ধর্মদর্শন

(PHILOSOPHY OF RELIGION)

শ্রীপ্রমোদবন্ধু সেনগুপ্ত, এম. এ. (দর্শন ও বাংলা) ;
অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক, কৃষ্ণচন্দ্র কলেজ,
হেতমপুর, (বীরভূম) ।

প্রকাশক :
শ্রীসূর্যকুমার ব্যানার্জী
ব্যানার্জী পাবলিশার্স
৫/১-এ কলেজ রো, কলিকাতা-৭০০০০৯

দ্বিতীয় সংস্করণ : অক্টোবর, ১৯৬২

মুদ্রাকর :
অজন্তা এণ্টারপ্রাইজ
কলিকাতা-৬

দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা

ধর্মদর্শনের পরিবর্ধিত, পরিমার্জিত ও পরিশোধিত দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হল। ধর্মদর্শনের প্রথম সংস্করণ কেবলমাত্র কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনার্স ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য ধর্মদর্শনের পাঠ্যসূচী অনুসরণ করে লেখা হয়েছিল। কিন্তু বর্তমান সংস্করণটি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনার্সের পাঠ্যসূচী ছাড়াও বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় ও উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের অনার্সের পাঠ্যসূচী অনুসরণ করে লেখা হল। এর ফলে কয়েকটি নতুন অধ্যায় গ্রন্থে সংযোজিত হয়েছে এবং গ্রন্থের শেষে পরিশিষ্টাংশে অধ্যায়-ভিত্তিক কতকগুলি নতুন অতিরিক্ত বিষয়ের আলোচনা করা হয়েছে। পরিশিষ্টাংশের আলোচ্য বিষয়গুলি কোন্ অধ্যায়ের অন্তর্ভুক্ত, অধ্যায় উল্লেখ করে তা নির্দেশ করা হয়েছে।

নতুন সংস্করণ রচনা করার সময় আমাকে পাশ্চাত্ত্য লেখকদের রচিত একাধিক ধর্মদর্শন (Philosophy of religion) গ্রন্থের সহায়তা গ্রহণ করতে হয়েছে। প্রয়োজন অনুসারে পাদটীকায় লেখক এবং তাঁদের লিখিত গ্রন্থের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। তবু উল্লেখ করা যেতে পারে যে, *John H. Hick*-এর "Philosophy of Religion" (Second Edition); *Paul Tillich*-এর 'Dynamics of Faith', 'Religious Language and the Problem of Religious Knowledge' (Edited by *R. E. Santoni*); *Peter Donovan*-এর 'Religious Language' এবং *Lenin*-এর 'On Religion' প্রভৃতি গ্রন্থগুলির সহায়তা আমাকে বিশেষভাবে গ্রহণ করতে হয়েছে। এই সব গ্রন্থের লেখক এবং প্রকাশকদের জানাই আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা।

ধর্মদর্শন গ্রন্থের প্রথম সংস্করণ বহুদিন পূর্বেই নিঃশেষিত হয়েছে। গ্রন্থটির নতুন সংস্করণের প্রকাশনায় বিলম্ব ঘটায় আমি দুঃখিত। এই সংস্করণটিও পূর্বের সংস্করণটির মতন সকলের সমাদর লাভ করবে, এই আশা করি। গ্রন্থের উন্নতিকল্পে যে-কোন অভিমত সাদরে গৃহীত হবে।

কলিকাতা
২০শে অক্টোবর, ১৯৮২

ইতি—
প্রমোদবন্ধু সেনগুপ্ত

ভূমিকা

ইতিপূর্বে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এবং সম্প্রতি বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ স্নাতক শ্রেণীর অনার্স ছাত্র-ছাত্রীদেরও মাতৃভাষায় উত্তরপত্র লেখার সুযোগ দান করেছেন। কিন্তু প্রায় সব বিষয়েই মাতৃভাষায় লেখা অনার্সের উপযুক্ত গ্রন্থের একান্ত অভাব। দর্শনের ক্ষেত্রেও এই অভাব বিশেষভাবে অনুভূত হচ্ছে। এই অভাবের কথা চিন্তা করেই অনার্স ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য ধর্মদর্শন (Philosophy of Religion) বাংলা ভাষায় রচনা করা হল। ধর্মদর্শন বিষয়টি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনার্স ছাত্র-ছাত্রীদের পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত তৃতীয় পত্র। যদিও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদিত ধর্মদর্শনের পাঠ্যসূচী অনুযায়ী গ্রন্থটি রচনা করা হয়েছে, তবুও পশ্চিমবঙ্গের ও বাংলাদেশের অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনের অনার্স ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ এই গ্রন্থ পাঠে উপকৃত হবে এই আশা রাখি। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনের (অনার্স) তৃতীয় পত্রের 'ক' অংশ (Group A) এবং 'খ' অংশ (Group B)-এর অন্তর্ভুক্ত সব বিষয়গুলি এবং তুলনামূলক ধর্ম (Comparative Religion) প্রভৃতি এই গ্রন্থে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে। আলোচনার ধারাবাহিকতা বজায় রাখার জন্য কোন কোন বিষয় গ্রন্থের প্রথমে ও কোন কোন বিষয় শেষে আলোচিত হয়েছে, কিন্তু কোন বিষয়ের আলোচনাই বাদ দেওয়া হয় নি। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচীর দিকে লক্ষ্য রেখে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচীর অতিরিক্ত কয়েকটি বিষয়ের আলোচনাকেও গ্রন্থে স্থান দেওয়া হয়েছে। বিষয়বস্তু যাতে সহজ ও সরলভাবে আলোচিত হয় এবং গত কয়েক বছরের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ধর্মদর্শনের প্রশ্নাবলীর উত্তর যাতে ছাত্ররা এই গ্রন্থ থেকে পেতে পারে সেদিকে লক্ষ্য রাখা হয়েছে। প্রায় দশ বৎসরের অনার্সের প্রশ্ন গ্রন্থের শেষে সংযোজিত করা হয়েছে।

এই গ্রন্থ রচনার জন্য প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য লেখকদের ধর্মতত্ত্ব ও ধর্মদর্শন সম্পর্কীয় অনেক গ্রন্থেরই সহায়তা গ্রহণ করতে হয়েছে। এই প্রসঙ্গে *Miall Edwards*, *G. Galloway*, *J. Caird*, *W. K. Wright*, *W. S. Brightman*, *J. B. Pratt*, *Durkheim*, *W. James*, *Martineau*, *Waterhouse*, *Hegel*, *G. Macgregor*, *Pringle Pattison* প্রভৃতি গ্রন্থকারদের ধর্মতত্ত্ব ও ধর্মদর্শন সম্বন্ধীয় গ্রন্থগুলি এবং *A. C. Bouquet*, *G. Parrinder*, *A. B. Widgery* প্রমুখ গ্রন্থকারদের Comparative Religion সম্বন্ধীয় গ্রন্থগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এইসব গ্রন্থকার এবং গ্রন্থের প্রকাশকদের প্রতি আমি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ।

হেতমপুর কলেজের অধ্যাপক শ্রীগিরিধারী শাস্ত্রী, হাওড়া গার্লস কলেজের উপাধ্যক্ষ বন্ধুবর শ্রীঅজিতকুমার ঘোষ, মহারাজা মনীন্দ্রচন্দ্র কলেজের অধ্যাপক শ্রীঋতেন্দ্রকুমার রায়, উলুবেড়িয়া কলেজের অধ্যাপক শ্রীসন্দীপ দাশ, মগরা শ্রীগোপাল ব্যানার্জীর কলেজের অধ্যাপক শ্রীশৈলেশ ভট্টাচার্য, সিউড়ী বিদ্যাসাগর কলেজের অধ্যাপক শ্রীঅমিয় চৌধুরী, কৃষ্ণনগর সরকারী কলেজের অধ্যাপক শ্রীনবকুমার নন্দী, বর্ধমান রাজ কলেজের অধ্যাপক শ্রীউমাপদ রক্ষিতের ও অন্যান্য অধ্যাপকবৃন্দের প্রেরণা এই গ্রন্থ রচনায় আমায় বিশেষভাবে উৎসাহিত করেছে। গ্রন্থখানি ছাত্র-ছাত্রী ছাড়াও যাতে সাধারণ পাঠকের উপকারে আসে সেদিকেও লক্ষ্য রাখা হয়েছে।

পরিশেষে যাদের জন্য বইখানি লেখা হল তারা উপকৃত হলে আমার শ্রম সার্থক হবে। ব্যানার্জী পাবলিশার্স-এর স্বত্বাধিকারী শ্রীসূর্যকুমার ব্যানার্জী এই পুস্তক প্রকাশ এবং রামকৃষ্ণ প্রিন্টিং ওয়ার্কস-এর স্বত্বাধিকারী শ্রীধনঞ্জয় দে পুস্তকটির মুদ্রণের দায়িত্ব গ্রহণ করে আমায় কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করেছেন। গ্রন্থটির উন্নতিকল্পে অধ্যাপক ও অধ্যাপিকাবৃন্দ তাঁদের সুচিন্তিত অভিমত জানিয়ে সুখী করবেন, এই কামনা করি।

হেতমপুর
নববর্ষ, ১৩৮১
১৫ই এপ্রিল, ১৯৭৪

প্রমোদবন্ধু সেনগুপ্ত

Syllabus

CALCUTTA UNIVERSITY

Philosophy of Religion. (Full marks)—50.

Seth Pringle Pattison : The Idea of God.

Chapters, 5, 8, 20.

J. Caird : An Introduction to Philosophy of Religion.

Chapters 5—6.

D. Miall Edwards : The Philosophy of Religion.

Chapters 2—4.

BURDWAN UNIVERSITY

Philosophy of Religion.—100.

Text :

1. J. Hick : Philosophy of Religion.
2. Lenin : Religion.
3. Mcgregor : Philosophical Issues in Religious Thought.

Chapters III, IV, V, VIII, IX, XIII (Houghton Mitfin Company, Boston).

NORTH BENGAL UNIVERSITY

Philosophy of Religion.—50 marks.

J. Hick : Philosophy of Religion.

সূচীপত্র

প্রথম অধ্যায়

পৃষ্ঠা

দ্বিতীয় অধ্যায়

তৃতীয় অধ্যায়

চতুর্থ অধ্যায়

পঞ্চম অধ্যায়

ষষ্ঠ অধ্যায়

সপ্তম অধ্যায়

অষ্টম অধ্যায়

নবম অধ্যায়

দশম অধ্যায়

একাদশ অধ্যায়

দ্বাদশ অধ্যায়

ত্রয়োদশ অধ্যায়

চতুর্দশ অধ্যায়

পঞ্চদশ অধ্যায়

ষোড়শ অধ্যায়

সপ্তদশ অধ্যায়

অষ্টাদশ অধ্যায়

ঊনবিংশ অধ্যায়

বিংশ অধ্যায়

একবিংশ অধ্যায়

দ্বাবিংশ অধ্যায়

পরিশিষ্ট

ধর্মদর্শন। প্রমোদবন্ধু সেনগুপ্ত। ব্যানার্জী পাবলিশার্স, ৫।১এ কলেজ রো, কলকাতা-৯। বাইশ টাকা।

'ধর্মদর্শন' গ্রন্থটি বস্তুত কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনার্স ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য রচিত হলেও সাধারণ উৎসুক পাঠক ও গবেষকরা এ গ্রন্থ থেকে যে প্রয়োজনীয় জ্ঞানস্পৃহা মেটাতে পারবেন সে বিষয়ে আমরা স্থির-নিশ্চিত। সেদিক থেকে এই গ্রন্থটি সংগ্রহযোগ্য। —যুগান্তর

ধর্মদর্শন
(Philosophy of Religion)

প্রথম অধ্যায়

ধর্মদর্শনের স্বরূপ ও পরিসর
(Nature and Scope of Philosophy of Religion)

১। ভূমিকা (Introduction) :

ধর্ম কি ? : মানুষের জীবনে ধর্ম এক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ধর্ম বলতে কি বোঝায় ? "ধর্ম হল মানুষের পক্ষে কোন উচ্চতর অদৃশ্য শক্তিকে স্বীকার করে নেওয়া, যে শক্তি মানুষের অদৃষ্টকে নিয়ন্ত্রিত করে এবং যা মানুষের আনুগত্য, শ্রদ্ধা এবং পূজা পাবার অধিকারী।"[1] ধর্ম হল কোন অতিপ্রাকৃত সত্তায় মানুষের বিশ্বাস, যে বিশ্বাস তার জীবনের সব মূল অনুভূতি এবং ক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রিত করে। ধর্ম জটিল বিষয়, তবু তার প্রয়োজনীয় বৈশিষ্ট্যগুলি উল্লেখ করে তার স্বরূপকে বুঝে নেওয়া যেতে পারে। **প্রথমতঃ,** ধর্মের ক্ষেত্রে কতকগুলি শক্তি প্রেষণারূপে ক্রিয়া করে, যেমন ব্যক্তির বেঁচে থাকার ইচ্ছা, তার আত্মবিকাশ ও কল্যাণলাভের আগ্রহ এবং তার আত্মোপলব্ধির বাসনা। **দ্বিতীয়তঃ,** ধর্ম কোন অতিপ্রাকৃত উচ্চতর সত্তায় বিশ্বাস সূচনা করে যার উপর ব্যক্তি তার নিজের কল্যাণলাভের জন্য নির্ভর করে। ঈশ্বরের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ককে কেন্দ্র করে ব্যক্তির মনে যে ভাব, ধারণা, চিন্তা এবং অনুভূতির আবির্ভাব ঘটে সেইগুলি ধর্মের আভ্যন্তরীণ দিক। **তৃতীয়তঃ,** ধর্মের একটা বাহ্য দিক আছে; সেটি হল ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান যার মাধ্যমে ঐ অনুভূতির প্রকাশ ঘটে। **চতুর্থতঃ,** ধর্মের একটা সামাজিক এবং আনুষ্ঠানিক রূপ আছে।

ধর্মের স্বরূপ

ধর্মের বৈশিষ্ট্য

ধর্ম একটি সার্বভৌম বিষয়। কি আদিম সমাজে, কি আধুনিক উন্নত সমাজে—যে কোন সমাজেই, কোন-না-কোন ভাবে ধর্মের অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায়। সি. জে. ডুকাস (*C. J. Ducasse*) বলেন, "মনে হয় কোন-না-কোন এক ধরনের ধর্ম মানবজীবনের এক সার্বিক বৈশিষ্ট্য।"[2] তাছাড়া, ধর্ম একটা শক্তিও বটে যা সমাজের উপর এবং স্বতন্ত্র সত্তা হিসেবে ব্যক্তির জীবনের উপর

ধর্মের সার্বিকতা

1. "Religion is recognition on the part of man of some higher unseen power as having control of his destiny, and as being entitled to obedience, reverence and worship."—Oxford Dictionary.

2. "Religion, of one kind or another seems to be a nearly universal feature of the life of mankind," —C. J. Ducasse : A Philosophical Scrutiny of Religion. Page 7.

গভীর প্রভাব বিস্তার করে। ডুকাস আরও বলেন, "ধর্ম-সম্বন্ধীয় বিশ্বাসের সত্যতা বা মিথ্যাত্বের প্রশ্ন, কিংবা ধর্মের পরিণাম প্রায়শঃই ভাল না মন্দ, এই সব প্রশ্ন উত্থাপন না করেও বলা যেতে পারে যে, ধর্ম মানুষের জীবনের এক অসাধারণ আকর্ষণীয় ও গুরুত্বপূর্ণ দিক।"[1]

ধর্মের স্বরূপকে কি ভাবে জানা যেতে পারে? : বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি থেকে ধর্মের স্বরূপকে জানা যেতে পারে। **প্রথমতঃ,** ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে ধর্মের স্বরূপকে আমরা জানার চেষ্টা করতে পারি। এই প্রচেষ্টার লক্ষ্য হবে ধর্মের উৎপত্তি এবং বিকাশকে জানা। **দ্বিতীয়তঃ,** মনোবিজ্ঞানীর দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে ধর্মকে জানার চেষ্টা করা যেতে পারে—এই প্রচেষ্টার লক্ষ্য হবে ধর্মের মনস্তাত্ত্বিক এবং আবেগগত ভিত্তিকে জানা। **তৃতীয়তঃ,** সমাজবিজ্ঞানীর দৃষ্টিভঙ্গি নিয়েও ধর্মকে জানবার চেষ্টা করা যেতে পারে। সমাজ-বিজ্ঞানীর চোখে ধর্ম হল সামাজিক অনুষ্ঠান (প্রতিষ্ঠান) (social institution)।

ধর্মের স্বরূপ বোঝার জন্য বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি

ধর্মের স্বরূপ উপলব্ধির জন্য এই দৃষ্টিভঙ্গির প্রত্যেকটিরই যে প্রয়োজন আছে, অস্বীকার করা চলে না। **কিন্তু এছাড়াও ধর্মকে বোঝার ও জানার আরও একটি দৃষ্টিভঙ্গি আছে যাকে বলা যেতে পারে ধর্মদর্শনের** (philosophy of religion) **দৃষ্টিভঙ্গি।** ধর্মদর্শন বলতে আমরা কোন ধর্মপ্রবণ ব্যক্তি বা কোন ধর্মসম্প্রদায়ের বিশ্বাসের নিছক আলোচনা বুঝব না। ধর্মদর্শন হল এইসব বিশ্বাসের বিচার।

ধর্মদর্শনের দৃষ্টিভঙ্গি

ধর্মদর্শনের লক্ষ্য কি? : প্রশ্ন হল, দার্শনিকের ধর্মে এই আগ্রহের স্বরূপ কী? ধর্মদর্শনের লক্ষ্যই বা কী? ধর্মের প্রতি ধর্মদর্শনের যে আগ্রহ, সেই আগ্রহ শুধু ঐতিহাসিকের আগ্রহ নয়, তার চেয়ে অধিক কিছু। আদিম নরনারীদের ধর্ম সম্পর্কে ধর্মইতিহাসে (histories of religion) এবং নৃবিজ্ঞানীদের নৃবিদ্যাগত বিবরণে বর্ণিত বিভিন্ন তথ্য ধর্মদার্শনিকের কাছে একটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যার সমাধানে প্রয়োজনীয় উপাদান রূপে গণ্য হয়—সমস্যাটি হল—এইসব তথ্য কি অর্থে ধর্মসম্বন্ধীয়, বা ধর্ম কি, বা 'কোন একটি ধর্ম' বলতে কি বোঝায়?

ধর্মদর্শনের লক্ষ্য সম্পর্কে টমসন[2] (*Thompson*) বলেন, "দর্শনের লক্ষ্য হল উপলব্ধি, সত্যের আবিষ্কার এবং বিচার-বুদ্ধির পরিতৃপ্তি। ধর্মদর্শনে এই লক্ষ্য ধর্মের দিকে

---

1. C. J. Ducasse : A Philosophycal Scruting of Religion, Page 8.
2. Thompson : The Philosophy of Religion, Page 130 (in the book Philosophy of Religion edited by. G. Labernethy and T. A. Langford.)

ধাবিত।" ধর্মদর্শনের প্রথম প্রচেষ্টা হল ধর্মকে বোঝা, ধর্ম কী তা আবিষ্কার করা, এবং ধর্মসম্বন্ধীয় ধারণাগুলির বুদ্ধিগত অর্থ উদ্ঘাটন করা। ধর্মীয় ধারণাগুলি সার্বিক ধারণা (conceptual), তাদের যৌক্তিক তাৎপর্য (logical significance) আছে এবং তারা সত্য কি মিথ্যা, এই প্রশ্ন উত্থাপন করা অযৌক্তিক নয়। ধর্মদর্শনের এই দিকটির কাজ হল ধর্মের মধ্যে যে বুদ্ধিগত সত্যতা আছে সেটির অনুসন্ধান করা। অবশ্য এর অর্থ এই নয় যে, ধর্মের সব সত্যই মানুষের আবিষ্কৃত বুদ্ধিগত উপাদানের মধ্যে নিহিত। এর অর্থ এও নয় যে, বুদ্ধির মাধ্যমেই ধর্মসম্বন্ধীয় সত্যের সঙ্গে আমাদের প্রধান সংযোগ সম্ভব হয়। ধর্মের যে বিষয়গুলি আমাদের বুদ্ধির অধিগম্য সেইগুলির স্বরূপ আবিষ্কার করাই ধর্মদর্শনের কাজ।

ধর্মদর্শনের লক্ষ্য

ধর্মের আরও একটা দিক আছে। বিচারবুদ্ধির সাহায্যে ধর্মকে বুঝতে গিয়ে, সত্যের পরিপূর্ণ রূপটিও আমাদের জানা হয়ে যায়। ধর্ম যে কেবল নিজের বিষয়-বস্তুর উপরই আলোকপাত করে তা নয়, সমগ্র সত্তার (whole existence) উপরই আলোকপাত করে, কেননা ধর্মের বিষয়বস্তুগুলি অন্যান্য বিষয়বস্তুর সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। টমসন বলেন, "ধর্মের যদি এমন সত্য থাকে যা মানুষের বিচারবুদ্ধির অধিগম্য, তাহলে ধর্মদর্শন যে কোন সামগ্রিক দৃষ্টির প্রয়োজনীয় অংশ"।[1] এমন হতে পারে যে ধর্ম সত্তার সঙ্গে যোগাযোগের যে উপায় নির্দেশ করে, চিন্তনের পক্ষে তা অনুসরণ করা সম্ভব হয় না। ধর্ম সত্তার সঙ্গে যোগাযোগের যে উপায় নির্দেশ করে তা বিচারবুদ্ধিপ্রদত্ত উপায়ের তুলনায় অনেক বেশী প্রত্যক্ষ এবং ঘনিষ্ঠ। দর্শনের পক্ষে এই ধরনের যোগাযোগের সুযোগ করে দেওয়া সম্ভব হয় না। তবু ধর্মদর্শন আমাদের বুঝতে সহায়তা করে এইসব যোগাযোগের উপায়গুলি কী, এবং ওরা কিসের জন্য অর্থাৎ ঐসব উপায়গুলি কি উদ্দেশ্য সিদ্ধ করে।

টমসনের মন্তব্য

যখন এই কথা বলা হয় যে ধর্মদর্শনের লক্ষ্য ধর্মের মধ্যে নিহিত সত্যগুলির বৌদ্ধিক উপলব্ধি, তার অর্থ এই নয় যে ধর্মদর্শনের কাজ প্রধানতঃ ধর্মের উৎপত্তি, ধর্মের শ্রেণীভেদ এবং ধর্মের বিকাশের বিভিন্ন স্তরগুলি নিয়ে আলোচনা করা। এই সব বিষয় ঐতিহাসিক, নৃবিজ্ঞানী এবং মনোবিজ্ঞানীর আলোচনার বিষয়। ধর্মদর্শন যা জানতে চায় তা হল ধর্মসম্বন্ধীয় বিশ্বাসের সত্যতা ও মিথ্যাত্বের বৌদ্ধিক ভিত্তি কি।

---

1. "So far as religion has any truth accessible to human reason the philosophy of religion is an essential part of any comprehensive view."

—Thompson : The Philosophy of Religion, Page 130

একটা কথা মনে রাখা যুক্তিসঙ্গত হবে যে ধর্মদর্শন ধর্মের কোন দিক (aspect) নয়, ধর্মদর্শন ধর্মের আলোচনা অর্থাৎ কিনা, ধর্মের দার্শনিক আলোচনা। এই প্রসঙ্গে ফ্রেডরিক ফেরী (*Fredrick Ferr'e*)[1] বলেন, "এটুকু বললে যথেষ্ট হবে যে ধর্মদর্শন একটা বিশেষ বিষয়ে আগ্রহ দেখায়, সেটা হল দর্শনের মধ্যে থেকে ধর্ম সম্পর্কে আলোচনা করা।"

ধর্মদর্শন ধর্মের কোন দিক নয়

২। ধর্মদর্শনের স্বরূপ ও পরিসর (Nature and Scope of Philosophy of Religion) :

দর্শন মানুষের অভিজ্ঞতার অর্থ ও মূল্য নিরূপণ করে। এই উদ্দেশ্যে অভিজ্ঞতার বিচার ও সমালোচনা দর্শনের কাজ। ধর্ম মানুষের অভিজ্ঞতার একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ দিক এবং সেইহেতু এর দার্শনিক ব্যাখ্যার প্রয়োজন আছে। ধর্ম-দর্শনের কাজ মানুষের ধর্মসম্বন্ধীয় অভিজ্ঞতার তাৎপর্য ও মূল্য নির্ধারণ করা, বিশেষ করে ধর্মসম্বন্ধীয় অভিজ্ঞতার চরম বা অন্তিম ভিত্তিকে (final ground) ব্যাখ্যা করা। কারণ ধর্ম হল মানুষের জীবনের একটা বৈশিষ্ট্য এবং স্থায়ী ঘটনা এবং ধর্মীয় ক্রিয়া বিশ্বজগতের প্রতি মানুষের মনোভাবের সবচেয়ে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ প্রকাশ।

ধর্মদর্শন ধর্মসম্বন্ধীয় অভিজ্ঞতার অর্থ নিরূপণ করে

ধর্মদর্শন কি? এই প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে জন হিক (*John Hick*)[2] বলেন যে, ধর্মদর্শন হল ধর্ম সম্পর্কে দার্শনিক চিন্তন (philosophical thinking about religion)। তাঁর মতে দার্শনিক দিক থেকে ধর্ম সম্পর্কীয় বিশ্বাসের সমর্থন (philosophical defense of religious convictions) ধর্মদর্শনের কাজ নয়। ধর্ম দর্শনের কাজ নয় বিচার বুদ্ধির দ্বারা ঈশ্বরের অস্তিত্ব কিভাবে প্রমাণ করা যায় সেটি দেখান। এই কাজ হল অপ্রত্যাদিষ্ট বা স্বাভাবিক ঈশ্বর তত্ত্বের বা ধর্ম-তত্ত্বের (natural theology) কাজ।

হিক মনে করেন ধর্মদর্শন, ধর্ম শিক্ষার কোন মাধ্যম (organ) নয়। বস্তুতঃ ধর্মের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে ধর্মদর্শনের স্বরূপ নিরূপণ কখনও সমীচীন হতে পারে না। কেননা নাস্তিক, অজ্ঞেয়তাবাদী অর্থাৎ যাঁরা মনে করেন পরমতত্ত্ব এক অজ্ঞেয় সত্তা এবং ঈশ্বর-

---

1. "It is simple enough to say that philosophy of religion is a special area of interest, attending to the subject of religion, within the general discipline of philosophy." —Fredrick Ferre' : Basic Modern Philosophy of Religion. Page 11.

2. J, Hick : Philosophy of Religion (second edition), Page 1.

বিশ্বাসী, সকলেই ধর্ম সম্পর্কীয় দার্শনিক চিন্তনে মনোনিবেশ করেন বা করতে পারেন। কাজেই ধর্মদর্শন ধর্মতত্ত্বের কোন শাখা নয়, দর্শনেরই শাখা। ধর্মতত্ত্ব বলতে আমরা এখানে ধর্মসম্পর্কীয় বিশ্বাসের সুসংহত বর্ণনাকেই বুঝব। ধর্মদর্শন ধর্মতত্ত্বের ধারণা বা প্রত্যয়গুলি এবং বচনগুলি আলোচনা করে। ধর্মতত্ত্ববিদদের যুক্তিগুলিও আলোচনা করা ধর্মদর্শনের কাজ। এ ছাড়াও ধর্মদর্শন ধর্মীয় অভিজ্ঞতা-পূর্ব-ঘটনা (prior phenomena of religious experience) নিয়ে আলোচনা করে। উপাসনা, ধর্মানুষ্ঠান, যার উপর ঈশ্বরতত্ত্বের বা ধর্মতত্ত্বের ভিত্তি এবং যা থেকে ঈশ্বরতত্ত্ব বা ধর্মতত্ত্বের উদ্ভব, তাও ধর্মদর্শনের আলোচনার বিষয়।

ধর্মদর্শনের স্বরূপ ও পরিসর সম্পর্কে জন হিকের বক্তব্য

ঈশ্বর, পূতচরিত্র বা ধার্মিকতা, মোক্ষ, পূজা, উপাসনা, সৃষ্টি, উৎসর্গ, অনন্ত জীবন ইত্যাদি ধর্মদর্শনের আলোচনার বিষয়বস্তু। ধর্মদর্শনের আর একটি কাজ হল, হিকের মতে, ধর্মীয় উক্তির স্বরূপ বিশ্লেষণ করা। এই উদ্দেশ্যে ধর্মদর্শনকে দৈনন্দিন জীবনের কথাবার্তা, বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার, নৈতিকতা বিষয়ক উক্তি এবং কলা (Arts)-র কল্পনাত্মক অভিব্যক্তি বা প্রকাশের সঙ্গে তুলনা করেই ধর্মীয় উক্তির স্বরূপ নিরূপণ করতে হয়।

তবে ধর্মদর্শনকে সাধারণভাবে ধর্মের স্বরূপ এবং বিভিন্ন ধর্মের প্রধান প্রধান ধারণাগুলিও আলোচনা করতে হয়।

ধর্মদর্শনের স্বরূপ বর্ণনা করতে গিয়ে মায়েল এডওয়ার্ডস্ (*Miall Edwards*)[1] বলেন, "এ হল ধর্ম সম্বন্ধীয় অভিজ্ঞতার স্বরূপ, ক্রিয়া, মূল্য, সত্যতা এবং পরম তত্ত্বের স্বরূপের প্রকাশ হিসেবে ধর্মের সামর্থ্য কতটুকু তার অনুসন্ধান।" ধর্মদর্শনের পরিচয় দিতে গিয়ে রাইট (*Wright*)[2] বলেন, "ধর্মদর্শন ধর্মের সত্য আলোচনা করে; সামগ্রিকভাবে জগতের ব্যাখ্যায় ধর্মের ক্রিয়াকলাপ এবং বিশ্বাসের চরম তাৎপর্য কি, নিরূপণ করাও ধর্মদর্শনের কাজ। ধর্মের সঙ্গে তত্ত্বের সম্পর্ক নিরূপণ করাই ধর্মদর্শনের কাজ।" কেয়ার্ড (*Caird*)[3] বলেন, "ধর্ম এবং ধর্মসম্বন্ধীয় ধারণাকে অনুভূতি বা ব্যবহারিক অভিজ্ঞতার রাজ্য থেকে বিচ্ছিন্ন করে এনে বৈজ্ঞানিক চিন্তার বিষয়বস্তু করে তোলা যেতে পারে"—পূর্ব থেকে এই বিষয়টি অনুমান করে নিয়েই ধর্মদর্শন তার কাজ

1. "It is a philosophical inquiry into the nature, function, value and truth of religious experience, and into the adequacy of religion as an expression of the nature of ultimate reality".—Miall Edwards : The Philosophy of Religion, Page 12.

2. W. K. Wright ; A Student's Philosophy of Religion, Page 4.

3. J. Caird ; An Introduction to the Philosophy of Religion, Page 1.

সুরু করে। ধর্ম এবং দর্শনের বিষয়বস্তু এক হলেও, এই একই বিষয়বস্তুর প্রতি উভয়ের দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য আছে। ধর্মের ক্ষেত্রে তারা উপস্থিত হয় উপাসনার বিষয়বস্তু হিসেবে কিন্তু দর্শনের ক্ষেত্রে তারা হয়ে ওঠে বিচারমূলক চিন্তনের বিষয়। গ্যালোয়ে (*Galloway*)[1] ধর্মদর্শনের সমস্যার সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেন, "এ হল মানুষের জীবনের এবং প্রগতির প্রয়োজনীয় উপাদান হিসেবে ধর্মের চরম অর্থের সমস্যা।" ধর্মীয় অভিজ্ঞতার ভিত্তি ব্যাখ্যা করা ধর্মদর্শনের কাজ এবং এই কাজ করতে গিয়ে ধর্মের স্বীকৃত সত্যগুলিকে পরীক্ষা করাও তার কাজ। ব্রাইটম্যান (*Brightman*)[2] ধর্মদর্শনের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেন, "ধর্মদর্শন হল ধর্মের এবং ধর্মের সঙ্গে অন্যান্য অভিজ্ঞতার সম্বন্ধের যৌক্তিক ব্যাখ্যার সাহায্যে ধর্মসম্বন্ধীয় বিশ্বাসের সত্যতা এবং ধর্মীয় মনোভাব ও ক্রিয়ার মূল্য আবিষ্কারের প্রচেষ্টা।"

ধর্মদর্শনের বিভিন্ন সংজ্ঞা

[3]জে. সি. ফিভার ধর্মদর্শনের কাজ কি তা ব্যক্ত করতে গিয়ে বলেছেন, ধর্মদর্শন ধর্মীয় অভিজ্ঞতার মধ্যে যে মানবিক উপাদান বর্তমান তার পরীক্ষা করে, সমালোচনা করে এবং তার যাথার্থ্য বিচার করে; সেইহেতু ধর্মদর্শনের কাজ দু'ধরনের—একদিকে তার কাজ হল মানুষের আচরণে প্রকাশমান ধর্মীয় অভিজ্ঞতার যে উপাত্ত তার ব্যাখ্যা দেওয়া, তার মূল্যায়ন করা এবং তাকে ঐক্যবদ্ধ করা, অপর দিকে সত্তার ব্যাখ্যা হিসেবে ধর্মীয় অভিব্যক্তির উপযোগিতার মূল্যায়ন করা।

মানুষের আলোচনা অসম্পূর্ণ থেকে যায় যদি ধর্মের আলোচনাকে তার অন্তর্ভুক্ত করা না হয়।

---

1. "It is the problem of the final meaning of religion as a constituent element in human life and development".—Galloway: The Philosophy of Religion, Page 24.

2. "Philosophy of Religion is an attemt to discover by rational interpretation of religion and its relation to other types of experience, the truth of religious beliefs and the value of religious attitudes and practices."

—W. S. Brightman: A Philosophy of Religion, Page 22.

3. "The task of the philosophy of religion, which is to examine, criticize, and assess the validity of at least the human elements in religious experience, is thus twofold. On the one hand, it has the function of interpreting, evaluating and integrating the data of religious experience as these are manifest in human behaviour. On the other hand, it must appraise the adequcy of the religious expression as in interpretation of reality."

—J. C. Feaver and W. Horosz: Religion in Philosophical and Cultural Perspective.

ধর্ম এক অর্থে মানুষের অভিজ্ঞতার একটা দিক এবং সেহেতু বিজ্ঞানের, বা সঠিক-ভাবে বলতে গেলে ঈশ্বরতত্ত্বের বা ধর্মতত্ত্বের (theology) অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু অন্যান্য ঘটনার মতো ধর্মও তার বিষয়বস্তুর দার্শনিক ব্যাখ্যার দাবী করে। কেননা, এই জাতীয় ব্যাখ্যার মাধ্যমেই তার যাথার্থ্য ও তাৎপর্য বোধগম্য হবে এবং মানুষের সমগ্র অভিজ্ঞতার মধ্যে ধর্মসম্বন্ধীয় অভিজ্ঞতা তার যথাযথ স্থানে প্রতিষ্ঠিত হবে। ধর্ম দাবী করে যে অন্যান্য অভিজ্ঞতার পাশাপাশি সেও একটা উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করে আছে। ধর্ম তার উন্নত স্তরে বস্তুর পরম স্বরূপের সঙ্গে নিবিড়ভাবে যুক্ত বলে দাবী করে থাকে।

ধর্মের দার্শনিক ব্যাখ্যার প্রয়োজনীয়তা

ধর্মের তথ্য বা ঘটনাগুলি যেন দর্শনকে অবিরত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আহ্বান করছে, যাতে সত্য ও তত্ত্বের যথার্থ ব্যাখ্যা ধর্ম দিতে পারে কিনা দর্শন তার দাবীটুকু অনুসন্ধান করে দেখুক এবং ধর্মের স্বীকৃত সত্যগুলি দর্শন বিচার করে দেখুক। ধর্মের এই প্রতিদ্বন্দ্বীতার আহ্বানে দর্শনের সাড়া দেওয়াই হল ধর্মদর্শন। **ধর্মদর্শন ধর্মীয় অভিজ্ঞতার স্বরূপ, ক্রিয়া, মূল্য এবং সত্যতা সম্পর্কে দার্শনিক অনুসন্ধানকার্যে আত্মনিয়োগ করে** এবং **পরমতত্ত্বের স্বরূপকে প্রকাশ করার পক্ষে ধর্ম কতখানি সমর্থ বা উপযোগী তার বিচার করে।**"

ধর্মদর্শনের প্রকৃতি

অন্য দর্শনের মতন ধর্মদর্শনকেও বাস্তব অভিজ্ঞতার ঘটনাবলী থেকে তার উপায় খুঁজে নিতে হবে এবং পরমনীতির আলোকে তাদের মূল্যাবধারণ করার জন্য এবং তত্ত্বের স্বরূপের মধ্যে তাদের ভিত্তি আবিষ্কার করার জন্য ঘটনাবলীকে অতিক্রম করে যেতে হবে।

কাজেই **ধর্মদর্শনের কাজ হল দুধরনের—প্রথমতঃ,** মানুষের জীবনের স্বাভাবিক এবং সার্বিক ঘটনা হিসেবে ধর্মের ঐতিহাসিক ও মনস্তাত্ত্বিক অনুসন্ধান, **দ্বিতীয়তঃ,** বস্তুর যথাযথ স্বরূপ এবং সত্যতার সঙ্গে ধর্মসম্বন্ধীয় অভিজ্ঞতার সম্পর্কের তাত্ত্বিক অনুসন্ধান। ইতিহাসকে বাদ দিলে ধর্মদর্শন হয়ে পড়ে শূন্যগর্ভ, আর দর্শনকে বাদ দিয়ে ধর্মের ইতিহাস হয়ে পড়ে অন্ধ।

ধর্মদর্শনের দু'ধরনের কাজ

ধর্মদর্শনের প্রথম কাজ হবে নৃতত্ত্ব, সমাজবিদ্যা, ইতিহাস, ধর্মের তুলনামূলক আলোচনা, ধর্মের মনস্তত্ত্ব প্রভৃতি আলোচনার বিস্তৃত ক্ষেত্র থেকে প্রয়োজনীয় উপাদান সংগ্রহ করা এবং উপাদানগুলির শ্রেণীকরণের বা ধর্মের বিবর্তনের কোন নীতি আবিষ্কার করার জন্য সচেষ্ট হওয়া, যার সাহায্যে উপাদানগুলিকে বোধগম্য এবং সুবিন্যস্ত করে

তোলা যায়। ধর্ম কিভাবে ক্রিয়া করে, মানুষের প্রগতির বিভিন্ন স্তরে, বিভিন্ন পরিবেশে কিভাবে ক্রিয়া করেছে তার জ্ঞানের সাহায্যেই বুঝে নিতে হবে ধর্ম কি।

কিন্তু শুধুমাত্র উপাদান সংগ্রহ ও সুবিন্যস্ত করার মধ্যেই ধর্মদর্শনের কাজের শেষ হয় না। ধর্মজীবনের এই সব জটিল সুবিন্যস্ত ঘটনাবলীর ব্যাখ্যা ও মূল্যাবধারণ করা ধর্মদর্শনের কাজ। তাছাড়া ধর্মদর্শনকে বিচার করে দেখতে হবে মানুষের ধর্মসম্বন্ধীয় ধারণাগুলির সঙ্গে সত্যতার মিল কতটুকু।

ধর্মদর্শনের প্রতি অভিজ্ঞতাবাদীদের দৃষ্টিভঙ্গি

কোন কোন আধুনিক চিন্তাবিদ, বিশেষ করে যারা অভিজ্ঞতাবাদী, মনে করেন যে ধর্মের উপরিউক্ত সমস্যাগুলি পুরোপুরি তত্ত্ববিদ্যার সমস্যা এবং সেহেতু ধর্মদর্শনের আলোচনার পরিসরের অন্তর্ভুক্ত নয়। বস্তুতঃ, এই সব সমস্যা তাঁদের মতে মানুষের মনের অগম্য; এঁরা ধর্মের বিচারমূলক ব্যাখ্যার প্রয়োজনীয়তা ও সম্ভাবনা অস্বীকার করতে চান এবং মনে করেন ধর্মদর্শনের কাজ হল নিছক ধর্মসম্বন্ধীয় ঘটনার বা বিষয়ের বর্ণনা ও বিন্যাস। এঁরা মনে করেন যে ধর্মের বস্তুগত সত্যতার প্রশ্নটির কোন নিষ্পত্তির প্রয়োজন নেই। মানুষের বিবর্তনের ক্ষেত্রে ধর্মের ক্রিয়ামূলক বৈশিষ্ট্যটুকু যদি প্রদর্শিত হয় এবং সামাজিক জীবনের উপর এর ব্যবহারিক ফলাফলগুলি যদি নিরূপিত হয় তা হলেই যথেষ্ট। ধর্মের সত্যকে এঁদের মতে শুধু এইভাবেই সমর্থন করা যেতে পারে। এই মতানুসারে ধর্মদর্শনের কাজ হল ধর্মের অভিজ্ঞতাভিত্তিক আলোচনার ফলাফলগুলিকে একটা সাধারণ দৃষ্টিভঙ্গি থেকে সংগ্রহ করা।

অভিজ্ঞতাবাদীদের দৃষ্টিভঙ্গির সমালোচনা

কিন্তু সমালোচনায় একথা বলা যেতে পারে যে ধর্মের নিছক অভিজ্ঞতাভিত্তিক আলোচনাও প্রমাণ করে যে ধর্মীয় চেতনা তার ভিত্তি হিসেবে এক অভিজ্ঞতা ঊর্ধ্ব সত্ত্বা বা তত্ত্বের নির্দেশ করে। কাজেই ধর্মের সারবস্তুকে শুধুমাত্র অভিজ্ঞতার দিক থেকে বুঝে নেওয়া যায় না। ধর্ম তার বিকাশের পথে অগ্রসর হতে হতে এমন একটা আদর্শকে লাভ করতে চায়, যেটি ইন্দ্রিয়ের অগোচর এবং যেটি আধ্যাত্মিক মূল্যের জগৎ থেকে তার যাথার্থ্য এবং প্রামাণ্য লাভ করে। এই আধ্যাত্মিক মূল্যের জগৎ দেশ-কাল ঘটনার অভিজ্ঞতার জগৎকে অতিক্রম করে যায়। এই আধ্যাত্মিক মূল্যের জগতই ধর্মের ভিত্তি এবং এটিই ধর্মের গভীরতর অর্থের সূচনা করে। এই ভিত্তি ছাড়া ধর্ম হয়ে পড়ে নিছক স্বপ্ন বা ভ্রান্তি, যার কোন বস্তুগত ভিত্তি নেই।

যদি মনে করা হয় ধর্মীয় চেতনা হল নিছক বস্তুনিরপেক্ষ অনুভূতির অবস্থা, তাহলে ধর্মের উপরে ব্যক্তির আর কোন আস্থা থাকবে না এবং ধর্মের যদি কোন ব্যবহারিক

মূল্য থাকে তাও অন্তর্হিত হবে। ধর্ম সত্যও হতে চায়, কার্যকরও হতে চায়; কার্যকর হতে চায় যেহেতু সত্য। কাজেই ধর্মীয় চেতনার মধ্য দিয়ে জগৎ সম্পর্কীয় যে মতবাদের প্রকাশ ঘটে তার একটা বিচারবুদ্ধি-সম্মত ভিত্তি যুগিয়ে দেবার দায়িত্ব ধর্মদর্শন কিছুতেই পরিহার করতে পারে না। যদি ধর্মদর্শন এইরকম কোন ভিত্তি আবিষ্কার করতে ব্যর্থ হয় বা যদি আবিষ্কার করে যে ধর্মীয় চেতনার সঙ্গে বিশ্বজগতের বৈরিতা আছে, তাহলে সে কথাও তাকে জানিয়ে দিতে হবে।

ধর্মদর্শন ধর্মের বৌদ্ধিক ভিত্তি নির্দেশ করে

ধর্মদর্শনের প্রথম কাজ ধর্মসম্বন্ধীয় অভিজ্ঞতার আলোচনা। আলোচনার এই বিভাগকে সময় সময় ধর্মের অবভাসবিজ্ঞান (Phenomenology of Religion) বলে অভিহিত করা হয়। এই বিষয়টিকে দুটি দৃষ্টিভঙ্গি থেকে আলোচনা করা যেতে পারে —মনস্তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে (the psychological point of view) অর্থাৎ ধর্মীয় চেতনার আভ্যন্তরীণ বা বস্তুনিরপেক্ষ অভিজ্ঞতার দিক থেকে এবং দ্বিতীয়তঃ ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে (the historical point of view) অর্থাৎ আচার-ব্যবহার, রীতিনীতি, অনুষ্ঠান, ধর্মমত এবং ধর্মতত্ত্বের মধ্য দিয়ে যে ধর্মীয় চেতনার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে সেই সব দিক থেকে। এই দুই দৃষ্টিভঙ্গি ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে সম্পর্কিত। এই দুটি একত্র যুক্ত হয়ে ধর্মীয় অভিজ্ঞতার মৌলিক ঐক্যকে গড়ে তুলেছে। যার মধ্য দিয়ে ধর্মীয় চেতনার প্রকাশ তাকে বাদ দিয়ে ধর্মীয় চেতনার আভ্যন্তরীণ অভিজ্ঞতাকে (inner experience) আমরা পরিপূর্ণভাবে বুঝে উঠতে পারি না। আবার ধর্মীয় চেতনার মধ্যে যে উদ্দেশ্য, কামনা, প্রত্যাশা নিহিত সেইগুলিকে অগ্রাহ্য করে ধর্মের বহিঃপ্রকাশকে উপলব্ধি করা যায় না। কেননা ধর্মসম্বন্ধীয় অভিজ্ঞতা সামাজিক পরিবেশ থেকেই তার অধিকাংশ উপাদান যেমন বংশপরম্পরাগত ঐতিহ্য, আচার-ব্যবহার, অনুমান, বিশ্বাস প্রভৃতি গ্রহণ করে।

মনস্তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি ও ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গি

এইসব আচার-ব্যবহার, অনুষ্ঠান, বিশ্বাস প্রভৃতির মূল রয়েছে কতকগুলি মনস্তাত্ত্বিক প্রেষণার (psychological motives) মধ্যে, যদিও এইসব প্রেষণা খুব বেশী পরিমাণে চেতনার কেন্দ্রস্থলে ক্রিয়া না করে অবচেতন মনে ক্রিয়া করে। ইতিহাসের তথ্যগুলি আমাদের কাছে অর্থহীন হয়ে পড়ে যদি আমরা তার মধ্যে কিছু অনুভূতি, আবেগ, কামনা, বাসনা, বিশ্বাস আবিষ্কার করতে না পারি, যেগুলি তাদের অর্থবহ করে তোলে। আবার অপরপক্ষে বস্তুনিরপেক্ষ ধর্মীয় অভিজ্ঞতা হয়ে পড়ে

ধর্মের আভ্যন্তরীণ দিক ও তার বাহ্য প্রকাশের মধ্যে নিবিড় সম্বন্ধ বর্তমান

ছলনাময়, অসংলগ্ন ও নিছক ব্যক্তিগত বিষয় যদি উপাসনা, অনুষ্ঠান, ক্রিয়াকর্ম ও ধর্মীয় মতবাদের মধ্য দিয়ে তার প্রকাশ না ঘটে।

ধর্মদর্শনকে শুধু তথ্য বা ঘটনাকে জানলেই চলবে না, তাদের বুঝতে হবে, ব্যাখ্যা করতে হবে। কাজেই ধর্মদর্শনকে কতকগুলি প্রশ্নের উত্তর যুগিয়ে দিতে হয়। যেমন—ধর্ম কী? ধর্মের প্রয়োজনীয় স্বরূপকে কি ভাবে জানা যায়? কিভাবে আমরা ধর্মের স্বরূপ ও ক্রিয়ার সংজ্ঞা দিতে পারি? ধর্মের সম্প্রদায়গত (racial) এবং ব্যক্তিগত (personal) ক্রিয়াগুলি কী; এবং ধর্মের কোন ক্ষতিকারক পরিণাম আছে কিনা? কোথায় গিয়ে আমরা ধর্ম ও ধর্মনিরপেক্ষ (secular) বিষয়ের মধ্যে সীমারেখা টেনে দিতে পারি? জীবন ও সংস্কৃতির অন্যান্য দিকগুলির সঙ্গে ধর্ম কি ভাবে সম্পর্কযুক্ত। নীতি, কলা, বিজ্ঞান ও দর্শনের সঙ্গে ধর্মের পার্থক্য কোথায় এবং কি ভাবেই বা ধর্ম এদের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত? অর্থাৎ কি না ধর্মের মধ্যে সেই সাবিক বৈশিষ্ট্যগুলি কি, যা তাকে নীতি, বিজ্ঞান, দর্শন, কলা প্রভৃতি মানব অভিজ্ঞতা থেকে পৃথক করে। এছাড়াও ধর্মদর্শনকে ধর্মের উৎপত্তি এবং বিকাশ সংক্রান্ত অনেক প্রশ্নের আলোচনা করতে হয়। ধর্মের বিবর্তনের প্রক্রিয়ার মূলে যে নিয়ম, নীতি বা উপাদান ক্রিয়া করছে সেইগুলি আবিষ্কার করা যায় কিনা ধর্মদর্শনকে তার আলোচনা করতে হয়। ধর্ম তার ক্রিয়া সম্পাদনের জন্য বা নিজেকে রক্ষা করার জন্য যেসব পদ্ধতি অবলম্বন করে সেইগুলি ধর্মদর্শনের আলোচনার অন্তর্ভুক্ত। আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ধর্মদর্শনের আলোচনার অন্তর্ভুক্ত, সেটি হল ঈশ্বর, ইচ্ছার স্বাধীনতা, অমরত্ব, প্রভৃতি বিষয়গুলির সমর্থনে উপযুক্ত প্রমাণ যদি পাওয়া না যায়, বা সংগৃহীত প্রমাণ যদি খুবই স্বল্প বা দুর্বোধ্য হয় তা'হলে ঐ বিষয়গুলিতে বিশ্বাস বা অবিশ্বাস কতখানি যুক্তিসঙ্গত।

ধর্মদর্শনের পরিসর অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলি

বিশ্বজগৎ সম্পর্কে ধর্মসম্বন্ধীয় মতবাদের যাথার্থ্য এবং উপযোগিতার প্রশ্নটিও ধর্মদর্শনকে আলোচনা করতে হয়। এই সমস্যার দুটি দিক আছে—প্রথমতঃ জ্ঞানবিদ্যা সম্পর্কীয় সমস্যা। মানব মনের কি তত্ত্বের স্বরূপ বিচারের ক্ষমতা আছে? যা ইন্দ্রিয়ের অনধিগম্য তার জ্ঞান কি সম্ভব? অভিজ্ঞতা অভিজ্ঞতা-ঊর্ধ্ব বিষয়কে জানে—একথা বলার মধ্যে কি কোন বিরোধিতা আছে? ধর্মসম্বন্ধীয় জ্ঞানের স্বরূপ কি? ধর্মনিরপেক্ষ বিষয়কে যে ভাবে জানা যায়, ধর্মসম্বন্ধীয় বিষয়কে কি সেই একই পদ্ধতিতে জানা যায়? উভয় ধরনের জ্ঞান কি অভিন্ন, না উভয়ের মধ্যে গুণগত পার্থক্য আছে? ধর্মবিশ্বাস কি উন্নত ধরনের জ্ঞানের বৃত্তি? ধর্মীয় চেতনা সত্যকে অপরোক্ষ

অনুভূতি বা স্বজ্ঞা (intuition)-রূপ এক উন্নত পদ্ধতির মাধ্যমে জানে—এই দাবীকে কি সমর্থন করা চলে ?

সমস্যার অপর দিকটি হল তত্ত্ববিদ্যা সম্পর্কীয় সমস্যা (ontological problem)। মানবমনের সামর্থ্যের আলোকে ধর্মের দাবীকে পরীক্ষা করার পর তাকে পরমতত্ত্বের পরিপ্রেক্ষিতে আর একবার পরীক্ষা করে দেখতে হবে। তত্ত্বের স্বরূপ কি এমনই যে জগৎ সম্পর্কীয় ধর্মীয় মতবাদকে সমর্থন করতেই হবে ? নাকি ঐ ধরনের মতবাদ নিছক ভ্রম বা ভ্রান্তি ? জগৎ সম্পর্কীয় ধর্মীয় মতবাদ যদি সমর্থন-যোগ্য হয় তাহলে প্রশ্ন দেখা দেয় কোন্ মতবাদটি পরমতত্ত্বের স্বরূপ সম্পর্কে সার্থক প্রকাশ ? ধর্মীয় সত্যের সর্বোচ্চ রূপ কোন্টি—সর্বেশ্বরবাদ (Pantheism) সর্বধরেশ্বরবাদ (Panentheism) বা বহুদেববাদ (pluralism) বা অদ্বৈতবাদ ? যে মতবাদকেই গ্রহণ করা হোক না কেন, অকল্যাণের সমস্যার (problem of evil) পরিপ্রেক্ষিতে সেই মতবাদকে কি সমর্থন করতে হবে ? কাজেই সবচেয়ে উপযোগী ধর্মবিশ্বাসের আবিষ্কার ও ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে ধর্মদর্শনেরও অবদান রয়েছে। সুতরাং বলা যেতে পারে ধর্মদর্শনের আলোচনার পরিসর খুবই বিস্তৃত এবং তার আলোচ্য সমস্যাবলীর সংখ্যাও কম নয়।

তত্ত্ববিদ্যা সম্পর্কীয় সমস্যা

ধর্মদর্শনের পরিসর সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে জন হিক (*John Hick*) বলেন যে, যে-সব বিষয় ধর্মদর্শনের পরিসরভুক্ত হওয়া উচিত নয়, সেইগুলিকে অনেক সময় ধর্ম-দর্শনের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। তাঁর মতে জীবনদর্শন এবং অস্তিত্ববিষয়ক দর্শন (Philosophy of existence) ধর্মদর্শনের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে না। বস্তুতঃ জন হিক অস্তিত্ববাদী চিন্তাধারাকে (existential thinking) ধর্মদর্শনের অন্তর্ভুক্ত করার বিরোধিতা করেছেন, অস্তিত্ববাদী দার্শনিক যে সমস্যার আলোচনা করে, সেই সমস্যা থেকে নিজেকে বিযুক্ত রেখে নিরপেক্ষ দর্শকের দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করে সমস্যা সম্পর্কে চিন্তা করতে ব্যর্থ হন। তিনি ব্যক্তিগতভাবে নিজেকেও সেই সমস্যার সঙ্গে জড়িয়ে ফেলেন। মানুষের উদ্বেগ, সীমা, অপরাধ, হতাশা, মৃত্যু এবং অসত্তার ভীতি, সন্দেহ, অর্থশূন্যতা, নিঃসঙ্গতা এবং আত্মবিচ্ছিন্নতা ইত্যাদি অস্তিত্ববাদী চিন্তনের বিষয়বস্তু, অস্তিত্ববাদীদের ভাষা হল আত্মার দুঃখের ভাষ।

দ্বিতীয় অধ্যায়

ধর্মদর্শনের সঙ্গে অন্যান্য বিজ্ঞানের সম্পর্ক

(Relation of Philosophy of Religion to other Sciences)

১। ধর্মদর্শন ও ধর্মতত্ত্ব বা ঈশ্বরতত্ত্ব[1] (Philosophy of Religion and Theology) ঃ

ধর্মদর্শন ও ধর্মতত্ত্বের সম্বন্ধ নিরূপণের জন্য প্রয়োজন উভয়ের স্বরূপ ও প্রকৃতি ভাল করে বুঝে নেওয়া। গ্যালোয়ে (*Galloway*)-এর মতে ধর্মতত্ত্ব হল 'ইতিহাসস্বীকৃত কোন ধর্ম থেকে উৎপন্ন ধর্মসম্বন্ধীয় বিশ্বাস বা মতবাদের সুসংহত রচনা।'[2] এর উদ্দেশ্য হল এমন কিছু সত্যকে ব্যক্ত করা যেগুলি কোন একটি নির্দিষ্ট ধর্মের কার্যকর মূল্য (working values)-রূপে নিজেদের প্রমাণ করতে পেরেছে। ধর্মতত্ত্ব এইসব সত্যকে সকলের বোধগম্য করে উপস্থাপিত করতে চায় যাতে সেইগুলিকে শেখানো যায় এবং সেইগুলি কোন ধর্মসম্প্রদায়ের ঐক্যের সংযোগ-সূত্ররূপে ক্রিয়া করতে পারে। ধর্মতত্ত্ব ধর্মবিশ্বাসকে (faith) স্বীকার করে নেয় এবং বিচারবুদ্ধির (reason) সাহায্যে তার ব্যাখ্যা দেবার জন্য সচেষ্ট হয়। যে ধর্মসংক্রান্ত অভিজ্ঞতা থেকে ধর্মতত্ত্বের উৎপত্তি তার সমালোচনা করা ধর্মতত্ত্বের যথার্থ কাজ নয়;

ধর্মতত্ত্বের স্বরূপ

1. ইংরেজী theology', গ্রীক শব্দ 'theos' অর্থাৎ ঈশ্বর এবং 'logos' অর্থাৎ তত্ত্ব শব্দ থেকে উদ্ভূত। Theology শব্দের অর্থ ঈশ্বরতত্ত্ব। কিন্তু আমরা 'Theology' বলতে ধর্মতত্ত্বকেও বুঝব। 'Theology' is the systematic formulation of religious belief.'—John Hick

ঐতিহাসিক দিক থেকে ধর্মতত্ত্বকে দুটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়। অ-প্রত্যাদেশমূলক বা স্বাভাবিক (Natural) এবং প্রত্যাদেশমূলক (Revealed)। অ-প্রত্যাদেশমূলক ধর্মতত্ত্ব হল, কোন অতিপ্রাকৃত বিশেষ ধরনের প্রত্যাদেশের আশ্রয় গ্রহণ না করে বিচারবুদ্ধি এবং অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করে ঈশ্বরতত্ত্ব সম্পর্কে আলোচনা করা। প্রত্যাদেশমূলক ধর্মতত্ত্ব বৌদ্ধিক (rational) বা অভিজ্ঞতাভিত্তিক (empirical) হতে পারে। প্রত্যাদেশমূলক ধর্মতত্ত্ব যাকে বিচারবিযুক্ত ধর্মতত্ত্ব (Dogmatic Theology) নামেও অভিহিত করা হয়, সেই ধরনের ধর্মতত্ত্ব যা কোন ঐশ্বরিক প্রত্যাদেশের উপর নির্ভর, যাকে এই ধর্মতত্ত্ব প্রামাণ্য বলে গ্রহণ করে। উদাহরণস্বরূপ খ্রীষ্টানদের ধর্মগ্রন্থ বাইবেলের উল্লেখ করা যেতে পারে।

2. "In its nature a theology is an articulated system of religious beliefs or doctrines which has been developed from some historic religion."

—G. Galloway : The Philosophy of Religion, Page 47.

সেই অভিজ্ঞতার যথাযথ আলোচনা এবং সেই অভিজ্ঞতা যে অর্থ প্রকাশ করে তার বর্ণনা দেওয়াই তার যথার্থ কাজ।[1]

ধর্মদর্শনের স্বরূপ

ধর্মসংক্রান্ত অভিজ্ঞতার স্বরূপ, ক্রিয়া, মূল্য, সত্যতা এবং পরমতত্ত্বের স্বরূপের প্রকাশ হিসাবে ধর্মের সামর্থ্য সম্পর্কে অনুসন্ধান করা ধর্মদর্শনের কাজ। সংক্ষেপে বলা যেতে পারে যে, তত্ত্বের সঙ্গে ধর্মের সম্বন্ধ নিরূপণ করা ধর্মদর্শনের কাজ। ধর্মদর্শন দর্শনের নীতি এবং পদ্ধতিকে কোন নির্দিষ্ট ধর্মের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে।

কারও কারও মতে ধর্মতত্ত্ব ধর্মদর্শনের শাখা

কেউ কেউ মনে করেন ধর্মতত্ত্ব হল ধর্মদর্শনের একটি শাখা। ধর্মদর্শনের সঙ্গে তার যেটুকু পার্থক্য সেটুকু হল তার আলোচনা শুরু করার ধরনে বা প্রকৃতিতে। ধর্মদর্শন সকল প্রকার ধর্মীয় বিশ্বাস এবং অভিজ্ঞতাকে তার আলোচনার উপাদানরূপে গণ্য করে। ধর্মতত্ত্বের পক্ষে প্রধান উপাদান হল ধর্মতত্ত্ববিদের নিজের ধর্মীয় সম্প্রদায়ের ঐতিহাসিক বিশ্বাস (the historical belief of the theoligian's own religious community)। কাজেই সেদিক থেকে বিচার করতে গেলে ধর্মতত্ত্বের আলোচনার পরিসর সুনির্দিষ্ট ও সীমিত; কিন্তু এই সীমিত পরিসরের মধ্যে সে তার উপাদানগুলিকে দর্শন যে বৌদ্ধিক ও বিচারমূলক পদ্ধতি প্রয়োগ করে আলোচনা করে; সেই একই পদ্ধতি প্রয়োগ করে আলোচনা করে। যদি ধর্মতত্ত্ববিদ্ উপরিউক্ত লক্ষ্য বজায় রেখে তার আলোচনায় অগ্রসর হন তাহলে তিনিও একজন ধর্মদার্শনিক, যিনি কোন একটি বিশেষ ধর্মমতের ব্যাপক ও বিচারমূলক দার্শনিক আলোচনায় নিযুক্ত।

উপরের মতের সমালোচনা

কিন্তু অনেকে মনে করেন ধর্মদর্শনের সঙ্গে ধর্মতত্ত্বের উল্লেখযোগ্য পার্থক্য আছে। এই মতের সমর্থকবৃন্দ মনে করেন প্রামাণ্য প্রত্যাদেশ (authoritative revelation)-এর উপরেই ধর্মতত্ত্বের ভিত্তি, কাজেই সেক্ষেত্রে বিচারবুদ্ধিকে প্রত্যাদেশের কাছে হার মানতে হবে। বিচারবুদ্ধির পক্ষে প্রত্যাদেশের বিচার করা সম্ভব নয়। এই প্রামাণ্য প্রত্যাদেশ সব বিচার-বুদ্ধির উর্ধ্বে।

---

1. অবশ্য একটা কথা বিস্মৃত হলে চলবে না যে শুরুতে ধর্মতত্ত্বের যে রূপ ছিল, ধর্মতত্ত্বের বর্তমান রূপ তার থেকে পৃথক। বর্তমানে ধর্মতত্ত্ব ধর্মসংক্রান্ত স্বীকৃত সত্যের (postulates) উপর ভিত্তি করে জগৎ সম্পর্কীয় মতবাদ ব্যক্ত করে এবং ঈশ্বরের স্বরূপ, সৃষ্টিতত্ত্ব, মানুষের উৎপত্তি প্রভৃতি বিষয়গুলি ব্যাখ্যা করে। স্বরূপ বা প্রকৃতির দিক থেকে বিচার করতে গেলে ধর্মতত্ত্ব কখনই দর্শন হয়ে উঠতে পারে না এবং ধর্মতত্ত্বের পক্ষে এইসব তত্ত্ববিদ্যার সমস্যা আলোচনা করার কথাও নয়। তবু ধর্মতত্ত্ব তার উন্নত অবস্থায় তার নিজস্ব আলোচনার পরিসরকে অতিক্রম করে দার্শনিক সমস্যার আলোচনা করতে চায়। ধর্মতত্ত্বের কাজ হল ধর্মবিশ্বাস ও বিচারবুদ্ধির মধ্যে মধ্যস্থতা করা।

বস্তুতঃ এই মতের সমর্থকবৃন্দ অ-প্রত্যাদেশমূলক বা স্বাভাবিক ধর্মতত্ত্বকে natural theology) অগ্রাহ্য করতে চান।

ধর্মদর্শনের সঙ্গে ঈশ্বরতত্ত্বের আরও এক বিষয়ে পার্থক্য আছে বলে এঁরা মনে করেন। ঈশ্বরতত্ত্বের নাম থেকেই বোঝা যায় যে এই বিদ্যা ঈশ্বরের সংজ্ঞা এবং ঈশ্বরের উদ্দেশ্য নিয়ে আলোচনা করে। কিন্তু ধর্মদর্শনের আলোচ্য বিষয় শুধুমাত্র ঈশ্বর নয়, ধর্মের সমগ্র বিকাশ এবং সকল স্তরের ধর্মসম্বন্ধীয় অভিজ্ঞতার অর্থ ও মূল্য নিরূপণ।

ধর্মদর্শনের সঙ্গে ঈশ্বরতত্ত্বের পার্থক্য

কয়েকটি বিষয়ে ধর্মতত্ত্বের সঙ্গে ধর্মদর্শনের পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। প্রথমতঃ, আলোচনার পরিসরের (scope) দিক থেকে উভয়ের মধ্যে পার্থক্য আছে। ধর্মদর্শনের আলোচনার পরিসর ধর্মতত্ত্বের আলোচনার পরিসর থেকে অনেক ব্যাপক। ধর্মদর্শন ও ধর্মতত্ত্ব উভয়েই ধর্ম নিয়ে আলোচনা করে, কিন্তু ধর্মতত্ত্ব যে ধর্ম নিয়ে আলোচনা করে তা কোন নির্দিষ্ট বা বিশেষ ধর্ম। কিন্তু ধর্মদর্শনের আলোচ্য বিষয় হল সাধারণ ধর্ম, যে ধর্ম মানুষের অভিজ্ঞতার মধ্যে একটি সার্বিক ঘটনা (a universal phenomenon in human experience)। ধর্মতত্ত্বের আলোচ্য বিষয় বিনা বিচারে গৃহীত ধর্মমত বা ধর্মসম্পর্কীয় মতবাদ। ধর্মদর্শন মানুষের ধর্মসংক্রান্ত অভিজ্ঞতা থেকে তাব উপাদান সংগ্রহ করে এবং ধর্মের বিবর্তনের প্রক্রিয়াটি আলোচনা করে। সংক্ষেপে ধর্মতত্ত্ব নির্দিষ্ট ধর্মের গণ্ডী স্বীকাব করে নেয়, ধর্মদর্শন কোন নির্দিষ্ট ধর্মের আলোচনাতে নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখে না। দ্বিতীয়তঃ, ধর্মতত্ত্বে ধর্মবিশ্বাসেব প্রাধান্য। ধর্মদর্শনে বিচারবুদ্ধির উপরেই সমধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়।

ধর্মতত্ত্বের সঙ্গে ধর্মদর্শনের পার্থক্য

ধর্মদর্শন ও ধর্মতত্ত্বের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করতে গিয়ে রাইট (*Wright*) বলেন—"ধর্মদর্শন ও ধর্মতত্ত্বের আলোচ্য বিষয়বস্তুর মধ্যে কয়েক বিষয়ে সাদৃশ্য থাকলেও, উভয়ে পৃথক এবং একটিকে আর একটির সঙ্গে গুলিয়ে ফেলা কোনমতেই যুক্তিসঙ্গত নয়।" উভয় বিদ্যাই কতকগুলি অভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করে, যেমন ধর্মের সত্য, ঈশ্বরের অস্তিত্বের পক্ষে যুক্তি এবং আত্মার অমরতা প্রভৃতি। কিন্তু ধর্মতত্ত্বের জ্ঞানের উৎস হচ্ছে কোন প্রামাণ্য প্রত্যাদেশ (authoritative revelation) বা ঐ জাতীয় কোন মতের ঘোষণা, পবিত্র ধর্মশাস্ত্র বা ধর্মপ্রবর্তকদের বাণী, পুরোহিত, ঋষি, বা ধর্মপ্রবর্তকের নিকট প্রকাশিত কোন বিশেষ ধরনের প্রত্যাদেশ (special revelation)। ধর্মতত্ত্বের ধর্মমত বা ধর্মসংক্রান্ত মতবাদ অন্য সবরকম জ্ঞানের তুলনায় সুনিশ্চিত জ্ঞান এবং মানুষের বুদ্ধির বিচারের উর্ধ্বে

রাইট-এর মন্তব্য

বলে গণ্য করা হয়। মানুষের মনের এমন ক্ষমতা নেই যে তাদের তাৎপর্য উপলব্ধি করে। চিরাচরিত ধর্মতত্ত্ব (traditional theology)-এর দৃষ্টিভঙ্গি এই জাতীয়।[1]

গ্যালোয়ে (*Galloway*) বলেন, যাকে চিন্তনমূলক ধর্মতত্ত্ব (speculative theology) বলে অভিহিত করা হয়, যা ধর্মসংক্রান্ত মতবাদগুলিকে স্বাধীনভাবে বিচার করে তাদের একটা দার্শনিক রূপ দিতে চায়, সেই বিচারমূলক ধর্মতত্ত্বকে ধর্মদর্শনের সঙ্গে অভিন্ন করে দেখাই যুক্তিযুক্ত। ধর্মদর্শনেব সঙ্গে ধর্মতত্ত্ব বা ঈশ্বরতত্ত্বের সম্পর্ক নিরূপণ করতে গিয়ে জন হিক (*John Hick*) বলেন যে, ধর্মদর্শন ধর্মজগতের কোন অংশ নয়। কলাবিষয়ক ঘটনা এবং সৌন্দর্য-বিষয়ক আলোচনার বস্তু ও পদ্ধতির সঙ্গে কলা-দর্শন (philosophy of art)-এর যে সম্বন্ধ, ধর্মের সঙ্গে ধর্মদর্শনের সম্বন্ধ তাবই অনুরূপ। বিজ্ঞান-দর্শন (philosophy of science)-এর সঙ্গে বিশেষ বিশেষ বিজ্ঞানেব যে সম্পর্ক, বিশেষ বিশেষ ধর্ম এবং জগতের বিভিন্ন ধর্মতত্ত্ব বা ঈশ্বরতত্ত্বের সঙ্গে ধর্মদর্শনেব সেই সম্পর্ক।

গ্যালোয়ে-এর মন্তব্য

ধর্মদর্শনেব সঙ্গে ধর্মতত্ত্বের নানান বিষয়ে পার্থক্য লক্ষ্য করা গেলেও এবং উভয়ে দুটি ভিন্ন শাস্ত্র বলে স্বীকৃত হলেও, উভয়ের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বর্তমান এবং একটিকে আর একটির পরিপূরক মনে করাই যুক্তিসঙ্গত। ধর্মতত্ত্ব বিনা বিচারে যে সব ধর্মমত বা ধর্মসংক্রান্ত মতবাদ গ্রহণ করে, ধর্মদর্শনের কাজ তাদের তাৎপর্য, মূল্য ও গভীরতর অর্থ নির্ধারণ করা এবং সেইগুলির ভিত্তিতে তত্ত্বের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক নির্ধারণ করা। ধর্মতত্ত্ব ধর্ম-দর্শনের পথ তৈরি করে দেয়। ধর্মতত্ত্বের কাজ হল শুধুমাত্র উপাদান সংগ্রহ করা। কিন্তু ধর্মদর্শন সংগৃহীত উপাদানগুলির বিচার করে এবং একটি সুসংহত সর্বব্যাপক জ্ঞানে তাকে পরিণত করে।

ধর্মদর্শন ও ধর্মতত্ত্বের মধ্যে সম্বন্ধ

মূল্যের ভিত্তিতে কতকগুলি ধর্মবিশ্বাস সংক্রান্ত স্বীকৃত সত্যকে (postulates of faith) স্বীকার করে নেওয়ার জন্য ধর্মদর্শনের সঙ্গে ধর্মতত্ত্বের কোন বিরোধ আছে মনে করলে ভুল হবে। অনেক সত্যকেই বিশ্বাসের ভিত্তিতে গ্রহণ করতে হয়, যৌক্তিক পরীক্ষার ভিত্তিতে নয়। কোন বৌদ্ধিক অবরোহ অনুমান থেকে ঈশ্বরকে সিদ্ধান্ত রূপে পাওয়া যায় না।

ধর্মদর্শনের সঙ্গে ধর্মতত্ত্বের কোন বিরোধ নেই

1. সাম্প্রতিককালে এক উদারপন্থী ধর্মতত্ত্বের (liberal theology) আবির্ভাব ঘটেছে যা বিজ্ঞান বা ধর্মদর্শনের মতনই পুরোপুরি বিচারবুদ্ধি এবং অভিজ্ঞতার উপরই ধর্মীয় মতবাদগুলিকে প্রতিষ্ঠিত করতে চায়। এই জাতীয় চরম উদারপন্থী ধর্মতত্ত্ব এবং ধর্মদর্শনের মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য বর্তমান। উদারপন্থী ধর্মতত্ত্বীরা একটি নির্দিষ্ট ধর্মের আলোচনাতেই আগ্রহী। কিন্তু ধর্মদর্শন নিরপেক্ষভাবে একাধিক বা সকল ধর্মের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য সাধারণ নীতিগুলির আলোচনায় আগ্রহী।

বিশ্বাসই তাকে বাস্তব করে তুলতে পারে, তর্কশাস্ত্রসম্মত প্রমাণ কখনই তা করতে পারে না। ধর্মদর্শন যেহেতু বিচারবুদ্ধির উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে সেইহেতু মনে হতে পারে ধর্মদর্শনের সঙ্গে ধর্মতত্ত্বের সম্বন্ধের ক্ষেত্রে ধর্মতত্ত্বের স্বীকৃত সিদ্ধান্তগুলি বিশেষভাবে এই সম্বন্ধের প্রতিকূল।

উভয়ের পার্থক্য মাত্রাগত

কিন্তু বিচারবুদ্ধির প্রক্রিয়া কখনও সম্পূর্ণতা লাভ করতে পারে না এবং বিচারবুদ্ধির প্রয়োগ শেষ পর্যন্ত কতকগুলি স্বীকৃত সত্যের উপর নির্ভর করে, যে সত্যগুলিকে বিচার-বুদ্ধির সাহায্যে অবরোহ পদ্ধতিভিত্তিক কোন কিছু থেকে অনুমান করে নেওয়া যায় না। এই দিক থেকে বিচার করলে ধর্মতত্ত্বের সঙ্গে ধর্মদর্শনের পার্থক্য হল মাত্রাগত। ধর্মতত্ত্ব ধর্মবিশ্বাসের উপর অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করে, ধর্মদর্শন গুরুত্ব আরোপ করে বিচারবুদ্ধির উপর। কিন্তু বিশ্বাস ব্যতিরেকে বিচারবুদ্ধি ক্রিয়া করতে পারে না এবং বিশ্বাস বিচারবুদ্ধির মধ্যেই তার সত্যিকারের মিত্রকে খুঁজে পায়।

সিদ্ধান্ত

আমাদের সিদ্ধান্ত হল ধর্মতত্ত্বের কাজ হবে কোন একটি নির্দিষ্ট ধর্মের মতবাদকে বর্ণনা করা। ধর্মতত্ত্ব যাকে প্রামাণ্য বলে গ্রহণ করবে, তা কোন বাইরের কর্তৃপক্ষ হবে না, তা হবে স্থায়ী আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা, ধর্ম যার ব্যবহারিক এবং আনুষ্ঠানিক প্রকাশ। এই ধর্মসম্বন্ধীয় অভিজ্ঞতা কোন একটি বিশেষ যুগে সীমাবদ্ধ থাকবে না। ধর্মতত্ত্বকে ধর্মসম্বন্ধীয় অভিজ্ঞতার ক্রমবিকাশকে স্বীকার করে নিতে হবে এবং তাকে এই ধারণা পরিহার করতে হবে যে ধর্মসংক্রান্ত মতবাদের যে রূপ তা চূড়ান্ত এবং বাঁধা-ধরা। কিন্তু অভিজ্ঞতার সীমানাকে প্রসারিত করতে গিয়ে ধর্মতত্ত্বকে তত্ত্ববিদ্যার রাজ্যে অনুপ্রবেশের লোভ সংবরণ করতে হবে। এর অর্থ এই নয় যে, ধর্মের সঙ্গে তত্ত্ববিদ্যায় কখনও সংযোগ ঘটবে না। এর আসল অর্থ হল, ধর্ম-সম্বন্ধীয় অভিজ্ঞতার মধ্যে যে তত্ত্ববিদ্যার সমস্যা নিহিত আছে তার আলোচনা করার যথোপযুক্ত শাস্ত্র ধর্মতত্ত্ব নয়।

ধর্মের সমস্যার বিচারমূলক আলোচনা থেকে নিবৃত্ত হয়ে ধর্মতত্ত্বের কাজ হবে সেই আলোচনার দায়িত্ব ধর্মদর্শনের হাতে তুলে দেওয়া। সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গির অধিকারী হওয়ার জন্য ধর্মদর্শনের পক্ষে এই আলোচনা করা সুবিধাজনক এবং কাজেই একথা বলা যেতে পারে যে, ধর্মদর্শন ধর্মতত্ত্বের কাজকে সম্পূর্ণ করার জন্য এগিয়ে আসে।

অবশ্য একথা স্বীকার না করে পারা যায় না যে, সময় সময় ধর্মতত্ত্বকে ধর্মদর্শন থেকে স্বতন্ত্র করে রাখা কঠিন হয়ে পড়ে। কারণ, তারা একই উপাদান নিয়ে আলোচনা করে এবং কোন একটি ধর্মসম্বন্ধীয় মতবাদের অর্থ-ব্যাখ্যা অতি সহজেই তার দার্শনিক

ব্যাখ্যায় পরিণত হতে পারে। ধর্মতত্ত্ব যদি ধর্মসম্বন্ধীয় মতবাদের ভিত্তিতে কখনও একটি বিচারমূলক মতবাদ গঠন করে, ধর্মতত্ত্বের পক্ষে তা একটা মারাত্মক অপরাধ বলে গণ্য হতে পারে না। আসল কথা হল, দুটো দৃষ্টিভঙ্গিকে স্বতন্ত্র রাখাই যুক্তিসঙ্গত। ধর্মসম্বন্ধীয় মতবাদের বিচারমূলক আলোচনাকে ধর্মদর্শনের পরিসরের অন্তর্ভুক্ত করাই যুক্তিসঙ্গত কাজ।

২। ধর্মদর্শন ও ধর্মবিজ্ঞান (Philosophy of Religion and Science of Religion) :

ধর্মদর্শন এবং ধর্মবিজ্ঞানের মধ্যে পার্থক্য আছে। ধর্মদর্শন সকল ধর্মীয় অভিজ্ঞতার প্রকৃত স্বরূপ ও যথার্থ মূল্য নিরূপণ করে। ধর্মজীবনের সব তথ্য এবং অভিজ্ঞতার ব্যাখ্যা এবং মূল্যায়ন ধর্মদর্শনের কাজ। ধর্মীয় চেতনার মধ্য দিয়ে বিশ্বজগৎ সম্পর্কীয় যে মতবাদ প্রকাশ পায় তার বৌদ্ধিক ভিত্তি নিরূপণ করাও ধর্মদর্শনের কাজ।

ধর্ম যেহেতু অভিজ্ঞতার একটি দিক, সেহেতু ধর্মবিজ্ঞানের পরিসরের অন্তর্ভুক্ত। ধর্মবিজ্ঞান হল আসলে কতকগুলি বিজ্ঞানের সমষ্টি যারা বিভিন্ন ধরনের ধর্মীয় তথ্য এবং অভিজ্ঞতা সংগ্রহ করে ও শ্রেণীভুক্ত করে। ধর্মদর্শন এই সব তথ্য ও অভিজ্ঞতাকে একটি সামগ্রিক সংহতির পরিপ্রেক্ষিতে ব্যাখ্যা করে ও তাদের মূল্যাবধারণ করে। ধর্মবিজ্ঞান ধর্মসম্বন্ধীয় চেতনাকে তার অঙ্গীভূত উপাদানে বিশ্লেষণ করে এবং বিভিন্ন ধর্মে ও বিভিন্ন অবস্থায় সেইগুলি পরস্পরের সঙ্গে কিভাবে যুক্ত হয়েছে এবং পূজারী বা উপাসকের পরিবেশের সঙ্গে সম্পর্কিত হয়ে তারা কিভাবে ধীরে ধীরে বিকশিত হয়েছে তা দেখাবার চেষ্টা করে।

ব্রাইটম্যান (*Brightman*) বলেন, 'বিজ্ঞানকে প্রধানতঃ দুটি শ্রেণীতে ভাগ করা যেতে পারে। আকারগত (formal) এবং অভিজ্ঞতাভিত্তিক (empirical)। তর্কবিদ্যা, গণিত প্রথম শ্রেণীর বিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত। তারা যেসব নিয়ম নিয়ে আলোচনা করে সেইগুলি সার্বিক কেননা তারা অভিজ্ঞতা-নিরপেক্ষ। অভিজ্ঞতা এই সব নিয়মগুলির ক্ষেত্রে কোন পরিবর্তন আনতে পারে না। অভিজ্ঞতাভিত্তিক বিজ্ঞান বলতে বোঝায় সেই বিজ্ঞান যার আলোচ্য বিষয় কোন প্রত্যক্ষগোচর অভিজ্ঞতার বিষয়বস্তু, এবং পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষণের সাহায্যে এই সব বিজ্ঞান তার আলোচ্য বিষয়বস্তুর নিয়মগুলি বর্ণনা করে। পদার্থবিদ্যা, রসায়নশাস্ত্র, জীববিদ্যা প্রভৃতি বিজ্ঞান এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত।

ধর্মবিজ্ঞান অভিজ্ঞতাভিত্তিক বিজ্ঞান

ধর্মবিজ্ঞান সেই শ্রেণীর অভিজ্ঞতাভিত্তিক বিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত, যে অভিজ্ঞতাভিত্তিক বিজ্ঞান মানুষের মনস্তত্ত্ব, ইতিহাস এবং সমাজতত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করে। পদার্থবিদ্যা,

রসায়নশাস্ত্র বা জীববিদ্যা যে শ্রেণীর অভিজ্ঞতাভিত্তিক বিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত, ধর্মবিজ্ঞান তার অন্তর্ভুক্ত নয়।

কাজেই [1]ব্রাইটম্যানের মতে ধর্মবিজ্ঞান প্রধানতঃ তিনটি—(১) ধর্ম-মনোবিজ্ঞান, যা ধর্মীয় অভিজ্ঞতার চেতন প্রক্রিয়াগুলি বর্ণনা করে এবং ব্যক্তি-আচরণের, সামাজিক আচরণের এবং নির্জ্ঞানের (unconscious) সঙ্গে তার সম্পর্ক আলোচনা করে। (২) ধর্মইতিহাস (History of religion) এবং তুলনামূলক ধর্ম (Comparative religion), যেগুলি ধর্মীয় বিশ্বাস এবং ক্রিয়ার বিকাশ বর্ণনা করে এবং (৩) ধর্মসমাজবিজ্ঞান (Sociology of religion), যা গোষ্ঠীগত তথ্য হিসেবে ধর্মের নিয়ম এবং ক্রিয়া ব্যাখ্যা করে।

তিনটি প্রধান ধর্মবিজ্ঞান

এই প্রসঙ্গে ধর্মবিজ্ঞানের (Science of Religion) সঙ্গে ধর্মতত্ত্বের বা ঈশ্বরতত্ত্বের (Theology) পার্থক্য বুঝে নেওয়া দরকার। ধর্মতত্ত্ব ধর্মীয় চেতনার পরিণাম নিয়ে আলোচনা করে। কিন্তু ধর্মবিজ্ঞান সেই সব প্রক্রিয়া নিয়ে আলোচনা করে যার ফলে এই পরিণামগুলির উৎপত্তি ঘটে। ধর্মতত্ত্ব আমাদের ঈশ্বর চিন্তার ফলাফলগুলিকে বিশ্লেষণ ও সুসমন্বিত করে। ধর্মবিজ্ঞান সাধারণভাবে ধর্মচিন্তার বা ধর্মচেতনার স্বরূপ নিয়ে আলোচনা করে।

ধর্মতত্ত্ব ও ধর্মবিজ্ঞানের মধ্যে পার্থক্য

ধর্মবিজ্ঞান ধর্মচেতনাকে বিশ্লেষণ করে যে সব তথ্য সংগ্রহ করে, ধর্মদর্শন তাদের তাৎপর্য ও অর্থ নির্ধারণ করতে চায়। ধর্মদর্শনকে ধর্মবিজ্ঞানের উপর নির্ভর করতে হয়। এটা ঠিক যে ধর্মবিজ্ঞান যে ধর্মীয় অভিজ্ঞতা নিয়ে আলোচনা করে, সেই আলোচনা ধর্মীয় অভিজ্ঞতার আংশিক ও সামাজিক ব্যাখ্যা, যা ধর্মদর্শনের প্রয়োজন পুরোপুরি মেটাতে পারে না। কিন্তু তবু ধর্মদর্শন ধর্মবিজ্ঞানের ব্যাখ্যাকে অগ্রাহ্য করতে পারে না। ধর্মবিজ্ঞান ধর্মদর্শনের পথ তৈরী করে দেয়। ধর্মবিজ্ঞান শুধুমাত্র উপাদান সংগ্রহ করে। কিন্তু ধর্মদর্শন সেই সংগৃহীত উপাদানের তাৎপর্য ও মূল্য নির্ধারণ করে এবং একটি ব্যাপকতর সংহতির মধ্যে তাদের সুবিন্যস্ত করে।

ধর্মদর্শন ধর্মবিজ্ঞানের উপর নির্ভর

৩। ধর্মদর্শন ও ধর্মমনোবিজ্ঞান (Philosophy of Religion and Psychology of Religion):

ধর্মদর্শন ধর্মের সঙ্গে তত্ত্বের সম্বন্ধ নিরূপণ করে। ধর্মসম্বন্ধীয় অভিজ্ঞার স্বরূপ, ক্রিয়া, মূল্য এবং সত্যতা সম্পর্কে অনুসন্ধান করা এবং পরমতত্ত্বের স্বরূপকে প্রকাশ

1. W. S. Brightman: A Philosophy of Religion, Page 20.

করার ব্যাপারে ধর্মের সামর্থ্য কতটুকু, বিচার করে দেখাও ধর্মদর্শনের কাজ। ধর্মমনোবিজ্ঞানের স্বরূপের বর্ণনা দিতে গিয়ে রাইট[1] (*Wright*) বলেন: "স্বতন্ত্রভাবে বা দলগতভাবে যখন ব্যক্তি ধর্ম-সম্বন্ধীয় অভিজ্ঞতার অধিকারী হয় তখন তার মানসিক অবস্থা এবং বাহ্য আচরণের বৈজ্ঞানিক বর্ণনা এবং ব্যাখ্যা দেওয়া ধর্মমনোবিজ্ঞানের কাজ।" ধর্মদর্শন যতটা না ধর্মের আলোচনা তার বেশী তত্ত্বের আলোচনা। ধর্মমনোবিজ্ঞান ধর্মকে যেমন দেখে সেভাবে তাকে গ্রহণ করে, একটা বিরাট মানবীয় তথ্য (human fact) রূপে তার প্রতি আগ্রহী হয় এবং ধর্মের ধারণাগুলি সত্য কি মিথ্যা সেই প্রশ্ন উত্থাপনই করে না। ধর্মমনোবিজ্ঞান ধর্মের প্রকৃত আভ্যন্তরীণ দিকটিকে বা ধর্মের অন্তর্মুখীতাকে (real inwardness) জানতে চায়। ধর্মমনোবিজ্ঞানী মনে করেন যে অন্যান্য মনস্তাত্ত্বিক তথ্যের সঙ্গে ধর্মীয় তথ্যের গুণগত কোন পার্থক্য নেই। এই কারণে মানবমনের সূত্রগুলির সাহায্যে তিনি ধর্মীয় তথ্যগুলির ব্যাখ্যা ও বর্ণনা দিতে সচেষ্ট হন।

ধর্মদর্শন ও ধর্মমনোবিজ্ঞান ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে সম্পর্কযুক্ত। যে ধর্মসম্বন্ধীয় তথ্য বা বিষয় উভয় শাস্ত্রের আলোচ্য বিষয়, সেই তথ্যের এমন এক বিশেষ বৈশিষ্ট্য বর্তমান যার জন্য উভয় শাস্ত্র নিকট সম্পর্কে সম্পর্কযুক্ত। ধর্মদর্শন ধর্মসম্বন্ধীয় তথ্যের অর্থ ও মূল্য নির্ধারণ করতে চায়। এই প্রচেষ্টায় ধর্ম-দার্শনিককে তার আলোচ্য বিষয়ের বিশেষ বৈশিষ্ট্যের কথা স্মরণে রাখতে হয়।

ধর্মদর্শন ও ধর্মমনোবিজ্ঞানের স্বরূপ

গ্যালোয়ে (*Galloway*)[2] বলেন, ধর্মের তথ্যের সঙ্গে যন্ত্রবিজ্ঞানের এবং জীববিজ্ঞানের তথ্যের সুনিশ্চিত পার্থক্য বর্তমান। এই পার্থক্য হল, প্রথম ধরনের তথ্য চেতন মন ও ইচ্ছার প্রকাশ, কিন্তু শেষোক্ত ধরনের তথ্য তা নয়। অর্থাৎ কিনা, প্রাকৃতিক বিজ্ঞানগুলিতে মনোবিজ্ঞানের সাহায্য ছাড়াও প্রাকৃতিক বিজ্ঞানী তার সমস্যার সমাধান করতে পারেন। কিন্তু ধর্মের ক্ষেত্রে তা সম্ভব নয়। ধর্মসম্বন্ধীয় অভিজ্ঞতার বৈশিষ্ট্যের মূলে রয়েছে মানুষের চেতনা, জাগতিক পরিবেশ নয়। ধর্মসম্বন্ধীয় ঘটনার মূলে যে গঠনমূলক উপাদানের অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায় তা'হল মন বা আত্মা। সেইকারণে মনোবিজ্ঞানের সাহায্য ব্যতিরেকে ধর্মসম্বন্ধীয় ক্রিয়ার ব্যাখ্যা একপ্রকার অসম্ভব। ধর্মসম্বন্ধীয় ঘটনার

ধর্মদর্শন ও ধর্মমনোবিজ্ঞানের সম্পর্ক

---

1. "By the Psychology of Religion is meant, a scientific description and explanation of the mental states and outward behaviour of individual persons, and groups of persons when they have religious experiences."

—W. K. Wright: A Student's Philosophy of Religion. Page 3.

2. Galloway: The Philosophy of Religion. Page 30.

অর্থ উপলব্ধি করার প্রচেষ্টার মধ্যেই চেতনার বিশ্লেষণ এবং বিভিন্ন মনস্তাত্ত্বিক উপাদানের ক্রিয়া এবং মূল্য সম্পর্কে জ্ঞান নিহিত আছে। কারণ, বিচিত্র ধর্মসম্বন্ধীয় ঘটনার মূলে যে ঐক্যবিধায়ক সূত্রটি বর্তমান সেটি হল মানুষের মনস্তাত্ত্বিক প্রকৃতি। ধর্মের প্রগতির প্রশ্নটিকে বুঝতে গিয়ে কেউ যদি জীববিদ্যার উপমার সাহায্যে তাকে বুঝতে চেষ্টা করেন, তাহলে তা হবে, যে আন্তর এবং চলমান শক্তি ঐ প্রগতির পিছনে ক্রিয়া করেছে তাকে অগ্রাহ্য করে নিছক বাইরের দিক থেকে তার স্বরূপকে জানবার চেষ্টা করা, যা কখনও সার্থক হবেনা। কাজেই ধর্মের বিকাশের মাধ্যমে যদি আমরা ধর্মের প্রকৃতি এবং অর্থ সম্পর্কে একটা সাধারণ ধারণা করতে চাই তাহলে ধর্মের এই বিকাশকে মানবমনের নিরবচ্ছিন্ন প্রকাশরূপে গণ্য করতে হবে। মানুষই ধর্মকে সৃষ্টি করে এবং ধর্ম সর্বত্রই মানুষের মনের ছাপ বহন করে বেড়ায়। জগতের বিভিন্ন ধর্মগুলির মধ্যে প্রধান প্রধান বিষয়ে যে সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়, মানুষের সাধারণ মানসিক সংগঠনের মধ্যেই তার উৎপত্তির সন্ধান পাওয়া যায়।

ধর্মসম্বন্ধীয় অভিজ্ঞতার বৈশিষ্ট্য নিরূপণে চেতনার অবদান

ধর্ম-চেতনাকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে এর মূলে রয়েছে কতকগুলি প্রেরণা ও কামনা-বাসনা। বস্তুতঃ ধর্মের যেসব বাহ্য প্রকাশ, যেমন ধর্মীয় আচার, ধর্মীয় অনুষ্ঠান —এগুলির পেছনে আছে বংশপরম্পরাগত ঐতিহ্য, আচার-ব্যবহার, রীতিনীতি, বিশ্বাস, প্রত্যাশা যার মূল নিহিত আছে কতকগুলি মনস্তাত্ত্বিক প্রেষণার মধ্যে। এইগুলি সব সময় মানুষের চেতনার কেন্দ্রস্থলে উপস্থিত না থাকলেও অবচেতন মনে উপস্থিত থেকে ক্রিয়া করে। ধর্মদর্শন ধর্মসম্বন্ধীয় তথ্যের ব্যাখ্যা ও মূল্যাবধারণ প্রসঙ্গে ধর্মীয় চেতনার বস্তুনিরপেক্ষ অভিজ্ঞতার দিককে অগ্রাহ্য করতে পারে না। ধর্মদর্শনকে ধর্ম-মনোবিজ্ঞানের উপর এই ব্যাপারে নির্ভর করতে হয়।

ধর্মচেতনার মনস্তাত্ত্বিক উপাদান

কিন্তু ধর্মমনোবিজ্ঞান ধর্মীয় চেতনার মধ্যে নিহিত মনস্তাত্ত্বিক উপাদানগুলি আবিষ্কার ও ব্যাখ্যা করলেও, শুধুমাত্র তার দ্বারাই ধর্মের গভীরতর অর্থের ও তাৎপর্যের উপলব্ধি হয় না। ধর্মের কেন্দ্রীয় বিষয় হল ঈশ্বর যিনি এক আধ্যাত্মিক তত্ত্ব। ধর্ম-মনোবিজ্ঞান এই ঈশ্বরের কোন ব্যাখ্যা দিতে পারে না। সেইকারণে ধর্মমনোবিজ্ঞানের পরিপূরক হিসেবে প্রয়োজন ধর্মদর্শনের। ধর্মীয় তথ্যের মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যার মাধ্যমে আমরা বুঝতে পারি যে স্বাভাবিক ধর্মীয় জীবনে ধর্মের স্বীকৃত সত্যগুলির ক্রিয়া ও মূল্য কি। কিন্তু তাদের যাথার্থ্য সম্পর্কে কোন নিশ্চয়তা ধর্মমনোবিজ্ঞান দিতে পারে না। একমাত্র বিচারমূলক চিন্তার

ধর্মদর্শন ধর্মমনোবিজ্ঞানের পরিপূরক

মাধ্যমেই এই যাথার্থ্যের সমর্থন খুঁজে পাওয়া যেতে পারে। কেবলমাত্র ধর্মের পরম-ভিত্তিকে জেনে এবং যে নীতির উপর ধর্মের ভিত্তি তা নিরূপণ করে আমাদের পক্ষে ধর্মের চরম অর্থ উপলব্ধি করা এবং মানুষের অভিজ্ঞতার রাজ্যে ধর্মের স্থান সমর্থন করা সম্ভব।

কোন কোন মনোবিজ্ঞানী মনে করেন যে ধর্মমনোবিজ্ঞান ধর্মদর্শনের প্রতিকল্প রূপে গণ্য হতে পারে। মনোবিজ্ঞানের এই সম্প্রদায়ের মতে নীতিবিদ্যা, সৌন্দর্যবিদ্যা, তর্কবিদ্যা, জ্ঞানবিদ্যা, তত্ত্ববিদ্যা শেষ পর্যন্ত ক্রিয়ামূলক মনোবিজ্ঞান (functional psychology) ছাড়া কিছুই নয়। তাঁদের মতে তত্ত্ব যদি অভিজ্ঞতার মাধ্যমেই প্রদত্ত হয়, এবং অভিজ্ঞতা ছাড়া তত্ত্ব যেহেতু আর কোন ভাবেই প্রদত্ত হতে পারে না, তাহলে সেই অভিজ্ঞতার যে বিজ্ঞান সেটি তত্ত্ব এবং ধর্মের তত্ত্ব (reality of religion) আলোচনার বিচারবুদ্ধিসম্মত এবং কার্যকর পদ্ধতির নির্দেশ দেবে। সুতরাং ধর্মমনোবিজ্ঞানের যথেষ্ট তাৎপর্য রয়েছে। ধর্মমনোবিজ্ঞান শুধু যে ধর্মতত্ত্বের পথই প্রস্তুত করে দেয় তা নয়, বরং এর অনেক মৌলিক অনুসন্ধানের কাজ করতে গিয়ে ধর্মতত্ত্ব এবং ধর্মদর্শনের প্রয়োজনীয় বিষয় নিয়ে আলোচনা করে। অপরপক্ষে ধর্মদর্শন তার চরম সমস্যার আলোচনা করতে গিয়েও মনোবিজ্ঞানের নীতিকে ছাড়িয়ে যেতে পারে না। উদাহরণস্বরূপঃ ঈশ্বরের ধারণা, যেটি ধর্মতত্ত্বের কেন্দ্রীয় ধারণা, অন্যান্য ধারণার মতো একই মানসজীবনের নিয়মের অধীন এবং মনোবিজ্ঞানের সূত্র এক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।

ক্রিয়ামূলক মনোবিজ্ঞানীদের অভিমত

ধর্মমনোবিজ্ঞান যে ধর্মদর্শনের প্রতিকল্পরূপে বিবেচিত হতে পারে, ক্রিয়ামূলক মনোবিজ্ঞানীদের উপরিউক্ত সিদ্ধান্ত ভ্রান্ত বলে মনে হয়। কেননা ক্রিয়ামূলক মনোবিজ্ঞান সব বিজ্ঞানকেই ক্রিয়ামূলক মনোবিজ্ঞানে রূপান্তরিত করতে চায়, যা গ্রহণযোগ্য নয়। যেহেতু প্রাকৃতিক বিজ্ঞানগুলি অভিজ্ঞতারই বিবরণ, এবং যেহেতু ক্রিয়ামূলক মনোবিজ্ঞানীদের দৃষ্টিতে মনোবিজ্ঞান অভিজ্ঞতার বিজ্ঞান, (science of experience) সেহেতু প্রাকৃতিক বিজ্ঞানগুলিও যেমন পদার্থবিদ্যা, রসায়নশাস্ত্র, জ্যোতির্বিজ্ঞান প্রভৃতি ক্রিয়ামূলক মনোবিজ্ঞানে রূপান্তরিত হয়ে যায়।

মনোবিজ্ঞানীদের অভিমতের সমালোচনা

মনোবিজ্ঞান ঈশ্বরের ধারণা নিয়ে আলোচনা করে এবং সেখানেই থেমে থাকে। কিন্তু ধর্মতত্ত্ব শুধু ঈশ্বরের ধারণার আলোচনাতেই সীমাবদ্ধ থাকে না। ধর্মতত্ত্ব বস্তুগত (objective) হতে চায় এবং তার এই চাওয়াকে অস্বীকার করলে ধর্মতত্ত্ব হয়ে পড়ে নিছক মনোগত (subjective), হয়ে পড়ে নিছক আমাদের অনুভূতির বর্ণনা। ঈশ্বরের

বদলে তখন এসে পড়ে ঈশ্বরের ধারণা। অর্থাৎ ধর্মতত্ত্ব হয়ে পড়ে ধারণার ধারণা (idea of an idea) বা বলা যেতে পারে ধর্মতত্ত্ব যে নিছক একটা ভ্রান্তি নিয়ে আলোচনা করছে সেটা সে স্বীকার করে নিয়েই আলোচনা করছে এবং ধর্মমনোবিজ্ঞান ধর্মের মধ্যে যা কিছু বস্তুগত তাকে আত্মসাৎ করে দেখে যে তার আলোচনার আর কিছু নেই। অর্থাৎ ধর্মমনোবিজ্ঞান হয়ে পড়ে অস্বভাবী মনোবিজ্ঞানের (abnormal psychology) একটা শাখা। কিন্তু ধর্মমনোবিজ্ঞানের এই জাতীয় পরিণতিকে কেউ স্বীকার করে নিতে ইচ্ছুক হবে না।

প্রেট-এর অভিমত

জে বি. প্রেট্ (*J. B. Pratt*)[1] এই প্রসঙ্গে যে অভিমত ব্যক্ত করেছেন, সেটিই সন্তোষজনক মনে হয়। তাঁর মতে ধর্মমনোবিজ্ঞানকে মানব অভিজ্ঞতার বর্ণনা দেওয়াতেই সন্তুষ্ট থাকতে হবে, কিন্তু সেই সঙ্গে তাকে স্বীকার করতে হবে যে, এমন কোন তত্ত্ব থাকতে পারে, এই অভিজ্ঞতা যাকে নির্দেশ করতে পারে, এবং যার সঙ্গে এই অভিজ্ঞতা সম্পর্কযুক্ত এবং যাকে ধর্মমনোবিজ্ঞান অনুসন্ধান করতে পারে না। অবশ্য তার থেকে এই সিদ্ধান্ত করা যুক্তিযুক্ত হবে না যে, লক্ষ্য বা উপায় যে কোনটি হিসেবেই ধর্মমনোবিজ্ঞান মূল্যহীন। ধর্মমনোবিজ্ঞান ধর্মীয় চেতনার মূলে যে মনস্তাত্ত্বিক উপাদানের অস্তিত্ব আছে সেইগুলি সম্পর্কে আমাদের অবহিত করে।

২। ধর্মদর্শন ও দর্শন (Philosophy of Religion and Philosophy) ঃ

ধর্মদর্শনের সঙ্গে দর্শনের সম্বন্ধ কী? গ্যালোয়ে (*Galloway*) বলেন, আপাতদৃষ্টিতে এর একটা সহজ উত্তর দেওয়া যেতে পারে, "প্রদত্ত বিষয়রূপে ধর্মকে গণ্য করে, তার ক্ষেত্রে দর্শনের নীতি এবং পদ্ধতির প্রয়োগ হল ধর্মদর্শন।"[2] ধর্মদর্শনের সঙ্গে দর্শনের সম্বন্ধ প্রকাশ করার ব্যাপারে এটি একটি সহজ উপায় হলেও এই প্রশ্নের গভীরে প্রবেশ করলে দেখা যাবে যে, বিষয়টা যত সহজ মনে হয় ততটা সহজ নয়। দর্শনের একটা পরিপূর্ণ সংহতির (completed system of philosophy) সম্ভাবনার কথা যদি

1. J. B. Pratt: Chapter-II, The Psychology of Religion in his book, The Religious Consciousness: A Psychological Study,' Pages 41-42.

2. "......the Philosophy of Religion is just the application of philosophicpal principles and methods of religion regarded as a matter given."
—G Galloway: The Philosophy of Religion, Page 41.

স্বীকার করে নেওয়া হয় তাহলে প্রশ্ন ওঠে এই সংহতি থেকে বিচ্ছিন্ন ধর্মদর্শনের স্বতন্ত্র স্বাধীন সত্তা স্বীকার করে নেওয়া যায় কী? যদি দর্শনের পক্ষে জগৎ সম্বন্ধীয় একটি সামগ্রিক মতবাদ দেওয়া সম্ভব হয় তাহলে দর্শন থেকে স্বতন্ত্র এবং স্ব-নির্ভর সংহতিরূপে ধর্মদর্শনের অস্তিত্ব মেনে নেওয়া যায় না। হয়ত এই কথাই হেগেল বোঝাতে চেয়েছেন যখন ধর্মের ধারণাগুলিকে (ideas of religion) তিনি দর্শনের শুদ্ধ বৌদ্ধিক ধারণার (pure intellectual notions) সঙ্গে অভিন্ন গণ্য করেছেন।

দর্শনের সংহতি থেকে বিচ্ছিন্ন ধর্মদর্শনের অস্তিত্বের সম্ভাবনায় সন্দেহ

হেগেলের মতে দর্শন তার দ্বান্দ্বিক গতিতে (dialectical movement) বা নিজেকে ব্যাখ্যা করার প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ধর্মকেও ব্যাখ্যা করে। দর্শন ও ধর্মদর্শন উভয়েরই আলোচ্য বিষয় হল ঈশ্বর, যে ঈশ্বর হল পরমতত্ত্ব বা সর্বনিরপেক্ষ সত্তা (Absolute)। কিন্তু ঈশ্বরের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গির ব্যাপারে ধর্মদর্শনের সঙ্গে দর্শনের পার্থক্য হল ধর্মদর্শন দর্শনের মতন সব শেষে ঈশ্বরের ধারণায় উপনীত না হয়ে, ঈশ্বরের ধারণা নিয়েই তার আলোচনা শুরু করে। দর্শনের কাছে পরমতত্ত্ব হল মুখ্যতঃ একটি[1] যৌক্তিক ধারণা (logical Idea)। কিন্তু ধর্মদর্শন এই পরমতত্ত্বকে একটি বস্তু (object) বা স্বপ্রকাশ মন বা আত্মারূপে (the mind or spirit which appears or reveals itself) গণ্য করে। ধর্মসম্পর্কীয় মতবাদ রূপকময় চিন্তনের (figuarative thought) মাধ্যমে স্বপ্রকাশ ঈশ্বরের ধারণাকে উপস্থাপিত করে। ধর্মদর্শন এই সব ধারণার সমালোচনা ও বিচার করে। ধর্মদর্শন দেখায় যে ধর্মের সত্য হল চিন্তনপ্রসূত ঈশ্বরের ধারণা (speculative idea of God)। দর্শন দেখায় কিভাবে পরমতত্ত্ব, পরমাত্মার প্রকাশের গতিপথে প্রকৃতি, আত্মা ও ধর্মের মধ্য দিয়ে নিজেকে পৃথক পৃথক ভাবে প্রকাশ করেছে।

ঈশ্বরের ধারণার প্রতি দর্শনের ও ধর্মদর্শনের দৃষ্টিভঙ্গি

ধর্মদর্শন ও দর্শনের সম্বন্ধ হেগেল যে ভাবে ব্যাখ্যা করেছেন তার মধ্যে যথেষ্ট সত্যতা আছে। ধর্মদর্শন দর্শনের উপর নির্ভর; ধর্মদর্শন হল অভিজ্ঞতার একটা বিশেষ ক্ষেত্রে বা স্তরে দার্শনিক চিন্তার প্রয়োগ যাতে এই বিশেষ অভিজ্ঞতার যথার্থ অর্থ এবং মূল্য নিরূপণ করা যায়। যে পদ্ধতি ও নীতির মাধ্যমে অভিজ্ঞতার কোন বিশেষ দিকের ব্যাখ্যা দেওয়া হয়, সেই পদ্ধতি এবং নীতি, সমগ্র অভিজ্ঞতা যে পদ্ধতি ও নীতির দ্বারা ব্যাখ্যাত হয়, তার দ্বারা অবশ্যই নিয়ন্ত্রিত হবে। যেমন অভিজ্ঞতার ভাববাদী ব্যাখ্যার পরিণতি হল ভাববাদের উপরে প্রতিষ্ঠিত ধর্মদর্শন। কিন্তু এক্ষেত্রে

1. "free from inconsistency or contradiction,"

একটা গুরুতর প্রশ্ন দেখা দেয়—সেই প্রশ্নটি হল দর্শন কি এমন একটা পরিপূর্ণ সংহতি (complete system) গঠন করতে পারে যা তার প্রতিটি অংশের পরিপূর্ণ এবং চরম অর্থ নিরূপণ করতে পারে? এই প্রশ্ন বিতর্কমূলক। কেননা ব্যাখ্যা বা বিচারের প্রক্রিয়াতেই সত্তা বা তত্ত্ব নিঃশেষ হয়ে যায় না এবং ব্যাখ্যাও কতকগুলি স্বীকৃত সত্যের (postulates) উপরে নির্ভর যাদের কোন একটা সংহতির অন্তর্ভুক্ত কতকগুলি যৌক্তিক উপাদানে (logical elements in a system) রূপান্তরিত করা যায় না। দর্শনের লক্ষ্য পরমমূল্যের উপলব্ধি, কিন্তু মূল্য সম্পর্কে মানুষের ধারণার যতই বিকাশ ঘটছে, মূল্যের আদর্শও ততই দূরে সরে যাচ্ছে। কাজেই চিন্তার মাধ্যমে সেই আদর্শগত মূল্য (Ideal value) কে উপলব্ধি করা মানুষের পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না। সুতরাং এটা অসম্ভব বলে মনে হয় যে দর্শন কোন পরিপূর্ণ সংহতির আলোকে অভিজ্ঞতায় প্রতিটি দিকের যথাযথ অর্থ এবং মূল্য নিরূপণ করতে পারে।

হেগেলের অভিমতের সমালোচনা

ধর্মসম্বন্ধীয় চেতনার মধ্যে এমন অনেক কিছু আছে যাকে সাধারণ চেতনার দ্বান্দ্বিক বিকাশের (dialectical development of consciousness in general) মধ্য থেকে নিঃসৃত করা যাবে না ধর্মদর্শনের আলোচ্য তথ্যগুলি ধর্মদর্শনের কাছে প্রত্যক্ষ ভাবেই উপস্থিত হয় এবং ধর্মদর্শন নিজ দায়িত্বে সেগুলির আলোচনা করে। 'ধর্মদর্শনের কাজ সংখ্যাতীত বিচিত্র ধর্মসম্বন্ধীয় বিষয়ের আলোচনা করা, সেগুলির যথাযথ দার্শনিক ব্যাখ্যায় তার সফলতার প্রশ্নটি তেমন গুরুত্বপূর্ণ নয়।' গ্যালোয়ে (*Galloway*)[1] বলেন, ধর্মদর্শনের সঙ্গে দর্শনের সম্বন্ধ হল মিথক্রিয়ার এবং সহযোগিতার, পরিপূর্ণ যৌক্তিক নির্ভরতার নয়। এর কারণ নির্দেশ করতে গিয়ে গ্যালোয়ে বলেন যে একটা পরিপূর্ণ দার্শনিক সংহতির ধারণা শুধু আদর্শেই পর্যবসিত।

ধর্মসম্বন্ধীয় চেতনার বৈশিষ্ট্য

ধর্মদর্শন ও দর্শনের সম্বন্ধ সহযোগিতার সম্বন্ধ

কিন্তু নিজের বিষয়বস্তুর আলোচনার ব্যাপারে ধর্মদর্শনের যে স্বাধীনতা রয়েছে, সেই স্বাধীনতার বিষয়টিকে নিয়ে খুব বাড়াবাড়ি করা মোটেও যুক্তিসঙ্গত হবে না। যে সাধারণ দৃষ্টিভঙ্গি থেকে ধর্মদর্শন অভিজ্ঞতার আলোচনা করে এবং ধর্মসম্বন্ধীয় অভিজ্ঞতার আলোচনা করতে গিয়ে যেসব ধারণা তাকে প্রয়োগ করতে হয় সেইগুলি ধর্মদর্শনকে দর্শন থেকেই গ্রহণ করতে হয়। ধর্মদর্শনের পক্ষে খুশীমত নিজের

---

1. "The relation of the philosophy of religion to philosophy is rather one of interaction and co-operation than of complete logical dependence."

—Galloway : The Philosophy of Religion, Page 43.

প্রয়োজনে আলোচনার নূতন পদ্ধতি বা ধরন সৃষ্টি করা সম্ভব নয়। কোন বিশেষ যুগে যে দার্শনিক চিন্তার প্রাধান্য সেটিই ধর্ম আলোচনায় মানুষকে প্রযোজ্য নীতিটি যুগিয়ে দেয়। এই নীতিই মানুষ ধর্মীয় অভিজ্ঞতা সম্বন্ধীয় কোন মতবাদ প্রতিষ্ঠা করার জন্য ধর্মের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে এবং এই নীতিই সাধারণভাবে ধর্মদর্শনের বৈশিষ্ট্য নিরূপণ করে। যদি কোন সময়ের দার্শনিক চিন্তাধারা হয় ভাববাদী, বস্তুবাদী বা দ্বৈতবাদী তাহলে মানুষের প্রদত্ত ধর্মের ব্যাখ্যায় সেই ধরনের দার্শনিক চিন্তার প্রতিফলন ঘটবেই।[1]

ধর্মদর্শন কোন যুগের দার্শনিক চিন্তার উপর নির্ভর

ধর্মদর্শনকে দর্শন থেকে বিচ্ছিন্ন করার মধ্যে অনেক অসুবিধা রয়েছে এবং এটা উপলব্ধি করা যায় যখন আমরা দেখি ধর্মের দার্শনিক আলোচনায় মনোবিদ্যা, জ্ঞানবিদ্যা, নীতিবিদ্যা এবং তত্ত্ববিদ্যার আলোচনা এসে পড়ে। উপরিউক্ত শাস্ত্রগুলির জন্য নূতন কোন নীতির উদ্ভাবন করা ধর্মদর্শনের পক্ষে সম্ভব নয়। প্রতিটি ক্ষেত্রেই এই সব শাস্ত্রে যে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে ধর্মদর্শনকে তার উপর নির্ভর করতে হয়। ধর্মদর্শন যদি সেই যুগের দার্শনিক চিন্তাধারাকে অগ্রাহ্য করতে চায় তাহলে সেই প্রচেষ্টা কখনই সফল হবে না। শুধু নিজের উপর ভিত্তি করে রয়েছে এমন কোন স্ব-নির্ভর বিশুদ্ধ ধর্মদর্শনের ধারণা কার্যকর ধারণা নয়। কেননা অন্যান্য অভিজ্ঞতা থেকে ধর্মসম্বন্ধীয় অভিজ্ঞতাকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করা সম্ভব নয় এবং এই প্রসঙ্গে গ্যালোয়ে যা বলেছেন তা খুবই প্রণিধানযোগ্য—সেটা হল ধর্মকে বোঝার প্রচেষ্টায় ধর্মকে অতিক্রম করে যাওয়ার প্রয়োজন আছে (in striving to understand religion it is also necessary to look beyond it)।

ধর্মদর্শনের নিজের উপর দাঁড়ানো সম্ভব নয়

দর্শনের উপর নির্ভর করে যে ধর্মদর্শন তার বিরুদ্ধে অভিযোগ এসেছে ঈশ্বরতত্ত্ব বা ধর্মতত্ত্বের (theology) দিক থেকে, বিশেষ করে সেই সব ধর্মতত্ত্ববিদদের দিক থেকে যারা তত্ত্ববিদ্যার প্রতি বৈরীভাবাপন্ন। যেমন একদল ধর্মতত্ত্ববিদ এই অভিমত ব্যক্ত করেন যে ধর্মের পরমসত্য খ্রীষ্টধর্মের মধ্যেই নিহিত, যে খ্রীষ্টধর্ম হল প্রত্যাদেশমূলক ধর্ম

1. যেমন ভাববাদী দার্শনিক চিন্তা অতি সহজেই ধর্মদর্শনের আলোচনার পথে অগ্রসর হয় যেহেতু মন বা আত্মা ভাববাদ এবং ধর্ম উভয়ের পক্ষেই প্রাথমিক মূল্য (Primary value) হিসেবে গণ্য। আবার জড়বাদের সঙ্গে ধর্মের বিরোধ আছে; কাজেই জড়বাদকে গ্রহণ করলে আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা সম্পর্কীয় দার্শনিক মতবাদ প্রতিষ্ঠা অসম্ভব হয়ে পড়বে। জড়বাদীদের একমাত্র কাজ হবে দেখান যে, ধর্ম নিছক ভ্রান্তি ছাড়া কিছুই নয়।

(revealed religion) এবং ধর্মদার্শনিকের যা করণীয় তাহল সুসংহতভাবে এই সত্যের বর্ণনা ও ব্যাখ্যা। এঁরা ধর্মের রাজ্যে তত্ত্ববিদ্যার অনুপ্রবেশের তীব্র বিরোধিতা করেন।

কিন্তু এই ধরনের অভিমত সমর্থনযোগ্য নয়। কেননা, সাধারণ তত্ত্ববিদ্যার উপর নির্ভর নয় এমন কোন ধর্মসম্বন্ধীয় তত্ত্ববিদ্যা (religious metaphysics) গড়ে তোলা সম্ভব নয়। অভিজ্ঞতার কোন একটা বিশেষ পর্বে সমগ্র সত্যকে পাওয়া যাবে এরূপ ধারণা করা ভুল এবং সেই কারণেই কোন ধর্মকেই তার বৈশিষ্ট্য না হারিয়ে অভিজ্ঞতার অবশিষ্ট অংশ থেকে বিচ্ছিন্ন করা সম্ভব নয়। তত্ত্বের কোন বিশেষ অংশ তার অবশিষ্ট অংশ থেকে পরিপূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন নয় এবং কোন বিষয়কে জানতে গেলে অন্য বিষয়ের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত করে তাকে জানতে হবে। এই বৃহত্তর দৃষ্টিভঙ্গির সাহায্যেই কোন একটি নির্দিষ্ট ধর্মের বৈশিষ্ট্যমূলক উপাদানগুলিকে জানা যেতে পারে। ধর্মদর্শন, অভিজ্ঞতার অবশিষ্টাংশের থেকে নিজেকে বিযুক্ত রেখে ধর্মসম্বন্ধীয় অভিজ্ঞতা নিয়ে সফলভাবে আলোচনা করতে পারবে না। অর্থাৎ কিনা ধর্মদর্শন দর্শনের সঙ্গে নিজের সম্বন্ধ স্বীকার করে নিয়ে তার কার্য সম্পাদন করবে।

অভিযোগের সমালোচনা

কাজেই আমাদের সিদ্ধান্ত হচ্ছে, ধর্মদর্শনকে অবশ্যই ধর্মসম্বন্ধীয় মতবাদের যাথার্থ্য এবং উপযোগিতা বিচার করতে হবে। সেই কারণে ধর্মদর্শনকে জ্ঞানবিদ্যার এবং তত্ত্ববিদ্যার অনেক প্রশ্নের জবাব দিতে হবে। যেমন সত্তার স্বরূপ বিচার করার পক্ষে মানবমন কি উপযুক্ত? পরমতত্ত্বের স্বরূপ কী? ধর্মসম্বন্ধীয় সত্যের সবচেয়ে উন্নত রূপ কোন্‌টি? সর্বেশ্বরবাদ, বহুঈশ্বরবাদ, ঈশ্বরবাদ কোন্ মতবাদটি সন্তোষজনক? ঈশ্বর কি এই জগতের অতিবর্তী, না অন্তবর্তী? এইসব প্রশ্নের উত্তর দিতে হলে ধর্মদর্শনকে দর্শনের বা তত্ত্ববিদ্যার রাজ্যে অনুপ্রবেশ করতে হয়।

ধর্মদর্শনকে তত্ত্ববিদ্যার প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে

ধর্মের সত্যকে দার্শনিক সত্য থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করে দেখা চলে না। দর্শনের সত্যের সঙ্গে সঙ্গতি থাকলেই ধর্মসম্বন্ধীয় অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে যে সত্য সূচিত হয় তা যথার্থ হতে পারে। কাজেই ধর্মদর্শন ও দর্শন গভীর সম্পর্কে সম্পর্যুক্ত এবং উভয়ের মধ্যে কোন স্থায়ী ব্যবধান রচনা করা চলে না।

৫। ধর্মদর্শন ও নীতিবিজ্ঞান (Philosophy of Religion and Ethics):

ধর্মদর্শনের সঙ্গে নীতিবিজ্ঞানের গভীর সম্পর্ক বর্তমান। ধর্মদর্শন ধর্মসম্বন্ধীয় অভিজ্ঞতার অর্থ নির্ধারণ ও মূল্যাবধারণ করে। নীতিবিজ্ঞান হল একটি তাত্ত্বিক

বিজ্ঞান যা আচরণের মঙ্গল বা ঔচিত্যের আলোচনা করে। মানুষের আচরণই নীতিবিজ্ঞানের প্রধান আলোচ্য বিষয় এবং মানুষের কাজের ভাল-মন্দ বিচার করা ও তার নৈতিক বিচারের মানদণ্ড নিরূপণ করা নীতিবিজ্ঞানের কাজ।

উভয় বিদ্যার স্বরূপ

নীতিবিজ্ঞানকে তার আলোচ্য বিষয়বস্তুর আলোচনার জন্য কয়েকটি বিষয়কে বিনা প্রমাণে স্বীকার করে নিয়ে তার আলোচনায় অগ্রসর হতে হয়। এই বিষয়গুলি হল ইচ্ছার স্বাধীনতা, আত্মার অমরত্ব এবং ঈশ্বরের অস্তিত্ব। যে নৈতিক আদর্শের মাপকাঠিতে মানুষের আচরণ বিচার করা হয়; সেই নৈতিক আদর্শ নিয়ে নীতিবিজ্ঞান আলোচনা করে। কিন্তু এই নৈতিক আদর্শের আলোচনায় পরমতত্ত্ব বা ঈশ্বরের আলোচনা এসে পড়ে। নীতিকে ব্যাখ্যা করার জন্য নীতিবিজ্ঞানকে কোন সর্বশক্তিমান, সর্বজ্ঞ, অসীম, অনন্ত পুরুষের অস্তিত্বের কল্পনা করতে হয়। নীতিবিদ্যাকে আলোচনা করতে হয় ঈশ্বরের সঙ্গে কি মানুষের নৈতিক সম্পর্ক আছে? নৈতিক আদর্শ কি বাস্তব না কল্পনামাত্র? নৈতিক আদর্শ কি কেবলমাত্র মানুষের নিজের সৃষ্টি, না এই নৈতিক আদর্শ ঈশ্বরের মধ্যে পূর্ণরূপ লাভ করেছে? ঈশ্বর কি নৈতিক পূর্ণতার প্রতীক? ঈশ্বরের বিধানই কি নৈতিক বিধান?

ধর্মদর্শন ও নীতিবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয়ের মধ্যে মিল

বস্তুতঃ ধর্ম ও নীতির মধ্যে গভীর সম্পর্ক বর্তমান, নীতি ভিন্ন ধর্ম কেবলমাত্র লৌকিকতার্থ বিশ্বাস এবং কুসংস্কার ছাড়া কিছুই নয়। অপরদিকে নীতির শেষ পরিণতি ধর্মে। ঈশ্বর, যিনি বিশ্বের পরিচালক, তিনি নৈতিক আদর্শেরও পূর্ণ প্রতীক। আবার নৈতিক আদর্শকে যদি বাস্তবে লাভ করা না যায় তাহলে নৈতিক আদর্শ হয়ে পড়ে ভ্রান্ত। কিন্তু ব্যক্তি যদি একটি জীবনে তার নৈতিক আদর্শকে পূর্ণভাবে লাভ করতে না পারে তাহলে এই জীবনের পরেও আরও জীবনের অস্তিত্ব অনুমান করে নিতে হয়, যে জীবনে মানুষ ধীরে ধীরে এই আদর্শকে লাভ করতে পারে। তাহলে স্বীকার করে নিতে হয় আত্মা অমর। দেহের সঙ্গে সঙ্গেই যদি আত্মার বিনাশ ঘটে তাহলে নৈতিক আদর্শকে উপলব্ধি করবে কে? তাকে পূর্ণভাবে লাভ করবে কে? নৈতিক আদর্শ হল অনন্ত, একটা সীমিত জীবনে সেই আদর্শকে পূর্ণভাবে লাভ করা সম্ভব নয়। মানুষের সীমিত জীবন তার অনন্ত জীবনের প্রস্তুতি। এই সীমিত জীবনের সঙ্গে নিরবচ্ছিন্নভাবে যুক্ত হয়ে আছে এক অসীম জীবন, যেখানে এই নৈতিক আদর্শকে ধীরে ধীরে লাভ করা যাবে। কাজেই নৈতিক জীবনের জন্য ব্যক্তি-আত্মার অমরতাকে স্বীকার করে নিতে হয়।

ধর্ম ও নীতির সম্বন্ধ

ধর্মদর্শনের সমস্যা হল মানুষের জীবনের এবং বিকাশের ক্ষেত্রে একটি প্রয়োজনীয় উপাদানরূপে ধর্মের চরম অর্থ নিরূপণ করা। ঈশ্বরের ধারণা এবং আত্মার অমরত্ব, ধর্মবিশ্বাসের দুটি মৌলিক বিষয়। এই দুটি নীতিবিজ্ঞানেরও স্বীকার্য সত্য। ধর্মদর্শনকে ঈশ্বর ও আত্মার অমরতায় বিশ্বাসের যৌক্তিক ভিত্তি সম্পর্কে আলোচনা করতে হয়। যদি ঈশ্বর ও আত্মার অমরতায় মানুষের বিশ্বাসের কোন যৌক্তিক ভিত্তি না থাকে, তাহলে ধর্মবিশ্বাস হয়ে পড়ে নিছক ভ্রান্তি। সত্য, শিব ও সুন্দর এই পরমমূল্যগুলি ঈশ্বরে মূর্ত এবং নৈতিক বিচারের আদর্শ হল, শিব বা মঙ্গল। কাজেই নৈতিক আদর্শ যা ঈশ্বরে মূর্ত এবং যাকে লাভ করার জন্য আত্মার অমরত্বকে স্বীকার করে নিতে হয় তাও হয়ে পড়ে নিছক ভ্রান্তি, যদি ঈশ্বর ও আত্মার অমরত্বে বিশ্বাসের কোন যৌক্তিক ভিত্তি না থাকে। কাজেই ধর্মদর্শনের আলোচনা নীতিবিদ্যার ও তত্ত্ববিদ্যার আলোচনাকে অগ্রাহ্য করতে পারে না। ধর্মদর্শন যখন ধর্মসম্বন্ধীয় অভিজ্ঞতা নিয়ে আলোচনা করে তখন অভিজ্ঞতার অবশিষ্ট অংশগুলির সঙ্গে সম্পর্ক বর্জিত হয়ে তার আলোচনায় অগ্রসর হতে পারে না।

ধর্মদর্শন নীতিবিদ্যাকে অগ্রাহ্য করতে পারে না

তৃতীয় অধ্যায়

ধর্মের উৎপত্তি এবং বিকাশ
(The Origin and Development of Religion)

১। **ভূমিকা :** ধর্মদর্শনের প্রধান কাজ হল ধর্মের প্রকৃতির এবং ক্রিয়ার ব্যাখ্যা দেওয়া। ধর্ম কী অর্থাৎ ধর্মের স্বরূপ কি এবং ধর্ম কি করে অর্থাৎ ব্যক্তি-জীবনে এবং সমাজ-জীবনে ধর্ম কি উদ্দেশ্য সিদ্ধ করে, ধর্মদর্শনের কাজ হল তা ব্যাখ্যা করা।

ধর্মের উৎপত্তি এবং বিকাশের আলোচনার প্রয়োজনীয়তা

কিন্তু ধর্মের উৎপত্তি এবং বিকাশের সমস্যা নিয়ে আলোচনা না করে ধর্মদর্শনের পক্ষে এই ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভব নয়। এই সমস্যা একদিকে যেমন ঐতিহাসিক তেমনি মনস্তাত্ত্বিক। যদি নৃবিজ্ঞানী, মনোবিজ্ঞানী এবং ঐতিহাসিকের কাছ থেকে আমরা জানতে পারি কেন এবং কি কারণে মানুষ ধর্মপ্রবণ হয়েছিল এবং কেন ও কিভাবে স্থূল অবস্থা থেকে বর্তমান উন্নত অবস্থায় ধর্মের বিকাশ ঘটেছিল তাহলেই জানা যাবে ধর্ম স্বরূপতঃ কি এবং মানুষের জীবনে ধর্ম কি উদ্দেশ্য সিদ্ধ করে।

ধর্মের উৎপত্তির প্রশ্নটি আলোচনা করতে গিয়ে বিভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন করা চলে। প্রথমতঃ, সমাজে ধর্মের উৎপত্তি কিভাবে ঘটেছে, সেটি আবিষ্কার করার জন্য আমরা

ধর্মের উৎপত্তির প্রশ্নে বিভিন্ন পদ্ধতি

সচেষ্ট হতে পারি। এর জন্য প্রয়োজন প্রাচীন সমাজের জ্ঞান এবং এটি হল নৃবিজ্ঞানীর (anthropologist) কাজ। দ্বিতীয়তঃ, ব্যক্তির জীবনে ধর্মের উৎপত্তি কিভাবে হয়েছে তাও আমরা অনুসন্ধান করতে পারি, এটি হল মনোবিজ্ঞানীর কাজ। এই দুটি পদ্ধতি ছাড়াও আরও একটি বিষয়ের আলোচনা প্রয়োজন, সেটি হল ধর্মের ঐতিহাসিক বিকাশ সম্পর্কে অনুসন্ধান করা। কেননা, এই প্রশ্নের আলোচনা না করলে আমরা ধর্মের প্রকৃতি এবং কার্য সম্পর্কে যথাযথ জ্ঞান অর্জন করতে পারব না।

এক্ষণে আমরা ধর্মের উৎপত্তি সম্পর্কীয় বিভিন্ন মতবাদগুলি আলোচনা করব।

২। ধর্মের উৎপত্তি সম্পর্কে বিভিন্ন মতবাদ (Different theories of the Origin of Religion) :

ধর্মের উৎপত্তি সম্পর্কে আধুনিক মতবাদগুলি আলোচনা করার পূর্বে আমরা দুটি প্রাচীন মতবাদ আলোচনা করব। এই মতবাদ দুটি যদিও পূর্বে বিশেষভাবে প্রচলিত ছিল, বর্তমানে এই মতবাদগুলিকে অযৌক্তিক গণ্য করে বর্জন করা হয়েছে।

(ক) **ঈশ্বরের প্রত্যাদেশ থেকে ধর্মের উৎপত্তি (Origin of religion in Divine Revelation) ঃ** এই মতানুসারে বিশেষ ঐশ্বরিক প্রত্যাদেশ (Special Divine Revelation) থেকেই ধর্মের উৎপত্তি। প্রত্যাদেশ হল দৈবাদেশ বা দৈববাণী। ইহুদী, খ্রীষ্টান প্রভৃতি ধর্মতত্ত্বে এই অভিমতের প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়।

মতবাদের স্বরূপ

[1]প্রত্যাদেশ বলতে কি বোঝায়? এই শব্দটি দুটি বিষয়কে বোঝাতে পারে— (১) যে প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ঈশ্বর মানুষকে তার প্রয়োজনীয় সত্য জ্ঞাত করে (the process by which God makes known to man the truth which he requires), অথবা (২) সেই সব সত্যগুলি যেগুলি ঈশ্বর জ্ঞাত করেছেন (the body of truth which God has made known)। প্রত্যাদেশ পূব থেকে স্বীকার করে নেয় যে একজন সজীব (living) ঈশ্বরের অস্তিত্ব আছে যিনি সত্য মানুষকে প্রদান করতে সক্ষম ও ইচ্ছুক এবং বুদ্ধিমান সত্তারও (intelligent beings) অস্তিত্ব আছে যারা সত্য গ্রহণে ও তার ব্যবহার করতে সক্ষম।

এই মতবাদের সমালোচনায় মায়েল এডওয়ার্ডস্ (*Miall Edwards*) বলেন যে, 'এই মতবাদ ধর্মের উৎপত্তির বিষয়টিকে নিছক বৌদ্ধিক এবং যান্ত্রিক ধরনে ব্যাখ্যা করে'। কেননা এই মতবাদ মনে করে যে, মানুষকে কতকগুলি নির্দিষ্ট ধারণা প্রদান করা থেকেই ধর্মের শুরু। মানুষের মন যেন শূন্য পাত্র এবং পূব থেকে প্রস্তুত এমন কিছু ধারণার দ্বারা সেই পাত্র পূর্ণ করে তুলতেই মানুষ ধর্মপ্রবণ হয়ে উঠল। এ হল অমনস্তাত্ত্বিক মতবাদ। এই মতবাদ অনুসারে প্রত্যাদেশ হল নিছক এক ঐশ্বরিক ক্রিয়া। এই মতবাদ আমাদের বুঝতে সাহায্য করে না, মানুষের প্রকৃতি এবং অভিজ্ঞতা এই প্রত্যাদেশকে কিভাবে গ্রহণ করেছিল এবং মনের দিক থেকে মানুষ এ-সম্পর্কে কি চিন্তা করেছিল। ঐশ্বরিক প্রত্যাদেশ সম্পর্কীয় মতবাদের সমালোচনায় শেলিং (*Schelling*)-এর বক্তব্য খুবই যুক্তিসঙ্গত। তাঁর মতে একটা ঐতিহাসিক প্রত্যাদেশ থেকে ধর্মের শুরু, একথা স্বীকার করে নিলে আমাদের এই সিদ্ধান্ত করতে হবে যে, ঐ প্রত্যাদেশের পূর্বে মানুষের ধর্ম বলে কিছু ছিল না। আর মানুষের চেতনার এমন একটি অবস্থা যদি কল্পনা করা হয় যখন সেই চেতনা ছিল নিরীশ্বরবাদী, তাহলে সেই চেতনা ঈশ্বরের প্রত্যাদেশ কি ভাবে গ্রহণ করল তা অবিশ্বাস্য মনে হয়। যে মনের কোন ধর্মীয় সংগঠন বা উপাদান নেই, নিছক একটা বাহ্য প্রত্যাদেশ কিভাবে সেই মনে ধর্মকে অনুপ্রবিষ্ট করতে পারে? ধর্মীয় বিশ্বাসের যাথার্থ্যের বস্তুগত

সমালোচনা

1· Encyclopaedia of Religion and Ethics ; Vol X. Page 745.

ভিত্তিরূপে এবং মানুষের ধর্ম-জীবনে ঈশ্বরের ভূমিকাকে সুরক্ষিত করার জন্য হয়ত প্রত্যাদেশের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করে নেওয়া যেতে পারে। কিন্তু এই প্রত্যাদেশকে হতে হবে এক নিরবচ্ছিন্ন ক্রমিক প্রত্যাদেশ, মানুষের গ্রহণ ক্ষমতার সঙ্গে যার সামঞ্জস্য থাকবে, মানুষ কতটুকু গ্রহণ করতে পারবে তার উপর যে প্রত্যাদেশ নির্ভর করবে। এই প্রত্যাদেশ বাহ্য হলে চলবে না। সীমিত কিছু লোক খেয়ালখুশীমত এই প্রত্যাদেশের অধিকারী হবে, তাও যুক্তিসঙ্গত নয়। এই প্রত্যাদেশ হবে মানুষের সমগ্র জীবনের পরিপ্রেক্ষিতে ঈশ্বরের প্রত্যাদেশ। নিছক উর্ধ্ব থেকে মানুষকে কিছু বৌদ্ধিক জ্ঞান বা ধারণা দেওয়াতেই যেন এই প্রত্যাদেশের শেষ না হয়। তাছাড়া বিবর্তনবাদ (theory of evolution)-ও আমাদের এই ধারণা দেয় যে, আদিম মানুষের পক্ষে প্রত্যাদেশের মাধ্যমে প্রকাশিত ধর্ম সম্বন্ধীয় উন্নত ধারণাগুলিকে গ্রহণ করা সম্ভব ছিল না।

(খ) **মানবীয় বিচার-বুদ্ধি থেকেই ধর্মের উৎপত্তি (Origin of religion in human reason) :** অষ্টাদশ শতাব্দীর ইংরেজ অতিবর্তীবাদীরা (Deists) এই মতবাদের সমর্থক। এই মতের সমর্থকবৃন্দ ঈশ্বরের প্রত্যাদেশ থেকেই ধর্মের উৎপত্তি, এই মতবাদ বর্জন করে মানুষের বিচারবুদ্ধি থেকেই ধর্মের উৎপত্তি এই অভিমত সমর্থন করেন। তাঁদের মতে ঈশ্বরের সত্তা, আত্মার অমরতা, নৈতিক নিয়মের প্রামাণ্য প্রভৃতি ধর্মের মৌলিক সত্যগুলিকে গাণিতিক সত্যতার নিশ্চয়তার মতনই প্রতিষ্ঠিত করা যেতে পারে এবং এই সত্যগুলি জগতের বিভিন্ন ধর্মের সাধারণ উপাদান। এই বিচারবুদ্ধির ধর্ম (religion of reason) মানুষের কাছে স্বাভাবিক বিষয় এবং ধর্মের শুরু থেকেই মানুষের জ্ঞাত বিষয়। কিন্তু বিচারবুদ্ধির এই সহজ ধর্মের (simple religion of reason) জায়গা দখল করল ব্যাপক কুসংস্কার, ভ্রান্ত বিশ্বাস এবং ধর্মীয়-আচার অনুষ্ঠান। এইগুলির প্রবর্তক হলেন ধূর্ত পুরোহিতবৃন্দ যারা নানারকম ফন্দি করে এইগুলিকে প্রবর্তিত করেছিল। এদের উদ্দেশ্য ছিল মানুষের ভয়-প্রবণতা ও বিশ্বাস-প্রবণতার সুযোগ গ্রহণ করা এবং তাদের নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসা। মায়েল এডওয়ার্ডস (*Miall Edwards*)[1] বলেন, "ধর্মের উৎস দুটি—শুদ্ধ প্রত্যাদেশ-নিরপেক্ষ বা স্বাভাবিক ধর্মের (natural religion) উৎস হল

মতবাদের ব্যাখ্যা

1. "Thus religion has a two-fold origin, viz, reason as the source of pure natural religion, and wilful deceit on the part of priests as the source of all the actual historical religion".

—D. Miall Edwards : 'The Philosophy of Religion, Page 32.

বিচারবুদ্ধি এবং সব বাস্তব ঐতিহাসিক ধর্মের উৎস হল পুরোহিতবৃন্দের স্বেচ্ছাকৃত প্রতারণা।" পুরোহিতদের এই শঠতা আত্মপ্রকাশের পূর্বে ধর্মের যে শুদ্ধ আকার প্রত্যক্ষ করা যেত তাহল আদিম মানুষের ধর্ম। যুক্তিবাদী প্রত্যাদেশ-নিরপেক্ষ ধর্ম শুরু থেকেই ছিল পূর্ণাঙ্গ। পরবর্তীকালে এই ধর্মের সঙ্গে যেসব বিষয় যুক্ত হয়েছে সেগুলি যেমনি ছিল অপ্রয়োজনীয়, তেমনি ছিল ভ্রান্ত এবং ক্ষতিকারক। লর্ড হারবার্ট (*Lord Herbert*), জন টলেণ্ড (*John Toland*) প্রমুখ ব্যক্তিরাই ইংরেজী অতিবর্তী-বাদীদের এই মতবাদ সর্বপ্রথম প্রচার করেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে লা ম্যাতরি (*La Mettrie*), ডি' এলেমবার্ট (*D' Alembert*), ভলটেয়ার (*Voltair*), প্রমুখ ফরাসী চিন্তাবিদ্‌গণ এই মতবাদ প্রবর্তন করেন।

এই মতবাদ বর্তমানে পরিত্যক্ত। এই মতবাদের বিরুদ্ধে কতকগুলি অভিযোগ আনা যেতে পারে।

প্রথমতঃ, এই মতবাদ ধর্মের উৎপত্তি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে যুক্তি বা বিচারবুদ্ধির উপর অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করে এবং ধর্মসম্বন্ধীয় ধারণা ও অভিজ্ঞতার উৎসের ক্ষেত্রে আবেগ ও স্বজ্ঞার (intuition) বা অপরোক্ষ অনুভূতির ভূমিকাকে উপেক্ষা করে।

দ্বিতীয়তঃ, জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রে যেমন, তেমনি ধর্মের ক্ষেত্রেও ঐতিহাসিক বিকাশের নীতিটি যে কার্যকর এই মতবাদ তা অগ্রাহ্য করে। তাছাড়া এই মতবাদ আদিম মানুষকে এমন পরিণত ধারণার অধিকারী করে, যেগুলি অনুধাবন ও উপলব্ধি করার জন্য মানুষের বহু যুগ লেগেছিল। আদিম প্রত্যাদেশ সম্পর্কীয় মতবাদেও আমরা এই ত্রুটি লক্ষ্য করেছি।

তৃতীয়তঃ, ইতিহাসের সব বাস্তব ধর্মই ক্ষমতার প্রলোভনে পুরোহিতদের বিবেচনা-প্রসূত ভণ্ডামী—এই অভিমত কোন মতেই গ্রহণযোগ্য নয়। এটা অনস্বীকার্য যে পুরোহিতরা অনেক সময়ই নিজেদের স্বার্থসিদ্ধি করার জন্য মানুষের ধর্মগত আবেগের সুযোগ গ্রহণ করেছে, কিন্তু যে ধর্মীয় আবেগ পুরোহিতদের উপর নির্ভর না করে পূর্বে থেকেই অস্তিত্বশীল ছিল, পুরোহিতদের পক্ষে তারই সুযোগ নেওয়া সম্ভব। সোজা কথায়, যা আগে থেকে রয়েছে পুরোহিতরা তারই সুযোগ নিয়েছিল। পুরোহিতদের কাজ ছিল ধর্মের উৎপত্তি সাধন নয়, ধর্মের সংরক্ষণ; ধর্মের আসল স্রষ্টা হল ধর্ম-প্রচারক এবং ভগবদ্বাক্য প্রচারার্থ প্রেরিত ব্যক্তি, যাদের কাছে ধর্মের বাহ্য আচার অনুষ্ঠানের তেমন মূল্য নেই। বস্তুতঃ বৃহৎ ঐতিহাসিক ধর্মগুলির মধ্যে কোনটিই পুরোহিতদের দ্বারা সৃষ্ট হয়নি। এই মতবাদ মনে করে ধর্ম

একটা স্বেচ্ছাকৃত আবিষ্কারের ব্যাপার। স্বতঃস্ফূর্তভাবে ধর্মের উৎপত্তি হয়েছে এবং মানুষের প্রকৃতির গভীরে যে তার মূল নিহিত—এই মতবাদ তা অগ্রাহ্য করে।

৩। ধর্মের উৎপত্তি সম্বন্ধীয় আধুনিক মতবাদ (Modern theories of the Origin of Religion) :

ধর্মের উৎপত্তি সম্পর্কে প্রাচীন এবং বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি-বর্জিত মতবাদগুলি বর্জন করে, এবার আমরা ধর্মের উৎপত্তি সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য আধুনিক মতবাদগুলি আলোচনা করব। দুটি দিক থেকে এই প্রশ্নটির আলোচনায় অগ্রসর হওয়া যেতে পারে, নৃবিজ্ঞানীর (anthropologist) দিক থেকে এবং মনোবিজ্ঞানীর (psychologist) দিক থেকে। ধর্মের ঐতিহাসিক বা প্রাগ্-ঐতিহাসিক উৎপত্তির প্রশ্নটির সঙ্গেই নৃবিজ্ঞানীর সম্পর্ক। তাঁর কাছে প্রশ্ন হল, দেশে কালে ধর্মের প্রথম আবির্ভাব কিভাবে ঘটেছিল ? কিভাবে মানুষের ধর্মীয় প্রকৃতি প্রথম আত্মপ্রকাশ করেছিল ? ধর্মের সবচেয়ে প্রাথমিক রূপটি কী, যা থেকে ধর্মের অন্যান্য রূপগুলি বিকশিত হয়েছিল ?

নৃবিজ্ঞানীর সমস্যা

মনোবিজ্ঞানীর কাছে সমস্যা হল, কেবলমাত্র উৎপত্তিব ব্যাপারে নয়, সবসময় এবং সর্বক্ষেত্রে মানুষের আধ্যাত্মিক প্রকৃতিতে ধর্মের উৎস কোথায় ? মানুষের আভ্যন্তরীণ বা আন্তরজীবনের সেই সব অপরিবর্তনীয় উপাদানগুলি কী, যেগুলি পরিবেশের সঙ্গে মিথস্ক্রিযার ফলে ধর্মীয় মনোভাব মানুষের মধ্যে জাগ্রত করে ? সেই সব উদ্দেশ্য, অনুভূত প্রয়োজন, প্রেরণা, তাড়না, আবেগ, উত্তেজনাগুলি কি, যেগুলি মানুষকে অলৌকিককে উপলব্ধি করার জন্য এবং তার সঙ্গে নিজের জীবনের সামঞ্জস্য সাধনের জন্য প্রণোদিত করে ? ব্যক্তির মানসিক গঠনের মধ্যে এমন কি আছে যার জন্য যেখানে ব্যক্তির উপস্থিতি সেখানে কোন এক ধরনের ধর্মেব উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায় ?

মনোবিজ্ঞানীর সমস্যা

এই দুই ধরনের প্রশ্ন পরস্পর অবিচ্ছেদ্য। নৃবিজ্ঞানীকে তার সমস্যাগুলি সমাধান করার জন্য মনোবিজ্ঞানীর সহায়তা এবং মনোবিজ্ঞানীকে অনুরূপ কারণে নৃবিজ্ঞানীর সহায়তা গ্রহণ করতে হয়।

আমরা প্রথমে নৃবিদ্যাগত এবং পরে মনস্তাত্ত্বিক মতবাদগুলি আলোচনা করব :

(ক) নৃবিদ্যাগত মতবাদ (Anthropological Tneories) : ই. বি. টাইলর-এর সর্বপ্রাণবাদমূলক তত্ত্ব (The Animistic theory of E. B. Tylor) : এটি ধর্মের উৎপত্তি সম্পর্কীয় এমন একটি মতবাদ যেটি আদিম নরনারীর মন এবং অভ্যাস

সম্পর্কে মনোবিজ্ঞানসম্মত আলোচনার দ্বারা সমর্থিত। অধ্যাপক ই. বি. টাইলর (*E. B. Tylor*) তাঁর সুবিখ্যাত 'Primitive Culture' নামক গ্রন্থে এই মতবাদ সম্পর্কে আলোচনা করেছেন এবং সর্বপ্রাণবাদ (animism)[1] শব্দটির প্রবর্তন করেছেন। এই মতবাদ অনুসারে অনেক আদিম নরনারী বিশ্বাস করত যে তাদের চারপাশের প্রাকৃতিক বস্তু হয় প্রাণবান কিংবা আত্মা তাদের আশ্রয় করে আছে (either alive or are inhabited by spirits)। বৃক্ষ, নদী, পর্বত, ঝরণা, মেঘ, আকাশ বা এক টুকরো পাথর প্রভৃতি বস্তুকে সজীব বা চেতন গণ্য করা হত।

মতবাদের ব্যাখ্যা

আদিম ব্যক্তি যা কিছু প্রত্যক্ষ করত তাতে নিজের মতনই প্রাণের বা চেতনার অস্তিত্ব স্বীকার করে নিত। সাদৃশ্যের নীতি প্রয়োগ করে সে তার চারপাশের বস্তুতে নিজের অভিজ্ঞতাকে প্রক্ষিপ্ত করত। সে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার মাধ্যমে জানত তার গতির মূলে বর্তমান তার ইচ্ছা বা তার চেতনা, সেহেতু তার নিজের গতির পরিপ্রেক্ষিতে চারপাশের গতিকে ব্যাখ্যা করত। আদিম মানুষের দৃষ্টিতে প্রকৃতি ছিল প্রাণময়, অসংখ্য আত্মার (innumerable spirits) দ্বারা পরিপূর্ণ; অবশ্য প্রাকৃতিক বস্তুগুলির মধ্যে সব বস্তুই বা যেসব আত্মা ঐ বস্তুগুলিকে আশ্রয় করে আছে বলে মনে করা হত, আদিম নরনারীর কাছে ধর্মের ব্যাপারে তাদের সবগুলিই গুরুত্বপূর্ণ ছিল না। যেমন [2]পশ্চিম আফ্রিকার সমুদ্রোপকূলে বসবাসকারী একদল আদিম নরনারী তৃণ, প্রস্তর, ঝোপ প্রভৃতিতে অবস্থানকারী আত্মার প্রতি তেমন মনোযোগ দিত না; কারণ তারা মনে করত এরা তেমন শক্তিশালী নয় এবং এদের ভাল বা মন্দ করার ক্ষমতা খুবই সীমিত। কিন্তু এরা নদী, সমুদ্র, পর্বত প্রভৃতি প্রাকৃতিক বস্তুতে অবস্থানকারী আত্মাগুলির প্রতি খুবই মনোযোগী হত।

[3]সর্বপ্রাণবাদ তিনভাবে আত্মপ্রকাশ করতে পারে: (১) মৃতের উপাসনা হিসাবে মানুষ এবং প্রাণীর আত্মার উপাসনা, (২) স্থায়ীভাবে কোন দেহের সঙ্গে যুক্ত নয়, এমন আত্মার উপাসনা, (৩) প্রকৃতিতে স্থায়ীভাবে বর্তমান বা মাঝে মাঝে আবির্ভাব ঘটে, এমন ঘটনাকে নিয়ন্ত্রণ করে যে সব আত্মা, তাদের উপাসনা।

---

1. 'From the point of view of the history of religions, the terms Animism is taken, in a wider sense, to denote the belief in the existence of spiritual beings, some attached to bodies of which they constitute the real personality (souls), others without necessary connexion with a determinate body (spirits.)

—Encyclopaedia of Religion and Ethics, Vol. 4, Page. 535.

2. W. K. Wright: Religion and Animism, page 48 (in his book 'A Student's Philosophy of Religion.')

3. Encyclopaedia of Religion and Ethics, Vol. 1

টাইলরের মতে এই সর্বপ্রাণবাদ থেকেই ধর্মের উৎপত্তি। ব্যক্তির চারপাশের কোন কোন প্রাণময় সত্তার সঙ্গে নিজের সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা থেকেই ধর্মের উৎপত্তি ঘটেছে। ঐতিহাসিক উপাসনার যে সব রূপ প্রত্যক্ষ করা যায় তাদের সবগুলির শুরুতে এর প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়। এই কারণেই ব্যক্তি শক্তিশালী চেতন সত্তাকে প্রসন্ন করার জন্য এবং অশুভ চেতন সত্তাকে বিতাড়িত করতে সচেষ্ট হত।

সমালোচনা: যদিও এই মতবাদের সমালোচকবৃন্দ স্বীকার করেন যে মানব-সংস্কৃতির এক বিশেষ স্তরে সর্বপ্রাণবাদে বিশ্বাস সর্বজনীন বিশ্বাসে পরিণত হয়েছিল তবু তাঁরা মনে করেন ধর্মের উৎপত্তির ব্যাখ্যা দেবার পক্ষে এই মতবাদকে সন্তোষজনক গণ্য করা চলে না। তাঁরা এই মতবাদের দুটি ক্রটির উল্লেখ বিশেষ ভাবে করেছেন। প্রথমতঃ, সর্বপ্রাণবাদ কোন মৌলিক ধর্ম সম্পর্কীয় মতবাদ নয়, বরং একটি মৌলিক দার্শনিক মতবাদ। এই মতবাদের ব্যাখ্যাতেই বলা হয়েছে যেসব আত্মা প্রাকৃতিক বস্তুগুলিকে সজীব বা চেতন করে তুলত তাদের সব কটিই আদিম মানুষের মনে ধর্মভাব জাগিয়ে তুলত না বা ধর্মসম্পর্কীয় ক্রিয়া সম্পাদনে তাদের প্রণোদিত করত না। কাজেই সেই মনস্তাত্ত্বিক উদ্দেশ্যের (psychological motive) সন্ধান করার প্রযোজন আছে যার সাহায্যে ব্যাখ্যা করা যাবে কেন আদিম নরনারী কোন বিশেষ আত্মার সঙ্গে সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠা করতে চাইত এবং অন্যান্য আত্মার সঙ্গে সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠা করতে চাইত না।

সমালোচনা

উপাসক নিশ্চয়ই তার উপাস্য বস্তুর মধ্যে এমন কিছুর সন্ধান পায় যা তার আবেগ ও বিশেষ আগ্রহকে জাগিয়া তোলে। উপাসক কোন একটি বস্তুকে তার উপাস্য হিসেবে নির্বাচন করে নেয় এবং এই নির্বাচনের পিছনে নিশ্চয়ই উপাসকের কোন উদ্দেশ্য থাকে। উপাসকের নির্বাচনের পিছনে কি উদ্দেশ্য ছিল, এই মতবাদ তার যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা দেয় না। তাছাড়া ধর্ম কোন না কোন ভাবে অলৌকিক সত্তার বা যা ব্যক্তির অদৃষ্টের নিয়ামক তার প্রতি যুক্তির প্রতিক্রিয়া নির্দেশ করে। কিন্তু অলৌকিকতা সর্বপ্রাণবাদের কোন ধর্ম নয়। কেননা সর্বপ্রাণবাদ অ-মানবীয় সত্তায় কোন অলৌকিক শক্তির আরোপ করে না, মানবীয় শক্তিরই আরোপ করে। আদিম মানুষ প্রবহমান স্রোতস্বিনীর গতির মূলে চেতন সত্তার অস্তিত্ব কল্পনা করত। মানুষের মতনই স্রোতস্বিনীর নিজস্ব ইচ্ছা আছে মনে করত, তার গতির মধ্যে কোন অলৌকিকতা বা রহস্য আরোপ করত না। যে বস্তু স্বাভাবিকভাবেই অস্তিত্বশীল, মানবমনে যা আবেগ সঞ্চারে ব্যর্থ, তা মানবমনে ধর্মসম্পর্কীয় সশ্রদ্ধ ভয় (awe), বা ভক্তি জাগাতে পারে না এবং উপাসনার বস্তু হতে পারে না। মায়েল এডওয়ার্ডস্

বলেন, "কাজেই আমরা বলতে পারি না যে সর্বপ্রাণবাদই ধর্মের উৎস। আমরা কেবলমাত্র বলতে পারি যে, আদিম মানুষের সমগ্র জীবনে ছিল সর্বপ্রাণবাদের আধিপত্য।" অনেক আদিম অধিবাসীই, যেমন মধ্য অস্ট্রেলিয়ার আদিম অধিবাসী, সর্বপ্রাণবাদে বিশ্বাসী হলেও, তাদের ধর্মীয় বিশ্বাসের সঙ্গে তার কোন সংযোগ লক্ষ্য করা যায় না। তাই রাইট (*Wright*) মন্তব্য করেছেন, 'সর্বপ্রাণবাদ যদিও অনেক সময়ই ধর্মীয় বিশ্বাসের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত, তবুও কোনমতেই ব্যতিক্রমহীনভাবে সম্পর্কযুক্ত নয়।'

দ্বিতীয়তঃ, দার্শনিক মতবাদ হিসেবেও সর্বপ্রাণবাদ আদিম ধারণা নয়। সর্বপ্রাণবাদে আত্মার ধারণা রয়েছে; যে ধারণা মানুষের উন্নত চিন্তাশক্তির পরিণাম। বহুদিন ধরে চিন্তা করার ফলে মানুষ এই জাতীয় ধারণার অধিকারী হয়েছে। সুনির্দিষ্ট বস্তুরূপে আত্মার ধারণা নিঃসন্দেহে এক উন্নত ধারণা; আদিম মানুষের পক্ষে সেই কারণে আত্মার ধারণা করা সম্ভব ছিল না। কাজেই সর্বপ্রাণবাদের ধারণা যে সময়ে মানুষের মনে উদিত হয়েছিল তার পূর্বে ধর্মের উৎপত্তি হয়েছে এইরূপ সিদ্ধান্তই অনেকে যুক্তিযুক্ত মনে করেন।

রাইট-এর অভিমতানুসারে কি ধর্ম, কি সর্বপ্রাণবাদ কোনটিই অনিবার্যভাবে অপরটির সঙ্গে যুক্ত নয়। ধর্ম ও সর্বপ্রাণবাদ উভয়েরই স্বাধীনভাবে উৎপত্তি ঘটেছে।

হার্বার্ট স্পেন্সারের প্রেতাত্মা সম্পর্কীয় মতবাদ (The Ghost Theory of Herbert Spencer) **:** মৃত ব্যক্তির প্রেতাত্মা সম্পর্কে একটা সশ্রদ্ধ ভয়ের মনোভাব আদিম ব্যক্তিদের মধ্যে ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল এবং মানুষ তার পূর্বপুরুষদের আত্মার উদ্দেশ্যে অনেক কিছু উৎসর্গ করত। এই কারণে হার্বার্ট স্পেন্সার সিদ্ধান্ত করেন, প্রেতাত্মা রূপে আবির্ভূত পূর্বপুরুষদের উপাসনা থেকেই ধর্মের উৎপত্তি। হার্বার্ট স্পেন্সারের মতে এই হল ধর্মের আদিম রূপ যা থেকে ধর্মের অন্যান্য রূপগুলির উদ্ভব ঘটেছে। হার্বার্ট স্পেন্সারের মতে ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের মূলে রয়েছে মৃত ব্যক্তিদের সম্পর্কে ভীতির ভাব, যারা জীবিত ব্যক্তির নিয়ন্ত্রণের বাইরে। তাঁর মতে সর্বপ্রাণবাদ মৌলিক নয়, অন্য বিশ্বাস থেকে উদ্ভূত। মৃত পূর্বপুরুষদের আত্মা প্রেতাত্মারূপে আবির্ভূত হয়ে প্রকৃতির কয়েকটি বস্তুকে তাদের আবাসস্থলরূপে নির্বাচিত করে নিয়েছে, এই বিশ্বাসেরই একটা সর্বজনীন রূপ হল সর্বপ্রাণবাদ। অবশ্য এই অভিমতের বিরুদ্ধে বলা যেতে পারে যে, প্রেতাত্মার উপাসনাই আত্মা উপাসনার একটা বিশেষ রূপ। সেইকারণে প্রেতাত্মার উপাসনা মৌলিক ধারণা নয়, অন্য উপাসনা থেকে উদ্ভূত।

মতবাদের ব্যাখ্যা

সমালোচনা: স্পেন্সারের মতবাদের ত্রুটি হল এই মতবাদ জটিল ধর্মীয় অভিজ্ঞতাকে অতিরিক্ত সরল করে ব্যাখ্যা করতে চায়। মৃত পূর্বপুরুষদের ক্ষেত্রে দেবত্ব আরোপকে ধর্মের ভিত্তি রূপে গণ্য করার ফলে, এই ভিত্তি খুব দুর্বল হয়ে পড়ে।

জেসট্রোর অভিমত

[1]জেসট্রো (*Jastrow*)-র মতে শুধু একটি মাত্র আচার-অনুষ্ঠানের উপর ভিত্তি করে ধর্মের মতো একটা জটিল বিষয়ের ব্যাখ্যা দেওয়া চলে না। উপাসনা, তা' যত আদিমই হোক না কেন, একটিমাত্র চিন্তন বা আবেগের ফল নয়, একাধিক শক্তিশালী জটিল চিন্তনের ফল। ডঃ জেভনস্ প্রেতাত্মা সম্বন্ধীয় মতবাদ অস্বীকার করতে গিয়ে বলেন, মৃত ব্যক্তিদের প্রেতাত্মাদের দেবতা মনে করা হত, এটা কখনই হতে পারে না। মানুষ দেবতাদের উপর নির্ভর, কিন্তু তার মৃত পূর্বপুরুষদের আত্মা তার উপর নির্ভর। আসলে যে সব পূর্বপুরুষদের মানুষ বলে মনে করা হত তাদের দেবতারূপে পূজা করা হত না এবং যে সব পূর্বপুরুষদের দেবতা রূপে উপাসনা করা হত, তাদের মানুষ বলে মনে করা হত না। আদিম ব্যক্তিদের মধ্যে প্রেতাত্মার পূজা যতখানি প্রচলিত ছিল বলে স্পেন্সার মনে করেছেন, ততখানি কিন্তু প্রচলিত ছিল না এবং প্রাণময় প্রাকৃতিক বস্তুর উপাসনার তুলনায় পূর্বপুরুষদের উপাসনা কোন মতেই প্রাচীনতম নয়। কাজেই পূর্বপুরুষদের উপাসনা থেকে ধর্মের উৎপত্তি—স্পেন্সার-এর এই মতবাদ গ্রহণযোগ্য নয়।

জেভনস্-এর সমালোচনা

ধর্মের সরলতম এবং আদিমতম রূপ হিসেবে টোটেমবাদ (Totemism as the simplest and most primitive form of religion): কারও কারও মতে ধর্মের প্রাচীনতম এবং আদিমতম রূপ টোটেমবাদ (*Totemism*)। মায়েল এডওয়ার্ডাস্ টোটেমের বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন, টোটেম (*Totem*) হল কোন এক জাতীয় প্রাণী বা বৃক্ষ বা কোন এক জাতীয় অচেতন বস্তু, যার সঙ্গে কোন সামাজিক গোষ্ঠীর (কোন উপজাতির) খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব বা আত্মীয়তার এক বিশেষ সম্পর্ক বর্তমান। সময় সময় এই বস্তুটিকে উপজাতির পূর্বপুরুষ বা জ্ঞাতি বলে গণ্য করা হয়। এই 'Totem' বা প্রতীক যে আসলে কোন দেবতা তা নয়, এ হল দেবতার সগোত্রীয় বস্তু বা শ্রদ্ধার বস্তু। এটি সর্বদাই একটি প্রজাতি (species), এবং কখনও কোন ব্যক্তি প্রাণী বা উদ্ভিদ (an individual, amimal or plant)-কে টোটেম রূপে গণ্য করা হয় না। কোন সাধারণ উদ্দেশ্যে একে ব্যবহার করা যাবে না, প্রাণী হলে কোন ধর্মীয় অনুষ্ঠান ছাড়া একে হত্যা

টোটেম-এর পরিচয়

1. M. Jastrow : The Study of Religion, Page 185.

করা চলবে না বা আহার করা চলবে না। ডব্লু. রবার্টসন স্মিথ (*W. Robertson Smith*) -এর মতে উৎসর্গ (sacrifice) প্রথার উদ্ভব ঘটেছে টোটেম-এর উপাসনা থেকে এবং টোটেমবাদ ধর্মের বিজ্ঞানসম্মত আলোচনাকে যথেষ্ট প্রভাবিত করেছে। [1]জেভনস্ (*Jevons*)-র মতে টোটেমবাদ হল সবচেয়ে প্রাচীন ধরনের সমাজের পরিচয়,এর প্রচলন জগৎ জুড়ে এবং এর থেকেই বহু দেববাদের (polytheism) পুনরায় উদ্ভব। তিনি অবশ্য এটিকেই ধর্মের আদিমতম অবস্থা বলে বর্ণনা করেন নি। তিনি টোটেম পূর্ববর্তী স্তরের (pre-totemistic stage) কথা বলেছেন। কিন্তু একথাও বলেছেন যে ঐ স্তরে ধর্মীয় বিশ্বাসের অস্তিত্ব নিছক একটা অনুমানের ব্যাপার। জেভনস-এর মতে বাহ্য বস্তুর মধ্যে প্রাণীরাই প্রথমে উপাস্য বস্তু হয়ে উঠেছিল এবং সেই উপাসনার প্রথম রূপ হল টোটেমবাদ এবং বহুদিন ধরে মানুষ একটি মাত্র বস্তুকেই উপাসনার বস্তু করেছিল সেটি হল 'টোটেম' বা উপজাতীয় দেবতা (totem or tribal gods)।

সমালোচনা: এই মতবাদের সমালোচনায় বলা হয় যে প্রতিটি ধর্মকেই যে টোটেমের স্তরটি অতিক্রম করতে হয়েছে সাম্প্রতিক গবেষণালব্ধ তথ্য থেকে তার সমর্থন পাওয়া যায় না। 'টোটেমবাদ' যে খুবই প্রাচীন তা অনস্বীকার্য। কিন্তু এর সর্বজনীনতা প্রমাণসাপেক্ষ। নিম্নতর সংস্কৃতিবিশিষ্ট বহু ব্যক্তির কাছে এই টোটেম-এর বিষয়টি সম্পূর্ণ অজ্ঞাত বিষয়। এই প্রসঙ্গে মায়েল এডওয়ার্ডস্ (*Miall Edwards*)-এর মন্তব্য খুবই প্রণিধানযোগ্য। [2]তিনি বলেন, "টোটেমবাদকে যথার্থভাবে ধর্ম বলে অভিহিত করা চলে না, যদিও এটি ধর্মের সীমান্ত রেখায় অবস্থিত। আদিম ধর্মের বিশিষ্ট রূপের তুলনায় এটি একটি সামাজিক বা উপজাতীয় সংগঠনের বিষয়।"

সমালোচনা

এই মতবাদেরই একটি নতুন রূপ পরিলক্ষিত হয় ফরাসী সমাজ-বিজ্ঞানী এমিলি দুরখীম (*Emile Durkhim*)-এর ধর্ম সম্পর্কে সমাজ-বিজ্ঞানসম্মত মতবাদে। দুরখীম টোটেমবাদকে সর্বাপেক্ষা সরল ও প্রাচীন ধর্ম বলে গণ্য করেন। তাঁর মতে ধর্ম হল প্রধানতঃ একটি সামাজিক বিষয়। সব ধর্মীয় বিশ্বাসের মূলে আছে একটা রহস্যময় নৈর্ব্যক্তিক শক্তি যা মানুষের জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করে এবং এই শক্তি, যা ব্যক্তিকে নিয়ন্ত্রিত করে, উদ্ভূত হয় ব্যক্তির

এমিলি দুরখীমের মতবাদ

1. Introduction to The History of Religion গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

2. "Indeed Totemism cannot accurately be called religion at all though it is on the border-line of religion."

—Miall Edwards: The Philosophy of Religion, Page 42.

উপর সমাজের কর্তৃত্ব থেকে। ব্যক্তির জীবনের উপর সামাজিক গোষ্ঠীর ক্ষমতার চেতনাই ব্যক্তির কাছে জগতে অস্তিত্বশীল এক রহস্যময় শক্তির চেতনা এনে দেয়। দুরখীমের মতে 'টোটেম' হল সমাজের এই শক্তির দৃশ্যমান প্রতীক। কিন্তু আসলে 'টোটেম' যার প্রতীক তা হল সমাজের আচার, আবেগ এবং চিন্তার ক্ষমতা যা বাস্তব শক্তিরূপে প্রতিটি ব্যক্তির উপর চাপ সৃষ্টি করে এবং তার জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করে। ব্যক্তির কাছে প্রকৃত দেবতা হল তার সমাজ। যে শক্তিকে সে প্রকৃত উপাসনা করে, যে শক্তি হল সমাজের শক্তি।

সমালোচনা: এই জগতের এক বৃহত্তর অংশে টোটেমবাদের কোন চিহ্ন পরিলক্ষিত হয় না এবং যথাযথভাবে ব্যক্ত করতে গেলে টোটেমবাদ কোন ধর্মই নয়। তবে দুরখীমের অভিমতের স্বপক্ষে বলা যেতে পারে যে, প্রাকৃতিক বস্তুকে প্রাণময় মনে করে তার উপাসনা করা এবং পূর্বপুরুষদের প্রেতাত্মাকে উপাসনা করার থেকেও ধর্ম প্রাচীনতর বিষয় এবং ধর্মের মূলে কোন রহস্যময় নৈর্ব্যক্তিক শক্তি সম্পর্কে অস্পষ্ট অথচ আবেগগত বোধের অস্তিত্ব আছে—এই ধারণার মধ্যে যথেষ্ট সত্যতা আছে।

সর্বপ্রাণবাদ পূর্ববর্তী ধর্ম: মানার ধারণা (Pre-animistic Religion : The Conception of Mana) : সাম্প্রতিক নৃবিজ্ঞানের সিদ্ধান্ত অনুসারে সংস্কৃতির যে স্তরে সর্বপ্রাণবাদের উদ্ভব ঘটেছিল তার পূর্ববর্তী কোন স্তরে, অর্থাৎ যে স্তরে কোন অনির্বচনীয়, নৈর্ব্যক্তিক, রহস্যময় শক্তির উপস্থিতিতে ব্যক্তির মনে সশ্রদ্ধ ভয়ের উদ্রেক হত, সেই স্তরে ধর্মের উৎপত্তি ঘটেছিল। বিশপ কড্‌রিংটন (*Bishop Codrington*) তাঁর 'The Melanesians' গ্রন্থে এই শক্তিকে মানা (***Mana***) নামে অভিহিত করেছেন। মানার প্রকৃতি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে মায়েল এডওর্ড্‌স্ বলেন[1], "এ হল এক সর্বব্যাপক অতীন্দ্রিয় শক্তি বা প্রভাব যা অপ্রত্যাশিতভাবে ক্রিয়া করে বা বিশেষ বৈশিষ্ট্যসমন্বিত প্রাকৃতিক বস্তুর মধ্য দিয়ে আত্মপ্রকাশ করে।" [2]ব্রাইট্‌ম্যান (*Brightman*) বলেন, "মানা হল একটা ক্ষমতা বা শক্তির নাম, যার জন্য বিশেষ ধরনের কার্য উৎপন্ন হয়।"

মানার প্রকৃতি

মানার কোন যৌক্তিক সংজ্ঞা দেওয়া সম্ভব নয়। কারণ মানা কোন যৌক্তিক ধারণা (logical conception) নয়। যেসব সম্প্রদায় মানার অস্তিত্বে বিশ্বাস করত তারা ঠিক তখনও উন্নত যৌক্তিক ধারণার মাধ্যমে চিন্তা করতে শেখেনি। যদি একটা বিশেষ ধরনের পাথরের টুকরো কোন আদিম অধিবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করত,

1. The Philosophy of Religion, Page 45.
2. W. S. Brightman : A Philosophy of Religion.

সে মনে করত তার মধ্যে 'মানা' আছে। হয়ত সেই পাথরের টুকরোর আকৃতি বিশেষ ধরনের একটি ফলের মতন। সেই ব্যক্তি সেই ধরনের ফলের গাছের তলায় সেটিকে রেখে দিত। যদি সেই বছর সেই ধরনের ফল প্রচুর ফলত, তখন সিদ্ধান্ত করা হত যে ব্যক্তির ধারণা ঠিক, সেই পাথরের টুকরোতে মানা আছে।

মানা কোন প্রাকৃতিক গুণ নয়, রহস্যময় মোহিনী গুণ বা শক্তি। মানা ব্যক্তিক এবং নৈর্ব্যক্তিকের মাঝামাঝি কিছু, দৈহিকের তুলনায় মানসিক প্রকৃতিবিশিষ্ট। মানা সব কিছুতে পরিব্যাপ্ত, কিন্তু বিশেষ করে কোন বিশেষ ব্যক্তি বা বস্তুতেই কেন্দ্রীভূত। মানা হল বিশ্বের এক অনির্দিষ্ট শক্তির ভাণ্ডার যার থেকে মানুষ তার শুভ বা অশুভকে পেতে পারে। এই ধারণাতীত শক্তিই অসাধারণ বস্তু বা ব্যক্তি এবং অপ্রত্যাশিত ঘটনার মধ্য দিয়ে নিজেকে প্রকাশ করে।

মানা অপ্রাকৃতিক শক্তি বা প্রভাব

বিশপ কড্‌রিংটন বলেন, "এক অতিপ্রাকৃতিক শক্তিতে বা প্রভাবেতে বিশ্বাস মিলেনেশিয়ার অধিবাসীর মন সম্পূর্ণভাবে অধিকার করে আছে, যাকে সর্বত্রই মানা নামে অভিহিত করা হয়। যে-সব কিছু সাধারণ মানুষের ক্ষমতার বাইরে, বা প্রকৃতির স্বাভাবিক প্রক্রিয়ার বহির্ভূত, সেই সবগুলি মানার ক্রিয়ার দ্বারা উৎপন্ন হয়। জীবনের ক্ষেত্রে এই মানা উপস্থিত; ব্যক্তি ও বস্তুতে এ নিজেকে যুক্ত করে রাখে এবং এমন কার্যের মাধ্যমে ব্যক্ত হয় যাকে কেবল মাত্র এরই ক্রিয়ার ফল বলে গণ্য করা যেতে পারে। ···কিন্তু এই ক্ষমতা যদিও নৈর্ব্যক্তিক, তবু এই ক্ষমতা সবসময়ই কোন ব্যক্তির সঙ্গে যুক্ত, যে একে নিয়ন্ত্রণ করে। সব আত্মার সাধারণভাবে প্রেতাত্মার এবং কোন কোন মানুষের এটি আছে। ·· সব উল্লেখযোগ্য সাফল্যই প্রমাণ করে যে মানুষের মানা আছে······কোন মানুষের ক্ষমতার কারণ, তা রাজনৈতিক বা সামাজিক, যাই হোক না কেন, হল তার মানা। কোন ব্যক্তির যুদ্ধে সাফল্যের কারণ তার বাহুর স্বাভাবিক শক্তি নয়, তার চোখের ক্ষিপ্রগামিতা নয়, বা তার সম্পদের প্রাচুর্য নয় যা তাকে সাফল্য এনে দিয়েছে। সে অবশ্যই কোন আত্মার বা মৃত যোদ্ধার মানার অধিকারী, যা তাকে ক্ষমতাশালী করেছে এবং সেই ক্ষমতা এসেছে তার কাছে কোন কবচ বা পাথরের টুকরোর মধ্য দিয়ে, যেটি সে তার গলাতে ঝুলিয়ে দিয়েছে। যদি কোন লোকের শূয়োরের সংখ্যা বাড়তে থাকে বা তার মাঠে বেশী রাঙা আলু উৎপন্ন হয়; তার কারণ এই নয় যে সে পরিশ্রমী বা সে তার সম্পত্তির দেখাশোনা করে, বরং শুয়োর বা রাঙা আলুর জন্য এমন পাথর তার কাছে আছে যা মানায় পূর্ণ। মানার অনুপস্থিতিতে নৌকা দ্রুতগামী হবে না বা তীর কোন ক্ষত উৎপন্ন করবে না। যে

প্রাণীকে কোন আদিম সম্প্রদায় টোটেম্ রূপে গ্রহণ ক'রে তার উপাসনা ক'রে, সেই প্রাণীর মধ্যে যে শক্তি আছে বা সে প্রাণী যে পবিত্র তার কারণ তার মানা আছে এবং মানুষ যে সেই প্রাণীকে কোন ধর্মীয় অনুষ্ঠানে উৎসর্গ ক'রে তার মাংস আহার করে, তার কারণ হল ঐ মানার অধিকারী হবার ইচ্ছা।"

বিশপ কড্রিংটন বলেন, "মিলেনেশিয়ার অধিবাসীরা কোন পরমসত্তার ধারণার সঙ্গে পরিচিত ছিল না। তারা এমন একটা শক্তিতে বিশ্বাস করত যে শক্তি জাগতিক শক্তি থেকে সম্পূর্ণ পৃথক, যা কল্যাণ এবং অকল্যাণের জন্য সকল রকম উপায়ে ক্রিয়া করে এবং যার অধিকারী হওয়া এবং যাকে নিয়ন্ত্রণ করা একটা বড় রকমের সুবিধার ব্যাপার। এটা হল মানা। মানার সংজ্ঞা দিতে গিয়ে তিনি বলেন, 'এটা হল একটা ক্ষমতা বা প্রভাব, যা পার্থিব নয়, যা এক হিসেবে অপার্থিব কিন্তু যা জাগতিক শক্তির মধ্য দিয়ে নিজেকে প্রকাশ করে বা মানুষের অধিকারে রয়েছে এমন কোন ক্ষমতা বা শ্রেষ্ঠত্বের মধ্য দিয়ে যা আত্মপ্রকাশ করে'। মিলেনেশিয়ার অধিবাসীদের ধর্ম হল নিজের জন্য এই মানার অধিকারী হওয়া বা নিজের সুবিধার জন্য একে লাভ করা।" মানা হল এক বস্তুগত শক্তি, যার ধারণা ব্যক্তির মধ্যে সশ্রদ্ধ ভয় এবং বিস্ময়রূপ আবেগের প্রতিক্রিয়া উৎপন্ন করে। মানা কোন বৈশিষ্ট্য (property), গুণ quality) বা অবস্থা (state) হতে পারে।

কড্রিংটনের ব্যাখ্যা

[1]কিডরিংটনের উপরিউক্ত সংজ্ঞা ও বর্ণনা থেকে মানার তিনটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যেতে পারে—(১) মানা হল অলৌকিক শক্তি বা প্রভাব, কোন পার্থিব শক্তি নয়; (২) যদিও এটি নিজে নৈর্ব্যক্তিক, কোন জড় বস্তু যেমন একখণ্ড প্রস্তর বা এক টুকরো হাড় এর মাধ্যম হতে পারে এবং (৩) এটি ভাল মন্দ দু-ভাবেই ক্রিয়া করতে পারে, লোকের উপকারও করতে পারে, অপকারও করতে পারে।

যে-কোন ক্ষমতাশালী বা প্রভাবশালী ব্যক্তির সাফল্যের কারণ হল মানা। কোন ব্যক্তিকে প্রধান বা কর্তা মনোনীত করার কারণ তার যথেষ্ট মানা আছে এবং আত্মাদের কাছ থেকে সে মানা সংগ্রহ করতে সক্ষম। জীবিত অবস্থায় যে ব্যক্তি অনেক মানার অধিকারী হওয়ার জন্য খ্যাতনামা, মৃত্যুর পর অনেকে তার পূজা করে এই প্রত্যাশায় যে ঐ ব্যক্তি তার মানা দিয়ে তাদের সাহায্য করবে। কোন সাধারণ ব্যক্তি জীবনে প্রচুর মানার অধিকারী হতে না পারলে সম্মানলাভ করতে পারে না। সলোমান দ্বীপে উপাসনার প্রধান বিষয়বস্তু হল মৃত ব্যক্তিদের প্রেতাত্মা যাদের প্রচুর মানা ছিল।

1. **Encyclopaedia of Religion and Ethics ; Vol, VIII, Page 376.**

উন্নত সভ্যজাতির মধ্যেও এই জাতীয় বিশ্বাসের লক্ষণ দেখা যায়। অনেক ব্যক্তি মনে করে শশকের পায়ের পাতা তাদের সৌভাগ্য এনে দেবে। তারা বিশ্বাস করে যে শশকের পায়ের পাতা ঘরে থাকার জন্য জাগতিক শক্তির তুলনায় কোন মনস্তাত্ত্বিক শক্তি তাদের উপর কল্যাণজনকভাবে ক্রিয়া করবে।

রাইট (*Wright*) বলেন, "কাজেই মানা হল একটি অনির্দিষ্ট পদ (indefinite term)। এটি মানুষ এবং আত্মার সঙ্গে সংযুক্ত, তবু এটিকে তাদের থেকে স্বতন্ত্র করা যায়।"

সর্ব প্রাণবাদ-পূর্ববর্তী ধর্ম হল অলৌকিক শক্তির উপস্থিতিতে সশ্রদ্ধ ভয়, রহস্য এবং বিস্ময়ের বোধ—যে শক্তি সর্বত্র ছড়িয়ে আছে, কিন্তু যাকে অপরিমেয়ভাবে কেন্দ্রীভূত করা যায়। এইখানেই এমন এক মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায় যা ধর্মকে তার উপাদান যুগিয়ে দেয়। সর্বপ্রাণবাদের তুলনায় ধর্মের এই উৎপত্তির ব্যাখ্যা প্রাচীনতর এবং সর্বপ্রাণবাদের তুলনায় এই মতবাদের কালিক পূর্বগামিতা বর্তমান। বস্তুতঃ ধর্মোৎপত্তির ব্যাখ্যা সম্বন্ধীয় এই মতবাদকে সর্বপ্রাণবাদের ভিত্তি বলে গ্রহণ করা যেতে পারে। কেননা যেসব শক্তির প্রতি মানুষের সশ্রদ্ধ ভয়ের উদ্রেক হয়, আত্মা সেই জাতীয় শক্তিগুলির মধ্যে একরূপ শক্তি।

ডঃ মেরেট (*Dr. Marett*)-এর মতে, মানা (*Mana*) এবং অলঙ্ঘন (tabu)—এই দুই ধারণাকে একত্র যুক্ত করলে সর্বপ্রাণবাদ পূর্ববর্তী ধর্মের প্রাথমিক অবস্থার সূত্রটি পাওয়া যেতে পারে। মানা হল অলৌকিকতার সদর্থক দিক এবং অলঙ্ঘনের বিষয়টি তার নঞর্থক দিক অর্থাৎ যা অলৌকিক তাকে লঙ্ঘন বা অবহেলা করা চলবে না।

মেরেটের অভিমত

[1]এডওয়ার্ডস্ বলেন, "ধর্মের উৎপত্তির স্তরে ধর্ম হল বস্তু, ব্যক্তি এবং ঘটনার মধ্যে প্রকাশমান বর্ণনাতীত এবং ধারণাতীত অপ্রাকৃতিক শক্তির উপস্থিতিতে তার প্রতি সশ্রদ্ধ ভয় এবং রহস্যের বোধ এবং সেই শক্তির সঙ্গে সদর্থকভাবে ও নঞর্থকভাবে সামঞ্জস্য বিধানের জন্য মানুষের প্রচেষ্টা, যাতে মানুষ তার জীবনে কতকগুলি অনুভূত প্রয়োজনকে পরিতৃপ্ত করতে পারে।" কাজেই দেখা যাচ্ছে যে, ধর্মের উৎপত্তি সম্পর্কে নৃবিজ্ঞানের ব্যাখ্যায় মনস্তত্ত্বের বিষয় এসে পড়ে—কেননা এই মতবাদ ধর্মের উৎপত্তির ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে বাহ্য ঘটনা, আচার, রীতিনীতি, ধর্মীয় অনুষ্ঠান প্রভৃতির তুলনায় ব্যক্তির আভ্যন্তরীণ আবেগ ও প্রতিক্রিয়ার উপর অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করে।

1. The Philosophy of Religion ; Page 47.

জাদু এবং ধর্ম (Magic and Religion) : জাদু এবং ধর্মের সম্বন্ধ নিরূপণ করতে হলে প্রথমে ধর্মের স্বরূপ সম্পর্কে অবহিত হবার প্রয়োজন আছে। ধর্ম বলতে আমরা বুঝি "এমন এক বা একাধিক সত্তায় মানুষের বিশ্বাস যে তার থেকে অনেক শক্তিশালী ও তার ইন্দ্রিয়ের অনধিগম্য অথচ তার আবেগ ও কাজের প্রতি উদাসীন নয় এবং যে বিশ্বাসের সঙ্গে যুক্ত হয়ে আছে তার অনুভূতি ও কার্য।" আদিম মানুষের কাছে জাদুর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল কোন এক ধরনের নৈর্ব্যক্তিক শক্তির ধারণা যাকে উপযুক্ত পদ্ধতির মাধ্যমে প্রয়োগ করে সে নিজের কোন উদ্দেশ্য সিদ্ধ করতে সক্ষম বলে বিশ্বাস করত। এই প্রসঙ্গে রাইট (*Wright*) বলেন, "আদিম মানুষ জাদু বলতে কি বুঝত, সেই সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা পাওয়া যাবে জাদুর এমন কোন যুক্তিবিজ্ঞানসম্মত সংজ্ঞা দেওয়া অসম্ভব বলেই মনে হয়। কারণ আদিম মানুষ জাদু প্রয়োগ করলেও যৌক্তিকভাবে সে জাদুর কথা কখনও চিন্তা করেনি। যে ধারণা মোটেও যৌক্তিক (logical) নয় তার যুক্তিবিজ্ঞানসম্মত সংজ্ঞা দেবার চেষ্টা না করে, তার বর্ণনা দেওয়াই যুক্তিসঙ্গত"।

ধর্ম ও জাদুর স্বরূপ

জাদুর যুক্তিবিজ্ঞান-সম্মত সংজ্ঞা দেবার অসুবিধা

[1]জাদুর একটি দৃষ্টান্ত গ্রহণ করে জাদুর স্বরূপকে বুঝে নেওয়া যেতে পারে। আদিম নরনারীদের মধ্যে অনেকে বিশ্বাস করত যে কোন ব্যক্তির দেহের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত কোন বস্তুর উপর ক্রিয়া করলে ব্যক্তির উপর প্রভাব বিস্তার করা যায়। জাদুকর যদি কোন ব্যক্তির মস্তিষ্কের কর্তিত কেশগুচ্ছ হস্তগত করতে পারে, তাহলে ইচ্ছা করলে, সে ঐ ব্যক্তির ক্ষতি সাধন করতে পারে।

---

1. রাইট জাদুর উৎপত্তির মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা দেবার চেষ্টা করেছেন।

প্রথমতঃ, আবেগের স্বাভাবিক এবং স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশের মধ্য দিয়ে জাদুর উৎপত্তি হতে পারে। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে যে, কোন এক বিশেষ আদিম সম্প্রদায়ের পুরুষেরা যখন অন্য কোন সম্প্রদায়কে আক্রমণে রত, তখন সেই সম্প্রদায়ের স্ত্রীলোকেরা চিন্তা ও উদ্বেগ দূর করার জন্য একত্রিত হয়ে নাচতে থাকে। দ্বিতীয়তঃ, ধারণার অনুষঙ্গ (association of ideas)। ঐ স্ত্রীলোকেরা যখন পুরুষদের কোন আক্রমণের কথা বলতে শোনে, তখন তারা একত্রিত হয়ে নাচের কথা চিন্তা করে। আক্রমণের সঙ্গে নাচের ব্যাপারটি তাদের মনে স্বাভাবিকভাবে অনুষঙ্গবদ্ধ হয়ে গেছে। তৃতীয়তঃ, কাকতালীয় দোষ (fallacy of post hoc ergo proper hoc) জাদুর বিষয়টিকে সম্পূর্ণ করে তোলে। যখন পুরুষেরা শত্রুপক্ষকে আক্রমণে রত ছিল তখন স্ত্রীলোকেরা নৃত্য করেছিল এবং ঐ পুরুষেরা আক্রমণে সাফল্য লাভ করেছিল। কাজেই সিদ্ধান্ত করা হল যে, যেহেতু স্ত্রীলোকেরা নৃত্য করেছিল সেহেতু পুরুষেরা সফলতা লাভ করেছিল। সুতরাং এটা একটা রীতি হয়ে দাঁড়াল যে আক্রমণের সাফল্যকে সুনিশ্চিত করার জন্য স্ত্রীলোকেরা প্রতিবারেই সেই সময় অবশ্যই নৃত্য করবে।

নৃতত্ত্ববিদ্‌রা জাদু এবং ধর্মের সম্বন্ধ নিয়ে অনেক সময়ই আলোচনা করেছেন এবং ধর্মের উৎপত্তি ও প্রকৃতি নিরূপণের সমস্যার উপর এই সম্বন্ধের প্রশ্নটির যথেষ্ট গুরুত্ব বর্তমান।

উভয়ের সাদৃশ্য

জাদু ও ধর্মের মধ্যে এক বিষয়ে সাদৃশ্য বর্তমান। উভয়ই মানুষের থেকে স্বতন্ত্র কোন অপ্রতক্ষ্যগোচর শক্তির অস্তিত্ব পূর্ব থেকে অনুমান করে নেয়। কিন্তু নানা বিষয়ে উভয়ের মধ্যে পার্থক্য আছে। জাদু ঐ অপ্রত্যক্ষগোচর শক্তিকে যান্ত্রিকভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে চায়, যা ধর্ম করে না। ধর্ম মনে করে ঐ অপ্রত্যক্ষগোচর শক্তি ভক্ত বা উপাসকের ভক্তি ও পূজা দাবী করে এবং প্রকৃতই পূজা পাবার যোগ্য। জাদুর মধ্যে আছে একটা গোপনতার ভাব। ধর্ম হল সামাজিক। ধর্ম সমাজের সমন্বয়-সাধক শক্তি রূপে ক্রিয়া করে। জাদু হল ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যমূলক (individualistic), অসামাজিক, এমন কি সমাজবিরোধী বললেও অত্যুক্তি হয় না। সামাজিক মূল্যের সঙ্গে জাদুর বিশেষ কোন সম্পর্ক নেই, বরং বলা যেতে পারে জাদু ঐ মূল্যের প্রতি উদাসীন। কিন্তু ধর্মের সঙ্গে মূল্যের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বর্তমান। জাদুর ক্ষেত্রে ব্যক্তি উপাস্যের কাছে নিজেকে জাহির করতে চায়। কিন্তু ধর্মের ক্ষেত্রে ব্যক্তি উপাস্যের কাছে নিজেকে আত্মসমর্পণ করেই খুশী। জেম্‌স ফ্রেজার (*James Frazer*)-এর অভিমতানুসারে ধর্মের মনোভাব হল উচ্চতর শক্তির উপস্থিতিতে ভক্তের মধ্যে বিনয়ের ও বশ্যতা-স্বীকারের মনোভাব। জাদুর মধ্যে রয়েছে অহংকারপূর্ণ স্বয়ং-সম্পূর্ণতার ও ঔদ্ধত্যের মনোভাব। উভয়েরই সম্পর্ক বিশ্বজগতের রহস্যময় বিস্ময়জনক শক্তিকে নিয়ে। কিন্তু জাদু তাদের নিজের কাজে ব্যবহারের জন্য বাধ্য করতে চায়। কিন্তু ধর্ম পূজা, প্রার্থনা, উপাসনা প্রভৃতির মাধ্যমে ঐ শক্তিকে প্রসন্ন করে তার অনুগ্রহ লাভের জন্য সচেষ্ট হয়। যে শক্তিগুলিকে জাদু নিয়ন্ত্রণ করতে চায়, সেইগুলি হল প্রধানতঃ নৈর্ব্যক্তিক, নামহীন, অনৈতিক। ধর্ম ঐ শক্তিগুলিকে ইচ্ছা-সমন্বিত পুরুষ (person) রূপে কল্পনা করে এবং মনে করে যে উৎসর্গ, প্রার্থনা, শ্রদ্ধা, ভক্তি প্রভৃতির মাধ্যমে তাদের শুভেচ্ছালাভ করা সম্ভব হবে।

উভয়ের অসাদৃশ্য

ফ্রেজারের অভিমত

অন্তর্নিহিত প্রবণতা এবং পরিণতি, উভয় দিক থেকে বিচার করলে জাদু ও ধর্মের উপরিউক্ত পার্থক্যসূচক বৈশিষ্ট্যগুলিকে অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু একথা মনে রাখা দরকার যে, এই বিশ্ব-জগতের রহস্যময় শক্তি সম্পর্কে মানবীয় অভিজ্ঞতার মধ্যেই উভয়ের মূল নিহিত। ই. সি. হার্টল্যাণ্ড (*E. C. Hartland*) তাঁর 'Ritual and

Belief' গ্রন্থে ধর্ম ও জাদুর সম্পর্ক নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। তাঁর মতে ধর্ম ও জাদুর মূলে রয়েছে এক ও অভিন্ন বিষয়।

আরনল্ড ভন্ গিনিপ (*Arnold Van Gennep*) ধর্ম-জাদুকে এক অবিভাজ্য সমগ্র (an indivisible whole) রূপে গণ্য করেছেন। তিনি কেবলমাত্র তার তাত্ত্বিক দিক এবং ব্যবহারিক ক্রিয়ার মধ্যে পার্থক্য করেছেন—প্রথমটিকে ধর্ম এবং দ্বিতীয়টিকে জাদু বলে অভিহিত করেছেন।

তাছাড়া আদিম নরনারীর ধর্মের সঙ্গে জাদু যে বিশেষভাবে সম্পর্কযুক্ত ছিল, এই সিদ্ধান্তকে অনেকে সমর্থন করেছেন। আদিম নরনারীর অনেক ধর্মানুষ্ঠানের সন্ধান পাওয়া যায়, যার মধ্যে জাদুর উপাদান দেখতে পাওয়া যায়। [1]রাইট বলেন, "অন্যান্য সুসংহত মানবীয় ক্রিয়ার তুলনায় ধর্মের ক্ষেত্রে জাদু অধিককাল ধরে স্থায়ী হয়। কারণ, মানুষ ধর্মের ক্ষেত্রে তার বিচারবুদ্ধিকে প্রয়োগ করতে দ্বিধা করে এই ভেবে যে, সতর্ক অনুসন্ধান ও জিজ্ঞাসার বিষয়রূপে ধর্ম পূত ও অলঙ্ঘনীয়।"

রাইটের মন্তব্য

জাদু এবং ধর্মের সম্বন্ধকে কেন্দ্র করে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন দেখা দেয়। সেটি হল উভয়ের মধ্যে **কোনটির আবির্ভাব অপরটির পূর্বে ঘটেছে? জাদু আগে, ধর্ম পরে, না ধর্ম আগে জাদু পরে?** কালের দিক থেকে কোন্‌টি অপরটির পূর্ববর্তী? এই সম্পর্কে তিনটি অভিমত পাওয়া যায়।

(১) প্রথম অভিমত অনুযায়ী ধর্মের আবির্ভাব জাদুর পূর্বে ঘটেছে। ডক্টর জেভন্‌স (*Dr. Jevons*)-এর মতে জাদুতে বিশ্বাস জাগ্রত হবার বহু পূর্বে মানুষের অলৌকিকতায় বিশ্বাস জাগ্রত হয়েছে এবং ধর্মের বিবর্তনে জাদু হল ধর্মের অবনয়ন (degradation), অর্থাৎ ধর্মের উৎকর্ষের হানি ঘটেছে এমন এক অবস্থা। কিন্তু খুবই অসঙ্গতিপূর্ণ বলে মনে হয় যখন জেভন্‌স উপরিউক্ত অভিমতের বিরোধী অভিমত প্রকাশ করেছেন এই বলে যে, ধর্ম ও জাদুর উৎপত্তি ভিন্ন ভিন্ন ভাবে ঘটেছে এবং স্বরূপতঃ উভয়ে পরস্পরের থেকে স্বতন্ত্র।

ধর্ম জাদুর পূর্ববর্তী

সমালোচনায় বলা যায় যে, দুটি বিষয় স্বরূপতঃ পৃথক হলে একটির আর একটি থেকে উদ্ভূত হবার বিষয়টি যুক্তিসঙ্গত মনে হয় না। তাছাড়া, আধুনিক নৃতত্ত্ববিদদের মধ্যে এই অভিমতের সমর্থন বড় একটা দেখা যায় না। একথা সত্য যে, বিবর্তন মানেই প্রগতি (development) নয়। তবু এরূপ অনুমান যুক্তিসঙ্গত মনে হয় যে, ধর্ম প্রথম

1. W. K. Wright: A Student's of Philosophy of Religion, Page 53

স্তরে ছিল একান্তই স্থূল এবং সেই অবস্থায় ধর্ম ও জাদুর মধ্যে পার্থক্য করা কঠিন হত এবং সেই কারণে উভয়কে অভিন্ন গণ্য করা হত।

(২) দ্বিতীয় অভিমত অনুসারে ধর্মের আগে জাদুর আবির্ভাব ঘটেছিল এবং প্রথমটি থেকেই কোন-না-কোন ভাবে দ্বিতীয়টির উদ্ভব ঘটেছে। স্যার জেম্‌স ফ্রেজার[1] (*Sir James Frazer*) এই অভিমতের সমর্থক। তাঁর মতে ধর্মের উৎপত্তিতে জাদুর অবদান সদর্থক নয়, নঞর্থক। চিন্তার বিবর্তনের পথে বুদ্ধির নিম্নতর স্তর হিসেবে জাদুর আবির্ভাব সর্বত্রই ধর্মের পূর্বে ঘটেছে।

জাদু ধর্মের পূর্ববর্তী

ধারণার অনুষঙ্গের নিয়ম (laws of the association of ideas) বিশেষ করে সাদৃশ্য অনুষঙ্গ এবং স্থানকালের অনুষঙ্গ সম্বন্ধীয় নিয়মগুলির অপপ্রয়োগ হল জাদু[2]। জাদুর ব্যর্থতা সম্পর্কে মানুষ যখনই সচেতন হল তখনই সে অপ্রত্যক্ষগোচর শক্তির অনুগ্রহ লাভের জন্য ধর্মের আশ্রয় গ্রহণ করল। এইভাবে জাদুর যুগ বিদায় নিল এবং ধর্মের যুগ শুরু হল। মানুষ উপলব্ধি করল যে তার অভীষ্ট সিদ্ধির পথে জাদু পুরোপুরি ব্যর্থ এবং হতাশাব্যঞ্জক। জাদু এবং ধর্ম, এই দুয়ের মনোভাব পরস্পরবিরুদ্ধ; এদের সম্পর্ক তেল ও জলের সম্পর্কের অনুরূপ; এরা কখনও মিশে যায় না। কাজেই জাদু ও ধর্মের মধ্যে যখন স্বরূপতঃ বিরোধিতা বর্তমান তখন ধর্মের পক্ষে জাদুর কাছ থেকে নঞর্থক ছাড়া কোন সদর্থক অবদান প্রত্যাশা করা ঠিক নয়। সব জাদুই মিথ্যা এবং শূন্যগর্ভ। সংক্ষেপে বলা যেতে পারে যে, জাদু সম্পর্কে মানুষের হতাশা ও ব্যর্থতার বোধ থেকেই ধর্মের উৎপত্তি।

সমালোচনায় বলা যেতে পারে যে, ফ্রেজারের মতবাদে সত্যতার উপাদান থাকলেও, যেভাবে ফ্রেজার তাঁর অভিমতটিকে উপস্থাপিত করেছেন, ঠিক সেই রূপে অভিমতটিকে গ্রহণ করা চলে না। এই মতবাদ বড় বেশী বুদ্ধিবাদী বা যুক্তিধর্মী। এই মতবাদে আদিম মানুষের জীবনে চিন্তনের প্রাধান্যকে স্বীকার করা হয়েছে, কিন্তু পরিবেশের প্রতি তার স্বতঃস্ফূর্ত আবেগময় প্রতিক্রিয়ার বিষয়টিকে উপেক্ষা করা হয়েছে। জাদু ও ধর্মের স্বরূপতঃ পার্থক্যকে স্বীকার করে নেওয়া হলেও ধর্মের উৎপত্তির স্তরে, আদিম মানুষ, জাদু ও ধর্মের পার্থক্য সম্পর্কে সুস্পষ্টভাবে সচেতন ছিল এইরূপ সিদ্ধান্ত করলে কালাসঙ্গতি দোষ (anachronism)

সমালোচনা

1. J. Frazer: "...in the evolution of thought, magic as representing a lower intellectual stratum has probably everywhere preceded religion."—Golden Bough: 'The Magic Art'. Vol. 1, PP. 220—243 (3rd ed. 1911)

2. ৪৫ পৃষ্ঠার পাদটীকা দ্রষ্টব্য

দেখা দেবে। ইতিহাসের বিবর্তনের পথে অনেক বিলম্বে মানুষ তার উচ্চতর বিশ্লেষণিক ক্ষমতাকে প্রয়োগ করে এই পার্থক্য সম্পর্কে সচেতন হয়েছিল। আদিম মানুষ ছিল অতিমাত্রায় বিশ্বাসপ্রবণ, কাজেই তার পক্ষে জাদু ও ধর্মের পার্থক্য সম্পর্কে সচেতন হওয়া কখনই সম্ভব ছিল না। ফ্রেজার জাদু ও ধর্মের সম্পর্ককে তেল ও জলের সম্পর্ক মনে করলেও আদিম সমাজে শুধু যে এ দুটির একত্র মিশ্রণ লক্ষ্য করা যেত তা নয়, যেন এক অন্তর্নিহিত ঐক্য নিয়ে উভয়ে বিরাজ করত। এই মতবাদ ধর্মের উৎপত্তির নেতিবাচক ব্যাখ্যা দেয়, অর্থাৎ জাদুর ব্যর্থতার কথা ব্যক্ত করে। কিন্তু ধর্মের মূলে মানুষের কোন্ উদ্দেশ্য বর্তমান সেই সম্পর্কে কিছু বলে না।

জাদু ও ধর্মের স্বাধীন-ভাবে উদ্ভব ঘটেছে

(৩) তৃতীয় অভিমত অনুসারে বিশ্বজগতের রহস্যময় শক্তিগুলি সম্পর্কে মানুষের অভিজ্ঞতাতেই জাদু ও ধর্মের মূল নিহিত, কিন্তু মানুষের বিবর্তনের পথে তাদের পারস্পরিক অসঙ্গতির বিষয়টি আত্মপ্রকাশ করে যা শেষ পর্যন্ত সক্রিয় বিরোধিতার রূপ গ্রহণ করে। উভয়ই স্বতন্ত্র এবং স্বাধীন ভাবে উভয়ের উদ্ভব ঘটেছে। একটি আর একটি থেকে উদ্ভূত হয়নি।

এই মতবাদটিই সন্তোষজনক মনে হয়। ধর্মের ও জাদুর মধ্যে পার্থক্যের বিষয়টি খুবই সুস্পষ্ট। জাদু উচ্চতর শক্তিকে নিজের কাজে লাগাবার জন্য বাধ্য করতে চায়; ধর্ম চায় তার তুষ্টিবিধান করে তার অনুগ্রহ লাভ করতে। ধর্ম সামাজিক, জাদু ব্যক্তিনির্ভর। এই প্রসঙ্গে দুরখীমের[1] (*Durkheim*) উক্তিটি খুবই উল্লেখযোগ্য। তিনি বলেন, "জাদুর কোন গীর্জা নেই, জাদুর মক্কেল আছে, গীর্জা নেই; অপরপক্ষে ধর্মকে গীর্জার ধারণা থেকে বিচ্ছিন্ন করা চলে না।"

ধর্ম ও জাদুর পার্থক্য অবশ্যই স্বীকার্য। কিন্তু যে আদিম মানুষের মন ছিল অজ্ঞানতার অন্ধকারে আচ্ছন্ন, তার মনে উভয়ের পার্থক্য সম্পর্কে কোন চেতনা ছিল না। বরং মায়েল এডওয়ার্ডস্-এর সঙ্গে একমত হয়ে বলা যেতে পারে যে, তার কাছে ধর্ম ও জাদু ছিল অভিন্ন এবং মানসিক দিক থেকে অবিচ্ছিন্ন প্রক্রিয়া। আমরা

আদিম মানুষের কাছে ধর্ম ও জাদু ছিল অভিন্ন প্রক্রিয়া

এভাবে চিন্তা করতে পারি যে, একই অবস্থা থেকে ধর্ম ও জাদুর উদ্ভব। মানুষের বেঁচে থাকার সংগ্রামে অপ্রত্যক্ষগোচর শক্তি নিয়ে মানুষের পরীক্ষণের এবং তার চারপাশের রহস্যময় শক্তিকে কাজে লাগাবার প্রচেষ্টার পরিণতি হল ধর্ম ও জাদু। মিলেনেশিয়ার অধিবাসী তার চারপাশে মানার উপস্থিতি লক্ষ্য করে। সে তার উদ্দেশ্য সিদ্ধ

1. E. Durkheim ; Elementary Forms of the Religious Life (E. Tr.) ; Page 44

করবার জন্য এই মানাকে বাধ্যতামূলক শক্তির দ্বারা কাজে লাগাতে পারে বা সে প্রার্থনা ও উৎসর্গের মাধ্যমে সেই ঐশ্বরিক শক্তির কাছে আবেদন জানাতে পারে, যিনি প্রচুর পরিমাণে ঐ মানার অধিকারী। প্রথমটিতে জাদুর মনোভাব ও শেষেরটিতে ধর্মের মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে। প্রাচীনকালে মানাকে লাভ করার এই দুই পদ্ধতির মধ্যে পার্থক্য করা খুবই কঠিন ছিল।

কাজেই এই সিদ্ধান্ত করা যেতে পারে, ধর্ম ও জাদু প্রথম থেকেই ছিল পরস্পর স্বতন্ত্র—নীতিগতভাবে ও পদ্ধতির বিচারেই স্বতন্ত্র। তবু আদিম মানুষের পরিবেশের প্রতি আবেগগত প্রতিক্রিয়া এবং জীবন-সংগ্রামে জগতের অপ্রত্যক্ষগোচর শক্তিগুলিকে নিয়ে তার খেয়ালখুশীমত পরীক্ষণের মধ্যেই ধর্ম ও জাদুর উৎসটি নিহিত।

সিদ্ধান্ত

(খ) মনস্তাত্ত্বিক মতবাদ (Psychological Theories)—এবার আমরা মনোবিজ্ঞানের দিক থেকে ধর্মের উৎপত্তির প্রশ্নটি আলোচনার চেষ্টা করব। প্রশ্ন হল, মানুষ কেন ধর্মপ্রবণ? মানুষের আন্তর জীবনের সেই উপাদানগুলি কি, যেগুলি তাকে ধর্মভাবাপন্ন করে তুলেছে? তার আধ্যাত্মিক সংগঠনের মধ্যে এমন কী আছে যার জন্য ধর্মের মধ্যে সে তার পরিতৃপ্তি খুঁজে পেয়েছে? অসংখ্য যুগ ধরে যে মানুষ ধর্মভাবাপন্ন রয়েছে, সেই মনস্তাত্ত্বিক উপাদানগুলি কি যেগুলি ধর্মের স্থূল রূপ থেকে তার সূক্ষ্ম উন্নত রূপের বিকাশের বিষয়টিকে ব্যাখ্যার পক্ষে উপযোগী? ধর্মের উৎপত্তি এবং তার বিকাশের মধ্যে এক মনস্তাত্ত্বিক ধারাবাহিকতা বর্তমান। ধর্মীয় বিবর্তনের সমগ্র প্রক্রিয়ার মূলে বর্তমান মানুষের ধর্মীয় চেতনার ঐক্য। ধর্মের অসংখ্য বিচিত্র প্রকাশের মধ্যে মনস্তাত্ত্বিক অভিন্নতা লক্ষ্য করা যায়। ধর্মের বিকাশ সমগ্র প্রক্রিয়ার ঐক্য এবং নিরবচ্ছিন্নতার মধ্যে থেকেই ঘটে থাকে। কাজেই মানুষের প্রকৃতির মধ্যে এমন কি আছে যা তাকে ধর্মপ্রবণ করে তুলেছে? তার আভ্যন্তরীণ জীবনের মধ্যে কোথায় ধর্মের উৎস খুঁজে পাওয়া যাবে?

মনোবিজ্ঞানের দিক থেকে ধর্মসংক্রান্ত বিভিন্ন প্রশ্ন

এই সব প্রশ্নের কতকগুলি উত্তর দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এইগুলি স্পষ্টতঃই অসন্তোষজনক।

(i) প্রথমতঃ, বলা হয়েছে যে, **মানুষ ধর্মপ্রবণ কেননা মানুষের মধ্যে ধর্মসম্বন্ধীয় এক সহজাত প্রবৃত্তি** (religious) instinct) **বর্তমান**।

সমালোচনা: ধর্মের উৎপত্তির এই মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা ধর্মের উৎপত্তিকে ব্যাখ্যা করার এক সহজ উপায়। বস্তুতঃ, এ হল যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা দেবার চেষ্টা না করে,

তাকে এড়িয়ে যাবার চেষ্টা। এ হল যে বিষয়টিকে প্রমাণ করতে হবে তাকে পূর্ব থেকে স্বীকার করে নেওয়া। মানুষ কেন ধর্মপ্রবণ, কেননা তার মধ্যে ধর্ম প্রবণতার সহজাত প্রবৃত্তি রয়েছে। এ হল ধর্মের মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা দেবার সমস্যার এক সহজ সমাধান খুঁজে বার করা। মানুষের কোন আচরণের ব্যাখ্যায় তার জন্মগত প্রবৃত্তিকে টেনে নিয়ে আসা হল ব্যাখ্যার মধ্যে পুনরুক্তি দোষ ঘটান, অর্থাৎ কিনা বলা, বিষয়টি কেন এমন, যেহেতু সেটা তাই। তাছাড়া সহজাত প্রবৃত্তির অস্তিত্ব স্বীকার করা হলেও, সমালোচকদের মতে, সহজাত প্রবৃত্তির সংখ্যা অনির্দিষ্টভাবে এবং অপ্রয়োজনীয়ভাবে বৃদ্ধি করা যুক্তিসঙ্গত নয়। সহজাত প্রবৃত্তি বলতে মনোবিজ্ঞানীরা বোঝেন 'পূর্ব-অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর না করে কোন বিশেষ ধরনের বস্তু বা ঘটনার প্রতি বিশেষ ভাবে প্রতিক্রিয়া করার জন্য জন্মগত শিক্ষানিরপেক্ষ প্রবণতা।' কিন্তু ধর্ম কোন বিশেষ ধরনের অভিজ্ঞতার প্রতি কোন বিশেষ ধরনের সরল প্রতিক্রিয়া নয়। ধর্ম হল ম্যাকডুগাল (*McDougall*)-এর ভাষায় একাধিক সহজাত প্রবৃত্তির সহযোগিতায় উৎপন্ন এক অতি জটিল এবং বিচিত্র বিষয়, যা বিচিত্র ধরনের আচরণের মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ করে। যদি 'সহজাত প্রবৃত্তি' পদটিকে ব্যাপক অর্থে গ্রহণ করা হয়, এই অর্থে যে, সহজাত প্রবৃত্তি হল মানুষের প্রকৃতির একটা স্বাভাবিক এবং স্বভাবজাত প্রবণতা, তাহলে অবশ্য ধর্মকে সহজাত প্রবৃত্তিরূপে গণ্য করা যেতে পারে।

সমালোচনা।

সহজাত প্রবৃত্তির স্বরূপ

যাঁরা বলেন ধর্মপ্রবণতার মূলে রয়েছে ধর্মীয় সহজাত প্রবৃত্তি, তাঁদের বক্তব্যের মধ্যে এই সত্যতাটুকু নিহিত আছে যে, ধর্মের মূল মানুষের প্রকৃতির মধ্যে গভীরভাবে নিহিত। কিন্তু ধর্মীয় প্রবণতা মানুষের প্রকৃতির কোন একটি সরল উপাদান নয়, যাকে বিশ্লেষণের মাধ্যমে আবিষ্কার করা যায়, কিন্তু যাকে আর বিশ্লেষণ করা যায় না। মায়েল এডওয়ার্ডস বলেন, "আদর্শমূলক লক্ষ্য অনুসরণের জন্য আমাদের সত্তার মধ্যে অবস্থিত মৌলিক সহজাত প্রবৃত্তি এবং আবেগের সংশ্লেষণমূলক সংগঠন হল ধর্ম। আসলে এই জাতীয় সংশ্লেষণ আমাদের প্রকৃতির একটা মৌলিক এবং স্থায়ী চাহিদার প্রকাশ এবং সেহেতু কেউ যদি একথা বলে মানুষ ধর্মপ্রবণ কেননা মানুষের জন্মগত ধর্মপ্রবৃত্তি রয়েছে, তাহলে এ হবে একটি জটিল বিষয়ের সহজ ব্যাখ্যা দেবার প্রচেষ্টা।"

এই মতবাদের মধ্যে নিহিত সত্য

এডওয়ার্ডস-এর মন্তব্য

(ii) দ্বিতীয় যে ব্যাখ্যাটি দেওয়া হয় সেটা হল, **মানুষ ধর্মপ্রবণ, কেননা মানুষের একটা ধর্মীয় বৃত্তি** (religious faculty) **আছে।**

সমালোচনা : এও হল বিশেষ একটা বৃত্তির উদ্ভাবন করে ধর্মপ্রবণতাকে সহজভাবে ব্যাখ্যা করার প্রচেষ্টা। মন থেকে স্বতন্ত্রভাবে ক্রিয়া করছে এমন একটা ধর্মীয় বৃত্তির কল্পনা করা, মানুষের মনের মৌলিক ঐক্যের বিষয়টিকে উপেক্ষা করার সামিল। মানুষের মনকে কয়েকটি স্বতন্ত্র বিভাগ রূপে কল্পনা করা এবং এক একটি বিভাগ অপরের থেকে স্বতন্ত্র হয়ে ক্রিয়া করছে এই জাতীয় ধারণা সর্বতোভাবে অবিজ্ঞানোচিত। ধর্মীয় অভিজ্ঞতা সেই সব উপাদানের দ্বারা গঠিত যার দ্বারা আমাদের জীবনের অবশিষ্ট সচেতন অভিজ্ঞতাগুলি গঠিত এবং ধর্মমনোবিজ্ঞান (psychological religion) সেই সব মানবীয় উপাদান নিয়ে আলোচনা করে, যা নিয়ে মনোবিজ্ঞান সাধারণভাবে আলোচনা করে। মানুষের মনস্তাত্ত্বিক প্রকৃতির কোন অংশকেই ধর্মীয় বলে পৃথক করা চলে না এই অর্থে যে, কেবল মাত্র এই অংশটিই ব্যক্তির ধর্মীয় জীবনে ক্রিয়া করে।

সমালোচনা

(iii) তৃতীয় যে ব্যাখ্যাটি দেওয়া হয় তাহল, **ধর্মীয় চেতনার উৎস হল একটি প্রাথমিক আবেগ, যা হল ভয়** (fear)। এপিকিউরিয়ান দর্শন সম্প্রদায় এবং লুক্রিটিয়াস (Lucretius), যাঁরা ধর্মকে কুসংস্কারের সঙ্গে অভিন্ন মনে করতেন, এই মতবাদের সমর্থক। দার্শনিক হিউমও উপরিউক্ত অভিমতের একজন সমর্থক। তিনিও মনে করতেন যে ধর্মীয় ক্রিয়ার মূলে রয়েছে ভয়। তবে তিনি ধারণা করেছিলেন এই ভয়ের সঙ্গে যুক্ত ছিল দেবতাদের শুভেচ্ছা লাভের আকাঙ্ক্ষা। সাম্প্রতিক মনোবিজ্ঞানী রিবট (*Rib t*, এই মতবাদেব একজন সমর্থক।

সমালোচনা : এই মতবাদের স্বপক্ষে একথা বলা যেতে পারে যে, এই মতবাদ ধর্মের উৎপত্তি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বাহ্য জগতের কোন বস্তু, বা উপজাতীয় রীতি প্রভৃতিকে ধর্মের উৎপত্তির কারণরূপে নির্দেশ না করে, মানুষের মনস্তাত্ত্বিক প্রকৃতিকে ধর্মের ভিত্তিরূপে গণ্য করেছেন। কিন্তু ধর্মের উৎপত্তির মূলে ভয়—এই মতবাদ নানা কারণে সমর্থনযোগ্য নয়।

মতবাদের গুণ

একথা অস্বীকার করা যায় না যে, রহস্যময় প্রাকৃতিক শক্তিগুলি সম্পর্কে একটা অস্পষ্ট ভীতির ভাব আদিম নর-নারীর মনে জেগেছিল এবং সেই কারণে তারা তাদের চারপাশের প্রতিকূল শক্তিগুলিকে নিজেদের অনুকূলে আনার জন্য, তাদের প্রসন্ন করার জন্য নানাধরনের আচার-অনুষ্ঠান পালন করত। ধর্মসম্বন্ধীয় ক্রিয়ার মূলে অকল্যাণকর দেব-দেবী সম্পর্কে ভয়ের ভাব বর্তমান ছিল। কিন্তু 'ভয়' এই সরল আবেগের সাহায্যেই ধর্মের যথাযথ ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভব নয়। ধর্মের উন্নত রূপগুলিতে যেখানে

ভয়ের তুলনায় বিস্ময়, শ্রদ্ধা, কৃতজ্ঞতা, প্রশংসা প্রভৃতির উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়, সেইগুলিকে ভয়, এই আবেগের সাহায্যে ব্যাখ্যা করা যায় না। প্রকৃতির রহস্যময় শক্তিগুলি মানবমনে যে শ্রদ্ধামিশ্রিত ভয়ের ভাব জাগিয়ে তোলে তাকে প্রাথমিক ধর্মীয় আবেগ বলে গণ্য করা যায়। কিন্তু ভয় (fear)-কে শ্রদ্ধামিশ্রিত ভয় (awe)-এর সঙ্গে অভিন্ন করে দেখা কোন মতেই যুক্তিসঙ্গত নয়, যদিও শ্রদ্ধামিশ্রিত ভয়ের মধ্যে ভয়ের উপাদান বর্তমান। শ্রদ্ধামিশ্রিত ভযের মধ্যে ভয় ছাড়াও বিস্ময়, প্রশংসা, আগ্রহ, শ্রদ্ধা, এমনকি ভালবাসা বা অনুরাগের উপস্থিতিও রয়েছে। নিছক যেটা ভয়ের বস্তু, তার সঙ্গে পরিচয় গভীর হলে ভয়ের ভাব দূর হয়ে যায়, বা ভয়ের বস্তু থেকে নিজেকে রক্ষা করার জন্য যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করলে ভয়ের ভাব কেটে যায়।

ভয় ও শ্রদ্ধামিশ্রিত ভয় অভিন্ন নয়

মৃত্যুভয় শিকারী এবং যোদ্ধাকে শিকার করা ও যুদ্ধ করা থেকে বিরত করতে পারে না। মানুষ যদি দেবতাকে শুধুমাত্র ভয় করত তাহলে এই ভয়কে অবদমিত করার জন্য মানুষ নিশ্চয়ই কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করত। আদিম নর-নারীর মনে ভয় ছাড়াও আশা ও বিশ্বাসের বীজ এবং যে অস্তিবাচক মূল্যের অর্জন ও সংরক্ষণে সে আগ্রহী সেই সম্পর্কে একটা বোধ বর্তমান। ধর্মের মূলে রয়েছে ভালবাসা বা অনুরাগ এবং প্রকৃত ভালবাসা বা অনুরাগ ভয়কে বিনষ্ট না ক'রে তার শোধন করে। ভীতিজনক বস্তু থেকে মানুষ দূরে সরে থাকতে চায়। ভয়ই যদি ধর্মের উৎপত্তির একমাত্র কারণ হত তাহলে মানুষ ভয়ের বস্তু থেকে পালাবার জন্য সচেষ্ট হত। মানুষ প্রেতাত্মা, বন্য জন্তু এবং অনেক বাস্তব ও কাল্পনিক বিষয় সম্পর্কে ভীত। এইসব বিপদ থেকে আত্মরক্ষার জন্য সে নানারকম ব্যবস্থা গ্রহণ করে। কিন্তু ধর্মের ক্ষেত্রে ব্যক্তির যে মনোভাব প্রকাশিত হয় তা এই জাতীয় কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করার সামিল নয়। যার থেকে মানুষ ভীত, মানুষ সেই সম্পর্কে তার ভয়ের কারণগুলিকে দূর করতে চায়। কিন্তু মানুষ যে তার দেবতাদের কাছে যেতে চায়, তাদের সাহচর্য কামনা করে, সেটাই প্রমাণ করে যে সে দেবতাদের ভয়ের বস্তু রূপে গণ্য না করে, অন্য দৃষ্টিতে তাদের দেখে থাকে।

দেবতাদের কাছ থেকে মানুষ পালিয়ে বেড়াতে চায় না

আসলে ধর্মের মধ্যে রয়েছে যে শ্রদ্ধামিশ্রিত ভয়, তা শুধু বস্তু থেকে পালিয়ে বেড়াবার আবেগ নির্দেশ করে না, বরং এ হল আবেগগত উত্তেজনা যা দুটি বিপরীত প্রেরণার ক্রিয়ার পরিণতি। একটা হল ভয়ের দরুণ ভয়ের বস্তু থেকে দূরে সরে

থাকা এবং দ্বিতীয়টি হল বিস্ময়, কৃতজ্ঞতা এবং অনুরাগবশতঃ তার প্রতি আকৃষ্ট হওয়া। আদিম নর-নারীর ধর্মে ভয়ের প্রাধান্যের কারণ সেই সব নর-নারীর চেতনার কেন্দ্রস্থলেই ছিল ভয়রূপ আবেগের অবস্থিতি। জীবনযুদ্ধে বিপদের বিরুদ্ধে অনবরত সংগ্রামই হয়ত এর একটা কারণ।

ধর্মের মধ্যে দুটি বিপরীত প্রেরণার পরিণতি

ওয়াটারহাউস্ (*Waterhouse*) বলেন, "সব সহজ ধরণের ধর্মগুলিতেই যথেষ্ট পরিমাণে ভয়ের উপস্থিতি রয়েছে, এবং নিছক দৃষ্টিতে এটা মনে হয় যে, ভয় ধর্মবিশ্বাসের জনক। কিন্তু ধর্মের ক্ষেত্রে ভয়ের আরোপ করে ধর্মসম্বন্ধীয় আচরণের মনস্তাত্ত্বিক প্রকৃতিকে কোনমতেই সম্পূর্ণভাবে ব্যাখ্যা করা যায় না।"[1]

আসল ব্যাপার হল, দেবতাদের শত্রু মনে করে তাঁদের সম্পর্কে কোন ভীতির মনোভাব থেকে নয়, বরং দেবতাদের সঙ্গে আত্মীয়তার মনোভাব থেকেই ধর্মের উৎপত্তি। [2]রবার্টসন্ স্মিথ (*Robertson Smith*) উপরিউক্ত অভিমতের সমর্থক। তিনি বলেন, অজ্ঞাত শক্তি সম্পর্কে অস্পষ্ট ভীতির ভাব থেকে নয়, বরং দেবতাদের প্রতি অনুরাগ মিশ্রিত শ্রদ্ধার ভাব থেকেই, যথার্থ ধর্মের শুরু। স্মিথের বক্তব্যের মধ্যে অতিশয়োক্তি দোষ থাকলেও, এটা অস্বীকার করা যায় না যে, ধর্মের উন্নত রূপগুলিতে ভয় ভালবাসার দ্বারা শোধিত হয়ে ভক্তিপূর্ণ শ্রদ্ধায় রূপান্তরিত হয়।

স্মিথের অভিমত

সিদ্ধান্ত: উপরিউক্ত মতবাদগুলির আলোচনা থেকে একটা বিষয় স্পষ্ট হয় যে, ধর্মীয় চেতনা একাধিক মনস্তাত্ত্বিক উপাদানের নিছক সমষ্টি নয়। এ হল একটা সুসংহত ঐক্য, যা তার অংশের থেকে বৃহত্তর। মানব প্রকৃতির মৌলিক উপাদানগুলি, সাধু এবং ইন্দ্রিয়পরায়ণ ব্যক্তি, উভয়েব ক্ষেত্রে একই—সংগঠনের নীতি বা উদ্দেশ্য, (the organising principle or purpose)-কে কেন্দ্র করেই উভয়ের মধ্যে পার্থক্য। সব সংগঠনের বা সংহতির মূলে থাকে একটা লক্ষ্য। ধর্মের উৎপত্তির মনস্তাত্ত্বিক সমস্যার যথার্থ উত্তর খুঁজে পাওয়া যাবে না, যদি কোন্ উপাদানটি মানুষকে ধর্মপ্রবণ করে তোলে সেটি আবিষ্কার করার জন্য মনকে তার কতকগুলি অংশে বিভক্ত করা

ধর্মের উৎপত্তির ব্যাখ্যায় ধর্মীয় চেতনার অভ্যন্তরে প্রবেশের প্রয়োজনীয়তা

1. "There is fear enough in all the simpler religious, and at a casual glance, it seems that fear is father to faith but the psychological nature of religious behaviour is not by any means fully explained by attributing it to fear." —E. S. Waterhouse; Philosophical Approach to Religion ; Page 15

2. W. R. Smith : The Religion of the Semites ; Page 55

হয়। ধর্মোৎপত্তির প্রশ্নটির মীমাংসা হতে পারে যদি ধর্মীয় চেতনার অভ্যন্তরে প্রবেশ করে আমরা এই প্রশ্নটির মীমাংসা করতে চাই যে, মানুষ যখন ধর্মপ্রবণ হয় তখন মানুষ কি চায়? তখন তার লক্ষ্য কী? ধর্মীয় চেতনা কোন্ মূল্যকে লাভ করতে চায়?

জীবনযুদ্ধে টিকে থাকা—এই জৈবিক প্রয়োজনের মধ্যেই যে ধর্মের মূল প্রথম থেকেই নিহিত, অস্বীকার করা চলে না। কিন্তু ধর্মের পরিপূর্ণ অর্থ জৈবিক প্রয়োজনের পরিতৃপ্তির মধ্যেই খুঁজে পাওয়া যায় না। ধর্ম হল বিশেষ করে জীবনের সম্পূর্ণতা এবং সমগ্রতার অন্বেষণে এক অনন্তযাত্রা—এমন এক জীবনের অন্বেষণ যা একাধারে পরিপূর্ণ এবং ব্যাপক এবং উপাদানের প্রাচুর্যে ও ঐশ্বর্যে সমৃদ্ধ। দৈহিক এবং আধ্যাত্মিক দুটি দিক থেকেই জীবনের পরিপূর্ণতা লাভই ধর্মের উদ্দেশ্য। বাইরে থেকে মানুষের উপর কৃত্রিমভাবে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে, ধর্ম এরকম কোন বাহ্য বস্তু নয়। ধর্মের সঙ্গে সংযোগ রয়েছে মানুষের সমগ্র জীবনের, যার সঙ্গে তার আঙ্গিক সম্পর্ক। দ্বিতীয়তঃ, জীবনের জন্য মানুষের অদম্য তৃষ্ণা অন্য অভিজ্ঞতার তুলনায় ধর্মীয় অভিজ্ঞতার মধ্যেই পরিপূর্ণ তৃপ্তি খুঁজে পায়। জীবনের অন্য কোন আচরণের তুলনায় ধর্মের মধ্যেই মানুষ জীবনের পরিপূর্ণতা ও প্রাচুর্য আবিষ্কার করে। ধর্ম নিছক জৈবিক স্তর থেকে, নিছক বেচে থাকার জীবন-সংগ্রাম থেকে মানুষকে বহু ঊর্ধে উত্থিত করে এবং তাকে মহান পরিতৃপ্তির স্বাদ দেয় যা সত্য, শিব ও সুন্দরকে লাভ করার মধ্যেই পাওয়া যায়। ধর্ম মানুষকে কোন নতুন মূল্যের সন্ধান দেয় না, কেননা সত্য, শিব ও সুন্দর হল এমন মূল্য যাকে মানুষ জানে এবং ধর্মীয় অভিজ্ঞতা ছাড়াও অন্য অভিজ্ঞতার মাধ্যমে পেতে চায়। কিন্তু ধর্মীয় জীবনে মানুষ এই সব মূল্যকে একটা ঐক্যবদ্ধ এবং ব্যাপকতর জীবনধারায় সুসংগঠিত করতে সচেষ্ট হয়।

একথা সত্য যে এই সব কিছুই আদিম ধর্মে কেবলমাত্র প্রচ্ছন্ন ছিল এবং ধর্মের বিবর্তনের সুদীর্ঘ প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই কেবলমাত্র এইগুলি প্রকট হয়ে ওঠে। জীবনের এই ধারাকে সে কেবলমাত্র প্রকৃত এবং পরিপূর্ণ আত্মোপলব্ধির উপায় বলে মনে করে। শুরুতে ধর্ম ছিল পার্থিব কল্যাণ লাভের পদ্ধতি, যেসব কল্যাণ তাকে জীবন-সংগ্রামে বাঁচিয়ে রাখতে সহায়তা করত। মানুষ শুরুতে ধর্মের আশ্রয় নেয় জাগতিক বিপদের মধ্যে নিরাপত্তার বোধ অনুভব করার জন্য। কিন্তু ধর্মের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে মানুষ ধর্মের আশ্রয় নেয় তার বৃহত্তর চাহিদাগুলিকে মেটাবার জন্য, আধ্যাত্মিক দিক থেকে জীবনকে প্রসারিত করার জন্য। মানুষ উপলব্ধি করে যে শুধুমাত্র উদরপূর্তির মাধ্যমেই সে বেঁচে থাকতে

ধর্ম মানুষের বৃহত্তর পরিতৃপ্তিগুলি মেটায়

পারে না, উদরপূর্তি ছাড়াও তার রয়েছে এক বৃহত্তর ও উচ্চতর পরিতৃপ্তির জন্য অদম্য তৃষ্ণা এবং সেই পরিতৃপ্তি জাগতিক বস্তু দিতে পারে না। ধর্ম তার শুরু থেকেই আধ্যাত্মিক, বা আধ্যাত্মিকতা তার মধ্যে প্রচ্ছন্ন রয়েছে বলা যেতে পারে, কেননা ধর্ম *নির্দেশ করে যে, মানুষের জীবন এমন অপ্রত্যক্ষগোচর শক্তির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত যেগুলি জাগতিক বা জড়াত্মক নয়।* কিন্তু মানুষের অভিজ্ঞতা যতই গভীর থেকে গভীরতর হতে থাকে ততই ধর্মের আধ্যাত্মিকতারও সুস্পষ্ট প্রকাশ ঘটতে থাকে।

তৃতীয়তঃ, জীবনের প্রয়োজনগুলিকে পরিতৃপ্ত করার এবং তার আদর্শগুলিকে লাভ করার অন্যান্য পদ্ধতির সঙ্গে ধর্মের পার্থক্য হল ধর্ম এমন কতকগুলি শক্তির সহায়তা যাচ্ঞা করে যা অতি মানবীয়, মনস্তাত্ত্বিক—সাধারণতঃ ব্যক্তিগত অর্থাৎ যারা হল দেবতা। অনেকে ধর্মের মূল্যের দিকটির উপরে এত বেশী গুরুত্ব আরোপ করেন যে তাঁরা মনে করেন, ধর্মের সঙ্গে উচ্চতর শক্তি বা দেবতার কোন অনিবার্য সম্পর্ক নেই। কিন্তু এই জাতীয় অভিমত সমর্থনযোগ্য নয়। অধ্যাপক লিউবা (*Leuba*)[1] বলেন, "ধর্ম

লিউবার অভিমত

মানব অভিজ্ঞতার সেই অংশ, যে অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে মানুষ মনস্তাত্ত্বিক প্রকৃতিবিশিষ্ট শক্তির সঙ্গে, বিশেষ করে ব্যক্তিগত শক্তির সঙ্গে নিজেকে সম্বন্ধযুক্ত মনে করে এবং তাদের কাজে লাগায়।" ধর্মের মাধ্যমেই ব্যক্তি অলৌকিক সত্তার সহায়তায় নিজের জীবনকে বর্ধিত করে এবং ঐশ্বর্যমণ্ডিত করে। এই অলৌকিক সত্তা হল পরম সম্পদের আবাসস্থল। মানুষ যে সম্পদের অধিকারী, এই সম্পদ, তাব তুলনায় অনেক বেশী মহান, কিন্তু কতকগুলি শর্ত পূরণ করলেই মানুষ এই সম্পদের অধিকারী হতে পারে। লিউবা এমন কথাও বলেন, "ধর্মেব ক্ষেত্রে প্রয়োজন বা চাহিদাই উল্লেখযোগ্য বিষয় নয়, কি উপায়ে তাদের পরিতৃপ্ত কবা হয় সেটিই উল্লেখযোগ্য।" এই অভিমতের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ

অভিমতের সমালোচনা

উত্থাপিত হতে পারে যে এই অভিমত দেবতাদের, মানুষের জীবনকে উন্নত করা এই লক্ষ্য লাভ করার উপায় রূপে গণ্য করে এবং দেবতা শুধু দেবতা হিসেবেই পূজা ও ভালবাসা পাবার অধিকারী; এ কথা বলে না। কিন্তু এই জাতীয় অভিযোগ যথার্থ নয়। কেননা ধর্মীয় জীবনের চরম স্তরে,

ঈশ্বরই পরম মূল্য

ব্যক্তিগত স্বার্থ পরিতৃপ্ত করার জন্য দেবতার উপাসনা করা হয় না, শুধুমাত্র দেবতা মনে করেই দেবতার প্রতি নিঃস্বার্থ প্রেম ভালবাসা জ্ঞাপন করা হয়। সর্বাপেক্ষা উন্নত ধর্মগুলিতে ঈশ্বর কোন উদ্দেশ্য সিদ্ধ করার জন্য

1. J. H. Leuba: A Psychological Study of Religion; Page 52

উপায়মাত্র নয়। বরং ঈশ্বরকেই পরমমূল্য রূপে গণ্য করা হয় এবং মানব জীবনের সব উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য ঈশ্বরের ইচ্ছা এবং প্রকৃতির পরিপ্রেক্ষিতেই নিরূপিত হয়।

তাহলে প্রশ্ন হল, ধর্মের প্রকৃত লক্ষ্য কি? ধর্মীয় অভিজ্ঞতার জটিল বিষয়কে ব্যাখ্যা করার জন্য কোন একটি মাত্র সূত্রের সন্ধান করা সম্ভব নয়, কিন্তু ক্রিয়ামূলক মনোবিজ্ঞানের দিক থেকে যে অভিমত খুবই ফলপ্রসূ মনে হয় তাহল ধর্ম প্রধানতঃ জীবনের জন্য অন্বেষণ (quest for life)। কিন্তু প্রশ্ন হল, কোন্ জীবনের জন্য অন্বেষণ? ধর্ম যে বৃহত্তর পরিপূর্ণ জীবনের জন্য আকাঙ্ক্ষা সূচনা করে সেই জীবন ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের জীবন বা সমাজ বিচ্ছিন্ন আত্মপোলব্ধির জীবন নয়। এ হল মানব জীবনের—যে জীবন একাধারে ব্যক্তিগত এবং সামাজিক তারই উপলব্ধির জন্য আকাঙ্ক্ষা। ব্যক্তি-জীবন ও সমাজ-জীবনের মধ্যে কোন বিরোধ নেই। ব্যক্তি সমাজের জীবন থেকে অনেক কিছুই গ্রহণ করে এবং সমাজ-জীবনে নিজের অবদানের মাধ্যমে জীবনের পূর্ণতা লাভ করতে পারে। ধর্মীয় অভিজ্ঞতার মাধ্যমেই ব্যক্তি প্রকৃত জীবনের অন্তঃদৃষ্টি লাভ করে এবং ধর্মের মাধ্যমেই ব্যক্তি আত্মস্বার্থের ক্ষুদ্র গণ্ডী থেকে উত্তীর্ণ হতে সক্ষম হয় এবং বৃহত্তর সমাজ- জীবনের মধ্যে নিজেকে ছড়িয়ে দিতে চায়।

ক্রিয়ামূলক মনোবিদের দৃষ্টিভঙ্গি

দুরখীম এবং অন্যান্য ফরাসী সমাজ-বিজ্ঞানীরা যখন বলেন যে, ধর্ম প্রধানতঃ সামাজিক বিষয়, তখন এডওয়ার্ডস্ বলেন, তাঁদের বক্তব্যের মধ্যে যথেষ্ট সত্যতা আছে, স্বীকার করতে হবে: তবে ধর্ম হল নিছক একটা মাধ্যম যার দ্বারা সমাজ ব্যক্তিকে নিয়ন্ত্রিত করে এবং সমাজের উন্নতি সাধনে তাকে সহায়ক করে তোলে, এইরূপ ধারণা করা যুক্তিসঙ্গত নয়। কেননা এটাও সত্য যে সমাজের বিরুদ্ধে যখন ব্যক্তি দাঁড়াতে চায় তখন ধর্ম ব্যক্তিকে ক্ষমতাশালী করে তোলে এবং এই বিষয়টিই ধর্মের প্রগতিকে সম্ভব করে তোলে। সমাজ হল সংরক্ষণশীল। যেসব মূল্য ইতিমধ্যেই আবিষ্কৃত হয়েছে বলে সমাজ মনে করে, সেইগুলিকে আচার, রীতিনীতি, ঐতিহ্য, অনুষ্ঠান, ধর্মবিশ্বাস প্রভৃতির মধ্যে রূপায়িত করে সমাজ তাদের সংরক্ষিত করতে চায়। কিন্তু উদ্যম, উন্নতির সঙ্কল্প, নব নব আবিষ্কারের প্রেরণা, মুক্তি ও বিস্তৃতির আকাঙ্ক্ষা এইসব প্রধানতঃ আসে প্রচারক এবং মহৎ পুরুষদের কাছ থেকে, যাঁরা প্রচলিত রীতির বাধাকে ভেঙে দেন এবং সমাজস্বীকৃত মূল্যগুলিকে অগ্রাহ্য করেন। কারণ তাঁরা মনে করেন যে, তাঁরা এক পূর্ণতর এবং প্রাচুর্যপূর্ণ জীবনের সন্ধান লাভ করেছেন, যা তাঁদের নিজেদের জন্য এবং সমাজের জন্য লাভ করা সম্ভব।

এডওয়ার্ডস্-এর মন্তব্য

ধর্মের মূলে জীবনের উপলব্ধির জন্য আকাঙ্ক্ষা

কিন্তু একথাও বিস্মৃত হলে চলবে না যে এই সব প্রচারক এবং প্রবর্তক সমাজেরই সৃষ্টি। তাঁদের অন্তর্দৃষ্টিকে তাঁরা ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার মধ্যে সীমিত রাখতে চান না। তাঁরা চান তাঁদের আদর্শ সমাজ-জীবনে অনুপ্রবিষ্ট হোক ও সমাজের সমষ্টিগত অভিজ্ঞতার মধ্যে মূর্ত হয়ে উঠুক এবং সংরক্ষিত হয়ে থাকুক। আসলে সমাজ এবং ব্যক্তি— উভয়েই একে অপরের জন্য অনিবার্য ও সামাজিক এবং ব্যক্তিগত ধর্ম উভয়েরই পিছনে রয়েছে সেই একই সঞ্জীবনী প্রেরণা, জীবনের উপলব্ধির জন্য সেই একই অদম্য আকাঙ্ক্ষা।

ধর্মের উৎপত্তি ও বিকাশকে নিয়ন্ত্রণ করে যে-সব মনস্তাত্ত্বিক উপাদান (The Psychical factors that determine the origin and development of religion): ধর্ম আমাদের যেসব আবেগগত চাহিদাকে পূরণ করে ইতিপূর্বে সেইগুলি আমরা আলোচনা করেছি। এবার আমরা আলোচনা করব মানুষের প্রকৃতির মধ্যে সেই সব উপাদানগুলি কী, যেগুলি ধর্মসম্বন্ধীয় অভিজ্ঞতার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত, যেগুলি ধর্মের উৎপত্তি এবং বিকাশ নিয়ন্ত্রণ করে।

ধর্মের জন্য মানুষের স্বতন্ত্র কোন বৃত্তি নেই। মানুষের অন্যান্য আচরণের ক্ষেত্রে যে মনস্তাত্ত্বিক উপাদানগুলি ক্রিয়া করে, ধর্মের ক্ষেত্রেও সেই একই উপাদানগুলি ক্রিয়া করে। প্লেটোর যুগ থেকে মানুষের প্রকৃতিকে বিশ্লেষণ করে তিনটি উপাদানের কথা বলা হয়েছে—অনুভূতি (feeling), ইচ্ছা (will), এবং চিন্তা (thought)। বাস্তব অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে এই তিনটি উপাদানকে একত্র দেখতে পাওয়া যায়। অধ্যাপক লিউবা

ধর্মের ক্ষেত্রে একই মনস্তাত্ত্বিক উপাদানের অস্তিত্ব

(*Leuba*) এই প্রসঙ্গে যে মন্তব্য করেছেন তা খুবই প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন, "চেতন জীবনের একক শুধুমাত্র চিন্তন নয়, শুধুমাত্র অনুভূতি নয় বা শুধু মাত্র ইচ্ছা নয়, বরং বস্তুর দিকে অগ্রসর হবার সময় তিনটি একত্রে থাকে[1]।" কিন্তু যদিও এটা সত্য যে প্রতিটি অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে এই তিনটি উপাদানই উপস্থিত থাকে, তবু মনোবিজ্ঞানীদের মধ্যে মতবিভেদ দেখা দেয়, সেটি হল এই তিনটির মধ্যে কোন্‌টি মুখ্য বা প্রধান[2]।

চিন্তন, অনুভূতি ও ইচ্ছা তিনটির একত্র উপস্থিতি

1. "The unity of conscious life is neither thought nor feeling, nor will but all three in movement towards an object."—J. H. Leuba : The Psycological Origin and the Nature of Religion ; page 8

2. এই সম্পর্কে প্রাচীন অভিমত চিন্তনের উপরে গুরুত্ব আরোপ করেছেন। মানুষ "বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন জীব" এইভাবেই তাঁরা মানুষের সংজ্ঞা নির্দেশ করেছেন। কিন্তু বর্তমান যুগের নব্য মনোবিজ্ঞান (New

ধর্মের বিকাশের আলোচনায় আমরা অনুভূতিকে মানসিক জীবনের প্রাথমিক উপাদানরূপে গণ্য করে অগ্রসর হব। অবশ্য অনুভূতি নিয়ে শুরু করার সময় আমরা যেন বিস্মৃত না হই যে, শুরুতে ধর্ম বুঝি শুধুমাত্র অনুভূতিরই ব্যাপার ছিল এবং ধর্মের মধ্যে 'ইচ্ছা' বা 'চিন্তনের' কোন উপাদান ছিল না। অন্য উপাদানবর্জিত শুধু মাত্র অনুভূতির কোন বাস্তব অস্তিত্ব নেই। আসল কথা হল, অন্যান্য উপাদানের তুলনায় অনুভূতি ছিল প্রধান ও তীব্র এবং ধর্মের চরম বিকাশের ক্ষেত্রেও অনুভূতি অনিবার্য প্রধান উপাদান রূপে বিদ্যমান। ধর্মের ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতার উপাদান রূপে অনুভূতির স্বীকৃতি ও গুরুত্বের মূলে শ্লায়ারমেকার (*Schleiermacher*) এবং পরবর্তীকালে লোটজার (*Lotza*)-র প্রভাব বিশেষভাবে লক্ষণীয়। শ্লায়ারমেকার ধর্মের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন, 'ধর্ম হল ঈশ্বরের উপর একান্ত নির্ভরতার বোধ'। উইলিয়ম জেম্‌সও (*William James*) বলেন, 'ধর্মের গভীরতর উৎস হল অনুভূতি'। কাজেই ধর্মীয় অভিজ্ঞতায় অনুভূতিকে কেন্দ্রীয় উপাদানরূপে স্বীকার করে নিতেই হয়।

ধর্মের ক্ষেত্রে অনুভূতিরই প্রাধান্য

শ্লায়ারমেকার ও জেম্‌স-এর অভিমত

প্রশ্ন হল, ধর্মীয় অনুভূতি কি ধরনের অনুভূতি? লুক্রিটিয়াস-এর মতে এই অনুভূতি হল ভয়। শ্লায়ারমেকারের মতে এ হল 'ঈশ্বরের উপরে একান্ত নির্ভরতার বোধ' এবং হফডিং (*Hoffding*)-এর মতে এ হল 'সেই অনুভূতি যা মূল্যের নিত্যতায় বিশ্বাসের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত' (feeling determined by the faith in the conservation of values)। আমরা ইতিপূর্বে আলোচনা করেছি যে, আদিম ধর্মীয় আবেগ হল অজ্ঞাত এবং শক্তিশালী ক্ষমতার উপস্থিতিতে সশ্রদ্ধ ভয় (awe)। ধর্মীয় আবেগের উন্নত রূপ হল একটি জটিল বিষয় যার মধ্যে সশ্রদ্ধ ভয়, বিস্ময়, প্রশংসা, কৃতজ্ঞতা,

Psychology) বলে যে, আধুনিক শিক্ষিত এবং সভ্য ব্যক্তিও শুধুমাত্র বিচারবুদ্ধির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হন না; তিনি অ-বুদ্ধিজনিত আবেগের দ্বারা এবং অবচেতন মনের ধারণার দ্বারা অনেক মাত্রায় নিয়ন্ত্রিত হন। সাম্প্রতিক কালে ইচ্ছাকেই চেতনার কেন্দ্রীয় উপাদানরূপে গণ্য করা হচ্ছে। এই অভিমতের স্বপক্ষে বলা যায় যে কামনা, অভিপ্রায়, উদ্দেশ্য ছাড়া চিন্তন সম্ভব হয় না অভিপ্রায় এবং উদ্দেশ্যর জন্যই চিন্তন বৈশিষ্ট্য লাভ করে। আমরা ইচ্ছা করি বলেই আমরা চিন্তা করি (we hink because we will)। মানুষ উদ্দেশ্য ছাড়া চিন্তা করতে পারে না এবং উদ্দেশ্যের মূল, আবেগ, কামনা এবং ক্ষোভের মধ্যে নিহিত। আবার কেউ কেউ মনে করেন ইচ্ছার থেকেও অনুভূতি হল প্রাথমিক উপাদান। অনুভূতিকে প্রাথমিক বলে গণ্য করা স্বাভাবিক বলে মনে হয়, কেননা একমাত্র অনুভূতির ভিত্তিতেই কোন কিছু চিন্তা করা বা ইচ্ছা করা সম্ভব।

প্রত্যাশা, নির্ভরতাবোধ, ভালবাসা, স্বাচ্ছন্দ্য ও শক্তির বোধ, শান্তি, আনন্দ, সাময়িক উন্মাদনা বা উল্লাস, সবকিছুই বর্তমান। অধিকতর আদিম ধর্মীয় অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে ধর্মীয় আবেগের তীব্র বিকারগ্রস্ত উত্তেজনার মধ্য দিয়ে আত্মপ্রকাশ করার সম্ভাবনা বিদ্যমান। উন্নত ধর্মের স্বাভাবিক উপাসনার ক্ষেত্রে এই অনুভূতি অনেকটা সংযত এবং বিচারবুদ্ধিজনিত ধারণার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত। কিন্তু উইলিয়ম জেম্‌স-এর ভাষায়, 'অনুভূতি হল গোপনীয় ও মূক এবং নিজের পরিচয় নিজে দিতে অক্ষম'। কাজেই অনুভূতিকে ইচ্ছা এবং বুদ্ধির মধ্য দিয়েই অগ্রসর হতে হবে। অনুভূতিকে ক্রিয়ায় রূপ দিতে হবে।

ধর্মীয় অনুভূতির স্বরূপ

এই কারণে ধর্ম হয়ে পড়ে এক ধরনের ক্রিয়া, এক ধরনের আচরণ। তীব্র আবেগ স্বাভাবিক ভাবে ক্রিয়ার মধ্য দিয়ে আত্মপ্রকাশ করে। নির্বাচনমূলক উদ্দেশ্য বা অভিপ্রায়, যার পরিণতি আচরণে, তাকে বাদ দিয়ে অনুভূতি হল অন্ধ এবং অর্থহীন। ইচ্ছা যেসব ব্যবহারিক উদ্দেশ্য সিদ্ধ করতে অভিলাষী তার সঙ্গে যুক্ত হয়েই অনুভূতি জীবনের অখণ্ড ঐক্যের মধ্যে তার স্থান করে নিতে পারে এবং অর্থবোধক হয়ে ওঠে। ধর্মজীবন সম্পর্কেও এ সবই সত্য। আভ্যন্তরীণ অনুভূতিরূপে ধর্মের বাহ্যপ্রকাশের অবশ্যই প্রয়োজন আছে, শুধুমাত্র বস্তুনিরপেক্ষ আবেগরূপে মনস্তাত্ত্বিক দিক থেকে ধর্ম অসম্পূর্ণ। পরিপূর্ণ বিষয়রূপে ধর্ম হল আচরণ; উদ্দেশ্য নিয়ন্ত্রিত এক ধরনের ক্রিয়া। বাহ্যক্রিয়া বা আচরণের মাধ্যমে ধর্মের আত্মপ্রকাশ থেকেই আচার-অনুষ্ঠান সম্পর্কীয় ধর্মের সৃষ্টি, তবে আচরণ হিসেবে ধর্ম শুধুমাত্র আচার-অনুষ্ঠানেই সীমাবদ্ধ নয়, নৈতিকতার সঙ্গেও তার সম্পর্ক উল্লেখযোগ্য। অনেকে ঈশ্বর সেবা বলতে আচার-অনুষ্ঠান পালনের তুলনায় সাধু আচরণের উপরে গুরুত্ব আরোপ করেন। ধর্মের লক্ষ্য আচার-অনুষ্ঠানকে বর্জন করা নয়, নৈতিক জীবনের সঙ্গে তাকে যুক্ত করা।

ধর্মীয় অনুভূতি ধর্মীয় ক্রিয়ার মাধ্যমে প্রকাশিত হয়

নৈতিকতার সঙ্গে ধর্ম সম্পর্কযুক্ত

ধর্মের বিকাশে চিন্তনও এক গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। ধর্মজীবনের অত্যন্ত প্রাথমিক স্তরেও কিছু জ্ঞানগত উপাদান বা বিশ্বাসের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। তাই উন্নত ধর্মের ক্ষেত্রে ঈশ্বরতত্ত্ব বা ধর্মতত্ত্বের (theology) উদ্ভব ঘটে, যা চিন্তনের মাধ্যমে ধর্মসম্বন্ধীয় মূল্যের ব্যাখ্যা দেবার চেষ্টা করে। এর পর উদ্ভব ঘটে ধর্মদর্শনের যা ধর্মসম্বন্ধীয় অভিজ্ঞতার অর্থ ব্যাখ্যা করতে চায় এবং তার যাথার্থ্যের ব্যক্তিগত ভিত্তি পরীক্ষা করে দেখতে চায়। ধর্মীয় অভিজ্ঞতার অন্তরতম বিষয় হল অনুভূতি, কিন্তু অনুভূতি হল মনোগত, চিন্তার লক্ষ্য

চিন্তনও ধর্মের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান

হল এর বাস্তবতার বিচার। ধর্মে চিন্তন ছাড়াও আবেগগত এবং ইচ্ছামূলক দৃষ্টিভঙ্গি বর্তমান। ধর্মীয় মন সব সময়ই চাইবে একটা ঈশ্বরতত্ত্ব বা ধর্মতত্ত্ব। কিন্তু ঈশ্বরতত্ত্বের বা ধর্মতত্ত্বের বিচারবিযুক্ত (dogmatic) ধর্মমতে পরিণত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। তাই প্রগতিমূলক ধর্মের দুটি কাজ—বিচারবিযুক্ত ধর্মমতের সমালোচনা করা এবং সমসাময়িক জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার মধ্যে যা শ্রেষ্ঠ তার সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করে ধর্মের পুনর্গঠন। কাজেই ধর্মের প্রগতির ক্ষেত্রে বিচার-মূলক চিন্তনের এক গুরুত্বপূর্ণ অবদান বর্তমান যা মানুষকে ঈশ্বর এবং জীবন সম্পর্কে অপরিণত, স্থূল, অজ্ঞানতাপ্রসূত ধারণা থেকে যথার্থ সত্যের আলোকে এবং আধ্যাত্মিক স্তরে টেনে নিয়ে যায়। একথা সত্য যে, সব ধর্মের মূল কথা ধর্মানুরাগ, ধর্মানুরাগের চিন্তা নয়। কেননা যৌক্তিক ধারণার তুলনায় অভিজ্ঞতা অনেক মূল্যবান। কিন্তু মানুষের বিচারবুদ্ধির দাবী মেটাবার জন্যই ধর্ম মতবাদের মধ্য দিয়ে আত্মপ্রকাশ করে।

প্রগতিমূলক ধর্মের দুটি কাজ

৪। ধর্মের ঐতিহাসিক ক্রমবিকাশ (Historical Development of Religion) :

মানব সভ্যতার প্রতিটি স্তরে এবং সভ্যতার প্রতি পর্বে ধর্মের বিকাশ কিভাবে ঘটেছে, সেই সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করতে না পারলে ধর্ম সম্পর্কে দার্শনিক আলোচনা সম্ভব নয়। ধর্ম কী বুঝতে হলে আমাদের ধর্মের ঐতিহাসিক বিবর্তনের স্বরূপটিকে জানতে হবে। এই সম্পর্কে আধুনিক গবেষণালব্ধ তথ্যের পরিমাণ এতই প্রচুর যে, ধর্মের যথাযথ আলোচনার জন্য প্রয়োজন এই তথ্যকে সুবিন্যস্ত করা এবং একটা কাঠামোর মধ্যে রেখে এই তথ্যগুলিকে শ্রেণীভুক্ত করা।

ধর্মের ঐতিহাসিক ক্রমবিবর্তনের জ্ঞানের প্রয়োজন

টাইলি (*Tiele*) ধর্মকে দুটি শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন—প্রাকৃতিক ধর্ম (Nature Religions) এবং নৈতিক ধর্ম (Ethical Religions)। ডক্টর গ্যালওয়ে (*Dr. Galloway*) ধর্মকে শ্রেণীবিভক্ত করতে গিয়ে তাদের তিনভাগে শ্রেণীবিভক্ত করেছেন—(১) উপজাতীয় (tribal), জাতীয় (national), এবং বিশ্বজনীন (universal)। উপরিউক্ত শ্রেণী-বিভাগের মধ্যে গ্যালওয়ের শ্রেণীবিভাগই গ্রহণযোগ্য, কেননা এই শ্রেণীবিভাগ আমাদের এই কথা স্মরণ করিয়ে দেয় যে ধর্মের ক্রমবিকাশ সাধারণভাবে সামাজিক সংগঠনের ক্রমবিকাশের একটি পর্ব এবং ধর্মের ক্রমবিকাশের বিভিন্ন স্তরগুলি সমগ্রভাবে সভ্যতা এবং সংস্কৃতির স্তরগুলির সঙ্গে সমশ্রেণীভুক্ত। সামাজিক সংগঠনের সরলতম রূপ হল উপজাতি। কাজেই উপজাতীয় ধর্ম নিয়ে আমরা প্রথম আলোচনা শুরু করব।

ধর্মের বিভিন্ন শ্রেণীবিভাগ

(ক) উপজাতীয় ধর্ম (Tribal Religion) : উপজাতি হল সামাজিক সংগঠনের প্রাথমিক রূপ, যে সংগঠন আদিম অধিবাসী দ্বারা অধ্যুষিত। এটি একটি অতি ক্ষুদ্র এবং সীমিত সামাজিক গোষ্ঠী ; এক হিসেবে এটিকে পরিবারের একটি সংযোজিত অংশরূপেই গণ্য করা চলে।

উপজাতির প্রকৃতি

রক্তের সম্বন্ধই উপজাতীয় নরনারীদের মধ্যে সামাজিক বন্ধন সূচনা করত এবং কোন উপজাতি তার চারপাশের উপজাতিগুলিকে বাস্তব বা সম্ভাব্য শত্রুরূপে গণ্য করত। কিন্তু উপজাতি-গোষ্ঠী (Tribe-group)-র সংগঠন যদিও খুব ক্ষুদ্র ছিল ; আসলে এই সংগঠন ছিল খুবই নিবিড। উপজাতির অন্তর্ভুক্ত প্রতিটি সভ্যকে সামাজিক রীতিনীতিগুলিকে কঠোরভাবে অনুসরণ করতে হত, সেইগুলিকে লঙ্ঘন করা তার পক্ষে দুঃসাধ্য ছিল। সব ব্যাপারে গোষ্ঠীই ছিল সর্বেসর্বা। গোষ্ঠী একটি মাত্র দলরূপে চিন্তা করত এবং ক্রিয়া করত। উপজাতীয় রীতিগুলিকে লঙ্ঘন করার শাস্তি ছিল খুবই কঠোর। দুরখীম (*Durkhim*) যথার্থই নির্দেশ করেছেন যে, আদিম ব্যক্তি নিজের উপর এই সামাজিক রীতির চাপকে বাস্তব শক্তির চাপ বলেই অনুভব করত এবং এই রহস্যময় শক্তির অস্পষ্ট চেতনা বংশপরম্পরায় সংক্রমিত হত। প্রাচীন ধর্মে এই উপজাতীয় চেতনার স্বাভাবিক প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায়। এ হল একটা গোষ্ঠীর সম্পত্তি—উপজাতির দ্বারা অনুমোদিত কিছু রীতি, যেগুলির প্রতি ব্যক্তি ব্যক্তিগত সুবিধার কথা চিন্তা না করে, গোষ্ঠীর কথা চিন্তা করেই তার আনুগত্য প্রকাশ করত। এই স্তরে ব্যক্তির স্বার্থ নিরন্তর বেঁচে থাকার সংগ্রাম, খাদ্যান্বেষণ, প্রাকৃতিক বিপদ এবং শত্রুর আক্রমণের হাত থেকে আত্মরক্ষার প্রয়োজনীয়তা প্রভৃতির দ্বারা নিরূপিত হত। কাজেই আদিম নরনারীর পক্ষে পার্থিব অভাবের অতি ঊর্ধ্বে ওঠা সম্ভব ছিল না। কাজেই তার ধর্মও ছিল সেই একই নিম্নস্তরের। তবে ধর্ম সম্পর্কীয় রীতি এবং অন্যান্য রীতির মূলে যেসব স্বার্থের অস্তিত্ব ছিল, সেই স্বার্থের সঙ্গে যুক্ত ছিল খাদ্যসংগ্রহ, বিবাহ, জন্ম, রোগ, মৃত্যু, যুদ্ধ, বন্যপশু ও আবহাওয়া থেকে আত্মরক্ষা ইত্যাদি। তখনও জীবনের বিভিন্ন বিভাগগুলিকে সুনির্দিষ্টভাবে পরস্পরের থেকে পৃথক করা হয়নি এবং অন্যান্য মানবীয় স্বার্থের সঙ্গে ধর্মের পার্থক্য তখনও খুবই অস্পষ্ট। কাজেই দেখা যায় ধর্মের প্রথম দিকে মানুষের আত্মা প্রকৃতির অধীন এবং দৈহিক প্রয়োজনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত এবং তার প্রকৃতির যে ভাবগত উপাদান সেইগুলি ছিল তার চেতনার পটভূমিতে। কিন্তু এই স্তরেও দেখা যায় জগতের অদৃশ্য শক্তির প্রতি ব্যক্তির গভীর আবেগমূলক প্রতিক্রিয়া

গোষ্ঠী-অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তির উপর সামাজিক রীতির চাপ

আদিম নরনারীর ধর্মে স্বার্থের ছোঁয়াচ

বর্তমান এবং যা প্রত্যক্ষগোচর তার মধ্যে নয়, যা অপ্রত্যক্ষগোচর তার মধ্যেই মানুষ জীবনের রহস্য অনুসন্ধান করছে। এইসব রহস্যময় শক্তির উপস্থিতি ব্যক্তির মনে যে সশ্রদ্ধ ভয়ের (awe) উদ্রেক করে, তার মধ্যেই আমরা সব ধর্মের মূল নীতিকে খুঁজে পাই। অবশ্য এক অজ্ঞানতার পরিবেশের মধ্যেই ধর্মের এই মূল নীতির ক্রিয়া লক্ষ্য করা যায়, উন্নত ধর্মে রূপান্তরিত হওয়ার জন্য যার বৌদ্ধিক এবং নৈতিক উপাদানের প্রয়োজন।

ধর্মের ঐতিহাসিক বিবর্তনের শুরু একাধিক আত্মায় বিশ্বাস, যেগুলি রহস্যজনক শক্তি প্রয়োগ করতে পারে এবং কতকগুলি আনুষ্ঠানিক ক্রিয়া সম্পাদনের মাধ্যমে যাদের প্রভাবিত করা যায়। এই ব্যাপারে কিছুটা অগ্রগতি লক্ষ্য করা গেল যখন মানা (mana)-র অস্পষ্ট ধারণা সজীব আত্মায় (living spirits) রূপান্তরিত হল। ব্যক্তি নিজের মধ্যে যে আত্মার অস্তিত্ব সম্পর্কে সচেতন, এই আত্মাগুলি সেই আত্মার অনুরূপ। পরবর্তী অগ্রগতির ক্ষেত্রে এই সব আত্মা যেগুলি পর্বত, বৃক্ষ, স্রোতস্বিনী প্রভৃতির সঙ্গে যুক্ত বলে ধারণা করা হত, সেইগুলিকে স্বাধীন বলে গণ্য করা হল। এরা খুশীমত, যে বস্তুগুলির সঙ্গে তারা যুক্ত, তাদের পরিত্যাগ করে চলে যেতে পারত, যেমন বিশ্বাস করা হত যে স্বপ্নে মানুষের আত্মা দেহ পরিত্যাগ করে এদিক ওদিক ঘুরে বেড়াতে পারে। এইভাবে প্রাণবাদ (animism) আত্মাবাদে (spiritism) রূপান্তরিত হল। এই রূপান্তর ধর্মের অগ্রগতির পথে সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ, কারণ টাইলি (*Tiele*)-র মতে এই মতবাদ আত্মা যে দেহের তুলনায় শ্রেষ্ঠ এবং দেহনির্ভর নয় এই বোধের অস্তিত্ব অনুমান করে নেয়। আত্মাবাদ এই বোধ জাগ্রত করে যে, উপাস্য বস্তুতে আত্মাই সবচেয়ে প্রয়োজনীয় বিষয়, যা বস্তুর সর্বপরিবর্তনের মধ্যেও স্থায়ী উপাদানরূপে বিরাজমান এবং এই ধারণাই ধর্মীয় আধ্যাত্মিকতাবাদের পথ সুগম করেছে, যার বক্তব্য হল, ঈশ্বর এক আত্মা। যে ঈশ্বরের উপাসনা করবে তার উচিত ঈশ্বরকে আত্মারূপে এবং পরম সত্যরূপে গণ্য করে ঈশ্বরের উপাসনা করা।

সর্বপ্রাণবাদ

আত্মাবাদ

কিন্তু ধর্মের ইতিহাস অবিচ্ছিন্ন অগ্রগতির ইতিহাস নয়। অনেক সময় এর অগ্রগতি বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে। আদিম ধর্মের ক্ষেত্রে অচেতন পদার্থের প্রতি অন্ধ ভক্তিবাদ যাকে 'fetishism' নামে অভিহিত করা হয়, ধর্মের অগ্রগামিতা সূচনা

1. 'fetish' পদটি পোর্তুগীজ 'fetico' শব্দ থেকে উদ্ভূত যার অর্থ হল মায়া বা জাদু (charm); ল্যাটিন factitius থেকেও উদ্ভূত হতে পারে যার অর্থ হল 'কৃত্রিম' (artificial)।

না করে, তার পশ্চাদগামিতা বা প্রতীপ গতি নির্দেশ করে। [১]'Fetish' হল কোন অচেতন বস্তু যাকে সাময়িকভাবে কোন আত্মার দ্বারা আশ্রিত মনে করে উক্ত আত্মার সাহায্য পাবার আশায় বা সৌভাগ্যলাভের জন্য পূজা করা হত। প্রাকৃতিক বস্তু হিসেবে তার কোন অন্তর্নিহিত মূল্য আছে বা সেটি গুরুত্বপূর্ণ এই কারণে তাকে নির্বাচিত করা হত না, এটি কোন আত্মার দ্বারা আশ্রিত, সেই কারণেই এটিকে নির্বাচিত করা হত। কোন অদ্ভুত আকৃতিবিশিষ্ট পাথরের টুকরো, কাঠের লাঠি, অস্থি, যে-কোন কিছুই 'fetish' রূপে গণ্য হতে পারে। আত্মা-আশ্রিত বলেই এর রহস্যময় শক্তি রয়েছে। অচেতন পদার্থ ও আত্মার মধ্যে কোন আঙ্গিক সম্পর্ক নেই। আত্মা খেয়ালখুশীমত অচেতন বস্তুকে আশ্রয় করে এবং খেয়ালখুশীমত অচেতন বস্তুটিকে পরিত্যাগ করে চলে যেতে পারে এবং তখন বস্তুটি তার রহস্যময় শক্তি হারিয়ে ফেলে। যতক্ষণ পর্যন্ত কার্যকর, ততক্ষণ পর্যন্তই আত্মা-আশ্রিত অচেতন পদার্থটিকে পবিত্র মনে করা হয়। তারপর তাকে অকেজো মনে করে দূরে ফেলে দেওয়া হয়। অবশ্য তার মানে এই নয় যে, অচেতন পদার্থের প্রতি অন্ধ ভক্তিবাদ (fetishism) পরিত্যক্ত হয়, কারণ পরিত্যক্ত অচেতন পদার্থের জায়গায় আর একটি অচেতন পদার্থকে নির্বাচিত করা হয়। অচেতন পদার্থের প্রতি অন্ধ ভক্তিবাদ হল নিম্নতর ধর্মের একটি রূপ। এর পটভূমিকায় রয়েছে প্রগতিমূলক আত্মাবাদের ধারণা, কিন্তু এ হল ধর্মের প্রশস্ত রাজপথ থেকে সরে এসে চোরা গলিতে ঢুকে পড়া। ধর্মের তুলনায় জাদুর (magic) সঙ্গেই এর মিল বেশী, কারণ 'fetish' হল ব্যক্তিগত দেবতা যাকে আদিম নরনারী প্রলুব্ধ করতে চায় বা তার ইচ্ছামত তাকে কাজ করতে বাধ্য করতে চায়। এটি ধর্মের অবনয়ন (degradation) সূচনা করে, কেননা এটি ব্যক্ত করে যে মানুষ উচ্চতর শক্তির উপর নির্ভর না করে, সেইগুলিকে নিজের অভীষ্ট সিদ্ধ করার জন্য বাধ্য করতে চায়। এই ধরনের ধর্মবিশ্বাস বা পূজা-পদ্ধতি যখন প্রাধান্য লাভ করে, তখন ধর্মের মধ্য থেকে নতুন আধ্যাত্মিক ধারণা উদ্ভূত হতে পারে না। কাজেই মায়েল এডওয়ার্ডস্-এর অভিমতানুসারে এই জাতীয় ধর্মবিশ্বাস প্রতীপ গতিবিশিষ্ট বা পশ্চাদাভিমুখী, কলঙ্কজনক, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যমূলক এবং খেয়ালী মনোভাবের পরিচায়ক (retrogressive, debasing, individualistic, capricious)।

অচেতন পদার্থের প্রতি অন্ধ ভক্তি—ফীটিশবাদ

এটি নিম্নতর ধর্মের একটি রূপ

এডওয়ার্ডস্-এর মন্তব্য

ধর্মের এই নিম্নতর রূপটিকে উপেক্ষা করে আমরা এবার আদিম নরনারীর বহুআত্মা-উপাসনাবাদ (Polydæmonism) সম্পর্কে আলোচনা করব। এই মতবাদ অনুসারে

সমস্ত বিশ্বজগৎ বহু অদৃশ্য আত্মার দ্বারা পরিপূর্ণ যারা যে কোন মুহূর্তে মানুষের সুবিধা বা অসুবিধার সৃষ্টি করে নিজেদের উপস্থিতিকে মানুষের পক্ষে অনুভবগম্য করে তুলতে পারে। এই আত্মাগুলিকে তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যেতে পারে—(১) যেসব আত্মা প্রাকৃতিক বস্তু, যেমন—নদী, হ্রদ, পর্বত, সমুদ্র, বৃক্ষ, প্রস্তর প্রভৃতির অন্তর্ভুক্ত। এই সব বস্তুর সবগুলিই আদিম নরনারীর উপাস্য নয়, যেগুলিকে সে নিজের থেকে বেশী শক্তিসম্পন্ন মনে করার জন্য, নির্বাচন করে নিত, সেইগুলিই উপাস্য হত। এই সব বস্তুর মধ্যে যেগুলি অদ্ভুত ধরনের, মনে শিহরণ জাগায় বা অদ্ভুত প্রকৃতিবিশিষ্ট তাদের প্রতিই আদিম নরনারী আকৃষ্ট হত। (২) মৃত ব্যক্তিদের আত্মা—আদিম নরনারী বিশ্বাস করত যে আত্মা মৃত্যুর পরও অস্তিত্বশীল এবং এই আত্মার ভাল বা মন্দ করার ক্ষমতা মৃত্যুর দ্বারা বৃদ্ধি পায়। (৩) প্রকৃতির মহান বস্তুকে আশ্রয় করে যে-সব আত্মা অস্তিত্বশীল (The great Nature Spirits): প্রকৃতির মহান বস্তু যেমন আকাশ, সূর্য, চন্দ্র, নক্ষত্র, পৃথিবী—এদের আত্মা আছে এবং এইগুলি উপাসনার বস্তু। কেউ কেউ এমন অভিমত প্রকাশ করেছেন যে, আদিম নরনারীর মনে সব আত্মার উপরে অবস্থিত এক পরম আত্মার (Supreme spirit) ধারণাও বিরাজ করত। এনড্রু লেঙ্গ (*Andrew Lang*) এই সম্পর্কে বলেন, কিছু নিম্নতর আদিম নরনারী খ্রীষ্টানদের মতনই একেশ্বরবাদী, তারা এক পরমসত্তায় বিশ্বাসী। একথা সত্যি যে এক মহান ঈশ্বরের ধারণা আদিম নরনারীর কাছে একেবারে অজ্ঞাত ছিল না; কিন্তু এই ধারণা মোটেও আদিম ধারণা নয়, ধর্মের এক উন্নত স্তরেই এই ধারণার আবির্ভাব। যদি কোথাও এই ধারণার অস্তিত্ব ছিল, তাহলে সেটা ছিল খুব অস্পষ্ট আকারে, তাদের জীবনে এই ধারণা কার্যকর ছিল না। তারা এই ধারণার পূজাও করত না। এডওয়ার্ডস্ (*Edwards*) এই সম্পর্কে যে অভিমত ব্যক্ত করেন তাহল, যেহেতু কোন কোন আদিম অধিবাসীদের মধ্যে এক পরম ঈশ্বরের ধারণার সন্ধান পাওয়া যায় তার দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, একেশ্বরবাদে বিশ্বাস সংস্কৃতির এক নিম্নস্তরে অস্পষ্টভাবে নিজেকে প্রকাশ করতে শুরু করেছিল।

বহুআত্মাউপাসনাবাদের পরিচয়

আত্মার শ্রেণীবিভাগ

আদিম নরনারীর একেশ্বরবাদে বিশ্বাস

উপজাতীয় ধর্মের ত্রুটি একাধিক। **প্রথমতঃ,** এই জাতীয় ধর্মে ভয়ের প্রাধান্য। সর্বপ্রাণবাদী নিজেকে প্রতিকূল আত্মার কৃপার পাত্র বলে গণ্য করে। **দ্বিতীয়তঃ,** উপজাতীয় ধর্ম অত্যন্ত সঙ্কীর্ণপরিধিযুক্ত এবং বর্জনমূলক মনোভাববিশিষ্ট। এই ধর্ম তার দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে

উপজাতীয় ধর্মের ত্রুটি

উপজাতির সভ্য ভিন্ন অন্য কাউকেও অন্তর্ভুক্ত করতে নারাজ। **তৃতীয়তঃ,** উপজাতিদের মধ্যে ধর্মভাবাপন্ন ব্যক্তিবিশেষের (religious individual) অস্তিত্ব নেই। কেননা উপজাতির মধ্যে ধর্ম কোন অর্থেই ব্যক্তির নিজস্ব বিষয় নয়, ধর্ম হল সমগ্র উপজাতিরই বিষয়। আদিম নরনারী ভাবতেই পারে না যে চারপাশের সব উপজাতির সঙ্গে সে একই ধর্মের অংশীদার। সে মনে করত তার দেবতা শুধুমাত্র তারই গোষ্ঠীর জন্য, অন্য গোষ্ঠীর জন্য নয়। তাছাড়া এই ধারণাও তাদের মধ্যে বিরাজ করত, যে দেবতা হল গোষ্ঠীর পূর্বপুরুষ। এর ফলে ধর্মের বন্ধন স্বাভাবিক ভাবেই গোষ্ঠীর মধ্যে সীমিত ছিল। **চতুর্থতঃ,** আত্মাদের দেবতারূপে অভিহিত করা চলে না, কারণ তাদের ব্যক্তিত্ব ছিল অস্পষ্ট এবং অনির্দিষ্ট। যদিও ক্ষমতাসম্পন্ন, তবু বহুদেববাদের উন্নত দেবতাদের প্রকৃতির তুলনায় তারা ছায়াময় এবং সুস্পষ্ট প্রকৃতি-বিহীন। উপজাতীয় ধর্মে কার্যকারণতত্ত্বকে খেয়াল খুশীমত প্রয়োগ করা হত যার ফলে কাকতালীয় দোষের (*post hoc ergo propter hoc*) উদ্ভব ঘটত। 'এই ঘটনার পরে এটা ঘটেছে, সুতরাং পূর্ববর্তী ঘটনা পরবর্তী ঘটনার কারণ'—এই নীতিকে স্বাধীনভাবে উপজাতীয় ধর্মে প্রয়োগ করা হত। একটি ঘটনার সঙ্গে অপর একটি ঘটনার শুধুমাত্র কালিক সংযোগ থাকলেও, উপজাতীরা মনে করত ঘটনা দুটি কার্যকারণ সম্বন্ধযুক্ত। কোন আদিম মানুষ একটা উট দেখার পর, তাদের পাড়াতে হয়ত বসন্ত মহামারীর আবির্ভাব ঘটল। দ্বিধাহীনভাবে সে সিদ্ধান্ত করল যে, উটের আবির্ভাবই বসন্ত রোগের আবির্ভাবের কারণ।

উপজাতীয় ধর্মের আর এক বৈশিষ্ট্য হল যাকে তারা ব্যাখ্যা করতে পারত না তাকেই আত্মার কার্য বলে সিদ্ধান্ত করত। রোগ, মূর্ছা, বিকার, সব কিছুই তারা আত্মার সাহায্যে ব্যাখ্যা করত। ওষুধ প্রয়োগে রোগ নীরোগ হলে তারা বলত ওষুধের আত্মা, রোগের আত্মাকে বিতাড়িত করেছে। কাজেই উপজাতীয়দের দেবতা, আমরা ঠিক ব্যাখ্যা বলতে যা বুঝি, সেই অর্থে বিস্ময়ের ব্যাখ্যা দিতে পারত না। এর কারণ আদিম মানুষের চিন্তা, অভিজ্ঞতার মধ্যে সংযোগ ও সঙ্গতি সন্ধান করার প্রয়োজন বোধ করত না। বিচারবিযুক্ত (dogmatic) মনোভাবের জন্য অভিজ্ঞতার শ্রেণীবিভাগ এবং বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে পার্থক্যের ব্যাপারটি আদিম মানুষের জানা ছিল না, যার ফলে সে বিভিন্ন বিষয়কে একসঙ্গে মিশিয়ে দিয়ে তাদের দুর্বোধ্য করে তুলত।

যাকে ব্যাখ্যা করা যেত না তাকেই আত্মার কার্য মনে করা হত

জড়াত্মক এবং আধ্যাত্মিক বিষয়কে একত্র মিশিয়ে দেবার যে প্রবণতা আদিম

মানুষের মধ্যে ছিল, উপজাতীয় দেবতার ধারণার ক্ষেত্রেও সেই মনোভাবের প্রতিফলন ঘটে ছিল। কাজেই আমরা ঠিক আধ্যাত্মিক বলতে যা বুঝি, উপজাতীয়দের দেবতা ঠিক সেই অর্থে আধ্যাত্মিক ছিল না। তাদের কম বেশী জড়াত্মকরূপে ধারণা করা হত এবং তাদের একটা স্থানীয় আশ্রয়ের প্রয়োজন ছিল। আত্মাকে কোন জড় বস্তুতে আশ্রয় নিতে হত। কারণ আশ্রয়হীন কোন দেবতাকে আবাহন করা উপজাতীয়দের পক্ষে সম্ভব ছিল না। উপজাতীয় ধর্ম দেবতাকে কোন প্রত্যক্ষগ্রাহ্য বস্তুতে অবস্থিত দেখতে চায়। শুদ্ধ অতীন্দ্রিয় আত্মার ধারণা আদিম নরনারীর অজ্ঞাত ছিল। **পঞ্চমতঃ,** দেবতাদের যদিও একটা স্থানীয় আবাসস্থল আছে, তাদের কোন নাম নেই। তারা হল নামহীন সত্তা। এমন কিছু নেই, এমন কি, একটা ব্যক্তিগত নামও নেই যার দ্বারা দেবতাদের পরস্পরের থেকে পৃথক করা যায়।

উপজাতীয় দেবতার ক্ষেত্রে জড়াত্মক এবং আধ্যাত্মিক বিষয়ের একত্র মিশ্রণ

ষষ্ঠতঃ, এই দেবতারা মানুষের থেকে মহৎ বা শ্রেষ্ঠ নয়, তারা মানুষের তুলনায় অধিক ক্ষমতাশালী ও ধূর্ত মাত্র। পবিত্রতা, সাধুতা, ভালবাসা প্রভৃতি নৈতিক সদগুণগুলি আদিম নরনারীরা কখনও এই সব দেবতাদের ক্ষেত্রে আরোপ করে নি। যে একটি মাত্র গুণ এই দেবতাদের ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হত, তাহল ক্ষমতা এবং এই ক্ষমতার প্রয়োগ ছিল খেয়ালখুশীর নামান্তর, দায়িত্বহীনতার পরিচায়ক ও বিপদজনক। উপজাতীয়দের ধর্ম-সম্পর্কীয় চিন্তার পিছনে ছিল তাদের উদ্দেশ্যের স্থূলতা। দেবতাদের কাছে যা তারা চাইত, তাদের সেই চাওয়ার উপর ছিল দৈনন্দিন জীবনের অভাবের প্রতিফলন। পার্থিব কল্যাণ লাভের বাসনার দ্বারা এই ধর্মবিরোধ বিশেষভাবে প্রভাবিত ছিল। এইসব আত্মার কাছে যা প্রার্থনা করা হত তাহল স্বাস্থ্য, খাদ্যের প্রাচুর্য, সন্তান-সন্ততি, যুদ্ধে সাফল্য প্রভৃতি জাগতিক কল্যাণ; সৎ জীবনযাপনের জন্য সহায়তা কামনা করা হত না। উপজাতীয় ধর্মের একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল এর রক্ষণশীল মনোভাব। অসীম ধৈর্য ও নিষ্ঠার সঙ্গে আদিম নরনারী নিজের ধর্মকে আঁকড়ে থাকত। সমাজের অসংখ্য পরিবর্তন সত্ত্বেও পুরাতন বিশ্বাস ও আচার-অনুষ্ঠান এরা বর্জন করত না। উপজাতীয় ধর্ম জাদুতে বিশ্বাসের দ্বারা প্রভাবিত হত। এর ফলে এই ধর্মে কুসংস্কারের প্রাধান্য ছিল এবং পবিত্র ও উন্নত উপাদানের অভাব পরিলক্ষিত হত।

পূর্বোক্ত ত্রুটি সত্ত্বেও, **উপজাতীয় ধর্মের গুণ** বা ভাল দিকগুলিকে উপেক্ষা করা যুক্তিসঙ্গত নয়। **প্রথমতঃ,** আদিম নরনারীর মধ্যে যে আত্মার ধারণা ছিল, তা আমাদের কাছে অনুপযোগী মনে হলেও বর্তমানের সংস্কৃতিসম্পন্ন ব্যক্তির সূক্ষ্ম ধারণার

সঙ্গে তার সাদৃশ্য বর্তমান। উপজাতীয়দের ধর্মে স্থূল প্রকৃতি-উপাসনার তুলনায় আত্মাবাদ কিছুটা অগ্রগতি সূচিত করে, কারণ আত্মাবাদ আত্মার এক অলৌকিক জগতের ধারণা ব্যক্ত করে, যে জগৎ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুর মধ্য দিয়ে ক্রিয়া করে কিন্তু তার সঙ্গে অভিন্ন নয়। **দ্বিতীয়তঃ,** উপজাতীয় ধর্ম পূর্বপুরুষদের আত্মা, বা উপজাতিদের দেবতাদের প্রতি আনুগত্যের মনোভাবকে উৎসাহিত করার মধ্য দিয়ে সামাজিক সংহতিকে সুদৃঢ় করেছে এবং উপজাতীয় সভ্যদের মধ্যে একটা সাধারণ বাধ্যতাবোধের সৃষ্টি করেছে। বিশেষ করে টোটেমবাদ সম্পর্কে এটা সত্য। টাইলর বলেন যে, আদিম নরনারীদের সর্বপ্রাণবাদ নৈতিক উপাদান-বর্জিত—একথা অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু উপজাতীয়রা যে রীতিনীতি ও আচার-ব্যবহারের প্রতি আনুগত্যের উপর জোর দিয়েছে, তার থেকেই সমগ্রের কল্যাণের উদ্ভব হয়; কাজেই এই আনুগত্যই হল মূল যার থেকে নৈতিক চেতনার উদ্ভব ঘটে। গ্যালোয়ে বলেন, "খুব প্রাথমিক অবস্থাতে হলেও আমরা এখানে মানুষের ইচ্ছার একটা আদর্শের ধারণা পাচ্ছি যা সকলে সকলের কল্যাণের জন্য স্বীকার করে নেয়। উপজাতীয় আনুগত্য যদিও এক অর্থে সংরক্ষণশীলতার পরিচায়ক, আর এক অর্থে আধ্যাত্মিক উন্নতির শর্তস্বরূপ।" এডওয়ার্ডস্ বলেন, "এটি ব্যক্তির মধ্যে সামাজিক মানদণ্ডের কাছে নিজের কামনা-বাসনাকে অধীন করার মনোভাব জাগিয়ে তোলে।' **শেষতঃ,** আদিম গোষ্ঠীর সভ্যদের মধ্যে রক্তের বন্ধন তাদের ঐক্যবদ্ধ করে, এই ধারণা থেকেই ধর্মীয় সমাজের আধ্যাত্মিক ভ্রাতৃত্ববোধের উন্মেষ ঘটে।

উপজাতীয় ধর্মের গুণ

(খ) জাতীয় ধর্ম (National religion): উপজাতির অস্তিত্ব বেশী দিন টিকে থাকে না। হয় কোন সাধারণ শত্রু থেকে উদ্ভূত ভয়ের চাপ, অথবা কোন শক্তিশালী উপজাতির দ্বারা একাধিক উপজাতিকে পরাজিত করে যুদ্ধে জয়লাভ এবং তার ফলে শক্তিশালী কর্তৃক দুর্বলের উপর আধিপত্য প্রভৃতি কারণবশতঃ অনেকগুলি উপজাতির যখন সংমিশ্রণ ঘটে তখন উপজাতি জাতিতে রূপান্তরিত হয়। জাতির উদ্ভব অর্থে বোঝায় মানুষের আগ্রহের ব্যাপকতা, মানুষের কার্যের বর্ধমান পৃথক্করণ এবং আনুষঙ্গিক ব্যক্তিগত চেতনার উন্মেষ। সঙ্গে সঙ্গেই নূতন ধর্মের আবির্ভাব ঘটে না, পরিবর্তন ধীরে ধীরে ঘটতে থাকে। সামাজিক সংগঠনের ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে ধর্মেরও ক্রমবিকাশ দেখা দেয়। যখন উপজাতি জাতিতে রূপান্তরিত হয় তখন উপজাতীয় ধর্ম জাতীয় ধর্মে রূপান্তরিত হয়। এর ফলে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন সূচিত হয়—বহুআত্মা পূজাবাদ (polydaemonism) বহুদেববাদে (polytheism) রূপান্তরিত

হয়। এটা নিঃসন্দেহে একটা গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি। বহু আত্মার পূজা যখন বহু দেবতার পূজায় রূপান্তরিত হয় তখন প্রাকৃতিক আত্মাগুলিতে ধীরে ধীরে নরত্ব আরোপিত হয়, অর্থাৎ কিনা এইসব প্রাকৃতিক আত্মা মানবসুলভ প্রবৃত্তি ও বৃত্তির অধিকারী হয় এবং এক একটি বিশিষ্ট নামের অধিকারী হয়ে মানুষের মতনই তাদের আহ্বান করা হয়। স্রোতস্বিনী, বৃক্ষ, মেঘ, অগ্নি প্রভৃতি প্রাকৃতিক বস্তুতে অবস্থানকারী আত্মাগুলি ক্রমশঃ দেবতার পর্যায়ে উন্নীত হল। পৃথিবীর ঊর্ধ্বে স্বর্গলোক হয় এদের আবাসস্থল কিন্তু প্রাকৃতিক বস্তুর সঙ্গে এদের সংযোগের বিষয়টি তখনও পর্যন্ত বিস্মৃতির বিষয় হয়ে ওঠে না। ক্রমশঃ প্রাকৃতিক বস্তুর সঙ্গে দেবতাদের সংযোগের বিষয়টি সকলেই ভুলে যায় এবং এই সব দেবতা, যাদের ক্ষেত্রে নরত্ব আরোপিত হয়েছে, জীবন ও রাষ্ট্রের বিভিন্ন বিভাগের যেমন সুখ, প্রেম, কলা, অদৃষ্ট প্রভৃতির রক্ষাকর্তা ও প্রধানরূপে গণ্য হতে থাকে। নরসুলভ গুণসম্পন্ন জাতীয় দেবতার একাধিক উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে, যেমন গ্রীক দেবতা অ্যাপোলো, মিশরের দেবতা ওসিরিস, বৈদিক দেবতা বরুণ, ভারতীয় দেবতা বিষ্ণু যখন দেবতাদের ক্ষেত্রে নরসুলভ গুণগুলি আরোপিত হল তখন মানুষ তাদের মরণশীল জীবের অনেক ঊর্ধ্বে প্রতিষ্ঠিত করল। তারা হয়ে উঠল এক অতি-জগতের অধিবাসী, যে জগৎ আধা-প্রাকৃতিক, আধা আধ্যাত্মিক, যেখানে এই সব দেবদেবী নিজেদেরই একটা সমাজ গড়ে তুলল। তাদের জীবনও হয়ে উঠল নাটকীয়-ঘটনা, পারস্পরিক হিংসা, বিদ্বেষ, ভালবাসা, যুদ্ধ, ষড়যন্ত্র প্রভৃতিতে পূর্ণ।

উপজাতীয় ধর্মের জাতীয় ধর্মে রূপান্তর

জাতীয় ধর্মের ক্রমবিকাশের ক্ষেত্রে দুটি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন উল্লেখযোগ্য। (১) দেবতাদের নৈতিক গুণসম্পন্ন করা (the moralization of the gods) এবং (২) বহুদেববাদের একেশ্বরবাদের দিকে অগ্রগতি (the movement in the direction of monotheism)। এই দুই পরিবর্তনই বিশ্বজনীন ধর্মের গতিধারা প্রশস্ত করে দেয়। এই দুই পরিবর্তনের সঙ্গে আরও একটি বিষয়ের উল্লেখ করা যেতে পারে যেটি হল, (৩) বিশেষ ধর্ম-সম্বন্ধীয় ক্রিয়ার উৎপত্তি, যেমন উৎসর্গ (sacrifice) এবং উপাসনা (prayer)।

জাতীয় ধর্মের ক্রমবিকাশের ক্ষেত্রে দুটি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন

(১) দেবতাদের নৈতিক গুণসম্পন্ন করা: প্রাকৃতিক বস্তুর আত্মাদের ক্ষেত্রে নৈতিক চরিত্র আরোপ করা চলে না। কিন্তু যখন এইসব আত্মাদের প্রাকৃতিক জগৎ ও জাগতিক শক্তির ঊর্ধ্বে এক অলৌকিক জগতের অধিবাসী রূপে গণ্য করা হতে লাগল এবং যখন নরসুলভ গুণ তাদের ক্ষেত্রে আরোপিত হল, তখন দেবতাদের নৈতিক চরিত্রের কথা বলা হতে লাগল। দেবতাকে মনে করা হতে লাগল ন্যায়পরায়ণ

এবং সাধু, শ্রেষ্ঠ সৎগুণের অধিকারী এবং নৈতিক শৃঙ্খলার সংরক্ষক, যিনি সাধু ব্যক্তিদের পুরস্কৃত করেন এবং অসাধু ব্যক্তিকে শাস্তি দেন।

পূর্বে দেবতারা ছিল প্রাকৃতিক শক্তি যার উপর মানুষ নির্ভর করত। কিন্তু এখন দেবতারা হয়ে উঠল নৈতিক শক্তি, অনুকরণযোগ্য আচরণ ছাঁদ এবং নৈতিক জগৎ শৃঙ্খলার সংরক্ষক। মানুষ যে পরমমূল্যের সঙ্গে পরিচিত, সেই পরমমূল্যের সংরক্ষক হয়ে উঠল এই দেবতারা।

দেবতাদের নৈতিক গুণসম্পন্ন করার প্রচেষ্টায় কতকগুলি সদ্‌গুণ প্রায়শই কতকগুলি দেবতাদের সঙ্গে যুক্ত করা হত। সেই সব দেবতাদের এইসব সদ্‌গুণের প্রতীক মনে করা হত। যেমন বৈদিক দেবতা ইন্দ্র, ল্যাটিন দেবতা মার্‌স্ এবং টিউটোনের দেবতা থোর হল সাহসের প্রতীক ; বৈদিক দেবতা বরুণ, মিশরীয় দেবতা ওসিরিস হল ন্যায়ের সংরক্ষক ; গ্রীক দেবী পোলাস জ্ঞানের এবং গ্রীক দেবী হেসটিয়া সতীত্বের প্রতীক। প্রাক্ খ্রীষ্টান সময়ে বিশেষ করে খ্রীষ্টীয় ধর্মগ্রন্থ বাইবেলের পূর্বভাগে (old testament) দেবতাদের নৈতিক গুণের প্রতীকরূপে কল্পনা করায় বিষয়টি সর্বোচ্চ সীমায় উপনীত হয়। যদিও দেবতার নৈতিক চরিত্রের উজ্জ্বল বর্ণনা অনেক প্রাচীন ধর্মের পবিত্র সাহিত্যেও দেখা যায়।

(২) বহুদেববাদের একেশ্বরবাদের দিকে গতি : বহুদেববাদের একেশ্বরবাদে রূপান্তর নিম্নলিখিত তিনটি রূপের যে কোন একটি গ্রহণ করতে পারে। **প্রথমতঃ**, অন্যান্য দেবতাদের তুলনায় কোন একটি দেবতাকে মহিমান্বিত করা। প্রাকৃতিক জগতে মানুষের মধ্যে যে সামাজিক শৃঙ্খলা বিদ্যমান তাকে দেবতাদের পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা। পৃথিবীতে যেমন রাজতন্ত্র বিদ্যমান, কল্পনা করা হল স্বর্গলোকেও অনুরূপ রাজতন্ত্র বিদ্যমান। কাজেই দেবতাদের পরস্পর সমান, স্বনির্ভর বা প্রতিদ্বন্দ্বী গণ্য না করে স্বর্গলোকে একই পরমদেবতার নেতৃত্বে ক্রমোচ্চ শ্রেণীভুক্ত বলে গণ্য করা হতে লাগল। যেমন গ্রীক দেবতাদের মধ্যে জিউসকে, রোমানদের মধ্যে জুপিটারকে দেবতাদের নেতারূপে কল্পনা করা হত। এই জাতীয় বিশ্বাসকে রাজতন্ত্রবাদ (Monarchianism) নামে অভিহিত করা হত।

ধর্মে রাজতন্ত্রবাদ

দ্বিতীয়তঃ, একেশ্বরবাদের দিকে যে গতি তা আরও প্রত্যক্ষ হয়ে উঠতে থাকে, যাকে ম্যাক্সমূলার (*Max Muller*) এক পরমসত্তার বহু দেবতার মিলন (henotheism) নামে অভিহিত করেছেন। যদিও বহু দেবতা অস্তিত্বশীল তবু উপাসক দেবতার প্রতি ভক্তি জানাতে গিয়ে কোন একটিমাত্র দেবতার উপর এত বেশী মনোযোগ নিবদ্ধ করেন যে, সেই দেবতা সাময়িক ভাবে একটি বিশ্বশক্তির স্তরে উন্নীত হন এবং অন্যান্য

শক্তিগুলিকে গ্রাস করেন। এই হল ধর্মীয় বিশ্বাসের তুলনায় ভক্তির মনোভাব, মস্তিষ্কের তুলনায় হৃদয়েরই এখানে প্রাধান্য। প্রাচীন বৈদিক সাহিত্যে ম্যাক্সমূলার এই মনোভাব আবিষ্কার করেন। কখনও বা দেবী অদিতি, কখনও বা বরুণ দেব বা মিত্র দেব শ্রেষ্ঠ দেবতার আসন গ্রহণ করেন এবং অন্যান্য দেবতারা সাময়িকভাবে পটভূমিকায় সরে যান। ভক্তির তীব্রতা অন্তর্হিত হলে যে দেব বা দেবী সর্বশ্রেষ্ঠ আসন লাভ করেছিলেন, তিনি আবার স্বাভাবিক মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হন এবং অন্য দেবদেবীর মতন তিনিও একজন স্বাভাবিক দেবদেবী রূপে গণ্য হন। বৈদিক ছাড়া অন্যান্য ধর্মে, যেমন প্রাচীন মিশরীয় ধর্মেও এই মনোভাব দৃষ্ট হয়।

বহু দেবতার এক পরম দেবতায় মিলন

তৃতীয়তঃ, বহু থেকে একের দিকে গতির মনোভাব আরও পরিলক্ষিত হয় যখন সব দেবতাকে এক পরম দ্রব্যের (substance) অবভাস (appearance) রূপে গণ্য করা হতে লাগল। একে একেশ্বরবাদ (monotheism) রূপে গণ্য না করে সর্বেশ্বরবাদ (pantheism) রূপে অভিহিত করাই যুক্তি-সঙ্গত। প্রাচীন মিশরে সূর্য দেবতাকে সব দেবতার আত্মা রূপে বর্ণনা করা হয়েছে, উপনিষদে ব্রহ্মই একমাত্র সত্তা, বিশ্বজগৎ নিছক মায়া বা অধ্যাস (illusion)। দেবতার বহুত্ব এক পরম সত্তা বা দ্রব্যে নিঃশেষ হল। ভারতে এই সর্বেশ্বরবাদ কিন্তু সাধারণের উপাসনার ব্যবহারিক প্রয়োজন মেটাবার জন্য বহু দেববাদকেও স্বীকার করে নিয়েছে। গ্রীস দেশে জেনোফেন, পারমেনাইডিস্, স্টোয়িকস্ প্রভৃতি দার্শনিকবৃন্দ সর্বেশ্বরবাদের বিকাশ ঘটান।

দেবতা পরম দ্রব্যের অবভাস

চতুর্থতঃ, ইসরায়েলের (Israel) ধর্মেতেই একেশ্বরবাদের চরম বিকাশ ঘটে। ঈশ্বরের ঐক্যে এবং সর্বময় কর্তৃত্বে বিশ্বাস ইহুদীদের ধর্মবিশ্বাসের স্তম্ভ ও ভিত্তিপ্রস্তর। এক ঈশ্বরে বিশ্বাস এবং ঈশ্বরের নৈতিক চরিত্রে বিশ্বাস—এক কথায় নৈতিক একেশ্বরবাদ —বিশ্বের আধ্যাত্মিক ভাণ্ডারে ইহুদীদের প্রধান অবদান।

(গ) ধর্মীয় ক্রিয়া, বিশেষ করে উৎসর্গ (sacrifice) এবং প্রার্থনার (prayer) বিকাশ: ধর্মের ইতিহাস শুধুমাত্র দেবদেবীতে বিশ্বাসের ক্রমবিকাশের ইতিহাস নয়। যেসব ক্রিয়ার মাধ্যমে মানুষ দেবতাদের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করতে সচেষ্ট হয়েছিল তারও ইতিহাস। ধর্ম শুধুমাত্র ঈশ্বরের প্রকৃতি সম্পর্কে অনাবশ্যক মতবাদ গঠনের ব্যাপার নয়। মূলতঃ ধর্ম হল দেবতাদের সঙ্গে আন্তরিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার ব্যাপার, যার পরিণতি হল সাহচর্য। এই সাহচর্য লাভের দুটি প্রধান উপায় হল—উৎসর্গ এবং প্রার্থনা। এর শুরু কিন্তু উপজাতীয় বা আদিম নরনারীর ধর্মে। কিন্তু

জাতীয় ধর্মে বা যে ধর্ম বহু দেববাদে বিশ্বাস সূচনা করে তাতে উপাসনা পদ্ধতির উল্লেখযোগ্য উন্নতি পরিলক্ষিত হয়।

(i) **উৎসর্গ** (Sacrifice) : রাইট (*Wright*) বলেন, "যে কোন উৎসর্গের ক্ষেত্রে সমাজস্বীকৃত মূল্যের সংরক্ষণকে পাবার জন্য মানুষ কোন এক ধরনের ক্রিয়া বা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে অন্তত আপাত-ব্যক্তিবৈশিষ্ট্যসূচক কোন অলৌকিক সত্তার সঙ্গে (কোন প্রেতাত্মা, কোন আত্মা, কোন দেবতা বা এক বিশ্বজনীন দেবতা) সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার জন্য সচেষ্ট হয়।"[1]

উৎসর্গের প্রকৃতি

যেসব অনুষ্ঠানে উৎসর্গ করা হয় সেই সব অনুষ্ঠানে অলৌকিক সত্তার প্রতি বিভিন্ন ধরনের মনোভাবের প্রকাশ ঘটতে পারে। **প্রথমতঃ**, ঐ অলৌকিক সত্তাকে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা হতে পারে অর্থাৎ কিনা তাকে কোন জাদু মন্ত্রের দ্বারা উপাসকের ইচ্ছামত কার্য করতে বাধ্য করা হয়। **দ্বিতীয়তঃ**, অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্য দেবতাকে শক্তিশালী করে তোলা যাতে দেবতা উপাসকের কল্যাণকর কার্যটি সম্পন্ন করতে পারেন। **তৃতীয়তঃ**, উৎসর্গের মাধ্যমে দেবতাদের কাছ থেকে পাওয়া অনুগ্রহের জন্য কৃতজ্ঞতার মনোভাব প্রকাশিত হয়। কিন্তু এই কৃতজ্ঞতার মনোভাব অতি সহজেই দেবতাদের সঙ্গে দর কষাকষির (bargaining) মনোভাবে পরিণত হয়। দেবতাদের উদ্দেশ্যে যে উৎসর্গ করা হয় তার বিনিময়ে দেবতা উপাসককে তার আকাঙ্ক্ষিত অভীষ্ট প্রদান করেন। **চতুর্থতঃ**, কোন কোন উৎসর্গের মাধ্যমে দেবতার সঙ্গে সংযোগের (communion with a deity) ইচ্ছা ব্যক্ত হয়। দেবতার উদ্দেশ্যে যে খাদ্য উৎসর্গীকৃত হয়, উপাসক এবং দেবতা উভয়েই তার অংশ গ্রহণ করেন এবং তার ফলে দেবতার সঙ্গে মৈত্রীর সম্পর্ক সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। এই ধরনের উৎসর্গে দেবতাদের উদ্দেশ্যে কোন পশু বলি দেওয়া হত এবং সেটিকে সাধারণ খাদ্যরূপে গ্রহণ করা হত। উপাসক মনে করত যে এই খাদ্য গ্রহণের ফলে দেবতার ঐশ্বরিক গুণ তার মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হবে, ঐশ্বরিক মানার অধিকারী হয়ে উপাসক ক্ষমতাশালী হবে। **পঞ্চমতঃ**, দেবতাকে প্রসন্ন করা ও কৃতকর্মের জন্য প্রায়শ্চিত্ত করাও উৎসর্গের উদ্দেশ্য হতে পারে। ব্যক্তির কোন আচরণে দেবতা অপ্রসন্ন এবং ক্রুদ্ধ। দেবতার অনুগ্রহলাভ থেকে ব্যক্তি বঞ্চিত।

উৎসর্গের মাধ্যমে বিভিন্ন মনোভাবের প্রকাশ

1, "In any sacrifice .... man seeks through some sort of act or ceremonial to come into relations with a supernatural being of at least quasi-personal characteristics (a ghost, a spirit, a god or the one universal God), in order to secure the conservation of a socially recognized value."

—W. K. Wright : A Students' Philosophy of Religion ; Page 64

দেবতার সঙ্গে প্রীতির সম্পর্ক পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য এবং কৃতকর্মের জন্য প্রায়শ্চিত্ত করার উদ্দেশ্যে কোন উৎসর্গমূলক ক্রিয়া অনুষ্ঠানের একান্ত প্রয়োজন দেখা দেয়।

প্রার্থনার স্বরূপ

(ii) **প্রার্থনা** (Prayer) : প্রার্থনার স্বরূপ বর্ণনা করতে গিয়ে রাইট (*Wright*)[1] বলেন, "যে আনুষ্ঠানিক ক্রিয়ায় সমাজ-স্বীকৃত মূল্যের সংরক্ষণের জন্য শব্দের পুনরাবৃত্তি করা হয় তাকেই আমরা প্রার্থনা বলে গণ্য করতে পারি।"

বাহ্য রূপ যাই হোক না কেন, প্রার্থনা ধর্মের মতনই সর্বজনীন বিষয়। প্রার্থনা ধর্মের এমনই এক বৈশিষ্ট্য যে সেবেটিয়ার (*Sabatier*) প্রার্থনাকে ধর্মের সারবস্তু বলে গণ্য করেন। তিনি বলেন, 'ধর্ম হল অন্তরের প্রার্থনা' (prayer of the heart)।

দুটি ধারণার মধ্য দিয়ে প্রার্থনার ক্রমবিকাশ

দুটি ধারায় প্রার্থনার ক্রমবিকাশ ঘটেছে, প্রথমতঃ, প্রার্থনার পদ্ধতির (method দিক থেকে, দ্বিতীয়তঃ, প্রার্থনার বিষয়বস্তুর (objects) দিক থেকে। প্রকৃত প্রার্থনার যে পদ্ধতি তা জাদুমন্ত্রের (spell) থেকে স্বতন্ত্র। এটি হল আবেদনের, নৈতিক যুক্তি পরামর্শ দিয়ে কার্যে প্রবৃত্ত করার পদ্ধতি। বিনয় এবং শ্রদ্ধা হল প্রার্থনার বৈশিষ্ট্য। কিন্তু জাদুমন্ত্র হল জাদুর ব্যাপার। জাদু মন্ত্রে আদেশ ও বাধ্যতার পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়। আত্মনির্ভরতার ও স্বয়ং-সম্পূর্ণতার মনোভাব জাদুমন্ত্রে পরিস্ফুট। যদিও প্রার্থনা ও জাদুমন্ত্রের মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য বর্তমান কিন্তু বাস্তবে বিশেষ করে আদিম নরনারীর ধর্মে এবং কিছু পরিমাণে উন্নত ধর্মে তাদের সংমিশ্রণ লক্ষ্য করা যায়। ধর্মের বিবর্তন হল

প্রার্থনার পদ্ধতি

সেই প্রক্রিয়া যে প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে প্রার্থনাকে ক্রমশঃ জাদুমন্ত্রের থেকে স্বতন্ত্র করা হয়েছে, অবশ্য এই স্বতন্ত্রীকরণের প্রক্রিয়া কখনও পুরোপুরি ভাবে সম্পূর্ণতা লাভ করেনি। কিন্তু মানুষের নৈতিক চেতনার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে এই প্রক্রিয়া সম্পূর্ণতা লাভের পথে এগিয়ে গেছে। প্রার্থনার ক্রমবিকাশের পথে অলৌকিক সত্তাকে জাদুমন্ত্রের দ্বারা কার্য করতে বাধ্য করার বা জাদুসংক্রান্ত অনুষ্ঠানের দ্বারা এদের কার্যে সহায়তা করার পদ্ধতির অবসান ঘটেছে। মানুষ উপলব্ধি করতে পেরেছে যে আত্মা বা দেবতা, তার থেকে মহান এবং শক্তিশালী এবং তাদের পক্ষে মানুষের সহায়তার প্রয়োজন নেই এবং মানুষ তাদের বাধ্য করতে পারে না। আসলে ধর্মের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে প্রার্থনার জাদুমন্ত্রের দিক আধ্যাত্মিক মনোভাবে রূপান্তরিত হয়েছে। প্রার্থনার ক্রমবিকাশের দ্বিতীয় ধারণা হল প্রার্থনার বিষয়বস্তুর

1. "Where words are repeated in a ceremonial act for the conservation of socially recognized values we may consider them to constitute a prayer."
—W. K. Wright : A Students' Philosophy of Religion ; Pages 66-67

ধীরে ধীরে আধ্যাত্মিকরণ (spiritualizing of prayer)। আদিম যুগে প্রার্থনার একমাত্র লক্ষ্য ছিল জাগতিক সম্পদলাভের জন্য আকুল আবেদন। এই প্রসঙ্গে ই. বি. টাইলর (*E. B. Tylor*) বলেন, 'নিম্নতর সংস্কৃতিসম্পন্ন ব্যক্তিদের মধ্যে এমন কোন প্রার্থনার সন্ধান পাওয়া যায় না যা কৃতকর্মের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে বা সৎ জীবনযাপনের সহায়ক এরূপ নৈতিক কল্যাণ কামনা করে। কিন্তু ক্রমশঃ দেবতার কাছ থেকে নৈতিক এবং আধ্যাত্মিক আশীর্বাদ লাভের দিকেই মানবমনের আকাঙ্ক্ষার প্রকাশ ঘটতে থাকে এবং মানবমন ঈশ্বরের আশীর্বাদ লাভের চেয়ে তাঁর ইচ্ছার কাছে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করে তৃপ্ত হতে চায়। যথার্থ প্রার্থনার প্রয়োজনীয় শর্তরূপে অন্তরের শুচিতার উপর এবং চিন্তন ও উদ্দেশ্যের সততার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হতে লাগল।

প্রার্থনার বিষয়বস্তু

প্রার্থনার ক্ষেত্রে যে অসুবিধা দেখা দেবার সম্ভাবনা তা হল কতকগুলি বাঁধাধরা শব্দ যান্ত্রিকভাবে উচ্চারণ করাতেই প্রার্থনা শেষ হয়ে যেতে পারে। কিন্তু একথা বিস্মৃত হলে চলবে না যে যথার্থ বা প্রকৃত প্রার্থনা ঈশ্বরকে কোন কিছু করার জন্য বাধ্য করা নয় বরং অসীমের সঙ্গে একাত্মতা লাভের এবং এই জগতে ঈশ্বরের ইচ্ছার পরিপূর্ণ উপলব্ধির বাসনাই প্রকাশ করে।

প্রার্থনার সারবস্তু

উপজাতীয় ধর্মের দেবতাদের সঙ্গে তুলনা করলে জাতীয় ধর্মের দেবতাদের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। **প্রথমতঃ,** উপজাতীয় ধর্মের দেবতাদের তুলনায় জাতীয় ধর্মের দেবতারা হল নাম, গুণ ও ব্যক্তিগত চরিত্রের অধিকারী এবং তারা ভিন্ন ভিন্ন কার্য সম্পাদন করে। সেই কারণে উপাসক ও উপাস্যের মধ্যে যে ব্যক্তিগত সম্বন্ধ তা জাতীয় ধর্মের ক্ষেত্রে সম্ভব হয়। **দ্বিতীয়তঃ,** জাতীয় ধর্মের দেবতারা নৈতিক গুণের অধিকারী। **তৃতীয়তঃ,** দেবতারা শুধুমাত্র পরিচিত বস্তু না হয়ে শ্রদ্ধার বস্তু হয়ে ওঠে। **চতুর্থতঃ,** উপজাতীয় দেবতাদের ক্ষেত্রে কোন প্রত্যক্ষ বাহ্যবস্তু তাদের আবাসস্থল। কিন্তু জাতীয় ধর্মের দেবতাদের আবাসস্থল হল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অভিজ্ঞতার জগতের ঊর্ধ্বে অন্য এক জগৎ।

জাতীয় ধর্মে দেবতাদের বৈশিষ্ট্য

(গ) বিশ্বজনীন ধর্ম (Universal Religion)**ঃ** জাতীয় ধর্ম জাতিরই ব্যাপার। জাতীয় জীবন রাষ্ট্রের একটা বিভাগ। জাতীয় ধর্ম সেই জাতীয় জীবনেরই একটা দিক। রাষ্ট্রের দেবতাদের কেন্দ্র করে সরকার এবং জনসাধারণের দ্বারা স্বীকৃত যে ধর্মমত, তাই হল জাতীয় ধর্মের প্রাণকেন্দ্র। জাতীয় ধর্মে দেবতাদের সুসংগঠিত পূজা ও উপাসনার মাধ্যমে জাতীয় চেতনা ও আদর্শের প্রকাশ ঘটে। জাতীয় ধর্মের সঙ্গে ব্যক্তিবিশেষের

জাতীয় ধর্মে ব্যক্তিবিশেষের ভূমিকা

সম্পর্ক মুখ্য নয়, নিতান্তই গৌণ। জাতীয় ধর্মে, ধর্ম ব্যক্তিবিশেষের পছন্দ অপছন্দ বা ব্যক্তিগত বিশ্বাসের উপর নির্ভর নয়। জাতীয় ধর্মের ক্ষেত্রে ব্যক্তির রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য এবং জাতীয় রীতিনীতির সঙ্গে সঙ্গতিবিধান করে চলাই হল আসল কথা। জাতীয় ধর্মে ব্যক্তিবিশেষ পূজা ও উপাসনার অংশীদার হয় ব্যক্তিবিশেষ হিসেবে নয়, রাষ্ট্রের নাগরিক হিসেবে ; এবং নাগরিকের ধর্ম বলতে বোঝায় প্রয়োজনীয় এবং অনুমোদিত পূজাপদ্ধতিগুলি সঠিকভাবে এবং নিয়মিতভাবে সম্পাদন করা। জাতীয় ধর্মে ব্যক্তিবিশেষ তার ধর্ম নির্বাচন করতে পারে না। জাতীয় ধর্মে, ধর্ম সম্পর্কে ব্যক্তিবিশেষের নিজস্ব অভিমত তেমন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নয়। যা গুরুত্বপূর্ণ তাহল ব্যক্তিবিশেষের ধর্ম-সম্পর্কীয় ক্রিয়াকলাপ। ধর্মের বিবর্তনের এই স্তরে ব্যক্তিবিশেষের ধর্মীয় বিশ্বাসকে পরীক্ষা করে দেখার কোন প্রয়োজন অনুভূত হয় না। ব্যক্তিবিশেষ যতক্ষণ পর্যন্ত সরকারীভাবে স্বীকৃত ধর্মের প্রতি বাহ্য ভক্তিশ্রদ্ধা প্রকাশ করে বা সেই ধর্মমতের দাবীগুলি পূরণ করে, ততক্ষণ পর্যন্ত তাকে ধর্মপরায়ণ বলেই গণ্য করা হয়। এই স্তরে সমগ্র জীবনের বা ব্যক্তির সমগ্র চরিত্রের সঙ্গে ধর্মকে অভিন্ন করে দেখার প্রয়োজনও অনুভূত হয় না।

জাতীয় ধর্মে বাহ্য-প্রকাশের দিকটাই গুরুত্ব লাভ করে এবং সেই কারণে যে ধর্মপ্রবণ মন নিজের সম্পর্কে সচেতন এবং চিন্তাশীল, জাতীয় ধর্ম সেইসব ধর্মপ্রবণ মনের প্রয়োজন মেটাতে পুরোপুরিভাবে সমর্থ হয় না।

স্বেচ্ছাকৃত প্রচার এবং প্ররোচনার মাধ্যমে নিজের স্বাভাবিক সীমারেখাকে অতিক্রম করে নিজেকে ছড়িয়ে দেবার প্রবণতা জাতীয় ধর্মে বড় একটা দেখা যায় না। কখনও কখনও যুদ্ধ জয়ের মধ্য দিয়ে ধর্মের এই বিস্তৃতি সাধিত হয়। বিজিত বিজয়ীর ধর্মকে গ্রহণ করে। নিজের ধর্মমত হয়ত তখন কুসংস্কারমূলক আচার-অনুষ্ঠানে পর্যবসিত হয় বা বিজয়ীর ধর্মমতের সঙ্গে মিশে যায়। ধর্মোদ্দেশ্যে প্রেরিত ব্যক্তিদের দ্বারা ধর্মপ্রচারের কোন ব্যাপার জাতীয় ধর্মে নেই।

জাতীয় ধর্মের অব্যাপকতা

প্রাচীন এবং আধুনিক সভ্য জগতের সব ধর্মই এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। ব্যতিক্রম হিসেবে তিনটি বিশ্বজনীন ধর্মের উল্লেখ করা যেতে পারে। এই তিনটি ধর্ম হল বৌদ্ধধর্ম, খ্রীষ্টধর্ম এবং ইসলাম ধর্ম। এই তিনটি ধর্মমতের প্রতিটিই দাবী করে যে তার ধর্মমতে রয়েছে সমগ্র মানবজাতির জন্য মূল্যের বাণী এবং এই তিনটি ধর্মই তার নিজ নিজ স্বাভাবিক গণ্ডী অতিক্রম করে বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছে।

ধর্মে বিশ্বজনীনতা আকস্মিকভাবে এবং কোন পূর্ব প্রস্তুতি ছাড়া আত্মপ্রকাশ

করেনি। কয়েকটি জাতীয় ধর্মের মধ্যেই বিশ্বজনীন ধর্মে পরিণত হওয়ার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। এর উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত দেখা যায় খ্রীষ্টের জন্মের পূর্বে ষষ্ঠ শতাব্দী থেকে তৃতীয় খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত গ্রীসে ও রোমে প্রচলিত রহস্যময় ধর্মগুলিতে (mystery religions) এবং খ্রীষ্টের জন্মের পূর্বে অষ্টম শতাব্দী থেকে ষষ্ঠ শতাব্দী পর্যন্ত ইসরায়েলের মহান প্রচারকদের বাণীতে।

রহস্যময় ধর্ম

গ্রীসে ও রোমে জাতীয় দেবতাদের কেন্দ্র করে প্রাচীন ধর্মমতগুলি মানুষের গভীর আধ্যাত্মিক আকুলতাকে পরিতৃপ্ত করতে যতই ব্যর্থ হতে লাগল ততই সেইসব ধর্মমতের স্থান দখল করতে লাগল কতকগুলি রহস্যময় ধর্মমত।[1] ব্যক্তির আধ্যাত্মিক বাসনাকে এক আবেগের উচ্ছ্বাসের মাধ্যমে আত্মপ্রকাশের সুযোগ দেওয়াই ছিল এই সব ধর্মমতের প্রচেষ্টা, যে সুযোগ সাধারণ ধর্মানুষ্ঠানের মধ্যে ছিল না। এই সব ধর্মমতের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল কোন দেবতার সঙ্গে উপাসকের এক রহস্যময় মিলনের সুযোগ করে দেওয়া এবং উপাসককে প্রশান্তিপূর্ণ অমরতার নিশ্চয়তা প্রদান করা। যে কেহ ইচ্ছা করত এই ধর্মমত গ্রহণ করতে পারত। জাতীয় ধর্মমত যেমন শুধুমাত্র রাষ্ট্রের নাগরিকরাই গ্রহণ করতে পারত, এই ধর্মমতের ক্ষেত্রে সেরকম বাধা-নিষেধ ছিল না। জাতীয় ধর্মে ব্যক্তির জাতিত্বের প্রশ্নই বড় কথা। এই সব রহস্যময় ধর্মমতে ব্যক্তির স্বেচ্ছাকৃত ধর্মমত গ্রহণের প্রশ্নই আসল কথা।

রহস্যময় ধর্ম

যদিও ধর্মীয় চেতনার বিবর্তনে বিশ্বজনীন ধর্মের আবির্ভাব এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা, তবু মানব-চেতনার এই অগ্রগতির প্রস্তুতি প্রচ্ছন্নভাবে বিদ্যমান ছিল তার পূর্ববর্তী অবস্থার মধ্যে। আসলে একটা ধর্মীয় পরিবেশ ধীরে ধীরে দানা বেঁধে উঠছিল, যেই পরিবেশ ধর্মপ্রচারক এবং ধর্মসংস্কারকদের আবির্ভাবকে সম্ভব করে তুলেছিল। প্রাচীন সমাজের বৈচিত্র্যহীন একরূপতা ধীরে ধীরে বিদায় নিতে লাগল এবং ধর্ম ও অন্যান্য ব্যাপারে মানুষ তার চারপাশের ব্যক্তিদের থেকে নিজেকে স্বতন্ত্র করে দেখতে শুরু করল। ধর্মের আভ্যন্তরীণ দিকের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে মানুষ ক্রমশঃ উপলব্ধি করতে থাকে যে যেসব প্রাকৃতিক ধারণা এবং বাহ্য ক্রিয়ার মাধ্যমে প্রচলিত ধর্মগুলির প্রকাশ ঘটেছে সেইগুলি ধর্মজীবনের আকুলতা পরিতৃপ্ত করার পক্ষে যথেষ্ট নয়। ব্যক্তির আন্তর অনুভূতি ও বিশ্বাস, ধর্মীয়

ধর্মে বিশ্বজনীনতার সম্ভাবনা

---

1. "Some of the more important of them were of foreign origin, such as the cult of Cybele and Attis, which originated in Phrygia, the cult of Serapis and Isis, which found its way into Europe and Egypt and the cult of Mithra which came from Persia."

—Miall Edwards : The Philosophy of Religion ; Page 124

বিশ্বাস ও পূজা উপাসনার মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হতে চায়। আসলে ধর্ম যখন আভ্যন্তরীণ মানস অবস্থা এবং অন্তরের বিষয় হয়ে ওঠে, শুধুমাত্র বাহ্য আচার-অনুষ্ঠানের ব্যাপার নয়, তখনই সেই ধর্মে বিশ্বজনীনতার সম্ভাবনা প্রচ্ছন্নভাবে বিদ্যমান থাকে।

আসলে প্রাচীন এবং গতানুগতিক ধর্মের ধারণার বিলোপ ঘটছিল। এতদিন পর্যন্ত ধর্ম ছিল প্রধানতঃ, একটি সামাজিক অনুষ্ঠান, সেটি উপজাতীয় গোষ্ঠীরই হোক বা জাতিরই হোক এবং এই অনুষ্ঠানের সঙ্গে ব্যক্তির সম্পর্ক নিরূপিত হত সমাজে তার সভ্য হওয়ার বিষয়টির দ্বারা। কিন্তু সমাজের যাঁরা মহান ব্যক্তি তাঁরা অনুভব করেছিলেন যে ধর্ম ব্যক্তির কাছে এর থেকেও অধিক কিছু অর্থ সূচিত করে। ব্যক্তিও, জাতির থেকে স্বতন্ত্র এক ব্যক্তিগত জীবনের অস্তিত্ব সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠছিল। জাতীয় ধর্ম জীবন ও জগতকে গভীর ভাবে দেখার প্রয়োজন অনুভব করেনি। কিন্তু ধর্মপ্রচারকরা এমন সব নতুন ধারণার কথা ব্যক্ত করতে লাগলেন যে, যার জন্য জগৎ ও জীবনকে গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করার প্রয়োজন অনুভূত হল। ধর্মপ্রচারকরা জগৎ সম্পর্কে কোন নতুন তত্ত্ব বা কোন ধর্মতত্ত্ব উদ্ভাবনে সচেষ্ট হননি। তাঁরা প্রচলিত ধর্মসম্বন্ধীয় ধরণাকে শোধিত এবং সঞ্জীবিত করতে এবং জীবনের অর্থ ও লক্ষ্য নিরূপণে সচেষ্ট হলেন। ধর্ম কি হওয়া উচিত এই ব্যক্তিগত চেতনাই এই প্রচেষ্টার লক্ষ্য ছিল।

অবশ্য সব ব্যক্তির মধ্যেই যে এই আধ্যাত্মিক পরিবর্তন ঘটেছিল তা নয়, অনেকেই নতুন পরিবর্তনকে স্বাগত জানাতে পারেন নি। কিন্তু সামাজিক প্রগতির সঙ্গে সঙ্গে আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতার এক নূতন পরিপূর্ণ রূপের সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল এবং স্বল্প কয়েকজন ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মহান পুরুষের মাধ্যমে এই সম্ভাবনা বাস্তব রূপ লাভ করল। এমন কয়েকজন ব্যক্তির আবির্ভাব ঘটল যাঁদের মধ্যে আধ্যাত্মিকতা এবং অন্তর্দৃষ্টি চরম বিকাশের স্তরে উপনীত হল। অন্তর্দৃষ্টির মাধ্যমে যে সত্যকে তাঁরা উপলব্ধি করলেন, যে জ্ঞান তাঁরা লাভ করলেন, গভীর চিন্তা-ভাবনার দ্বারা সেই জ্ঞান এক সুমহান পরিণতি লাভ করল। অগণিত জনসাধারণকে তাঁরা দিলেন মহান সত্যের সন্ধান।

মহান পুরুষের আবির্ভাব

বিভিন্ন জাতির ক্ষেত্রে বিভিন্ন সময়ে এই সব ধর্মপ্রচারকদের আবির্ভাব ঘটেছে, যাঁরা জাতির জীবনের সঞ্চিত অভাব, আশা-আকুলতাকে মূর্ত করে তুলেছেন। উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করা যেতে পারে যে, ইসরায়েলে এমস্ (*Amos*), ইসা (*Isaiah*), জেরেমিয়া (*Jeremiah*) প্রভৃতি মহান ধর্মপ্রচারকদের নেতৃত্বে ধর্ম, জাতীয় ধর্মানুষ্ঠানের তুলনায় আন্তর বিশ্বাস এবং ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার বিষয় হয়ে উঠেছিল।

ইসরায়েলের ধর্মপ্রচারক

এই সব ধর্মপ্রচারকদের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে ধর্মের মধ্যে ব্যক্তিগত উপাদানের অনুপ্রবেশ ঘটল, যাকে এক কথায় বিপ্লবাত্মক বলে অভিহিত করা যেতে পারে। ধর্মের অন্তর্মুখীতা ছাড়াও ইসরায়েলে এই মনোভাবের প্রকাশ ঘটল যে জেওভা শুধুমাত্র ইসরায়েলের দেবতা নয়, সমস্ত বিশ্বজগতের দেবতা। বস্তুতঃ এই সত্যই একেশ্বরবাদে ব্যক্ত হয়েছে। ইসরায়েলের ধর্মপ্রবর্তকবৃন্দ কোন নতুন ধর্ম প্রবর্তন করেন নি। তাঁরা পুরাতন ধর্মমতকে শোধন করেছিলেন এবং তার মধ্যে একটি নতুন উপাদান, অর্থাৎ নৈতিক ধারণাকে অনুপ্রবিষ্ট করে তাকে মহান করে তুলেছিলেন। ইসাই, এমোস, হোসিয়া প্রভৃতি ধর্মপরায়ণ ব্যক্তিগণ আভ্যন্তরীণ অভিজ্ঞতার পরিপূর্ণতার কথা বলেছিলেন এবং ধর্মের আচার-অনুষ্ঠান, ধর্মীয় উৎসর্গ প্রভৃতির উপর অত্যধিক গুরুত্ব আরোপের বিষয়টিকে তীব্রভাবে নিন্দা করেছিলেন। তাঁদের মতে ব্যক্তির যথার্থ ঈশ্বরভক্তি হল অন্তরের শুচিতা ও সাধুতা এবং ঈশ্বরের ইচ্ছার প্রতি আনুগত্য। ঈশ্বরের নৈতিক ধারণা বস্তুতঃ একেশ্বরবাদী বিশ্বাস সূচনা করে। কাজেই ধর্মপ্রবর্তকগণ যখন এই ব্যাপক ও নতুন ধর্মমতের কথা ব্যক্ত করেছিলেন তখন তাঁরা জাতীয় ধর্মের সীমারেখাকে অতিক্রম করে যাচ্ছিলেন। তাঁরা যতই ধর্মকে করে তুলেছিলেন ব্যক্তিগত এবং আভ্যন্তরীণ, তাঁরা ততই তাকে করে তুলেছিলেন বিশ্বজনীন। অবশ্য একথা বলা যুক্তিসঙ্গত হবে না যে, তাঁরা বিশ্বজনীন ধর্মের ধারণাকে পরিপূর্ণভাবে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। প্রকৃত ধর্ম যে কোন দেশকালের গণ্ডীর দ্বারা সীমাবদ্ধ নয়, প্রকৃত ধর্ম যে সর্বত্রই ব্যাপ্ত এবং মানুষ অন্তর দিয়েই যে ঈশ্বরের উপাসনা করে এই নীতি তাঁরা পরিপূর্ণভাবে উপলব্ধি করেন নি। তবে তাঁরা এই সত্য উপলব্ধি করেছিলেন যে জেওভা শুধু ইসরায়েলের দেবতা নয় এবং সেই দিন আসবে যেদিন ধর্মপ্রবণ নয় এমন ব্যক্তিও তাঁকে স্বীকার করে নিয়ে তার উপাসনা করবে। কাজেই দেখা যাচ্ছে, মানুষ একটা বিশ্বজনীন ধর্মের ধারণার খুব কাছাকাছি উপনীত হচ্ছে।

নতুন ধর্মমতের জাতীয় সীমা অতিক্রমণ

কি জাতির জীবনে, কি ব্যক্তির জীবনে একটা বিরাট আধ্যাত্মিকতার জোয়ারের পর একটা ভাঁটা দেখা দেয়, যা ধর্মের অগ্রগতিকে ব্যাহত করে। ইসরায়েলেও তাই ঘটেছিল। ধর্মপ্রবর্তকদের মৃত্যুর পর ধর্মের আভ্যন্তরীণ দিকটির উপর গুরুত্ব আরোপ না করে পুনরায় আচার-অনুষ্ঠান পালনের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হতে লাগল। যান্ত্রিকভাবে আচার পালনই ধর্ম হয়ে দাঁড়াল। এই আচার-অনুষ্ঠানের মধ্যে পুনরায় ফিরে আসার অর্থ বৃহত্তর উদার মানবসুলভ দৃষ্টিভঙ্গি হারিয়ে জাতীয়তাবাদে এবং স্বাতন্ত্র্যবাদে ফিরে আসা।

ধর্মের অগ্রগতিতে বাধা

ইসরায়েলে ধর্ম হয়ে উঠল নিছক কৃত্রিম, যান্ত্রিক আচার-অনুষ্ঠান পালন এবং আচার-অনুষ্ঠান ও বিধিনিষেধের চাপে ধর্মের দৃষ্টিভঙ্গি হয়ে পড়ল সংকীর্ণ। যখন ধর্ম এই জাতীয় পীড়াদায়ক বাহ্য আচার-অনুষ্ঠান পালনের ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায় তখন এক নতুন এবং শক্তিসম্পন্ন নৈতিক চেতনার আবির্ভাবেই কেবলমাত্র ধর্মকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করা যেতে পারে।

আসলে যাঁরা নতুন কোন ধর্ম-প্রবর্তন করেন তাঁদের ব্যক্তিত্বের মধ্যে এমন এক অসাধারণ এবং অভিনব উপাদানের সন্ধান পাওয়া যায়, অতীত ইতিহাসের বিশ্লেষণ বা তৎকালীন ধর্মীয় পরিবেশের সাহায্যে তাকে ব্যাখ্যা করা যায় না। প্রাচীন ধর্মগুলি ধীরে ধীরে বিকশিত হয়েছে। সমষ্টিগত মনের প্রয়োজনের পরিতৃপ্তির পরিণতি হল এইসব ধর্ম। যেসব ধর্ম ধর্ম-প্রবর্তকদের দ্বারা প্রবর্তিত হয়েছে, সেইগুলি ব্যক্তিবিশেষের ব্যক্তিগত সুস্পষ্ট অভিজ্ঞতার পরিণতি এবং জগৎ জীবন সম্পর্কে তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গির পরিচায়ক। এইসব ধর্ম ধর্মের আভ্যন্তরীণ এবং বস্তুনিরপেক্ষ দিকটির উপর গুরুত্ব আরোপ করেছিল। ধর্মের আভ্যন্তরীণ এবং আধ্যাত্মিক দিকের উপর গুরুত্ব আরোপিত হওয়াতে ধর্মসম্বন্ধীয় সম্পর্কের একটা নতুন এবং গভীরতর ধারণার সূচনা ঘটল। দেবতাদের সঙ্গে জাগতিক আত্মীয়তার সম্পর্ক এবং উপজাতি বা জাতির সঙ্গে দেবতার যে প্রাকৃতিক সম্পর্ক—এই সব প্রাচীন ধারণাকে স্থূল এবং অপর্যাপ্ত গণ্য করা হতে লাগল। মানুষের সঙ্গে দেবতার সম্পর্ক কোন পূর্ব-নির্দিষ্ট সম্পর্ক নয়। এটি হল একটি আধ্যাত্মিক লক্ষ্য যা উপলব্ধির বিষয়। আভ্যন্তরীণ চেতনা কোন জনসম্প্রদায়ের বা জাতির একচেটিয়া সম্পত্তি নয়। এই চেতনাই ব্যক্তিকে ধর্মপরায়ণ করে তোলে। কাজেই প্রাচীন বাধাগুলি অপসারিত হয়। ধর্মবিশ্বাস সকলের পক্ষেই সম্ভব হয়ে ওঠে এবং ধর্মের উন্নত রূপগুলির ক্ষেত্রে ধর্ম তার কার্যকলাপের দিক থেকে হয়ে ওঠে জনকল্যাণকর এবং ব্যাপকতার দিক থেকে হয়ে ওঠে বিশ্বজনীন।

প্রাচীন ধর্ম ও ধর্মপ্রবর্তকদের দ্বারা প্রবর্তিত ধর্ম

৩। বিশ্বজনীন ধর্মের প্রধান বৈশিষ্ট্য (Main features of Universal Religion) :

ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যকরণ প্রক্রিয়ার (process of individualising) মধ্য দিয়েই বিশ্বজনীন ধর্মের আবির্ভাব—এটা হেঁয়ালী বা আপাতবিরোধদুষ্ট মনে হলেও এটা স্পষ্টত:ই সত্য। কেননা, ধর্মকে ব্যক্তিগত করার মধ্য দিয়েই ধর্ম বিশ্বজনীন হয়ে ওঠে।[1]

[1] ......"in individualising religion we are at the same time universalising it."
—Galloway : The Philosophy of Religion, Page 133

ধর্মকে ব্যক্তিগত করার অর্থ হল ধর্ম যে আন্তর এবং ব্যক্তিগত উপলব্ধির বিষয় সেইভাবে ধর্মকে গঠন করা এবং যেহেতু ব্যক্তিরা একই আধ্যাত্মিক প্রকৃতির অধিকারী তারা একই ধর্মীয় অভিজ্ঞতার অংশীদার হতে পারে। কোন গোষ্ঠীর সঙ্গে দেবতার আত্মীয়তা বা কোন ধর্মানুষ্ঠানের অংশীদার হওয়া মানুষের সেই চেতনাকে সৃষ্টিও করতে পারে না বা তাকে কেড়েও নিয়ে যেতে পারে না, যে চেতনার সাহায্যে সে তার দেবতার উপাসনা ও সেবা করে। কাজেই বিশ্বজনীন ধর্মের আবেদন জাতিধর্ম-নির্বিশেষে ব্যক্তির সেই চেতনার কাছেই আবেদন। এই ধর্মের মধ্যে রয়েছে সমস্ত মানবজাতির জন্য মূল্য ও আশার বাণী এবং এই ধর্ম দেশ-কাল-জাতি-বর্ণ সব কিছুর সীমারেখাকে —অর্থাৎ নিজের স্বাভাবিক সীমারেখাকে অতিক্রম করে যায়। এই বিশ্বজনীন ধর্মের মধ্যে রয়েছে একটা ঐচ্ছিক ধর্ম-প্রচারমূলক আন্দোলনের ব্যাপার। যখন ধর্ম বাহ্য আচার-অনুষ্ঠান পালনের ব্যাপার না হয়ে আভ্যন্তরীণ মন ও অন্তরের অবস্থাতে পরিণত হয় তখন সেই ধর্মের মধ্যে বিশ্বধর্মে পরিণত হবার সম্ভাবনা প্রচ্ছন্ন থাকে।

বিশ্বজনীন ধর্মের আবেদন ব্যক্তির চেতনার কাছে

এ'বার আমরা তিনটি বিশ্বজনীন ধর্মের আলোচনা করব। এই তিনটি ধর্ম ইসলাম ধর্ম, বৌদ্ধধর্ম এবং খ্রীষ্টধর্ম।

(ক) ইসলামধর্ম (Islam) **:** হজরত মহম্মদ এই ধর্মের প্রবর্তক। খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতকে যখন আরবদেশ ছিল ঘোর তমসাচ্ছন্ন, সামাজিক এবং পারিবারিক জীবন হয়ে উঠেছিল নানারকমের কুসংস্কার ও অনাচারে পূর্ণ, তখন যুগপ্রবর্তক হজরত মহম্মদের আবির্ভাব ঘটে। পথভ্রষ্ট মানুষের জন্য তিনি বহন করে নিয়ে এলেন এক নতুন বাণী, তিনি প্রবর্তন করলেন এক নতুন ধর্ম যার নাম ইসলাম। সাম্য এবং শান্তিই ইসলামের আদর্শ। ইসলামের ধর্মগ্রন্থের নাম কোরান। এই গ্রন্থে ইসলাম ধর্মের আদর্শের ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে। ইসলাম ধর্ম অত্যন্ত বাস্তবপন্থী ধর্ম। এই ধর্মে পরলোকের তুলনায় ইহলোকের উপরই গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। ইসলাম ধর্মের মূল বিষয় হল মানুষ, ধর্ম তার বাহন। ইসলাম বলে মানুষের জন্যই ধর্ম, ধর্মের জন্য মানুষ নয়। ইসলাম ধর্মে তাই তাত্ত্বিক মতবাদের বিশেষ প্রাধান্য দেখা যায় না। বাস্তব জীবনের সমস্যাগুলিকে সহজ করে দেওয়াই এই ধর্মের উদ্দেশ্য। ইসলাম ধর্ম তাই আচার অনুষ্ঠানভিত্তিক হয়ে ওঠেনি। ধর্মের যে অনুষ্ঠান ইসলাম নির্দেশ করেছে তা পরোক্ষভাবে বাস্তব জীবনেরই অঙ্গ। ইসলাম ধর্ম ঘোষণা করে যে ঈশ্বর এক। এই

ইসলামের আদর্শ

ঈশ্বর এক

ধর্ম বহুদেববাদ এবং পৌত্তলিকতার বিরোধী। এই ধর্মমত অনুসারে আল্লা এক এবং সর্বেসর্বা। আল্লা অসীম, সর্বশক্তিমান, সর্বজ্ঞ এবং সর্বব্যাপক। ইসলাম শব্দের অর্থ 'আল্লার কাছে সমর্পণ' (submission to 'Allah')। এই সমর্পণের মধ্য দিয়ে ব্যক্তি পরিপূর্ণ শান্তি লাভ করে। এই ধর্ম আল্লা ছাড়া অন্য কোন দেবতার উপাসনা করার কথা বলে না। এই ধর্মানুসারে উপাসনা পরিপূর্ণভাবে আধ্যাত্মিক বিষয় এবং উপাসক কোন রকম প্রতীকের সহায়তা গ্রহণ না করে আল্লার উপাসনা করেন। অপরের সহায়তা ছাড়া ঈশ্বরের সঙ্গে ব্যক্তির প্রত্যক্ষ সংযোগ-প্রতিষ্ঠার উপরই, এই ধর্মে গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।

বিশ্বজনীন ধর্মগুলির মধ্যে ইসলাম অন্যতম। এই ধর্ম দাবী করে যে, যে কেহ এই ধর্ম গ্রহণ করতে পারে এবং জন্মসূত্রে যে ব্যক্তি এই ধর্মে বিশ্বাসী এবং যিনি এই ধর্ম গ্রহণ করেছেন উভয়ের মধ্যে ইসলাম ধর্ম কোন পার্থক্য করে না। ইসলামে বর্ণ-বিদ্বেষের কোন স্থান নেই। এই ধর্ম মানুষ এবং মানবতাকে মর্যাদা দিয়েছে। এই ধর্মের আদর্শ সর্বজনীন। প্রচারের মধ্য দিয়েও এই ধর্ম বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছে।

(খ) বৌদ্ধধর্ম (Buddhism)ঃ খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকে বৌদ্ধধর্মের প্রতিষ্ঠাতা সিদ্ধার্থ বা গৌতম বুদ্ধের জন্ম হয়। এই সময় একদিকে যেমন যাগযজ্ঞ অনুষ্ঠানের জন্য আগ্রহ, এবং শাস্ত্রের প্রতি অন্ধ আনুগত্য মানুষের মনকে অধিকার করেছিল; অপরদিকে একেশ্বরবাদ বা অদ্বৈতবাদের উদ্ভব হওয়াতে ক্রিয়াকর্মের অনুষ্ঠান অপেক্ষা চরমতত্ত্বের জ্ঞানকে শ্রেয়তর বলে বিবেচনা করা হয়েছিল। এই দুটি ভাবধারার সংঘাতের সন্ধিক্ষণেই বুদ্ধদেবের আবির্ভাব। কোন চরমতত্ত্বে আস্থা স্থাপন না করে বুদ্ধদেব তাকালেন মানুষের দিকে, যে মানুষ দুঃখক্লেশে জর্জরিত। তিনি অনুসন্ধান করতে লাগলেন মানুষের দুঃখমুক্তির উপায়—বাহ্যিক অনুষ্ঠান এবং দর্শনের চরমতত্ত্ব

বুদ্ধদেবের আবির্ভাব কাল

আলোচনা না করে নতুন যুগের এক নব্য দর্শন তিনি মানব জাতিকে উপহার দিলেন যা মানুষকে জানাল তার মুক্তির বারতা। মানুষ দুঃখের হাত থেকে কিভাবে মুক্তি লাভ করতে পারে তার উপায় নির্দেশ করাই ছিল তাঁর জীবনের লক্ষ্য। তিনি উপলব্ধি করতে চেয়েছিলেন যে, এই সংসার দুঃখময় এবং এই দুঃখের কারণ আছে এবং যদি এই কারণগুলি ধ্বংস করা যায় তাহলে দুঃখের নিরোধ হয়। এই দুঃখ নিরোধকেই তিনি নির্বাণ নামে

নির্বাণের স্বরূপ

অভিহিত করেছেন। নির্বাণ অর্থে দুঃখ থেকে চিরমুক্তি লাভ। মানুষ যদি এই জীবনে অনুক্ষণ সত্যের অনুধাবন করে এবং ইন্দ্রিয়কে সম্পূর্ণভাবে বশীভূত করে তাহলে সে নিজের প্রচেষ্টায় নির্বাণ লাভ করতে

পারে। সকলের জন্য এই মুক্তির পথ আবিষ্কার ধর্মের বিকাশের ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন। এখানে লক্ষ্য করা দরকার যে, বুদ্ধদেব দুঃখ থেকে মুক্তির কথা বলেছেন, পাপের থেকে মুক্তির কথা বলেননি। দুঃখের আত্যন্তিক নিরোধ বা দুঃখ থেকে চিরমুক্তিই হল নির্বাণ। রাগ, দ্বেষ ও মোহের নির্বাণই হল নির্বাণ।

বুদ্ধদেব বাহ্যিক যাগযজ্ঞ, ক্রিয়াকর্ম অনুষ্ঠানের উপর কোন গুরুত্ব আরোপ করতেন না। তিনি নৈতিক শুচিতা, অন্তরের পবিত্রতা, ইন্দ্রিয় সংযম এবং কামনা ও ভোগতৃষ্ণা পরিহার করে সংযত জীবন যাপন করার উপর গুরুত্ব আরোপ করতেন। জীবের একমাত্র লক্ষ্য নির্বাণ বা দুঃখ থেকে চিরমুক্তি লাভ এবং ঈশ্বর বা অপর ব্যক্তির করুণার প্রার্থী না হয়ে নিজের আন্তরিক চেষ্টায় এই নির্বাণ লাভ করতে হবে। বুদ্ধদেব কর্মবাদে বিশ্বাসী ছিলেন। মানুষ যেমনই কর্ম করবে তেমনই ফলভোগ করবে।

বৌদ্ধধর্মে অন্তর্মুখীতা, বিশ্বজনীনতা ও মানবিকতা বর্তমান। কিন্তু সাধারণতঃ ধর্ম বলতে যা বোঝায় বৌদ্ধধর্মকে সেই বিচারে ধর্ম বলে গণ্য করা চলে না। ধর্মের কেন্দ্রীয় বিষয় হল ঈশ্বর, বৌদ্ধধর্মে ঈশ্বরের কোন স্থান নেই। বুদ্ধদেব মানুষকে যে মুক্তির বাণী শুনিয়েছেন সেই মুক্তির ব্যাপারে ঈশ্বরের কোন ভূমিকা নেই। বুদ্ধদেব যে তাত্ত্বিক দিক থেকে নাস্তিক ছিলেন তা নয়, আসলে তিনি ঈশ্বরকে উপেক্ষা করেছেন। বুদ্ধদেবের মতে কর্মের থেকে বড় কিছু নেই। কর্মের দ্বারাই জগতের দুঃখের যুক্তিযুক্ত ব্যাখ্যা দেওয়া যায়। কর্মের ফলেই জীবের উদ্ভব। জীবের সৃষ্টিকর্তারূপে কোন ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাসের প্রয়োজন নেই। তাছাড়া বুদ্ধদেবের মতে প্রতিটি ব্যক্তিকে নিজের প্রচেষ্টায় মুক্তি বা মোক্ষ লাভ করতে হবে। কোন ঈশ্বরের সহায়তা এই ব্যাপারে সহায়ক হবে না। পূজা, উপাসনা প্রভৃতি শূন্যগর্ভ ও নিরর্থক। বুদ্ধদেবের বাণী এই অর্থে ধর্মীয় যে, এই বাণীতে মোক্ষের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু এই ধর্মের কোন বাহ্য আচার-অনুষ্ঠান নেই এবং মোক্ষের ব্যাপারে ঈশ্বরের কোন ভূমিকা নেই। কর্মও কোন ঈশ্বরের ইচ্ছার প্রকাশ নয়। কর্মের ফলভোগ কার্যকারণবাদ নিয়মানুসারে ঘটে থাকে এবং এর জন্য কোন ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করার প্রয়োজন নেই।

বৌদ্ধধর্মে ঈশ্বরের স্থান নেই

বৌদ্ধধর্ম কর্মবাদে বিশ্বাসী

কিন্তু যদিও বুদ্ধের বাণী ধর্ম-বিষয়ক নয় এবং ঈশ্বরবর্জিত, তবু মহান ঐতিহাসিক ধর্মরূপে বৌদ্ধধর্ম ঈশ্বরবাদী বা বহু ঈশ্বরবাদী। সাধারণ মানুষ জীবন-সংগ্রামে বিপর্যস্ত হয়ে, দুঃখ-দুর্দশার দ্বারা নিপীড়িত হয়ে ঈশ্বরের চরণতলে আশ্রয় খুঁজে বেড়ায়। ঈশ্বরের করুণার জন্য তার তৃষিত মন হাহাকার করে ওঠে। সেই কারণে

যে ধর্মে ঈশ্বরের স্থান নেই; সেই ধর্ম তার কাছে কোন সান্ত্বনা বহন করে আনতে পারে না। এই কারণে বুদ্ধদেব প্রচারিত জীবনধারাই জগতের একটি মহান ধর্মে পরিণত হয়। এমন কি বুদ্ধদেব তাঁর শিষ্যদের কোন রকম ঈশ্বর পূজা থেকে নিবৃত্ত করার জন্য সচেষ্ট হলেও, শিষ্যদের মধ্যে অনেকে 'ধর্মকায়'রূপে বুদ্ধকে ভগবানের আসনে বসিয়ে সাধারণ মানুষের ঈশ্বরের অভাব পূরণ করার জন্য চেষ্টা করেছিলেন। তাঁদের কাছে বুদ্ধই হয়ে উঠলেন ভগবান।

বুদ্ধদেব প্রচারিত জীবনধারাই হয়ে ওঠে এক মহান ধর্ম

যদিও বুদ্ধ ও তাঁর প্রচারিত বাণীর মহত্ব ও আকর্ষণীয়তাকে অস্বীকার করা যায় না, তবু বৌদ্ধধর্মের কিছু কিছু ত্রুটি বৌদ্ধধর্মের বিশ্বধর্মে পরিণত হওয়ার পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। বুদ্ধদেবের বাণীর লক্ষ্য হল দুঃখ মুক্তি, যেন দুঃখ সকল সময়ই অকল্যাণকর ও বর্জনীয়। বুদ্ধদেব আত্মমুক্তির বাণী প্রচার করেছেন এবং সমাজ এই লক্ষ্য সিদ্ধ করার পথে উপায়স্বরূপ। সমগ্র মানবজাতির আধ্যাত্মিক কল্যাণসাধনে ব্যক্তির করণীয় কি তার নির্দেশ বুদ্ধের বাণী থেকে পাওয়া যায় না।

বৌদ্ধধর্মের ত্রুটি

(গ) খ্রীষ্টধর্ম: যীশুখ্রীষ্ট এই ধর্মের প্রবর্তক। এই ধর্মমতে নরনারী ঈশ্বরের সন্তান। ঈশ্বরের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক পিতার সঙ্গে সন্তানের সম্পর্কের সমতুল। এই ধর্মমত যীশুখ্রীষ্টকে ঈশ্বরের প্রতিনিধিরূপে গণ্য করে। প্রতিটি ব্যক্তির উচিত যীশুর উপদেশ অনুসরণ করা। খ্রীষ্টধর্ম বাহ্য আচার-অনুষ্ঠানের উপরে গুরুত্ব আরোপ করে না। মনের পবিত্রতা এবং ইচ্ছার শুচিতার উপরে জোর দেয়। অন্তরের মালিন্য দূরীভূত না হলে বাইরের যান্ত্রিক সদাচরণের কোন মূল্য নেই। এই ধর্ম ব্যক্তির আত্ম-মুক্তিকেই ধর্মের প্রধান লক্ষ্যরূপে নির্দেশ করে না। অন্তরের দিক থেকে যাঁরা শুচি তাঁরাই ঈশ্বরের সাক্ষাৎ লাভ করেন।

খ্রীষ্টধর্মের পরিচয়

খ্রীষ্টধর্ম ও বৌদ্ধধর্মের মধ্যে কয়েক বিষয়ে মিল লক্ষ্য করা যায়। উভয় ধর্মই ধর্মের প্রকৃতিগত বিচারে এবং আবেদনের দিক থেকে বিচার করলে বিশ্বজনীন। উভয় ধর্মই দাবী করে যে তারা জাতি, বর্ণ, সম্প্রদায়, সব রকম সঙ্কীর্ণ গণ্ডীকে অতিক্রম করে গেছে। উভয় ধর্মই মানুষকে মুক্তির বাণী শোনায়। উভয় ধর্মই সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করে যে, আধ্যাত্মিক মূল্যের তুলনায় জাগতিক মূল্যের স্থান অনেক নীচে এবং উভয় ধর্মই যা জাগতিক, যা দৃশ্যমান, যা সীমিত তার বন্ধন থেকে মানুষকে মুক্ত করতে চায়। উভয় ধর্মের নীতিতত্ত্বে দয়া, ক্ষমা এবং ভ্রাতৃত্বের উপরে গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।

খ্রীষ্টধর্ম ও বৌদ্ধধর্মের মধ্যে সাদৃশ্য

উভয় ধর্মই স্ব-স্ব প্রবর্তকের মহান ব্যক্তিত্বের উপরে বিশেষ ভাবে গুরুত্ব আরোপ করেছে। বৌদ্ধধর্মে বুদ্ধদেবের যে স্থান, খ্রীষ্টধর্মে যীশুখ্রীষ্টের সেই স্থান।

কিন্তু উভয় ধর্মের মধ্যে মিলও যেমন আছে পার্থক্যও তেমন আছে। যীশুখ্রীষ্ট নিজেই মুক্তিদাতা। যাঁরা ঈশ্বর বিশ্বাসী, ঈশ্বরের হয়ে যীশুখ্রীষ্ট তাদের করুণা করেন, তাদের ক্ষমা করেন এবং তাদের মুক্ত করেন। অর্থাৎ ঈশ্বরের হয়ে তিনি মধ্যস্থতা করেন। কিন্তু বুদ্ধদেব কখনই বলেন না যে তিনি মানবের মুক্তিদাতা। বরং মোক্ষ লাভের দায়িত্ব ব্যক্তিকে নিজেকেই গ্রহণ করতে হবে, এই তাঁর নির্দেশ।

অসাদৃশ্য

কিন্তু অশুভ বা অকল্যাণ (evil)-এর প্রকৃতি সম্পর্কীয় ধারণার ব্যাপারে এবং এই অকল্যাণ থেকে মুক্তি লাভের ধারণার ব্যাপারে উভয়ের মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য বর্তমান। বৌদ্ধধর্মে মূল অকল্যাণ হল দুঃখ এবং বৌদ্ধমতে অস্তিত্বশীল হওয়া মানেই দুঃখ ভোগ করা। কাজেই অস্তিত্বই হল অকল্যাণ যার থেকে ব্যক্তিকে মুক্ত করা দরকার। বৌদ্ধধর্ম মতে বিষয়ের প্রতি আসক্তিই ব্যক্তির মধ্যে জন্ম গ্রহণের বাসনা সৃষ্টি করে। জন্মগ্রহণ করার জন্যই মানুষকে দুঃখ কর্মের অধীন হতে হয়। কিন্তু খ্রীষ্টধর্মে অকল্যাণ হল নৈতিক অকল্যাণ। এই অকল্যাণ দুঃখ নয়, পাপ। খ্রীষ্টধর্ম মানুষকে জগতের হাত থেকে রক্ষা করতে চায় না, বরং যে পাপ মানুষের দুঃখ ও অবনতির কারণ তার হাত থেকে মানুষকে রক্ষা করতে চায়। পাপ থেকে মুক্তি হল আধ্যাত্মিক প্রক্রিয়া, এ বাহ্য আচার-অনুষ্ঠান পালন নয়।

অকল্যাণের ব্যাখ্যা বিষয়ে বৌদ্ধধর্মে ও খ্রীষ্টধর্মের মধ্যে পার্থক্য

সব কামনা-বাসনাকেই যীশু অকল্যাণকর বলে অভিহিত করেননি, কারণ এর পরিণতি হল মানুষের প্রকৃতির ধ্বংস সাধন করা। যীশুর লক্ষ্য ছিল কামনাকে মহৎ করে তোলা, উন্নত করা; কলঙ্কময় উপাদান থেকে তাকে শুচিশুভ্র করে এক মহান আধ্যাত্মিক লক্ষ্যের দিকে চালিত করা। কাজেই যীশুর দৃষ্টিভঙ্গি পলাতকের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল না, জগৎ থেকে দূরে সরে যাওয়ার কথা তিনি বলেননি। তাঁর উপদেশ ছিল ক্ষুদ্র জাগতিক স্বার্থের কারাগারে নিজেকে বন্দী করে না রাখা। যীশুর ধর্ম ছিল ইচ্ছাকে সক্রিয়ভাবে প্রয়োগ করা যার ফলে আত্মা ধীরে ধীরে পরমাদর্শের দিকে অগ্রসর হতে থাকবে। বৌদ্ধধর্মে মোক্ষের স্বরূপ হল নেতিবাচক। বাহ্য-জগতের সঙ্গে সর্বপ্রকারে সম্পর্ক বিযুক্ত হওয়াই মোক্ষ। খ্রীষ্টধর্মের মোক্ষের ধারণার মধ্যেও নঞর্থক দৃষ্টিভঙ্গি বর্তমান। যেমন, যখন বলা হয় 'সমস্ত কামনা-লালসা নিয়ে দেহকে ক্রুশবিদ্ধ কর', তখন এই বক্তব্যের মধ্যে

খ্রীষ্টধর্মের লক্ষ্য কামনাকে মহৎ করে তোলা

নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির প্রকাশ ঘটে। খ্রীষ্টধর্মের বক্তব্য 'মরে অমর হও' (Die to live)। এ কথার তাৎপর্য হল দেহের মৃত্যুতেই আত্মার পুনরুজ্জীবন। অর্থাৎ দৈহিক, কামনা, বাসনা, ভোগ এবং ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তিকে একেবারে ধ্বংস করতে পারলেই মানুষের আত্মা জেগে উঠবে, বেঁচে থাকবে। সেটাই হবে সত্যিকারের বাঁচা। কিন্তু খ্রীষ্টধর্মের এই নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির আড়ালে একটা সদর্থক উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য আছে—তাহল আধ্যাত্মিক জীবনের উন্নতি এবং সমৃদ্ধি। খ্রীষ্টধর্মের আদর্শ হল 'মরে বাঁচ', অর্থাৎ আত্মোৎসর্গের মধ্য দিয়ে আত্মোপলব্ধি লাভ কর। অনেকে খ্রীষ্টধর্মে কৃচ্ছ্রতার দিকটির উপর এত বেশী মনোনিবেশ করেন যে তার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের কথা বিস্মৃত হন। কিন্তু একথা ভুললে চলবে না যে, খ্রীষ্টধর্মের লক্ষ্য মানুষের ইচ্ছাকে পঙ্গু বা অকেজো করে দেওয়া নয়, ইচ্ছাকে পবিত্র ও শুচি করে তোলা যাতে ঈশ্বরলাভ সম্ভব হয়। মায়েল এডওয়ার্ডস্ বলেন,[1] 'বৌদ্ধধর্মের মুক্তি হল সংগ্রাম থেকে মুক্তি, খ্রীষ্টধর্মের মুক্তি হল সংগ্রামে জয়লাভ'।

খ্রীষ্টধর্মের সদর্থক উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য

খ্রীষ্টধর্মের অনুরাগীবৃন্দ মনে করেন যে অন্যান্য ধর্মের তুলনায় খ্রীষ্টধর্মের ঈশ্বরের ধারণা খুবই মহান। যদিও খ্রীষ্টধর্মের ঈশ্বর তাঁর সৃষ্ট জীবদের অতিবর্তী, তবু তিনিই হলেন প্রেম যা দিয়ে তিনি তাঁর সৃষ্ট জীবদের ঘিরে রয়েছেন। এই ধর্মে ব্যক্তি সমাজের মধ্যে নিজের স্বাতন্ত্র্য হারিয়ে ফেলে না। এই ধর্ম এমন আদর্শ প্রচার করে না যা নিতান্তই ব্যক্তিকেন্দ্রিক, বরং এই ধর্মমত ব্যক্তি ও সমাজকে পরস্পরের পরিপূরক বলে গণ্য করে। এই ধর্মের আধ্যাত্মিক লক্ষ্য হল এমন এক জগৎ যেখানে সমগ্রের কল্যাণ তার প্রতিটি বিশেষ সভ্যের মধ্য দিয়ে প্রতিফলিত হয় এবং ব্যক্তিবিশেষ সমগ্রের মধ্য দিয়ে তার জীবনের পরিপূর্ণতা খুঁজে পায়। খ্রীষ্টধর্ম মানুষের জীবনে পাপের উপস্থিতি এবং প্রভাব স্বীকার করে, কিন্তু ঐশ্বরিক করুণার সহায়তায় মানুষ যে এই পাপমুক্ত হতে পারে তাও প্রচার করে। কাজেই খ্রীষ্টধর্ম আশাবাদী, নৈরাশ্যবাদী নয়। গ্যালোয়ে (*Galloway*) মন্তব্য করেন যে, "মানুষের প্রকৃতি এবং মানুষের জীবনের প্রতি এর পরিপূর্ণ এবং সুন্দর দৃষ্টিভঙ্গির জন্য বিশ্বজনীন ধর্মের স্বীকৃতি লাভের দাবী খ্রীষ্টধর্মের সবচেয়ে অধিক"।[2]

খ্রীষ্টধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব

তবে গ্যালোয়ে একথাও স্বীকার করেছেন যে, খ্রীষ্টধর্ম তার ঐতিহাসিক বিকাশের

1. "The salvation of Buddhism is deliverance from struggle, that of Christianity victory in struggle."
—Miall Edwards : The Philosophy of Religion ; Page 133

2. Galloway : The Philosophy of Religion, Page 146

পথে যীশুর মহান ও পুণ্য আদর্শের প্রতি একনিষ্ঠতা বজায় রাখতে পারেনি। প্রায় সব ধর্মের ক্ষেত্রেই দেখা যায় আধ্যাত্মিকতার চরম স্তরে উন্নীত হবার পথে তার অগ্রগতি ব্যাহত হয়, তার গতি হয় পশ্চাদাভিমুখী। হিব্রু ধর্মপ্রবর্তকদের মহান আদর্শবাদের পরে দেখা দিল বাহ্য আচার-অনুষ্ঠানপূর্ণ ধর্মের কৃত্রিমতা। মধ্যযুগে খ্রীষ্ট-ধর্ম হয়ে উঠল একান্তভাবে আচার-অনুষ্ঠান সর্বস্ব। আচার-অনুষ্ঠানের প্রাধান্যের এবং মতবাদের গোঁড়ামির জন্য ধর্মের অগ্রগতি ব্যাহত হওয়াতে বিশ্বজনীন লক্ষ্যের অভিমুখে খ্রীষ্টধর্মের গতি হয়ে পড়ে খুবই ধীর। তবু এইসব বাধা সত্ত্বেও, গ্যালোয়ে মনে করেন যে অন্যান্য ধর্মের তুলনায় খ্রীষ্টধর্মের বিকশিত হবার সম্ভাবনা সবচেয়ে অধিক মাত্রায় নিহিত, খ্রীষ্টধর্মের মহত্ত্ব প্রকাশিত হয় তার বিকশিত হবার ক্ষমতার মধ্যে। তাই এই ধর্ম মানব জাতির অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে নিজেও এগিয়ে চলে এবং দুঃখপীড়িত মানুষের পরিবর্তনশীল প্রয়োজনও মিটিয়ে চলে। গ্যালোয়ে বলেন, "কেবলমাত্র যে ধর্ম প্রগতিশীল, সেই ধর্মই যথার্থ বিশ্বজনীন ধর্ম হতে পারে।"[1]

গ্যালোয়ের মন্তব্য

---

1. "Only a religion which develops can be a truly Universal Religion."
—Galloway : The Philosophy of Religion ; Page 147

চতুর্থ অধ্যায়

ধর্মের স্বরূপ
(Nature of Religion)

১। 'ধর্ম' শব্দের সম্ভাব্য প্রকৃতি-প্রত্যয় নির্ণয় (Possible derivation of the word religion) :

ওয়েবস্টারের অভিধান অনুযায়ী ইংরেজী 'Religion' শব্দটি উদ্ভূত হয়েছে 'religare' শব্দ থেকে যার অর্থ হল বন্ধন (bond) বা যা দৃঢ়ভাবে বেঁধে রাখে। কাজেই নিষেধ বা নিয়ন্ত্রণ (taboo or restraint) হল শব্দটির অন্তর্নিহিত অর্থ। ল্যাকটেন্‌টিয়াস্ (*Lactantius*)-ও মনে করেন যে, 'religion' শব্দটি 'religare' শব্দ থেকে উদ্ভূত, কিন্তু তিনি বন্ধন বলতে কোন নিষেধ বা নিয়ন্ত্রণ বোঝেননি। তিনি বন্ধন বলতে মনে করেন, কোন সদর্থক কিছু, অর্থাৎ ঈশ্বরের সঙ্গে বন্ধন বা ঈশ্বরের প্রতি আকর্ষণ। কিন্তু সিসিরো (*Cicero*) মনে করেন, 'religion' শব্দটি 'relegere' শব্দ থেকে উদ্ভূত যার অর্থ হল পুনরায় পাঠ করা, পুনরাবৃত্তি করা (to read over again, rehearse), যে কারণে ধর্মপরায়ণ ব্যক্তি বলতে তাঁদের বোঝায় যাঁরা ধর্মবিশ্বাসের সঙ্গে যা কিছু যুক্ত তাকে অধ্যবসায় সহকারে পুনর্বিবেচনা করেন। রাইস ডেভিড্‌স (*Rhys Davids*) মনে করেন, 'religion' শব্দটি যার থেকে উদ্ভূত তার অর্থ হল একটি নিয়মনিষ্ঠ, দ্বিধাগ্রস্ত, বিবেকী মনের গঠন (a law abiding, scrupulously, conscientious frame of mind).

ধর্ম শব্দটির উদ্ভবের বিভিন্ন ব্যাখ্যা

যদি ইংরেজী 'religion' শব্দটির উদ্ভব হয় 'religare' শব্দ থেকে যার অর্থ হয় বন্ধন (bond), তাহলে বলা যেতে পারে যে, ব্যক্তির জীবনে এবং জাতির জীবনেও বটে, যা যথার্থ সংহতি আনে তাই ধর্ম। 'ধৃ' ধাতুর সঙ্গে 'মন্' প্রত্যয় যোগ করে সংস্কৃতে ধর্ম শব্দটির উৎপত্তি। যা ধারণ করে তাই ধর্ম; ধর্ম শব্দটির ধাতুগত অর্থ তাই। অন্তর এবং বাহির মিলে মানুষের জীবনের যে পূর্ণ সামঞ্জস্য তার মধ্যে যা মানুষের জীবনকে ধরে রাখে, সামাজিক জীবনের বৃহত্তর ঐক্যের মধ্যে যা মানুষের জীবনকে ধরে রাখে তাকেই ধর্ম বলা যেতে পারে।

ধর্ম শব্দটির অর্থ

২। ধর্মের স্বরূপ বা প্রকৃতি (Nature of Religion) :

মায়েল এডওয়ার্ড্‌স-এর মতে ধর্মের স্বরূপ বা প্রকৃতি আলোচনা করতে গিয়ে, আমরা দু'ভাবে এই আলোচনায় অগ্রসর হতে পারি। আমরা ধর্মের সংজ্ঞা নিরূপণ

করে ধর্মের স্বরূপকে বুঝে নিতে পারি বা ধর্মের সঙ্গে মানুষের অন্যান্য আচরণ বা ক্রিয়ার সম্পর্ক নিরূপণ করেও আমরা ধর্মের স্বরূপ বা প্রকৃতিকে বুঝে নেওয়ার জন্য সচেষ্ট হতে পারি। যা তুলনামূলক ভাবে অপরিবর্তনীয় এবং নিশ্চল, তার তুলনায় যা ক্রমবিকাশমান এবং গতিশীল তার সংজ্ঞা দেওয়া কঠিন। তবে ধর্মের এমন কিছু বৈশিষ্ট্য আছে যা বিশ্বজনীন ও অনুপম এবং এই বৈশিষ্ট্যগুলির আবিষ্কারের প্রচেষ্টার মাধ্যমে ধর্মের স্বরূপ বা প্রকৃতিকে বুঝে নেওয়া যেতে পারে।

ধর্মের স্বরূপকে জানার দুটি পদ্ধতি

ধর্মের সংজ্ঞা : [1]ব্রাইটম্যান (*Brightman*) বলেন, "ধর্মদর্শনই হল ধর্মের সংজ্ঞা দেবার প্রচেষ্টা এবং ধর্মের যথোপযুক্ত সংজ্ঞা অবশ্যই পর্যাপ্ত অনুসন্ধানের পরিণামস্বরূপ হবে।" বস্তুতঃ, ধর্মের সর্বজনস্বীকৃত সংজ্ঞা নিরূপণ করা খুবই কঠিন। এর কারণ, ধর্ম হল অত্যন্ত জটিল বিষয়, ধর্ম মানব জীবনের প্রতিটি দিককে ছুঁয়ে আছে। আদিম নারীর গুপ্ত ধর্মানুষ্ঠান বা উচ্ছৃঙ্খল, হৈ-চৈপূর্ণ উৎসব থেকে শুরু করে দার্শনিক স্পিনোজার 'ঈশ্বরের প্রতি বৌদ্ধিক অনুরাগ' (intellectual love of GOD)—এই সব কিছুর মধ্য দিয়েই ধর্মের প্রকাশ ঘটেছে। ধর্ম ব্যক্তিগত এবং সামাজিক। ধর্মের নিম্নতর স্তরে ধর্ম জাদু বা ইন্দ্রজালের সঙ্গে মিশে আছে এবং উন্নত স্তরে নৈতিকতার সঙ্গে মিশে আছে, কিন্তু তবু ধর্ম এই উভয়ের কোনটির সঙ্গেই অভিন্ন নয়। বিশ্বাস, আচরণ, বিচারবুদ্ধি এবং আবেগ এই সবই ধর্মের অন্তর্ভুক্ত। ধর্মমত ও রীতিনীতির মধ্যে ধর্ম নিহিত, তবু এদের উপরে নির্ভর না করেই মানুষের অন্তরে ধর্ম বিরাজ করে। ধর্ম কি, তার উপর যতটা নয়, মানুষ কি, তার উপরই ধর্মের অর্থ মানুষের কাছে নির্ভর করে। এই অবস্থায় ধর্মের সর্বজনস্বীকৃত কোন সংজ্ঞা প্রত্যাশা করা আমাদের পক্ষে উচিত হবে না, আবার হতাশ হয়ে ধর্মের সংজ্ঞা দেবার প্রচেষ্টা বর্জন করাও যুক্তিসঙ্গত নয়। ধর্ম কত জটিল এবং বিচিত্র বিষয় উপরিউক্ত আলোচনার মাধ্যমে তা পরিস্ফুট হবে। নানাভাবে ধর্মের সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে। টাইলর (*Tylor*) ধর্মের খুব ছোট একটা সংজ্ঞা দিয়েছেন এইভাবে যে, 'ধর্ম হল আত্মিক জীবে বিশ্বাস' (The belief in spiritual beings)। কিন্তু এই সংজ্ঞা সন্তোষজনক নয়। কেননা এই সংজ্ঞায় আত্মিক জীবের

সর্বজনস্বীকৃত ধর্মের সংজ্ঞা নিরূপণে অসুবিধা

ধর্মের বিভিন্ন সংজ্ঞা
টাইলর-এর সংজ্ঞা

---

1. "A philosophy of religion is itself an attempt to define religion, and an adequate definition of religion, must be the product of an adequate investigation."
—W. S. Brightman : A Philosophy of Religion ; Page 13

স্বরূপ সম্পর্কে সুনির্দিষ্টভাবে কিছুই বলা হয় নি। ম্যাক্সমূলার (*Max Muller*)-এর সংজ্ঞা, 'ধর্ম হল অসীমের প্রত্যক্ষণ বা উপলব্ধি' (a perception or apprehension of the Infinite)। ক্রিস্টোফার ডসন (*Christopher Daws n*)-এর মতে যখন এবং যেখানে বাহ্য শক্তির উপর মানুষের নির্ভরতাবোধ জেগেছে এবং মানুষ সেই শক্তিকে নিজের থেকে বড় ও রহস্যময় বলে মনে করেছে সেখানেই ধর্মের অস্তিত্ব সূচিত হয়েছে এবং এই শক্তির সামনে থেকে মানুষের মনে যে ভীতি ও আত্মঅবমাননার ভাব জাগ্রত হয়েছে তা অবশ্যই ধর্মীয় অনুভূতি যা উপাসনা ও প্রার্থনার মূলে বর্তমান। ধর্মের এই বর্ণনাও সন্তোষজনক নয় কারণ, এই বর্ণনা খুবই ব্যাপক। এই বর্ণনা অনুযায়ী জাদু বা ইন্দ্রজাল ধর্মের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়ছে এবং সর্বভূতে চৈতন্যের অস্তিত্ব স্বীকার করে নেওয়া হচ্ছে।

ম্যাক্সমূলার-এর সংজ্ঞা

ক্রিস্টোফার ডসন-এর সংজ্ঞা

বুদ্ধি, অনুভূতি এবং ইচ্ছা মনের এই তিনটি মানসিক প্রক্রিয়াব দিক থেকেও ধর্মের সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে। যেমন হারবার্ট স্পেন্সার (*Herbert Spencer*) ধর্মের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন, 'ধর্ম হল একটা আনুমানিক ধারণা যা এই বিশ্বজগতকে বুদ্ধিগম্য করে তোলে।'[1] এই সংজ্ঞা অনুযায়ী ধর্মের ক্রিয়া হল বুদ্ধির ক্রিয়া যা প্রকৃতপক্ষে সত্য নয়। ম্যাকটাগার্ট[2] (*McTaggart*) অনুভূতির দিক থেকে ধর্মের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন, 'ধর্ম হল, আমাদের ও বহির্বিশ্বের মধ্যে এক সামঞ্জস্য আছে—এই বিশ্বাসের উপর নির্ভরশীল একটি আবেগ।' এই সংজ্ঞা ধর্মের মধ্যে অনুভূতি বা আবেগের দিকটিকে প্রকাশ করে কিন্তু ধর্মের মধ্যে যে ক্রিয়ামূলক দিকটি আছে তাকে প্রকাশ করে না। সেইহেতু সংজ্ঞাটি সন্তোষজনক নয়। স্যার জেম্‌স ফ্রেজার (*Sir James Frazer*) ধর্মের মধ্যে যে ক্রিয়ামূলক দিকটি বর্তমান তার উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন এবং তাঁর মতে, "ধর্ম হল মানুষের থেকে উচ্চতর যে সকল শক্তি, প্রকৃতি এবং মানবজীবনের গতিপথ পরিচালিত বা নিয়ন্ত্রিত করে তাদের তুষ্টতা বা প্রসন্নতাসাধন।"[3] যদিও এই সংজ্ঞার মধ্যে ধর্মের তাত্ত্বিক এবং ব্যবহারিক, উভয়

হারবার্ট স্পেন্সার-এর সংজ্ঞা

ম্যাকটাগার্ট-এর সংজ্ঞা

জেম্‌স ফ্রেজার-এর সংজ্ঞা

1. "An hypothesis supposed to render the universe comprehensible" —Herbert Spencer

2. "An emotion resting on a conviction of a harmony between ourselves and the universe at large."—McTaggart,

3. "Propitiation or conciliation of powers superior to man which are believed to direct and control the course of nature and human life," —Sir James Frazer

দিকই বর্তমান তবু এমন কথা বলা চলে না যে, কোন শক্তিকে তুষ্ট বা প্রসন্ন করাই ধর্মের প্রকৃত দিক। ওয়াটারহাউস[1] (*Waterhouse*) বলেন, "যীশুর উপদেশে ঈশ্বরকে তুষ্ট করার কোন কথা নেই। ধর্মের যে সংজ্ঞা খ্রীষ্টধর্মের মতো একটি মহান ধর্মের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়, সেই সংজ্ঞা কখনও ধর্মের সাধারণ সংজ্ঞা হিসেবে সন্তোষজনক গণ্য হতে পারে না।"

মার্টিন্যু-এর সংজ্ঞা

মার্টিন্যু[2] (*Martineau*) ধর্মের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেন, "ধর্ম হল এক সদা-অস্তিত্বশীল ঈশ্বরে বিশ্বাস যিনি এক ঐশ্বরিক মন এবং ইচ্ছা, যা জগতকে নিয়ন্ত্রণ করছে এবং মানুষের সঙ্গে নৈতিক সম্পর্ক রক্ষা করছে।" এই সংজ্ঞার ত্রুটি হল এই যে, এই সংজ্ঞা কেবলমাত্র ধর্মের উন্নত রূপগুলির ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।

হোয়াইটহেড এর সংজ্ঞা

হোয়াইটহেড (*Whitehead*) ধর্মের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন যে, ধর্ম হল 'তাই যা মানুষ তার নিঃসঙ্গতার সঙ্গে করে থাকে' (what a man does with his solitariness)। এই সংজ্ঞা ধর্মের প্রয়োজনীয় স্বরূপ সম্পর্কে কোন আলোকপাত করে না। ওয়াটারহাউস (*Waterhouse*) বলেন, "হোয়াইট-হেডের এই শ্লেষাত্মক উক্তি কতকগুলি উন্নত মন সম্পর্কে প্রযোজ্য হতে পারে, কিন্তু ধর্মের সামগ্রিক বর্ণনা হিসেবে অসফল।"

মায়ার্স-এর সংজ্ঞা

[3]মায়ার্স (*Myers*) বলেন, 'ধর্ম হল যা কিছুকে আমরা জাগতিক নিয়ম বলে জানি তার প্রতি মানুষের আত্মার সুস্থ এবং স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া।' এই সংজ্ঞার সমালোচনায় বলা যেতে পারে যে, ধর্মের কেন্দ্রীয় বিষয় হল কোন আধ্যাত্মিক পরমসত্তা বা ঈশ্বর। কিন্তু এই সংজ্ঞা এই সম্পর্কে কিছুই বলেন না।

উইলিয়াম জেমস-এর সংজ্ঞা

উইলিয়ম জেম্‌স (*William James*) বলেন, "ধর্ম হল এই বিশ্বাস যে, অপ্রত্যক্ষ-গোচর এক শৃঙ্খলার অস্তিত্ব আছে এবং আমাদের পরম কল্যাণ এই শৃঙ্খলার সঙ্গে সুসমঞ্জসভাবে সঙ্গতি বিধানের মধ্যেই নিহিত।"[4] 'সুসমঞ্জসভাবে' কথাটির মধ্য দিয়ে যদি আমরা বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক না বুঝি তাহলে এই সংজ্ঞা সুস্পষ্টভাবে ধর্মকে জাদু বা ইন্দ্রজাল থেকে পৃথক করতে

1. Waterhouse: The Philosophical Approach to Religion; Page 22

2. "A belief in an ever-living God that is a Divine Mind and Will ruling the universe and holding moral relations with mankind,'— Martineau.

3. "The sane and normal response of the human spirit to all that we know of cosmic law." —F. W. H Myers

4. "The belief that there is an unseen order and that our supreme good lies in harmoniously adjusting ourselves thereto."
—William James: The Varieties of Religious Experience; Page 53

পারে না। এই সংজ্ঞাটির গুণ হল যে নিম্নতর এবং উচ্চতর উভয় প্রকার ধর্মের ক্ষেত্রে এই সংজ্ঞা উপযোগী। কিন্তু ধর্মকে যদি আধ্যাত্মিকতা (spiritualism) থেকে স্বতন্ত্র করতে হয় তাহলে পূর্বোক্ত ঐ শৃঙ্খলার উপর মানুষের নির্ভরতাবোধ—এই বিষয়টির উপর গুরুত্ব আরোপ করা উচিত।

ক্রলে (*Crawley*)-এর মতে পবিত্র অনুষ্ঠানই হল ধর্মের আসল বৈশিষ্ট্য। ধর্মের দুটি দিক আছে—একটি তার অন্তরঙ্গ দিক, অপরটি তার বহিরঙ্গ দিক। ধর্মের অন্তরঙ্গ দিক হল ঈশ্বরের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ককে কেন্দ্র করে ব্যক্তির মনে যে ভাব-ধারণা, চিন্তা এবং অনুভূতির আবির্ভাব ঘটে; এবং বহিরঙ্গ দিক হল, ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান, উৎসব যার মাধ্যমে ঐ অনুভূতির প্রকাশ ঘটে। বিভিন্ন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান এই সব আচার-অনুষ্ঠান নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। ক্রলের সংজ্ঞা ধর্মের সংজ্ঞা থেকে ঈশ্বরকে নির্বাসিত করেছে এবং ধর্মের বহিরঙ্গ দিকের উপরই গুরুত্ব আরোপ করেছে। কিন্তু ধর্মের সঙ্গে ঈশ্বরের ধারণা এমনভাবে যুক্ত যে ঈশ্বরের কল্পনা ছাড়া ধর্মের কোন ধারণা করা যায় না।

ক্রলের সংজ্ঞা

মেনজিস্ (*Menzies*) ধর্মের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন যে, 'ধর্ম হল প্রয়োজনবোধ থেকে উদ্ভূত উচ্চতর শক্তির পূজা, (the worship of higher powers from a sense of need)। কিন্তু ওয়াটারহাউস মন্তব্য করেন যে, পূজাকে ধর্মের কেন্দ্রীয় বৈশিষ্ট্য রূপে গণ্য করা চলে না। কোন কোন এস্কিমো (Eskimo)-র এমন দেবতা আছে যাদের সে পূজা করে না। তাছাড়া প্রয়োজনবোধ কৃতজ্ঞতার মনোভাবকে বর্জন করতে চায় এবং এই সংজ্ঞাটি ধর্মীয় উপাসনাকে পূর্বপুরুষদের উপাসনা থেকে সুস্পষ্টভাবে পৃথক করে না।

মেনজিস্ এর সংজ্ঞা

শ্লায়ারমেকার (*Schleiermacher*) অনুভূতির দিক থেকে ধর্মের ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তিনি বলেন, "ধর্মের অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য হল ঈশ্বরের উপর একান্ত নির্ভরতার বোধ।"[1] তাঁর মতে শুদ্ধ ধর্ম হল শুদ্ধ অনুভূতি (pure religion is pure felling), অর্থাৎ কিনা, সেই অনুভূতি যা একদিকে চিন্তনের সঙ্গে এবং অপরদিকে নৈতিকতা অথবা ক্রিয়ার সঙ্গে সংযোগ রহিত। তাঁর মতে ধর্মের সঙ্গে জ্ঞানের কোন সম্পর্ক নেই, জ্ঞান ছাড়াও ধর্মের স্বরূপকে জানা যেতে পারে। মানুষ কোন্ ধারণার অধিকারী, তাতে কিছু যায় আসে না; তা সত্ত্বেও মানুষ ধার্মিক হতে পারে। ধারণা এবং নীতি (ideas and principles) জ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত সেইহেতু এই সব কিছুই ধর্মের পক্ষে অবান্তর বিষয়।

1. "The essence of religion consists in a feeling of absolute dependence on God." —Schleiermacher

ধর্ম নীতি (morality) থেকেও পৃথক। নীতি বা নৈতিকতা স্বাধীনতার চেতনার উপর নির্ভর। কিন্তু ধর্মের গতি বিপরীত দিকে। ধর্মের ক্ষেত্র হল অনিবার্যতার (necessity) ক্ষেত্র। ধর্ম হল পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণ। কিন্তু নীতি কর্মের দায়িত্ব ও ইচ্ছার স্বাধীনতা সূচিত করে। কাজেই ধর্ম হল সসীমের মধ্যে অসীমের, সীমিত কালের মধ্যে অনন্তের ঘনিষ্ট, আন্তরিক ও প্রত্যক্ষ অনুভূতি; সমগ্রের উপর নির্ভরতাবোধ।

শ্লায়ারমেকারের সংজ্ঞা

শ্লায়ারমেকারের সংজ্ঞার গুণ হল তিনি ধর্মকে শূন্যগর্ভ বুদ্ধিবাদ এবং নৈতিকতা (morality) থেকে রক্ষা করেছেন। বস্তুতঃ, ধর্মের অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য রয়েছে তার অন্তর্মুখীতাতে; ঈশ্বর সম্পর্কে প্রত্যক্ষ অবগতিতে। কিন্তু এই সংজ্ঞার ত্রুটি হল, ধর্মের মধ্যে যে অনুভূতির উপাদান রয়েছে তা নিছক অনুভূতি হতে পারে না। অনুভূতির মধ্যে ধারণাগত উপাদান (idea content) থাকা দরকার এবং অনুভূতিকে ধারণা থেকে কখনও এমনভাবে বিযুক্ত করা যেতে পারে না যাতে অনুভূতি প্রয়োজনীয় এবং ধারণা অপ্রয়োজনীয় গণ্য হতে পারে। অনুভূতির জীবন স্বাভাবিকভাবে এবং অনিবার্যভাবে চিন্তন ও ক্রিয়াতে পরিণত হয়। ধর্মের ক্ষেত্রে চিন্তন, অনুভূতি ও ক্রিয়া মিলে এক অখণ্ড ঐক্য গড়ে ওঠে। তাছাড়া নির্ভরতার বোধ ধর্মের অনিবার্য বৈশিষ্ট্য সূচিত করতে পারে না। কেননা ধর্মসম্বন্ধীয় এবং ধর্মনিরপেক্ষ, উভয় প্রকার অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে এই নির্ভরতাবোধ প্রত্যক্ষ করা যায়। ঈশ্বরের বা অসীমের উপর নির্ভরতার কথা বলার মানেই হল অনুভূতির মধ্যে, যত অস্পষ্টই হোক না কেন, বুদ্ধিগত উপাদানের অস্তিত্ব স্বীকার করে নেওয়া। কাজেই ধর্ম নিছক অনুভূতি হতে পারে না, যার কাছে ধারণা বা জ্ঞান সম্পূর্ণ বহিরাগত বিষয়রূপে পরিগণিত হতে পারে।

সংজ্ঞার গুণ

সংজ্ঞার ত্রুটি

কাণ্ট (*Kant*) ধর্মকে নৈতিক চেতনার সঙ্গে অভিন্ন গণ্য করেন। তিনি ধর্মের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেন, "ধর্ম হল আমাদের সব কর্তব্যকে ঐশ্বরিক আদেশরূপে স্বীকার করে নেওয়া"[1]। মেথু আরনল্ড (*Matthew Arnold*) বলেন, "ধর্ম হল আবেগের ছোঁয়ালাগা নৈতিকতা।[2]

কাণ্টের সংজ্ঞা

কাণ্টের সংজ্ঞার ত্রুটি হল তিনি তাঁর সংজ্ঞাতে তিনটি প্রধান মানসিক ক্রিয়া—চিন্তা, অনুভূতি ও ইচ্ছার মধ্যে শুধুমাত্র ইচ্ছার উপরই গুরুত্ব আরোপ করেছেন।

1. 'The recognition of all our duties as divine commandments." —Kant
2. "Religion is morality touched with emotion." —M. Arnold

ধর্ম তাঁর মতে শুধু ইচ্ছারই ব্যাপার। তিনি নৈতিক ইচ্ছার পরিপ্রেক্ষিতে ধর্মের সংজ্ঞা দিয়েছেন এবং ধর্মীয় চেতনাকে নৈতিক চেতনার সঙ্গে অভিন্ন গণ্য করেছেন। ঈশ্বরের সঙ্গে সাহচর্যের অলৌকিক অভিজ্ঞতা, প্রার্থনা, পূজা, উপাসনা, ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি, যেগুলি ধর্মীয় অভিজ্ঞতার উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য, কাণ্টের সংজ্ঞায় সেইগুলি অনুপস্থিত।

কাণ্ট ও আরনল্ড-এর সংজ্ঞায় ত্রুটী

মেথু আরনল্ড-এর বর্ণনা ধর্মের নিম্নতর ও উচ্চতর রূপ, কোনটির ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য নয়। তিনি ধর্মকে নীতির সঙ্গে অভিন্ন করে দেখেছেন। নীতি ও ধর্ম ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে সম্পর্কযুক্ত হলেও উভয়কে অভিন্ন গণ্য করা যুক্তিসঙ্গত নয়। তাছাড়া নৈতিকতায় যেমন 'প্রেম'—এই আবেগের ছোঁয়াও লাগতে পারে, তেমনি অহঙ্কার, ক্রোধ প্রভৃতি আবেগের ছোঁয়াও লাগতে পারে।

[1]হেগেলের মতে, ধর্ম হল 'জীবাত্মার পরমাত্মারূপে নিজ স্বরূপের জ্ঞান'। আর ঐশ্বরিক দিক থেকে হেগেল ধর্মের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন, ধর্ম হল 'সসীম আত্মার মাধ্যমে ঐশ্বরিক আত্মার নিজের সম্পর্কে জ্ঞান'[2]। হেগেলের মতে ধর্ম হল জ্ঞানের ব্যাপার—সসীম ও অসীমের ঐক্য সাধিত হয়েছে যে অদ্বৈত তত্ত্বের মধ্যে, তার জ্ঞান।

হেগেলের সংজ্ঞা

হেগেলের ধর্ম সম্বন্ধীয় সংজ্ঞা অতিরিক্ত মাত্রায় বুদ্ধিগত বা বিশুদ্ধ যুক্তিনির্ভর (intellectualistics)। তিনি ধর্মের বুদ্ধিগত বৈশিষ্ট্যের উপর জোর দিয়েছেন, এবং ইচ্ছামূলক ও আবেগমূলক বৈশিষ্ট্যকে উপেক্ষা করেছেন। ধর্মের ক্ষেত্রে আমরা শুধুমাত্র ঈশ্বরকে জানি তা নয়, আমাদের অদৃষ্টের নিয়ামক কোন অলৌকিক শক্তি বা সত্তার সঙ্গে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করছি এমনও ধারণা করি। ভক্তি, পূজা, উপাসনা ও ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের সঙ্গে সম্পর্কশূন্য ধর্ম, নিছক শূন্যতা ছাড়া কিছুই নয়। [3]মায়েল এডওয়ার্ড্‌স বলেন, "ধর্মের হেগেলীয় বর্ণনাগুলি যৌক্তিক ঐক্য, সংহতি ও সমন্বয়ের উপরে গুরুত্ব আরোপ করাতে ধর্মীয় অভিজ্ঞতার বৈশিষ্ট্যসূচক যে মূল্যায়নের মনোভাব, তাকে দুর্বোধ্য করে তুলেছে।"

সাম্প্রতিক কালে মূল্যের দিক থেকে ধর্মের সংজ্ঞা দেবার চেষ্টা করা হয়েছে। মূল্যের

1. "Religion is the knowledge possessed by the finite mind of its nature as absolute mind."—Hegel.

2. "Religion is the divine spirit's knowledge of itself through the mediation of the finite spirit'.'—Hegel.

3. "Hegelian descriptions of religion, with their stress on logical unity, system, coherence, obscure the valuational attitude which is so characteristic of religious experience."—Miall Edwards ; The Philosophy of Religion" ; Page 19

ধারণা আধুনিক চিন্তার ক্ষেত্রে মৌলিক ধারণা। প্লেটোর মঙ্গলের (good) ধারণা এবং কাণ্টের সৎ ইচ্ছার (good will) ধারণার মধ্য দিয়ে এই মূল্যের ধারণার প্রকাশ ঘটেছে। কিন্তু সাম্প্রতিক কালের দার্শনিক আলোচনায়, হারবার্ট (*Herbert*), লোটজা (*Lotze*) এবং রিচেল (*Ritschl*) প্রভৃতি দার্শনিকদের জন্য মূল্যের ধারণা এক উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করেছে।

হেরল্ড হফডিং (*Harold Hoffding*)-মূল্যের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে ধর্মের সংজ্ঞা নির্দেশ করেছেন। তার মতে ধর্মের আসল কথা হল মূল্য নিত্য—কোন মূল্যেরই অস্তিত্ব ধ্বংস হয়ে যায় না। সব পরিবর্তন সত্ত্বেও মূল্য অবিনশ্বর থাকে। তাই ধর্মের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে তিনি বলেছেন ধর্ম হল মূল্যের নিত্যতায় বিশ্বাস (faith in the conservation of values)। মূল্যের অবিনশ্বরতা ধর্মের স্বতঃসিদ্ধ বৈশিষ্ট্য।

হফডিং-এর সংজ্ঞা

হফডিং নিঃসন্দেহে ধর্মের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদানের কথা নির্দেশ করেছেন। ধর্মীয় চেতনা নিঃসন্দেহে জীবনের পরমমূল্যের প্রতি বিশ্বাস সূচনা করে, একটি সংবেদনশীল জগতের অস্তিত্বে বিশ্বাস সূচনা করে, যে জগত মানুষকে মূল্যের সংগ্রহণে এবং সংরক্ষণে সহায়তা করবে। ধর্মপরায়ণ মানুষ উপলব্ধি করে যে, পরম মূল্যের সংগ্রহণে এবং সংরক্ষণের কাজে তার ব্যক্তিগত ক্ষমতা ও সামর্থ্য পর্যাপ্ত নয়। সে উপলব্ধি করে যে এই বিরাট বিশ্বজগতের যেহেতু সে এক নগণ্য অংশ এবং জগতের অসীম সম্পদের উপরে তার পূর্ণ আধিপত্য নেই, সেইহেতু পরমমূল্যের সংগ্রহণে ও সংরক্ষণে এমন কারও সহায়তার প্রয়োজন আছে যে মানবীয় শক্তির অনেক উর্ধ্বে। মানুষের ধর্মীয় বিশ্বাস তাই এক সর্বব্যাপী, সর্বশক্তিমান, সর্বজ্ঞ শক্তির আশ্রয় নেয়, যে শক্তি মূল্যের নিত্যতায় ব্যক্তিকে সুনিশ্চিত আশ্বাস দিতে পারে। কাজেই ধর্মীয় চেতনার মধ্যে এই বিশ্বাস নিহিত আছে যে, কোন মূল্যই হারিয়ে যায় না।

হফডিং-এর সংজ্ঞার গুণ

ধর্মের প্রয়োজনীয় স্বরূপ সম্পর্কে হফডিং-এর সঙ্গে আমরা একমত। তবু হফডিং-এর সংজ্ঞার বিরুদ্ধে নিম্নলিখিত অভিযোগগুলি আনা যেতে পারে। প্রথমতঃ, ধর্মীয় চেতনা উদ্দেশ্যমূলক এবং সৃজনমূলক, শুধুমাত্র নিষ্ক্রিয় এবং চিন্তামূলক নয়। হফডিং-এর মূল্যের নিত্যতাবাদের স্বতঃসিদ্ধ সত্য, ধর্মীয় চেতনার এই বৈশিষ্ট্যকে অগ্রাহ্য করেছে। তিনি অভিজ্ঞতাকে অনুভূতির সঙ্গে অভিন্ন গণ্য করেছেন, যেহেতু তিনি নিজেই বলেছেন, 'ধর্মীয় অভিজ্ঞতা হল প্রধানতঃ ধর্মীয় অনুভূতি, মূল্যের নিত্যতায় বিশ্বাসের দ্বারা যে অনুভূতি নিয়ন্ত্রিত'। কিন্তু আসল

সংজ্ঞার ত্রুটি

ব্যাপার হল পূর্বস্থিত মূল্যের নিত্যতায় নিছক নিষ্ক্রিয় বিশ্বাসই ধর্ম নয়। ধর্ম নতুন নতুন মূল্যের পরীক্ষণমূলক অনুসন্ধানও বটে।

ধর্মীয় অভিজ্ঞার ক্ষেত্রে মূল্যের পরিমাণ কোন সুনির্দিষ্ট পরিমাণ নয়। এই পরিমাণের হ্রাস বৃদ্ধি আছে। আসল কথা ধর্ম হল জীবনের মূল্যের পুনঃসংগঠন এবং পুনর্মূল্যায়ন। দ্বিতীয়তঃ, সব ধর্মীয় চেতনার প্রয়োজনীয় উপাদান হল এক অলৌকিক সত্তার সঙ্গে ব্যক্তির ঘনিষ্ঠ ও প্রত্যক্ষ ব্যক্তিগত সম্পর্ক, যে অলৌকিক সত্তা সব মূল্যের উৎস এবং ভিত্তি, যাকে ঈশ্বর রূপে অভিহিত করা হয়। হফডিং-এর সংজ্ঞা সেই ঈশ্বরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ব্যক্তিগত সম্পর্কের দিকটিকে অগ্রাহ্য করেছে। মায়েল এডওয়ার্ডস্ বলেন, 'মূল্যের নিত্যতা নিছক স্বতঃসিদ্ধ সত্য হিসেবে নৈর্ব্যক্তিক, দার্শনিক, সার্বিক নীতি মাত্র এবং যখন উপাসকের কাছে উপাসনা হয়ে ওঠে সত্যিকারের অভিজ্ঞতা, নিছক গতানুগতিক ব্যাপার নয়, তখন উপাসক যে ব্যক্তিগত আন্তরিকতা এবং হৃদ্যতা সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠে, উপরিউক্ত নীতির মধ্যে তার অভাব পরিলক্ষিত হয়।"

এডওয়ার্ডস্-এর মন্তব্য

ধর্মের মনস্তাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যের উপর ভিত্তি করে রাইট (*Wright*)[1] ধর্মের সংজ্ঞা দেবার চেষ্টা করেছেন। তাঁর মতে, "বিশেষ ধরনের ক্রিয়ার মাধ্যমে সমাজস্বীকৃত মূল্যের নিত্যতাকে লাভ করার প্রচেষ্টা হল ধর্ম, যে ক্রিয়ার মাধ্যমে ব্যক্তির সাধারণ আত্মা এবং অন্যান্য নিছক মনুষ্যজাতীয় জীব থেকে স্বতন্ত্র কোন সত্তাকে আহ্বান করা হয় এবং যে ক্রিয়া ঐ সত্তার উপর নির্ভরতাবোধ সূচিত করে।" রাইট এই সংজ্ঞাটিকে ব্যাখ্যা করেছেন। মূল্যকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি বলেন, মূল্য দু'ধরনের হতে পারে, (১) মূর্ত বা জড়াত্মক এবং ব্যবহারিক। যেমন—খাদ্য, পানীয়, যুদ্ধজয়, যেগুলিকে আদিম নরনারী তাদের ধর্মে মূল্য বলে গণ্য করত, এবং (২) হৃদয়ের পবিত্রতা, ক্ষমা, সততা' যেগুলিকে নৈতিক ধর্মে (ethical religions) মূল্য বলে গণ্য করা হয়। রাইট মূল্য বলতে দু'ধরনের মূল্যকেই বুঝেছেন। এই মূল্যগুলি 'সমাজ স্বীকৃত' (socially recognised) কেননা এই মূল্যগুলি সামাজিক গোষ্ঠীর সামগ্রিক কল্যাণের পক্ষে কিংবা ব্যক্তির নিজ কল্যাণের জন্য নৈতিক দিক থেকে যথোচিত এবং উপযুক্ত বলে স্বীকৃত। নিত্যতা (conservation)বলতে জাগতিক

রাইটের সংজ্ঞা

1 'Religion is the endeavour to secure the conservation of socially recognized values through specific actions that are believed to evoke some agency different from the ordinary ego of the individual, or from other merely human beings, and that imply a feeling of dependence upon this agency".

—W. K. Wright: A Student's Philosophy of Religion; Page 47

মূল্যের পরিমাণগত বৃদ্ধি এবং আধ্যাত্মিক মূল্যের বৃদ্ধি উভয়কেইবোঝায়। ধর্ম মূল্যের সংরক্ষণের প্রচেষ্টা (the endeavour to conserve the values) মাত্র নয়, মূল্যের নিত্যতাকে লাভ করার প্রচেষ্টা (the endeavour to secure the conservation)— এই উক্তির মধ্য দিয়ে এই কথাই বোঝবার চেষ্টা করা হয়েছে যে, ধর্মীয় ক্রিয়া যেমন, প্রার্থনা, পূজা, উপাসনা, উৎসর্গ প্রভৃতি প্রত্যক্ষভাবে ফল লাভের চেষ্টা না করে কোন সত্তার মাধ্যমে তাকে লাভের জন্য চেষ্টা করে। রাইটের মতে ধর্মের মধ্যে ক্রিয়ারই প্রাধান্য, ধর্মের বুদ্ধিগত এবং আবেগত বৈশিষ্ট্য ধর্মের উপরিউক্ত প্রচেষ্টার আনুষঙ্গিক বিষয় মাত্র। বিশেষ ধরনের ক্রিয়া (specific action) বলতে বোঝায়, উৎসর্গ, মন্ত্রোচ্চারণ, প্রার্থনা, যাগযজ্ঞ ইত্যাদি। ধর্মের ক্ষেত্রে ধর্মীয় ক্রিয়ার মাধ্যমে কোন বিশেষ ধরনের সত্তাকে (agent) আহ্বান করা হয়। এই সত্তা ব্যক্তির চেতন আত্মা (conscious self) বা অন্য কোন মানুষ হলে চলবে না। ধর্মপ্রবণ ব্যক্তির বিশেষ মনোভাবের কথাও এই সংজ্ঞাতে বলা হয়েছে, তাহল ঐ সত্তার উপর নির্ভরতাবোধ।

নানাকারণে এই সংজ্ঞাকে সন্তোষজনক মনে করা হয় না। এই সংজ্ঞার বিরুদ্ধে অভিযোগ হল—(১) রাইটের ব্যাখ্যানুযায়ী ধর্ম হয়ে পড়ে সমাজের মাধ্যমে উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত বিষয়, কিন্তু এটাকে ধর্মের সারবস্তু বলে গণ্য করা চলে না, কেননা কোন ব্যক্তি নিজের জন্য ধর্ম তৈরি করতে পারে। (২) রাইটের মতে মূল্য হবে সমাজস্বীকৃত। তিনি দু'ভাবে মূল্যের ব্যাখ্যা দিয়েছেন। যে ভাবেই ব্যাখ্যা দেন না কেন, তাঁর প্রদত্ত ব্যাখ্যা মনে হয় খেয়াল-খুশীর ব্যাপার। মূল্যের ক্ষেত্রে আসল প্রশ্ন হল, মূল্য সদর্থক, না নঞর্থক এবং ব্যক্তির ধর্মপরায়ণতার পক্ষে তার সদর্থক মূল্য সম্পর্কে ধারণা, সামাজিক গোষ্ঠীর প্রভাবের ফল বা ব্যক্তির ব্যক্তিগত অন্তঃদৃষ্টি বা অভিজ্ঞতার ফল, ধর্মের পক্ষে কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে যে, ধর্মীয় ভাবাবেশকে সামাজিক গোষ্ঠী, গোষ্ঠীর জন্য বা ব্যক্তির নিজের জন্য সদর্থক মূল্য বলে গণ্য নাও করতে পারে।

সংজ্ঞার ত্রুটি

(৩) ক্রিয়ার পরিপ্রেক্ষিতে ধর্মের সংজ্ঞা দেবার জন্য, বিশ্বাস এবং অনুভূতিকে ধর্মের পক্ষে সহায়ক গণ্য করা হয়েছে, অনিবার্য মনে করা হয়নি। তাছাড়া সর্ব ধর্মীয় ক্রিয়ার মধ্য দিয়েই কোন সত্তাকে আহ্বান করা হয়, এমন নয়। (৪) রাইট তাঁর সংজ্ঞাতে যে সত্তাকে আহ্বান করা হচ্ছে তাকে অতীন্দ্রিয় বা অলৌকিক হতেই হবে এমন কথা বলেন নি, শুধু বলেছেন তাকে অ-মানবীয় হতে হবে। এর ফলে বিজ্ঞান ও জাদু এই সংজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়েছে।

ইন্দ্রজাল এই সংজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়ে

[1]জে. বি প্র্যাট (*J. B. Pratt*) ধর্মের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন, "ধর্ম হল ব্যক্তি বা সম্প্রদায়ের, তাদের স্বার্থ এবং অদৃষ্টের উপর চরম নিয়ন্ত্রণ রয়েছে বলে ধারণা করে, এমন শক্তি বা শক্তিগুলির প্রতি গুরুত্বপূর্ণ এবং সামাজিক মনোভাব।"

এই সংজ্ঞার গুণ হল প্র্যাট ধর্মকে রাইটের মতন উদ্দেশ্যমূলক ক্রিয়া বলে বর্ণনা না করে তাকে মনোভাব রূপে বর্ণনা করেছেন ; কিন্তু সামাজিক মনোভাব বলতে তিনি কি বোঝেন তা অস্পষ্ট রয়ে গেছে।

মন্তব্য : উপরিউক্ত সংজ্ঞাগুলির আলোচনা থেকে একটা বিষয় স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, ধর্মের কোন একটি সংজ্ঞাকে সন্তোষজনক মনে করা খুব কঠিন। একটিমাত্র সংজ্ঞাতে ধর্মের আদিম ও পরবর্তীকালের ধর্মের স্তরগুলিকে উল্লেখ করা, আত্মাবাদ, পূর্বপুরুষের পূজা, ইন্দ্রজাল প্রভৃতি থেকে ধর্ম যে স্বতন্ত্র, সংজ্ঞাতে সেইগুলি নির্দেশ করা এবং ধর্মের লক্ষণার্থ (connotation) নির্ধারণের পক্ষে ধর্মের কোন্ কোন্ বৈশিষ্ট্য উল্লেখযোগ্য, এইসমস্ত কিছুর উল্লেখ করা খুবই কঠিন।

ধর্মের সন্তোষজনক সংজ্ঞার শর্ত

ধর্মের সংজ্ঞা দেবার সময় মনে রাখতে হবে, ধর্ম হল মানুষের চিন্তার ও আচরণের এক স্বাভাবিক, বৈশিষ্ট্যমূলক এবং সার্বিক রূপ (a normal, characteristic and universal form of human thought and conduct) যা বিশেষ বৈশিষ্ট্যের অধিকারী, যেগুলি তাকে অন্য আচরণ থেকে স্বতন্ত্র করে। সংজ্ঞাতে আরও নির্দেশ করতে হবে যে, বিশ্বাস ধর্মের অন্তর্ভুক্ত এবং যাতে বিশ্বাস স্থাপন করা হয়েছে তাকে লাভ করার জন্য ব্যবহারিক ক্রিয়ারও প্রয়োজন। ধর্মের সঙ্গে মূল্যেরও সম্পর্ক রয়েছে ; মানুষ মূল্যের কামনা করে, কিন্তু সেইগুলি সে নিজে লাভ করতে পারে না, কিন্তু নিজের থেকে ঊর্ধ্ব কোন শক্তির সাহায্যে তাকে লাভ করার প্রত্যাশা করে। কোন একটি মাত্র সংজ্ঞাতে ধর্মের উপরিউক্ত সব বৈশিষ্ট্যকে অন্তর্ভুক্ত করা কঠিন। তবু ধর্মের যে কোন সংজ্ঞাতে উপরিউক্ত বৈশিষ্ট্যের যতগুলি সম্ভব উল্লিখিত হওয়া প্রয়োজন।

বিভিন্ন ধর্মের সংজ্ঞার সমালোচনা ও ধর্মের সংজ্ঞা সম্পর্কে উপরিউক্ত শর্তগুলির দিকে লক্ষ্য রেখে ওয়াটারহাউস (*Waterhouse*) ধর্মের একটি সংজ্ঞা দেবার চেষ্টা করেছেন

---

1. "Religion is the serious and social attitude of individuals or communities towards the power or powers which they conceive as having ultimate control over their interests and destinies."

—J. B. Pratt : The Religious Consciousness ; Page 2

—"একটি উচ্চতর সত্তা যেটি এই জগতে প্রকাশমান এবং যথোপযুক্তভাবে অগ্রসর হলে যার সঙ্গে সহানুভূতিসূচক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করা যায় বলে ব্যক্তি বিশ্বাস করে, এমন একটি উচ্চতর সত্তার সঙ্গে মৈত্রীবন্ধনে আবদ্ধ হয়ে নিজের অনুভূত অপর্যাপ্তিকে সম্পূরণ করার প্রচেষ্টা হল ধর্ম "[১]

[২]ফ্লিন্ট (Flint) ধর্মের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেন, "ধর্ম হল এমন এক বা একাধিক সত্তায় মানুষের বিশ্বাস যে তার থেকে অনেক শক্তিশালী ও তার ইন্দ্রিয়ের অনধিগম্য অথচ তার আবেগ ও কাজের প্রতি উদাসীন নয় এবং যে বিশ্বাসের সঙ্গে যুক্ত হয়ে আছে তার অনুভূতি ও কার্য।"

অন্যান্য সংজ্ঞার তুলনায় উপরিউক্ত সংজ্ঞা দুটি অপেক্ষাকৃত সন্তোষজনক, কেননা ধর্মের প্রয়োজনীয় বৈশিষ্ট্যের অনেকগুলিই সংজ্ঞা দুটিতে উল্লিখিত হয়েছে।

৩। ধর্মের স্বরূপ সম্পর্কে সবচেয়ে সন্তোষজনক অভিমত :

ইতিপূর্বে বিভিন্ন সংজ্ঞার মাধ্যমে ধর্মের স্বরূপ সম্পর্কে যে আলোচনা আমরা করেছি তার থেকে একটা বিষয় স্পষ্ট হয়েছে যে, অনুভূতি, ক্রিয়া এবং বুদ্ধি এই তিনের শুধুমাত্র একটি কখনও ধর্মের প্রয়োজনীয় উপাদানরূপ গণ্য হতে পারে না। ইতিপূর্বে যে সংজ্ঞাগুলি আলোচিত হয়েছে, এরা ধর্মের প্রকৃতি সম্পর্কে আংশিক সত্যকে ব্যক্ত করেছে। ধর্ম মানুষের প্রকৃতির শুধু একটা অংশমাত্র অধিকার করে নেই। ধর্ম এক পরমতত্ত্বের প্রতি ব্যক্তির সমগ্র সত্তার প্রতিক্রিয়া। ধর্মের মধ্যে রয়েছে একটা মনোগত দিক এবং একটা বস্তুগত দিক এবং এই দুই দিকের সম্বন্ধ। মনের দিক থেকে দেখতে গেলে মানুষের সব মানসিক প্রক্রিয়া চিন্তা, অনুভূতি ও ইচ্ছা ধর্মের অন্তর্ভুক্ত। বস্তুর দিক থেকে বিচার করতে গেলে ধর্ম মানুষের চেতনা-ঊর্ধ্ব এক ঐশ্বরিক তত্ত্বকে (trans-subjective divine reality) নির্দেশ করে, যে ঐশ্বরিক তত্ত্বের মধ্যে মানবজীবনের পরমমূল্যগুলি সংরক্ষিত আছে। আবার ধর্ম

---

1. "Religion is man's attempt to supplement his felt insufficiency by allying himself with a higher order of being which he believes is manifest in the world and can be brought into sympathetic relationship with himself if rightly approached "

—E. S. Waterhouse : The Philosophical Approach to Religion ; Page 25

2. "Religion is man's belief in a Being or Beings mightier than himself and inaccessible to his senses but not indifferent to his sentiments and actions with the feelings and practices which flow from such belief."—Flint.

পূজা, সখ্যতার এবং সেবার মধ্য দিয়ে মনের সঙ্গে সেই চেতনা-উর্ধ্ব পরম ঐশ্বরিক তত্ত্বের সম্পর্কও নির্দেশ করে। এই সম্পর্ক একটি বিশেষ লক্ষ্য দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়—তাহল ব্যক্তিগত ও সামাজিক মানবীয় মূল্যের সংরক্ষণ ও বৃদ্ধি—যা শেষ পর্যন্ত ঐশ্বরিক তত্ত্বের প্রতি ভক্তিময় অনুরাগে পরিণত হয়, যে ঐশ্বরিক তত্ত্বই হয়ে ওঠে পরমমূল্য। ধর্মীয় অভিজ্ঞতা চেতনারূপ মানসিক অবস্থার অতিরিক্ত কিছু। ধর্ম এক অতীন্দ্রিয় জগতের নির্দেশ করে, যে জগৎ একাধারে অতিবর্তী ও অন্তর্বর্তী, যেখানে মূল্য তত্ত্বের সদৃশ হয়। ধর্ম শুধুমাত্র এক অলৌকিক তত্ত্বে বিশ্বাস নয়, ধর্ম এই অলৌকিক তত্ত্বের প্রতি আবেগময় সাড়া এবং ইচ্ছামূলক প্রতিক্রিয়া যার ফলে ব্যক্তি এই তত্ত্বের সঙ্গে সঙ্গতিবিধানের জন্য সমগ্র জীবনকে তার উপযোগী করে তোলে।

ধর্মের স্বরূপকে বোঝার জন্য আমরা ইতিপূর্বে ধর্মের বিভিন্ন সংজ্ঞা সম্পর্কে আলোচনা করেছি। এবার আমরা ধর্মের সঙ্গে জ্ঞানের অন্যান্য শাখার, বিশেষ করে যেগুলির সঙ্গে ধর্মের সম্পর্ক রয়েছে, সেইগুলি আলোচনা করে ধর্মের স্বরূপকে বুঝবার চেষ্টা করব। আমরা প্রথমে ধর্মের সঙ্গে বিজ্ঞানের সম্বন্ধ আলোচনা করব :

(i) ধর্ম এবং বিজ্ঞান (Religion and Science) ঃ

ধর্ম ও বিজ্ঞানের প্রকৃতি

'ধর্ম হল এমন এক বা একাধিক সত্তায় মানুষের বিশ্বাস যে তার থেকে অনেক শক্তিশালী ও তার ইন্দ্রিয়ের অনধিগম্য অথচ তার আবেগ ও কাজের প্রতি উদাসীন নয় এবং যে বিশ্বাসের সঙ্গে যুক্ত হয়ে আছে তার অনুভূতি ও কার্য।' বিজ্ঞান হল প্রকৃতির কোন একটি বিশেষ বিভাগ সম্পর্কে বিশেষ জ্ঞান। প্রত্যেক বিজ্ঞান প্রকৃতির এক নির্দিষ্ট বিভাগ সম্পর্কে আমাদের সুনির্দিষ্ট, সুশৃঙ্খল এবং নির্ভুল জ্ঞান দান করে। পদার্থবিদ্যা, রসায়নশাস্ত্র প্রভৃতি প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের উদাহরণ।

প্রায়শঃই একথা বলা হয়ে থাকে যে, ধর্ম ও বিজ্ঞান পরস্পরবিরুদ্ধ। এই জাতীয় অভিমত যুক্তিযুক্ত কিনা আমরা বিচার করে দেখে, ধর্ম ও বিজ্ঞান পরস্পরের সঙ্গে কিভাবে সম্বন্ধযুক্ত আলোচনা করব। যাঁরা মনে করেন ধর্ম ও বিজ্ঞান পরস্পর বিরুদ্ধ, তাঁদের এইরূপ সিদ্ধান্ত করার পিছনে কতকগুলি কারণ আছে। প্রথমতঃ, অনেকে মনে করেন যে, এই বিজ্ঞানের যুগে মানুষ বিজ্ঞানের সাহায্যে তার অনেক প্রয়োজনই মেটাতে সমর্থ হয়েছে, জগৎকে বুঝতে ও ব্যাখ্যা করতে সমর্থ হয়েছে। কাজেই ধর্মের আর করণীয় কিছু নেই। বিজ্ঞান যে প্রয়োজন মেটাতে পারে না ধর্ম তা মেটাতে অসমর্থ।

ধর্ম ও বিজ্ঞানের পারস্পরিক বিরোধিতার প্রশ্নে বিভিন্ন যুক্তি

দ্বিতীয়তঃ, ধর্ম ও বিজ্ঞানের পরিসর সম্পর্কে কাণ্টের বক্তব্যও এই বিরোধিতার ধারণা সৃষ্টি করেছে। কাণ্টের মতে বিজ্ঞানের কাজ অবভাসকে (phenomena) অর্থাৎ যা প্রতীয়মান তাকে নিয়ে, আর ধর্মের সম্পর্ক হল অবভাসকে অতিক্রম করে যে তত্ত্ব রয়েছে তাকে নিয়ে। কাজেই ধর্ম সম্বন্ধীয় বিষয়ের কোন বৈজ্ঞানিক জ্ঞান লাভ করা সম্ভব নয়। হারবার্ট স্পেন্সার-এর অজ্ঞেয়তাবাদ (agnosticism)-ও ধর্ম ও বিজ্ঞান পরস্পর বিরোধী এই ধারণাকে কিছুটা প্রভাবিত করেছে। অজ্ঞেয়তাবাদীদের মতে অতীন্দ্রিয় সত্তার অস্তিত্ব আছে কিন্তু এই সত্তা অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয়। ধর্মের সম্পর্ক এক অতীন্দ্রিয় তত্ত্বকে নিয়ে এবং বিজ্ঞানের পক্ষে এই অতীন্দ্রিয় তত্ত্বকে জানা সম্ভব নয়, অজ্ঞেয়তাবাদ যেন এই ধারণাই সৃষ্টি করে। এছাড়াও বহুদিন ধরে একটা ধারণা চলে আসছে যে, আধুনিক বিজ্ঞান ও ধর্মের মধ্যে উভয়ের প্রকৃতির দিক থেকে এক অন্তর্নিহিত অসঙ্গতি বর্তমান।

ধর্ম ও বিজ্ঞানের বিরোধিতার ধারণার মূলে রয়েছে বিজ্ঞান ও ধর্মের পারস্পরিক সম্বন্ধ এবং উভয়ের ক্রিয়া ও পদ্ধতি সম্পর্কে একটা ভুল বোঝাবুঝির ধারণা। এছাড়াও উভয়ের বিরোধিতার মূলে রয়েছে ধর্ম ও বিজ্ঞানকে একটা সঙ্কীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি

ধর্ম ও বিজ্ঞান পরস্পর বিরুদ্ধ নয়। একটি অপরটির পরিপূরক

থেকে দেখা। তছাড়া তত্ত্বকে (reality) জানার ব্যাপারে ধর্ম ও বিজ্ঞানের দৃষ্টিভঙ্গি ও পদ্ধতি পৃথক সন্দেহ নেই; কিন্তু এই দৃষ্টিভঙ্গির ও পদ্ধতির পার্থক্যকে অনেক সময় এত বড় করে দেখান হয় যে, তার ফলে এই ধারণার সৃষ্টি হয় যে উভয়ের সম্পর্ক হল পারস্পরিক বিরুদ্ধতার ও অসঙ্গতির। কিন্তু প্রকৃত সত্য হল উভয়ের মধ্যে কোন বিরোধিতা নেই; বরং এমন কথা বলাই সঙ্গত যে, একটি অপরটির পরিপূরক।

ধর্ম ও বিজ্ঞানের পার্থক্য নিরূপণের পূর্বে বিজ্ঞানের কার্য ও পদ্ধতির বিশ্লেষণ করে দেখা যাক যে তার মধ্যে ধর্মবিরোধী কিছু আছে কিনা। অভিজ্ঞতালব্ধ ঘটনাবলীর

বিজ্ঞানের কার্য ও পদ্ধতি

মধ্যে পূর্বাপর সম্পর্ক আবিষ্কার করে তাদের সুবিন্যস্ত করা এবং তার সুসমঞ্জস, ঐক্যবদ্ধ ও সুশৃঙ্খল বিবরণ দেওয়া বিজ্ঞানের লক্ষ্য। বিজ্ঞানের পদ্ধতি হল পর্যবেক্ষণ, পরীক্ষণ এবং আরোহ পদ্ধতি। প্রত্যেক বিজ্ঞান তার আলোচ্য বিষয় সম্পর্কে কতকগুলি সাধারণ নিয়ম আবিষ্কার করে এবং সেই নিয়মগুলির সাহায্যে আলোচ্য বিষয়গুলিকে ব্যাখ্যা করতে চেষ্টা করে। কাজেই প্রাকৃতিক বিজ্ঞানগুলির কার্য ও পদ্ধতিকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, প্রাকৃতিক বিজ্ঞানগুলি ধর্মীয় নয় এবং ধর্মবিরোধীও নয়। প্রাকৃতিক বিজ্ঞানগুলি

অভিজ্ঞতায় প্রাপ্ত ঘটনাবলীকে যে অবস্থায় আলোচনা করে, তাতে মনে হয় না যে তারা কোন ধর্মসম্বন্ধীয় সমস্যার উত্থাপন করে। বৈজ্ঞানিক যখন ঘটনার মধ্যে পরিমাণগত সম্বন্ধগুলি আবিষ্কার করতে পারেন এবং কার্যকারণের ক্রমের মধ্যে তার স্থান নির্দিষ্ট করতে সমর্থ হন তখনই তার কার্য সমাপ্ত হয়। অভিজ্ঞতায় এমন অনেক কিছু আছে যা বিজ্ঞান উপেক্ষা করে এবং এই উপেক্ষার কারণ হল ঐগুলিকে বৈজ্ঞানিক তার আলোচনার পক্ষে অপ্রাসঙ্গিক বস্তু বলে গণ্য করে। পরমতত্ত্বের স্বরূপ নির্ণয় করা এবং ঘটনার উদ্দেশ্য নিরূপণ করা বৈজ্ঞানিকের কাজ নয়। বস্তুর গুণগত প্রকৃতি নিরূপণ এবং বস্তু কি লক্ষ্য বা অভীষ্ট সিদ্ধ করে তা নিরূপণ করা, অর্থাৎ কিনা—কোন লক্ষ্য বা উদ্দেশ্যের জগৎ নিয়েও তার কাজ নয়। ব্যক্তিগত মূল্য এবং আদর্শের জগৎ, যাকে আশ্রয় করে ধর্ম বেঁচে থাকে, তা প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের কাছে এক অপরিচিত জগৎ। আধ্যাত্মিক মূল্যের যাথার্থ্য সম্পর্কে বিজ্ঞান কোন অভিমত ব্যক্ত করে না। কাজেই বিজ্ঞান যদি তার আলোচনাকে নিজের পরিসরের মধ্যে সীমিত রাখে তাহলে আমরা যুক্তিসঙ্গতভাবে এই সিদ্ধান্ত করতে পারি যে, ধর্মের সঙ্গে বিজ্ঞানের ভুল বোঝা-বুঝির কোন প্রশ্ন ওঠে না। কিন্তু যদি প্রাকৃতিক বিজ্ঞানগুলি তাদের অনুসৃত পদ্ধতি ও নীতিকে সমগ্র বিশ্বের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে তৎপর হয় এবং প্রাকৃতিক দিক থেকে মূল্যের ও জগতের উদ্দেশ্যকে ব্যাখ্যা করতে সচেষ্ট হয়; তাহলে ধর্মের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক হয়ে উঠবে মূলতঃ বিরোধিতার সম্পর্ক। অবশ্য বেশীর ভাগ বৈজ্ঞানিকই তাদের কার্যের সীমা সম্পর্কে সচেতন।

বিজ্ঞান নিজের নির্দিষ্ট গণ্ডী অতিক্রম না করলে ধর্ম বিরোধী হয়ে উঠতে পারে না

দুটি কারণে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের আলোচনার পরিসরকে সীমিত করার এবং চরম সমস্যা সম্পর্কে তার অভিমতকে স্বীকার না করার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে।

প্রথমতঃ, প্রাকৃতিক বিজ্ঞান তার বাস্তব ও যান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে চেতনার সন্তোষজনক ব্যাখ্যা দিতে অসমর্থ এবং **দ্বিতীয়তঃ,** প্রাকৃতিক বিজ্ঞান ঘটনাকে যে-ভাবে প্রাপ্ত হয় সেইভাবেই তাকে গ্রহণ করে, কিভাবে তাদের পাওয়া গেল সেই সম্পর্কে কোন প্রশ্ন উত্থাপন করে না। ঘটনাকে আলোচনা করতে গিয়েও প্রাকৃতিক বিজ্ঞান একটা বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি থেকে তাদের আলোচনা করে। তা করতে গিয়ে বিজ্ঞানের দৃষ্টিভঙ্গি হয়ে পড়ে অসম্পূর্ণ এবং খণ্ড দৃষ্টিভঙ্গির পরিচায়ক, যার ফলে পরমমূল্যের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত সমস্যার উপর প্রাকৃতিক বিজ্ঞান তার অভিমত যুক্তিসঙ্গতভাবে ব্যক্ত করতে পারে না।

প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের দুটি সমস্যা

এখন দেখা যাক, বিজ্ঞান ও ধর্মের দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে কি কি বিষয়ে পার্থক্য বর্তমান। **প্রথমতঃ**, বিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয়বস্তু অভিজ্ঞতায় প্রদত্ত ঘটনাবলী। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি বস্তুর দৃশ্যমান রূপটুকুর বা বস্তুর বাহ্য সত্তার প্রতিই নিবদ্ধ থাকে। কিন্তু ধর্মের কেন্দ্রীয় বিষয় হল ঈশ্বর, যা এক অধ্যাত্ম অতিন্দ্রীয় তত্ত্ব। **দ্বিতীয়তঃ**, বিজ্ঞানের পদ্ধতি হল পর্যবেক্ষণ ও আরোহানুমান। ধর্মের পদ্ধতি যুক্তি, বিশ্বাস ও প্রত্যক্ষ অনুভূতি বা স্বজ্ঞা। অনেকেই মনে করেন যে, তর্কের দ্বারা ঈশ্বরের অস্তিত্বকে প্রমাণ করা যায় না, ঈশ্বরকে জানা যায় না। স্বজ্ঞাই ঈশ্বর-জ্ঞান লাভের প্রশস্ত পথ। স্বজ্ঞার মাধ্যমে অতীন্দ্রিয় ঈশ্বরের সাক্ষাৎ প্রতীতি হয়। **তৃতীয়তঃ**, ধর্মের দৃষ্টিভঙ্গি এক ব্যক্তিগত (personal) বা মূল্যায়নের দৃষ্টিভঙ্গি। কিন্তু বিজ্ঞানের দৃষ্টিভঙ্গি হল নৈর্ব্যক্তিক (impersonal)। ধর্মের মধ্য দিয়ে ব্যক্তি তার ব্যক্তিগত ইচ্ছা পূরণ করে। ধর্ম মূল্যের পরিপ্রেক্ষিতে তত্ত্বের স্বরূপের ব্যাখ্যা দেয়। কিন্তু বিজ্ঞানের দৃষ্টিভঙ্গি হল নৈর্ব্যক্তিক। তথ্যের বা ঘটনার ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বিজ্ঞান কোন আবেগের আশ্রয় নেয় না। পাছে বিচার পক্ষপাতদুষ্ট হয় সেই কারণে বৈজ্ঞানিক অনুভূতি, কামনা-বাসনাকে সাধ্যমত বর্জন করেন। শিব ও সুন্দর—এই মূল্যকে সে তার অভীষ্ট সিদ্ধির পথে অগ্রাহ্য করে। কেবল যা বস্তুগত সত্য তার সঙ্গেই তার সম্পর্ক। **চতুর্থতঃ**, ধর্মের সম্পর্ক গুণগত পরিমাপের সঙ্গে; পরিমাণগত দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই বৈজ্ঞানিকের জগৎ আলোচনা। বস্তুর গুণকে পরিমাণগত সূত্রে নির্ধারণ করাই হল বিজ্ঞানের লক্ষ্য। ধর্ম পরমমূল্য নিয়ে আলোচনা করে। কল্পনা ও আবেগকে বর্জন করে যাথার্থ্য লাভ করাই হল বিজ্ঞানের লক্ষ্য, বিষয়বস্তুর প্রতি বিজ্ঞানের দৃষ্টিভঙ্গিও যান্ত্রিক। **পঞ্চমতঃ**, বৈজ্ঞানিকের দৃষ্টিভঙ্গি হল খণ্ড, ধর্মের দৃষ্টি হল অখণ্ড; ধর্মের আলোচ্য পরিসর অভিজ্ঞতার কোন সীমিত পরিসর নয়, পরিপূর্ণ অর্থ ও মূল্যের দিক থেকে সমগ্র অভিজ্ঞতার জগৎই ধর্মের আলোচ্য পরিসর। বিজ্ঞানের দৃষ্টি হল খণ্ড এবং সাময়িক, চূড়ান্ত বা ব্যাপক নয়। **ষষ্ঠতঃ**, বিজ্ঞান হল তাত্ত্বিক, ধর্ম মূলতঃ ব্যবহারিক।

বিজ্ঞান ও ধর্মের দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে পার্থক্য

কাজেই ধর্ম ও বিজ্ঞানের মধ্যে পার্থক্য আলোচনা করেও দেখা গেল যে, উভয়ের আলোচনার ক্ষেত্র এক নয় এবং একের অপরের বিরুদ্ধতা করার কোন প্রশ্ন ওঠে না। ধর্ম ও বিজ্ঞানের মধ্যে বিরোধিতা দেখা দেওয়া তখনই সম্ভব যখন ধর্ম তার আলোচ্য পরিসর ও দৃষ্টিভঙ্গি বর্জন করে জগতের বৈজ্ঞানিক ও তথ্যগত ব্যাখ্যা দিতে সচেষ্ট হয় এবং যখন বিজ্ঞান তার নির্দিষ্ট রাজ্যকে অতিক্রম করে তার খণ্ড দৃষ্টিভঙ্গিকে অর্থাৎ জড়াত্মক ও প্রাকৃতিক দৃষ্টিভঙ্গিকে সমগ্র তত্ত্বের ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে প্রযুক্ত করে। আরও এক

কারণে বিজ্ঞান ও ধর্মকে পরস্পরবিরোধী ধারণা করা হয়। তা'হল, বিজ্ঞানকে মনে করা হয় বিচারবুদ্ধিভিত্তিক। ধর্মকে মনে করা হয় পুরোপুরি বিশ্বাসের ব্যাপার। বিজ্ঞান ঘটনা থেকে তার সিদ্ধান্ত নিঃসৃত করে। ধর্ম বিশ্বাসের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। উপরিউক্ত বর্ণনার মধ্যে যে কিছুটা সত্যতা নেই, তা নয়, তবে বিষয়টাকে একটু অতিরঞ্জিত করা হয়েছে। বিশ্বাস এবং বিচারবুদ্ধিকে পরস্পরের থেকে এত চরমভাবে পৃথক করা চলেনা। ধর্ম বিচারবুদ্ধি বিরোধী নয় এবং বিজ্ঞানকেও তার প্রযুক্ত নিয়ম বা নীতির কার্যকরতায় বিশ্বাস করতে হয়। বিজ্ঞান প্রকৃতির একরূপতায় বিশ্বাস করে, যে বিশ্বাস ছাড়া তার পক্ষে সার্বিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সম্ভব নয়। যে বৃত্তির সাহায্যে বৈজ্ঞানিক প্রকল্প গঠন করে এবং তার থেকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে, সেই বৃত্তিতে তার বিশ্বাস আছে। সে আরও বিশ্বাস করে যে, উপযুক্ত আশ্রয়বাক্যের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলে সেই সিদ্ধান্তের যাথার্থ্য প্রাকৃতিক ঘটনার দ্বারা প্রমাণিত হবে। কাজেই এই ধরনের অনেক ব্যাপারে বৈজ্ঞানিককে সে যা প্রমাণ করতে অক্ষম, তাকে বিশ্বাসের ভিত্তিতে প্রমাণ করতে হয়। সে কতকগুলি বিষয়কে বিনা প্রমাণে, অর্থাৎ বিশ্বাসের ভিত্তিতে স্বীকার করে নেয়। কাজেই পূর্বের সিদ্ধান্তের আর একবার পুনরাবৃত্তি করে বলা চলে যে, কি পদ্ধতির দিক থেকে, কি মনোভাবের দিক থেকে বিজ্ঞান আবশ্যিকভাবে ধর্মের বিরোধী নয় এবং বিজ্ঞান যদি ধর্ম-বিরোধী না হয়, ধর্মও বিজ্ঞানবিরোধী নয়।

ধর্ম ও বিজ্ঞান পরস্পরের বিরোধী নয়

বস্তুতঃ ধর্ম ও বিজ্ঞানের মধ্যে যে সম্বন্ধ সেই সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠতার সম্বন্ধ, একটি অপরটির কাজের পরিপূরক। বিজ্ঞান এই দৃশ্যমান জগতের সুশৃঙ্খল ব্যাখ্যা দিয়ে জগৎকে সঠিকভাবে বুঝতে সহায়তা করে এবং পরোক্ষভাবে ঈশ্বর-উপলব্ধির সহায়ক হয়। ধর্মকে বিজ্ঞানের এই সহায়তার কথা স্বীকার করে নিতে হবে। আবার ধর্মের দৃষ্টিভঙ্গি যেহেতু ব্যাপক, জগতের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার উপর তার প্রভাব বর্তমান। ধর্মের দৃষ্টিভঙ্গি যেহেতু অখণ্ড, বস্তুর বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা ধর্ম সম্বন্ধীয় জগৎ-ব্যাখ্যার মধ্যে অবশ্যই একটা জায়গা করে নেবে। উভয় দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে কোন বিরোধ নেই। অংশের সঙ্গে সমগ্রের, কার্যকরণের সঙ্গে উদ্দেশ্যের যে সম্পর্ক তাদেরও সেই সম্পর্ক। বৈজ্ঞানিক ঘটনার মধ্যে কার্যকারণ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হলেই খুশী, কিন্তু এই জগতের বিভিন্ন উপাদানের মধ্যে যে নিরবচ্ছিন্নতা, তার ভিত্তি হিসেবে রয়েছে কোন আদি কারণ (final cause) বা লক্ষ্য যা নীতিরূপে বিচ্ছিন্ন কার্যকারণ তত্ত্বের মধ্য দিয়ে নিজেকে প্রকাশ করে। এই লক্ষ্যের তাত্ত্বিক আলোচনা দর্শনের অন্তর্ভুক্ত। এই ধারণাটির ব্যবহারিক

ধর্ম ও বিজ্ঞান পরস্পরের পরিপূরক

প্রয়োগের বিষয়টি ধর্মের পক্ষে কেন্দ্রীয় ও প্রয়োজনীয় বিষয়। ধর্মপ্রবণ মন একটা অন্তিম উদ্দেশ্যের ভিত্তিতে জগৎ এবং জীবনকে দেখে, এবং অভিজ্ঞতার সকল অংশকে পরমলক্ষ্য ও মূল্যের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত করে। প্রকৃতির একরূপতার মধ্য দিয়ে যে কার্যকারণ তত্ত্বের প্রকাশ ঘটে, একটা ঐশ্বরিক লক্ষ্যের উপায়স্বরূপ বলেই ধর্মপ্রবণ ব্যক্তি তাকে মূল্য দেয়। ধর্মপ্রবণ ব্যক্তির জগতের প্রতি আগ্রহ এই কারণে হয় যে, জগৎ নিয়মের রাজত্ব, জগৎ একটা পরম উদ্দেশ্যকে প্রকাশ করে। এই মতানুসারে বিজ্ঞান ও ধর্ম দুটি ভিন্ন স্তরের অভিজ্ঞতারূপে পরস্পরের সঙ্গে সংযুক্ত। ধর্মীয় অভিজ্ঞতার রাজ্য হল উন্নততর রাজ্য যেখানে বিজ্ঞানের সমস্যাগুলির ব্যবহারিক দিক থেকে সমাধান দেবার চেষ্টা করা হয়।

মায়েল এডওয়ার্ডস্ (*Maill Edwards*) উভয়ের সম্বন্ধ ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন যে, 'মানব জীবনে বিজ্ঞানের অবদান প্রচুর এবং নিজেকে বিপদাপন্ন করেই ধর্ম তাকে উপেক্ষা করতে পারে। এই নতুন বৈজ্ঞানিক জ্ঞানকে ধর্ম অঙ্গীভূত করে নিতে পারে বা তার পারা উচিত এবং প্রয়োজনমত তার ধর্মতত্ত্বকে পরিবর্তিত করে নেওয়া উচিত। অভিজ্ঞতা শেষ পর্যন্ত এক এবং অবিভাজ্য, এবং জ্ঞান হল এক আঙ্গিক সমগ্রতা; কাজেই বিজ্ঞান ও ধর্মের মিথস্ক্রিয়া ঘনিষ্ঠ হতে বাধ্য।"[1]

কিন্তু একটা কথা ভুললে চলবে না যে, উভয়ের সম্বন্ধ যতই ঘনিষ্ঠ হোক না কেন, একটাকে আর একটার মধ্যে মিশিয়ে দেওয়া চলবে না। ধর্ম অবশ্যই তার স্বাধীন দৃষ্টিভঙ্গি এবং অনুপম অন্তর্দৃষ্টি বজায় রাখবে।

(ii ধর্ম ও নীতি (Religi·n and Morality) :

নীতি বা নৈতিকতা হল জীবনের এমন একটা দিক যাকে ধর্মের সবচেয়ে কাছাকাছি বলে মনে হয়। সেই কারণেই ধারণা করা হয় যে, ধার্মিক লোক নিশ্চয়ই সৎ ও নীতিনিষ্ঠ হবে। তাই ধর্ম ও নীতির সম্বন্ধ শুধু যে ঘনিষ্ঠ তা নয়, অবিচ্ছেদ্য। ধর্ম ছাড়া নীতি এবং নীতি ছাড়া ধর্ম কখনও সম্ভব হয় না। রাইট বলেন, 'যেসব মূল্যকে কোন ধর্ম সংরক্ষিত করতে চায় সেইগুলি যেহেতু সমাজস্বীকৃত মূল্য, বলা যেতে পারে যে, ধর্মের সব সময়ই একটা নৈতিক উদ্দেশ্য বর্তমান।[2]

ধর্মের প্রকৃতি

1. Maill Edwards : The Philosophy of Religion ; page 176

2. "Since all values which any religion seeks to conserve are socially recognised values, it may be said that religion always has a moral purpose."

—W. K. Wright : A Student's Philosophy of Religion ; page 54

কিন্তু ধর্ম বলতে কি বুঝি? এখানে ধর্ম বলতে আমরা কোন এক বিশেষ ধর্মকে, যেমন হিন্দু বা ইসলাম ধর্ম বুঝি না। ধর্ম বলতে আমরা বুঝি কোন অতিপ্রাকৃত সত্তায় মানুষের বিশ্বাস, যে বিশ্বাস তার জীবনের সকল মূল অনুভূতিকে এবং ক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রিত করে। ধর্মবোধের মধ্যে জ্ঞান, অনুভূতি এবং ইচ্ছা—এই তিন প্রকার উপাদানই পাওয়া যায়।

অতি আদিম সমাজে ধর্ম ও নীতির মধ্যে পার্থক্য করা হত না। কারণ, ঐ স্তরে জীবন ছিল স্বাতন্ত্র্যবিহীন ও একরূপবিশিষ্ট। জীবনের ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ে মানুষের আগ্রহ তখনও তেমন সুস্পষ্ট রূপ গ্রহণ করেনি। কিন্তু যখন পরবর্তীকালে ধর্ম ও নীতির মধ্যে পার্থক্য করা হল তখনও তাদের মধ্যে সম্বন্ধ ছিল খুবই ঘনিষ্ঠ। নিকট সম্পর্কে সম্পর্কিত হয়ে তারা পাশাপাশি বিরাজ করছিল, পারস্পরিক সুবিধার পরিপ্রেক্ষিতে পরস্পর পরস্পরের উপর ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া করছিল, পরস্পরের উপাদানকে সমৃদ্ধতর করে তুলছিল। মানুষের আধ্যাত্মিক কর্ম প্রচেষ্টায় উভয়ে ছিল সমান অংশীদার। তবু মর্যাদার দিক থেকে উভয়ের আসন যে সমান ছিল তা উভয়ে মনে করত না। ধর্ম নীতির তুলনায় নিজেকে প্রামাণ্য ও মৌলিক বলে দাবী করত। অপরদিকে নৈতিক চেতনা দাবী করত যে নৈতিকতার উৎস নীতির মধ্যেই নিহিত, কোন অলৌকিক শাসন বা নিয়ন্ত্রণ (sanction) থেকে তার উদ্ভব নয়। নীতির ব্যাপারে নীতিবিদ পুরোহিতের হস্তক্ষেপের প্রতিরোধ করত এবং নীতি ধর্মীয় বিশ্বাস ও মতবাদকে অনাবশ্যক মনে করে অগ্রাহ্য করত।

ধর্ম ও নীতির নিকট সম্পর্ক

উভয়েই অপরের কর্তৃত্ব অপছন্দ করত

নীতি ধর্মের নিয়ন্ত্রণকে অগ্রাহ্য করে নিরপেক্ষতার, অর্থাৎ স্ব-নির্ভরতার ও স্বাধীনতার দাবী করতে লাগল। মানুষ বিশ্বাস করতে লাগল যে, মানুষ ধর্মপ্রবণ না হয়েও নীতিনিষ্ঠ হতে পারে। ঊনবিংশ শতাব্দীতে কোঁতে, জে. এস. মিল, স্পেন্সার প্রভৃতি চিন্তাবিদগণ ধর্মনিরপেক্ষ নীতির প্রতিষ্ঠা করলেন। তারপর নীতিবিদরা এমনও দাবী করতে লাগল যে, ধর্মের সব উৎকর্ষই নীতির অন্তর্ভুক্ত। 'ধর্ম হল আবেগের ছোঁয়া লাগা নীতি'। কাজেই ধর্মের করণীয় কিছু নেই। কিন্তু এইভাবে ধর্মকে নীতির অঙ্গীভূত করা সম্ভব নয়। উভয়েই সম্বন্ধযুক্ত, কিন্তু অভিন্ন নয়। কেউ কেউ এই নৈতিকতার দৃষ্টিভঙ্গির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাল। তাঁদের মতে ধর্মের একটা অতীন্দ্রিয় দিক আছে, যা হল ঈশ্বরের সাক্ষাৎ প্রতীতি। ধর্মের এই দিকটিকে অগ্রাহ্য করা চলে না এবং নীতির মধ্যে এর সন্ধান পাওয়া যায় না।

অধিকাংশ ব্যক্তির জীবনে নীতি এবং ধর্ম এমন ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত যে, এদের পৃথক করে দেখা চলে না। কিন্তু তাই বলে নীতি ও ধর্মকে এক ও অভিন্নরূপে কল্পনা করাও যুক্তিযুক্ত নয়। এমন অনেক লোক আমরা দেখি যাঁরা ঈশ্বরে বিশ্বাস না করেও তাঁদের দৈনন্দিন কর্তব্য যথারীতি সম্পাদন করেন। অপরদিকে আবার এমন অনেক লোকের দেখা পাওয়া যায় যাঁরা নীতির প্রতি কোন মর্যাদা না দেখিয়েই যন্ত্রবৎ ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান পালন করে চলেছেন। কিন্তু গভীরভাবে চিন্তা করলে দেখা যাবে নীতি ও ধর্ম সকল সময়ই এক সঙ্গে চলে। নিষ্ঠা সহকারে যে লোক আচার-অনুষ্ঠান পালন করে তার নীতিজ্ঞান বা বিবেক শেষ পর্যন্ত জাগবেই এবং তার আচার-আচরণে যদি কোন নীতিবিরুদ্ধ উপাদান থাকে তবে তাকে দূর করতে সে নিশ্চয়ই সচেষ্ট হবে। পক্ষান্তরে যাঁরা নীতিনিষ্ঠ অথচ ঈশ্বর-বিশ্বাসী নন তাঁরা প্রকৃতপক্ষে সমাজ-স্বীকৃত ঈশ্বর-কল্পনায় বিশ্বাস রাখেন না। কিন্তু নীতির সঙ্গে যে জগৎ-সত্তার এক গভীর সম্পর্ক আছে তা তাঁরা স্বীকার করেন।

নীতি ও ধর্ম এক ও অভিন্ন নয়, যদিও এরা পরস্পরকে প্রভাবিত করে

নীতি ও ধর্মের পারস্পরিক সম্পর্ককে কেন্দ্র করে নীতি আগে, না ধর্ম আগে —এ নিয়ে একটা সমস্যা দেখা দিয়েছে। এই বিষয়ে আমরা প্রধানতঃ তিনটি মত পাই, যথা—(ক) ধর্ম থেকেই নীতির উৎপত্তি। দেকার্ত, লক, পেলে (*Paley*) প্রভৃতির মতে ধর্ম থেকেই নীতির উদ্ভব। নীতি ও নৈতিক আদর্শ ঈশ্বরের অবদান। ঈশ্বর নিজের ইচ্ছায় নীতি সৃষ্টি করেছেন এবং মানুষের জন্য তিনি নানাপ্রকার বিধি-নিষেধ প্রবর্তন করেছেন। ঈশ্বরের বিধি-নিষেধ মেনে চলাই মানুষের আসল কর্তব্য। ঈশ্বরের বিধান নৈতিক জীবনের শ্রেষ্ঠ বিধান। কাজেই প্রথমে ঈশ্বর এবং ঈশ্বরের বিধান, তারপর নীতি, অর্থাৎ ধর্ম থেকেই নীতির উৎপত্তি।

তিনটি অভিমত

ধর্ম থেকে নীতির উদ্ভব

এই মত গ্রহণ করা যায় না, কারণ এই মতবাদ অনুযায়ী ঈশ্বরের কোন নিজস্ব নৈতিক চরিত্র নেই। যদি ভাল ও মন্দ ঈশ্বরের খেয়াল-খুশীর উপর নির্ভর করে তবে তিনি ইচ্ছা করলে ভালকে মন্দ এবং মন্দকে ভাল বলে বিধান দিতে পারেন। কিন্তু মানুষ বিশ্বাস করে, ঈশ্বর সর্বশক্তিমান হলেও তিনি ভালকে মন্দ বা মন্দকে ভাল করতে পারেন না। ঈশ্বর নৈতিক আদর্শের পূর্ণ প্রকাশ। সেইহেতু যা ভাল তা ঈশ্বরের স্বভাবের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ, যা মন্দ তা তাঁর স্বভাবের বিরোধী। দ্বিতীয়তঃ, এই মতবাদ অনুসারে ঈশ্বর তাঁর বিধি অনুসরণ করার জন্য মানুষকে পুরস্কৃত করেন আর তাঁর বিধিকে লঙ্ঘন করার জন্য তিনি মানুষকে

সমালোচনা

শাস্তি দেন। কিন্তু শাস্তির ভয়ে বা পুরস্কারের প্রত্যাশায় যদি কোন কাজ করা যায় তবে সেই কাজের কোন নৈতিক মূল্য থাকে না।

(খ) নীতি আগে, ধর্ম পরে এবং নীতি থেকেই আমরা ধর্ম লাভ করি। কাণ্ট, মার্টিন্যু প্রভৃতি নীতিবিজ্ঞানীরা এই মতবাদের সমর্থক। কাণ্টের মতে কোন নৈতিক শক্তি এই বিশ্বের পিছনে কাজ করছে যা সদাচারণের সঙ্গে সুখের এবং অসাদাচারণের সঙ্গে দুঃখের সংযোগ সাধন করে এবং এই জীবনে না হোক পরবর্তী জীবনে সাধু ব্যক্তিকে পুরস্কৃত করে এবং অসাধু ব্যক্তিকে শাস্তি দান করে।

নীতি থেকেই ধর্মের উদ্ভব

এই নৈতিক শক্তি হল সর্বশক্তিমান সর্বজ্ঞ ঈশ্বর, সুতরাং নীতিই আমাদের ঈশ্বরের ধারণা এনে দেয় এবং সেইজন্য নীতি থেকে ধর্মের উৎপত্তি। মার্টিন্যু-ও মনে করেন নীতি থেকেই ধর্মের উৎপত্তি। নৈতিক বাধ্যতাবোধ থেকেই ঈশ্বরের ধারণা পাওয়া যায়। যা নীতিসম্মত বা ন্যায়ানুগত তা আমরা মানতে বাধ্য। কিন্তু এই বাধ্যতাবোধ একমাত্র তাঁর কাছেই হতে পারে যিনি আমাদের সকল উদ্দেশ্য ও অভিপ্রায় সম্পর্কে অবহিত। সুতরাং এই বাধ্যতাবোধ ঈশ্বরের কাছে। কাজেই নৈতিক বাধ্যতাবোধ এবং দায়িত্ববোধ থেকেই ঈশ্বরের ধারণার উৎপত্তি। তাছাড়া নৈতিক আদর্শ বাস্তব হওয়া দরকার, নতুবা এই আদর্শের প্রতি মানুষ শ্রদ্ধাভাজন হতে পারে না। কাজেই নৈতিক আদর্শ কোন সত্তার মধ্যে বাস্তব রূপ লাভ করেছে এবং তিনিই ঈশ্বর। (গ) ধর্ম ও নীতি পরস্পর পৃথক এবং স্বতন্ত্রভাবে উদ্ভূত হয়েছে। ধর্মের উদ্ভব হয়েছে কোন পরমসত্তার উপর নির্ভরতাবোধ থেকে। কিন্তু নীতির উদ্ভব হয়েছে অন্যভাবে। মানুষের বিবেক তার সামনে একটা নৈতিক আদর্শ তুলে ধরে এবং নিজের নৈতিক উন্নতির জন্য মানুষ এই নৈতিক আদর্শ অনুসরণ করার সঙ্কল্প করে। মানুষের সভ্যতার ক্রমবিকাশের এক উচ্চস্তরে নীতির উদ্ভব।

ধর্ম ও নীতি স্বতন্ত্রভাবে উদ্ভূত

এই মতবাদই সন্তোষজনক বলে গণ্য। ধর্ম ও নীতির মধ্যে পার্থক্য আছে। যদিও এই পার্থক্য থেকে এই সিদ্ধান্ত করা যুক্তিসঙ্গত হবে না যে, উভয়ের মধ্যে কোন বিরোধিতা বর্তমান।

ধর্ম ও নীতির মধ্যে কয়েক বিষয়ে মিল আছে। ধর্ম আত্মার অমরত্বে স্বীকার করে নেয়। নৈতিক আদর্শ হল জীবনের অন্যতম পরম আদর্শ যাকে একটি মাত্র ক্ষুদ্র সীমিত জীবনে লাভ করা সম্ভব নয়। জন্মজন্মান্তরের প্রচেষ্টার দ্বারা মানুষ ধীরে ধীরে এই নৈতিক আদর্শের নিকটে যায়। এইজন্য আত্মার অমরত্বকে স্বীকার করে না নিলে,

মানুষের নৈতিক প্রচেষ্টার কোন সার্থকতা থাকে না। ধর্ম ও নীতির মধ্যে আরও এক বিষয়ে মিল আছে যে, উভয়েরই সম্পর্ক পরমকল্যাণ (Absolute good)-কে নিয়ে।

কিন্তু উভয়ের পার্থক্য ব্যক্ত করতে গিয়ে বলা যেতে পারে যে, ধর্ম আরও ব্যাপক যেহেতু কল্যাণ বা শিব ছাড়াও সত্য ও সুন্দর—এই মূল্যগুলিও ধর্মের অন্তর্ভুক্ত। আবার শিব ও কল্যাণের সঙ্গে উভয়ের সম্পর্ক থাকলেও, তার প্রতি উভয়ের দৃষ্টিভঙ্গি পৃথক। ধর্মীয় চেতনার কাছে শিব বা কল্যাণ হল এমন কিছু যা বর্তমান অভিজ্ঞতার মুহূর্তে প্রদত্ত, এমন কিছু যাকে বর্তমানে উপলব্ধি করা হয়েছে। কিন্তু নৈতিক চেতনার কাছে পরমকল্যাণ বর্তমানে প্রদত্ত কোন কিছু নয়, বরং এমন কিছু যাকে অনেক পরিশ্রম ও প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে লাভ করতে হবে। মানুষের প্রচেষ্টা ও সংঘাতের জগতেই নীতির অস্তিত্ব, এর ক্ষেত্র হল সংগ্রাম-ক্ষেত্র। কিন্তু ধর্ম হল জয় এবং শান্তি (victory and peace)।

ধর্ম ও নীতির মধ্যে অন্য পার্থক্য হল ঈশ্বরকেন্দ্রিক; নীতি মানবকেন্দ্রিক। অলৌকিকতার সঙ্গে সম্পর্কবিহীন শুদ্ধ নৈতিকতার কথা অনেকে বলে থাকেন। কিন্তু অলৌকিকতার সঙ্গে পরিপূর্ণভাবে সম্পর্কশূন্য হলে ধর্ম তার নিজস্ব প্রকৃতিকেই বর্জন করবে। নীতি হল অসীমের দিকে অগ্রগতি আর ধর্ম হল অসীমের মধ্যে থেকে অগ্রগতি। নৈতিকতা অনেকটা আবেগমুক্ত। ধর্ম হল আবেগময় অভিজ্ঞতা। সেই কারণেই মেথু আরনল্ড ধর্মের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন, 'ধর্ম হল আবেগের ছোঁয়া লাগা নীতি'। ইচ্ছার স্বাধীনতার চেতনা ছাড়া নীতি সম্ভব নয়, অপরপক্ষে ধর্মের ক্ষেত্র হল আবশ্যিকতার বা অনিবার্যতার ক্ষেত্র (sphere of necessity)।

নীটসে (*Nietzsche*) বলেন, 'নীতির সঙ্গে ধর্মের কোন সম্পর্ক নেই।' অনেক পাশ্চাত্ত্য নীতিবিদ ধর্মনিরপেক্ষ নীতির প্রতিষ্ঠায় সচেষ্ট হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ এমন অভিমতও ব্যক্ত করেছেন যে, কল্যাণের সঙ্গে ঈশ্বরকে একত্র যুক্ত করে ধর্ম নীতিকে বাধা দিয়েছে এবং মানুষের সদাচারণকে ঈশ্বরের আদর্শ-নির্ভর করার জন্য সচেষ্ট হয়েছে।

নীটসের মন্তব্য

রাইট বলেন, "সব ধর্ম সম্বন্ধীয় মূল্য (religious values) এই অর্থে নৈতিক যে তারা সমাজ-স্বীকৃত। কিন্তু সব নৈতিক মূল্য (moral values) ধর্ম সম্বন্ধীয় মূল্য নয়।"

ধর্ম ও নীতির মধ্যে যত পার্থক্যই থাকুক না কেন, উভয়ের গভীরতর ঐক্যের দিকটিকে উপেক্ষা করা যুক্তিযুক্ত নয়। যে মানুষ ঐশ্বরিক লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে

চলেছে সেই মানুষের ক্রমবিকাশমান আধ্যাত্মিক জীবনের দুটি ভিন্ন স্তর হল ধর্ম ও নীতি। নীতি ও ধর্ম হল যথাক্রমে মানুষের অভিজ্ঞতার নিম্ন ও উচ্চ স্তর। নিম্ন স্তরই উচ্চ স্তরের দিকে মানুষকে এগিয়ে নিয়ে যায় এবং যখন মানুষ সচেতনভাবে এই উচ্চ স্তরে উপনীত হয় তখনই নিম্নস্তরের পূর্ণ তাৎপর্যকে সে উপলব্ধি করতে পারে।

উভয়ের মধ্যে গভীরতর ঐক্য

ধর্ম ও নীতির মধ্যে পার্থক্য করা হয়েছে সত্য, কিন্তু বাস্তবে তাদের পৃথক করা কঠিন। বাস্তব অভিজ্ঞতায় তারা পৃথক হয়ে অবস্থান করে না, বরং একে অপরের সঙ্গে মিশে যায়। যার ফলে আমরা পাই নৈতিক ধর্ম (ethical religion)।

নীতি ধর্মের পক্ষে এবং ধর্ম নীতির পক্ষে প্রয়োজনীয়। নীতি অবশ্যই ধর্মের পক্ষে প্রয়োজনীয়। ধর্মীয় জীবনে নৈতিক চেতনার অবদানের অসীম মূল্য রয়েছে। যাঁরা ধর্মপ্রবর্তক তাঁরা ধর্মীয় জীবনে ঈশ্বরের গুণ হিসেবে সাধুতা ও ভালবাসা, এই নৈতিক গুণগুলির উন্মেষের কথা বলেছেন। নীতি ধর্মকে সংশোধিত ও উন্নত করে। নীতি ভিন্ন ধর্ম কেবলমাত্র লৌকিকতায় বিশ্বাস এবং কুসংস্কার ছাড়া কিছুই নয়। ধার্মিক ব্যক্তি স্বভাবতঃই বিবেকবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি যিনি নীতিসম্মতভাবে তাঁর কর্তব্য সম্পাদন করেন এবং নৈতিক আদর্শকে অনুসরণ করে জীবন-যাপনের সঙ্কল্প করেন।

উভয়ে পরস্পরের পক্ষে প্রয়োজনীয়

আবার ধর্মও নীতির পক্ষে প্রয়োজনীয়। ধর্ম নীতির উপরে প্রভাব বিস্তার করে তাকে অনুপ্রাণিত করে, নীতির শেষ পরিণতি ধর্মে। ঈশ্বর যিনি বিশ্বের পরিচালক বা বিশ্বনিয়ন্ত্রক তিনি নৈতিক আদর্শের পূর্ণ প্রতীক এবং ধর্মের মূল কথা এই ঈশ্বরের সঙ্গে একাত্মতা লাভ করা। নীতি স্বনির্ভর নয়। নীতি আধ্যাত্মিক জীবনের একটি স্তর, যেটি নিজেকে অতিক্রম করে অপর কিছুকে নির্দেশ করে।

নীতি এমন অনেক সমস্যার সৃষ্টি করে যার সমাধান ধর্মের মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায়। নীতি যে নৈতিক আদর্শের কথা বলে, তা কেবলমাত্র কল্পনা নয়। নৈতিক আদর্শের বাস্তবতায় মানুষ বিশ্বাস করে বলেই এই আদর্শ মানুষকে প্রভাবিত করে এবং মানুষ এও বিশ্বাস করে যে এই আদর্শের বাস্তব এবং পূর্ণ রূপ হল ঈশ্বর বা জগৎ সত্তা। অর্থাৎ ঈশ্বরের মধ্যেই নৈতিক আদর্শ পূর্ণতা লাভ করে বাস্তব রূপ গ্রহণ করেছে। সুতরাং নীতি ও ধর্ম গভীর সম্পর্কে সম্পর্কযুক্ত। নৈতিক নিয়ম অনুসরণ করা বাধ্যতামূলক। একমাত্র ঈশ্বরে এই বাধ্যতাভাবের মূল যদি নিহিত না থাকে তাহলে নৈতিক নিয়ম হয়ে ওঠে খেয়ালখুশীর ব্যাপার। ধর্মই নৈতিক প্রচেষ্টায় মূল্য আরোপ করে এবং আমাদের সেই পরম

ধর্মে নীতির সমস্যার সমাধান

উৎসের সংস্পর্শে নিয়ে আসে যা নৈতিক শক্তির ভাণ্ডার। ধর্ম কখনও নৈতিকতার অঙ্গীভূত হয়ে জীবনের একটি স্বতন্ত্র ক্রিয়া রূপে অদৃশ্য হয়ে যেতে পারে না।

যদিও নীতি ও ধর্মের উৎপত্তি পৃথক তবু উভয়ে পরস্পরের উপর ক্রিয়া করে এবং প্রভাব বিস্তার করে। পরস্পরের এই ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়ার ফলে নীতি ও ধর্ম উভয়ই হয় উন্নত। মানুষের ধর্মভাব যতই বাড়তে থাকে তার সৎ আচরণ করার স্বাভাবিক প্রবণতাও ততই বাড়তে থাকে। এই কারণে ধার্মিক ব্যক্তিমাত্রই স্বভাবতঃ সজ্জন। মানুষের ধর্মজ্ঞান বা ঈশ্বরে বিশ্বাস তাকে স্বভাবতঃই ন্যায় পথে চলার প্রেরণা দেয়। ঈশ্বরের বিধান অনুযায়ী কর্তব্য সম্পাদন করাই সৎ চরিত্রের বৈশিষ্ট্য। সুতরাং মানুষের ধর্মজ্ঞান যতই বাড়তে থাকে নীতিজ্ঞান ততই উন্নত হয়। আবার নীতিজ্ঞান যতই বৃদ্ধি পায়, ধর্মভাব ততই গভীর ও নিবিড় হয়ে ওঠে। ধর্মভাব সকল রকম কুসংস্কার থেকে মুক্ত হয়ে পবিত্র ও মহান হয়ে ওঠে।

উভয় পরস্পরের উপর ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া করে

[1]রাইট বলেন, "সভ্যতা ও ধর্মের যতই অগ্রগতি সূচিত হতে থাকে, যে সব মূল্যকে ধর্ম সংরক্ষণের জন্য সচেষ্ট হয়, সেই সময়কার পরিচিত সব চেয়ে উন্নত নৈতিক মূল্যের সঙ্গে সদৃশ হওয়ার প্রবণতা তার বাড়তে থাকে।"

এই প্রসঙ্গে কেয়ার্ড[2]-এর নৈতিক জীবনের বিশ্লেষণ এবং ধর্মীয় জীবনের সঙ্গে তার সম্বন্ধের ব্যাখ্যা আলোচনা করা যেতে পারে।

কেয়ার্ড নীতি বা নৈতিকতার বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেছেন যে, এ হল মানুষের উচ্চতর এবং নিম্নতর প্রকৃতির মধ্যে যে বিরোধ বর্তমান তার সমাধান; উচ্চতর প্রকৃতিকে প্রকাশ করার মাধ্যম হিসেবে নিম্নতর প্রকৃতির রূপান্তর সাধনের মধ্য দিয়ে এটি সম্পন্ন হয়। কেয়ার্ড বলেন, মানুষের দুটি প্রকৃতির মধ্যে একটা বিরোধ আছে—একটা হল উচ্চতর প্রকৃতি যেটি বৌদ্ধিক ও সার্বিক এবং আর একটি হল বিশেষ, সীমিত ও বর্তমানের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। মানুষের উচ্চতর এবং নিম্নতর প্রকৃতির মধ্যে যে বিরোধ তার আংশিক সমাধান হল নীতি। নৈতিক জীবনের মূল বিষয় হল ব্যক্তিকেন্দ্রিক, আত্মস্বার্থসমন্বিত ক্ষুদ্র সত্তাকে বিসর্জন দিয়ে আমাদের উর্ধ্বে যে সদা ব্যাপক আধ্যাত্মিক ক্ষেত্র রয়েছে তার সঙ্গে আমাদের সত্তার একাত্মতা লাভ

কেয়ার্ডের অভিমত

মানুষের দুই প্রকৃতির মধ্যে বিরোধ

1. "The values which religion endeavours to conserve increasingly tend to coincide with the highest moral values that are known at the time."

2. J. Caird : An Introduction to the Philosophy of Religion, Chapter Two (Relation of Morality and Religion) ; Pages 247-289.

করা। আমরা শিশু, পিতামাতা, ভাই বা বোন হিসেবে আমাদের কর্তব্যের কথা বলি, কিন্তু যার উপর এই সব কর্তব্যের ভিত্তি তাহল এই যে, এই সব সম্পর্কের মাধ্যমে আমাদের যথার্থ প্রকৃতি আত্মপ্রকাশ করে যা নিজেকে উপলব্ধি করে। নৈতিক জীবনে আমরা প্রাকৃতিক (natural) এবং আধ্যাত্মিক (spiritual)-এর মধ্যে যে বিরোধ তার সমাধান দেখতে পাই, কিন্তু নীতি যে সমাধান দেয় তা এই বিরোধের আংশিক সমাধান। এই সমাধান আংশিক ও অসম্পূর্ণ এই কারণে যে, যদিও লক্ষ্য হল অসীম আদর্শের উপলব্ধি (realisation of an infinite ideal), নীতি বা নৈতিকতা হল এই আদর্শকে লাভ করার অবিরাম প্রচেষ্টা। কাজেই অসীমের বদলে নীতি আমাদের দেয় সসীমের অবিরাম অস্বীকৃতি (endless negation of the finite)। কাজেই যখন কোন ব্যক্তি নিজেকে গভীর অনুরাগের সঙ্গে পরিবার বা রাষ্ট্রের জীবনের সঙ্গে একাত্ম করতে সচেষ্ট হয়, তখন সে অসীমের এবং পরমসত্তার যে জীবন তার থেকে অনেক দূরে সরে যায়। মনুষ্যজাতির মিলিত জীবনকে অতিক্রম করেও একটি বৃহত্তর জীবনের অস্তিত্ব আছে, একটা অসীম আদর্শের অস্তিত্ব আছে যাকে কোন সমাজ, কোন ব্যক্তি, যে পরিবার, সমাজ বা রাষ্ট্রের কাছে পরিপূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ করেছে, কখনও লাভ করতে পারে না—নৈতিক জীবনে সেই আদর্শকে লাভ করতে গেলে সেটি সবসময় তার হাতের নাগালের বাইরে চলে যাবে।

তাহলে আদর্শ ও বাস্তবের বিরোধিতার কি কোন সমাধান নেই? সমাধান আছে, তবে সেই সমাধানের জন্য আমাদের নীতিকে ছাড়িয়ে ধর্মের কাছে যেতে হবে।

ধর্মের আদর্শ ও বাস্তবের বিরোধের সমাধান

ধর্মের স্বরূপ হল উচ্চাকাঙ্ক্ষাকে সিদ্ধ করা, প্রত্যাশাকে বাস্তব করে তোলা। ধর্মকে যদি মানুষের দিক থেকে দেখি এভাবে যে, ধর্ম হল ঈশ্বরের কাছে আত্মার সমর্পণ বা ঈশ্বরের দিক থেকে দেখি এভাবে যে, ধর্ম হল আত্মার মধ্যে ঈশ্বরের জীবন (life of God in the soul); যে-কোন দিক থেকেই হোক না কেন, ধর্মের সারবস্তু হল অসীম কোন আধ্যাত্মিক সম্পূর্ণতার সুদূরের স্বপ্ন না হয়ে উপলব্ধ বর্তমানের বিষয় হয়ে দাঁড়ায়।

কিন্তু ধর্মের জীবন নীতির মতন কি প্রগতিমূলক (progressive) নয়? এর উত্তর হল, ধর্ম নীতির মতন অগ্রগতি সূচনা করলেও, নীতি হল অসীমের দিকে অগ্রগতি। ধর্ম হল অসীমের মধ্যে অগ্রগতি।[1] কাজেই নীতি হল যে-অসীম সব সময়ই

1. "The answer is that while religion, like morality implies progress, unlike morality which is only progress towards the infinite, religion implies progress within the infinite."

—J. Caird: An Introduction to the Philosophy of Religion; Page 296

নাগালের বাইরে চলে যাচ্ছে তার অন্বেষণ। ধর্ম হল আমাদের মধ্যে যে অসীম রয়েছে সেই সম্পর্কে গভীর চেতনা। যাকে আমরা পূজা বা উপাসনা বলি তা হল জীবাত্মার নিজের মধ্যে অসীমের উপস্থিতির উপলব্ধি। উপাসনা হল সেই গভীর চেতনা যে, অসীম আমাদের মধ্যেই রয়েছে এবং আমাদের বাইরে নেই। এটি হল আমাদের মধ্যে সদা বর্তমান এক সত্তা এবং কোন দূরবর্তী লক্ষ্য নয় যাকে আমরা এখনও পাবার প্রত্যাশায় আছি।

কাজেই মায়েল এডওয়ার্ডস্-এর মন্তব্যের সঙ্গে একমত হয়ে আমরা বলতে পারি যে, ধর্ম এবং নৈতিকতা জীবনের আধ্যাত্মিক অভিযানে সহযোগী এবং ধর্ম সব সময়ই সহযোগী হয়ে থাকবে।

মায়েল এডওয়ার্ড্স্-এর মন্তব্য

(iii) ধর্ম এবং আর্ট (Religion and Art):

ধর্ম এবং আর্টের সম্বন্ধ নিরূপণ করতে হলে আমাদের প্রথম বুঝে নিতে হবে ধর্ম ও আর্টের স্বরূপ কী? ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতে ইন্দ্রিয়াতীতের প্রতিষ্ঠা করে আর্ট। তাই হেগেল বলেন, 'Art is the sensuous representation of the absolute'। ইন্দ্রিয়াতীত পরমসত্তাকে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য রূপের মাধ্যমে প্রকাশ করাই হল আর্টের মূল কথা। আর্টের লক্ষ্য সুন্দরকে রূপায়িত করা, সত্যকে প্রকাশ করা। আদর্শগত সৌন্দর্যের জন্য মানুষের যে অনুসন্ধান তারই মহান প্রকাশ হল আর্ট (Art)। ইন্দ্রিয়গত রূপ, বর্ণ এবং শব্দের মধ্য দিয়ে সৌন্দর্যকে মূর্ত করে তোলা হল আর্টের কাজ। যা ইন্দ্রিয়গত তার সঙ্গে আধ্যাত্মিকতার মিলনের ফলে আর্টের উদ্ভব। হেগেল-এর ভাষায়, "সুন্দর হল বিশেষ করে আধ্যাত্মিক, যা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়ের মধ্য দিয়ে নিজেকে প্রকাশ করে, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য মূর্ত অস্তিত্বের বা সত্তার মধ্য দিয়ে নিজে উপস্থাপিত করে, কিন্তু এমনভাবে যে, ঐ অস্তিত্বশীল সত্তা সম্পূর্ণভাবে এবং সমগ্রভাবে আধ্যাত্মিকতার দ্বারা পরিব্যাপ্ত হয়; যার ফলে যা ইন্দ্রিয়গত ত স্বনির্ভর নয়। বরং যা আধ্যাত্মিক কেবলমাত্র তারই মধ্য দিয়ে এবং তারই মধ্যে থেকে অর্থপূর্ণ হয় এবং নিজেকে নয়, আধ্যাত্মিককেই প্রকাশ করে।"[1] ধর্ম বলতে আমরা বুঝি কোন অতিপ্রাকৃত সত্তায় মানুষের বিশ্বাস—যে বিশ্বাস তার জীবনের সব মূল অনুভূতি এবং ক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রিত করে।' ধর্ম হল মানুষের জীবনের শ্রেষ্ঠ মূল্যগুলির (values) স্বীকৃতি অর্থাৎ সত্য, শিব ও সুন্দরের উপলব্ধি। সেই

আর্টের স্বরূপ

হেগেলের মন্তব্য

ধর্মের স্বরূপ

1. Hegel: Philosophy of Religion, Vol. 11; Page 8

কারণেই রাধাকৃষ্ণণ বলেছেন, 'সুন্দর, শিব ও সত্যের জন্য মনের যে অন্বেষণ তাই হল ঈশ্বরান্বেষণ'।

আর্টের কাজ যদি হয় সুন্দরকে প্রকাশ করা এবং আধ্যাত্মিকতাই যদি হয় সৌন্দর্যের আত্মাস্বরূপ, তাহলে আর্ট এবং ধর্মের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কই আমরা প্রত্যাশা করব। কারণ যা জাগতিক তার মধ্যে এবং তার আড়ালে যে আধ্যাত্মিক পরমসত্তার অস্তিত্ব ধর্মের কাজ তাকে নিয়ে।

রাইট বলেন, 'আর্ট ও ধর্মের মধ্যে পার্থক্য এত বেশী যে একটিকে আর একটির সঙ্গে গুলিয়ে ফেলার প্রশ্ন ওঠে না। উৎসর্গ এবং প্রার্থনার মধ্য দিয়ে যে ধর্মীয় প্রচেষ্টার প্রকাশ ঘটে, সেটা কখনই শুধু মাত্র লক্ষ্য হয়ে উঠতে পারে না, ঐটি সম্পাদিত হয় ভবিষ্যৎ আধ্যাত্মিক এবং জাগতিক লাভের জন্য। সৌন্দর্যের মনোভাব অপরপক্ষে সব সময়ই নিজেই নিজের লক্ষ্য (end in itself)। সৌন্দর্যের প্রতি প্রকৃত অনুরাগ সৌন্দর্যের জন্যই, অন্য অভীষ্ট সিদ্ধ করার জন্য নয়। এই ধরনের অনুরাগ হল অপরোক্ষ, ধর্মের অনুরাগ হল পরোক্ষ। ধর্ম আর্টের প্রয়োগ করলেও তাকে কোন লক্ষ্য সিদ্ধ করার উপায় রূপে প্রয়োগ করবে।'

অতি প্রাচীনকাল থেকেই আর্টের ও ধর্মের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক লক্ষ্য করা যায়। ইতিহাসও প্রমাণ করে যে মহৎ আর্ট সব সময়ই ধর্মের কাছ থেকে অনুপ্রেরণা লাভ করেছে। ইতিহাস থেকে আরও জানা যায় যে আর্ট প্রথম থেকেই ধর্মের সেবায় নিজেকে নিযুক্ত করে। চিত্রাঙ্কন, স্থাপত্যবিদ্যা, সঙ্গীত, ভাস্কর্য প্রভৃতির মধ্য দিয়ে মানুষ ঈশ্বরের ধারণা এবং তাঁর প্রতি তাঁর পূজা ও শ্রদ্ধার ভাবকে ব্যক্ত করেছে।

আদিম নরনারীর সংস্কৃতিতে আর্ট ও ধর্মের সম্পর্ক বড় একটা দেখা যায় না। অনেক সময় আদিম নরনারী যে পশু শিকার করত তার মূর্তি সেই পশুর শিঙের উপর খোদাই করত বা যে গুহায় সে বসবাস করত তার দেয়ালে তার চিত্র অঙ্কন করত। কিন্তু এই সব প্রচেষ্টা ছিল প্রধানতঃ অনুকরণমূলক এবং তাদের ধর্মীয় তাৎপর্য বড় একটা ছিল না। কেবলমাত্র সভ্যতার শুরুতে আমরা ধর্মের কাজে আর্টকে প্রয়োগ করার সচেতন প্রয়াস লক্ষ্য করি। মৃন্ময় শিল্পের ব্যবহারের মধ্য দিয়েই ব্যক্তির দেবতাকে মর্যাদা দেবার প্রথম প্রচেষ্টা লক্ষিত হয়। দেবতার বাসস্থানের জন্য মন্দির নির্মাণ এবং তাদের উপাসনা করার জন্য মন্দিরগুলিকে সজ্জিত করা, দেবতাদের প্রকৃতি অনুযায়ী তাদের মূর্তি খোদাই করা, এই সব সূক্ষ্ম শিল্পচর্চার মধ্য দিয়ে মানুষ ধর্মের উদ্দেশ্য সিদ্ধ করার কাজে আর্টকে প্রয়োগ করেছিল।

আদিম সংস্কৃতিতে আর্ট ও ধর্মের সংযোগের অভাব

সভ্যতার শুরুতে আর্ট ও ধর্মের মধ্যে এই যে উল্লেখযোগ্য সংযোগ লক্ষ্য করা যায় তা কখনও আকস্মিক হতে পারে না। এই সংযোগ উভয়ের মধ্যে এক অন্তর্নিহিত মিল ও ঐক্য নির্দেশ করে, যার ফলে একটি অপরটির সঠিক প্রকাশের পক্ষে সহায়ক হয়। আর্ট পূজা ও উপাসনাকে ইঙ্গিতপূর্ণ ও বৈশিষ্ট্যসূচক করে তোলে। আর ধর্ম আর্টের ক্ষেত্রে একটি পবিত্র ও মহান উদ্দেশ্যের আরোপ করে।

আর্ট ও ধর্মের সংযোগ আকস্মিক নয়

অবশ্য ধর্ম ও আর্টের পদ্ধতি ও লক্ষ্যের মধ্যে এমন একটি মিল আছে, জগৎ ও জীবনের প্রতি তাদের মনোভাবের মধ্যে এমন এক সাদৃশ্য আছে যে এটা খুব স্বাভাবিক মনে হয় যে, তারা পরস্পরের সহায়ক হবে। আর্ট ও ধর্ম উভয়েই কল্পনার মধ্য দিয়ে ক্রিয়া করে এবং মানুষের অভিজ্ঞতার মধ্যে এমন এক বৈশিষ্ট্যের সূচনা করে তাকে প্রাণবন্ত করে তোলে যা বর্তমানের মুহূর্তকে অতিক্রম করে যায়। অভিভাবিত করার (suggest) অনন্ত সামর্থ্য থাকার জন্য আর্ট ধর্মের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কযুক্ত হতে পারে। আর্ট ধর্মের মতনই জীবনের মহত্তর অর্থ প্রকাশের জন্য সচেষ্ট হয় এবং জীবনের অতি সাধারণ স্থূল স্তরে যেখানে মানুষের আত্মা অনেক সময় বিচরণ করে, সেখান থেকে আত্মাকে এক মহান স্তরে নিয়ে যায়। আর্ট সৌন্দর্যকে এমনভাবে ফুটিয়ে তুলতে পারে যে সংবেদনশীল মন তার মধ্যে এক অতীন্দ্রিয় সত্তার রূপ আবিষ্কার করে। দেখার মতো চোখ এবং সংবেদনশীল মন থাকলে যা জ্ঞাত এবং সীমিত তার মধ্য দিয়েই অজ্ঞাত ও অনন্তের প্রকাশ ঘটে। গ্যালোয়ে বলেন, আর্টের অভিভাবন ক্ষমতা তার প্রতীকতার মধ্যে নিহিত এবং প্রতীকমূলক ক্রিয়ার মাধ্যমেই উপাসনার মধ্য দিয়ে আত্মার অগ্রগতিতে সহায়তা করার ব্যাপারে ধর্মের সঙ্গে হাত মেলাতে পারে। শুদ্ধ এবং উচ্চতর উপাসনার পক্ষে আধ্যাত্মিক আবেগ একান্ত প্রয়োজনীয় এবং যেহেতু অনুভূতিকে জাগ্রত করার ও তার গতিকে পরিচালিত করার এবং মনকে এক আধ্যাত্মিক স্তরে উত্তোলন করার ব্যাপারে আর্ট উপায়রূপ গণ্য হতে পারে, সেইহেতু আর্ট ও ধর্মের ঘনিষ্ঠ সংযোগ লক্ষ্য করা যায়। আর্টের উন্নত ও সমৃদ্ধ সম্পদগুলিকে ধর্মের ব্যাপারে সহায়তা করার জন্য আহ্বান করে গীর্জা অনুভব করেছিল যে, উপাসনাকে আরও উন্নত, বৈশিষ্ট্যমূলক এবং অবদান সৃষ্টিকারী করা হয়েছে।

ধর্মকে অনুপ্রাণিত করার ব্যাপারে আর্টের ক্ষমতা

তবু আধুনিককালে ধর্ম এবং আর্ট যেন কিছুটা পরস্পরের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। একদিকে কঠোর নীতিবাগীশের দল ধর্মের ক্ষেত্রে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য রূপ ও বর্ণের ব্যবহারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে। এর মূলে রয়েছে কঠোর নৈতিকতা

এবং বুদ্ধিগত কৃচ্ছ্রতা। এর অর্থ হল ধর্মের ক্ষেত্রে সৎ আচরণের উপর গুরুত্ব আরোপ এবং গোঁড়া খ্রীষ্টান সম্প্রদায়ের 'এই বুঝি পৌত্তলিকতা চলে এল',—এই ভীতিবোধ। অপরদিকে রয়েছে আর্টের নিরপেক্ষতা বা আত্মনির্ভরতা দাবী, যে দাবী ব্যক্ত হয়েছে 'আর্টের জন্য আর্ট' (Art for Art's sake) এই শ্লোগানের মধ্য দিয়ে। এই দাবীর অর্থ হল, আর্টের সৃজনমূলক প্রচেষ্টাকে আর্টের নিজস্ব মানদণ্ডের সাহায্যেই বিচার করতে হবে, নৈতিক বা ধর্মীয় মানদণ্ডের সাহায্যে তাকে বিচার করলে চলবে না। কিন্তু নিছক সৌন্দর্যমূলক এবং ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ধর্মের (aesthetic and sensous religion) বিরুদ্ধে নীতিবাগীশদের বিদ্রোহ এবং বাহ্য মানদণ্ডের সাহায্যে আর্টের বিচারের বিরুদ্ধে কলারসিকদের বিদ্রোহ—উভয়কেই একটা সীমা পর্যন্ত স্বীকার করে নেওয়া যেতে পারে।

আধুনিক কালে ধর্ম আর্ট থেকে বিচ্ছিন্ন

ধর্ম ও আর্টের পারস্পরিক দাবী

ধর্মীয় আর্টের (religious art) ক্ষেত্রে যা কিছু ইন্দ্রিয়গত তা আধ্যাত্মিককে প্রকাশ করার বাহন না হয়ে যদি নিজেই নিজের লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায় তাহলেই বিপদ দেখা দেবে, অর্থাৎ কিনা মানুষের বিচার-বুদ্ধি এবং বিবেকের কাছে ধর্মের কোন আবেদন থাকবে না এবং ধর্ম হয়ে পড়বে নিছক এক সৌন্দর্যভোগের বিষয়। সেই কারণেই অনেকেই ধর্মীয় আর্টের ক্ষেত্রে ধর্মের আধ্যাত্মিকতার উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। কিন্তু এটার আর একটা দিক আছে। ধর্মের সৌন্দর্য মূলক দিকটাকে একেবারে বর্জন করার প্রচেষ্টা হল মানুষের আত্মাকে অনাবশ্যকভাবে কঠোর এবং রিক্ত করে তোলা। ধর্ম যদি হয়ে পড়ে শুধুমাত্র চিন্তার বিষয় তাহলে উপাসনা বা পূজার ক্ষেত্রে আর্টের ব্যবহার হয়ে পড়বে অনাবশ্যক ব্যাপার। কিন্তু কেবলমাত্র শুদ্ধ চিন্তা ধর্ম সৃষ্টি করতে পারে না এবং যেহেতু আধ্যাত্মিক পূজা বা উপাসনার ক্ষেত্রে অনুভূতির একটা বিশিষ্ট স্থান রয়েছে, কাজেই ধর্মোপাসনার ও পূজা পদ্ধতির ক্ষেত্রে আর্টের একটা বিশিষ্ট স্থান সব সময়ই উপস্থিত থাকবে। ধর্মানুরাগ যদি বড় বেশী বুদ্ধি নিয়ন্ত্রিত হয়ে পড়ে তাহলে ধর্মানুরাগী আত্মা হয়ে পড়ে অতি মাত্রায় নিঃস্ব এবং সাধারণ জীবনের প্রয়োজন ও স্বার্থের সঙ্গে ধর্মের কোন ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকে না। আধুনিক মন আধ্যাত্মিক জীবনের জন্য এক সমৃদ্ধতর উপাদানের দাবী করে এবং ধর্মের উদ্দেশ্যকে সিদ্ধ করবে এমন সব প্রভাবকে সহায়ক হিসেবে গ্রহণ করতে রাজী হয়। তাছাড়া ধর্মীয় মতবাদের মধ্যে প্রতীকমূলক উপাদানকে স্বীকার করে নেবার যে মনোভাব তা ধর্মকে আর্টের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে সম্বন্ধযুক্ত করে। কাজেই যাকে গ্রীকরা সৌন্দর্যের ধর্ম

দাবীর সীমা

ধর্ম আর্টকে বর্জন করতে পারে না

(religions of beauty) বলে অভিহিত করেছেন, তার থেকে অনেক কিছু শিখবার আছে।

আবার 'আর্টের জন্য আর্ট'—কলারসিকদের এই শ্লোগানের মধ্য দিয়ে যে স্ব-নির্ভরতা ও স্বশাসিত হবার দাবী প্রকাশ পেয়েছে তাকে সমর্থন করা যেতে পারে যদি সেই দাবী নিঃশর্ত না হয়ে আপেক্ষিক হয়। এটা অস্বীকার করা চলে না যে, আধুনিকদের আর্টের স্ব-নির্ভরতা ও আত্মপ্রতিষ্ঠার এই দাবীর মধ্যে বিপদের সম্ভাবনা রয়েছে। কারণ, আর্ট যাই করুক না কেন, কখনও ধর্মের স্থান অধিকার করতে পারে না। যে নৈতিক এবং ব্যবহারিক দিক ধর্মের বৈশিষ্ট্য সূচনা করে, আর্টের মধ্যে তা'র একান্ত অভাব। পূজা বা উপাসনার সৌন্দর্যমূলক দিকটির প্রতি অতিরিক্ত অনুরাগ প্রকৃত ধর্মের স্বার্থকে ক্ষুণ্ণ করে, কারণ উপাসনার সঙ্গে জীবনের যে সংযোগ, এই বিষয়টি ব্যক্তিকে তা উপেক্ষা করতে প্রণোদিত করে। ধর্মানুরাগে যেমন চিন্তনের দিক আছে তেমনি ক্রিয়ার দিকও আছে। অনেক সময় দেখা যায় যে যেসব ব্যক্তি ধর্মীয় মতবাদে তাদের বিশ্বাস হারিয়েছে তারা ধর্মের বাহ্যরূপ ও অনুষ্ঠানের মধ্যে এক সৌন্দর্যগত মূল্য আবিষ্কার করে এবং তার প্রতি বাইরে থেকে তাদের ভক্তি-শ্রদ্ধা প্রকাশ করে।

'আর্টের জন্য আর্ট' এই দাবী নিঃশর্ত হতে পারে না

কিন্তু এই সবক্ষেত্রে ধর্মের বাহ্যরূপটুকুই বজায় থাকে, ধর্মের প্রকৃত লক্ষ্য অন্তর্হিত হয়। আসল কথা হল, আর্ট যদি ধর্মের কল্যাণের জন্য ধর্মের সঙ্গে সহযোগিতা করতে চায়, তাহলে ধর্মের আধ্যাত্মিক দিক যে পথে তাকে চলার নির্দেশ দেবে, সেই পথ ধরে তাকে চলতে হবে। বিশপ ওয়েস্টকট (*Bishop Westcott*)-এর অভিমতানুসারে ধর্মের ক্ষেত্রে আর্টের কাজ হবে সহায়কের কাজ। সঙ্গীত, চিত্রাঙ্কন, ভাস্কর্য যাই হোক না কেন, প্রত্যেক ক্ষেত্রেই আর্টকে প্রত্যক্ষ বা বর্তমানকে অতিক্রম করে পরোক্ষ বা বর্তমান-উর্ধ্ব কিছুকে নির্দেশ করতে হবে। যতক্ষণ পর্যন্ত আর্ট এই প্রত্যাশাকে ব্যক্ত করবে যে, 'হে ঈশ্বর, তোমার মহান গৌরবের জন্য', ততক্ষণ পর্যন্ত আর্ট শুধুমাত্র নিবেদন নয়, আর্ট পথপ্রদর্শক এবং সমর্থক। কিন্তু যখন আর্টই হয়ে ওঠে লক্ষ্য তখন মনে করতে হবে পৌত্তলিকতা শুরু হয়ে গেছে। কাজেই বাস্তব ও সংবেদনমূলক আর্ট, যার লক্ষ্য শুধু মাত্র বর্তমানে একটা ফলাফল সৃষ্টি করা, যখন ধর্মের সঙ্গে যুক্তহয়ে পড়ে, তখন আর্ট ধর্মের সহায়ক না হয়ে তার অবনয়নের (degradation) কারণ হয়ে দাঁড়ায়, যা ধর্মপ্রবণ ব্যক্তির মনে প্রতিকূল মনোভাবের সৃষ্টি করে। এই জাতীয় আর্ট কুসংস্কারমূলক ধর্মের উপযোগী বলে গণ্য হতে পারে, কিন্তু পবিত্র ও

আর্টকে ধর্মের নির্দেশ মেনে চলতে হবে

ওয়েস্টকটের অভিমত

মালিন্যমুক্ত ধর্মের সহায়ক হতে পারে না। যে আর্ট প্রতীকমূলক এবং আধ্যাত্মিকতাকে অভিভাবিত করে তার স্থায়ী ধর্মগত মূল্যকে অস্বীকার করা চলে না। কারণ এ-ক্ষেত্রে আর্ট ইন্দ্রিয়ের ঊর্ধ্বে যে জগৎ আছে তার কথা ব্যক্ত করে এবং আত্মা যাতে ইন্দ্রিয়ঊর্ধ্ব জগতের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারে তার সহায়ক হয়। গ্যালোয়ে বলেন, 'ধর্ম এবং নীতির মতন মানবপ্রকৃতির আধ্যাত্মিক উপাদান থেকে আর্টের উদ্ভব।'

এই প্রসঙ্গে মায়েল এডওয়ার্ড্‌স-এর মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য। সত্য, শিব ও সুন্দর —এই তিন মূলের মধ্যে কোন অসামঞ্জস্য থাকতে পারে না। কলাবিদের কাজ হবে অ-নৈতিক (amoral), কিন্তু তার কাজ কখনও নীতিবিরোধী (immoral) হতে পারে না। তাহলে তা আর শিল্পজনোচিত হবে না। প্রকৃত আর্ট বিশেষ করে ধর্মীয়, যদিও ধর্মের স্থান গ্রহণ করা তার পক্ষে সম্ভব নয়। একটা বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি থেকে তত্ত্বের (reality) ব্যাখ্যা দেওয়া আর্টের কাজ। কারণ তত্ত্ব একাধারে কল্যাণকর ও সুন্দর। সৌন্দর্য হল নিরপেক্ষ মূল্য। এটি ঈশ্বরের একটি মৌলিক গুণ। এই সৌন্দর্যের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে তত্ত্বের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে আর্ট নৈতিকতা এবং বিজ্ঞানের মধ্য দিয়ে প্রদত্ত ঈশ্বরের প্রত্যাদেশকে আরও অনেকদূর পর্যন্ত টেনে নিয়ে যায় এবং অনন্তের নিকট সংস্পর্শ লাভে আমাদের সহায়তা করে। কাজেই ধর্মের আর্টের প্রয়োজন আছে। অনুরূপভাবে দেখান যেতে পারে যে, আর্টেরও ধর্মের প্রয়োজন আছে, কেননা ধর্মই শুধু মাত্র মানুষকে সব সৃষ্টিমূলক অনুপ্রেরণার আদি উৎসের (ultimate fount of all creative inspiration) কাছে নিয়ে যেতে পারে।

[1]কেউ কেউ ধর্ম ও আর্টের মধ্যে কোন পার্থক্য স্বীকার করতে চান না। তাঁদের মতে আর্ট ও ধর্ম এমনভাবে পরস্পরের সঙ্গে জড়িত যে তাদের পৃথক করা চলে না।

ধর্ম ও আর্ট অভিন্ন নয়

কিন্তু এই অভিমত গ্রহণযোগ্য নয়, এই সম্পর্কে রাইট[2] যা বলেছেন তা গ্রহণযোগ্য। তাঁর মতে মানুষের অভিজ্ঞতায় আর্টের তুলনায় ধর্ম অনেক বড় জিনিস, এর কারণ ধর্ম নিজেই নিজের লক্ষ্য নয়, এবং সবসময়ই বর্তমানকে অতিক্রম করেই তার দৃষ্টি প্রসারিত। সেই কারণে মানুষের ব্যক্তিগত জীবনে এবং সামাজিক সম্বন্ধের মাধ্যমে মানুষের জ্ঞাত সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ মূল্যের সংরক্ষণে ধর্মের উপায়রূপে গণ্য হবার সামর্থ্য রয়েছে।"

1. A. C. Watson: "Logic of Religion". American Journal of Theology. Vol. XX; PP 81-101; 244-265.

2. W. K. Wright: A Student's Philosophy of Religion; Page 56.

(iv) দর্শন ও ধর্ম (Philosophy and Religion) :

দর্শন ও ধর্মের সম্বন্ধ নিরূপণ করার পূর্বে দর্শন ও ধর্মের প্রকৃতি সম্পর্কে অবহিত হওয়া প্রয়োজন।

দর্শন ও ধর্মের স্বরূপ

মারভিন দর্শনের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন, "দর্শন হল সত্যের প্রতি অনুরাগ—সব সত্য যার অন্তর্ভুক্ত এমন জ্ঞানের পূর্ণ ভাণ্ডার, যাতে সব সত্য এক মহান অখণ্ডতার মধ্যে সুবিন্যস্ত।" ওয়েবার বলেন, "দর্শন হল প্রকৃতির বিষয়ে এক সামগ্রিক দৃষ্টিলাভের অনুসন্ধান, বস্তুর সঠিক ব্যাখ্যা দেবার প্রচেষ্টা।" জগৎ ও জীবনের স্বরূপ ব্যাখ্যা এবং তার মূল্যাবধারণই দার্শনিকের কাজ। ধর্ম বলতে বুঝি কোন অতিপ্রাকৃত সত্তায় মানুষের বিশ্বাস, যে বিশ্বাস তার জীবনের সব মূল অনুভূতি ও ক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রিত করে।

উভয়ের সম্পর্ককে কেন্দ্র করে দুটি চরম মত

দর্শন ও ধর্মের সম্বন্ধকে কেন্দ্র করে একাধিক অভিমত ব্যক্ত হয়েছে। কারও কারও মতে দর্শন ও ধর্মের মধ্যে কোন সংযোগ সম্ভব নয় এবং দর্শন ধর্মের পক্ষে, বা ধর্ম দর্শনের পক্ষে অপ্রাসঙ্গিক বিষয়। এই অভিমতের পরিণাম হল কোন ধর্মদর্শন সম্ভব নয়। আবার অপরদিকে কেউ কেউ ধর্ম ও দর্শনকে পরস্পরের মধ্যে মিশিয়ে দেবার চেষ্টা করেছেন। এই অভিমত যাঁরা সমর্থন করেন তাঁদের মতে বিচারবুদ্ধি (reason) এবং প্রত্যাদেশের (revelation) মধ্যে কোন বৈসাদৃশ্য নেই ; এরা একই বিষয়ের দুটি দিক। প্রত্যাদেশ যা ব্যক্ত করে বিচারবুদ্ধি তাকে জানতে চায় এবং জানতে পারে। এই মতের সমর্থকবৃন্দ বলেন যে, "জগৎ সম্পর্কে শ্রেষ্ঠ বুদ্ধিগত মতবাদ শ্রেষ্ঠ ধর্মতত্ত্ব। কারণ প্রত্যাদেশ হল বিচারবুদ্ধি যা নিজের অন্তর্নিহিত ক্ষমতাকে প্রকাশ করছে।"[1]

দর্শন ও ধর্ম পরস্পরের পরিপূরক

অনেক লেখক এই দুই চরম অভিমত বর্জন করে একাধিক বিকল্প অভিমত ব্যক্ত করেছেন। যেমন, কেউ কেউ মনে করেন দর্শন ও ধর্মের সম্বন্ধ হল একটি অপরটির পরিপূরক। ধর্ম ও দর্শন প্রত্যেকেরই আলোচনার নিজস্ব পরিসর রয়েছে যারা পরস্পরকে সম্পূর্ণ করে তোলে। টমাস একুইনাস-এর চিন্তার মধ্য দিয়ে এই জাতীয় অভিমতের সুস্পষ্ট প্রকাশ ঘটেছে। আবার কেউ কেউ এমন অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে, দর্শন ও ধর্ম

---

1. "Proponents of this position feel that the best rational structure of the universe is the best theology, for revelation is reason exercising its inherent power."

তাদের নিজ নিজ পরিধির মধ্যে যথার্থ এবং উভয়ের সম্পর্ক স্থিরীকৃত হয়নি। ধর্মতত্ত্ববিদ্ মনে করেন, ধর্মতত্ত্ব প্রত্যাদেশের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং মানুষের পরমমূল্য ও তার অর্থ অনুসন্ধানের প্রচেষ্টার সঙ্গে এই প্রত্যাদেশের সম্পর্ক। আর সংবেদনমূলক অভিজ্ঞতা এবং যৌক্তিক বিশ্লেষণ নিয়ে দর্শনের কাজ। সেহেতু মানুষের সঙ্গে এই উভয়েরই সম্পর্ক রয়েছে। উভয়ের সংযোগ প্রয়োজন, যদিও সংযোগসাধন কঠিন ব্যাপার।

উভয়ের সম্পর্ক অস্থিরীকৃত

অনেক সময় আবার ধর্মতত্ত্ব দর্শনকে পরিবর্তিত করতে চায়। ধর্মতত্ত্ব মনে করে তার কাজ বিচারবুদ্ধিকে ঠিক পথে চালিত করা। ধর্মতত্ত্বের বক্তব্য হল বিচারবুদ্ধি যে অযথার্থ তা নয়, তবে বিচারবুদ্ধি ভ্রান্ত পথে চালিত। কাজেই ধর্মতত্ত্ব নতুন জ্ঞান দেয় না, ধর্মতত্ত্ব বিচারবুদ্ধিকে আলো দেখায়, নতুন পথে চলার নির্দেশ দেয় যার দ্বারা বিচারবুদ্ধি তার অন্তর্নিহিত ক্ষমতাকে আরও সার্থকভাবে উপলব্ধি করতে পারবে। আবার দর্শনও ধর্মতত্ত্বকে পরিবর্তিত করতে পারে। দর্শন অবশ্যই চাইবে ধর্মতত্ত্বীয় ধারণাগুলিকে তার সামগ্রিক সংহতির অন্তর্ভুক্ত করতে এবং ধর্মীয় ধারণাগুলির সত্যতাকে সেই সংহতির পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করে দেখতে।

পরস্পর পরস্পরকে পরিবর্তিত করতে চায়

এখন দেখা যাক দর্শনের সঙ্গে ধর্মের কোন্ কোন্ বিষয়ে মিল এবং কোন্ কোন্ বিষয়ে অমিল আছে। এক সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে জগৎ এবং জীবনের ব্যাখ্যা দেওয়া দর্শনের উদ্দেশ্য। দার্শনিকের দৃষ্টি হল অখণ্ড দৃষ্টি। দর্শন পরম ধারণার (ultimate conception) পরিপ্রেক্ষিতে অভিজ্ঞতাকে সামগ্রিকভাবে ব্যাখ্যা করে। ধর্মও পরমতত্ত্বের পরিপ্রেক্ষিতে অভিজ্ঞতাকে সামগ্রিকভাবে ব্যাখ্যা করে।

দর্শনের সঙ্গে ধর্মের মিল

ধর্ম ও দর্শন উভয়ই পরমতত্ত্ব ও পরমমূল্য নিয়ে আলোচনা করে। দর্শন ও ধর্ম এদের প্রত্যেকটিই মূল তত্ত্বের প্রতি মানুষের মনোভাব নির্দেশ করে। ধর্মের মনোভাব ব্যক্ত হয় উপাসনা, প্রার্থনা ও আচরণ ইত্যাদির মাধ্যমে আর দর্শনের মনোভাব ব্যক্ত হয় বৌদ্ধিক উপলব্ধির মধ্য দিয়ে। বিশ্বজগতের মূল্যের উৎসের প্রতি ধর্মের মনোভাব হল ব্যবহারিক এবং আবেগমূলক আর দর্শনের কাজ ঐ উৎসের সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা দেওয়া। [1]জে. সি. ফিভার (*J. C. Feaver*) বলেন, "যেহেতু ধর্মের কাজ

1, "... . insofar as religion is concerned with the interpretation and establishment of values, religion and philosophy tend to become interdependent."

—J. C. Feaver and William Horosz : Religion in Philosophical and Cultural Perspective."

মূল্যকে ব্যাখ্যা করা ও প্রতিষ্ঠা করা, ধর্ম এবং দর্শন পরস্পর নির্ভর।" মূল্যের মনন, সমালোচনা এবং মূল্য সম্পর্কীয় বচনের প্রতিষ্ঠা দর্শনের কাজ। ধর্ম ও দর্শনের আলোচ্য বিষয়ের মধ্যেও মিল লক্ষ্য করা যায়। আত্মা, অমরত্ব, ঈশ্বরের সৃষ্টিকার্য, জগতের সঙ্গে ঈশ্বরের সম্পর্ক, ঈশ্বরের সঙ্গে জীবনের সম্পর্ক, ঈশ্বরকে জানার উপায় প্রভৃতি ধর্ম ও দর্শন উভয়েরই আলোচ্য বিষয়। ধর্মসম্বন্ধীয় বিভিন্ন ধারণার সত্যতা ও মিথ্যাত্ব বিচারের কাজ ধর্মদর্শনের।

উভয়ের মধ্যে অমিল

কিন্তু কয়েক বিষয়ে মিল থাকলেও উভয়ের মধ্যে অনেক বিষয়ে অমিল আছে। দর্শনের পদ্ধতি হল বিচারবুদ্ধি ও বিশ্লেষণ। ধর্মের পদ্ধতি হল স্বজ্ঞা বা প্রত্যক্ষ অনুভূতি (intuition)। উপাদানের বৈচিত্র্যের ব্যাপারে ধর্ম দর্শনের তুলনায় অনেক সমৃদ্ধ। ধর্মের মধ্যে যেমন পরমতত্ত্ব, মানুষের অদৃষ্ট সম্পর্কে বৌদ্ধিক বিশ্বাস রয়েছে, তেমনি আছে পরমতত্ত্বের প্রতি আবেগ-মূলক প্রতিক্রিয়া এবং ইচ্ছামূলক কর্মপ্রবৃত্তি। দর্শনের মধ্যে শুধু বুদ্ধিগত উপাদানই বর্তমান। বস্তুতঃ সকলরকম আবেগ বর্জন করে বিচার ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে সত্যান্বেষণ দর্শনের লক্ষ্য। জগৎকে বোঝা, যদিও দর্শন ও ধর্ম উভয়েরই লক্ষ্য, তবু উভয় ক্ষেত্রে উদ্দেশ্য পৃথক। দর্শনে এই উদ্দেশ্য হল জ্ঞানের প্রতি অনুরাগ এবং তার পরিণাম হিসেবে বুদ্ধির পরিতৃপ্তি ও মানসিক শান্তি। ধর্মের ক্ষেত্রে উদ্দেশ্য হল শান্তি লাভ, পরমতত্ত্বের সঙ্গে ব্যক্তির সঙ্গতিবিধান এবং মোক্ষলাভ।

দর্শন হল পরমতত্ত্বের জ্ঞান। ধর্ম হল পরমতত্ত্বের সঙ্গে সংযোগ। দর্শনে কতকগুলি ধারণার চিন্তন ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে আমরা তত্ত্বের জ্ঞান লাভ করি। কিন্তু ধর্মের দুটি দিক আছে, একটি তার অন্তরঙ্গ দিক, অপরটি তার বহিরঙ্গ দিক। ধর্মের অন্তরঙ্গ দিক হল ঈশ্বরের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ককে কেন্দ্র করে ব্যক্তির মনে যে ভাব-ধারণা, চিন্তা এবং অনুভূতির আবির্ভাব ঘটে সেইগুলি এবং এর বহিরঙ্গ দিক হল ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান, উৎসর্গ প্রভৃতি যার মাধ্যমে ঐ অনুভূতির প্রকাশ ঘটে। ধর্ম বিষয়-বস্তুর কোন ধারণাগত ব্যাখ্যা দেয় না। বিচারবুদ্ধির সহায়ক হওয়া ধর্মের কাজ নয়। সত্তার সঙ্গে সংযোগ প্রতিষ্ঠা করার উপায় নির্দেশ করে বলে ধর্ম দাবী করে এবং যদি ধর্মের এই দাবীকে যথার্থ মনে করা যায় তাহলে দর্শনের পক্ষে ধর্মের স্থান দখল করা কখনও সম্ভব হবে না। কিন্তু সত্তার সঙ্গে ব্যক্তির সংযোগের বিষয়, যেটি প্রতিষ্ঠা করে বলে ধর্ম দাবী করে, দর্শন সেটিকে বুঝতে চায়, ব্যাখ্যা করতে চায়। যে মূল্যের সংগঠন নিয়ে ধর্মের কাজ, দর্শন তাকে পরীক্ষা করে দেখতে চায়, তাকে বিশ্লেষণ করতে চায়। দর্শন আলোচনা করে মূল্য কি মনোগত না বস্তুগত, না উভয়ই। মূল্যের

সঙ্গে পরমতত্ত্বের সম্পর্ক দর্শনের আলোচ্য বিষয়। দর্শনে আমরা তত্ত্বকে জানি, বুঝি; ধর্মে আমরা তার সঙ্গে যোগাযোগ করি।

যাঁরা মনে করেন ধর্মীয় মূল্য (religious value) হল এক বিশেষ ধরনের মূল্য এবং জীবনের অন্যান্য মূল্যের সঙ্গে তার কোন মিল নেই, তাঁরা মনে করেন যে, ধর্ম দর্শনের উপর নির্ভরশীল নয়। একথা বলা যেতে পারে যে, ধর্মীয় মূল্যগুলি কোন তত্ত্বের (theory) বা দর্শনের উপর নির্ভরশীল নয়। ধর্মীয় মূল্য হল প্রদত্ত তথ্য বা অভিজ্ঞতা কিন্তু ধর্মসম্বন্ধীয় মূল্য শুধুমাত্র মনোগত অভিজ্ঞতা (subjective experience) নয়। ভাল-মন্দ, সৌন্দর্য, মানুষের অদৃষ্ট (human destiny), ঐশ্বরিক শক্তি ও ইচ্ছায় বিশ্বাস ধর্মীয় মূল্যের অন্তর্গত। ধর্মীয় মূল্য যদি মূল্যের উৎস ও ভবিষ্যৎ সম্পর্কে কিছু ব্যক্ত করে, যদি নৈতিক, সৌন্দর্যমূলক, সামাজিক বা জাগতিক মূল্যের সঙ্গে তার সংযোগের কথা ব্যক্ত করে তাহলে ঐ সংযোগের বিষয়টি দার্শনিকের অনুসন্ধানের বিষয় হয়ে ওঠে।

ধর্মীয় মূল্য দর্শনের আলোচনার বিষয়বস্তু

একথা হয়ত বলা যেতে পারে যে, ধর্ম দর্শনের অনুসন্ধানের কোন বিষয় নয়। কিন্তু ধর্ম, ইতিহাস, সমাজবিজ্ঞান এবং মনোবিজ্ঞান নিরপেক্ষ হতে পারে না। এই সব বিজ্ঞান ধর্মের উৎপত্তি, ধর্মের বিকাশ, ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান, ধর্মের মনস্তাত্ত্বিক উপাদান এবং ক্রিয়া অবশ্যই আলোচনা করবে। তাদের কাজ শেষ হলে আরও একটি কাজ বাকী থাকবে সেটি হল, এই সব অনুসন্ধানের ফলাফলগুলিকে যুক্ত করা। সেটি হবে দর্শনের কাজ

বিশ্বাসের বস্তুগত ভিত্তির প্রতিষ্ঠার জন্য ধর্মের দর্শনকে প্রয়োজন আর দর্শনকে তার ভয় এই কারণে যে, দর্শনের স্বাধীন অনুসন্ধানের কাজ ধর্মের বিশ্বাস এবং ঐ বিশ্বাসের ভিত্তিকে নষ্ট করে দেবে। দর্শন মানুষের ধর্মীয় বিশ্বাসের মধ্যে দৃঢ়তা আনে। বেকন বলেন, 'একথা সত্য যে, অল্প দর্শন মানুষের মনকে নাস্তিকতার দিকে নিয়ে যেতে পারে, কিন্তু দর্শনের গভীরতা মানুষের মনকে ধর্মের দিকে টেনে নিয়ে যায়।'

বেকনের মন্তব্য

পঞ্চম অধ্যায়

ধর্মের বিজ্ঞানসম্মত আলোচনার বিরুদ্ধে অভিযোগের বিচার
(Examination of Objections to the Scientific Treatment of Religion)

১। ধর্মদর্শন সম্ভব কী? (Is Philosophy of Religion Possible?) :

ধর্মের বিজ্ঞানসম্মত আলোচনা সম্ভব কী? ধর্মদর্শন কি সম্ভব? ধর্মদর্শন সম্ভব হলেও ধর্মদর্শন কি বিজ্ঞান পদবাচ্য? সুদূর অতীত থেকে আজ পর্যন্ত এই প্রশ্ন মানুষের মনকে আলোড়িত করেছে। বিভিন্ন দার্শনিক বিভিন্ন দিক থেকে ধর্মের বিজ্ঞান সম্মত আলোচনার বিরুদ্ধে আপত্তি জানিয়েছেন। মোটামুটি তিন দিক থেকে এই অভিযোগ উত্থাপিত হয়েছে। প্রথমতঃ, মানুষের জ্ঞান আপেক্ষিক সেহেতু ধর্মের বিজ্ঞানসম্মত আলোচনা বা ধর্মদর্শন সম্ভব নয়। দ্বিতীয়তঃ, যদিও মানুষের বিচারবুদ্ধির পক্ষে পরমতত্ত্বের (Absolute) জ্ঞানলাভের সামর্থ্য নেই, তবু পরমতত্ত্বকে স্বজ্ঞা (intuition) বা প্রত্যক্ষ অনুভূতির মাধ্যমে জানা যেতে পারে। কিন্তু স্বজ্ঞা বৌদ্ধিক (rational) নয়, বিচারবুদ্ধি-ঊর্ধ্ব (supra-rational)। এই দিক থেকে যাঁরা ধর্মের বিজ্ঞানসম্মত আলোচনায় আপত্তি জানান, তাঁরা মনে করেন, ধর্ম-সম্বন্ধীয় জ্ঞান লাভের মাধ্যম বিচারবুদ্ধি নয়, অনুভূতি। তৃতীয়তঃ, ধর্মের বিজ্ঞানসম্মত আলোচনা এই কারণে সম্ভব নয় যে, ধর্ম-সম্বন্ধীয় সত্যতার (religious truths) সঙ্গে অন্য ধরনের সত্যতার পার্থক্য আছে। ধর্মসম্বন্ধীয় সত্যতার উৎস হল কোন প্রামাণ্য প্রত্যাদেশ (authoritative revelation) এবং এই প্রামাণ্য প্রত্যাদেশ মানুষের বিচারবুদ্ধির অধিগম্য নয়।

ধর্মদর্শনের সম্ভাব্যতার বিরুদ্ধে অভিযোগ

সুতরাং এই সব যুক্তির ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত করা হয়েছে যে, ধর্ম সম্বন্ধীয় জ্ঞান নিয়ে আলোচনার কোন অধিকার দর্শনের নেই। অর্থাৎ কিনা, ধর্মদর্শনের সম্ভাব্যতা স্বীকার করা চলে না। উপরি উক্ত বিষয়গুলি এবার একে একে আলোচনা করা যাক :

(ক) মানুষের জ্ঞান আপেক্ষিক (relative), কাজেই ধর্মের বিজ্ঞান-সম্মত আলোচনা সম্ভব নয়। অর্থাৎ ধর্মদর্শন সম্ভব নয়।

কোন কোন চিন্তাবিদ্ মনে করেন বিজ্ঞানের আলোচনা প্রকৃতিকে নিয়ে। ধর্মের আলোচনা অলৌকিক (supernatural) বা অপ্রাকৃতকে নিয়ে। কিন্তু অলৌকিকের অস্তিত্ব আছে, নিছক এই জ্ঞান ছাড়া অলৌকিক সম্পর্কে আমরা কিছুই জানতে পারি

না। রসায়নশাস্ত্র, প্রাণিবিদ্যা, জ্যোতির্বিজ্ঞান প্রভৃতি প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের সঙ্গে সম মর্যাদার অধিকারী এমন কোন অলৌকিকের বিজ্ঞান (a science of the super-natural) সম্ভব নয়। এই দৃশ্যমান সান্ত জগতকে অতিক্রম করে যদি কোন অতীন্দ্রিয় রহস্যময় জগৎকেই ধর্মীয় আবেগ, ভক্তি, সশ্রদ্ধ ভয়ের উৎস বলে নির্দেশ করা হয়, তাহলে আপত্তি করার বিশেষ কিছু থাকে না। কিন্তু এই অতীন্দ্রিয় জগৎ সম্পর্কে আরও কিছু জানার প্রচেষ্টাকে অভিজ্ঞতা ও বিচারবুদ্ধি, উভয়েই নিরর্থক বলে ঘোষণা করে। কাজেই যখন ধর্মতত্ত্ববিদ্ এবং দার্শনিকেরা পরম সত্তার অস্তিত্ব এবং স্বরূপ সম্পর্কে এবং এই সান্ত জগতের সঙ্গে তার সম্বন্ধ বর্ণনা করেন এবং যখন তাঁদের এই ব্যাখ্যা ও বর্ণনাকে তাঁরা বিজ্ঞানসম্মত বলে দাবী করেন, তখন তাকে যথার্থ বিজ্ঞান-সম্মত জ্ঞান বলে গণ্য করা কঠিন হয়ে পড়ে। কাজেই প্রত্যাদেশ নিরপেক্ষ ধর্মতত্ত্ব বা ঈশ্বরতত্ত্ব (natural theology) যথার্থ বিজ্ঞানপদবাচ্য নয়। কেননা এটি সীমার তুলাদণ্ডে অসীমকে ওজন করতে চায় (it seeks to weigh the finite in the balance of the infinite)[1]।

অলৌকিকের বিজ্ঞান সম্ভব নয়

প্রত্যাদেশ-নিরপেক্ষ ধর্মতত্ত্ব সম্ভব নয়

ধর্ম ও বিজ্ঞানের আলোচনার ক্ষেত্র যে ভিন্ন এটা অস্বীকার করা যায় না। যদি এই কথা বলা হয় যে, ধর্মবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয় এবং অনুসৃত পদ্ধতি প্রাকৃতিক বিজ্ঞান-গুলির আলোচ্য বিষয় ও অনুসৃত পদ্ধতি থেকে ভিন্ন, অর্থাৎ ধর্ম-বিজ্ঞান কোন আরোহমূলক বিজ্ঞান (inductive science) নয়, তাহলে এই অভিমত স্বীকার করে নেওয়া যেতে পারে। কিন্তু উপরিউক্ত অভিমতগুলির বক্তব্য বিষয় যদি এই হয় যে, মানুষের বুদ্ধি যেহেতু আপেক্ষিক এবং বস্তুর পরিদৃশ্যমান রূপের জ্ঞানেতেই সীমাবদ্ধ এবং যা অসীম ও ইন্দ্রিয়াতীত তার জ্ঞান লাভের পক্ষে উপযুক্ত নয়, এবং যেহেতু ধর্মতত্ত্ব ও ধর্মদর্শন এই জাতীয় জ্ঞান দেয় বলে ভ্রান্ত বিজ্ঞান, তাহলে এই অভিমত স্বীকার করা চলে না।

ধর্মদর্শন ভ্রান্ত বিজ্ঞান এই অভিমত স্বীকার্য নয়

ধর্মতত্ত্ব বা ধর্মদর্শন অবিজ্ঞানসম্মত—এই অভিমতের একটা পরিপূর্ণ রূপ আমরা হারবার্ট স্পেন্সার-এর অভিমতে ব্যক্ত হয়েছে দেখতে পাই। তাঁর বক্তব্য হল, বিজ্ঞান ও ধর্মের আলোচনার ক্ষেত্র স্বতন্ত্র। বিজ্ঞানের কাজ যা জ্ঞাত (the

1. আবার কোন কোন লেখক এই অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে, আমাদের বুদ্ধির প্রকৃতিই আমাদের এই শিক্ষা দেয় যে অভিজ্ঞতার পরিদৃশ্যমান রূপ বা অবভাসের (phenomena) আড়ালে যে তত্ত্বের (reality) অস্তিত্ব আছে তা মানুষের বিচারবুদ্ধির পক্ষে অচিন্তনীয়। অন্য একজন লেখক বলেন যে, ধর্মতত্ত্ব ও বিজ্ঞানের পরিসর ভিন্ন। ধর্মতত্ত্ব বিশ্বাসের জগতেই নিজেকে সীমিত রাখতে চায় এবং অনুসন্ধানের কাজটি দর্শন ও বিজ্ঞানের উপর চাপিয়ে দেয়।

known) তাকে নিয়ে, আর ধর্মের কাজ যা অজ্ঞাত এবং অজ্ঞেয় (the unknown and unknowable) তাকে নিয়ে। বিজ্ঞান প্রত্যক্ষগোচর (positive) এবং সুনির্দিষ্ট জ্ঞান নিয়ে আলোচনা করে। কিন্তু এই প্রত্যক্ষগোচর জগতের অভিজ্ঞতাকে অতিক্রম করে রয়েছে এক অজ্ঞাত অন্ধকারাচ্ছন্ন অনধিগম্য পটভূমিকা যা হল ধর্মের আলোচনার ক্ষেত্র। এই অজ্ঞাত জগতের প্রতি মানুষের একমাত্র সম্ভাব্য মনোভাব হল নীরব শ্রদ্ধার, বিচারবুদ্ধির সাহায্যে তাকে উপলব্ধি করার মনোভাব নয়। হারবার্ট স্পেন্সারের মতে এই হল সব ধর্মের সাধারণ সারবস্তু (essence)।

হারবার্ট স্পেন্সারের অভিমত

বিচারবুদ্ধি যে ধর্মের বিষয়বস্তুকে উপলব্ধি করতে অসমর্থ এর সমর্থনে দুটি যুক্তি দেখানো হয়েছে। প্রথমতঃ, অভিজ্ঞতার দিক থেকে বলা যেতে পারে যে, আমাদের জ্ঞানের বিশেষ একটা সীমা অতিক্রম করার এবং পরমতত্ত্ব সম্পর্কে কোন ধারণা গঠন করার প্রচেষ্টা সফল হতে পারে না। দ্বিতীয়তঃ, মানুষের বিচারবুদ্ধির প্রকৃতিকে পরীক্ষা করলে দেখা যায় যে, বিচারবুদ্ধি আপেক্ষিক এবং মানুষের জ্ঞান বিচারবুদ্ধিভিত্তিক হওয়াতে, যা সান্ত ও আপেক্ষিক, তাতেই সীমাবদ্ধ।

বিচারবুদ্ধির অসামর্থ্য সম্পর্কে যুক্তি

স্পেন্সারের অভিমতের ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত অসঙ্গতিগুলির উল্লেখ করা যেতে পারে।

(১) স্পেন্সার বলেছেন যে, মানুষের বিচারবুদ্ধি যা সান্ত তার জ্ঞানেতেই সীমাবদ্ধ, অথচ এই সান্তকে অতিক্রম করে যার অস্তিত্ব রয়েছে, তার সম্পর্কেও বিচারবুদ্ধি অবহিত। অর্থাৎ সব জ্ঞানই আপেক্ষিক, তবু আমরা পরমতত্ত্বের অস্তিত্ব সম্পর্কে অবহিত হতে পারি—স্পেন্সারের এই দুটি ভিন্ন অভিমতের মধ্যে সমন্বয় সাধন করা সম্ভব নয়।

স্পেন্সারের মতবাদের ত্রুটি

যে যৌক্তিক অনিবার্যতা (logical necessity) স্পেন্সারকে তাঁর মতবাদে এই দুই পরস্পর বিরুদ্ধ উপাদানকে একত্র সংযুক্ত করতে বাধ্য করেছে তা বোধগম্য। মানুষের জ্ঞান সীমিত ও আপেক্ষিক এ কথা বলতে গেলেই কোন অসীম ও নিরপেক্ষ বস্তুকে স্বীকার করে নিতেই হয়, যার সঙ্গে তুলনা করে আমরা আমাদের জ্ঞানের সীমিত স্বরূপ ও আপেক্ষিকতা সম্পর্কে অবহিত হতে পারি। যখন কোন বস্তুকে নিছক অবভাস (phenomena) বলে আখ্যাত করি, তখন আমাদের কোন সত্তাকে (reality), অর্থাৎ বস্তুর যথার্থ স্বরূপকে স্বীকার করে নিতে হয়, যার সঙ্গে তুলনা করে আমরা ঐ বস্তুকে অবভাস বলে আখ্যাত করতে পারি। আমরা শুধু অবভাসকে বা বস্তু যে ভাবে প্রতিভাত হচ্ছে তাকেই জানি বললে পরোক্ষভাবে অবভাসের

আড়ালে সত্তার বা 'বস্তু আসলে যা' তার অস্তিত্বকে স্বীকার করে নিতে হয়। যদি আমরা শুধু মাত্র সান্ত ও অবভাসকে জানি এবং অন্য কিছুকে জানতে পারি না বলি, তাহলে আমাদের এই জ্ঞানকে সান্ত ও অবভাস বলে আখ্যাত করা কোনমতেই সম্ভব হয় না। সীমিত জ্ঞানের কথা বললেই, সীমাকে অতিক্রম করে অসীমের অস্তিত্বকে স্বীকার করে নিতেই হয়। কিন্তু একই সঙ্গে জ্ঞানের আপেক্ষিকতাকে স্বীকার করে নেওয়ার জন্য পরমতত্ত্বের (Absolute) চেতনাকে অস্বীকার করা এবং জ্ঞানকে আপেক্ষিক বলে জানার জন্য পবমতত্ত্বের চেতনাকে স্বীকার করে নেওয়া, স্পষ্টতঃই অসঙ্গতিপূর্ণ সিদ্ধান্ত। একই চেতনার পক্ষে পুরোপুরি আপেক্ষিক হওয়া এবং এই আপেক্ষিকতা সম্পর্কে সচেতন হওয়া অসম্ভব।

স্পেন্সার, হ্যামিলটন, ম্যানসেল প্রমুখ চিন্তাবিদ্‌দের আপেক্ষিকতা সম্পর্কীয় মতবাদের যথাযথ সিদ্ধান্ত এই নয় যে পরমতত্ত্ব অজ্ঞেয়, বরং এই জাতীয় পরম তত্ত্বের কোন অস্তিত্ব নেই বা তার অস্তিত্বের কথা বলা অর্থহীন। হ্যামিলটন, ম্যানসেল প্রমুখ চিন্তাবিদদের যেটি আসল উদ্দেশ্য সেটি হল মানুষের জ্ঞানকে আপেক্ষিক প্রতিপন্ন করে অলৌকিক প্রত্যাদেশকে (supernatural revelation) প্রামাণ্য বলে অভিহিত করা এবং ধর্মসম্বন্ধীয় জ্ঞানের মাধ্যম যে বিচারবুদ্ধি নয়, একমাত্র বিশ্বাস (faith) তাই প্রতিপন্ন করা। কেননা শুধুমাত্র বিশ্বাসের মাধ্যমেই এই অলৌকিক প্রত্যাদেশকে জানা যেতে পারে। 'অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয়কে' ধর্মের উৎস নির্দেশ করে, এক অচিন্তনীয় পরমসত্তার অস্তিত্বে বিশ্বাস সূচিত করে, স্পেন্সাব অবশ্যই মানুষকে তার ধর্মীয় আকুলতার পরিতৃপ্তির কিছুটা সুযোগ করে দিয়েছেন। কিন্তু মানুষের বিচার-বুদ্ধি আপেক্ষিক এই মতবাদ স্বীকার করে নিলে কোন অলৌকিক প্রত্যাদেশ বা স্পেন্সার ঈশ্বরের প্রতিকল্পরূপে যে 'ছায়াময়, অনির্বচনীয় শ্রদ্ধার বস্তু' নির্দেশ করেছেন, কোনটিকেই যুক্তিযুক্তভাবে স্বীকার করে নেওয়া যেতে পারে না। কোন জন্মান্ধ ব্যক্তিকে যেমন বর্ণের ধারণা দেওয়া সম্ভব নয়, তেমনি চিন্তনের প্রকৃতি যদি এই হয় যে, আপেক্ষিক জ্ঞান লাভের বিষয়েতেই তা সীমাবদ্ধ থাকবে তাহলে তার পক্ষে কোন পরমতত্ত্বের জ্ঞান দেওয়া সম্ভব নয়।

ম্যানসেল, হ্যামিলটন-এর মতে জ্ঞান আপেক্ষিক, প্রত্যাদেশই প্রামাণ্য

স্পেন্সারের মতবাদ সম্পর্কে ঐ একই মন্তব্য প্রযোজ্য। কারণ সব জ্ঞানই যদি আপেক্ষিক হয়, তাহলে পরমতত্ত্বের অস্তিত্ব সম্পর্কে আমাদের জ্ঞানও আপেক্ষিক জ্ঞান, অর্থাৎ কোন আপেক্ষিক বা বস্তুনিরপেক্ষ অস্তিত্বের (subjective existence) জ্ঞান।

স্পেন্সারের বক্তব্যের পরিণতি

(২) 'পরমতত্ত্ব অজ্ঞেয়'—এই মতবাদ যে নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত তাহল দুটি পরস্পর সংযুক্ত বিষয়কে স্বতন্ত্র করে দেখা, যা যুক্তিযুক্ত নয়। এই নীতি সর্বপ্রথম সর্ব-মননিরপেক্ষ শর্তহীন, স্ব-নির্ভর এক পরমতত্ত্বের কথা ব্যক্ত করে এবং তারপর ধারণা করে যে ঐ বস্তু চিন্তার বহির্ভূত (outside of thought)। কিন্তু এমন কোন সত্তা আছে কি, বা বুদ্ধির পক্ষে এমন কোন সত্তার কথা চিন্তা করা সম্ভব কী, যা চিন্তনীয় বা বোধগম্য সত্তা নয়; বা চিন্তনের সামর্থ্যযুক্ত কোন বুদ্ধি তার সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য ভাবে যুক্ত নয়? চিন্তনীয় বিষয়ের সঙ্গে চিন্তন অবিচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত। যতই স্বতন্ত্র করার চেষ্টা করি না কেন, দুটি অবিচ্ছেদ্যভাবে সম্পর্কযুক্ত বিষয়ের মধ্যে একটি অপরটির থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে নিজে নিজেই অস্তিত্বশীল হযে রয়েছে, এইরূপ চিন্তা করা যায় না। কোন ব্যক্তিবিশেষ জ্ঞাত নয়, এমন অসংখ্য বস্তুর কথা চিন্তা করা যেতে পারে কিন্তু এই সব বস্তু কোন বুদ্ধির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত না হয়ে নিজে নিজে অস্তিত্বশীল, এই জাতীয় সিদ্ধান্ত যুক্তিসঙ্গত নয়। প্রকৃতি ও মানুষের মধ্যে যে বুদ্ধির অস্তিত্ব আমরা প্রত্যক্ষ করি, একথা সত্য যে, আমরা তা সৃষ্টি করি না; আমরা তাদের মধ্যে তাকে প্রত্যক্ষ করি মাত্র। কিন্তু তার জন্য একথা বলতে পারি না যে, সত্তা হল অজ্ঞেয়, অচিন্তনীয় একটা অজানা কিছু, যা বুদ্ধির সঙ্গে সম্পর্কবর্জিত। বস্তুতঃ প্রকৃতি বোধগম্য এই বিষয়টি স্বীকার করে নিয়েই বিজ্ঞান সত্য আবিষ্কারের জন্য সচেষ্ট হয়।

পরমতত্ত্ব চিন্তার বহির্ভূত

চিন্তনীয় বস্তুকে বুদ্ধির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত হতেই হবে

(৩) যা অজ্ঞেয় মনের পক্ষে তার উপাসনা সম্ভব নয়। যা অজ্ঞেয়, তার চিন্তন আমাদের মনে যে সশ্রদ্ধ ভয়, ভক্তি, আত্মসমর্পণের মনোভাব জাগিয়ে তোলে বলে আমরা মনে করি, সেইগুলি যুক্তিযুক্তভাবে এই অজ্ঞেয় সত্তার প্রাপ্য নয়। যা রহস্যময় ও দুর্জ্ঞেয় তা মনে যে ভাবাবেগ জাগিয়ে তোলে তার সঙ্গে ধর্মসম্বন্ধীয় অনুভূতির একটা বাহ্য সাদৃশ্য আছে। আমাদের উন্নততর আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতাকে সুনির্দিষ্ট বৈজ্ঞানিক আকারে ব্যক্ত করা যায় না। ধর্মীয় অনুভূতি অনেক সময়ই তার পরমসত্তার বোধকে নঞর্থকভাবে ব্যক্ত করে, যেমন পরম সত্তা অনির্বচনীয়, অশ্রুত, অপ্রত্যক্ষগোচর ইত্যাদি। যে প্রক্রিয়ার মাধ্যমে চিন্তন বা বিচারবুদ্ধি ঈশ্বরের ধারণায় উপনীত হয়, তার প্রথম স্তর হল সান্তকে অস্বীকার করা (negation of the finite)। কিন্তু এই নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি যথার্থ অসীম (True Infinite)-কে, যে অসীম মানুষ এবং প্রকৃতির মধ্য দিয়ে নিজেকে প্রকাশ করে এবং তার মধ্য দিয়েই নিজেকে উপলব্ধি করে,

অজ্ঞেয়-র উপাসনা সম্ভব নয়

লাভ করার পথে একটি স্তর মাত্র। স্পেন্সার তাঁর মতবাদে যে ধর্মীয় ভাবাবেগের কথা বলেছেন, কোন নৈতিবাচক অসীম সত্তা (Negative Infinite) সেই ভাবাবেগ মনে জাগাতে পারে না। যে অসীম সত্তা সান্তের অতিবর্তী অথচ সান্তের মধ্যেই ব্যাপ্ত সেই অসীম সত্তাই যথার্থ অসীম সত্তা, যা সশ্রদ্ধ ভয়, ভক্তি প্রভৃতি ধর্মীয় ভাবাবেগ মানুষের মনে জাগিয়ে তুলতে পারে।

নৈতিবাচক সত্তা ধর্মীয় ভাবাবেগ জাগাতে পারে না

হ্যামিলটন এবং ম্যানসেলের মতে পরমতত্ত্ব বা অসীম সত্তা হল নিছক নাম, নঞর্থক কিছু, যার সদর্থক কোন অস্তিত্ব নেই। এই নাম চিন্তন বা চেতনার বিষয়রূপে কোন বস্তুর অস্তিত্ব নির্দেশ করে না। এই নাম শুধুমাত্র সেই শর্তের অনুপস্থিতি নির্দেশ করে যা চিন্তনকে সম্ভব করে তোলে (the mere absence of the conditions under which thought is possible)। তাঁদের মতে যাকে নঞর্থকভাবে জানতে হয়, তার সদর্থক অস্তিত্বের কথা বিচারবুদ্ধির পক্ষে সুনিশ্চিতভাবে বলা যুক্তিযুক্ত নয়।

হ্যামিলটন এবং ম্যানসেলের যুক্তি খণ্ডন করতে গিয়ে স্পেন্সার বলেন, আমরা পরমতত্ত্বকে জানতে পারি না, এই কথা বলা মানেই স্বীকার করে নেওয়া যে পরমতত্ত্বের অস্তিত্ব আছে এবং এটাই প্রমাণ করে যে আমাদের মনে পরমতত্ত্বের নঞর্থক নয়, সদর্থক অস্তিত্ব রয়েছে।

হ্যামিলটন ও ম্যানসেলের যুক্তি খণ্ডন

স্পেন্সারের উপরিউক্ত অভিমতকে যথার্থ বলে স্বীকার করে নিলেও, সমালোচনায় কেয়ার্ড বলেন যে, স্পেন্সারের মতবাদ যথাযথভাবে পরমতত্ত্বে বিশ্বাস সূচিত করতে পারে না। যদি সান্ত (*finite*)-এর চিন্তা অনন্তকে বা পরমসত্তাকে চিন্তা করার সামর্থ্য নির্দেশ করে, তাহলে সান্ত-এর সম্পর্কে আমাদের যথার্থ জ্ঞান আছে, কিন্তু অনন্ত বা পরমতত্ত্ব সম্পর্কে অস্পষ্ট জ্ঞান আছে বলার কোন যুক্তি নেই। যখন স্পেন্সার বলেন যে, যদিও আমাদের পরমতত্ত্ব সম্পর্কে যথার্থ জ্ঞান নেই, তবু তার সম্পর্কে অনির্দিষ্ট চেতনা (indefenite consciousness) আছে, তখন তিনি এই অনির্দিষ্ট চেতনার যে প্রমাণ উপস্থিত করছেন, তার ভিত্তি রয়েছে জ্ঞানের আকার ও উপাদানের মধ্যে পার্থক্যের উপর। স্পেন্সারের বক্তব্যের উত্তরে বলা যেতে পারে যে, যদিও চিন্তার ক্ষেত্রে আকার ও উপাদানের মধ্যে পার্থক্য করা চলে, তাদের বাস্তবে বিচ্ছিন্ন করা চলে না।

স্পেন্সারের সমালোচনা

আসলে স্পেন্সারের ভুলের উদ্ভব ঘটেছে 'অচিন্তনীয়কে' (unthinkable) 'অকল্পনীয়' (unimaginable)-র সঙ্গে গুলিয়ে ফেলার জন্য। এক মাইলের কথা কল্পনা করা যায়, কিন্তু সূর্যের সঙ্গে আমাদের যে লক্ষ লক্ষ মাইলের দূরত্ব, তা কল্পনা

করা যায় না। কিন্তু কল্পনা করা যায় না বলে এই দূরত্ব ধারণাতীত, একথা বলা যেতে পারে না। কল্পনার অতীত হলেই যে তা অনিবার্যভাবে অচিন্তনীয় বা অজ্ঞেয় (unthinkable or unknowable) হবে এমন কোন কথা নেই।

চিন্তা করতে গিয়ে সব শর্ত বা সীমাকে যদি দূরে সরিয়ে দেওয়া যায়, তাহলেও কিছু অবশিষ্ট থাকে, যা হল শুদ্ধ সত্তা (Pure Being), যার গুণের কথা আমরা চিন্তা করতে পারি না, শুধুমাত্র চিন্তা করতে পারি যে, এটা অস্তিত্বশীল। কিন্তু যাই হোক না কেন, অন্য বস্তুকে যেমন আমরা জানি একেও আমরা জানি। শুধু এটুকু পার্থক্য অন্য বস্তুকে আমরা গুণবিশিষ্ট বস্তুরূপে জানি, আর একে জানি শুদ্ধ সত্তারূপে। কিন্তু কেয়ার্ড বলেন, শুদ্ধ সত্তাকে উপাসনার এবং পূজার বস্তু করে তোলা, প্রকৃতি পূজা বা কোন অচেতন বস্তুর প্রতি অন্ধ ভক্তি প্রদর্শনের চেয়েও নিকৃষ্ট ব্যাপার।

কেয়ার্ডের বক্তব্য

(খ) ধর্মের বিজ্ঞানসম্মত আলোচনা সম্ভব নয়। কেননা ধর্মের বিষয়বস্তুকে জানার মাধ্যম বিচারবুদ্ধি নয়, স্বজ্ঞা বা প্রত্যক্ষ অনুভূতি। অন্য আর এক দিক থেকে ধর্মের বিজ্ঞানসম্মত আলোচনা বা ধর্মদর্শনের সম্ভাব্যতার বিরুদ্ধে আপত্তি জানিয়েছেন কোন কোন চিন্তাবিদ। তাঁদের মতে ধর্মের বিষয়বস্তু যে অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয়, তা নয়; তবে তাকে জানার মাধ্যম বিচার-বুদ্ধি নয়, তাব জন্য স্বতন্ত্র পদ্ধতি বা উপায় নির্দিষ্ট হয়ে আছে; যা হল স্বজ্ঞা (intuition) বা প্রত্যক্ষ অনুভূতি। এঁদের মতে সান্ত বা সীমিত বস্তুকে বিচারবুদ্ধির সাহায্যে জানা যেতে পারে। কিন্তু ঈশ্বর বা ঐশ্বরিক সত্যের সঙ্গে সংযোগ প্রতিষ্ঠিত কবতে হলে এমন উপায় অবলম্বন করতে হয় যা যুক্তিতর্ককে অতিক্রম করে যায় এবং চেতনার সঙ্গে বস্তুর প্রত্যক্ষ সংযোগ প্রতিষ্ঠিত হয়। এই উপায় হল স্বজ্ঞা বা প্রত্যক্ষ অনুভূতি, যা ঐশ্বরিক সত্যতা সম্পর্কে, অনির্বচনীয় হলেও আমাদের সুনিশ্চিত জ্ঞান দান করে। এঁরা বলেন যে, কি অবরোহ বা কি আরোহ কোন যুক্তিতর্কই ঈশ্বরে আমাদের বিশ্বাস জাগ্রত করতে পারে না। ধর্মতত্ত্ব-তার প্রদত্ত সংজ্ঞা ও মতবাদের মধ্য দিয়েও ঈশ্বরে আমাদেব বিশ্বাস জাগ্রত করতে পারে না। আমরা ঈশ্বরে বিশ্বাস করি কারণ আমরা ঈশ্বরকে জানি, যদিও আমরা ঈশ্বরকে প্রমাণ করতে পারি না বা তার সংজ্ঞা দিতে ব্যর্থ হই। আমরা আধ্যাত্মিক সত্য উপলব্ধি করি, কিন্তু তাকে ব্যক্ত করতে পারি না।

ধর্মকে জানার মাধ্যম স্বজ্ঞা

যুক্তিতর্ক ঈশ্বর-বিশ্বাস জাগ্রত করতে পারে না

বস্তুত, বিচারবুদ্ধি ধর্ম সম্বন্ধীয় জ্ঞান দেবার ব্যাপারে অনিশ্চিত, অব্যাপক এবং অনুপযোগী বলেই স্বজ্ঞাবাদীরা মনে করেন। স্বজ্ঞাবাদীরা মনে করেন যে, নিশ্চয়তার মানদণ্ডের বিচারে স্বজ্ঞার স্থান বিচারবুদ্ধির ঊর্ধ্বে। কেননা স্বজ্ঞার মাধ্যমে চেতনা আধ্যাত্মিক সত্তাকে প্রত্যক্ষভাবে জানতে পারে। যে পদ্ধতির মাধ্যমে কোন কিছুকে প্রত্যক্ষভাবে জানা যায় সেই পদ্ধতির তুলনায় সুনিশ্চিত পদ্ধতি আর কি থাকতে পারে? স্বজ্ঞা তার বিষয়বস্তুকে এত সুনিশ্চিতভাবে জানে যে, তাকে, তার পক্ষ সমর্থনে যুক্তি দেবার প্রয়োজন হয় না।

স্বজ্ঞাবাদীদের দৃষ্টিতে স্বজ্ঞার উৎকর্ষ

স্বজ্ঞাবাদীরা মনে করেন যে, বিচারবুদ্ধির কিছু দোষ বা ত্রুটি আছে যার জন্য তার পক্ষে ঐশ্বরিক সত্যতা সম্পর্কে জ্ঞান দেবার ব্যাপারে অসুবিধা আছে। প্রথমতঃ, বিচারবুদ্ধি বা যুক্তিতর্ক মনকে ঈশ্বরের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যায় এবং ঈশ্বরের পরিবর্তে আমাদের ঈশ্বর সম্পর্কে যুক্তি, ধারণা এবং নানাধরনের মতবাদ প্রদান করে। দ্বিতীয়তঃ, বিচারবুদ্ধির মাধ্যমে লব্ধ জ্ঞান আংশিক। বুদ্ধির কাজ হল বিশ্লেষণ করা, সমগ্রকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশের মধ্যে বিভক্ত করে তাকে বোঝার চেষ্টা করা। তার ফলে বিচারবুদ্ধি কেবলমাত্র অসম্পূর্ণ ও আংশিক জ্ঞানই লাভ করে, অখণ্ড সমগ্রের জ্ঞান লাভ করতে পারে না। পরমতত্ত্ব এক অখণ্ড ঐক্য। বিশ্লেষণাত্মক বুদ্ধি তাকে উপলব্ধি করতে পারে না। বিচারবুদ্ধি কতকগুলি নির্দিষ্ট ধারণার মাধ্যমে সত্যকে জানতে সচেষ্ট হয় যা সত্যতার বিভিন্ন দিককে প্রকাশ করে মাত্র। কিন্তু যে ঐক্যের সূত্রটি ঐ বিচ্ছিন্ন সত্যগুলিকে ঐক্যবদ্ধ করে রাখে বিচারবুদ্ধির পক্ষে সেটা যুগিয়ে দেওয়া সম্ভব হয় না। তৃতীয়তঃ, ঈশ্বরের মধ্যে রয়েছে অনন্ত উপাদান। বিচারবুদ্ধির সীমিত বিশ্লেষণ প্রক্রিয়ার পক্ষে ঐসব উপাদানকে পরিপূর্ণভাবে জানা সম্ভব হয় না। কাজেই বিশ্বাসের কাছে প্রদত্ত সত্যের তুলনায় বিচারবুদ্ধিলব্ধ সত্য সবসময়ই কম হয়ে থাকে। বৈজ্ঞানিক সংজ্ঞা যা প্রকাশে ব্যর্থ হয়, স্বজ্ঞা নিমিষের মধ্যেই তার সম্পর্কে অবহিত হতে পারে। বিজ্ঞানের পক্ষে কোন সীমিত বস্তুর অসংখ্য উপাদানকে বিশ্লেষণ করে তার স্বরূপটিকে প্রকাশ করা সম্ভব। কিন্তু ঈশ্বরের প্রকৃতির বিশদ বিশ্লেষণ করে ঈশ্বরের ভাবময় স্বরূপটিকে মূর্ত করে তোলা অসম্ভব। বস্তুতঃ, বিশ্বাসের পরিতৃপ্তি কোন দার্শনিক মতবাদ দিতে পারে না। [1]কেয়ার্ডের ভাষায়, অন্তরের দিক থেকে যারা শুচি তারা

স্বজ্ঞাবাদীদের দৃষ্টিতে বিচারবুদ্ধির ত্রুটি

1. "The pure in heart may know God but the critical understanging can never know him." —Philosophy of Religion ; Page 39

ঈশ্বরকে জানলেও জানতে পারে কিন্তু বিচারমূলক বোধের পক্ষে ঈশ্বরকে জানা কখনও সম্ভব নয়। শেষতঃ, স্বজ্ঞার তুলনায় দর্শনের সবচেয়ে বড় ত্রুটি হল ঈশ্বরকে প্রমাণ করার প্রচেষ্টায় ঈশ্বরের উর্ধ্বে কোন কিছুকে স্থাপন করা। অসীম সসীমের বা সান্তের কাছে কিছু প্রকাশ করছে, এই ধারণা করা চলে। কিন্তু যা সীমিত বা সান্ত তা অসীমকে প্রমাণ করতে চাইছে, বা ঈশ্বরকে যুক্তি-তর্কের মধ্যে টেনে আনতে চাইছে, এ ভাবা চলে না। কোন নীতির মাধ্যমে পরোক্ষ-ভাবে ঈশ্বরের জ্ঞান লাভ করার অর্থই হল, সেই নীতিকে এবং যে চেতনা সেই নীতিকে অনুধাবন করতে সমর্থ, তাদের ঈশ্বরের থেকে বড় করে দেখা। ঈশ্বরকে প্রমাণ করার প্রচেষ্টা হল সসীমের মধ্যে অসীমের কারণ সন্ধান করা (to find in the finite the reason of the infinite)। তাছাড়া এ হল ঈশ্বরের সত্তার অনিবার্যতাকে ঈশ্বরের বাইরে আবিষ্কার করে ঈশ্বরকে সীমিত করা।

কেয়ার্ডের মন্তব্য

উপরিউক্ত অভিযোগের ভিত্তিতে তাই সিদ্ধান্ত করা হয়েছে যে, বিচারবুদ্ধি নয়, স্বজ্ঞা বা বিশ্বাসই (intuition or faith) ধর্ম-সম্বন্ধীয় জ্ঞানলাভের উপায়।

কিন্তু বিচারবুদ্ধি-বিরুদ্ধ স্বজ্ঞা সম্পর্কীয় মতবাদ গ্রহণযোগ্য নয়। বিচারবুদ্ধির বিরুদ্ধে যেসব অভিযোগ উত্থাপিত হয়েছে সেইগুলির প্রতিটিকেই যে খণ্ডন করা যায়, শুধু তাই নয় ধর্মসম্বন্ধীয় জ্ঞান লাভের উপায় হিসাবেও স্বজ্ঞার দাবী অযৌক্তিক, তাও যুক্তির সাহায্যে দেখান যেতে পারে।

বিচারবুদ্ধির বিরুদ্ধে যেসব অভিযোগ উত্থাপিত হয়েছে সেগুলিকে নিম্নলিখিতভাবে খণ্ডন করা যেতে পারে।

বিচারবুদ্ধির বিরুদ্ধে অভিযোগ খণ্ডন

(১) ধর্মদর্শন ও দর্শনের লক্ষ্য স্বতন্ত্র। দর্শন কখনও মানুষকে ধর্মপ্রবণ করে তোলার দাবী করে না। দর্শন ধর্মের অস্তিত্ব পূর্ব থেকে স্বীকার করে নেয়, তাকে সৃষ্টি করার দাবী করে না। ধর্মের মধ্যে বিচারবুদ্ধি যদি প্রচ্ছন্নভাবে না থাকে, দর্শনের পক্ষে ধর্ম আলোচনা করা সম্ভব হয় না! ধর্ম হল প্রচ্ছন্ন বিচারবুদ্ধি (reason implicit), আর দর্শন হল সেই বিচারবুদ্ধি যা আত্মসচেতন (reason self-conscious)। ধর্মীয় অভিজ্ঞতার তুলনায় ধর্মের বিচারমূলক আলোচনাকে নিকৃষ্ট মনে করার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ নেই। বস্তুতঃ ধর্ম এবং ধর্মতত্ত্ব, স্বজ্ঞা এবং চিন্তন, অপরোক্ষ চিন্তন এবং পরোক্ষ বা দার্শনিক চিন্তন পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী নয় এবং একই মানদণ্ডের সাহায্যে তাদের মূল্য বিচার করাও যুক্তিযুক্ত নয়।

(২) বিচারবুদ্ধি বা বিজ্ঞানসম্মত চিন্তন বিশ্লেষণ, বিভজন, পৃথকীকরণ (abstrac-

tion) প্রভৃতি প্রক্রিয়ার সাহায্যে তার কাজ শুরু করে; প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা সমগ্রতাকে খণ্ডিত করে অংশবিশেষের উপর বা সীমিত বিষয়ের উপর মনোযোগকে কেন্দ্রীভূত করে। সাধারণ চিন্তনের কাজ যে সমগ্রতাকে নিয়ে, তাকে সাময়িকভাবে বর্জন করে, সমগ্র থেকে বিচ্ছিন্ন অংশকেই তাকে জানতে হয়। কিন্তু এই কারণে স্বজ্ঞা বা বিশ্বাসের তুলনায় বিচারবুদ্ধিকে সঙ্কীর্ণ বা অব্যাপক মনে করা এবং বিচারবুদ্ধি সমগ্রতাকে বর্জন করে, এই সিদ্ধান্ত করা যুক্তিযুক্ত নয়। কাজের জন্য বিজ্ঞানকে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ঐক্য এবং সঙ্গতিকে সাময়িকভাবে খণ্ডিত করতে হয়, কিন্তু রূপ ও সম্বন্ধের ভেদের অন্তরালে যে চিন্তার ঐক্য বা অভেদের নীতি বর্তমান, সেটি নির্দেশ করে বিজ্ঞান ঐ খণ্ডিত ঐক্যকে পুনর্গঠিত করে প্রকাশ করে।

বিচারবুদ্ধির বিরুদ্ধে এই অভিযোগ করা হয় যে, বিচারবুদ্ধি সান্ত বিচারবুদ্ধিকে ঈশ্বরের উর্ধ্বে স্থাপন করে, কেননা সান্ত বিচারবুদ্ধির সাহায্যেই ঈশ্বরের জ্ঞান লব্ধ হয়। কিন্তু স্বজ্ঞামূলক জ্ঞানের (intuitive knowledge) ক্ষেত্রেও এই অভিযোগ প্রযোজ্য হতে পারে। কারণ স্বজ্ঞামূলক জ্ঞানও জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়র মধ্যে যে পার্থক্য, তাকে উপেক্ষা করে না এবং সেইহেতু ঈশ্বরের থেকে স্বতন্ত্র এবং এক অর্থে ঈশ্বর-বহির্ভূত জ্ঞাতার অস্তিত্ব স্বীকার করে নেয়। বস্তুতঃ পরোক্ষ বা অপরোক্ষ, যে জ্ঞানই হোক না কোন, জ্ঞান জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়র মধ্যে এক সচেতন সম্বন্ধ (conscious relation) স্বীকার করে নেয়, যাকে স্বীকার না করলে জ্ঞান সম্ভব হয় না। কাজেই স্বজ্ঞা বা অপরোক্ষ জ্ঞানও অসীমের থেকে স্বতন্ত্র এবং তার বিরুদ্ধ এক সসীমের অস্তিত্ব স্বীকার করে নেয় এবং কার্যতঃ চিন্তন প্রক্রিয়াকে তার অন্তর্ভুক্ত করে নেয়। দ্বিতীয়তঃ, এই অভিযোগও শেষ পর্যন্ত সমর্থনীয় নয়। একথা সত্য যে, ঈশ্বর হল এমন এক সত্তা, যা নিজে নিজেই অস্তিত্বশীল, যাকে কোন কিছু থেকে নিঃসৃত করা যায় না এবং যার অস্তিত্বের যুক্তি তাঁর মধ্যেই নিহিত। তাহলেও উপরের অভিযোগ টেকে না। কেননা, ঈশ্বরের পরোক্ষ জ্ঞানের ক্ষেত্রে তর্কের আশ্রয় গ্রহণ করা হয়। ভাল করে বিচার করে দেখলে তা ঈশ্বরের নিজের প্রকৃতির মধ্যেই নিহিত। ধর্মদর্শন ঈশ্বরের প্রকৃতি ও সত্তা সম্পর্কে কোন সান্ত ব্যক্তির চিন্তন বা যুক্তিতর্ক নয়, বরং ধর্মের মধ্যে এবং ধর্মীয় অনুভূতি ও ক্রিয়ার মধ্যে যে প্রক্রিয়া প্রচ্ছন্ন হয়ে আছে তার সচেতন বিকাশ, অর্থাৎ সেই প্রক্রিয়া যে প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে সান্ত তার সান্তত্বকে বিসর্জন দিয়ে অনন্তের মধ্যেই তার যথার্থ সত্তাকে খুঁজে পায়। ঈশ্বর তার সত্তার অপরিচিত কোন বিষয়ের দ্বারা জ্ঞেয় হন না বা প্রমাণিত হন না। তিনি চিন্তাতে এবং চিন্তার কাছে প্রকাশিত হন। ঈশ্বর সম্পর্কে সব চিন্তনই ঐশ্বরিক চিন্তন। কাজেই বৌদ্ধিক বা ভাবনাত্মক চিন্তন একদিক

থেকে ঈশ্বর সম্পর্কে মানুষের জ্ঞান, অপর দিক থেকে ঈশ্বরের নিজের সম্পর্কেই জ্ঞান (God's knowledge of Himself)। স্বজ্ঞাবাদীরা মনে করেন, ঐশ্বরিক জ্ঞান লাভের জন্য স্বজ্ঞা বা প্রত্যক্ষ অনুভূতিই একমাত্র মাধ্যম। তাঁদের মতে স্বজ্ঞাই সবচেয়ে সুনিশ্চিত জ্ঞান দিতে পারে, কেননা মনের সঙ্গে যখন ঈশ্বরের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ প্রতিষ্ঠিত হয় তখন মন যে সুনিশ্চিত জ্ঞান লাভ করে, তার থেকে অধিক সুনিশ্চিত জ্ঞান আর কি হতে পারে?

স্বজ্ঞাই সুনিশ্চিত জ্ঞান দিতে পারে

স্বজ্ঞাবাদীদের দাবী সম্পর্কে নিম্নলিখিত মন্তব্যগুলি করা যেতে পারে। ধর্মসম্বন্ধীয় জ্ঞান প্রত্যক্ষ বা স্বজ্ঞামূলক—স্বজ্ঞাবাদীদের এই সিদ্ধান্তের অন্তর্নিহিত তাৎপর্য যদি এই হয় যে, সত্যতাই সত্যতার মানদণ্ড, এবং তারই সত্যতা আছে বলা যেতে পারে, মানুষের চেতনার কাছে যার আবেদন রয়েছে, অর্থাৎ যা সত্য তা চেতনার দ্বারা অবশ্যই অনুমোদিত হওয়া দরকার, স্বজ্ঞাবাদীদের এই বক্তব্য দর্শনও স্বীকার করে নেবে। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে দার্শনিক বা বিচারমূলক চিন্তন, প্রত্যক্ষ বা স্বজ্ঞামূলক জ্ঞানের বিরোধী এবং ধর্মের ক্ষেত্রে স্বজ্ঞাই সত্যতার একমাত্র মাপকাঠি। স্বজ্ঞার নামে যে কোন আবেগ বা ধারণাকেই, যার হয়ত কোন যুক্তিযুক্ত ব্যাখ্যা মানুষ দিতে পারে না, পরম সত্য বলে গ্রহণ করা যায় না। প্রত্যক্ষ অনুভূতি কোন প্রমাণ নয় যে, আমরা জ্ঞানের কোন মৌলিক উপাদানের সন্ধান পেয়েছি এবং সন্ধান পেয়ে থাকলেও প্রত্যক্ষ অনুভূতির যে নিশ্চয়তা তাহল অভিজ্ঞতামূলক (empiric l), এবং সেহেতু নিশ্চয়তার কোন ভিত্তি নয়। যা বিশেষ এবং আকস্মিক, প্রত্যক্ষ জ্ঞান তাই দিতে পারে, কোন বস্তুগত এবং আবশ্যিক সত্য দিতে পারে না। প্রত্যক্ষ জ্ঞান নিজেই নিজের সত্যতার মাপকাঠি—এই সিদ্ধান্ত গ্রহণযোগ্য নয়। কাজেই স্বজ্ঞা নয়, কোন উচ্চতর নীতিই সত্যতার মানদণ্ড এবং তাহল বিচারবুদ্ধির বস্তুগত প্রামাণ্য। সংবেদনবাদ বা অভিজ্ঞতাবাদ ভ্রান্ত মতবাদ হতে পারে কিন্তু তার একমাত্র বিকল্প স্বজ্ঞাবাদ নয়।

স্বজ্ঞাবাদীদের দাবীর বিচার

সত্যতার মানদণ্ড বিচারবুদ্ধি

(গ) ধর্ম সম্বন্ধীয় জ্ঞান প্রত্যাদিষ্ট, কাজেই বিজ্ঞান বা দর্শনের আলোচনার বহির্ভূত, সুতরাং ধর্মের বিজ্ঞানসম্মত আলোচনা বা ধর্মদর্শন সম্ভব নয়।

কেউ কেউ মনে করেন যে, ধর্মসম্বন্ধীয় জ্ঞানের ভিত্তি হল কোন ঐশ্বরিক প্রত্যাদেশ (divine revelation) এবং এই প্রত্যাদেশ বিচারবুদ্ধি-বিরুদ্ধ। তাহলে প্রশ্ন দেখা দেয় যে, ধর্মের কোন বিজ্ঞানসম্মত আলোচনা বা ধর্মদর্শন সম্ভব কী?

(১) এর উত্তরে বলা যেতে পারে যে, প্রত্যাদেশ (revelation) এবং বিচারবুদ্ধি যদি পরস্পরের বিরুদ্ধ হয়, উভয়ের সম্পর্ক যদি এমন হয় যে প্রত্যাদেশ যা ব্যক্ত করে বিচারবুদ্ধি তাকে অস্বীকার করে, বা বিচারবুদ্ধি যা বলে প্রত্যাদেশ তাকে অগ্রাহ্য করে, তাহলে ধর্মের ব্যাপারে দর্শনের আলোচনা কখনও সম্ভব হত না। কিন্তু বিচারবুদ্ধি ও প্রত্যাদেশের মধ্যে এই জাতীয় বিরোধের সম্পর্ককে কখনও স্বীকার করে নেওয়া হয়নি। কেউ যখন বলে এটা অসঙ্গত বা এটা অসম্ভব, তখন পরোক্ষভাবে কোন চরম মানদণ্ডকে স্বীকার করে নেওয়া হয়, যার দ্বারা সত্যতা ও সম্ভাব্যতার বিচার করা হয়। ধর্মবিশ্বাস এবং বিচার-বুদ্ধি নিজেদের একমাত্র প্রামাণ্য মনে করে কখনই মনে পাশাপাশি বিরাজ করতে পারে না। যদি তাই করে তাহলে কে প্রামাণ্য, তার বিচারের জন্য কোন উচ্চতর কর্তৃপক্ষের উপরে মীমাংসার দায়িত্ব অর্পণ করতে হয়, তা না হলে চিন্তন বা জ্ঞান অর্থহীন হয়ে পড়ে। প্রথমতঃ, কোন অলৌকিক প্রত্যাদেশকে স্বীকার করার ব্যাপারে, আমাদের তার বৌদ্ধিক ভিত্তিকে (rational ground) সন্ধান করতেই হবে; প্রত্যাদেশকে তার প্রামাণ্যের দাবীকে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। কিন্তু প্রত্যাদেশ যদি যুক্তির দ্বারা তার দাবীকে প্রতিষ্ঠিত বা প্রমাণ করতে চায়, তাহলে তাকে বৌদ্ধিক বলে স্বীকার করতেই হবে। বিচারবুদ্ধির সাহায্যে বিচারবুদ্ধির অযৌক্তিকতা প্রতিষ্ঠা করার প্রচেষ্টা আত্মবিরোধিতা দোষে দুষ্ট। দ্বিতীয়তঃ, কোন বাইরের কর্তৃপক্ষের তুলনায় বিচারবুদ্ধি আমাদের অনেক কাছের বস্তু এবং কোন বাহ্য প্রমাণ এর প্রামাণ্যকে নস্যাৎ করে দিতে পারে না।

প্রত্যাদেশ ও বিচারবুদ্ধি পরস্পরের বিরুদ্ধ নয়

প্রত্যাদেশের বৌদ্ধিক ভিত্তিকে জানা প্রয়োজন

(২) প্রত্যাদেশ বিচারবুদ্ধির অতীত নয়। কিন্তু কেউ কেউ, বিশেষ করে দার্শনিক লাইবনিজের সময় থেকে যাজকীয় লেখকবৃন্দ (ecclesiastical writers) মনে করেন যে, প্রত্যাদেশের বিষয়বস্তু বিচারবুদ্ধির বিরোধী না হলেও, বিচারবুদ্ধির অতীত (above reason)। প্রত্যাদেশ এমন কিছু ব্যক্ত করতে পারে যা বিচারবুদ্ধিকে অতিক্রম করে যায়। কোন প্রত্যাদেশ হয়ত ঐশ্বরিক রহস্যের কথা ব্যক্ত করে যা মানুষের বিচারবুদ্ধির অধিগম্য নয়, কিন্তু যেহেতু পরিচিত সত্যের সঙ্গে অসঙ্গতিপূর্ণ নয় সেহেতু উপযুক্ত প্রামাণ্যের বলে গ্রহণযোগ্য। সান্ত বিচাবুদ্ধি এদের উপলব্ধি করতে পারে না, কিন্তু এদের অস্বীকার করতেও পারে না এবং কোন প্রামাণ্যের ভিত্তিতে এইগুলি ব্যক্ত হলে সান্ত বিচারবুদ্ধির পক্ষে এদের বিশ্বাস করাই যুক্তিযুক্ত। বিচারবুদ্ধির বিরোধী নয়

প্রত্যাদেশ বিচারবুদ্ধি-ঊর্ধ্ব নয়

বলে মানুষের বিচারবুদ্ধি তাদের গ্রহণ করতে পারে। কিন্তু যেহেতু বিচারবুদ্ধির অতীত, সেইহেতু এদের প্রামাণ্য বিচার করে দেখার কোন অধিকার দর্শনের নেই।

এখন এই বিচারবুদ্ধির অতীত (above reason) বলতে কি বোঝায়, পরীক্ষা করে দেখা যাক: বিচারবুদ্ধির অতীত বলতে বোঝায় যে সাধারণ মানুষের বিচারবুদ্ধির অধিগম্য তারা নয়, আমাদের বিচারবুদ্ধির তুলনায় কোন উচ্চতর বিচারবুদ্ধির অধিগম্য। এর অর্থ বিচারবুদ্ধিকে অস্বীকার না করে তাকে নিম্নতর ও উচ্চতর দুটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা।

উপরিউক্ত অভিমতের বিচার

কিন্তু বিচারবুদ্ধির এই শ্রেণীবিভাগ সমর্থনযোগ্য নয়; কারণ উচ্চতর ও নিম্নতর বিচারবুদ্ধির মধ্যে কোন সীমারেখা টানা সম্ভব নয়। কোন সীমা সম্পর্কে সচেতন হওয়ার অর্থই সীমাকে অতিক্রম করে যাওয়া (to know a limit would be to transcend that limit)।

কাজেই যাকে বিচারবুদ্ধির অতীত বলা হচ্ছে, দেখা যাচ্ছে তাহলে আসলে বিচারবুদ্ধির বিরোধী (contray to reason)। কেননা যা জ্ঞেয়, তা আমাদের বর্তমান জ্ঞানের অতীত হলেও, তাকে আমরা বিচারবুদ্ধির বিরোধী বলি না। কিন্তু যা বিচারবুদ্ধির সম্পূর্ণ অতীত, যাকে মানুষের বিচারবুদ্ধি কখনও জানতে পারে না, তাকে বিচারবুদ্ধির বিরোধী বলতে হয় এবং তার অর্থ হল, অর্থহীন কিছুকে জানার প্রচেষ্টা।

এটা খুবই সত্যি কথা যে, অনেক মহান সত্যই আমাদের কাছে অপরোক্ষ অনুভূতি বা প্রত্যক্ষের রূপ নিয়ে উপস্থিত হয়। যদি একেই আমরা প্রত্যাদেশ বলে অভিহিত করতে চাই, তাতে আপত্তি করার কিছু থাকতে পারে না। কিন্তু এই প্রত্যাদেশকে যদি অভ্রান্ত হতে হয় তাহলে তার মধ্যে বুদ্ধি অবশ্যই প্রচ্ছন্ন থাকবে, যাতে বিচারবুদ্ধি নিছক সংবেদন থেকে এই প্রত্যাদেশকে পৃথক কর'ত পাবে। বিচারবুদ্ধির কাছে যা পুরোপুরি দুর্জ্ঞেয়, তা বিশ্বাসের পক্ষে বোধগম্য হতে পারে না। প্রত্যাদেশের উপাদানের মধ্যে বুদ্ধি প্রচ্ছন্ন থাকে বলেই, প্রত্যাদেশের স্বতঃপ্রামাণ্য আছে বা প্রত্যাদেশ মানুষের উপর নৈতিক প্রভাব বিস্তার করতে পারে। প্রত্যাদেশের উপাদানগুলিকে যদি বিচারবুদ্ধির অতিবর্তী মনে করা না হয় তাহলেই মানুষের বিচারবুদ্ধি তাকে পরীক্ষা করে তার যাথার্থ্য বিচার করে দেখতে পারে, জ্ঞানের অন্য উপাদানের সঙ্গে তার সম্পর্ক নির্ধারণ করতে পারে; সংক্ষেপে তাদের দার্শনিক জ্ঞানের রূপ দিতে পারে।

প্রত্যাদেশের মধ্যে বুদ্ধি অবশ্যই প্রচ্ছন্ন থাকা প্রয়োজন

ষষ্ঠ অধ্যায়

ধর্মের প্রয়োজনীয়তা
(Necessity of Religion)

মানুষের জীবনে ধর্মের প্রয়োজনীয়তা আছে, একথা বলতে আমরা কি বুঝি? ধর্ম কি অর্থে ব্যক্তির জীবনে প্রয়োজনীয়? ধর্মের প্রয়োজনীয়তা বলতে কি একথা বোঝায় যে, প্রতিটি ব্যক্তিকে ধর্মপরায়ণ হতে হবে? ধর্মের প্রয়োজনীয়তাকে প্রমাণ করতে গিয়ে আমাদের কি প্রমাণ করার প্রয়োজন আছে যে, ধর্মপরায়ণ নয় এমন ব্যক্তির অস্তিত্ব নেই? তা কিন্তু নয়। ধর্মের প্রয়োজনীয়তা নৈতিকতার প্রয়োজনীয়তার (necessity of morality) অনুরূপ। আমরা যেমন নৈতিকতার প্রয়োজনীয়তার কথা বলি, অনুরূপ প্রয়োজনীয়তার কথা আমরা ধর্মের বেলাতেও বলে থাকি। নৈতিকতা যে মৌলিক নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত সেইগুলি ব্যক্তির খেয়ালখুশী থেকে উদ্ভূত নয়, মানুষের বিচার-বুদ্ধি থেকেই তারা উদ্ভূত এবং ঐ নীতিগুলির স্বীকৃতি ও উপলব্ধির মধ্য দিয়েই প্রতিটি ব্যক্তি তার নিজের স্বরূপ বা প্রকৃতিকে উপলব্ধি করে। অনুরূপভাবে বলা যেতে পারে যে, ধর্মের প্রয়োজনীয়তাও নিহিত রয়েছে বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তির প্রকৃতির মধ্যে। তবে ব্যক্তি তার খেয়ালখুশীর জন্য তার প্রকৃতির মধ্যে সুপ্ত এই ধর্মীয় চেতনাকে পরিপূর্ণভাবে বিকশিত নাও করতে পারে।

ধর্মের মূল মানুষের প্রকৃতিতে

ধর্মের প্রয়োজনীয়তা নিরূপণ করতে গিয়ে আমাদের প্রমাণ করবার দরকার নেই যে, সব যুগের বা সকল সম্প্রদায়ের ধর্ম সম্বন্ধীয় ধারণাগুলি একই ধরনের। কিংবা এমন কথাও প্রমাণ করার দরকার নেই যে, সব লোকে, বা সব যুগের লোক ধর্মসম্পর্কীয় যে ধারণাগুলি সম্পর্কে একমত, সেইগুলিই ধর্মের প্রয়োজনীয়তা সূচিত করে। এই প্রসঙ্গে এটাও আমাদের খেয়াল রাখতে হবে যে, যে বিশেষ বিশেষ বৈশিষ্ট্য বিভিন্ন ধর্মকে পরস্পরের থেকে পৃথক করে, সেইগুলিকে বর্জন করে, যেসব ধর্মসম্বন্ধীয় ধারণা ও বিশ্বাস বিভিন্ন ধর্মের সার্বিক উপাদান (universal elements), সেইগুলিকে একত্রিত করলেই ধর্মের প্রয়োজনের কারণটি আবিষ্কার করা সম্ভব হবে না।

ধর্মের প্রয়োজনীয়তা নিরূপণের উপায়

আসলে ধর্মের যেগুলি সার্বিক উপাদান, যেগুলি সর্বতোভাবে এবং নিরপেক্ষভাবে সত্য, সেইগুলি মানুষের বুদ্ধির অগ্রগতির অনেক পরবর্তী স্তরে এবং সীমিত সংখ্যক

ব্যক্তির কাছেই ধরা পড়েছে। আসল কথা যখন কোন কিছুর ক্রমবিকাশের কথা বলা হয়, যখন কোন কিছু ক্রমিক বিবর্তনের মাধ্যমে তার পরিপূর্ণ অবস্থা প্রাপ্ত হয়, তখন সেই বস্তুর যথাযথ ধারণা তার নিম্নতম, উচ্চতম এবং অন্তর্বর্তী স্তরের সাধারণ উপাদানের মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায় না। ধর্ম সম্পর্কেও এই কথা সত্য। যদি ধর্মের জৈবিক ক্রমবিকাশের কথা বলি, তাহলে ধর্মের এমন এক প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করা যেতে পারে যা ধর্মের নিম্নতম এবং উচ্চতম উভয় প্রকার ধর্ম সম্পর্কে প্রযোজ্য। নিম্নতম ধর্মের মধ্যে এমন কিছু নিহিত আছে যা ধর্মের পরিপূর্ণ রূপের ধারণা থেকে বর্জন করা যায় না। অর্থাৎ এমন কিছু, ধর্মের পরিপূর্ণ রূপ যাকে অবশ্য স্বীকার্য সত্য রূপে স্বীকার করে নেয়। ধর্মের যেটি উন্নততম রূপ, সেটি ধর্মের নিম্নতম রূপটিকে অতিক্রম করে গেলেও তার মধ্যে যা কিছু যথার্থ ও মূল্যবান, তাকে অবশ্যই অন্তর্ভুক্ত করে নেয়।

বস্তুতঃ জগতের বিভিন্ন ধর্মের অভিজ্ঞতামূলক আলোচনা বা তাদের ঐতিহাসিক ক্রম ও সম্বন্ধের আলোচনার মাধ্যমে ধর্মের সঠিক উপাদানকে আবিষ্কার করা যায় না। তাকে লাভ করতে হলে ধর্মের ঐতিহাসিক রূপকে অতিক্রম করে যেতে হবে। বিভিন্ন ঐতিহাসিক রূপের আড়ালে যে ধারণা তার পরিপূর্ণ উপলব্ধির পথে ক্রমশঃ অগ্রসর হচ্ছে, যা অগ্রগতির প্রতিটি স্তরে পূর্বতমকে বর্জন করছে না, তাকে রূপান্তরিত করে নিচ্ছে এবং অতীতকে সম্পূর্ণভাবে বর্জন না করে, তাকে পরিবর্তিত করে নিয়ে নিজের মধ্যে স্থান দিচ্ছে, তাকে জানতে হবে। কাজেই ধর্মের পরিপূর্ণ রূপটি যেমন অপরিপূর্ণ ধর্মের তাৎপর্যকে ব্যাখ্যা করতে সক্ষম হবে তেমনিই তাকে অতিক্রম করে যাবে এবং অতিক্রম করতে গিয়ে তাকে নাকচ করে দেবে।

ধর্মের সঠিক উপাদানকে জানার উপায়

কাজেই ধর্মের প্রয়োজনীয়তা নির্দেশ করতে গিয়ে আমাদের দেখতে হবে যে যা কিছু সীমিত ও আপেক্ষিক (finite and relative) ধর্ম তাকে অতিক্রম করে যায় এবং ধর্ম সান্ত আত্মার বা জীবাত্মার সঙ্গে পরমাত্মার সংযোগ প্রতিষ্ঠা করে এবং এই বিষয়টি মানুষের প্রকৃতির মধ্যেই নিহিত। ধর্মের প্রয়োজনীয়তা নিরূপণ করতে গিয়ে আমাদের দেখতে হবে যে সান্ত আত্মাকে অসীমের জ্ঞান লাভ করতেই হবে এবং এই অনিবার্যতা তার প্রকৃতির মধ্যেই নিহিত। পরমাত্মার জ্ঞান লাভ করা জীবাত্মার পক্ষে শুধুমাত্র ঐচ্ছিক ব্যাপার নয়, খেয়ালখুশীর ব্যাপার নয়। জীবাত্মার প্রকৃতি বা স্বরূপই এমন যে তাকে পরমাত্মার জ্ঞান লাভ করতেই হবে। ঈশ্বরের জ্ঞান ছাড়া চিন্তনের পক্ষে চিন্তন

ধর্ম সান্তকে অতিক্রম করে যায়

হওয়াই সম্ভব নয়। সান্তর জ্ঞানই একমাত্র জ্ঞান, অসীমের জ্ঞান নিছক ভ্রান্তি—এই ধারণা বর্জন করে আমাদের দেখাতে হবে, সান্তব জ্ঞান যেহেতু সীমিত সেহেতু ভ্রান্ত এবং সব যথার্থ জ্ঞানের মধ্যেই সর্বনিরপেক্ষ বা অসীমের উপাদান বর্তমান, যাকে বাদ দিলে আমাদের সীমিত জ্ঞানের এবং অভিজ্ঞতার সমগ্র সংগঠনটিই অবিন্যস্ত, অসামঞ্জস্যপূর্ণ ও অর্থহীন মনে হবে।

জড়বাদ ধর্মকে অস্বীকার করতে চায়

একটি বিশেষ মতবাদ ধর্মের এই প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করতে চায়। সেটি হল জড়বাদ। অচেতন জড় এবং যান্ত্রিক কার্যকারণ সম্পর্কের সাহায্যে জড়বাদ সব কিছুকে ব্যাখ্যা করতে চায়। জড়বাদ যদি তার এই প্রচেষ্টায় সাফল্য লাভ করতে পারে তাহলে নিঃসন্দেহে ঈশ্বরের সাহায্যে কোন কিছুর ব্যাখ্যা দেবার প্রশ্ন আসে না। ঈশ্বরের সঙ্গে সান্ত জীবনের সম্বন্ধের পরিপ্রেক্ষিতেও কোন কিছুর ব্যাখ্যা হয়ে পড়ে অপ্রয়োজনীয়। সোজা কথায়, ধর্মের প্রয়োজনীয়তা বলে কিছু থাকে না। কেননা, ধর্মের প্রয়োজনীয়তা বলতে আমরা বুঝি বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন আত্মসচেতন সত্তা হিসেবে ব্যক্তির প্রকৃতির মধ্যে এমন কিছু নিহিত আছে যা তাকে জড় ও সান্তকে অতিক্রম করে, এক অসীম সর্বব্যাপক পরমাত্মার মধ্যে আশ্রয় খুঁজে নিতে প্রণোদিত করে। কিন্তু জড়বাদ মতবাদ হিসেবে যথার্থ হলে এই সব কিছুই হয়ে পড়ে অলীক ও অর্থহীন।

জড়বাদের ত্রুটি

[1]কিন্তু জড়বাদ সন্তোষজনক মতবাদ নয়। জড়বাদের দুটি প্রধান ত্রুটির উল্লেখ করে মতবাদ হিসেবে এর অসার্থকতা প্রতিপন্ন করা যেতে পারে। প্রথমতঃ, জড়ই মৌলিক বিষয়, এবং মন জড় থেকে উৎপন্ন এরকম সিদ্ধান্ত করার মানেই হল মনকে জড়ের পূর্ববর্তী বলে স্বীকার করে নেওয়া, কেননা জড় বা পরমাণু থেকে মনকে নিঃসৃত করতে গেলে পরমাণুকে অবশ্যই চিন্তার বিষয় হতে হবে এবং চিন্তনই মনের অস্তিত্ব সূচিত করে। কাজেই পরমাণুর কথা চিন্তা করতে গিয়ে কেউ যদি বলেন মন পরমাণুজাত, তাহলে এই হবে, যাকে প্রমাণ করতে হবে তাকে পূর্ব থেকে স্বীকার করে নেওয়া। পরমাণুর কথা চিন্তা করতে গেলেই ত মনের অস্তিত্ব স্বীকার করে নিতে হয়। কাজেই মন কিভাবে পরমাণু থেকে উদ্ভূত হতে পারে? দ্বিতীয়তঃ, জড়বাদ প্রাণ ও মনের সন্তোষজনক ব্যাখ্যা দিতে পারে না।

যেহেতু জড়বাদ সন্তোষজনক মতবাদ নয়, আমরা এবার বিচার করে দেখতে পারি

1. পরে এই সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে

যে মানুষের সেই আভ্যন্তরীণ বা বৌদ্ধিক অনিবার্যতা কি যা মানুষের মনকে ধর্মপরায়ণ হতে বাধ্য করে, অর্থাৎ মানুষ কেন ধর্মের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করতে বাধ্য।

মন জড়ের দ্বারা উৎপন্ন নয় বা মন জড়ের পূর্ববর্তী শুধু এইটুকু প্রমাণিত হলেই যে ধর্মের প্রয়োজনীয়তা প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেল তা নয়। চিন্তন বা মনের পূর্ববর্তিতা পরমাত্মার পূর্ববর্তিতা সূচিত করে না বা পরমাত্মার সঙ্গে জীবাত্মার সংযোগের আবশ্যিকতা, যা ধর্ম নির্দেশ করে, তাও সূচনা করে না। ধর্মের প্রয়োজনীয়তার জন্য যে বিষয় প্রমাণ করা দরকার তাহল জীবাত্মা তার সান্তত্বকে অতিক্রম করে বহু ঊর্ধ্বে বিচরণ করতে পারে এবং মনের এই ঊর্ধ্বগতি যা ধর্মের মূল কথা, মনের প্রকৃতিতেই নিহিত। মনের অস্তিত্বের জন্যই তার এই ঊর্ধ্বগতি অর্থাৎ যা সান্ত তাকে অতিক্রম করে যাওয়ার প্রয়োজন আছে। চিন্তন সব কিছুর পরবর্তী, এইটুকু দেখাতে পারলেই যথেষ্ট হবে না। আমাদের আরও দেখাতে হবে যে, এই চিন্তন কোন ব্যক্তিবিশেষের চিন্তন বা সান্ত চিন্তন (finite thought) নয়—এ হল এক সার্বিক সর্বনিরপেক্ষ চিন্তন (a thought which is universal and absolute)। মনের ধর্মই হল এই যে তাকে তার গন্তব্যস্থল অর্থাৎ ঐ সার্বিক ও সর্বনিরপেক্ষ চিন্তনে উপনীত হতে হবে—এ হল এমন এক চিন্তন যা সব সান্ত চিন্তনের ও সত্তার (thought and being) ভিত্তিস্বরূপ। ধর্মের প্রয়োজনীয়তা প্রমাণ করার জন্য এই বিষয়টিই প্রমাণ করতে হবে।

সান্তকে অতিক্রম করে যাওয়ার প্রবণতা মনের প্রকৃতিতেই নিহিত

আধ্যাত্মিক আত্মসচেতন সত্তার ধারণার (notion of a spiritual, self-conscious being) মধ্যেই প্রচ্ছন্ন রয়েছে অসীমত্ব বা অনন্তত্ব। আমরা যে বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন আধ্যাত্মিক সত্তা, এই কারণেই আমরা আমাদের সঙ্কীর্ণ ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের গণ্ডীকে অতিক্রম করতে পারি এবং আমাদের অতিক্রম করে যে অসীম সত্তা রয়েছে তার মধ্যে নিজেদের আবিষ্কার করতে পারি। জড় প্রকৃতির পক্ষে তার সীমাকে অতিক্রম করার ক্ষমতা নেই। আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় মন জড় প্রকৃতির মতনই সীমার অধীন। ব্যক্তির চারপাশের জগৎ তার উপর এমন কতকগুলি শর্ত আরোপ করছে যেগুলি তার নিয়ন্ত্রণের বাইরে। কিন্তু মানুষের আধ্যাত্মিক প্রকৃতির গভীরে প্রবেশ করলে দেখা যাবে যে, তার এমন এক বৈশিষ্ট্য রয়েছে যা প্রকৃতির সান্তত্ব থেকে পৃথক।

মানুষের মধ্যেই অনন্তত্ব প্রচ্ছন্ন আছে

আধ্যাত্মিক প্রকৃতির ধর্মই হল যা তাকে অতিক্রম করে রয়েছে তাকে উপলব্ধি করা। আধ্যাত্মিক বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন সত্তার বৈশিষ্ট্যই হল এই যে, তাকে তার

ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের সীমার মধ্যে আবদ্ধ রাখা যায় না। সেই বাহ্যজগৎ, প্রকৃতির এবং অন্যান্য আধ্যাত্মিক জীবের জীবনের অংশীদার। বস্তুতঃ তাদের জীবনের অংশীদার হওয়ার মধ্যেই তার জীবনের মূল্য নিহিত। যখন আমরা আমাদের জ্ঞানের উৎপত্তি এবং স্বরূপ সম্পর্কে গভীরভাবে পরীক্ষা করে দেখি, তখন মন ও তার থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র যে বাহ্যজগৎ বা জড়—এই উভয়ের ব্যবধানকে স্বীকার করে নেওয়া যায় না। প্রকৃতি সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান, মন এবং জড়ের সব ব্যবধানকে অস্বীকার করে এবং বাহ্য জগতের সব বস্তু এবং ঘটনার মধ্যে এমন এক সত্তা এবং প্রাণ আবিষ্কার করে যা বিশেষ করে আমাদের সমধর্মী।

মানুষ তার সান্তত্বকে অতিক্রম করতে পারে

আমরা প্রকৃতির মধ্যে নিজেদেরই দেখি। যাদের আমরা প্রাকৃতিক নিয়ম বলে অভিহিত করি, যে নিয়মগুলি বিশেষ বিশেষ বস্তু বা ঘটনাকে একত্র যুক্ত করে শৃঙ্খলা, সামঞ্জস্য ও সংহতি রচনা করে সেইগুলি মনের অপরিচিত কিছু নয়, সেইগুলি চিন্তনেরই বিষয়। বৌদ্ধিক সম্বন্ধ (rational relations) বিচারবুদ্ধির নিজেরই সম্পদ।

জাগতিক নিয়ম মনেরই সম্পদ

ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দেখলে মনে হয়, যেসব সামাজিক প্রতিষ্ঠানের মধ্যে আমরা বসবাস করি সেইগুলির প্রতিটিই আমাদের স্বাধীনতাকে সীমিত করে। কিন্তু এক উন্নততর দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বিচার করলে এই সব সামাজিক প্রতিষ্ঠান আমাদের ব্যক্তিগত জীবনের সঙ্কীর্ণতা, ক্ষুদ্রতা এবং নিঃস্বতা থেকে অতিক্রান্ত হয়ে একটা বৃহত্তর অথচ একান্ত করে আমাদেরই জীবনে উত্তীর্ণ হবার সুযোগ দেয়। আমাদের স্বরূপকে পরিপূর্ণভাবে উপলব্ধি করতে হলে আমাদের নিজেদেরই অতিক্রম করে যেতে হবে।

আমরা ব্যক্তি সত্তার সীমাকে ক্রমশঃ অতিক্রম করতে করতে অনন্ত এবং সার্বভৌম জীবনের অংশীদার হতে থাকি। এই প্রক্রিয়া কখনও সম্পূর্ণ হয় না। যতই সীমাকে অতিক্রম করা যায়, ততই নতুন করে সীমার আবির্ভাব ঘটতে থাকে। বাস্তবের এবং আদর্শের, ব্যক্তিগত ও সার্বিক জীবনের ঐক্যে আমরা কখনও উপনীত হতে পারি না। আমরা যতই লক্ষ্যের অন্বেষণে অগ্রসর হতে থাকি এই লক্ষ্য ততই পেছনে সরে যেতে থাকে। যা আমরা নই, অথচ যা আমাদের পক্ষে হওয়া সম্ভব, তা হবার জন্যই আমরা চেষ্টা করছি। আধ্যাত্মিক সত্তা হিসেবে, যাতে আমাদের যথার্থ উত্তরাধিকার, আমরা কখনও তার পূর্ণ অধিকারী হতে পারছি না। আবার আর একদিক থেকে আমরা তার অধিকারী। যেহেতু এটা যে আমাদের উত্তরাধিকার সেটা আমরা জানি এবং অনুভব করি। আমাদের কাছে অসীমতা বা অনন্তের সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধের প্রত্যাদেশ হয়েছে। আদর্শ ও বাস্তব, প্রত্যাদেশ ও অভিজ্ঞতার পার্থক্য চিন্তনই করে

থাকে এবং সেইহেতু চিন্তন তাকে অতিক্রম করে যেতে পারে—বস্তুতঃ এই পার্থক্য করতে গিয়ে চিন্তন তাকে অতিক্রম করে গেছে। আমাদের বৌদ্ধিক বা নৈতিক জীবনে আমাদের বাস্তব আত্মা এবং আমাদের আকাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য এই দুইয়ের মধ্যে পার্থক্য করা সম্ভব হয়, কারণ ঐ লক্ষ্যের সঙ্গে আমাদের যে সম্বন্ধ আছে সেই সম্পর্কে প্রচ্ছন্নভাবে সচেতন এবং উভয়ের এই পার্থক্যই ভেদের ঊর্ধ্বে যে অভেদ (identity) বর্তমান তাকে স্বীকার করে নেয়।

আমরা লক্ষ্য সম্পর্কে প্রচ্ছন্নভাবে সচেতন

কোন সীমা সম্পর্কে জ্ঞান নির্দেশ করে যে আমরা ঐ সীমাকে অতিক্রম করতে পারি। পূর্ণতার মানদণ্ড সম্পর্কে চেতনা আমাদের মধ্যে প্রচ্ছন্ন হয়ে আছে বলেই আমরা নিজেদের অপূর্ণতা সম্পর্কে সচেতন হতে পারি। ঈশ্বর সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান, আধ্যাত্মিক সত্তা হিসেবে তাঁর সঙ্গে আমাদের সম্পর্কই আমাদের আংশিক জ্ঞানকে বাস্তবতা দান করে এবং এই জ্ঞান যে আংশিক সেই সম্পর্কে আমাদের অবহিত করে।[1]

সীমার জ্ঞান অসীমতার জ্ঞান নির্দেশ করে

জ্ঞানের একটা চরম মানদণ্ড (absolute criterion of knowledge) আছে যার সাহায্যে ব্যক্তিগত জ্ঞানের নিশ্চয়তা পরিমাপ করা হয়, এমন পরম সত্য আছে যা নিশ্চয়তার পরম ভিত্তি। আমার ব্যক্তিগত চিন্তন ভুল করতে পারে কিন্তু পরম চিন্তন বা ধী'কে সন্দেহ করা চলে না। কাজেই নিশ্চয়ই কোন পরমাত্মার অস্তিত্ব আছে যা এই পরম সত্যকে জানে এবং যার সত্তায় বিশ্বাস করতেই হবে। আমাদের সংশয় ও অনিশ্চয়তার জ্ঞান প্রমাণ করে যে, একটা চরম মানদণ্ড সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান আছে যার সঙ্গে তুলনা করে আমাদের এই সংশয়গুলিকে সংশয় বলে বুঝতে পারি। এই চরম মানদণ্ডকে আর সংশয় করা চলে না।

চরম সংশয়বাদকে স্বীকার করা চলে না। কারণ চরম সংশয়বাদ অন্ততঃপক্ষে এই সত্য প্রকাশ করে যে, সত্যতা বলে কিছু নেই, সব সত্যই আপেক্ষিক। সান্ত চিন্তনের অস্তিত্বকে পরিমাপ করার জন্য, তার ভিত্তি হিসেবে কোন পরম বুদ্ধি বা পরম চেতনাকে স্বীকার করে নিতেই হয়, যাকে পূর্ব থেকে স্বীকার করে না নিলে কোন অভিজ্ঞতা সম্ভব হয় না। যখন সংশয়বাদীরা বলে যে চরম জ্ঞান সান্ত মানুষের

1. হয়ত এমন কথা বলা যেতে পারে যে, আমার সসীমত্ব বা সান্তত্ব সম্পর্কে চেতন হবার জন্য কোন সর্বনিরপেক্ষ অনন্ত সত্তার চেতনার অস্তিত্ব স্বীকার করে নেওয়ার প্রয়োজন নেই ; যা আমার থেকেও কম সীমিত তার জ্ঞানই আমার মধ্যে আমার সান্তত্বের জ্ঞান জাগাবার পক্ষে যথেষ্ট। কিন্তু এর উত্তরে বলা যেতে পারে যে, চরম পূর্ণতা থেকে কম, এমন কোন মানদণ্ডকে স্বীকার করে নেওয়া যেতে পারে না। কারণ আমি যতই অগ্রসর হতে থাকি না কেন, আমার চলার প্রতিটি স্তরেই আমি আমার সান্তত্ব সম্পর্কে সচেতন।

পক্ষে লাভ করা সম্ভব নয়, সংশয়বাদীরা মনে মনে চরম জ্ঞানের আদর্শের কথা কল্পনা করে, যার সঙ্গে তুলনা করে মানুষের জ্ঞান যে সীমিত ও ত্রুটিযুক্ত তা উপলব্ধি করা যায়।

সব মানবীয় জ্ঞানই জ্ঞান ও সত্তা, আত্মা ও অনাত্মার ঐক্য সূচিত করে। আত্মা ও অনাত্মা হল 'অন্তর' ও 'বাহির'-এর মতো অনন্যোনিরপেক্ষ (correlative)। আত্মা ও অনাত্মার মধ্যে পার্থক্য করা যেতে পারে কিন্তু তাদের বিভক্ত করা যেতে পারে না। দুটি উপাদান অবিচ্ছেদ্যভাবে সম্বন্ধযুক্ত—এই বিষয়ই প্রমাণ করে যে তাদের উভয়কে জড়িয়ে রয়েছে এক বৃহত্তর ঐক্য। আত্মা ও অনাত্মা, ব্যক্তিমন এবং বাহ্যবস্তুর জগৎ—চিন্তন এদের মধ্যে পার্থক্য করতে পারে। কিন্তু এই পার্থক্য করতে পারাই প্রমাণ করে যে, চিন্তন তাকে অতিক্রম করে যেতে পারে। যখন আমরা চিন্তা করি, তখন বাহ্য জগতের দ্বারা সীমিত আমাদের যে ব্যক্তিগত সত্তা, তার ঊর্ধ্ব এক সত্তাতে আমরা উপনীত হই, যা ব্যক্তি আত্মা ও জগৎ উভয়কেই নিজের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করে নেয়। ব্যক্তিবিশেষ হিসেবে আমরা চিন্তা করি না, একটা সার্বিক চিন্তন বা বুদ্ধির অংশীদার হয়ে আমরা চিন্তা করি। আধ্যাত্মিক জীব হিসেবে এটুকু আমাদের সুবিধে যে আমরা যা কিছু বিচ্ছিন্ন ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যমূলক তার উর্ধ্বে, অর্থাৎ মুহূর্তের অনুভূতির উর্ধ্বে উত্তীর্ণ হতে পারি। কাজেই ব্যক্তিবিশেষ হিসেবে আমাদের সমগ্র চেতন-জীবন এক সার্বিক চেতনা নির্দেশ করে, যে চেতনা চিন্তন ও সত্তার (thought and being) ঐক্যকে পূর্ব থেকে স্বীকার করে না নিয়ে চিন্তাই করতে পারে না।

চেতন-জীবন এক সার্বিক চেতনার অস্তিত্ব নির্দেশ করে

কাজেই আমরা দেখতে পাই যে, আধ্যাত্মিক সত্তা হিসেবে মানুষের প্রকৃতিতে দুটি বিষয় আছে—(১) নিজের সীমিত ব্যক্তি-সত্তাকে অতিক্রম করার সামর্থ্য এবং যা ব্যক্তি-সত্তাকে সীমিত করছে তার মধ্যে নিজেকে আবিষ্কার এবং উপলব্ধি করা এবং (২) চিন্তন ও সত্তার পরম ঐক্য বা এক পরম আত্ম চেতনা, যার উপর সব সীমিত জ্ঞান ও অস্তিত্ব নির্ভরশীল, তার সম্পর্কে প্রচ্ছন্ন বা প্রকট চেতনা।

আধ্যাত্মিক সত্তা হিসেবে মানুষের প্রকৃতিতে দুটি বিষয়

এই দুই নীতির প্রথমটি নির্দেশ করে আমাদের নিজেদের অতিক্রম করে যাবার নিরবচ্ছিন্ন প্রচেষ্টা, দ্বিতীয়টি নির্দেশ করে এক সার্বিক চেতনা বা পরমাত্মার অস্তিত্ব, যা এই অতিক্রমণের বিষয়টিকে অর্থবহ করে তোলে, এবং যার চেতনা রয়েছে মানুষের প্রকৃতির গভীরে। এই হল ধর্মের যথার্থ ভিত্তি।

সপ্তম অধ্যায়

ধর্ম-চেতনা

(Religious Consciousness)

১। ধর্ম-চেতনার স্বরূপ (Nature of Religious Consciousness) :

ব্যক্তি যখন ধর্মপরায়ণ হয় বা ঈশ্বরনিষ্ঠ হয়, তখন তার ধর্মপ্রবণ মানসিক অবস্থার সঙ্গেই ধর্ম-চেতনার সম্পর্ক, অর্থাৎ কিনা, যখন কোন-না-কোন ভাবে ধর্ম-সম্বন্ধীয় চিন্তন আমাদের মনে জাগ্রত হয়, তখন তাকে ধর্ম-চেতনার অবস্থারূপে আখ্যাত করা যেতে পারে। ব্যক্তির ধর্ম-চেতনা আকস্মিক বা অপ্রত্যাশিত কিছু নয়, একে মৌলিক বলেই অভিহিত করা যেতে পারে। কারণ বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন, চিন্তনক্ষমতা-যুক্ত মানুষের স্বরূপের মধ্যেই তার এই ধর্ম-চেতনা নিহিত। ধর্ম-চেতনার মাধ্যমেই ব্যক্তি সার্বিক ও অসীমের সঙ্গে যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা করতে সমর্থ হয়। এই সার্বিক, বস্তুগত অসীম সত্তা হল এক অলৌকিক সত্তা যা সত্য, শিব ও সুন্দরের পরিপূর্ণ রূপ। ধর্ম-চেতনার অবস্থা এক বিশেষ ধরনের মানসিক অবস্থা এবং অতি-বৌদ্ধিক (supra-rational)।

ধর্ম-চেতনার পরিচয়

ধর্মের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে অনেক সময় বলা হয় ধর্ম হল, 'অসীমের সঙ্গে সসীমের বা অনন্তের সঙ্গে সান্তের সংযোগ'। সাধারণতঃ মনে করা হয় অনুভূতির মধ্য দিয়েই ঈশ্বরের সঙ্গে এই সংযোগ সম্ভব হয়। যদিও চিন্তন প্রক্রিয়া আত্মা ও অনাত্মার মধ্যে পার্থক্য সূচিত করে তবু চিন্তনের উন্নত রূপে আত্মা ও অনাত্মার মধ্যে ব্যবধান দূরীভূত হয় এবং সসীমের সঙ্গে অসীমের আধ্যাত্মিক সম্পর্ক অনুভূত হয়।

ব্যক্তির ধর্ম-চেতনার স্বরূপ বা প্রকৃতি নিয়ে বিভিন্ন যুগের চিন্তাবিদ্‌দের মধ্যে মতবিভেদ লক্ষ্য করা যায়। কেউ কেউ মনে করেন ধর্ম-চেতনার স্বরূপ নিহিত অনুভূতিতে (feeling)। কেউ বা মনে করেন চিন্তনে বা জ্ঞানে (thought or knowledge), কেউ বা মনে করেন ক্রিয়াতে (activity), বা পূজা পদ্ধতিতে। কেউ কেউ এমন অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে, ধর্ম-চেতনা হল প্রধানতঃ অনুভূতির (feeling) বিষয়। ধর্ম হৃদয়ের ব্যাপার, মস্তিষ্কের বা চিন্তনের ব্যাপার নয়। এই মতের সমর্থকবৃন্দ মনে করেন যে, ধর্ম হল ঐশ্বরিক স্তরে জীবাত্মার উন্নয়ন এবং অসীমের সঙ্গে সংযোগের অনুভূতির মাধ্যমেই এটা সম্ভব। ধর্ম-চেতনা অনুভূতির ব্যাপার, ধর্ম বোধের (understanding) বা যৌক্তিক চিন্তনের (logical thought) ব্যাপার নয়। বোধ বা যৌক্তিক চিন্তন পদ, বচন, যুক্তি, তর্কবিদ্যা নিরূপিত

ধর্ম-চেতনার স্বরূপ সম্পর্কে মতবিভেদ

ধর্ম চেতনা অনুভূতির বিষয়

সংজ্ঞা, ধারণা, বা সুসংহত মতবাদ নিয়ে আলোচনা করে। কিন্তু বাস্তবে দেখা যায় বিজ্ঞানসম্মত যুক্তি কোন ব্যক্তিকে যে সব সময় ধর্মপরায়ণ করে তোলে তা নয়, কেননা অশিক্ষিত ও জড়বী যাদের কাছে যুক্তিসম্মত চিন্তাধারা বোধগম্য নয়, তারা অনেক সময়ই ধর্মপরায়ণ হয়ে থাকে। এই অভিমতের সমর্থকবৃন্দ আরও মনে করেন যে, ইচ্ছা (will) বা ব্যবহারিক ক্রিয়ার (practical activity) মধ্যেও ধর্ম-চেতনার স্বরূপ নিহিত নয়। গ্যালোয়ে বলেন যে, ক্রিয়া বা অনুষ্ঠান যারা এমনিতে ধর্মীয় নয়, ধর্মীয় অনুভূতির রহস্যময় পরিবেশের সঙ্গে যুক্ত হবার জন্যই ধর্মীয় হয়ে ওঠে এবং এই পরিবেশ ছাড়া উপাসনা যান্ত্রিক এবং সাধারণ স্তরে নেমে যায়। ধর্ম-চেতনার সারবস্তুকে খুঁজে পাওয়া যাবে অন্তরের একটা বিশেষ অবস্থার মধ্যে, অর্থাৎ কিনা মানুষের আবেগময় প্রকৃতির মধ্যে। গ্যালোয়ে বলেন, "ঐশ্বরিক বস্তুর সঙ্গে আত্মীয়তার যে আন্তরিকতা, ধর্মপরায়ণ অন্তরের কাছে যা অতি প্রিয় বিষয়, তা অনুভূতির ক্রিয়ার জন্যই সম্ভব হয় এবং অনুভূতিই ব্যক্তির ধর্মকে ব্যক্তিগত এবং সজীব করে তোলে।"

যুক্তি সব সময় ব্যক্তিকে ধর্মপরায়ণ করে না

কেয়ার্ডের মন্তব্য

কেয়ার্ড বলেন, "সঠিকভাবে চিন্তা করার জন্য বা যথার্থভাবে ইচ্ছা করার জন্য নয়, শুধুমাত্র এবং বিশেষ করে ঈশ্বরের প্রতি আমাদের অনুভূতি এবং অনুরাগের অবস্থার জন্যই আমরা ধর্মপরায়ণ"।[1]

অনুভূতিতেই ধর্ম-চেতনা নিহিত, এই মতের একজন বিশেষ সমর্থক হলেন শ্লায়ারমেকার। তাঁর মতে ধর্ম হল অসীমের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংযোগের এবং এক হয়ে যাবার অনুভূতি (soul's feeling of immediate contact and fusion with the infinite)। উইলিয়ম জেমস্-এর অভিমতানুসারে ধর্মের গভীরতর উৎস রয়েছে অনুভূতির মধ্যেই এবং এই অনুভূতিকে কেন্দ্র করে ধর্মের দর্শন বা তত্ত্ব হল গৌণ বিষয়।[2]

এই মতবাদের সমর্থকবৃন্দ

ধর্ম-চেতনার উৎস যে অনুভূতিতে তার স্বপক্ষে, এই মতবাদের সমর্থকবৃন্দ দু'ধরনের প্রমাণ উপস্থিত করেন। প্রথমতঃ, সাধারণ লৌকিক ধারণার কাছে আবেদন জানিয়ে এবং দ্বিতীয়তঃ, কতকগুলি বিজ্ঞানসম্মত বিষয়ের বিবেচনা করে।

---

1. "We are religious, not in virtue of thinking accurately or willing rightly but simply and essentially in virtue of certain state of our feelings and affections towards God." —Philosophy of Religion ; Page 156

2. এই প্রসঙ্গে 'ধর্মের স্বরূপ' অধ্যায়ে প্রদত্ত ধর্মের বিভিন্ন সংজ্ঞা দ্রষ্টব্য।

সাধারণ মানুষের চেতনাই প্রমাণ করে যে জ্ঞান বা বাহ্য ব্যবহারিক ক্রিয়া মানুষকে ধর্মপরায়ণ করে তোলে না। যুক্তিতর্কের ক্ষমতা বা বিচারবুদ্ধি আমরা স্বভাবতঃই অনুভব করি, ঈশ্বরের সঙ্গে যোগাযোগের মাধ্যম নয়, বা এর দ্বারা ব্যক্তির আধ্যাত্মিক অবস্থা পরীক্ষা করে দেখা যায় না। যুক্তিতর্কে দক্ষতা, উন্নত বিচারবুদ্ধি, পর্যবেক্ষণ বা চিন্তন-ক্ষমতার অধিকারী হয়েও ব্যক্তির মধ্যে যদি সেই সজীব বিশ্বাসের অভাব থাকে, যা হল অন্তরের বিষয়, তার পক্ষে ধর্মপরায়ণ হওয়া সম্ভব হয় না। বস্তুতঃ ধর্ম যদি সকলের পক্ষে সম্ভাব্য বিষয় হয়, ধর্ম যদি হয় আত্মার সঙ্গে ঈশ্বরের সংযোগের ব্যাপার, কোন বিশেষ ধরনের অর্জিত বিষয়ের পরিণাম নয়, তাহলে ধর্ম কখনও বৌদ্ধিক সামর্থ্য ও সংস্কৃতির উপর নির্ভরশীল হতে পারে না, কারণ এটা সার্বিক নয়, সবাই এর অধিকারী নয়। সীমিত সংখ্যক ব্যক্তি এই ক্ষমতার ও দক্ষতার অধিকারী। কাজেই ধর্ম জ্ঞানের সঙ্গে অভিন্ন হতে পারে না বা ধর্মপরায়ণতার মূল বুদ্ধিতে নিহিত থাকতে পারে না। ধর্ম-চেতনার সারবস্তু ক্রিয়ার (practical activity) উপরও নির্ভরশীল হতে পারে না, কারণ বাহ্যক্রিয়া আকস্মিক অবস্থা বা বাহ্য ঘটনানির্ভর। মানুষের অভ্যন্তরীণ উদ্দেশ্য ও নীতিই কর্মের উৎস। আর ধর্মের অভ্যন্তরীণ নীতি যদি বুদ্ধি না হয়, তাহলে অনুভূতি বা আবেগ ছাড়া কি হতে পারে ?

সমর্থকবৃন্দের দ্বিতীয় যুক্তি

দ্বিতীয়তঃ, ধর্মের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলা হয় যে, ধর্ম হল ঈশ্বরের সঙ্গে জীবাত্মার সংযোগ। এর থেকে অনিবার্যভাবে এই সিদ্ধান্তে আসতে হয় যে, ধর্ম-চেতনার উৎস হল অনুভূতি। একমাত্র অনুভূতির মাধ্যমেই ভিন্ন প্রকৃতির বিষয়ের মধ্যে গভীর মিলন সাধিত হয়। জ্ঞানের ক্ষেত্রে জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়র প্রভেদ বর্তমান থাকে, কিন্তু অনুভূতির ক্ষেত্রে এই বিবোধ অদৃশ্য হয়ে যায়—দুই মিলে এক হয়ে যায়। কোন বস্তু বা সত্তা যখন অনুভূতির কাছে নিজেকে প্রকাশ করে, তখন যে চেতনার কাছে সে নিজেকে প্রকাশ করে, তার সঙ্গে এক হয়ে যায়। আসল কথা হল, জ্ঞান কখনও অপরোক্ষ হতে পারে না। যুক্তি ও প্রমাণের মাধ্যমেই জ্ঞান লব্ধ হয়। যুক্তির মাধ্যমে আমরা সিদ্ধান্তে উপনীত হই। কোন চিন্তন-প্রক্রিয়া বিভিন্ন স্তর অতিক্রম করে তার ফললাভ করে। কিন্তু কোন বস্তু যখন অনুভূতির কাছে প্রদত্ত হয় তখন অন্তবর্তী স্তর পেরিয়ে অনুভূতিকে বস্তুটির কাছে পৌঁছতে হয় না। বিশেষ করে ঈশ্বর সম্পর্কে এটা খুবই সত্য। ঈশ্বর যখন আমাদের কাছে চিন্তনের বিষয় হয়ে ওঠেন, তখন তাঁর সঙ্গে মিলনের গভীর চেতনা আমাদের মধ্যে জাগ্রত হয় না। কিন্তু যখন তিনি অনুভবের বিষয় হয়ে ওঠেন তখন তাঁর উপস্থিতি, ভালবাসা, আনন্দ, উল্লাস নিয়ে সমস্ত আত্মার মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট

হয় এবং তখনই সব ভেদ, সব ব্যবধান ঘুচে যায়। তখনই আমরা ঈশ্বরের সঙ্গে আধ্যাত্মিক দিক থেকে একাত্ম হয়ে উঠি।

এখন প্রশ্ন হল, ধর্মীয় চেতনার উৎস যদি অনুভূতিতেই নিহিত থাকে তাহলে এই ধর্মীয় অনুভূতি কি ধরণের অনুভূতি? ইতিপূর্বে এই সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। পূর্ব কথার পুনরাবৃত্তি করে বলা যেতে পারে যে, আদিম ধর্মীয় আবেগ হল সশ্রদ্ধ ভয় (awe), যা ভয়েরই রকমফের। কিন্তু ধর্মীয় আবেগের উন্নত রূপের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে সেই আবেগ হল এক জটিল আবেগ—সশ্রদ্ধ ভয়, বিস্ময়, প্রশংসা, কৃতজ্ঞতা, প্রত্যাশা, নির্ভরতাবোধ, ভালবাসা, শান্তি, আনন্দ সবই যার অন্তর্ভুক্ত। ধর্মের উন্নতরূপের ক্ষেত্রে অনুভূতি হয় সংযত এবং বৌদ্ধিক ধারণার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে সম্পর্কযুক্ত, কিন্তু অনুভূতির উপাদান একেবারে অদৃশ্য হয়ে যায় না, তা থাকেই। অনুভূতির ছোঁয়া না থাকলে উপাসনা হয়ে পড়ে যান্ত্রিক, উত্তাপহীন, রীতিসিদ্ধ এবং গতানুগতিক ব্যাপার। গ্যালোয়ে বলেন,[1] "অনুভূতির মধ্য দিয়ে ধর্মের মধ্যে যা গভীরতম এবং সবচেয়ে ব্যক্তিগত তার প্রকাশ ঘটে এবং ধর্ম-চেতনার কেন্দ্রের সবচেয়ে কাছাকাছি এর অবস্থান।"

ধর্মীয় অনুভূতির স্বরূপ

সমালোচনা: উপরিউক্ত অভিমতের বিরুদ্ধে নানা ধরনের অভিযোগ উত্থাপিত হয়েছে। প্রথমতঃ, যখন একথা বলা হয় যে ধর্ম-চেতনার উৎস অনুভূতি, তখন এই অভিমত আত্মবিরোধিতা দোষে দুষ্ট হয়। কারণ কেয়ার্ডের ভাষায়, নিছক অনুভূতির ধর্ম নিজেকে ধর্ম বলে জানতেই পারবে না (for a religion of mere feeling would not even know itself to be religion)। অনুভূতি যেহেতু অ-বিচারবুদ্ধিজনিত (irrational), সেইহেতু অনুভূতির উপর অত্যধিক গুরুত্ব আরোপের ফলে ধর্ম হয়ে পড়ে বিচারবিযুক্তবাদী (dogmatic)। যা জ্ঞেয় তার সুস্পষ্ট ধারণা ছাড়া ধর্মীয় অনুভূতি অন্য ধরনের অনুভূতি থেকে নিজেকে পৃথক করতে অসমর্থ, নিজের ক্ষেত্রে কোন বৈশিষ্ট্য আরোপ করতে অক্ষম বা নিজের অস্তিত্বকে সমর্থন করতে অপারগ। শুধু তাই নয়, একজন লম্পটের এবং একজন ধর্মনিষ্ঠ সাধুব্যক্তির অনুভূতির মধ্যে পার্থক্য করা সম্ভব হবে এবং অনুভূতির দিক থেকে দু'জনকে একই স্তরে অবস্থিত মনে করতে হবে—উভয়ের অনুভূতিই সমর্থনযোগ্য মনে করতে হবে। তাহলে ধর্ম হবে ব্যক্তিগত খেয়ালখুশীর ব্যাপার এবং ধর্মের কোন বস্তুগত মানদণ্ড থাকবে না। দ্বিতীয়তঃ, অনুভূতির

সমালোচনা

1. In feeling, what is deepest and most individual in religion is expressed and it lies nearest the centre of the religious consciousness."
—G. Galloway; The Philosophy of Religion; page 79.

তীব্রতা কোন মানদণ্ড হতে পারে না। একই বস্তু বিভিন্ন মনে বিভিন্ন তীব্রতাযুক্ত অনুভূতি বা একই মনে বিভিন্ন সময়ে অনুভূতির বিভিন্ন তীব্রতা সৃষ্টি করে। যা আমার কাছে আনন্দজনক তা অপরের মধ্যে দুঃখের অনুভূতি সৃষ্টি করতে পারে এবং তৃতীয় ব্যক্তির মনে উদাসীনতার ভাব জাগ্রত করতে পারে। তাছাড়া অনেক সময় আমাদের ইন্দ্রিয়-অনুভূতির বা আবেগের তীব্রতা ধর্মীয় অনুভূতির তুলনায় অনেক বেশী তীব্র হয়। আবেগের তীব্রতাই যদি বাস্তবতার লক্ষণ হয় বা উপাসকের অন্তরে জাগ্রত অনুভূতির তীব্রতা অনুসারে যদি ধর্মের ক্রমবিন্যাস করা হয় তাহলে কোন ধর্মের শুদ্ধ রূপের সঙ্গে তার বিকৃত রূপের মধ্যে পার্থক্য করা কষ্টকর হয়ে পড়বে। কারণ প্রত্যেকেই তার অনুভূতির তীব্রতার সাহায্যে তার ধর্মীয় চেতনাকে যথার্থ বলে প্রমাণের জন্য সচেষ্ট হবে। আসল কথা, ধর্মের ক্ষেত্রে অনুভূতি শুধুমাত্র প্রমাণ করে যে 'ধর্ম আমার,' 'ধর্ম আমার অভিজ্ঞতার অংশ'; কিন্তু ধর্মীয় অভিজ্ঞতার মূল্য নির্ভর করে ব্যক্তি নৈতিক এবং আধ্যাত্মিক সংস্কৃতির কোন্ স্তরে উন্নীত। কেয়ার্ড বলেন, "আমি কোন কিছু অনুভব করছি এটাই বস্তুগত মানদণ্ড যুগিয়ে দিতে পারে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না তুমি প্রথমেই নিরূপণ করছ যে, এই 'আমি' কে এবং কী।" তৃতীয়তঃ, অনুভূতি হল পুরোপুরি বস্তুনিরপেক্ষ অভিজ্ঞতা এবং সেই কারণে খুব বেশী মাত্রায় পরিবর্তনশীল। কাজেই এইরকম পরিবর্তনশীল মানদণ্ড ধর্মচেতনার বস্তুগত মূল্য নিরূপণের মাপকাঠি হতে পারে না। চতুর্থতঃ, অনুভূতিই যদি ধর্মের একমাত্র মানদণ্ড হয়, তাহলে ধর্মের উচ্চতম এবং নিম্নতম রূপ উভয়কেই এক স্তরে অবস্থিত বলে মনে করতে হয়। কিন্তু এই জাতীয় সিদ্ধান্ত স্পষ্টতঃই অসমর্থনীয়।

কেয়ার্ড-এর মন্তব্য

এই প্রসঙ্গে গ্যালোয়ে যা বলেছেন তাও প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন, "ধর্মপরায়ণ হবার জন্য অনুভূতি কোন জ্ঞানমূলক উপাদানের দ্বারা বিশেষিত হওয়া দরকার। অর্থাৎ কিনা, ব্যক্তি যে শক্তি বা শক্তিগুলির উপর নির্ভরশীল এবং যার সঙ্গে ব্যক্তির একটা সদর্থক সম্পর্ক বর্তমান তাতে বিশ্বাসের প্রয়োজন আছে।" যেমন ঈশ্বরের প্রকৃতি ও গুণাবলী, এই জগতের সঙ্গে ও জীবাত্মার সঙ্গে ঈশ্বরের সম্পর্ক, এইগুলিকে বিজ্ঞানোচিত ভাবে প্রদর্শন করা সম্ভব নয়। এইগুলিকে মনে মনে ধারণা করা যেতে পারে কিন্তু তার পূর্বে এইগুলিকে প্রত্যক্ষভাবে অনুভব করা দরকার।

সাম্প্রতিককালে সে-কারণে কেউ কেউ মনে করেন যে, ইচ্ছা (will)-ই হল ধর্ম-চেতনার সারবস্তু। কান্ট, ফিখটে, শোপেনহাওয়ার (*Schopenhauer*), হফ্‌ডিং প্রভৃতি চিন্তাবিদ্‌গণ উপরিউক্ত অভিমতের সমর্থক। তাঁদের যুক্তি হল, উদ্দেশ্য বা ইচ্ছাই

আমাদের চিন্তন বা অনুভূতিকে তাৎপর্যপূর্ণ করে তোলে। ধর্মের যে একটা বাহ্য প্রকাশ আছে এটাই তাঁদের বক্তব্যকে সমর্থন করে।

গ্যালোয়ের ভাষায়, 'ইচ্ছা হল সেই, যা নিজেকে প্রয়োগ করে স্থায়ী ধর্মীয় মানসিক অবস্থা (disposition) ও মনোভাব গঠন করে এবং ধর্মীয় জীবনের ক্ষেত্রে বাস্তবতা ও ধারাবাহিকতা নিয়ে আসে। অনুভূতি হল অস্থির (spasmodic)। অনুভূতি হল দোদুল্যমান এবং এর তীব্রতা পরিবর্তনশীল এবং কোন একটা মেজাজ খুব শীঘ্র পরিবর্তিত হয়ে ভিন্ন একটা মেজাজে পরিণত হয়। অন্তর বা অভ্যন্তরীণ অবস্থা তুলনামূলকভাবে স্থির, যা চরিত্রের স্থায়ী ভিত্তি গঠন করে এবং ইচ্ছার ক্রিয়া দ্বারাই এটি ক্রমশঃ গঠিত হয়।'

এই মতবাদের সমর্থকবৃন্দ মনে করেন যে, গভীর আবেগ স্বাভাবিকভাবেই ক্রিয়ার মধ্য দিয়ে নিজেকে প্রকাশ করে এবং যদি তা না করে এবং কোন অস্বাভাবিক বাধার সৃষ্টি হয়, তাহলে সেই আবেগ জৈবিক দিক থেকে অসম্পূর্ণ থেকে যায়।

আবেগ ক্রিয়ার মধ্য দিয়ে নিজেকে প্রকাশ না করলে অসম্পূর্ণ থেকে যায়

কোন নির্বাচিত উদ্দেশ্য বা অভিপ্রায় যা আচরণের মাধ্যমে নিজেকে প্রকাশ করে, তার থেকে বিযুক্ত হলে অনুভূতি হয়ে পড়ে অর্থহীন ও লক্ষ্যহারা। ধর্ম-চেতনা সম্পর্কেও একথা সত্য। আন্তর অনুভূতি হিসেবে ধর্ম বাহ্য প্রকাশ দাবী করে। নিছক মনোগত আবেগ হিসেবে ধর্ম অসম্পূর্ণ। সম্পূর্ণ বস্তু হিসেবে ধর্ম হল এক ধরনের আচরণ, উদ্দেশ্য নিয়ন্ত্রিত এক ধরনের ক্রিয়া। ক্রিয়া বা আচরণ হিসেবে ধর্মের দুটি প্রধান দিক আছে—আনুষ্ঠানিক দিক, উৎসর্গ এবং প্রার্থনা যার অন্তর্ভুক্ত এবং দ্বিতীয়তঃ, নৈতিক দিক। সময় সময় এই দুই মনোভাবের মধ্যে তীব্র বিরোধ দেখা দেয়।[1]

সমালোচনা: কিন্তু বিচারবুদ্ধি ও অনুভূতির দ্বারা সমর্থিত নয় এমন নিছক ক্রিয়ার যান্ত্রিক হবার সম্ভাবনা থাকে এবং তার ফলে ধর্ম নীতিহীন হতে পারে বা ধর্মের অবনয়ন সূচিত হতে পারে। ধর্ম যান্ত্রিক কৃত্রিম অভ্যাসে পরিণত হতে পারে।

বিচারবুদ্ধিবিযুক্ত ক্রিয়াকে ধর্মমূলক ক্রিয়া বলে অভিহিত করা চলে না। কাজেই ধর্মের ব্যাপারে হৃদয় ও মস্তিষ্ক দুই পাশাপাশি থাকা দরকার। অনুষ্ঠানসর্বস্ব ধর্মের সম্পর্কে যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করা প্রয়োজন। ধর্মীয় পূজা-পদ্ধতি গোঁড়ামি ও

1. পুরোহিতের দল ধর্মীয় অনুষ্ঠান সম্পাদনের উপরে গুরুত্ব আরোপ করেন এবং ধর্মপ্রবর্তক ধর্মানুষ্ঠানের তুলনায় সাধু আচরণকেই ঈশ্বর-সেবার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ বলে মনে করেন। আমাদের মতে ধর্মের নৈতিক দিকের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হলেও ধর্মের উপাসনার দিকটিরও যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে। ধর্মের সমস্যা ধর্মীয় অনুষ্ঠান বা পূজা-পদ্ধতিকে ধ্বংস করা বা বিলুপ্ত করে দেওয়া নয়, সেটি যাতে ব্যক্তির প্রগতিমূলক চেতনার উপযুক্ত প্রকাশ হয় তার জন্য সচেষ্ট হওয়া এবং নৈতিক জীবনের সঙ্গে তাকে যুক্ত করা।

কায়েমীস্বার্থের ব্যাপার হয়ে উঠতে পারে। বাহ্য ধর্মানুষ্ঠান সম্পাদনের উপরই যখন কেবলমাত্র গুরুত্ব আরোপ করা হয়, তখন ধর্ম হয়ে উঠতে পারে নিছক যান্ত্রিক কর্মসূচী, গতানুগতিক ব্যাপার এবং প্রগতিমূলক বুদ্ধির জীবনের সঙ্গে সম্পর্ক রহিত এবং নৈতিক চেতনা-বর্জিত একটা সাধারণ রীতি। তবু ধর্মের আনুষ্ঠানিক দিক বা পূজা-উপাসনার দিককে কোন মতেই অগ্রাহ্য করা চলে না।

উপরিউক্ত সমালোচনার ভিত্তিতে কেউ কেউ সিদ্ধান্ত করেছেন যে, ধর্ম-চেতনার সারবস্তু হল জ্ঞান বা চিন্তন (knowledge or thought)। ইংলণ্ড এবং ফ্রান্সের অষ্টাদশ শতাব্দীর বুদ্ধিজীবীরা চিন্তনকেই ধর্মের সারবস্তুরূপে আখ্যাত করেছেন। ধর্ম নিঃসন্দেহে অন্তরের বিষয়, অর্থাৎ অনুভূতির বিষয় হবেই। কিন্তু ধর্ম যাতে ব্যক্তিগত খেয়ালখুশীর বিষয় হয়ে না দাড়ায় তার জন্য আমাদের অবশ্যই কোন বস্তুগত মানদণ্ডের কাছে আবেদন জানাতে হবে। প্রত্যেক ধর্মের মধ্যেই জ্ঞানগত উপাদান, একটা বস্তুগত মানদণ্ড থাকবে, যার সাহায্যে প্রকৃত ধর্ম এবং মিথ্যা ধর্মের মধ্যে পার্থক্য করা সম্ভব হবে। যা অন্তরের বিষয়, তা যে সত্য, বিচারবুদ্ধির দ্বারা সেটি সমর্থিত হওয়া প্রয়োজন। ধর্ম যে শুধুমাত্র মনোগত বিষয়; আকস্মিক কিছু, বা ধর্মোন্মত্ততা নয়, চিন্তন বা বিচারবুদ্ধির সাহায্যেই তা নিরূপণ করা যেতে পারে। বিচারবুদ্ধির সাহায্যেই যে বস্তু সম্পর্কে আমাদের অনুভূতি জাগ্রত হয়, তার জ্ঞান লাভ করতে পারি এবং ধর্মকে যথার্থভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে পারি। এই কারণেই উন্নত ধর্মের ক্ষেত্রে ধর্মতত্ত্বের (theology) আবির্ভাব ঘটে, যা চিন্তনের সাহায্যে ধর্মীয় মূল্যের ব্যাখ্যা দিতে সচেষ্ট হয় এবং শেষ পর্যন্ত ধর্মদর্শনের আবির্ভাব ঘটে যা ধর্মীয় অভিজ্ঞতার অর্থের ব্যাখ্যা দেয় এবং তার যাথার্থ্যের বস্তুগত ভিত্তি পরীক্ষা করে দেখে। কাজেই বিচারবুদ্ধির প্রকৃতির মধ্যে তার এই অধিকার নিহিত থাকা দরকার যার দ্বারা সে অনুভূতিকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে এবং অনুভূতিকে বিচার ও নিয়ন্ত্রণ করার নীতিরূপে কার্যকর হতে পারে। গ্যালোয়ে বলেন, "ইচ্ছাকে বাস্তব করে তোলার মাধ্যম হল ধর্মীয় ধারণা; তারা অনুভূতিকে নির্দেশ দেয় এবং তাকে অর্থবহ করে তোলে…"। তিনি আরও বলেন, 'চিন্তন ধর্মকে তার আদিম সঙ্কীর্ণতা থেকে ক্রমশঃ মুক্ত করেছে এবং একটা উন্নত ও সার্বিক আবেদন সৃষ্টি করতে তাকে সমর্থ করেছে।'

ধর্ম-চেতনার সারবস্তু হল চিন্তন

আবেগ বিচারবুদ্ধির দ্বারা সমর্থিত হওয়া প্রয়োজন

সমালোচনা: চিন্তন বা জ্ঞানকে যদি ধর্ম চেতনার সারবস্তু মনে করা হয় তাহলে এই অভিমত হবে একদেশদর্শী অর্থাৎ এ যেন ছবির একটা দিক দেখা। ব্যক্তির

চিন্তন তার ভাষা, আর্ট, ভাস্কর্য, সাহিত্য প্রভৃতির মাধ্যমে নিজেকে প্রকাশ করে। ব্যক্তির ধর্ম-চেতনার ক্ষেত্রে ব্যবহারিক ক্রিয়া (practical activity)-র একটা গুরুত্বপূর্ণ অবদান আছে। চিন্তন বা জ্ঞান, তা বৈজ্ঞানিক বা দার্শনিক যাই হোক না কেন, ধর্মচেতনার দাবী পুরোপুরি পূরণ করতে পারে না। এ যেন সমগ্র থেকে একটা অংশকে পৃথক করে নিয়ে তার উপরে গুরুত্ব আরোপ করা। চিন্তন, অনুভূতি ও ইচ্ছা এই তিনটির মধ্যে ধর্মের ক্ষেত্রে যে-কোন একটির প্রাধান্য লক্ষ্য করা যেতে পারে। যখন অনুভূতির প্রাধান্য তখন যে ধর্মনিষ্ঠা তাকে আবেগমূলক বা অতীন্দ্রিয় (emotional or mystical), যখন চিন্তনের প্রাধান্য তখন তাকে বৌদ্ধিক (intellectual) এবং যখন ইচ্ছার প্রাধান্য তখন তাকে ব্যবহারিক (practical) রূপে আখ্যাত করা যেতে পারে।

সিদ্ধান্ত ঃ উপরিউক্ত আলোচনা থেকে ধর্ম-চেতনার স্বরূপ সম্পর্কে অনেক তথ্যই জানা গেল। চিন্তা, অনুভূতি ও ইচ্ছা এই তিনটির কোন একটি মাত্রকেই ধর্ম-চেতনার সারবস্তুরূপে আখ্যাত করা চলে না। বস্তুতঃ, কেয়ার্ডের ভাষায় বলতে হয়, "ধর্ম মানুষের চেতনার কোন বিশেষ বৃত্তি বা বিভাগের অন্তর্ভুক্ত বা অন্য কথায়, ধর্ম প্রধানতঃ জ্ঞানের, অনুভূতির, ইচ্ছার বা কর্মের বিষয়—এই প্রশ্ন, যা নিয়ে এত আলোচনা হয়েছে তা ভ্রান্ত বা ত্রুটিপূর্ণ মনস্তত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত।" কেয়ার্ড আরও বলেন, 'ব্যক্তির আধ্যাত্মিক জীবন এবং চেতনাকে পাশাপাশি অবস্থিত স্বনির্ভর বিভাগে, বা ভিন্ন ভিন্ন বৃত্তি বা শক্তি, যাদের 'মন' বলে একটি সাধারণ আধার (substrate) রয়েছে তাতে বিভক্ত করা চলে না। মানুষের আধ্যাত্মিক প্রকৃতির প্রকাশ, জ্ঞান বা অনুভূতিকে বাদ দিয়ে শুধু ক্রিয়াতে সীমাবদ্ধ, এমন কথা বলা যেতে পারে না। এমন কোন অনুভূতি বা ইচ্ছা নেই যার মধ্যে সুপ্তভাবে জ্ঞানের উপাদান নিহিত থাকে না, বা এমন কোন জ্ঞান নেই যা অনুভূতিকে পূর্ব থেকে স্বীকার করে নেয় না। এমন কোন অনুভূতি বা ইচ্ছা নেই যে ক্ষেত্রে মনের মনোভাব হল নিষ্ক্রিয়, শুধুমাত্র সংগ্রহণের মনোভাব, এবং তার মধ্যে কোন ক্রিয়ার উপাদান নেই। আধ্যাত্মিক ঐক্যকে শুধুমাত্র একটি আধার (repository) হিসাবে কল্পনা করা যেতে পারে না। এ কোন যন্ত্রপাতির বাক্স নয়, যাতে কিছু জিনিস পাশাপাশি রয়েছে। বরং এমন এক ঐক্য যেখানে উপাদানগুলি অনিবার্যভাবে পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত বা একই সাধারণ নীতির অনন্যো-নিরপেক্ষ প্রকাশ। ধর্ম-চেতনার প্রকৃতি বিচার করতে গিয়ে আমরা শুধুমাত্র অনুভূতির উপর গুরুত্ব আরোপ করতে পারি না। আমাদের যে বৌদ্ধিক ক্রিয়া (intellectual activity) অনুভূতিকে নিয়ন্ত্রণ করে, তার দিকে তাকাতে হয়। একথা সত্য যে, ইচ্ছা বা ক্রিয়া উপাসনার বস্তু সম্পর্কে আমাদের অভ্যন্তরীণ অনুভূতিকে বাস্তব আকার দান করে। কিন্তু আমাদের আধ্যাত্মিক জীবনের বিভিন্ন দিককে যে কেন্দ্রীয় নীতি পরিচালিত করে তাহল চিন্তন, যা বিভিন্ন আধ্যাত্মিক ক্রিয়ার মধ্যে আঙ্গিক সম্পর্ক রচনা করে।

কেয়ার্ডের মন্তব্য

অষ্টম অধ্যায়

ঈশ্বরের অস্তিত্বের পক্ষে প্রমাণ
(Proofs for the existence of God)

১। ভূমিকা (Introduction) :

ঈশ্বর ধর্মের কেন্দ্রীয় বিষয়বস্তু। কাজেই ঈশ্বর অস্তিত্বশীল কিনা স্বাভাবিক ভাবে এই প্রশ্ন সকলের মনে জাগে। ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ করার জন্য বহু পূর্বেই দার্শনিকবৃন্দ কতকগুলি যুক্তি উপস্থাপিত করেছেন। কিন্তু ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্পর্কীয় এইসব গতানুগতিক যুক্তিগুলির বর্তমান যুগে আর তেমন গুরুত্ব আছে বলে অনেকে মনে করেন না। ঈশ্বরের অমূর্ত ধারণা থেকে ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ করা বা জগতের অমূর্ত ধারণা থেকে অনুমানের মাধ্যমে জগৎ থেকে স্বতন্ত্র কোন ঈশ্বরের ধারণায় উপনীত হওয়া অনেকেই এখন অসম্ভব বলে মনে করেন। এমন কথা বলা যায় না যে, যাদের মনে ধর্মবিশ্বাস অনুপস্থিত, ঈশ্বরের অস্তিত্বের প্রমাণবিষয়ক যুক্তিগুলি তাদের মনে ধর্মবিশ্বাস সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছে। একথা হয়ত বলা যেতে পারে যে, এই যুক্তিগুলি ধর্মবিশ্বাস সৃষ্টি করার তুলনায়, যে ধর্মবিশ্বাস মানবমনে পূর্ব থেকে উপস্থিত, তাকে সুদৃঢ় করার পক্ষে কার্যকর হতে পারে। কোন ধর্মসম্বন্ধীয় পূর্ব অনুমিত বিষয় থেকে প্রমাণগুলি উদ্ভূত হয় নি। যে পূর্ব অনুমিত বিষয়কে কেন্দ্র করে প্রমাণগুলির উদ্ভব

যুক্তিগুলির দুর্বলতা

সেইগুলি সাধারণ ও অমূর্ত (general and abstract) এবং যুক্তিগুলির ক্ষেত্রে যে স্থায়ী অসুবিধা দেখা দিয়েছে তাহল, যে মূর্ত সত্তার (concrete reality) অস্তিত্ব প্রমাণ করা যুক্তিগুলির লক্ষ্য, সেই যুক্তিগুলির সিদ্ধান্তের মধ্যে আশ্রয়বাক্যের তুলনায় অধিক কিছু নিহিত। অর্থাৎ কিনা, যুক্তিগুলি যে আশ্রয়বাক্যের ভিত্তিতে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে তা আশ্রয়বাক্যগুলির তুলনায় ব্যাপকতর, যা অবরোহ অনুমানের নিয়মবিরোধী। এই প্রসঙ্গে গ্যালোয়ে বলেন, "ঈশ্বরের অস্তিত্ববিষয়ক যুক্তিগুলি যাঁরা উপস্থাপিত করেছিলেন, তাঁদের সুস্পষ্ট

গ্যালোয়ের মন্তব্য

ধারণা ছিল তাঁরা কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হতে চান এবং যৌক্তিক চিন্তনের মাধ্যমে তাঁরা তাতে উপনীত হবার প্রত্যাশা করেছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্য হল এই যে তাঁরা উপায় ও লক্ষ্যের মধ্যে যে বৈষম্য বর্তমান ছিল, সেই সম্পর্কে পরিপূর্ণভাবে সচেতন ছিলেন না"।[1]

এই যুক্তিগুলি এত বেশী আলোচিত হয়েছে এবং এইগুলির এত বেশী সমালোচনা হয়েছে যে, এই সম্পর্কে নতুন কিছু বলা একরকম অসম্ভব ব্যাপার। তবু এইগুলির

1. G. Galloway ; The Philosophy of Religion ; Page 381

আলোচনার প্রয়োজন আছে, কেননা এইগুলির ঐতিহাসিক গুরুত্ব আছে এবং ধর্মীয় বিশ্বাসের বস্তু যে যথার্থ, তার বৌদ্ধিক প্রমাণ উপস্থিত করে এই যুক্তিগুলি দেখায় যে চিন্তন কিভাবে বিশ্বাসের সহায়ক হতে পারে। মানবমন কিভাবে সঠিক এবং অকাট্য যুক্তির সাহায্যে ধর্মবিশ্বাসের সত্যতাকে নিজের কাছে সমর্থনযোগ্য করে তুলতে পারে, এই যুক্তিগুলি তার উপায় নির্দেশ করে। ঈশ্বরের অস্তিত্বের প্রমাণবিষয়ক বিভিন্ন যুক্তিগুলির সংক্ষিপ্ত আলোচনা ও সমালোচনা ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্পর্কীয় সমস্যাদির প্রকৃতিকে বুঝে নেবার পক্ষে সহায়ক হবে এবং যখন আমরা বুঝে নিতে পারব কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে এবং কেন সমাধানগুলি কার্যকর হয়নি, তখন নতুন সমাধানের কথা হয়ত আমরা চিন্তা করতেও সক্ষম হব।

যুক্তিগুলির ঐতিহাসিক গুরুত্ব আছে

যুক্তিগুলি ঈশ্বরের অস্তিত্বের সমস্যা উপলব্ধির পক্ষে সহায়ক

কেয়ার্ড[1] বলেন, "সাধারণতঃ প্রমাণ বলতে যা বুঝায় সেই দিক থেকে বিচার করলে, এই যুক্তিগুলির বিরুদ্ধে প্রায়শঃই যেসব অভিযোগ করা হয়, তারা সেই সব অভিযোগের যোগ্য। কিন্তু মানুষের আত্মা যে প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ঈশ্বরের জ্ঞানে উপনীত হয় এবং সেখানে তার সর্বোত্তম প্রকৃতির পরিপূর্ণতা খুঁজে পায়, তার বিভিন্ন স্তরগুলির সন্ধান করতে গিয়ে ধর্ম যে যুক্তি দেয়, যেগুলি তার মধ্যে প্রচ্ছন্ন রয়েছে, তার বিশ্লেষণের দিক থেকে বিচার করতে গেলে, এই প্রমাণগুলি যথেষ্ট মূল্যের অধিকারী।"

২। ঈশ্বরের অস্তিত্বের পক্ষে যুক্তি (Arguments for the existence of God):

প্রথমে যে যুক্তিটি আমরা আলোচনা করব সেটি হল তত্ত্ববিষয়ক যুক্তি (the Ontological Argument)। এই যুক্তিটি গভীর দার্শনিক সমস্যার সৃষ্টি করে এবং আলোচনায় অগ্রসর হলে আমরা দেখতে পাব যে অন্যান্য যুক্তিগুলি এই যুক্তির সত্যতাকে প্রচ্ছন্নভাবে স্বীকার করে নিয়েছে। আমরা প্রথমে তাই এই যুক্তিটি আলোচনা করব।

তত্ত্ববিষয়ক যুক্তির সত্যতা অন্যান্য যুক্তিতে প্রচ্ছন্নভাবে স্বীকৃত

(ক) তত্ত্ববিষয়ক যুক্তি (The Ontological Argument): তত্ত্ববিষয়ক যুক্তিটি বিভিন্ন ভাবে উপস্থাপিত হয়েছে। কিন্তু এই যুক্তিটির মূল বক্তব্য হল ঈশ্বরের ধারণা (idea of God)-র মধ্যেই ঈশ্বরের বাস্তবতা (reality of God) নিহিত। ঈশ্বরের ধারণা হল এক অভিনব ধারণা। কাজেই তা নিছক ধারণা হতে পারে না। কাজেই এই যুক্তি ঈশ্বরের ধারণা থেকেই ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণে সচেষ্ট হয়। আমাদের মনে ঈশ্বরের ধারণার উপস্থিতি তার

যুক্তিটির মূল বক্তব্য

1. J. Caird: An Introduction to the Philosophy of Religion; Page 125.

সত্তা বা অস্তিত্ব প্রমাণ করে। চিন্তন বা ধারণা থেকে অস্তিত্বে উপনীত হওয়া বা অস্তিত্বের সিদ্ধান্ত করাই হল এই যুক্তিটির সার কথা।

এই যুক্তিটি বিভিন্ন চিন্তাবিদ্, যেমন [1]আন্‌সেলেম, [2]বোনাভেন্‌চার (*Bonaventure*), [3]দেকার্ত [4]লাইবনিজ এবং [5]হেগেল উপস্থাপিত করেছেন। তবে এই যুক্তিটির উল্লেখযোগ্য উপস্থাপক হলেন আন্‌সেলেম এবং দেকার্ত। আন্‌সেলেমের সময়েই এই যুক্তিটির সমালোচনা করা হয় এবং পরবর্তীকালে [6]টমাস একুইনাস এবং [7]ইমানুয়েল কাণ্ট এই যুক্তির সমালোচনা করেন।

যুক্তিটির প্রধান প্রবর্তক আন্‌সেলেম ও দেকার্ত

কাণ্টারবেরীর আন্‌সেলেম ঈশ্বরের ধারণাকে কিভাবে ব্যক্ত করেছেন, প্রথমে তা দেখা যাক। তিনি খৃষ্টীয় ঈশ্বরের ধারণাকে ব্যক্ত করতে গিয়ে বলেছেন, "এ হল এমন সত্তা যার থেকে বৃহত্তর কিছু ধারণা করা যায় না (a being than which nothing greater can be conceived)। এটা স্পষ্ট যে 'বৃহত্তম' (greater) বলতে আন্‌সেলেম মনে করেন অধিকতর পূর্ণ (more perfect), দৈশিক দিক থেকে বৃহত্তর (spatially bigger) নয়। একটা বিষয় লক্ষ্য করার রয়েছে, সবচেয়ে পূর্ণ সত্তা **যা রয়েছে** (that there is) তার ধারণা, এবং সবচেয়ে পূর্ণ সত্তা **যার ধারণা করা যেতে পারে**, তার ধারণা, এই দুইয়ের মধ্যে পার্থক্য আছে। প্রথমটির উপর তত্ত্ববিষয়ক যুক্তিটি প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না কেননা যদিও সংজ্ঞানুসারে এটা সত্য যে সবচেয়ে পূর্ণ সত্তা যা আছে তা অস্তিত্বশীল (the most perfect being that there is exists), তাকেই যে আন্‌সেলেম ঈশ্বর বলেছেন এমন কোন নিশ্চয়তা নেই। কাজে কাজেই সবচেয়ে পূর্ণ সত্তা যা আছে তাকে ঈশ্বররূপে বর্ণনা না করে, আন্‌সেলেম ঈশ্বরকে বর্ণনা করেছেন সেই পূর্ণ সত্তা রূপে, যার থেকে অধিকতর পূর্ণ সত্তার ধারণা করা যায় না।

আন্‌সেলেম-এর মতে ঈশ্বরের ধারণা

সেণ্ট আন্‌সেলেম (*St Anselem*) যুক্তিটিকে এইভাবে উপস্থাপিত করেছেন।[8]

যুক্তিটির প্রথম রূপ (First Form of the Argument): আমাদের মনে এক পূর্ণ সত্তার (Perfect Being) ধারণা আছে। এই পূর্ণ সত্তা হল ঈশ্বর। ঈশ্বরের ধারণা এমন যার থেকে পূর্ণতম ও মহত্তম কিছু চিন্তা করা যায় না (a being than which nothing greater can be conceived)। কিন্তু এই পূর্ণ

---

1. (1033-1109); 2. (1221-74); 3. (1596-1650); 4. (1646-1716); 5. (1770 1831); 6. (1215-74); 7. (1724-1807).

8. The Ontological argument is to be found in chapters 2-4 of Anselem's Proslogion.

সত্তার অস্তিত্ব স্বীকার না করলে তা কিভাবে পূর্ণ হতে পারে? অস্তিত্ব পূর্ণতার অন্তর্গত। যার অস্তিত্ব নেই তাকে পূর্ণ বলা যায় না। শুধু চিন্তায় যার অস্তিত্ব আছে তার তুলনায় চিন্তায় এবং বাস্তবে যার অস্তিত্ব আছে তা পূর্ণতর। আমাদের মনে যে পূর্ণ সত্তার ধারণা আছে বাস্তবে তার যদি অস্তিত্ব না থাকে, তাহলে আমরা অপর এক পূর্ণ সত্তার ধারণা করতে পারি যার বাস্তবে অস্তিত্ব আছে। তাহলে শেষোক্ত সত্তা প্রথমটির তুলনায় অধিকতর পূর্ণ হবে। যেহেতু ঈশ্বর পূর্ণতম বা মহত্তম তাঁর অস্তিত্ব শুধুমাত্র চিন্তায় নেই, বাস্তবেও আছে। কাজেই ঈশ্বর অস্তিত্বশীল।

আনসেলেম-এর প্রথম যুক্তি

যুক্তিটির দ্বিতীয় রূপ (Second Form of the Argument): আনসেলেম তাঁর 'Proslogion' গ্রন্থের তৃতীয় পরিচ্ছেদে যুক্তিটিকে আবার ব্যক্ত করেছেন। তবে সেখানে শুধুমাত্র ঈশ্বরের অস্তিত্বের কথা বলেন নি, ঈশ্বরের অবশ্যম্ভাবী অস্তিত্বের (necessary existence) কথা বলেছেন। ঈশ্বরের এমন ভাবে সংজ্ঞা নির্দেশ করা হয়েছে যে, ঈশ্বর অস্তিত্বশীল নয়, এমনভাবে ঈশ্বরকে ধারণা করা যায় না। অবশ্যম্ভাবী অস্তিত্বের যে ধারণা তার মূল কথা হল নিজে নিজে অস্তিত্বশীল (self-existent) হওয়া। যেহেতু ঈশ্বরের পূর্ণতা অসীম তিনি কালে বা কালের দ্বারা সীমিত নন্ (is not limited in or by time)। কাজেই কোন বিশেষ কালে ঈশ্বরের অস্তিত্বশীল হওয়া এবং কোন বিশেষ কালে ঈশ্বরের অস্তিত্ব বিলীন হয়ে যাওয়া, এই দুই সম্ভাবনাকেই বাতিল করা চলে। কাজেই ঈশ্বরের নাস্তিত্ব অসম্ভব।

আনসেলেম-এর দ্বিতীয় যুক্তি

আনসেলেম-এর যুক্তির সমালোচনা (Criticisms of the Argument): যে সহজ উপায়ে আনসেলেম ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ করার জন্য সচেষ্ট হয়েছিলেন, আনসেলেমের সমসাময়িক চিন্তাবিদদের মধ্যে অনেকেই আনসেলেমের যুক্তিটির আলোচনা করেন। আনসেলেমের সমসাময়িকদের মধ্যে গনিলো (*Gaunilo*) নামে একজন ফরাসী সন্ন্যাসী 'A Book on behalf of the Fool' নামে একটি গ্রন্থ রচনা করে আনসেলেম-এর প্রদত্ত যুক্তির উত্তর দেবার জন্য সচেষ্ট হয়েছিলেন। গনিলো আনসেলেম-এর সঙ্গে একমত যে ঈশ্বরের ধারণা অনিবার্য-ভাবে তাঁর মনে বর্তমান। কিন্তু তিনি বলেন যে, এর থেকে সিদ্ধান্ত করা অসম্ভব যে ঈশ্বর বাস্তবে অস্তিত্বশীল। তিনি আরও বলেন যে, যদি কেউ তাকে এমন একটি অত্যাশ্চর্য দ্বীপের কথা ব্যক্ত করতেন যেটি এই জগতে স্বর্গের মতনই সুন্দর, তাহলে তার পক্ষে এই দ্বীপের ধারণা মনে গঠন করা এবং তাকে মনে জাগরুক

গনিলোর সমালোচনা

রাখা সহজ হত। কিন্তু মনের এই ধারণা থেকে তিনি কখনও এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতেন না যে দ্বীপটি বাস্তবে অনিবার্যভাবে অস্তিত্বশীল।

আন্‌সেলেমের অভিযোগের উত্তর : আন্‌সেলেম গনিলোর সমালোচনার উত্তর দিয়েছিলেন। তিনি স্বীকার করেছিলেন যে দ্বীপ সম্পর্কে গনিলোর যুক্তি নির্ভুল এবং একটিমাত্র ক্ষেত্র ছাড়া অপর সব ক্ষেত্রেই এটি সত্য হবে। আন্‌সেলেম মনে করেন যে ঈশ্বরের ক্ষেত্র একটা বিশেষ ধরনের ক্ষেত্র। দ্বীপের ক্ষেত্রে যেমন অন্যান্য ক্ষেত্রেও, আমরা তাদের অস্তিত্বের কথা যেমন চিন্তা করতে পারি তেমনি তাদের নাস্তিত্বের কথাও চিন্তা করতে পারি। কেননা দ্বীপ হল এই জগতের একটা অংশ—একটি পরনির্ভর সত্তা (a dependent reality)। দ্বীপের নাস্তিত্বের চিন্তার মধ্যে কোন বিরোধিতা (contradiction) নেই। কাজেই আন্‌সেলেমের বক্তব্য এক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। কিন্তু আন্‌সেলেম মনে করেন যে ঈশ্বরের ক্ষেত্রে তা সম্ভব নয়। ঈশ্বরের বেলায় ঈশ্বরের নাস্তিত্বের কথা ধারণা করা যায় না। কারণ এক্ষেত্রে আমরা কোন দ্বীপ, অশ্ব বা বিদ্যালয়ের কথা চিন্তা করছি না যা সেই ধরণের বস্তুর মধ্যে মহত্তম এবং পূর্ণতম (the greatest and most perfect)। আমরা এমন কিছুর চিন্তা করছি, সেটা যাই হোক না কেন, সব সত্তার মধ্যে মহত্তম এবং পূর্ণতম। একমাত্র ঈশ্বরের ক্ষেত্রেই চিন্তার অস্তিত্ব (existence in thought) থেকে বাস্তব অস্তিত্বে (existence in reality) উপনীত হওয়া সম্ভব। আন্‌সেলেমের নীতি, ধারণা করা যায় এমন সবচেয়ে পূর্ণসত্তার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য, কেননা এই ঈশ্বরের অনন্ত এবং অবশ্যম্ভাবী অস্তিত্ব (eternal and independent existence) আছে।

আনসেলেমের উত্তর

দেকার্তের যুক্তি : প্রথম যুক্তি : পঁচিশ বছরেরও বেশী পরে অনুরূপ যুক্তি উপস্থাপিত করতে গিয়ে ফরাসী দার্শনিক দেকার্ত যে তা' একটু ভিন্ন আকারে উপস্থাপিত করবেন এইটাই প্রত্যাশিত। দেকার্ত মনে করলেন যে, আন্‌সেলেম-এর উপরিউক্ত প্রমাণ দোষযুক্ত। উপরের যুক্তিতে ঈশ্বরের অস্তিত্বের বাস্তবতা অবশ্যম্ভাবীভাবে প্রমাণিত হয় নি। দেকার্ত-এর মতে আন্‌সেলেম-এর প্রমাণ থেকে তাঁর প্রমাণ ভিন্ন। পূর্ণতম সত্তা ঈশ্বরেরর ধারণা থেকে ঈশ্বরের অস্তিত্ব অবশ্যম্ভাবীভাবে নিঃসৃত হয় না। ঈশ্বরের ধারণার মধ্যে কেবল যে অস্তিত্বের সম্ভাবনা নিহিত আছে তা নয়, অবশ্যম্ভাবী অস্তিত্ব (necessary existence) ঈশ্বরের পূর্ণতম সত্তার ধারণার অন্তর্ভুক্ত।

দেকার্তের আন্‌সেলেমের সমালোচনা

দেকার্ত ছিলেন একজন গাণিতিক। কাজেই গণিত থেকে তিনি একটি উদাহরণ নিয়ে তাঁর বক্তব্য বোঝাবার চেষ্টা করলেন। তিনি বললেন, আমি এমন একটা

ত্রিভুজের কথা কল্পনা করতে পারি, যার কোন বাস্তব অস্তিত্ব নেই। কিন্তু যদিও এই ত্রিভুজটি আমার কল্পনার উপর নির্ভর, তবু এই ত্রিভুজের এমন কিছু গুণ আছে, যেমন 'ত্রিভুজের তিনটি কোণের সমষ্টি দুই সমকোণের সমান', যা আমার কল্পনার উপর নির্ভর নয়, বরং বলা যেতে পারে যে কল্পনা-নিরপেক্ষ।

পূর্ণতম সত্তার ধারণার মধ্যেই তার অস্তিত্ব নিহিত

'ত্রিভুজের তিনটি কোণের সমষ্টি দুই সমকোণের সমান'—এই গুণ বা বৈশিষ্ট্যটি যেমন ত্রিভুজের ধারণার মধ্যেই নিহিত বা এটি যেমন ত্রিভুজের একটি অনিবার্য বৈশিষ্ট্য তেমনি পূর্ণতম সত্তার ধারণার মধ্যেই তার অস্তিত্ব নিহিত অর্থাৎ অস্তিত্ব পূর্ণতম সত্তার এক অনিবার্য বৈশিষ্ট্য[1]। কাজেই পূর্ণতম সত্তা অস্তিত্বশীল নয় একথা বলা হলে বক্তব্যের মধ্যে সেই বিরোধিতা দেখা দেবে, ত্রিভুজের তিনটি কোণের সমষ্টি দুই সমকোণের সমান নয় বললে, যে বিরোধিতা দেখা দেয়।

ত্রিভুজের প্রকৃতিই হল এমন যে তার তিনটি কোণ দু' সমকোণের সমান। অনুরূপভাবে পূর্ণতম সত্তার প্রকৃতিই হল অস্তিত্বশীল হওয়া। তিনটি কোণ মিলে যেমন অবশ্যম্ভাবীভাবে দুটি সমকোণের সমান হয়, তেমনি পূর্ণতম সত্তা অবশ্যম্ভাবীভাবে অস্তিত্বশীল। কাজেই পূর্ণতম সত্তার ধারণা থেকে আমরা তার বাস্তব এবং অবশ্যম্ভাবী অস্তিত্ব অনুমান করতে পারি। যে সত্তার অস্তিত্ব নেই, তা কখনও অসীম এবং পূর্ণ হতে পারে না। পূর্ণতার ধারণা ছাড়া অন্য কোন ধারণার অবশ্যম্ভাবী অস্তিত্ব নেই। অস্তিত্বহীন পূর্ণ সত্তার ধারণা যৌক্তিক অসঙ্গতিপূর্ণ। উপরিউক্ত যুক্তি ছাড়া দেকার্ত ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ করার জন্য আরও কয়েকটি যুক্তি দিয়েছেন। আমরা সংক্ষেপে সেইগুলিও আলোচনা করছি:

দ্বিতীয় যুক্তি: প্রতিটি কার্যেরই একটা কারণ আছে। নিছক শূন্য থেকে কোন কিছুর সৃষ্টি হতে পারে না—এটি একটি স্বতঃসিদ্ধ বচন। কাজেই ঈশ্বরের ধারণারও একটা কারণ আছে। কার্যের মধ্যে যতখানি সত্যতা থাকবে, কারণের মধ্যেও ততখানি সত্যতা থাকবে, অর্থাৎ কার্য উৎপন্ন করার মতো কারণকে ততখানি পর্যাপ্ত হওয়া দরকার। যার মধ্যে বেশী সত্যতা আছে বা যা সবচেয়ে পূর্ণ, তা কখনও কম সত্যতা

---

1. যে বৈশিষ্ট্যের দ্বারা ত্রিভুজের সংজ্ঞা নির্দেশ করা হয় সেই বৈশিষ্ট্য ছাড়া যেমন ত্রিভুজ ত্রিভুজ নয়, তেমনি অস্তিত্ব ছাড়া ঈশ্বর ঈশ্বর নয়। পার্থক্য হল এই যে, ত্রিভুজের বেলায় আমরা কোন ত্রিভুজের অস্তিত্বের বিষয়টি অনুমান করে নিতে পারি না, কেননা 'অস্তিত্ব' ত্রিভুজত্বের সারধর্ম (essence) নয়। কিন্তু পূর্ণতম সত্তার ক্ষেত্রে আমরা ঈশ্বরের অস্তিত্ব অনুমান করতে পারি, কেননা অস্তিত্ব হল একটি প্রয়োজনীয় গুণ যেটি ছাড়া কোন সত্তা সীমাহীন ভাবে পূর্ণ হতে পারে না।

আছে বা তার চেয়ে কম পূর্ণ, এমন বিষয়ের কার্য হতে পারে না। কাজেই ঈশ্বরের ধারণার কারণ আমি হতে পারি না যেহেতু আমি একজন সীমিত অপূর্ণ সত্তা। ঈশ্বরের ধারণা হল পূর্ণ অসীম সত্তার ধারণা। কাজেই কোন অসীম পূর্ণ সত্তা, অর্থাৎ ঈশ্বর আমার মনের মধ্যে এই ধারণা সংস্থাপিত করেছেন। সুতরাং ঈশ্বরের অস্তিত্ব আছে।

তৃতীয় যুক্তি ঃ তৃতীয় যুক্তিটি প্রায় দ্বিতীয় যুক্তিটির মতনই, অর্থাৎ দেকার্ত অন্য আর একভাবে উপরিউক্ত যুক্তিটিকে উপস্থাপিত করেছেন। এই যুক্তির ক্ষেত্রে দেকার্ত নিজের অপূর্ণতা এবং সেই অপূর্ণতার জ্ঞান থেকেই ঈশ্বরের অস্তিত্ব অনুমান করতে চান। দেকার্তের যুক্তি হল এই যে, তিনি কখনও নিজের স্রষ্টা হতে পারেন না, যেহেতু তাঁর পূর্ণতার ধারণা আছে এবং তিনি জানেন যে তিনি নিজে অপূর্ণ। তিনি যদি নিজেকে নিজে সৃষ্টি করতেন বা নিজের অস্তিত্বের কারণ হতেন তাহলে তাঁর মনে যে পূর্ণতার ধারণা আছে তিনি তার কারণ হতেন অর্থাৎ তিনি ঈশ্বরের মতন পূর্ণ হতেন। কিন্তু যেহেতু তিনি অপূর্ণ, সেইহেতু তিনি নিজেকে সৃষ্টি করেননি। কাজেই দেকার্ত সিদ্ধান্ত করলেন যে, তিনি এবং অন্যান্য সসীম জীব, (যদি একান্তই তাদের কোন অস্তিত্ব থাকে) নিশ্চয়ই ঈশ্বরের দ্বারা সৃষ্ট, যে ঈশ্বর এক পূর্ণ সত্তা এবং যার থেকে সব সসীম জীব উদ্ভূত। কাজেই ঈশ্বরের অস্তিত্ব আছে এবং তিনি স্বয়ংসৃষ্ট।

সমালোচনা ঃ ঈশ্বরের অস্তিত্বের পক্ষে দেকার্তের যুক্তিগুলিকে নানাভাবে সমালোচনা করা হয়েছে। **প্রথমতঃ,** দেকার্ত বিনা প্রমাণেই ধরে নিয়েছেন যে আমাদের মনে ঈশ্বরের ধারণা আছে। তিনি যদি দেখাতে পারতেন যে ঈশ্বরের ধারণা হল এমন ধারণা যেটি আমরা চিন্তা করতে বাধ্য, অর্থাৎ কিনা একটি অনিবার্য ধারণা, তাহলে ঈশ্বরের অস্তিত্বের পক্ষে প্রদত্ত তাঁর যুক্তি আরও জোরালো হত।

সমালোচনা

দ্বিতীয়তঃ, দেকার্তের ঈশ্বরের ধারণা একটি সদর্থক বা ভাবাত্মক ধারণা। কিন্তু অভিজ্ঞতাবাদীরা মনে করেন যে পূর্ণতা, অসীমতা প্রভৃতি ধারণা নঞর্থক বা অভাবাত্মক (negative) ধারণা। এই শব্দগুলি কেবলমাত্র কোন বিষয়ের অনুপস্থিতিই নির্দেশ করে। দেকার্ত অসীমতার ধারণাকেই সদর্থক ধারণারূপে গ্রহণ করেছেন, কিন্তু তার সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা দিতে পারেন নি।[1]

---

1. তবে এই প্রসঙ্গে গ্যাসেন্ডির মন্তব্য হল 'ঈশ্বর' পদটি যে বৈশিষ্ট্য সূচিত করে 'অসীম' পদটি তার তুলনায় অনেক কম বৈশিষ্ট্য সূচিত করে (the term Infinitive connotes much less than is signified by God)। তবে যুক্তিটির একেবারেই কোন গুরুত্ব নেই বলে গ্যাসেন্ডি মনে করেন না। যুক্তিটি একটি বিষয় নির্দেশ করে যে ঈশ্বরের নিজের জন্যই মানুষের মধ্যে ঈশ্বরের জ্ঞানের

তৃতীয়তঃ, দেকার্ত অস্তিত্বকে একটা গুণ হিসেবে গণ্য করেছেন। কিন্তু অস্তিত্ব কি একটি গুণ? কোন টেবিলের চতুষ্কোণত্ব বা লালবর্ণের গুণ আছে বলা যেতে পারে, কিন্তু টেবিলের 'অস্তিত্ব'-রূপ গুণটি রয়েছে কি অনুরূপভাবে বলা যেতে পারে? টমাস্ একুইনাস্ মনে করেন যে, ঈশ্বরের অস্তিত্বের পক্ষে তত্ত্ব বিষয়ক যুক্তিটি 'অস্তিত্বকে' গুণ হিসেবে গণ্য করে। কিন্তু অস্তিত্ব গুণ নয়, চতুষ্কোণত্ব বা লালবর্ণ যে অর্থে গুণ সেই অর্থে নিশ্চয়ই নয়। 'অস্তিত্বশীল হওয়া' যদি ঈশ্বরের গুণ হয়, তবে ঈশ্বর অস্তিত্বশীল কিনা এই প্রশ্ন অবান্তর হয়ে পড়ত। এই কারণেই যুক্তির দিক থেকে যেমন ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করা সম্ভব, তেমনি যুক্তির দিক থেকে ঈশ্বরের অস্তিত্ব অস্বীকার করাও সম্ভব।

চতুর্থতঃ, কোন কিছু সম্পর্কে আমার নিছক চিন্তা বা ধারণাই তার বাস্তব সত্তা প্রমাণিত করে না; কাজেই চিন্তার বিষয়টি যদি 'অস্তিত্ব' হয় তাহলেই যে প্রমাণ বা যুক্তিটি বেশ জোরালো হল, তা নয়। নিছক অস্তিত্বের ধারণা প্রকৃত বা বাস্তব অস্তিত্বের প্রমাণ নয়। খাদ্য বা বস্ত্রের নিছক ধারণা যথাক্রমে খাবার টেবিলটিকে ভরিয়ে তোলে না বা অনাবৃত দেহকে আবরণের দ্বারা উত্তপ্ত করে তোলে না।

পঞ্চমতঃ, কাণ্ট এবং কাণ্ট পরবর্তী দার্শনিকবৃন্দ দেকার্তের প্রথম প্রমাণটির কঠোর সমালোচনা করেছেন। দেকার্তের প্রথম যুক্তিটি দুটি ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত (১) অস্তিত্ব পূর্ণতার অত্যাবশ্যকীয় গুণ এবং (২) পূর্ণতম সত্তার ধারণা থেকেই অভিজ্ঞতার সহায়তা ছাড়া, শুধুমাত্র বিশ্লেষণের মাধ্যমে, তার বাস্তব অস্তিত্ব অনুমান করা যেতে পারে। কাণ্ট দেখালেন যে, অস্তিত্বের নিছক ধারণা কোন বস্তুর বাস্তব অস্তিত্ব প্রমাণ করে না। **ঈশ্বরের 'ধারণা' থেকে ঈশ্বরের অস্তিত্বের ধারণা করা যেতে পারে, ঈশ্বরের বাস্তব অস্তিত্ব অনুমান করা যেতে পারে না।** দেকার্ত অস্তিত্বের ধারণার (idea of existence) সঙ্গে বাস্তব অস্তিত্বকে (real existence) গুলিয়ে ফেলেছেন। কাণ্টের মতে অস্তিত্বের ধারণা এবং বাস্তব অস্তিত্বের মধ্যে যে সম্পর্ক সেটা বৈশ্লেষিক নয়, সংশ্লেষক। অস্তিত্বের ধারণা থেকে বিশ্লেষণের মাধ্যমে বাস্তব অস্তিত্বে উপনীত হওয়া যায় না। কোন কিছুর বাস্তব অস্তিত্ব প্রমাণ করতে হলে, বাস্তব অভিজ্ঞতার প্রয়োজন। ধারণা থেকেই যদি বাস্তব অস্তিত্ব পাওয়া যেত তাহলে, কাণ্ট বলেন, আমার পকেটে একশত ডলার আছে

কাণ্টের সমালোচনা

অস্তিত্ব। মানুষের মধ্যে তাঁর ধারণার পর্যাপ্ত হেতুও তিনি নিজেই। (...that man's knowledge of God is due to God himself. He is the sufficient reason of the idea of himself in man)

ধারণা করলেই আমার পকেটে একশত ডলারের বাস্তব অস্তিত্ব প্রত্যক্ষ করতাম। কিন্তু বাস্তবে তা দেখি না। তেমনি ঈশ্বরের ধারণা থেকে কখনও ঈশ্বরের বাস্তব অস্তিত্ব পাওয়া যেতে পারে না।[1]

দেকার্তের বক্তব্যের সমালোচনা করতে গিয়ে কাণ্ট যে দেকার্তের বক্তব্যকে প্রথমেই সরাসরি অস্বীকার করলেন তা নয়। তিনি দেকার্তের এই দাবী অস্বীকার করতে চাইলেন না যে, একটা ত্রিভুজের ধারনাকে বিশ্লেষণ করলে যেমন তার তিনটি কোণের অস্তিত্বের বিষয়টিকে অস্বীকার করা চলে না, তেমনি ঈশ্বরের ধারণাকে বিশ্লেষণ করলে তার অস্তিত্বের ধারনা যে সেই ধারনার অন্তর্ভুক্ত, তা অস্বীকার করা চলে না। কিন্তু কাণ্টের বক্তব্য হল, তাই বলে কি এটা মেনে নিতে হবে, বা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে হবে যে, উদ্দেশ্য তার বিধেয় সহ বাস্তবে অস্তিত্বশীল? বিশ্লেষণের দিক থেকে যে বিষয়টি সত্য, তা হল, যদি কোন ত্রিভুজ থাকে, তার অবশ্যই তিনটি কোণ থাকবে। এবং যদি কোন অসীম পূর্ণ সত্তা থাকে তাঁর অস্তিত্ব থাকবে। কাণ্ট বলেন, "ত্রিভুজের কথা বলা এবং তার তিনটি কোণকে অস্বীকার করা আত্ম-বিরোধিতা দোষে দুষ্ট। কিন্তু তিনটি কোণ সহ ত্রিভুজকে অস্বীকার করার মধ্যে কোন আত্ম-বিরোধিতা নেই। সর্বনিরপেক্ষ অবশ্যম্ভাবী সত্তা সম্পর্কে ঐ একই কথা প্রযোজ্য।"

কাণ্ট দেকার্তের বক্তব্যকে সরাসরি অস্বীকার করলেন না

কাণ্ট আরও গভীর সমালোচনায় অগ্রসর হয়ে যে মৌলিক ধারণাটির উপর দেকার্তের যুক্তিটি প্রতিষ্ঠিত সেটিকেই অস্বীকার করলেন। কাণ্ট যেটি অস্বীকার করতে চাইলেন সেটি হল অস্তিত্ব, ত্রিভুজত্বের মতনই একটি বিধেয়, কেউ যার অধিকারী হতে পারে বা কারও মধ্যে যার অভাব থাকতে পারে বা কোন কোন ক্ষেত্রে যাকে বিশ্লেষণের মাধ্যমে কোন উদ্দেশ্যের সঙ্গে যুক্ত করা যেতে পারে। কাণ্ট বলেন যে অস্তিত্বের ধারণা, কোন বিশেষ বস্তুর ধারনাতে বা কোন এক জাতীয় বস্তুর ধারনাতে কিছু যোগ করে দিতে পারে না। কাল্পনিক একশত ডলারের সংখ্যার সঙ্গে বাস্তবে একশত ডলারের

কাণ্ট দেকার্তের মৌলিক ধারণাটিকেই অস্বীকার করলেন

1. আমার মনে একশত ডলারের ধারণা কখনই আমার পকেটে বাস্তবে অস্তিত্বশীল একশত ডলারের ধারণার অনুরূপ নয়। কাণ্ট দেখাতে চাইলেন যে অস্তিত্বশীল কোন বস্তুর ধারণা বস্তুটির নিছক ধারণার ক্ষেত্রে নতুন কিছু যোগ করে দিতে পারে না (the conception of a thing as existing adds nothing fresh to the bare conception of it)। মনে মনে আমরা যে পূর্ণতম সত্তার ধারণা করি, ধারণা হিসেবে তার মধ্যে কোন অভাব নেই, যদিও বাহ্যজগতে তার অস্তিত্ব নেই এখন বাস্তব বা 'অস্তিত্বশীল' হওয়ার বৈশিষ্ট্যটি এই ধারণার সঙ্গে যোগ করে দিয়ে ধারণাটিকে উন্নত করা যায় না।

সংখ্যার দিক থেকে কোন পার্থক্য নেই। যখন বলা হয় ডলারের অস্তিত্ব রয়েছে বা তারা মিথ্যা নয়, তখন আমরা ডলারের ধারণাকে জগতের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করি। যখন বলা হয় 'ক' এর অস্তিত্ব রয়েছে তখন তার অর্থ এই নয় যে, 'ক'র অন্যান্য গুণের মতন অস্তিত্বও তার একটি গুণ, আসলে যা ব্যক্ত করা হয় তা হল 'ক'-এর বাস্তব জগতে অস্তিত্ব রয়েছে।

বার্ট্রেণ্ড রাসল (*Bertrand Rusell*)-ও 'অস্তিত্ব' শব্দটির বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বলেন যে, ব্যাকরণের দিক থেকে 'অস্তিত্ব' শব্দটি বিধেয় হলেও, যৌক্তিক দিক থেকে (logically) এটি একটি ভিন্ন ক্রিয়া সাধিত করে। যখন বলা হয় 'গরু অস্তিত্বশীল', তখন গরুর ক্ষেত্রে 'অস্তিত্ব' এই গুণটি প্রয়োগ করা হয় না। বরং এই কথা বোঝান হয় যে, জগতে এমন বস্তু আছে যার ক্ষেত্রে 'গরু' এই শব্দটির মাধ্যমে আমরা যা বর্ণনা করতে চাই, তাকে প্রয়োগ করা যেতে পারে।

রাসেল-এর মন্তব্য

অস্তিত্ব (existence) পূর্ণতার কোন গুণ নয়। পূর্ণতম সত্তার ধারণা থেকেই পূর্ণতম সত্তার অস্তিত্বের ধারণা পাওয়া যেতে পারে কিন্তু তাতে পূর্ণতম সত্তার বাস্তব অস্তিত্ব প্রমাণিত হয় না। 'অস্তিত্ব' যদি পূর্ণতার কোন গুণ হয় এবং ঈশ্বর যদি পূর্ণতম সত্তা হন তাহলে ঈশ্বরের অস্তিত্ব অবশ্যই স্বীকার করে নিতে হয়। কিন্তু অস্তিত্ব পূর্ণতার কোন গুণ নয়। কোন গুণের অধিকারী হতে হলে একটা বস্তুকে প্রথমে অস্তিত্বশীল হতে হবে। অনুরূপভাবে 'পূর্ণতা' গুণের অধিকারী হতে হলে প্রথমে ঈশ্বরকে অস্তিত্বশীল হতে হবে। কাজেই ঈশ্বরের পূর্ণতা থেকে ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ করা যায় না। যা 'অস্তিত্বশীল' তাতে অস্তিত্ব গুণ আরোপ করা একই বিষয়ের পুনরুক্তি ছাড়া কিছুই নয়।

জন হিক এই প্রসঙ্গে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেন যে, এনসেলেম এবং দেকার্ত ধারণা করেছিলেন যে ঈশ্বরের সংজ্ঞাতে, 'অস্তিত্বকে' ঈশ্বরের যোগ্য গুণ বা বিধেয় হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে বা অবশ্যই করা উচিত। তা যদি হয় তা হলে তত্ত্ব হিসেবে যুক্তি বৈধ। কেননা ধারণার যোগ্য, সর্বাপেক্ষা পূর্ণ সত্তার, 'অস্তিত্ব' রূপ গুণের অভাবের কথা স্বীকার করা চলে না। কিন্তু অস্তিত্ব শব্দটি ব্যাকরণের দিক থেকে বিধেয় রূপে গণ্য হলেও, আসলে এটি যে বিষয়টি ব্যক্ত বা ঘোষণা করতে চায়, তা হল, এটি একটি বর্ণনা, যা বাস্তবে কোন কিছুর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। এই বিষয়টি স্বীকার করে নিলে ঈশ্বরের অস্তিত্বের পক্ষে তত্ত্ববিষয়ক যুক্তিটিকে বৈধ গণ্য করা চলে না। 'অস্তিত্ব' যদি 'বিধেয়' (predicate) না হয়, তাহলে এটি ঈশ্বরের সংজ্ঞা নিরূপক বিধেয় রূপে গণ্য হতে পারে না এবং

জন হিকের মন্তব্য

ধারণার যোগ্য এমন পূর্ণতম সত্তার বাস্তব অস্তিত্ব আছে কিনা, এই প্রশ্ন থেকেই যায়। হিক বলেন, "ঈশ্বরের সংজ্ঞা ঈশ্বর সম্পর্কে কারও ধারণা ব্যক্ত করে, কিন্তু এইরূপ কোন সত্তার বাস্তব অস্তিত্ব প্রমাণ করতে পারে না।"

তত্ত্ববিষয়ক যুক্তি সম্পর্কে দার্শনিকের মন্তব্য:

কাণ্টের পূর্বোক্ত অভিযোগের উত্তরে অবশ্য একথা বলা যেতে পারে যে, অস্তিত্ব বলতে যদি কাণ্ট ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষের বিষয়বস্তু হিসেবে বিশেষ বস্তুর অস্তিত্বের কথা বুঝে থাকেন (যেমন কাণ্টের ডলারের উদাহরণ) তাহলে নিছক চিন্তা বা ধারণা থেকে অস্তিত্ব অনুমান করা যায় না। এই সব বস্তু সম্ভাব্য (contingent) বা সাপেক্ষ, কাজেই তাদের ধারণা থেকে তাদের অবশ্যম্ভাবী (necessary) অস্তিত্ব অনুমান করা যেতে পারে না। কিন্তু এমন কতকগুলি বিষয় আছে, যাদের সম্পর্কে এই নিয়ম খাটে না। বিশেষ করে একটি ধারণা আছে, যার ধারণাই তার অস্তিত্ব প্রমাণ করে, এবং এই ধারণা হল এক বিশ্ব আত্ম-চেতনার (Universal self-consciousness) বা পরম ধীশক্তির ধারণা। হেগেল-এর মতে ব্যক্তির আত্ম-চেতনার কথা বলতে গেলেই পূর্ব থেকে বিশ্ব-আত্মচেতনার কথা স্বীকার করে নিতে হয়। কাজেই বিশ্ব-আত্ম চেতচার ধারণার মধ্যেই তার বাস্তব অস্তিত্বের প্রমাণ নিহিত।[1]

কাণ্টের অভিযোগের উত্তর

হেগেলের বক্তব্য

তত্ত্ববিষক যুক্তিটির যথার্থ অর্থ হেগেল উপলব্ধি করেছিলেন এবং চিন্তা (thought)-ও সত্তাব (reality) অভিন্নতার মাধ্যমেই তিনি তা প্রকাশ করেছেন। দেকার্ত যেভাবে তত্ত্ববিষয়ক যুক্তিটিকে উপস্থাপিত করেছেন, সেটি দুর্বল। যদি দেকার্ত হেগেলের মতো দেখাতে পারতেন যে আমাদের আত্মচেতনার সঙ্গে ঈশ্বরের ধারণা অবশ্যম্ভাবীভাবে যুক্ত, তাহলে তাঁর যুক্তিটির মূল্য সম্যক ভাবে প্রতিষ্ঠিত হত।

হেগেলের যুক্তিটির ব্যাখ্যা

1. চিন্তাকে পূর্ব থেকে স্বীকার করে না নিলে, কোন কিছুর অস্তিত্ব আছে বলা যেতে পারে না। একটা চেতনাকে পূর্ব থেকে স্বীকার নেওয়ার প্রয়োজন আছে, যার জন্য এবং যাতে সব কিছুর অস্তিত্ব। কিন্তু সে চেতনা কোন ব্যক্তি বিশেষের চেতনা নয়, যার নাস্তিক চিন্তা করা অসম্ভব নয়। কাজেই সব জ্ঞান এবং চিন্তার জন্য পূর্ব থেকে কোন বিশ্বচেতনার অস্তিত্ব স্বীকার করে নিতে হয়, যা সব ব্যক্তি-বিশেষের আত্মার অন্তবর্তী, যা সব আত্মার, সব চিন্তার বস্তুর ঐক্য, এবং এ ক্ষেত্রে চিন্তা থেকেই আমরা অস্তিত্বে উপনীত হতে পারি। কেননা এই ধারণা ছাড়া চিন্তাই অসম্ভব হয়ে পড়বে। এই ধারণার বাস্তবতা চিন্তার পক্ষে এতই মৌলিক বিষয় যে, একে সন্দেহ করার অর্থ হল সব চিন্তার, সব অস্তিত্বের ধ্বংসসাধন করা।

গ্যালোয়ে বলেন যে, তত্ত্ববিষয়ক যুক্তিটিকে ঈশ্বরের অস্তিত্ব বিষয়ক প্রমাণ রূপে গ্রহণ করা না গেলেও, যুক্তিটির মধ্যে কিছুটা সত্যতা নিহিত আছে।

যুক্তিটির সত্যতা সম্পর্কে গ্যালোয়ের অভিমত

যদি ঈশ্বরের বদলে আমরা এমন এক শুদ্ধ সত্তার (Being) কথা কল্পনা করি যিনি সব সত্তার (reality) সমষ্টি, তাহলে এইরূপ ধারণাকে নিছক আমাদের মনের কাল্পনিক ধারণা মনে করা কঠিন হবে। কারণ চিন্তন সত্তা নির্দেশ করে এবং সত্তা ছাড়া চিন্তন অর্থহীন। কোন সত্তা (Being) না থাকলে চিন্তাও থাকবে না এবং তাই যদি হয় তাহলে সবচেয়ে বাস্তব সত্তা (most real being) বা সত্তার সমষ্টি (a sum of reality) বলে কিছু নেই বলাটা অর্থহীন হবে। এই জাতীয় ধারণার মধ্যে কোন বিরোধ নেই ; এই জাতীয় ধারণাকে অস্বীকার করাও চলে না।

তত্ত্ববিষয়ক যুক্তিকে যদি এই রূপ দেওয়া হয় তাহলে এটাকে যথার্থ বলে অভিহিত করা যেতে পারে। কিন্তু তাহলে এটা কোন ধর্মীয় উদ্দেশ্য সিদ্ধ করবে না। আসলে

লোটজার মন্তব্য

তত্ত্ববিষয়ক যুক্তিটির তাৎপর্য উপলব্ধি করতে গিয়ে লোটজা (*Lotze*) যা বলেছেন তা অনুধাবন করতে হবে। লোটজা বলেন, এই যুক্তিটি নির্দেশ করে যে, পরমসত্তা, যা পরমমূল্য, তা নিছক মনের একটা ভ্রান্তি, এটা বিশ্বাস করার অনিচ্ছা মানুষের মনেই নিহিত। গ্যালোয়ে বলেন, মানুষ তার যে

গ্যালোয়ের মন্তব্য

বিশ্বাস সম্পর্কে অন্য বিষয়ের ভিত্তিতে সুনিশ্চিত, সেই বিশ্বাসকে যে ভাবে মানুষ নিজের কাছে সমর্থন করার চেষ্টা করেছে তারই একটি কৃত্রিম উপায় তত্ত্ববিষয়ক যুক্তিটির দ্বারা নির্দেশিত হয়েছে। কেয়ার্ডের মতে তত্ত্ববিষয়ক যুক্তিটির প্রকৃত অর্থ হল যে, আধ্যাত্মিক সত্তা হিসেবে আমাদের সমগ্র চেতনজীবন একটি বিশ্বচেতনার উপর প্রতিষ্ঠিত, যা নিছক মনের ধারণা নয় এবং যা তার অনিবার্য অস্তিত্বের প্রমাণ নিজেই বহন করে বেড়ায়। এই প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে যে, কোন কোন ধর্মতত্ত্ববিদ বা ঈশ্বরতত্ত্ববিদ যেমন, কার্ল বার্থ (*Karl Barth*) মনে করেন যে, এনসেলেম প্রদত্ত যুক্তি ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণের কোন প্রচেষ্টা নয়। এই যুক্তির মধ্যে রয়েছে ঈশ্বরের নিজেকে প্রত্যাদিষ্ট করার ব্যাপারে যে তাৎপর্য বর্তমান, তাকে প্রকাশ করা—সেটি হল ঈশ্বর-বিশ্বাসী ব্যক্তি ঈশ্বরকে যেন ধারণাযোগ্য পূর্ণতম সত্তার থেকে কোন অংশে ছোট বলে গণ্য না করে।

(খ) বিশ্বতত্ত্ববিষয়ক বা আদি কারণ-বিষয়ক যুক্তি (The Cosmological or Causal Argument) : [1]এই যুক্তিটি জগতকে প্রদত্ত বিষয়রূপে

1. "It sets out from the world as given, and from the charecter of the world infers the existence of a God to explain it.'
— G. Galloway : The Philosophy of Religion ; Page 387

গ্রহণ করে, জগতের ব্যাখ্যার জন্য জগতের প্রকৃতি থেকেই ঈশ্বরের অস্তিত্বের অনুমান করে। এই যুক্তিটি খুবই প্রাচীন। এই চিন্তাধারার ইঙ্গিত আমরা দেখতে পাই প্লেটোর '*Timoeus*'-এতে যেখানে তিনি বলেছেন যে প্রত্যেক সৃষ্ট বস্তু নিশ্চয়ই কোন কারণের দ্বারা সৃষ্ট। [1]এ্যারিস্টটল সর্বপ্রথম এই যুক্তিটিকে উপস্থাপিত করেন। ত্রয়োদশ শতাব্দীর চিন্তাধারার বিকাশে এ্যারিস্টটলের চিন্তাধারার একটি উল্লেখযোগ্য অবদান থাকায় মধ্যযুগীয় দর্শনে এই যুক্তিটির পুনরাবির্ভাব ঘটে। টমাস একুইনাস-এর বিখ্যাত 'পাঁচটি প্রমাণ' এই যুক্তিটিরই ঈষৎ পরিবর্তিত রূপ।

তত্ত্ববিষয়ক যুক্তিটির তুলনায় এই যুক্তিটিকে অধিকতর কার্যকর মনে হয়, কেননা দৈনন্দিন জীবনকে ভিত্তি করেই যুক্তিটি উপস্থাপিত হয়েছে।

তত্ত্ববিষয়ক যুক্তির মতন ঈশ্বরের ধারণা থেকে তার আভ্যন্তরীণ তাৎপর্য উদ্ঘাটনে সচেষ্ট না হয়ে একুইনাস-এর যুক্তিগুলি এই জগতের কতকগুলি সাধারণ বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে যে বিষয়টি ব্যক্ত করতে চেয়েছে তা হল, এই জগতের যে-সব বিশেষ বৈশিষ্ট্য আমরা দেখছি, সেই বৈশিষ্ট্যসহ এই জগতের অস্তিত্বের কথা বলা যেত না যদি না কোন পরমসত্তা, যাঁকে আমরা ঈশ্বর বলে অভিহিত করতে পারি, তাঁর অস্তিত্ব না থাকত। প্রথম যুক্তিটির ক্ষেত্রে তিনি গতি (motion) থেকে গতির আদিম প্রবর্তক (Prime Mover), দ্বিতীয় যুক্তিটির ক্ষেত্রে কার্যকারণ থেকে আদি কারণের ; তৃতীয় যুক্তির ক্ষেত্রে সম্ভাব্য সত্তা থেকে অবশ্যম্ভাবী সত্তার ; চতুর্থ যুক্তির ক্ষেত্রে মূল্যের ক্রম থেকে সর্বনিরপেক্ষ মূল্য বা মান (Absolute Value)-এর এবং পঞ্চম যুক্তিটির ক্ষেত্রে প্রকৃতিতে উদ্দেশ্যের ভিত্তিতে কোন ঐশ্বরিক পরিকল্পনাকারীর অস্তিত্বের পক্ষে যুক্তি উপস্থাপনে সচেষ্ট হয়েছেন।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে এই যুক্তির বিভিন্ন রূপ আছে। কিন্তু সব কটি যুক্তিই কার্যকারণ নীতির (Principle of Causation) উপর ভিত্তি করেই উপস্থাপিত হয়েছে।

(*i*) **বিশ্বতত্ত্ববিষয়ক** বা **আদি কারণ-বিষয়ক যুক্তির প্রথম রূপ:** কার্যকারণ নীতির উপর ভিত্তি করে এই যুক্তি উপস্থাপিত হয়েছে। কার্যকারণ নীতি অনুসারে প্রত্যেক কার্যেরই কোন-না-কোন কারণ আছে। বিনা কারণে কোন কার্যের উদ্ভব সম্ভব নয়। কাজেই এই সৃষ্ট জগতেরও কোন কারণ আছে। সৃষ্ট জগতের কারণ কোন সসীম বস্তু হতে পারে না। কেননা

যুক্তিটির প্রথম রূপ

1. Ibid : (384-322 Bc)·

তাহলে তার আবার কারণ অনুসন্ধান করতে হবে। জগতের কারণ অসীম (infinite) হওয়া প্রয়োজন। এই কারণ হল ঈশ্বর।

সমালোচনা: (১) জগৎ সসীম ও সান্ত, তার কারণ, অসীম অনন্ত ঈশ্বর কি ভাবে হতে পারে? অসীম ও সর্বনিরপেক্ষ কারণ থেকে সসীম কার্যের সিদ্ধান্ত করা যায়। কিন্তু সসীম কার্য থেকে অসীম কারণের অস্তিত্ব অনুমান করা যায় না। ন্যায়-অনুমানে সিদ্ধান্ত কখনও আশ্রয় বাক্য থেকে ব্যাপকতর হতে পারে না। কাজেই সান্ত ও সসীম বস্তু থেকে অনন্ত ও অসীম ঈশ্বরের অস্তিত্ব সিদ্ধান্ত করা সম্ভব নয়। (২) ঈশ্বর যদি হন অনন্ত সত্তা, তাহলে এই জগতের অস্তিত্ব কি তার অনন্তত্বের হানি ঘটিয়ে তাকে সসীম ও সান্ত বস্তুতে পরিণত করবে না?

সমালোচনা

(ii) **বিশ্বতত্ত্ববিষয়ক** বা **আদি কারণ-বিষয়ক যুক্তির দ্বিতীয় রূপ:** প্রতিটি কার্যের যদি একটা কারণ স্বীকার করা যায়, তাহলে সেই কারণের আবার একটা কারণ স্বীকার করতে হয়। এই জগতের অসংখ্য বস্তু বা ঘটনা পরস্পরের সঙ্গে এক কারণ শৃঙ্খলে যুক্ত। কাজেই এই জগত হল কার্যকারণের এক নিরবচ্ছিন্ন শৃঙ্খল। কিন্তু প্রত্যেক কারণের যদি একটা কারণ সন্ধান করতে হয় এবং এর যদি কোন শেষ সীমা না থাকে তাহলে অনবস্থা দোষ (infinite regress) ঘটবে। কাজেই অনবস্থা দোষ এড়াবার জন্য কোন আদি কারণ স্বীকার করে নিতে হয়, যা হবে স্বয়ম্ভু (*causa sui*), অর্থাৎ অন্য কোন কারণের কার্য নয়। এই আদি কারণ হল ঈশ্বর।

যুক্তিটির দ্বিতীয় রূপ

সমালোচনা: কাণ্ট এই যুক্তির বিরুদ্ধে অভিযোগ এনেছেন। কাণ্ট বলেন, কার্যকারণ নীতির উপর ভিত্তি করে যদি আমরা ঈশ্বরকে সন্ধান করার জন্য সচেষ্ট হই, তাহলে আমরা খেয়ালখুশীমত কার্যকারণ শৃঙ্খলের কোন একটি জায়গায় হঠাৎ থেমে যেতে পারি না। তাহলে যে নীতির উপর ভিত্তি করে আমাদের যাত্রা শুরু, তাকে অগ্রাহ্য করা হবে। কেয়ার্ডও মনে করেন যে, সান্ত ও সসীম বস্তুর অস্তিত্বের ভিত্তিতে কোন অসীম কারণের অস্তিত্ব প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়।

সমালোচনা

সান্ত ও সম্ভাব্য কার্য থেকে সান্ত ও সম্ভাব্য কারণের অনুমান করা যেতে পারে বা এই ধরনের কারণের সীমাহীন ক্রমের (endless series) কথা চিন্তা করা যেতে পারে। কিন্তু যেহেতু ভ্রান্ত অসীমতা (fales infinity) নিয়ে মন স্থির হতে পারছে না, সেহেতু এই কারণ ক্রমের কোন জায়গায় হঠাৎ থেমে গিয়ে যদি বলা হয় যে, এই একটি কারণ

পাওয়া গেল যা স্বয়ম্ভূ, যা শর্তহীন এবং অসীম, তাহলে এ হবে খেয়ালখুশীর ব্যাপার। ভ্রান্ত অসীমতাকে চিন্তা করার মানসিক অক্ষমতাকে এড়ানোর জন্য হঠাৎ কোন একটি নামকে টেনে আনা এবং সেটি প্রকৃত অসীমতাকে (true infinity) নির্দেশ করছে মনে করা, আসলে যুক্তির নিষ্ফলতাকে মেনে নেওয়া।

একুইনাসের সমসাময়িক কয়েকজন দার্শনিক একুইনাসের যুক্তিটিকে সমর্থন করার অভিপ্রায়ে তাকে একটু অন্যভাবে উপস্থাপিত করতে সচেষ্ট হয়েছেন। তাঁদের ব্যাখ্যা হল কোন একটি ঘটনা বোধগম্য হয়, যখন সেটিকে অন্য আর একটি ঘটনার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত করে ব্যাখ্যা করা হয় এবং সেটিকে যখন অপর আর একটি ঘটনার সঙ্গে সম্পর্ক যুক্ত করে ব্যাখ্যা করা হয়। কাজেই শেষ পর্যন্ত এমন একটি সত্তাকে স্বীকার করে নিতে হয়, যা নিজেকে নিজে ব্যাখ্যা করতে পারে (self-explanatory), যেহেতু এর অস্তিত্বই সমগ্রের চরম ব্যাখ্যা দিতে সমর্থ হয়। এই জাতীয় কোন সত্তা স্বীকার না করলে বিশ্বজগত হয়ে পড়বে এক দুর্বোধ্য শৃঙ্খলাবিহীন ঘটনা মাত্র।

কিন্তু একুইনাসের সমর্থকবৃন্দের দ্বারা উপস্থাপিত, একুইনাস প্রদত্ত যুক্তিটির পরিবর্তিত রূপটির ক্ষেত্রেও দুটি অসুবিধা দেখা দেয়। প্রথমতঃ, যুক্তিটির ক্ষেত্রে একটি প্রশ্ন যেন দেখা দেয় যে, হয় এই বিশ্বজগতের কোন আদি কারণ মেনে নিতে হবে নতুবা বিশ্বজগত শেষ পর্যন্ত দুর্বোধ্য থেকে যাবে। কিন্তু এমন কোন কথা আছে কি যে, এই দুটি বিকল্পের মধ্যে একটিকে ছেড়ে আমাদের অপর একটিকে বাধ্যতামূলকভাবে গ্রহণ করতে হবে? দ্বিতীয়তঃ, যে কথা জন হিক বলেছেন যে, এই যুক্তি বলতে চায় যে কোন ঘটনার কারণসম্পর্কীয় শর্ত নির্দেশ করা মানে হল ঘটনাটিকে বোধগম্য করা। কিন্তু সমসাময়িক বিজ্ঞানই বলে যে কারণসম্পর্কীয় নীতি পরিসংখ্যানগত সম্ভাব্যতার কথাই ব্যক্ত করে। তাছাড়া দার্শনিক হিউম-এর অভিমতানুসারে কার্যকারণ নিয়ম ঘটনার প্রত্যক্ষযোগ্য পারম্পর্যকেই বুঝিয়ে থাকে। এই জাতীয় ব্যাখ্যা মেনে নিলে টমাস একুইনাসের সমর্থকবৃন্দের দ্বারা উপস্থাপিত যুক্তিকে সমর্থন করা যায় কি?

(iii) **বিশ্বতত্ত্ববিষয়ক** বা **আদিকারণ বিষয়ক যুক্তির তৃতীয় রূপ:** বিশ্বতত্ত্ববিষয়ক যুক্তির তৃতীয় রূপটি জগতের সম্ভাব্যতার ভিত্তিতে ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ করতে চায়। আমাদের দৈনন্দিন অভিজ্ঞতায় আমরা যেসব বস্তু প্রত্যক্ষ করি, সেই সব বস্তুর আবশ্যিক অস্তিত্ব নেই (do not exist of necessity)। যে টেবিলটিকে অস্তিত্বশীল দেখছি, সেটি অস্তিত্বশীল না হলেও পারত। এই সব বস্তুর সম্ভাব্য অস্তিত্ব (contingent existence) রয়েছে। কাজেই আমাদের প্রত্যক্ষ

অভিজ্ঞতার কাছে প্রদত্ত যে জগৎ তার কোন স্ব-নির্ভরতা নেই। এই জগৎ কেবলমাত্র সম্ভাব্য। তাছাড়া এই জগৎ দেশ ও কালের দ্বারা সীমিত। কাজেই কোন অনিবার্য (necessary), স্ব-নির্ভর, সর্বনিরপেক্ষ সত্তা আছে, যা হল ঈশ্বর। কাজেই ঈশ্বর অস্তিত্বশীল।

কার্যকারণ নীতির দিক থেকে ব্যক্ত করতে গেলে বলতে হয় এ হল সেই যুক্তি যে, যা অনিবার্যভাবে অস্তিত্বশীল নয় তা অস্তিত্বের জন্য অপরের উপর নির্ভর। কার্যকারণ সম্পর্কযুক্ত সান্ত ও সসীম বস্তুর ক্ষেত্রে যেহেতু অনবস্থা দোষ দেখা দেয়, সেহেতু আমাদের এমন এক সত্তার কথা চিন্তা করতে হয় যা অন্যের উপর নির্ভর না করে অস্তিত্বশীল এবং যা হল স্বয়ম্ভু। সসীম বস্তু যেহেতু সম্ভাব্য এবং অপর্যাপ্ত, সম্ভাব্য বস্তুর অস্তিত্বের কারণ তার মধ্যে নিহিত নয়। কিন্তু কেন সেটি অস্তিত্বশীল তার অবশ্যই একটা কারণ থাকবে। সেই হেতু এই জগতের আড়ালে এমন এক সত্তার সন্ধান করতে আমরা প্রণোদিত হই, যা স্থায়ী এবং অনিবার্য, যার আবশ্যিক অস্তিত্ব (necessary existence) আছে, যা সব কিছুর কারণ, বস্তুতঃ যা কার্যকারণ নীতির ভিত্তিস্বরূপ। সম্ভাব্যতার ধারণার মধ্যে ঈশ্বরের ধারণা প্রচ্ছন্নভাবে বর্তমান। সম্ভাব্য বললেই যা সম্ভাব্য নয়, অর্থাৎ অনিবার্য, তার প্রশ্ন এসে পড়ে।

লোটজা আদি কারণের ধারণাতে 'আবশ্যিকতা' বা 'অনিবার্যতা' গুণটির আরোপে আপত্তি জানিয়েছেন। তাঁর মতে আদি কারণ অনিবার্য হতে পারে না, কারণ যা অপরের উপর নির্ভর নয় তা কখনও অনিবার্য হতে পারে না। কিন্তু আদি কারণ কোন কিছুর উপর নির্ভর হতে পারে না। কাজেই আদি কারণ শর্তহীন হতে পারে, কিন্তু অনিবার্য নয়। আদি কারণকে ঈশ্বরের সঙ্গে অভিন্ন গণ্য করা, এই যুক্তি যা করেছে, নিছক অনুমানমূলক। আদি কারণই যে ঈশ্বর সেই সিদ্ধান্তের সমর্থনে যুক্তি কোথায়? তাছাড়া এই যুক্তি ব্যাখ্যা করতে পারে না, কেন এবং কখন এই জগৎ কার্যরূপে অস্তিত্বশীল হয়েছিল। এই যুক্তি শুধুমাত্র একটি সত্তার নির্দেশ করে, কিন্তু তার বর্ণনাকে এড়িয়ে যায়। এই সত্তা ঈশ্বর হলেও হতে পারে, কিন্তু যুক্তিটি তা প্রমাণ করতে পারে না।

লোটজার সমালোচনা

সাম্প্রতিককালে এই যুক্তিটির বিরুদ্ধে দর্শনের দিক থেকে যে অভিযোগ আনা হয়েছে তা হল এই যে 'অবশ্যম্ভাবী' সত্তার (necessary being) ধারণা দুর্বোধ্য। কেননা কোন বস্তু নয়, শুধুমাত্র বচনই যৌক্তিক দিক থেকে অবশ্যম্ভাবী (logically necessary) গণ্য হতে পারে। কাজেই যৌক্তিক দিক থেকে অবশ্যম্ভাবী বা অনিবার্য এমন কোন সত্তার কথা বলা, ভাষার অপব্যবহার মাত্র।

কিন্তু বিশ্বতত্ত্ববিষয়ক যুক্তির ক্ষেত্রে এই অভিযোগ আনা চলে না। কেননা যুক্তিটিতে কোন যৌক্তিক দিক থেকে অনিবার্য সত্তার (logically necessary being) কথা বলা হয় নি। ঘটনাগত বা তথ্যগত অনিবার্যতার (factual necessity) কথা বলা হয়েছে, ঈশ্বরের ক্ষেত্রে যা নিজে নিজে অস্তিত্বশীল হওয়ার বিষয়টিকে সূচিত করে। এই কারণে ঈশ্বররূপ অনিবার্য সত্তার ধারণার কথা বলা হলে এমন মনে করা যুক্তিসঙ্গত হবে না যে, এমন কথা বলা হচ্ছে 'ঈশ্বর অস্তিত্বশীল' হয় যৌক্তিক দিক থেকে এক অনিবার্য সত্য (a logically necessary truth)।

দ্বিতীয় যুক্তিটির ক্ষেত্রে যেমন, তৃতীয় যুক্তিটির ক্ষেত্রেও যুক্তিটির রূপ দাঁড়িয়েছে এরকম—হয় কোন অনিবার্য সত্তার অস্তিত্ব আছে কিংবা বিশ্বজগত শেষ পর্যন্ত দুর্বোধ্য থেকে যাচ্ছে। এক্ষেত্রে প্রথম বিকল্পটিকে স্বীকার করে নেওয়া যায় যদি দ্বিতীয় বিকল্পটিকে মেনে নেওয়া না যায়। অর্থাৎ কিনা, এমন কথা বলা যে, বিশ্বজগৎ দুর্বোধ্য নয়; কাজেই অনিবার্য সত্তার অস্তিত্ব আছে। কিন্তু সংশয়বাদীরা দ্বিতীয় বিকল্পটিকে অস্বীকার করা দূরে থাকুক, সেটিকে স্বীকার করেন। তাহলে আর বিশ্বতত্ত্ববিষয়ক যুক্তিটি সংশয়বাদীদের কাছে ঈশ্বরের অস্তিত্বের পক্ষে একটি গ্রহণযোগ্য যুক্তি হয়ে ওঠে কি?

(iv) **বিশ্বতত্ত্ববিষয়ক বা আদিকারণ বিষয়ক যুক্তির চতুর্থ রূপ:** মার্টিন্যু এই যুক্তিটির উপস্থাপক। কারণের ধারণার উপর এই যুক্তিটি প্রতিষ্ঠিত এবং কারণের ধারণার বিশ্লেষণ এবং ব্যাখ্যার সাহায্যে এই যুক্তি ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ করে। ঐতিহাসিক দিক থেকে আমরা কারণ সম্পর্কে চারটি ধারণা পাই—(১) কারণ হল কোন দ্রব্য (substance), (২) কারণ হল কোন ঘটনা (phenomenon), (৩) কারণ হল কোন শক্তি (power), (৪) কারণ হল কোন ইচ্ছা (will)। সময় সময় ইচ্ছা (will)-কে কারণরূপে গণ্য করা হয়। আত্মচেতনার (self consciousness) ক্ষেত্রে আমরা ইচ্ছারূপ শক্তি সম্পর্কে সচেতন, যা বাহ্য জগতে পরিবর্তন ঘটায়।

যুক্তিটির চতুর্থ রূপ

মার্টিন্যু (*Martineau*) মনে করেন যে, এই জগতের কারণ বা ভিত্তি হল আমাদের ইচ্ছার মতন কোন ইচ্ছা। এই রকম কোন কারণকে স্বীকার করে নিলেই আমরা কারণের কারণ সন্ধান করা রূপ যে অনবস্থা দোষের উদ্ভব ঘটে, তাকে এড়াতে পারি। আমাদের কাজের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে আমরা ঐ কাজের ক্ষেত্রে আমাদের যে ইচ্ছাকে প্রয়োগ করি তার সাহায্যে তার ব্যাখ্যা দিই। অনুরূপ ভাবে এই জগৎ যদি ঈশ্বরের কার্য হয় তাহলে তার ব্যাখ্যা হিসেবে ঈশ্বরের প্রযুক্ত ইচ্ছার কথা আমরা ব্যক্ত করতে পারি।

সুতরাং ঈশ্বর জগতের কারণ এই অর্থে যে, ঐশ্বরিক ইচ্ছা হল একটা শক্তি যা প্রাকৃতিক জগতে অন্তঃস্যূত এবং সব জাগতিক ঘটনার নিয়ামক নীতিরূপে ক্রিয়া করে। কাজেই মার্টিন্যু আদি কারণরূপে ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করেন।

মার্টিন্যুর ব্যাখ্যা

৩। ভারতীয় ন্যায়দর্শনে আদি কারণ-বিষয়ক যুক্তি (The Causal argument in the Naya Philosophy):

এই জগতের যাবতীয় যৌগিক পদার্থ যেমন—সূর্য, চন্দ্র, গ্রহ, নক্ষত্র, সমুদ্র, পর্বত প্রভৃতি পরমাণুর সংযোগের ফলে উদ্ভূত। এইগুলি হল কার্য, যেহেতু এইগুলি অংশের সমষ্টি বা সমন্বয় এবং দ্বিতীয়তঃ, এইগুলির অবান্তর মহত্ত্ব বা সীমিত পরিসর (limited dismension) আছে। দেশ, কাল, আত্মা প্রভৃতি কার্য নয়, যেহেতু এরা অসীম দ্রব্য এবং অংশের সংযোগে গঠিত নয়। ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ-এর পরমাণু এবং মন কোন কারণের কার্য নয়; কারণ এরা সরল, অবিভাজ্য ও অসীম দ্রব্য। এসব ছাড়া জগতের অন্য সব যৌগিক দ্রব্য কোন কারণের কার্য। কারণ দু'প্রকার—নিমিত্ত কারণ এবং উপাদান কারণ বা সমবায়ী কারণ। জগতের যাবতীয় যৌগিক পদার্থের উপাদান কারণ যদি হয় ক্ষিতি, অপ্, তেজ ও মরুৎ প্রভৃতির পরমাণু, তাহলে এদের নিমিত্ত কারণ বা কর্তা কে? এইসব বস্তুগুলির উপাদান কারণগুলি নিজে নিজেই সংযুক্ত হতে পারে না। যদি কোন কর্তা এইসব উপাদান কারণগুলির মধ্যে সংযোগ সাধন না করে, তাহলে এই সব সৃষ্ট বস্তুর মধ্যে আমরা যে সামঞ্জস্য, শৃঙ্খলা, সূক্ষ্ম কলাকৌশল লক্ষ্য করি তা কখনও সম্ভব হত না। সুতরাং এইরূপ অনুমান করা যেতে পারে যে, এমন কোন কর্তা আছে যার জ্ঞান, চিকীর্ষা ও কৃতি আছে। অর্থাৎ এই উপাদান কারণগুলি কোন উদ্দেশ্যসাধন করতে পাবে, সেই সম্পর্কে তাঁর অপরোক্ষ জ্ঞান আছে এবং উদ্দেশ্য সাধনের ইচ্ছা ও ক্ষমতা আছে। সে কর্তা অবশ্যই সর্বজ্ঞ হবেন। কারণ যিনি সর্বজ্ঞ তাঁর পক্ষেই উপাদান বা পরমাণুগুলি সম্পর্কে অপরোক্ষ জ্ঞান থাকা সম্ভব। সুতরাং এই সর্বশক্তিমান ও সর্বজ্ঞ কর্তা ঈশ্বর ভিন্ন আর কেউ নন।

নৈয়ায়িকদের এই যুক্তির সঙ্গে মার্টিন্যুর আদি কারণবিষয়ক যুক্তির সাদৃশ্য আছে।

মার্টিন্যু জাগতিক কার্যকারণ নীতিকে কেন্দ্র করে তাঁর পরম ভিত্তিরূপে এক চেতন নীতিকে উপনীত হয়েছেন। অনুরূপভাবে নৈয়ায়িক জাগতিক কার্য থেকে শুরু করে জাগতিক কারণের কথা চিন্তা করে এবং জগতের অচেতন জড় উপাদানগুলির সংযোজক কর্তারূপে ঈশ্বরের অস্তিত্বের কথা ব্যক্ত করেছেন।

বিশ্বতত্ত্ববিষয়ক যুক্তির সামগ্রিক মূল্যায়ন :

(১) সংক্ষেপে বলতে গেলে এই যুক্তিটির ভিত্তি হল একটি আদি কারণের (first cause) ধারণা। কিন্তু আদি কারণের এই ধারণা খুবই দুর্বল। কেননা আদি কারণের ধারণা অনুমান করে নেয়, যখন কার্য অর্থাৎ জগতের অস্তিত্ব ছিল না, তখনও আদি কারণ রূপে স্বয়ম্ভূ ঈশ্বর অস্তিত্বশীল ছিল। কিন্তু এই অভিমত যুক্তিগ্রাহ্য নয়। কেননা কার্যকারণ নীতির প্রকৃতি আলোচনা করলে জানা যাবে যে কার্য ও কারণ একই অবিচ্ছিন্ন প্রক্রিয়ার দুটি দিক (two aspects of one continuous process)। কার্য ছাড়া কারণ অর্থহীন। কাজেই এই যুক্তি যেভাবে কার্যকারণনীতিকে প্রয়োগ করতে চায় তা মোটেও বিজ্ঞানোচিত নয়।

(২) কার্যকারণ নীতি অনুসারে প্রতিটি কার্যেরই কারণ থাকবে। তার থেকে কি এই সিদ্ধান্তে আসা যায় যে স্বয়ম্ভূ ঈশ্বর আদি কারণ ?

(৩) কারণের ধারণার সাহায্যে আমরা অভিজ্ঞতায় প্রদত্ত বিভিন্ন উপাদানের মধ্যে সংযোগ প্রতিষ্ঠা করি এবং তাদের সংগঠিত করি, কাজেই যে ঈশ্বরকে এই অভিজ্ঞতার জগতের অতিবর্তী বলে মনে করা হয়, কোন ব্যাখ্যা বা যুক্তি ছাড়া তার ক্ষেত্রে এই ধারণাটি প্রযুক্ত করা উচিত নয়।

(৪) জগৎ কার্য, কিন্তু তার কারণ স্বরূপ অসীম ও অনন্ত ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণিত হয় না। অসীম ঈশ্বরকে জগতের কারণ বলে বিশ্বাস করা যেতে পারে কিন্তু এই বিশ্বাসকে যুক্তির দ্বারা প্রমাণ করা কঠিন।

(৫) এই যুক্তি অনুমান করে নেয় যে, কারণের বহুত্ব নয়, কারণের একত্বই কার্যকারণ ক্রমের সম্পর্কে যথার্থ মতবাদ। যেহেতু জগতে কার্যকারণ ক্রম বহু, এটা সিদ্ধান্ত করা যুক্তিযুক্ত নয় যে, সব কার্যকারণ ক্রম একটি মাত্র কারণে এসে শেষ হয়েছে। আদি কারণের বহুত্ব অনুমান করতে বাধা কোথায় ?

(৬) কারণ শৃঙ্খলের আদি কারণরূপে ঈশ্বর অস্তিত্বশীল, যদি এইরূপ অনুমান করে নেওয়া হয় তাহলে এইরূপ প্রকল্পের বিশেষ প্রয়োজন আছে মনে হয় না। কারণ এটুকু অনুমান করে নিলেই যথেষ্ট হবে যে, কার্যকারণ শৃঙ্খলের কোন শুরু নেই।

(৭) গ্যালোয়ে বলেন, প্রমাণ ছাড়া এই জগত রূপ উপাত্ত (data)-কে সম্ভাব্য বলে অনুমান করা ন্যায়সঙ্গত নয় ; এবং যদি তাই হয় তার থেকে এই সিদ্ধান্ত করা চলবে না যে, জগৎ সম্পূর্ণভাবে সম্ভাব্য। তাছাড়া এটা বোধগম্য নয় যে, সম্ভাব্য ঘটনার দ্বারা পূর্ণ জগৎ কি ভাবে অনিবার্য সত্তা থেকে নিঃসৃত হয়।

(৮) আধুনিক কালে এই যুক্তিটির বিরুদ্ধে একটি অভিযোগ উত্থাপিত হয়েছে।

বিশ্বতত্ত্ব বিষয়ক যুক্তি অনুসারে ঈশ্বর অনিবার্যভাবে অস্তিত্বশীল। অনিবার্য এই অর্থে যে তাঁর নাস্তিত্ব ধারণাতীত। ঈশ্বরের নাস্তিত্বের কথা চিন্তা করা হল বৃত্তাকার বর্গক্ষেত্র চিন্তা করার অনুরূপ। বিশ্বতত্ত্ববিষয়ক যুক্তি যখন বলে যে ঈশ্বর অবশ্যই অস্তিত্বশীল হবে (God must exist), তখন 'ঈশ্বর কি অস্তিত্বশীল' ? —এই প্রশ্ন অবান্তর। কিন্তু বিশ্বতত্ত্ববিষয়ক যুক্তি এই প্রশ্নেরই উত্তর দিতে চায়। ঈশ্বরের অস্তিত্ব যদি স্বতঃসিদ্ধ বিষয় হয় তাহলে বিশ্বতত্ত্ববিষয়ক যুক্তির অবতারণা হয়ে পড়ে অবান্তর বিষয়। ঈশ্বর কি অস্তিত্বশীল ? —এই প্রশ্ন যখন উত্থাপন করা হয় তখন ঈশ্বর অস্তিত্বশীল হতে পারে, নাও হতে পারে—এই দুই সম্ভাবনাকেই স্বীকার করে নেওয়া হয়। নতুবা প্রশ্নটি উত্থাপন করার কোন প্রয়োজন দেখা দেয় না।

এই অভিযোগটিকেই অন্য ভাবে উপস্থাপিত করে বলা হয় যে, কোন সত্তার অস্তিত্ব কি ভাবে স্বতঃসিদ্ধ হতে পারে? সব সত্তার প্রকৃতি কি এই নয় যে এটি অস্তিত্বশীল হতে পারে, নাও হতে পারে ? বৃত্তের গোলাকার হওয়াটা স্বতঃসিদ্ধ, কিন্তু কোন বিশেষ বৃত্তের অস্তিত্ব কখনও স্বতঃসিদ্ধ হতে পারে না।

(৯) কাণ্ট এই যুক্তিটির বিরুদ্ধে একটি অভিযোগ এনেছেন। 'অনিবার্যভাবে অস্তিত্বশীল' ঈশ্বর যদি এই জগতকে সৃষ্টি করে থাকেন, যে জগৎ হল সম্ভাব্য, তাহলে এই সিদ্ধান্তে আসতে হয় যে, এই জগতের মধ্যেও কিছুটা অনিবার্যতা (necessity) থাকবে। কারণ এটা মনে হয় যে অনিবার্য সত্তা অনিবার্যভাবেই জগতকে উৎপন্ন করবে (the necessary being must necessarily produce the world)। যদি এই জগতের উৎপাদন অনিবার্য না হয়, তাহলে প্রশ্ন দেখা দেবে 'কেন অনিবার্য সত্তা জগতকে সৃষ্টি করেছিলেন ?'

(১০) বিশ্বতত্ত্ববিষয়ক যুক্তি ঈশ্বরকে এক অনিবার্য সত্তা রূপে কল্পনা করে, যা জগতের অতীত এবং অতিবর্তী (beyond and above the world)। কিন্তু যে অনিবার্য সত্তা জগতের অতীত ও অতিবর্তী, তার জগতের সম্পর্কে করণীয় কিছু আছে বলে মনে হয় না। কাজেই সেই অনিবার্য সত্তাতে কি ভাবে জগতের ব্যাখ্যা খুঁজে পাওয়া যেতে পারে ?

(১১) কেয়ার্ড বলেন, বিশ্বতত্ত্ববিষয়ক যুক্তি যে অসীম বা অনিবার্য সত্তার কথা বলে, সেই সত্তা প্রকৃতপক্ষে অসীমও নন, অনিবার্যও নন। তিনি অসীম নন, কেননা অসীম সত্তা-বহির্ভূত জগতের সদর্থক অস্তিত্ব অসীম সত্তাকে সীমিত করবে। তিনি অনিবার্য নন কেননা জগতের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক কার্যের সঙ্গে কারণের সম্পর্ক। কিন্তু কার্যকারণ সম্বন্ধের ক্ষেত্রে কার্য যেভাবে কারণের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়, কারণও

সেইভাবে কার্যের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। যদি এই যুক্তি অনিবার্যতা প্রমাণও করে, এই অনিবার্যতা 'অস্তিত্বের অনিবার্যতা' হবে না, শুধুমাত্র 'কারণের অনিবার্যতা' হবে।

গ্যালোয়ে বলেন, "অভিজ্ঞতার ঘটনা থেকে আমরা অভিজ্ঞতার একটা ভিত্তি সন্ধান করব, এই নীতি যুক্তিযুক্ত হলেও, বিশ্বতত্ত্ববিষয়ক যুক্তি এই নীতিকে ভ্রান্তভাবে এবং একপক্ষীয় ভাবে কার্যকর করেছে। উপাত্ত থেকে যাত্রা শুরু করে এই যুক্তি একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্যে উপনীত হতে চায় এবং এমন একটা পদ্ধতি প্রয়োগ করতে চায় যেটি লক্ষ্যে পৌছুতে বাধার সৃষ্টি করে। এই প্রমাণকে যদি ত্রুটিমুক্ত করা হয় তবুও এটি আমাদের জগৎ-অতিবর্তী কোন ঈশ্বরের কাছে নিয়ে যেতে পারে না"।

যুক্তিটির মূল্য ঃ এই যুক্তির সমর্থনে বলা যেতে পারে যে, যদিও এই যুক্তি এক অসীম সত্তার (ঈশ্বরের) অনিবার্য অস্তিত্ব প্রমাণ করতে পারে না, তবু এর নিজস্ব একটা মূল্য আছে। এই যুক্তি ঈশ্বরকে সন্ধান করার জন্য মানবমনে এক দুর্বার আকুলতার সৃষ্টি করে।

কেয়ার্ড মনে করেন, মন যে পদ্ধতিতে অসীম সত্তাকে উপলব্ধি করার পথে চালিত হয়, এই যুক্তিটি হল সেই পথে একটি স্তর। জগতের সান্তত্ব ও ক্ষণস্থায়িত্ব প্রত্যক্ষ করার সময়ই মন এই অসীম সত্তার অস্তিত্ব সম্পর্কে প্রচ্ছন্নভাবে সচেতন। আমরা সান্তকে অস্বীকার করি কারণ আধ্যাত্মিক জীব হিসেবে আমরা অসীম সম্পর্কে সচেতন এবং তাকে সন্ধান করার জন্য দুর্বার আকুলতা অনুভব করি। কাজেই যৌক্তিক প্রমাণ হিসেবে ব্যর্থ হলেও বিশ্বতত্ত্ব-বিষয়ক প্রমাণের তাৎপর্য হল এই যে, এই যুক্তির মাধ্যমে আমরা একটি উচ্চতর ও সমৃদ্ধতর ধারণায় উপনীত হতে পারি। সান্তকে অস্বীকার করে যে অসীমে আমরা উপনীত হই তা যথার্থ অসীম নয়। কারণ যথার্থ বা প্রকৃত অসীম, সান্তকে বিলুপ্ত করে দেয় না, তাকে নিজের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করে নিয়ে, তার উপযুক্ত ব্যাখ্যা দেয়। কাজেই চিন্তন এমন ধারণার অন্বেষণ করে, যে নিজেরও ব্যাখ্যা দেয় এবং সান্ত জগতেরও ব্যাখ্যা দেয়। এই রকম একটা ধারণার উপনীত হবার প্রচেষ্টা আমরা লক্ষ্য করি পরিণাম বা উদ্দেশ্য সম্পর্কীয় যুক্তির মধ্যে, যেটি পরবর্তী অংশ আলোচনা করা হয়েছে।

কেয়ার্ডের অভিমত

(গ) পরিণাম বা উদ্দেশ্য সম্পর্কীয় যুক্তি (Teleological Argument) : মনে হয় ঈশ্বরের অস্তিত্ব বিষয়ক যতগুলি যুক্তি উপস্থাপিত হয়েছে পরিণাম বা উদ্দেশ্য সম্বন্ধীয় যুক্তি সবচেয়ে জনপ্রিয়। ইংরাজী 'Teleological' শব্দটি গ্রীক শব্দ 'Telos' থেকে উদ্ভূত যার অর্থ হল, পরিণাম বা উদ্দেশ্য (end)। কাজেই পরিণামমূলক

বা উদ্দেশ্যমূলক বিশ্বজগত হল এমন জগৎ যা কোন উদ্দেশ্য সিদ্ধ করার জন্য সৃষ্ট। পরিণাম বা উদ্দেশ্য সম্পর্কীয় যুক্তি উদ্দেশ্যের ভিত্তিতে একজন সর্বজ্ঞ সত্তার বা উদ্দেশ্যসাধন কর্তার অস্তিত্ব প্রতিষ্ঠা করতে চায়, যিনি এই জগতের মধ্য দিয়ে তার কিছু লক্ষ্য বা উদ্দেশ্যকে সিদ্ধ করবেন। জগতের নিয়ম, শৃঙ্খলা, সামঞ্জস্য, ঐক্য স্পষ্টতঃই নির্দেশ করে যে, বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই এই জগতের সৃষ্টি। এই জগতের স্রষ্টা কোন সুদক্ষ কারিগর যিনি অসীম ও অনন্ত শক্তিসম্পন্ন। এই জগৎ তাঁর উদ্দেশ্য সাধন করেছে। এর স্রষ্টা হলেন ঈশ্বর।

যুক্তিটির মূল বক্তব্য বিষয়

প্রকৃতির মধ্যে, বিশেষ করে জীবজগতের মধ্যে এই উদ্দেশ্য বা পরিণতির অনেক দৃষ্টান্ত লক্ষ্য করা যায়, যা অবশ্যই নির্দেশ করে যে প্রকৃতির আড়ালে কোন উদ্দেশ্য সাধন-কর্তার অস্তিত্ব আছে। এই উদ্দেশ্য বা পরিণতির অনেক উদাহরণ দেওয়া যায়। বিভিন্ন প্রাণীর অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বিভিন্ন প্রকারের পরিবেশ ও কর্মের উপযোগী করে নির্বাচিত হয়েছে। বিভিন্ন প্রাণীর অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলিতে এমন সুসামঞ্জস্য বর্তমান যে আমাদের মনে হয় যেন তাদের ঐ ভাবেই নির্বাচন করা হয়েছে এবং তাদের মধ্যে একটা পারস্পরিক উপযোগিতার সম্পর্ক রয়েছে, যার ফলে প্রাণীরা বিভিন্ন পরিবেশের সঙ্গে নিজেদের সহজে খাপ খাইয়ে নিতে পারে। প্রাণীরা যাতে আত্মরক্ষা করতে পারে তার জন্য কারও আছে ধারাল নখ; কারও বা আছে শিং। শীতপ্রধান মেরু অঞ্চলে ভালুকদের আছে বড় বড় লোম। জগতের সর্বত্রই রয়েছে এমন এক সূক্ষ্ম, সুনিপুণ নির্বাচন ব্যবস্থা যার দ্বারা প্রমাণ হয় যে এই জগৎ উদ্দেশ্যমূলক। স্থলচর জীবদের রয়েছে ফুসফুস যাতে তারা শ্বাসপ্রশ্বাস নিতে পারে। কিন্তু মাছ যাতে জলে দ্রবীভূত বাতাস গ্রহণ করতে পারে তাই তার রয়েছে অন্য ধরনের শ্বাসযন্ত্র, ফুলকা। পাখীদের শরীরের হাড় হালকা, যাতে তারা বাতাসে কম ওজনের জন্য উড়তে সক্ষম হয়। দুর্বল প্রাণীরা সতর্ক এবং ক্ষিপ্রগতি। কাজেই তাদের দুর্বলতা সত্ত্বেও তারা বেঁচে থাকতে পারে। জগৎ জুড়ে এই উদ্দেশ্যের অস্তিত্ব একজন উদ্দেশ্য সাধন কর্তার অস্তিত্বের অনুমানকে অনিবার্য করে তোলে এবং এই উদ্দেশ্য সাধন কর্তা হলেন ঈশ্বর।

জগৎ জুড়ে উদ্দেশ্য বা পরিণতির উদাহরণ

উপায় ও উদ্দেশ্যের মধ্যে সঙ্গতি, নির্বাচন (selection), সংযোগ (combination), এবং ক্রমিক স্তরভেদ (gradation) প্রকৃতিতে উদ্দেশ্যের অস্তিত্ব প্রমাণ করে। আমাদের এই দেহের বিভিন্ন অঙ্গগুলি এমনভাবে সুবিন্যস্ত যে এদের বৃদ্ধি ও বিকাশের মধ্যে এক অদ্ভুত সামঞ্জস্য আছে। দেহের বিভিন্ন অঙ্গগুলি একই সময়ে স্বাভাবিক ভাবে

নির্বাচন, সংযোগ ও ক্রমিক স্তরভেদ

বৃদ্ধি পেতে থাকে। জীবদেহের গঠনের মধ্যে অংশের এবং সমগ্রের পারস্পরিক নির্ভরতা, সামগ্রিক ঐক্য, গঠন সম্পর্কীয় সামঞ্জস্য, বিভিন্ন অঙ্গের পারস্পরিক উপযোগিতা নিঃসন্দেহে উদ্দেশ্যমূলক। জগতের বিভিন্ন বস্তু, যেমন জড়বস্তু, উদ্ভিদ, নিম্নতর প্রাণী এবং মানুষ এদের মধ্যে যে ক্রমিক স্তরভেদ লক্ষ্য করা যায়, প্রমাণ করে যে এই জগৎ উদ্দেশ্যমূলক।

যান্ত্রিক অভিব্যক্তিবাদ উপরিউক্ত বিষয়গুলিকে আকস্মিক মনে করে এবং এইগুলির মধ্যে উদ্দেশ্য নিহিত আছে বলে ধারণা করে না। কিন্তু সমস্ত কিছুকেই আকস্মিক গণ্য করার অর্থ হল আকস্মিকতার উপর অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করা, যা মতবাদ হিসেবে সন্তোষজনক নয়। এটা অসম্ভবই মনে হয় যে, এই জগতের শৃঙ্খলা এবং সৌন্দর্য নিছক আকস্মিকতারই সৃষ্টি এবং অন্ধ প্রাকৃতিক শক্তির পরিণাম। জড় জগৎ প্রাণিজগতের উদ্দেশ্য সিদ্ধ করে, এবং নিম্নতর প্রাণী তার থেকে উচ্চতর কোন জটিল সত্তার উদ্দেশ্য সিদ্ধ করে। কাজেই প্রকৃতির মধ্যে উচ্চতর এবং নিম্নতরের ক্রমিক স্তরভেদ আছে। শেষ পর্যন্ত আমরা সৃষ্টির সর্বোচ্চ স্তরে—চেতন মানব মনে উপনীত হই। অন্তর্দৃষ্টির সাহায্যে আমরা বুঝে নিতে পারি যে প্রকৃতির এই বৈশিষ্ট্য কোন বুদ্ধিময় ইচ্ছাশক্তির প্রকাশ। কাজেই আমরা সিদ্ধান্ত করতে পারি যে, এক বুদ্ধিময় ইচ্ছাশক্তি এই সুশৃঙ্খল ও সামঞ্জস্যপূর্ণ জগতের সৃষ্টিকর্তা।

যান্ত্রিক অভিব্যক্তিবাদের সমালোচনা

আধুনিক যুগে উইলিয়াম পেলে (*William Paley*) তাঁর 'Natural Theology' গ্রন্থে পরিণাম বা উদ্দেশ্য সম্পর্কীয় যুক্তির সমর্থনে তাঁর সুচিন্তিত বক্তব্যকে উদাহরণের সাহায্যে উপস্থাপিত করেছেন। একটি ঘড়ির উপমার সাহায্যে তিনি বিষয়টিকে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছেন। তিনি বলেন যে, একটি মরুভূমিতে ভ্রমণ করতে করতে যদি দেখা যায় যে কোনও একটা বড় পাথর পড়ে রয়েছে তাহলে ওর উপস্থিতিকে আকস্মিক বলে বর্ণনা করা যেতে পারে। অর্থাৎ বাতাস, বৃষ্টি, উত্তাপ, আগ্নেয়গিরি সম্পর্কীয় ক্রিয়া প্রভৃতির দ্বারা তা সৃষ্ট মনে করা যেতে পাবে। কিন্তু ঐ মরুভূমিতে কোথাও একটি ঘড়ি পড়ে থাকতে দেখলে কিন্তু অনুরূপ সিদ্ধান্ত করা চলে না। একটি ঘড়ির গঠনের জটিলতা, তার অংশগুলির বিন্যাস এবং একটি লক্ষ্য সিদ্ধ করার জন্য অংশগুলির পারস্পরিক সহযোগিতা প্রভৃতি সকল কিছুই নির্দেশ করে যে অংশগুলির গঠন এবং অংশগুলিকে একত্রিত করে একটি কার্যকর যন্ত্রে পরিণত করা কখনই আকস্মিক ঘটনা হতে পারে না। ঘড়িটির নির্মাতা হিসেবে কোন বুদ্ধিমান সত্তার অস্তিত্ব স্বীকার না করে আমরা পারি না। অর্থাৎ ঘড়িটির নির্মাণের ব্যাপারে কোন বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন মনের ক্রিয়াকে অগ্রাহ্য করা যাবে না।

পেলে যুক্তি দিতে গিয়ে বলেন যে, এই প্রাকৃতিক জগতও একটি জটিল যন্ত্র এবং ঘড়ির মতনই কোন বুদ্ধিময় সত্তার দ্বারা পরিকল্পিত। সৌরজগতে গ্রহগুলির আবর্তন, পৃথিবীতে ঋতুচক্র, প্রাণীর জটিল দেহাবয়ব এবং তার দেহের বিভিন্ন অংশগুলির মধ্যে পারস্পরিক উপযোগিতা সবই উদ্দেশ্য সাধন কর্তার অস্তিত্ব নির্দেশ করে। মানুষের মস্তিষ্কে সহস্র কোষের সুসংহতভাবে ক্রিয়া করা, চক্ষুর গঠন ও কৌশল এবং তার ক্রিয়া, সকল কিছুই প্রমাণ করে যে, একখণ্ড প্রস্তর যেমন প্রাকৃতিক শক্তির যান্ত্রিক এলোমেলো ক্রিয়ার দ্বারা উৎপন্ন হতে পারে, উপরিউক্ত জটিল সূক্ষ্ম বস্তুগুলি, সেইভাবে উৎপন্ন হতে পারে না।

সমালোচনা ঃ কিন্তু এই মতবাদের বিরুদ্ধে কয়েকটি অভিযোগ উত্থাপিত হয়েছে।

(১) জগতে নিয়ম, শৃঙ্খলা, সামঞ্জস্য যেমন আছে তেমনি অনিয়ম, বিশৃঙ্খলা, অসামঞ্জস্যেরও বহু দৃষ্টান্ত বর্তমান। এই মতবাদের সমর্থকবৃন্দ এই নঞর্থক দৃষ্টান্তগুলি উপেক্ষা করেছেন।

(২) সাম্প্রতিক বিজ্ঞানের আবিষ্কারের সাহায্যে জগতের অনেক উদ্দেশ্যকে প্রাকৃতিক কারণের সাহায্যে ব্যাখ্যা করা যাচ্ছে। জীবদেহের উপযোগিতার বিষয়টিকে 'জীবন সংগ্রামের' দ্বারা ব্যাখ্যা করা যায়। স্পষ্টতঃই এই অনুমান ঈশ্বরের অনুমানের তুলনায় সহজ ও সরল। সহজ ও সরল বলে উভয় অনুমান বা প্রকল্পের তুলনায় জীবন সংগ্রামের প্রকল্পটি বিজ্ঞানীদের মতে গ্রহণযোগ্য।

(৩) জগৎ প্রক্রিয়ার মধ্যে কোন উদ্দেশ্যের অস্তিত্ব রয়েছে, অভিজ্ঞতার মাধ্যমে তা প্রমাণ করা কঠিন। কাজেই এই যুক্তির বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা যেতে পারে যে মানুষের মনের বিচারবুদ্ধি পূর্ব থেকেই কোন উদ্দেশ্যের অস্তিত্ব স্বীকার করে নিয়ে, জগতের বিভিন্ন ঘটনার মধ্যে তার অস্তিত্ব প্রত্যক্ষ করে। তাছাড়া জগতের মধ্যে অন্তঃস্থিত উদ্দেশ্যের ধারণা বিচারবুদ্ধির দিক থেকে প্রয়োজনীয় মনে করা হলেও তার দ্বারা ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণিত হয় না।

(৪) কাণ্ট এই যুক্তির বিরুদ্ধে আপত্তি জানাতে গিয়ে বলেছেন যে, এই যুক্তি যে ধরনের ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ করার প্রত্যাশা করে, তা করতে পারে না (it does not prove the kind of god it is presumably expected to prove), অর্থাৎ কিনা এমন এক স্রষ্টার অস্তিত্ব প্রমাণ করতে পারে না যিনি জগতের মধ্যে শুধু শৃঙ্খলা ও উদ্দেশ্যের প্রতিষ্ঠা করেন না, যে জগতে শৃঙ্খলা ও উদ্দেশ্য প্রতিষ্ঠিত করেন তাকেও সৃষ্টি করেন। পরিণাম বিষয়ক যুক্তি একজন মহৎ উদ্দেশ্যসাধন কর্তার কথা বলে, কিন্তু যার উপর উদ্দেশ্যকে প্রয়োগ করা হবে তাকে কিভাবে পাওয়া গেল তার ব্যাখ্যা দিতে

পারে না। এই কারণেই অনেক সময় পরিণামমূলক যুক্তির সঙ্গে বিশ্বতত্ত্ববিষয়ক যুক্তিটিকে সংযুক্ত করে এর ব্যাখ্যা দেবার চেষ্টা করা হয়। কিন্তু যাই করা হোক না কেন তার দ্বারা ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণিত হয় না।

(৫) এই যুক্তি ঈশ্বরকে সাধারণ যন্ত্রীর মতো কল্পনা করে, ফলে ঈশ্বরকে অনন্ত বলা যায় না। ঈশ্বর যদি সর্বশক্তিমান সত্তা হন তাহলে তিনি যে উপাদানের সাহায্যে ক্রিয়া করেন তার দ্বারা তিনি সীমিত হচ্ছেন, এ কিভাবে সম্ভব?

(৬) কেয়ার্ড এই যুক্তির ত্রুটি নির্দেশ করতে গিয়ে বলেন যে, ঈশ্বরের ধারণার পরিপ্রেক্ষিতেই মানুষ এবং প্রকৃতির মধ্যে আমরা লক্ষ্য বা পরিণাম প্রত্যক্ষ করি। কাজেই লক্ষ্য বা পরিণামের ভিত্তিতে আমরা কিভাবে ঈশ্বরের অস্তিত্বের কথা বলতে পারি? কেয়ার্ড এই যুক্তির দ্বিতীয় ত্রুটির কথা উল্লেখ করতে গিয়ে বলেন যে, এই যুক্তিমতে ঈশ্বরের সঙ্গে জগতের সম্পর্ক নিছক খেয়ালখুশীর সম্পর্ক। এই জগতের অনন্ত জ্ঞানের প্রকাশ প্রত্যক্ষ করতে হলে, এই জগতের এবং জগতের যা কিছু আছে সব কিছুর অস্তিত্ব ঈশ্বরের প্রকৃতির মধ্যেই সন্ধান করতে হবে, ঈশ্বরের খেয়ালখুশী, ইচ্ছা ও শক্তির মধ্যে নয়। আমরা পূর্ব থেকে যদি ঈশ্বরের প্রকৃতি সম্পর্কে অবহিত হই, তাহলে আমরা ঈশ্বরের প্রকৃতির সঙ্গে তার কাজের কোন সম্পর্ক প্রত্যক্ষ না করলেও, সব কিছুই যে ঈশ্বরের অনন্ত জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ এই সিদ্ধান্ত করতে পারি, কিন্তু বিপরীত দিক থেকে এই প্রক্রিয়াকে আমরা চিন্তা করতে পারি না। তাছাড়া শুধুমাত্র ঈশ্বরের প্রকৃতি সম্পর্কে অবহিত হলেই চলবে না, আমাদের আরও জানতে হবে যাকে আমরা ঈশ্বর বলছি সেই ঈশ্বর অস্তিত্বশীল কিনা। এটাই আসল প্রশ্ন। কোন কার্য প্রত্যক্ষ করে এবং সেটিকে ইচ্ছা বা শক্তির পরিণাম অনুমান করে আমরা তার স্রষ্টার যথার্থ প্রকৃতি সম্পর্কে কিছুই অনুমান করতে পারি না, অস্তিত্ব সম্পর্কে তো নয়ই।

(৭) এই মতবাদ দ্বৈতবাদের সৃষ্টি করে, কাজেই দ্বৈতবাদের সব দোষত্রুটি এই মতবাদে দেখা দেবে।

(৮) যাঁরা উদ্দেশ্য বা পরিণতির বিরোধিতা করেছেন মার্টিন্যু তাঁদের মতবাদ বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। তিনি বলেন যে, জাগতিক কারণ, বা স্বতঃস্ফূর্ত পরিবর্তন উদ্দেশ্য বা পরিণামের প্রতিকল্প গণ্য হতে পারে না। আকস্মিক পরিবর্তন, প্রাকৃতিক নির্বাচন বা যোগ্যতমের বাঁচার অধিকার প্রভৃতি নীতি, আদি কারণ কোন্ পদ্ধতিতে ক্রিয়া করে তার বর্ণনা সূচিত করতে পারে, কিন্তু আদি কারণের প্রতিকল্প রূপে তাদের গ্রহণ করা যায় না। যান্ত্রিক

মার্টিন্যুর সমালোচনা

অভিব্যক্তিবাদীরা ভুলবশতঃই চিন্তা করেন যে, যেহেতু তারা জগৎ এবং জগৎ প্রক্রিয়ার ক্রমবিকাশ দেখাতে পারেন' সেইহেতু কোন বুদ্ধিময় ইচ্ছাশক্তির অস্তিত্ব স্বীকারের আবশ্যকীয়তার প্রয়োজন নেই। যান্ত্রিক নিয়ম জগৎ প্রক্রিয়ার প্রারম্ভ ব্যাখ্যা করতে পারে না। কিন্তু যখন প্রক্রিয়া একবার শুরু হয়ে যায়, তখন সেটি কিভাবে অবিরতভাবে চলতে থাকে, তার ব্যাখ্যা দিতে পারে। প্রাকৃতিক নির্বাচন এবং যোগ্যতমের বাঁচার অধিকার, যার সাহায্যে যান্ত্রিক অভিব্যক্তিবাদীরা অস্তিত্বশীল প্রজাতিগুলিকে ব্যাখ্যা করতে চান, তা অসফল মনে হয় কেননা নির্বাচন ও বর্জন প্রক্রিয়া তখনই ক্রিয়া করতে পারে যখন নির্বাচন ও বর্জনের বিষয়গুলি পূর্ব থেকেই আছে অনুমান করে নেওয়া যায়। কিন্তু কি ভাবে তারা অস্তিত্বশীল হয় তার ব্যাখ্যা দেওয়া প্রয়োজন, যে ব্যাখ্যা যান্ত্রিক মতবাদ যুগিয়ে দিতে পারে না।

(৯) ডেভিড হিউম তাঁর 'Dialogues Concerning Natutral Religion' গ্রন্থে পরিণাম বা উদ্দেশ্য সম্পর্কীয় যুক্তির কঠোর সমালোচনা করেছেন। তাঁর যুক্তিগুলি নিম্নরূপ :

( ) এই বিশ্ব জগৎ কোন উদ্দেশ্যের পরিকল্পনা মনে জাগিয়ে তোলে, এটা খুবই স্বাভাবিক। কেননা বিশ্ব জগতের অংশগুলির মধ্যে বেশ কিছু মাত্রায় সামঞ্জস্য নেই, এমন বিশ্বজগতের কথা ভাবাই যায় না। পাখীর ডানা রয়েছে অথচ মাছের মতন তারা বাতাসে উড়তে পারছে না, এমন পাখী সৃষ্ট হতে পারে না। একটি পরিবেশে কোন প্রাণীর সুদীর্ঘকাল অবস্থিতি, শৃঙ্খলা এবং পারস্পরিক উপযোগিতা নির্দেশ করে যাকে কোন উদ্দেশ্য বা পরিকল্পনার ফলস্বরূপ মনে করা যেতে পারে। কিন্তু সুচিন্তিত পরিকল্পনা ছাড়া অন্য কোন ভাবে এটি সংঘটিত হতে পারে কিনা, সেই প্রশ্ন থেকে যায়। হিউম এই প্রসঙ্গে জড় পরমাণু গতির সাহায্যে এই জগৎকে সৃষ্টি করেছে, এমন সম্ভাবনার কথাও ব্যক্ত করেছেন।

(২) বিশ্ব জগতের সঙ্গে ঘড়ি বা গৃহের উপমা, উপমা হিসেবে খুবই দুর্বল। এই বিশ্ব জগৎ কোন বৃহৎ যন্ত্র নয়। একে একটি সুবৃহৎ নিষ্ক্রিয় জীব বা কোন উদ্ভিদের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। সেক্ষেত্রে পরিণাম সম্পর্কীয় যুক্তি খাটে না কেননা উদ্ভিদ সচেতন পরিকল্পনার ফল কিনা বিতর্কের বিষয়। কেবলমাত্র বিশ্বজগতকে মানুষের তৈরি কোন যন্ত্রের সঙ্গে তুলনা করা হলেই, কোন বুদ্ধিমান উদ্দেশ্যকর্তার অস্তিত্ব অনুমান করা যুক্তিযুক্ত মনে হয়।

(৩) যদিও বা যুক্তিযুক্তভাবে এই বিশ্ব জগতের স্রষ্টা হিসেবে কোন ঐশ্বরিক পরিকল্পনাকারীর অস্তিত্বের কথা অনুমান করা চলে তবু, এই ঈশ্বর যে সর্বশক্তিমান,

সর্বজ্ঞ, দয়াময় হবেন এমন সিদ্ধান্ত করা যায় না। সসীম জগতের অস্তিত্বের ভিত্তিতে কোন অসীম স্রষ্টার অস্তিত্ব অনুমান যুক্তিসঙ্গত নয়। বিশ্ব জগতের বৈচিত্র্য লক্ষ্য করে এক ঈশ্বরের ক্ষেত্রে বহু ঈশ্বরের অস্তিত্ব অনুমান করা যেতে পারে বা বিশ্বজগতে অকল্যাণের অস্তিত্ব সর্বশক্তিমান দেখে দয়াময় ঈশ্বরের অস্তিত্ব অনুমান যুক্তিসঙ্গত নাও হতে পারে।

কেয়ার্ড বলেন যে, পরিণাম বিষয়ক যুক্তির বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হয়েছে যে, এক্ষেত্রে ঈশ্বরের সঙ্গে জগতের যে সম্পর্কের কথা বলা হয়েছে তা বাহ্য এবং খেয়ালখুশীর সম্পর্ক। জগতের নিজস্ব যদি কোন উদ্দেশ্য না থাকে এবং এই জগৎ যদি জগৎ-বহির্ভূত ঈশ্বরের উদ্দেশ্য সাধন করে, তাহলে এই পরিণতিবাদ হবে বাহ্য পরিণতিবাদ বা বহিরুদ্দেশ্যবাদ। বহিরুদ্দেশ্যবাদ সন্তোষজনক মতবাদ নয়, বহিরুদ্দেশ্যবাদ দ্বৈতবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত। এই মতবাদ স্বীকার করে নিলে জগৎ-বহির্ভূত ঈশ্বর, জগতকে সীমিত করবে। ঈশ্বরের সঙ্গে জগতের সম্পর্ক যন্ত্রের সঙ্গে যন্ত্রীর সম্পর্কের তুল্য হবে। তাছাড়া ঈশ্বর-নিরপেক্ষ স্বতন্ত্র জগৎ-সত্তার উপর ঈশ্বরের দ্বারা উদ্দেশ্য আরোপ করা কিভাবে সম্ভব?

কেয়ার্ডের মন্তব্য

কিন্তু বহিরুদ্দেশ্যবাদ ছাড়া আর এক ধরনের উদ্দেশ্যবাদ আছে যা হল অন্তঃস্থিত উদ্দেশ্যবাদ বা আন্তর পরিণতিবাদ (Internal teleology)। এই মতবাদ অনুসারে জগতের উদ্দেশ্য জগতের মধ্যেই নিহিত অর্থাৎ জগতের অন্তঃস্থিত এক পরম চেতনাময় সত্তার উদ্দেশ্যই জগতের মধ্য দিয়ে প্রকাশমান।

কান্ট যদিও এই মতবাদের যৌক্তিকতাকে স্বীকার করেন নি তবু তিনি এই যুক্তিটির প্রশংসা করেছেন। তিনি বলেন, "এই প্রমাণটি সব সময়ই শ্রদ্ধার সঙ্গে উল্লেখ করার যোগ্য। এটি সবচেয়ে প্রাচীন, সবচেয়ে সুস্পষ্ট এবং মানবজাতির সাধারণ বিচার-বুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। এটি প্রকৃতির আলোচনাকে প্রাণবন্ত করে তোলে, যেমনভাবে এটি ঐ উৎস থেকেই নিজের অস্তিত্ব ও চির নতুন প্রাণশক্তি গ্রহণ করে। আমাদের পর্যবেক্ষণশক্তি নিজে থেকেই যাদের সন্ধান করতে পারত না, এই যুক্তি সেই লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের নির্দেশ দেয় এবং পথনির্দেশক একটি বিশেষ ধরনের ঐক্যের ধারণার মাধ্যমে (by means of the guiding concept of a special unity) আমাদের প্রকৃতির জ্ঞানকে প্রসারিত করে, যে ঐক্যের নীতিটি প্রকৃতি-বহির্ভূত। এই জ্ঞান প্রকৃতির এক পরম স্রষ্টা কর্তার আমাদের বিশ্বাসকে এত দৃঢ় করে যে ঐ বিশ্বাস এক দুর্দমনীয় সুদৃঢ় প্রত্যয়ে পরিণত হয়।" ঈশ্বরের অস্তিত্ব বিষয়ক কোন যুক্তিই কান্টের এতটা প্রশংসা লাভ করেনি।

[1]ম্যাকগ্রেগর (*MacGregor*) এই যুক্তিটির মূল্য নিরূপণ করতে গিয়ে বলেন, "যে শৃঙ্খলা ও উদ্দেশ্যের উপস্থিতির সম্মুখীন আমরা হই, তাকে ব্যাখ্যা করা কষ্টকর হয়ে পড়ে যদি আমরা এক মহৎ উদ্দেশ্য সাধনকর্তা বা পরিকল্পকের অস্তিত্বের অনুমান না করি। তবে এটা স্বীকার করতে হবে যে এই যুক্তি এই ধরনের সত্তার অস্তিত্ব নির্দেশ করে, কিন্তু সাধারণতঃ 'প্রমাণ' বলতে যা বোঝায়, সেই অর্থে তাকে প্রমাণ করতে পারে না।"

পরিণাম সম্পর্কীয় যুক্তি বিশ্বতত্ত্ববিষয়ক যুক্তিরই একটি সম্প্রসারিত রূপ বা তার বিশেষ প্রয়োগ ছাড়া কিছুই নয় (the teleological proof is rather an extension or a special application of the cosmological proof)।

গ্যালোয়ে উপরিউক্ত মন্তব্য করেছেন। বিশ্বতত্ত্ববিষয়ক যুক্তির মতনই পরিণাম সম্পর্কীয় যুক্তি অনুমান করে যে জগতের একটা বিশেষ দিক বা বৈশিষ্ট্যের ব্যাখ্যার জন্য ঈশ্বরের অস্তিত্ব অনুমানের প্রয়োজন আছে। বিশ্বতত্ত্ববিষয়ক যুক্তির ক্ষেত্রে আমরা প্রত্যক্ষ করেছি যে জগতকে একটি কার্যরূপে গ্রহণ করে, যুক্তিটি তার কারণকে প্রমাণ করতে চায়, যে কারণ ঈশ্বর ছাড়া আর কেউ নয়। পরিণাম সম্পর্কীয় যুক্তিকে বিশ্বতত্ত্ববিষয়ক যুক্তির একটি সম্প্রসারিত রূপ বলে গ্রহণ করা হয়, কেননা পরিণাম সম্পর্কীয় যুক্তি অনুসারে এই জগতের সামঞ্জস্য ও শৃঙ্খলা উদ্দেশ্যের প্রতীক এবং ঈশ্বর এই উদ্দেশ্যসাধন-কর্তা। কাজেই প্রথম যুক্তির ক্ষেত্রে কার্য থেকে কারণে অগ্রসর হই এবং দ্বিতীয় যুক্তির ক্ষেত্রে উদ্দেশ্য থেকে উদ্দেশ্যসাধন কর্তাতে উপনীত হই। অন্য ভাষায় বলা যেতে পারে যে উভয় যুক্তির ক্ষেত্রে শুরু এবং সিদ্ধান্ত প্রায় একই ধরনের। সেইজন্যই এই সিদ্ধান্ত করা হয়েছে যে পরিণাম বিষয়ক যুক্তি বিশ্বতত্ত্ব বিষয়ক যুক্তির সম্প্রসারিত রূপ।

প্রথম তিনটি যুক্তির সমালোচনা (Review of the first three arguments)**:** ইতিপূর্বে আমরা যে তিনটি যুক্তি আলোচনা করেছি, কাণ্টের মতে—এই যুক্তিগুলি পরস্পরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কযুক্ত। পরিণাম সম্পর্কীয় যুক্তি বিশ্বতত্ত্ববিষয়ক যুক্তির উপর নির্ভর এবং বিশ্বতত্ত্ববিষয়ক যুক্তি তত্ত্ববিষয়ক যুক্তির উপর নির্ভর। কোন কোন দর্শনের ইতিহাস রচয়িতা যুক্তিগুলিকে তত্ত্ববিষয়ক যুক্তির, আবার কেউ বা বিশ্বতত্ত্ববিষয়ক যুক্তিরই পরিবর্তিত রূপ বলে গণ্য করেছেন। এই সকল যুক্তির বিরুদ্ধে যে সাধারণ অভিযোগ উত্থাপিত হয়েছে তা হল এই যে, যে মনে ধর্মবিশ্বাস জাগ্রত হয়নি, সেই মনে এই সব যুক্তি ধর্মবিশ্বাস জাগ্রত করতে সফল

1. G. MacGregor : Introduction to Religious Philosophy ; Page 119

হয় না। ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্পর্কে মানুষের স্বীকৃতি আদায় করার ক্ষমতা এই সব যুক্তির নেই। বিশ্বাসের রাজ্য থেকে বোধের রাজ্যে যিনি উপনীত হতে ইচ্ছুক, তেমন ব্যক্তিও এই সব যুক্তির দুর্বলতা স্বীকার করেছেন। কেননা, এই যুক্তিগুলির উপস্থাপক-বৃন্দ একটি যুক্তির পরিপূরক হিসেবে আর একটি যুক্তিকে প্রয়োগ করেছেন— যে পদ্ধতি স্পষ্টতঃই নির্দেশ করে যে, কোন একটি পদ্ধতিকে স্বতন্ত্রভাবে গ্রহণ করলে সেটি হবে অপর্যাপ্ত। যে যুক্তি নিজে নিজেই পর্যাপ্ত বা সার্থক তাকে শক্তিশালী করার জন্য বা তার সমর্থনে, তার সঙ্গে অপর যুক্তি যোগ করার প্রয়োজন হয় না। যাই হোক না কেন, এটা স্পষ্ট যে ঈশ্বরের অস্তিত্বের পক্ষে যেসব যুক্তি আমরা ইতিমধ্যে আলোচনা করেছি, সেইগুলির কোনটিই স্বতন্ত্রভাবে চূড়ান্ত বা সিদ্ধান্তমূলক নয়। এই যুক্তিগুলি সম্পর্কে একথা বলা যেতে পারে যে একটি অপরটিকে সহায়তা করে, কিন্তু কোন একটিই স্বতন্ত্রভাবে লক্ষ্য সিদ্ধ করতে পারে না। আসলে স্বীকার করতেই হবে যে এই যুক্তি-গুলি প্রমাণ নয়। এরা ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ করে না, ঈশ্বরের অস্তিত্বের সম্ভাবনা নির্দেশ করে মাত্র। অন্য বিষয়ের ভিত্তিতে যে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে এই যুক্তিগুলি সেই সিদ্ধান্তকে কিছুটা সুদৃঢ় করে এইমাত্র। কিন্তু কোনমতেই এই যুক্তিগুলি ঈশ্বরের অস্তিত্বের পক্ষে সুনিশ্চিত প্রমাণরূপে গৃহীত হতে পারে না। গ্যালোয়ে মন্তব্য করেন, "চিরাচরিত প্রমাণগুলির আশ্রয়বাক্যগুলি এমন নয় যে তাদের যৌক্তিক সিদ্ধান্তরূপে ঈশ্বরের অস্তিত্বকে পাওয়া যেতে পারে।"[1]

(ঘ) নৈতিক যুক্তি (The Moral Argument)**:** এই যুক্তিটির একটি রূপ হল বস্তুগত নৈতিক নিয়মের ভিত্তিতে কোন ঐশ্বরিক নৈতিক নিয়ম রচয়িতার অস্তিত্ব অনুমান করা বা নৈতিক মূল্যগুলিকে বস্তুগত (objective) গণ্য করে তার কোন অতীন্দ্রিয় উৎস বা ভিত্তির অনুমান করা বা ব্যক্তির মধ্যে বিবেক (conscience)-এর অস্তিত্বের ভিত্তিতে, এই বিবেকের উৎস হিসেবে কোন অতীন্দ্রিয় সত্তার অস্তিত্ব অনুমান করা ইত্যাদি। নৈতিক যুক্তির কোন কোন রূপ যদিও প্রাচীন তবু কাণ্টের নামের সঙ্গেই যুক্তিটি বিশেষ করে জড়িত।

(ii) **নৈতিক বিশ্বজগৎ ঈশ্বরের অস্তিত্ব নির্দেশ** করে**:** কাণ্টের মতে মানুষের নৈতিক চেতনা ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাসকে সমর্থন করে। নৈতিক যুক্তি দেখাতে চায় যে মানুষের নৈতিক অভিজ্ঞতা ঈশ্বরের অস্তিত্ব নির্দেশ করে। যেভাবে যুক্তিটি উপস্থাপিত হয়েছে তা এইরূপ: নৈতিক মূল্য বস্তুগত এই অর্থে যে তারা

---

1. '...the premises of the traditional proofs are not such that could yield the existence of God for their logical conclusion,"
—G. Galloway: The Philosophy of Religions; Page 391

মানবপ্রকৃতির প্রয়োজনীয় গুণ। সুতরাং মানবপ্রকৃতি এই জগতের যেমন একটা বাস্তব অংশ, মানুষ মনে করে সে এবং তার মূল্যগুলি বাস্তব এবং সেহেতু এই বিশ্বজগৎ একটি নৈতিক বিশ্বজগৎ (a moral universe)। প্রয়োজন, কামনা, বাসনা, স্বার্থ, মানুষের প্রকৃতি বা সমাজের গঠনের সাহায্যে নৈতিক মূল্যের ব্যাখ্যা দেওয়া যায় না বা অন্য কোন ভাবেও তাকে ব্যাখ্যা করা যায় না যদি না সেই ব্যাখ্যাকে কোন অতীন্দ্রিয় সত্তার অস্তিত্বের সঙ্গে যুক্ত করা না হয়। অর্থাৎ নৈতিক মূল্যের অপ্রাকৃতিক ভিন্ন কোন প্রাকৃতিক ব্যাখ্যা সম্ভব নয়। এই বিশ্বজগতে মানুষ এবং মঙ্গলের আদর্শের (ideal of goodness) স্থান আছে, যা মানুষের প্রকৃতির একটা মৌলিক গুণ। কিন্তু এই বিষয়টি স্বীকার করে নিলে, আমাদের স্বীকার করে নিতে হয় যে এক চেতন বৌদ্ধিক সত্তার অস্তিত্ব আছে যিনি নৈতিক জীব হিসেবে মানুষের নৈতিক চেতনাকে বিকশিত করেন। এই অতিমানবীয় শক্তি (super-human power) অবশ্যই চেতন এবং বৌদ্ধিক হবে, যিনি উদ্দেশ্যের কথা চিন্তা করেন এবং সেইগুলিকে সিদ্ধ করার জন্য সচেষ্ট হন। সংক্ষেপে তিনি হবেন একজন পুরুষ (person)। এই পুরুষই হল ঈশ্বর। কাজেই নৈতিক মূল্যকে বস্তুগত গণ্য করলে অবশ্যম্ভাবীভাবে কোন ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করতে হয়। নৈতিক বিশ্বজগৎ ঈশ্বরের অস্তিত্ব নির্দেশ করে।

নৈতিক মূল্য বাস্তব

(ii) **কর্তব্যের চেতনা ঈশ্বরের অস্তিত্ব সূচিত করে :** এই নৈতিক বিশ্বজগতে মানুষের অবশ্যই কর্তব্য সম্পাদনের স্বাধীনতা থাকবে। কিন্তু কর্তব্য করার স্বাধীনতা থাকলেও, মানুষের পক্ষে এই জীবনেই তার সব কর্তব্য সম্পাদন করা সম্ভব নয়। নৈতিক বাধ্যতাবোধের সব দাবীকে এই জীবনে পূরণ করা মানুষের পক্ষে সম্ভব হয় না। কাজেই এই জীবনের পরেও একটা ভবিষ্যৎ জীবনের অস্তিত্ব স্বীকার করে নিতে হয়। মানুষকে হতে হবে অমর। এছাড়াও ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করে নিতে হয়। কেননা ঈশ্বর ছাড়া, আমাদের এই কর্তব্যের চেতনা বা পরমকল্যাণকে লাভ করা যে আমাদের কর্তব্য, তা যে নিছক ভ্রান্তি নয়, এই সুনিশ্চিত আশ্বাস লাভ করা যাবে কার কাছ থেকে? কর্তব্য সম্পাদনের জন্য মানুষের প্রয়োজন অনন্ত জীবন এবং ঐশ্বরিক সমর্থনের আশ্বাস। মানুষ যদি তার পরমকল্যাণকে লাভ করতে না পারে তাহলে নৈতিক জীবন হয়ে পড়বে নিছক ভ্রান্তি। কিন্তু মানুষ যে তার পরমকল্যাণকে লাভ করতে পারবে, তার আশ্বাস দিতে পারে একমাত্র ঈশ্বর। কাজেই ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করতে হয়।

কর্তব্যের চেতনা ভ্রান্তি নয়—ঈশ্বরই এই আশ্বাস দিতে পারে

তবে এই প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে যে, তাত্ত্বিক দিক থেকে (theoretically) ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করতে গেলেই সেই যুক্তি আত্মবিরোধিতা দোষে দুষ্ট হয়ে পড়ে, কিন্তু [1]ব্যবহারিক বিচারশক্তির স্বীকার্য সত্য হিসেবে ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করা যেতে পারে।

(iii) **সুখের দিক থেকে যুক্তি :** কান্ট বলেন যে আমাদের নৈতিক চেতনা এই দাবি জানায় যে ধার্মিক অবশ্যই সুখী হবে। কিন্তু ধার্মিক ব্যক্তিকে আমরা সাধারণতঃ সুখী হতে দেখি না। সাধারণ মানুষের পক্ষে সব ধার্মিক ব্যক্তিকে সুখী করা সম্ভব নয়। তাছাড়া প্রায়শঃই দেখা যায় ধার্মিক ব্যক্তিরা এই জীবনে বহু দুঃখ কষ্টের দ্বারা পীড়িত হন এবং অধার্মিক ব্যক্তিরা উন্নতির চরম শিখরে আরোহণ করে। কাজেই কোন ভবিষ্যৎ জীবনের অস্তিত্ব স্বীকার করতে হয় যেখানে সব অন্যায়ের সংশোধন করা হয় ও ধার্মিক এবং অধার্মিক ব্যক্তিরা তাদের নিজ নিজ কাজের প্রতিফল লাভ করে। তাছাড়া যেহেতু এই জীবনে যেমন ধার্মিকতা ও সুখের মধ্যে কোন অনিবার্য সংযোগ নেই, তেমনি এই জীবনকে একটি ভবিষ্যৎ জীবনের মধ্যে টেনে নিয়ে গেলেও সেই অনিবার্যতার সন্ধান পাওয়া যাবে না যা ধার্মিকতাকে সুখের সঙ্গে সংযুক্ত করবে। কাজেই কোন ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করে নিতে হয় যিনি নিরপেক্ষ বিচারক হিসেবে ধার্মিকতা ও সুখের মধ্যে সমন্বয় সাধন করবেন। কাজেই ধার্মিক ব্যক্তিকে এই জীবনে সুখী করা না গেলেও ঈশ্বর পর জীবনে সুখী করতে পারেন। কাজেই ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করে নিতে হয়।

ঈশ্বরই ধার্মিকতা ও সুখের মধ্যে সমন্বয় সাধন করেন

(iv) **মার্টিন্যুর যুক্তি** (Martineau's argument) **:** মার্টিন্যুর মতে নৈতিক দায়িত্ব ও নৈতিক আদর্শ ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ করে। মানুষের নৈতিক দায়িত্ব কার কাছে? সসীম মানুষের কাছে হতে পারে না, কারণ সসীম মানুষের পক্ষে মানুষের সব অভিপ্রায় সম্পর্কে অবহিত হওয়া সম্ভব নয়। কাজেই এই দায়িত্ব কোন সর্বজ্ঞ অসীম পূর্ণ সত্তার কাছে। এই সত্তাই ঈশ্বর। তাছাড়া নৈতিক আদর্শের পূর্ণতা কোথায়? নিশ্চয়ই কোন সত্তার মধ্যে এই আদর্শ পূর্ণতা লাভ করেছে। তা না হলে এই নৈতিক আদর্শ অবাস্তব ও মিথ্যা প্রতিপন্ন হবে। এই আদর্শ ঈশ্বরে পূর্ণতা লাভ করেছে, সুতরাং ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করে নিতে হয়।

নৈতিক দায়িত্ব এবং নৈতিক আদর্শ ঈশ্বরে পূর্ণতা লাভ করেছে

1. কান্ট বিচারশক্তিকে দু'ভাগে ভাগ করেছেন (১) শুদ্ধ বিচারশক্তি (pure reason) এবং ব্যবহারিক বিচারশক্তি (practical reason)। শুদ্ধ বিচারশক্তি তথ্য সম্পর্কীয় জ্ঞান অর্জনে সহায়তা করে। ব্যবহারিক বিচারশক্তি আমাদের একাধিক কর্মপন্থার মধ্যে কোন একটিকে নির্বাচন করতে এবং কোন ইচ্ছাকৃত কার্য করতে সহায়তা করে।

৪। ভারতীয় দর্শনে ঈশ্বরের অস্তিত্বের পক্ষে প্রদত্ত নৈতিক যুক্তি (Moral Argument for the existence of God in Indian philosophy) :

নৈয়ায়িকদের নৈতিক যুক্তি : এই জগতের বিভিন্ন মানুষের অবস্থার মধ্যে আমরা তারতম্য লক্ষ্য করি। কোন ব্যক্তি জ্ঞানী, কোন ব্যক্তি মূর্খ; কেউ বা সুখী, কেউ বা দুঃখী; কেউ বা ধনী, কেউ বা দরিদ্র। মানুষের অবস্থার এই তারতম্যের কারণ কি? মানুষ নিজ নিজ কর্ম অনুযায়ী ফলভোগ করে। 'যেমন কর্মসম্পাদন, তেমন ফলভোগ'—এই নৈতিক কর্মবাদই মানুষের জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করে। এই নীতি অলঙ্ঘনীয়, কোন ব্যক্তির পক্ষেই এই নীতিকে লঙ্ঘন করা সম্ভব নয়। কার্যকারণ নীতি অনুসারে প্রতিটি কার্যেরই একটা কারণ আছে এবং এই নিয়ম নৈতিক জগতে কর্মবাদের রূপ পরিগ্রহ করেছে।

নৈতিক কর্মবাদ

জীবের সৎকর্ম ও অসৎকর্ম সম্পাদনের ফলে পুণ্য এবং পাপরূপ অদৃষ্টশক্তির আবির্ভাব ঘটে। জীবের সঞ্চিত পাপ-পুণ্যকেই অদৃষ্ট বলা যেতে পারে। এই অদৃষ্টের জন্যই জীবের সুখ ভোগ এবং দুঃখ ভোগ, কিন্তু এই অদৃষ্টশক্তি অচেতন। তার পক্ষে কর্মফল অনুযায়ী কার কতটুকু প্রাপ্য তা বিচার করা সম্ভব নয়।

সুতরাং, অনুমান করা যেতে পারে যে, এমন কোন সর্বজ্ঞ বা সর্বশক্তিমান কর্তা আছেন যিনি এই অদৃষ্টকে নিয়ন্ত্রিত করেন এবং জীবের কর্ম অনুযায়ী তার পাপ-পুণ্যের বিচার করে তার ফলভোগের ব্যবস্থা করেন। এই কর্তা কে? ঈশ্বরই হলেন এই কর্তা বা অধিষ্ঠাতা।

ঈশ্বর অদৃষ্টের নিয়ামক

যোগদর্শনে এই নৈতিক যুক্তিটিকে একটু ভিন্নভাবে উপস্থাপিত করা হয়েছে।

জীবের কর্মফলানুযায়ী এই জগৎ সৃষ্টির জন্যও ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করে নিতে হয়। জীবের পক্ষে নিজের অদৃষ্টকে নিজে নিয়ন্ত্রিত করা সম্ভব নয় কারণ জীবের জ্ঞান সীমিত এবং জীব যেহেতু নিজের অদৃষ্ট সম্পর্কে সম্যক্‌ভাবে অবহিত নয়, তার পক্ষে নিজের অদৃষ্টকে নিয়ন্ত্রিত করা সম্ভব নয়। প্রকৃতি এবং কর্ম থেকে জাত যে অদৃষ্টশক্তি উভয়ই অচেতন। সুতরাং তাদের পক্ষেও জীবের অদৃষ্টকে নিয়ন্ত্রিত করে এই শৃঙ্খলাপূর্ণ, সুসমঞ্জস ও নিয়মসঙ্গত জগৎ সৃষ্টি সম্ভব নয়। সুতরাং কোন সর্বশক্তিমান, সর্বজ্ঞ, পূর্ণ, সগুণ ও সক্রিয় পুরুষের পক্ষেই এই কাজ করা সম্ভব, এই পুরুষ হলেন ঈশ্বর।

যোগদর্শনের নৈতিক যুক্তি

নৈতিক যুক্তির সমালোচনা (Criticism of Moral Argument) **:** ঈশ্বরের অস্তিত্বের পক্ষে প্রদত্ত যুক্তিগুলির মধ্যে নৈতিক যুক্তিকেই সবচেয়ে শক্তিশালী যুক্তি

বলে সাধারণত, গণ্য করা হয়। বস্তুতঃ, এই যুক্তিটির যথেষ্ট গুরুত্ব আছে মনে করা যেতে পারে যদি নৈতিক মূল্যকে নিছক কাল্পনিক বস্তু রূপে গণ্য না করে এই জগৎ-শৃঙ্খলার বাস্তব গুণ বলে গণ্য করা হয়। মানুষ এবং তার মূল্য যদি প্রকৃতই বাস্তব হয়, যদি নিছক অবভাস (appearance) না হয়, যদি তার মূল্যগুলি যথার্থই কোন পরম এবং অনন্ত তাৎপর্যের প্রকাশক হয়, সংক্ষেপে এই জগৎ যদি প্রকৃতই নৈতিক জগৎ হয়, তাহলে এই জগতের পরিচালকরূপে কোন পরমাত্মার অস্তিত্বে বিশ্বাস যুক্তিসঙ্গত মনে হয়।

যুক্তিটির মূল্য

কিন্তু প্রশ্ন হল, নৈতিক মূল্যকে বাস্তব বলে বিশ্বাস করার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ আছে কী? সত্যই কি আমরা নৈতিক মূল্যকে বাস্তব বলে গণ্য করতে পারি? মানুষ তার নৈতিক জীবনে আদর্শকে লাভ করার জন্য সংগ্রাম করে। কিন্তু এই আদর্শকে তার অভিজ্ঞতার মধ্যে সে পরিপূর্ণভাবে উপলব্ধি করতে পারে না, যেহেতু এই আদর্শ তার অভিজ্ঞতার অতিবর্তী। কিন্তু যদিও এই আদর্শকে পরিপূর্ণভাবে উপলব্ধি করা তার পক্ষে সম্ভব নয়, তবু এই আদর্শকে সে বাস্তব মনে করে এবং এই আদর্শের আলোকেই সে মানুষের আচরণের মূল্যায়ন করে। কাজেই এই আদর্শের যথার্থই বাস্তব ভিত্তি আছে এবং এই আদর্শ মানুষের অভিজ্ঞতানিরপেক্ষ। কাজেই এই জগতের শৃঙ্খলা অংশতঃ নৈতিক শৃঙ্খলা। সুতরাং মঙ্গল বা কল্যাণ প্রকৃতই বস্তুগত এবং বস্তুর প্রকৃতির গুণবিশেষ।

নৈতিক মূল্যকে বাস্তব মনে করার পক্ষে সুযুক্তির অভাব

উপরিউক্ত আলোচনার ভিত্তিতে অনেকে মনে করেন যে, নৈতিক যুক্তি যদিও ঈশ্বরের অস্তিত্বের সুনিশ্চিত প্রমাণ নয়, তবু নাস্তিকদের ঈশ্বরের অস্তিত্ব-বিরোধী যুক্তির সদর্থক উত্তর। এই যুক্তি ব্যক্তিকে ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাসের যৌক্তিক অধিকার দান করে।

[1]ম্যাকগ্রেগর (*MacGregor*) এই যুক্তির সমালোচনায় বলেন, 'ঈশ্বরে অবিশ্বাসী এমন ব্যক্তির কাছে ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ করার যুক্তিরূপে এটি চক্রক দোষে দুষ্ট। কারণ অবিশ্বাসী ব্যক্তিটি যদি নৈতিক মূল্যের বাস্তবতাকে অস্বীকার করেন, তাহলে এই যুক্তিটির প্রবর্তকবৃন্দ নিশ্চল সমাপ্তির মুখে উপনীত হন।' তিনি আরও বলেন, "নৈতিক যুক্তির বিরুদ্ধে অভিযোগগুলি তত্ত্ববিষয়ক যুক্তির বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগগুলির কথা মনে করিয়ে দেয়। শেষোক্ত যুক্তির সমর্থকবৃন্দ যেমন ঈশ্বরের মধ্যে কার্যকারণ সম্বন্ধের আশ্রয়ের

যুক্তিটি চক্রক দোষে দুষ্ট

1. G. MacGregor: Introduction to Religious Philosophy; Page 126

সন্ধান করেন, তেমনি নৈতিক যুক্তির সমর্থকবৃন্দ ঈশ্বরের মধ্যে মানুষের জীবনে উপলব্ধ মূল্যগুলির (a home in God for values as these are exprienced in human life) আশ্রয়ের সন্ধান করেন।"

[1]কাণ্ট যেভাবে নৈতিক যুক্তিটিকে উপস্থাপিত করেছেন, সেটি অন্যান্য যুক্তিগুলি যেভাবে তর্কবিজ্ঞানসম্মত যুক্তিগুলির সার্বভৌমত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত, সেইভাবে প্রতিষ্ঠিত, না হয়ে নৈতিক ইচ্ছার সার্বভৌমত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত। কাণ্টের মতে মানুষের নৈতিক চেতনা এবং নৈতিক মর্যাদা ঈশ্বরকে এক স্বীকার্য সত্য রূপে স্বীকার করার দাবী জানায়। কিন্তু আমার নৈতিক চেতনা এবং নৈতিক মর্যাদা তা দাবী করলেও, আমি আমার নাস্তিক বন্ধুকে তার নৈতিক চেতনা এবং নৈতিক মর্যাদাও তাই দাবী করছে, এই মতে স্বীকৃতি জানাতে বাধ্য করতে পারি না। ঈশ্বরে অস্তিত্বের পক্ষে প্রমাণ হিসেবে নৈতিক যুক্তি স্বীকৃতি দিতে বাধ্য করতে পারে না (as a part of the existence of God the moral argument cannot compel assent)।

কাণ্টের নৈতিক যুক্তির সমালোচনায় ওয়াটারহাউসের (*Waterhouse*) বক্তব্য হল যে, কাণ্ট ঈশ্বরে বিশ্বাস করতে চেয়েছিলেন, তাই এই যুক্তির অবতারণা। বিচার-বুদ্ধি সেই বিশ্বাসের ভিত্তি যুগিয়ে দিতে পারে কাণ্ট নিজেই সেই ধারণাকে বাতিল করে দিয়েছেন। তাঁর নিজের কর্তব্যবোধ তাকে কর্তব্যবোধের বিষয়টির উপর গুরুত্ব আরোপ করে এমন সিদ্ধান্ত টানতে প্রণোদিত করেছিল, যে সিদ্ধান্ত যুক্তিযুক্তভাবে আশ্রয়বাক্য থেকে নিঃসৃত হয় না।

এই যুক্তির বিরুদ্ধে অন্যান্য যেসব অভিযোগ উত্থাপিত হয়েছে সেইগুলি হল :

(i) নৈতিক মূল্যের কোন প্রাকৃতিক ব্যাখ্যা দেওয়া যায় না। কোন ব্যাখ্যা দিতে গেলে তার অপ্রাকৃতিক ব্যাখ্যা দিতেই হবে—এই জাতীয় সিদ্ধান্ত করা হল, যে বিষয়টিকে প্রমাণ করতে হবে তাকে বিনা বিচারে স্বীকার করে নেওয়া।

(ii) জন হিক নৈতিক যুক্তির সমালোচনায় বলেন যে, নৈতিক মূল্য আমাদের মনে ধর্মসম্পর্কীয় বিশ্বাস বা ঈশ্বরে বিশ্বাস জাগ্রত করে। একথা মেনে নিলেও, একে ঈশ্বরের অস্তিত্বের পক্ষে একটি সন্তোষজনক যুক্তি রূপে গ্রহণ করা যায় না। নৈতিক-বাধ্যতাবোধের সার্বভৌম কর্তা হলেন ঈশ্বর অর্থাৎ আমাদের নৈতিক বাধ্যতাবোধ ঈশ্বরের কাছে—এমন সিদ্ধান্ত বিতর্কমূলক এবং যদি এটা স্বীকার করে নেওয়াও যায়

1. "The Moral Argument, as presented by Kant, is based on the sovereignty of the moral will instead of being based, as are the other arguments, on the sovereignty of logical reasoning."

—G. MacGregor : Introduction to Religious Philosophy ; Page 127

যে, নৈতিক মূল্যের উৎস হল কোন অতীন্দ্রিয় সত্তা। সেই সত্তা যে কোন অসীম, সর্বশক্তিমান, স্বয়ম্ভূ. সর্বোত্তম পুরুষ, জগৎ স্রষ্টা ঈশ্বর, তা প্রমাণের অপেক্ষা রাখে।

(iii) ধার্মিককে সুখী হতেই হবে এমন প্রমাণ কোথায়? গ্যালোয়ে (*Galloway*) কাণ্টের এই যুক্তির সমালোচনা করতে গিয়ে বলেন, "এই সবকিছু খুবই কৃত্রিম। যে উদ্দেশ্যের বশবর্তী হয়ে মানুষ একজন ঈশ্বরকে স্বীকার করে নেবে, এই যুক্তি সেই উদ্দেশ্যের মনস্তাত্ত্বিক বর্ণনা নয়, বা এই যুক্তি কাণ্টের নিজেরই যুক্তিবাক্যের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয় যে, যে সুখকে তিনি অভিজ্ঞতামূলক এবং ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় বলে গণ্য করেন তাকে পরমকল্যাণের একটি উপাদানের স্তরে উন্নীত করা হবে।" নৈতিক দায়িত্বের জন্য ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করলে নৈতিকতা স্বার্থবুদ্ধির দ্বারা দোষদুষ্ট হবে। তাছাড়া যদি কেউ নৈতিক বাধ্যতাবোধের বিষয়টিকে সামাজিক নিয়ন্ত্রণ (social sanctions)-এর সাহায্যে ব্যাখ্যা করতে চান তাহলে কাণ্টের কিছুই বলার থাকবে না।

উনবিংশ শতাব্দীতে এবং বিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে এই যুক্তিটির যথেষ্ট প্রভাব ছিল। এর কারণ হল, যুক্তিটি শক্তিশালী, আকর্ষণীয় এবং কোন কোন ক্ষেত্রে এটি দৃঢ় বিশ্বাস জাগ্রত করতে সক্ষম। তর্কবিজ্ঞানসম্মত যুক্তির কথা বাদ দিলে, ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্পর্কে চিন্তার বিকাশে এর অভিনব গুরুত্ব রয়েছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত অন্যান্য যুক্তির মতনই এটি ঈশ্বরে অস্তিত্বে স্বীকৃতি দেবার জন্য মানুষকে বাধ্য করতে অসমর্থ হয়। যা অন্যান্য যুক্তিগুলি পাবে না, এই যুক্তি ঈশ্বরের অস্তিত্বের প্রমাণ-সম্পর্কীয় সমস্যাটির প্রতি মানুষের মনোযোগ আকর্ষণ করে। আসল কথা, যে মানুষের মন ঈশ্বরের অস্তিত্ব অস্বীকার করতে প্রস্তুত, এমন কোন যুক্তির কথা আমরা চিন্তা করতে পারি না, যা তার কাছে ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ করতে পারে।

যুক্তিটির গুণ

বিশেষ ধরনের ঘটনা এবং অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে ঈশ্বরের অস্তিত্বের পক্ষে যুক্তি (The Argument from Special Events and Experiences) :

অনেকে দাবী করেন যে এমন অনেক বিচিত্র ঘটনা এবং অভিজ্ঞতা মানুষের জীবনে ঘটে, যার প্রাকৃত বা লৌকিক ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভব হয় না। এই সব বিশেষ ধরনের ঘটনা বা অভিজ্ঞতা বহু ক্ষেত্রেই সাধারণের কাছে প্রত্যক্ষগোচর হয়। যেমন নানা ধরনের লৌকিক ঘটনা, ব্যক্তির অলৌকিকভাবে প্রার্থনা পূরণ এবং অভীষ্ট সিদ্ধির ঘটনা প্রভৃতি ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ করে বলে অনেকে মনে করেন। এছাড়াও রয়েছে নানা ধরনের অভিজ্ঞতা, যা ঈশ্বরে অস্তিত্ব প্রমাণ করে বলে অনেকে ধারণা করেন। ব্যক্তিগত ঈশ্বর-সাক্ষাৎকারের বা ঈশ্বর-দর্শনের অভিজ্ঞতা, ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্পর্কে রহস্যপূর্ণ সচেতনতা, স্বপ্নে ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ করার অভিজ্ঞতা, ঈশ্বর-

সান্নিধ্যের অলৌকিক অভিজ্ঞতা, অলৌকিকবাণী শ্রবণ করা, ভাবাবেশ, দিব্যদৃষ্টি প্রভৃতির অভিজ্ঞতা ঈশ্বরের অস্তিত্বের পক্ষে সার্থক যুক্তি বলে অনেকে মনে করেন।

সমালোচনায় জন হিক বলেন যে ধারাবাহিকভাবে বেশ কিছু অলৌকিক ঘটনা যদি ঘটে এবং সেইগুলি যদি ব্যক্তির প্রত্যক্ষগোচর ঘটনা হয় তাহলে সেই ব্যক্তি যতই সংশয়বাদী হোন না কেন, তার মধ্যে ঈশ্বরে বিশ্বাস জাগ্রত হয়। কিন্তু এইরূপ ঘটনা যাঁরা প্রত্যক্ষ করেননি তাঁদের কাছে উপরিউক্ত ঘটনাগুলি ঈশ্বরের অস্তিত্বের পক্ষে সাধারণ যুক্তিরূপে গণ্য হতে পারে না। ঐ জাতীয় ঘটনার প্রাকৃত বা লৌকিক ব্যাখ্যা দেবার প্রচেষ্টাই তাদের মধ্যে পরিলক্ষিত হবে।

ডেভিড হিউম 'অলৌকিক'-এর সমালোচনায়[1] যা বলেছেন তাও প্রণিধানযোগ্য। প্রথমতঃ, ইতিহাসে এমন কোন অলৌকিক ঘটনার কথা জানা যায় না যে ঘটনা বহু সংখ্যক ব্যক্তি, যাঁদের জ্ঞান, শিক্ষা, বুদ্ধি, বিদ্যা, সন্দেহাতীত, তাঁদের দ্বারা সত্যই অলৌকিক বলে প্রমাণিত হয়েছে। দ্বিতীয়তঃ, অলৌকিক ঘটনায় বিশ্বাসের একটা সাধারণ প্রবণতা মানুষের মধ্যে দেখা দেয় এবং অনেক ক্ষেত্রে আবেগ ও অতিরিক্ত বিশ্বাস প্রবণতাকে সংযত করে অলৌকিক ঘটনাগুলিকে বিচার বিশ্লেষণ করলে তাদের প্রাকৃতিক ব্যাখ্যা খুঁজে পাওয়া খুব কঠিন হয় না। তৃতীয়তঃ, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই, হিউমের অভিমত, অলৌকিক ঘটনার অভিজ্ঞতা অজ্ঞ ব্যক্তিদের হয়ে থাকে। চতুর্থতঃ, কোন অলৌকিক ঘটনার অভিজ্ঞতার কোন প্রমাণ প্রদত্ত হলে অসংখ্য ব্যক্তিকে তার বিরোধিতা করতে দেখা যায়।

মনোবিজ্ঞানের একটি বিশেষ শাখা হল পরামনোবিদ্যা (Parapsychology)। মনোবিদ্যার এই শাখাটি অনেক অলৌকিক ঘটনার লৌকিক বা প্রাকৃতিক ব্যাখ্যা দিয়েছে এবং এই শাখাটি আরও অনেক অলৌকিক ঘটনা যেমন দূরদর্শন, পূর্বজন্মস্মৃতির অভিজ্ঞতা প্রভৃতি ঘটনারও প্রকৃত ব্যাখ্যা দিতে সচেষ্ট।

বিশেষ ধরনের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে যাঁরা ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ করতে চান, সেই সম্পর্কে বলা যেতে পারে যে, এই সব অভিজ্ঞতা ঈশ্বরের অস্তিত্বের পক্ষে অকাট্য যুক্তি বলে গণ্য হতে পারে না। কোন ব্যক্তির একটা বিশেষ ধরনের অভিজ্ঞতা হতে পারে। কিন্তু এর নির্ভুল ব্যাখ্যা ধর্মবিজ্ঞানের তুলনায় মনোবিজ্ঞান দিতে পারে বলে অনেকে মনে করেন।

সংক্ষেপে বলা যেতে পারে যে, যে বিশেষ ঘটনা বা বিশেষ অভিজ্ঞতা ঈশ্বরের

1. An Enquiry concerning Human Understanding, See Chapter X (ON MIRACLES).

অস্তিত্ব প্রমাণ করছে বলে দেখান হয় তাকে যে অন্যভাবে দেখান বা উপস্থাপিত করা যায় না এমন নয়; সেক্ষেত্রে ঐ বিশেষ ঘটনা বা বিশেষ অভিজ্ঞতাকে ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ সম্পর্কীয় অকাট্য যুক্তি বলে গণ্য করা চলে না।

ভারতীয় দর্শনে ঈশ্বরের অস্তিত্বের প্রমাণ বিষয়ক আরও কতকগুলি যুক্তি উপস্থাপিত হয়েছে, যেগুলি সংক্ষেপে এখানে আলোচনা করা হচ্ছে:

(ক) শাস্ত্রের প্রামাণ্যের ভিত্তিতে যুক্তি (Argument from the authoritativeness of the scriptures): ন্যায় দর্শনে ও যোগ দর্শনে এই যুক্তি উপস্থাপিত হয়েছে। নৈয়ায়িকদের মতে শাস্ত্রের প্রামাণ্য সব ধর্মেই স্বীকৃত। বেদ প্রামাণ্য গ্রন্থ ও বেদের সাহায্যে ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ করা হয়। কিন্তু বেদকে প্রামাণ্য মনে করার কারণ কি? বেদের প্রামাণ্য হল আপ্ত-প্রামাণ্য। বেদের রচয়িতা কোন জীবাত্মা নয়, কোন সর্বজ্ঞ সর্বশক্তিমান আত্মাই বেদের কর্তা। সাধারণ মানুষের ভ্রম-প্রমাদাদি থাকার জন্য তারা বেদের রচয়িতা হতে পারে না। একমাত্র ঈশ্বর যদি বেদ রচনা করেন তবেই বেদ অভ্রান্ত ও প্রামাণ্য হতে পারে। এ ছাড়াও বেদে বহু অলৌকিক বিষয়ের উল্লেখ আছে। এই সব অলৌকিক বিষয় কোন সাধারণ জীবের প্রত্যক্ষের বিষয় হতে পারে না। সুতরাং অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন, সর্বশক্তিমান ও সর্বজ্ঞ কোন পরমাত্মাই বেদের কর্তা। যেহেতু তিনি সর্বজ্ঞ, সেইহেতু তিনি ত্রিকালজ্ঞ। অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ এবং যাবতীয় অলৌকিক বিষয়ের প্রত্যক্ষ জ্ঞান তাঁর আছে। এই সর্বজ্ঞ পরমাত্মাই হলেন ঈশ্বর।

(খ) শ্রুতির যুক্তি (The Argument from the Testimony of Sruti): বেদে ঈশ্বরকে পরমাত্মা, পরমপুরুষ, পরমতত্ত্ব ও জ্ঞানকর্তারূপে বর্ণনা করা হয়েছে। বেদে ঈশ্বরকে সৃষ্টি, স্থিতি এবং প্রলয়কর্তারূপে, জীবাত্মার নিয়ামক কর্মফলদাতারূপে, বিশ্বজগতের নৈতিক শাসন কর্তারূপেও বর্ণনা করা হয়েছে। যেহেতু শ্রুতি অভ্রান্ত প্রমাণ এবং ঈশ্বরের অস্তিত্বের সাক্ষ্য বহন করে সেইহেতু ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করতে হয়।

কিন্তু প্রশ্ন হল, ব্যক্তি শাস্ত্রের প্রামাণ্য স্বীকার করে নেবে কেন? এই প্রশ্নের যথার্থ কোন উত্তর দেওয়া সম্ভব নয়। তবে নৈয়ায়িকরা বলবেন যে, যাঁরা প্রত্যক্ষভাবে ঈশ্বরকে উপলব্ধি করতে সমর্থ হননি তাঁদের সত্যদ্রষ্টাঋষিদের আপ্তবচনের উপর নির্ভর করাই শ্রেয়ঃ। যেহেতু শাস্ত্রে ঋষিদের প্রত্যক্ষ সাক্ষাৎকারের উপলব্ধির কথা লিপিবদ্ধ আছে, সেইহেতু শাস্ত্রগুলিকে প্রামাণ্য বলে স্বীকার করা উচিত।

(গ) অনবচ্ছেদ নীতির ভিত্তিতে যুক্তি (Argument from the Law of Continuity): এই নীতি অনুসারে যা কিছু তারতম্যযুক্ত তার একটা সর্বোচ্চ এবং

সর্বনিম্ন স্তর স্বীকার করতে হয়, যেমন পরিমাণ। অল্পতার সর্বনিম্ন স্তর হল পরমাণু আর বৃহতের চরম সীমা, আকাশ। সেইরূপ জ্ঞান এবং শক্তির ক্ষেত্রেও এই তারতম্য লক্ষ্য করা যায়। কারও জ্ঞান এবং শক্তি কম, কারও তুলনায় কিছু বেশী, কারও আরও বেশী এইভাবে আমরা চরম সীমায় উপনীত হই। সুতরাং, এমন কোন পুরুষ আছেন যাঁর মধ্যে জ্ঞান ও শক্তি চরম উৎকর্ষ লাভ করেছে। সাধারণ পুরুষের জ্ঞান ও শক্তি সীমিত। সুতরাং ঈশ্বর হলেন পুরুষবিশেষ, যিনি সর্বজ্ঞ এবং সর্বশক্তিমান; তিনি জ্ঞান ও শক্তির পরাকাষ্ঠা।

(ঘ) পুরুষ ও প্রকৃতির সংযোগকর্তারূপে ঈশ্বরের অস্তিত্বের প্রমাণ (Argument from the association and disassociation of Purusa and Prakriti): যোগশাস্ত্রকারের মতে ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করার অন্যতম প্রমাণ হল, ঈশ্বরই পুরুষ ও প্রকৃতির মধ্যে সংযোগ ঘটিয়ে প্রকৃতির অভিব্যক্তিকে সম্ভব করে তোলেন। সাংখ্যমতে পুরুষ ও প্রকৃতির সংযোগহেতু এই জগতের অভিব্যক্তি। পুরুষ ও প্রকৃতি দুটি নিত্য স্বতন্ত্র বিরুদ্ধস্বভাবসম্পন্ন সত্তা। পুরুষ চেতন, কিন্তু নিষ্ক্রিয়। প্রকৃতি অচেতন, কিন্তু সক্রিয়। পুরুষ ও প্রকৃতি—এই দুটি বিরুদ্ধস্বভাবসম্পন্ন নিত্য সত্তার মধ্যে কিভাবে সংযোগ ঘটতে পারে? একমাত্র কোন সর্বজ্ঞ শক্তিমান পূর্ণ চেতন পুরুষের দ্বারাই এই কার্য সম্ভব। এই পুরুষ কোন সাংসারিক জীব হতে পারে না। এই পুরুষ হল ঈশ্বর।

(ঙ) শঙ্করের ঈশ্বরের অস্তিত্ববিষয়ক প্রমাণ (Sankara's proof of God): শঙ্করের মতে ঈশ্বরের অস্তিত্ব যুক্তির দ্বারা প্রমাণ করা যায় না। পাশ্চাত্ত্য দার্শনিক কাণ্টও অনুরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন। ঈশ্বরের অস্তিত্ব বিষয়ক সব প্রমাণই ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ করতে পারে না, ঈশ্বরের অস্তিত্বের সম্ভাবনা নির্দেশ করে। যৌক্তিক বিশ্লেষণ এবং অভিজ্ঞতার মাধ্যমে ঈশ্বরের বাস্তবতাকে প্রতিপন্ন করা যায় না, কেননা ঈশ্বর অভিজ্ঞতা ও বিচারবুদ্ধির অতিবর্তী। সত্যদ্রষ্টা ঋষিদের আধ্যাত্মিক অন্তর্দৃষ্টির সাহায্যেই ঈশ্বরের বাস্তবতা প্রতিপন্ন হতে পারে। শ্রুতির মাধ্যমেই আমরা জানতে পারি ঈশ্বর জগতের স্রষ্টা, পালনকর্তা ও ধ্বংসকর্তা। ঈশ্বরের বাস্তবতা, শঙ্করের মতে কোন যৌক্তিক সত্য, বা স্বতঃসিদ্ধ সত্য নয়, বরং অভিজ্ঞতার দিক থেকে স্বীকার্য সত্য, যেটির ব্যবহারিক উপযোগিতা আছে।

ঈশ্বরের অস্তিত্ববিষয়ক যুক্তিগুলির সামগ্রিক মূল্যায়ন: ঈশ্বরের অস্তিত্ব-বিষয়ক যুক্তিগুলি আলোচনা করে দেখা গেল যে, ঈশ্বরের অস্তিত্বের প্রমাণ হিসেবে এইগুলি ব্যর্থ। বার্গ বলেন, "পরিচিত প্রমাণগুলি হয় প্রমাণ হিসেবে ব্যর্থ, কিংবা যা

তারা প্রমাণ করে তা ধর্মের ঈশ্বর ভিন্ন অন্য কিছু।"[1] যুক্তিগুলি কম বা বেশী মাত্রায় ঈশ্বরের অস্তিত্বের সম্ভাবনা সূচিত করে। কিন্তু যারা অকাট্য যুক্তি সন্ধান করেন, সেইসব ব্যক্তিদের মনে এই যুক্তিগুলি ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্পর্কে দৃঢ় বিশ্বাস জাগ্রত করতে ব্যর্থ হয়। প্রমাণ বলতে বোঝায় বক্তব্য বিষয়ের মধ্যে যৌক্তিক সংযোগ (logical connection) এবং জগৎ ও জগতের প্রকৃতি থেকে ঈশ্বরের অস্তিত্ব অনুমান করার অর্থ হল, আশ্রয়বাক্যে যা নেই তার অধিক কিছু সিদ্ধান্তে স্বীকার করে নেওয়া যার ফলে সিদ্ধান্ত হয়ে পড়ে আশ্রয়বাক্যের তুলনায় ব্যাপকতর। ধর্ম যে ঈশ্বরের কথা বলে, কোন অবরোহ যুক্তির সাহায্যে তাকে লাভ করা সম্ভব নয়।

যুক্তিগুলি ঈশ্বরের অস্তিত্বের সম্ভাবনার ইঙ্গিত দেয়

তবে প্রমাণ হিসেবে অসার্থক হলেও এই যুক্তিগুলি যে একেবারে মূল্যহীন তা নয়। এই যুক্তিগুলি দেখায় ধর্মবিশ্বাসের দাবীকে বিচারবুদ্ধি কিভাবে সমর্থন করতে পারে এবং যে ঈশ্বর মানুষের অন্তর্জীবনের (inner life) পক্ষে অনিবার্য, সেই ঈশ্বরকে ভাবনাত্মক চিন্তনের দ্বারাও সমর্থন করা যেতে পারে: ঈশ্বরের অস্তিত্বের পক্ষে বিভিন্ন যুক্তিগুলি মানুষের মনে এই বিশ্বাস জাগায় যে, তার ধর্ম কোন অবিচারবুদ্ধিজনিত মনোভাব (non-rational attitude)-এর প্রকাশক নয়। যুক্তির সাহায্যে ঈশ্বরে উপনীত হবার এই প্রচেষ্টাকে যেটি মানবাত্মার একটি নিরবচ্ছিন্ন প্রবণতার লক্ষণ, ধর্মীয় চেতনার কেন্দ্রীয় বিষয়রূপে গণ্য করা যেতে পারে। এই প্রবণতা মানুষের আধ্যাত্মিক সত্তাকে তার পরিবেশের, তার জগতের ঊর্ধ্বে নিয়ে যেতে চায় যাতে, সে পরমসত্তাকে ঈশ্বর বলে অভিহিত করে, তার মধ্যেই তার চিন্তন ও জীবনের গভীরতর ভিত্তির সন্ধান পায়।

যুক্তিগুলির মূল্য

ধর্মনিষ্ঠ ব্যক্তি এই যুক্তিগুলির সাহায্যেই তার লক্ষ্যে উপনীত হতে সমর্থ হয়, তা নয়। সে যুক্তির পথে অগ্রসর হয় কেননা এই জগৎ তাকে পরিতৃপ্ত করতে পারে না। মানুষের সুনিশ্চিত বিশ্বাস যে, জগৎ অপূর্ণ এবং কোন গভীরতর সত্তার প্রয়োজন আছে, যে এই অপূর্ণতা দূর করে তাকে পূর্ণ করে তুলবে। কি চিন্তন, কি আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা উভয়ের কাছেই এই জগৎ এক বিরাট অতৃপ্তির কারণ হয়ে দাঁড়ায় এবং সেই কারণে মানুষ এই জগতকে অতিক্রম করে যেতে চায় এবং এই জগতের যথার্থ ব্যাখ্যা ও মূল্যের সন্ধান করতে উৎসুক। ঈশ্বরের অস্তিত্ববিষয়ক প্রমাণগুলি এই ব্যাখ্যা দেবার চেষ্টা করে। ধর্মপ্রবণ মনের সাধারণ গতির লক্ষণ ও প্রতীক হিসেবে এই যুক্তিগুলির মূল্য অস্বীকার করা যায় না।

1. W. G. De Burgh ; Towards Religious Philosophy ; Page 40

নবম অধ্যায়

ধর্ম-বিশ্বাসের ভিত্তি
(Grounds of Religious Belief)

১। ভূমিকা (Introduction) :

ধর্মসম্বন্ধীয় জ্ঞান কি ভাবে লাভ করা যায়? এই জ্ঞান লাভ করার মাধ্যম কি? যে উপায়ে বৈজ্ঞানিক এবং দার্শনিক জ্ঞান লাভ করা যায়, সেই একই উপায়ে কি ধর্মসম্বন্ধীয় জ্ঞান লাভ করা যায়?

ধর্মসম্বন্ধীয় জ্ঞানের মাধ্যম কি?

সময় সময় এমন কথা বলা যায় যে, ধর্মসম্বন্ধীয় জ্ঞান নিজেই নিজের প্রামাণ্য (religious knowledge is its own authority)। তাহলে ধর্মের সমর্থকবৃন্দ কি এমন কথা বলতে চান যে তাঁরা তাদের আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে ধর্মের দিক থেকে যে জগৎ সম্পর্কীয় মতবাদ উপস্থাপিত করেন সেটি সকলের স্বীকৃতি লাভ করবে? কিন্তু বাস্তবে তা দেখা যায় না। ধর্মসম্বন্ধীয় জগৎ ব্যাখ্যার মধ্যে পার্থক্য দেখা যায়। প্রশ্ন হল, কিসের ভিত্তিতে আমরা কোন একটি মতবাদ স্বীকার করে নেব এবং অন্যান্য মতবাদগুলিকে অস্বীকার করব? ধর্মনিষ্ঠ ব্যক্তি সব সময়ই দাবী করেন যে তাঁর শ্রদ্ধার বস্তু বাস্তব এবং সেই বস্তুর সঙ্গে তাঁর যে সম্বন্ধের কথা তিনি ধারণা করেন তাও সত্য। ধর্মনিষ্ঠ ব্যক্তির বক্তব্য হল, 'আমি এটাকে এরকম অনুভব করছি এবং আমি একে সন্দেহ করতে পারি না।' কিন্তু মানসিক ঘটনা হলেই যে তার যৌক্তিক যাথার্থ্য (logical validity) থাকবেই এমন কোন কথা নেই। নিশ্চয়তার বস্তুনিরপেক্ষ অনুভূতি, অনুভূতিকে সব সময় সত্য করে তোলে না। কোন ব্যক্তি তার অভিজ্ঞতা সম্পর্কে ভুল নাও করতে পারে। কিন্তু সেই অভিজ্ঞতাকে ভিত্তি করে সে যেসব অনুমান করে বা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে, বা সেই অভিজ্ঞতার সে যেসব ব্যাখ্যা দেয় সেগুলি অতি সহজেই ভ্রান্ত হতে পারে। কাজেই নিশ্চয়তার বস্তুনিরপেক্ষ অনুভূতি (subjective feeling of certainty) থেকে ধর্মীয় অভিজ্ঞতার সত্যতার আভাস পাওয়া যায় না। ধর্মসম্বন্ধীয় অভিজ্ঞতার ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে যে সব অনুমান করা হয় তখন ভুলভ্রান্তি ঘটবার সম্ভাবনা দেখা দিতে পারে। কাজেই আমার অনুভূতি, শুধুমাত্র এটুকুই ধর্মীয় বিশ্বাসের সত্যতা বা প্রামাণ্যের কারণ বলে গৃহীত হতে পারে না। তাছাড়া আবেগগত নিশ্চয়তা যেহেতু ব্যক্তি ভেদে পৃথক, সেইহেতু অপরকে আমার অনুভূতিকে প্রামাণ্য বলে স্বীকার করতে বাধ্য করা কোনমতেই যুক্তিযুক্ত হতে পারে না। কেননা অপর ব্যক্তি অতি সহজে

ধর্মসম্বন্ধীয় জ্ঞান নিজেই নিজের প্রামাণ্য

নিশ্চয়তার অনুভূতি, অনুভূতিকে সুনিশ্চিত করে না

অনুভূতিই অভিজ্ঞতাকে সত্য করে না

এই উত্তর দিতে পারেন, 'তুমি যেমন অনুভব করছ, আমি যখন সেরকম অনুভব করছি না, তখন 'তুমি কিছুতেই প্রত্যাশা করতে পার না যে তুমি যেমন বিশ্বাস করছ, আমিও সেইরূপ করব।' এই অসুবিধা আরও বিশেষ করে দেখা দেয় ধর্মীয় জীবনের উন্নত স্তরে, যে স্তরে ধর্মীয় অভিজ্ঞতার অনেকখানি ব্যক্তিগত এবং আন্তর বিষয়।

কাজেই মানুষের প্রশ্ন হল, ধর্মীয় জ্ঞান লাভ করার মাধ্যম কি? ধর্মীয় জ্ঞানের প্রামাণ্যের উৎসটি কী?—প্রত্যাদেশ, বিশ্বাস, বিচারবুদ্ধি, না স্বজ্ঞা? আমরা এবার ধর্ম-সম্বন্ধীয় জ্ঞান লাভের বিভিন্ন উৎসগুলি একে একে আলোচনা করব। তবে তার আগে ঈশ্বরের অস্তিত্বের পক্ষে প্রমাণের সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে আলোচনা করব, যার জন্য ধর্মীয় জ্ঞান লাভ করার বিভিন্ন মাধ্যমগুলির আলোচনা অপরিহার্য হয়ে পড়ে।

২। ঈশ্বরের অস্তিত্বের পক্ষে প্রমাণের সীমাবদ্ধতা (The Limits of Proof for the existence of God):

ঈশ্বরের যে অস্তিত্ব আছে, তা বিশ্বাস করার মূলে কি ভিত্তি রয়েছে? ইতিপূর্বে আমরা আলোচনা করে দেখেছি যে, সর্বজনস্বীকৃত হেতুবাক্য থেকে বিচারবুদ্ধিসম্মত যুক্তির সাহায্যে ঈশ্বরের অস্তিত্ব, বা নাস্তিত্ব, কোনটিকেই প্রতিষ্ঠা করা চলে না। কিন্তু তা সত্ত্বেও মানুষের বিচারবুদ্ধি ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রতিষ্ঠা করার জন্য আগ্রহী। প্রশ্ন হল, কি ভাবে তা সম্ভব হতে পারে?

ঈশ্বরের অস্তিত্ব বা নাস্তিত্ব প্রতিষ্ঠার পক্ষে অসুবিধা

দর্শন কোন কিছুর জ্ঞান লাভের দুটি উৎস-এর কথা বলে থাকে। একটি, যার উপর অভিজ্ঞতাবাদীরা গুরুত্ব আরোপ করেছেন, হল অভিজ্ঞতা। দ্বিতীয়টি, যার উপর বুদ্ধিবাদীরা গুরুত্ব আরোপ করেছেন, সেটি হল বিচারবুদ্ধি। বুদ্ধিবাদীরা জ্ঞান লাভের যে পথের কথা বলেছেন তার সীমাবদ্ধতা হল যে, কেবল মাত্র সেই সত্যগুলিকে প্রমাণ করা যায় যেগুলি বিশ্লেষাত্মক এবং বস্তুতঃ পুনরুক্তিমূলক। শুধুমাত্র যুক্তির সাহায্যে ঘটনা এবং অস্তিত্ব সম্পর্কীয় কোন বিষয়কে প্রমাণ করা যায় না। 'চারের দ্বিগুণ আট' এটিকে প্রমাণ করা যেতে পারে। কিন্তু বাস্তব জগতের অস্তিত্ব বা বাস্তব জগতের কোন বিষয়কে অভিজ্ঞতা ব্যতিরেকে জানা সম্ভব নয়। কেননা বাস্তব জগতের কোন কিছুর জ্ঞান ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষ নির্ভর। তাছাড়া অভিজ্ঞতার মাধ্যমে বিষয়বস্তু আমাদের কাছে উপস্থাপিত না হলে, আমাদের সেই সম্পর্কে বিচারবুদ্ধির সাহায্যে কোন যুক্তি উপস্থাপনের প্রশ্নই ওঠে না। এই বিষয়টি অন্য ব্যাপারে যেমন, ধর্মের ক্ষেত্রেও সত্য।

বুদ্ধিবাদীদের সিদ্ধান্তের সীমাবদ্ধতা

ঈশ্বরকে মানুষের কাছে প্রকাশিত হতে হবে

ঈশ্বরের যদি অস্তিত্ব থাকে; তাহলে সেই ঈশ্বর আমাদের মনের কোন ধারণা নয়। আমাদের বাইরে অস্তিত্বশীল কোন সত্তা। কাজেই মানুষকে যদি ঈশ্বরকে জানতে হয় তাহলে ঈশ্বরকে কোন না কোন ভাবে মানুষের অভিজ্ঞতায় প্রকাশিত হতে হবে।

দেকার্তের সময় থেকে পাশ্চাত্যদর্শনে বুদ্ধিবাদীদের স্বীকার্য সত্যগুলি (assumptions) বিরুদ্ধে যে সমসাময়িক বিদ্রোহ ঘোষিত হয়েছে, উপরিউক্ত সিদ্ধান্ত তার সঙ্গে সংগতিপূর্ণ। দেকার্তের মতে যে সত্যগুলি স্বতঃসত্য বা স্বতঃসত্য হেতুবাক্য থেকে যৌক্তিক অনুমানের সাহায্যে যে সত্যগুলিকে অবরোহের আকারে নিষ্কাশিত করা যায়, সেইগুলিকে কেবলমাত্র সঠিকভাবে জানা যায়। 'জানা মানেই তা প্রমাণযোগ্য' এই লৌকিক ধারণা উপরিউক্ত ঐতিহ্য থেকেই লব্ধ হয়েছে। আমরা জানি যে দেকার্ত তাঁর দর্শনের শুরুতে সব কিছুকে সন্দেহ করতে শুরু করেছিলেন এবং সিদ্ধান্ত করেছিলেন যে, একটি বিষয়কে সন্দেহ করা যায় না, সেটি হল ব্যক্তির আত্মার অস্তিত্ব। 'আমি চিন্তা করি, সুতরাং আমি অস্তিত্বশীল'। আত্মার সুনিশ্চিত অস্তিত্বের উপর ভিত্তি করে তিনি ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ করলেন এবং ঈশ্বরের সত্যতার ভিত্তিতে আমাদের ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষের সত্যতাকে স্বীকার করে নিলেন। তাঁর বক্তব্য হল ঈশ্বর প্রতারক হতে পারেন না; কাজেই আমাদের ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষের সত্যতা আছে।

দেকার্তের মতে স্বতঃসিদ্ধ সত্যই কেবলমাত্র প্রমাণযোগ্য

দেকার্ত সংশয়ের ভিত্তিতে ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষের সত্যতা মেনে নেন

কিন্তু দেকার্তের সিদ্ধান্তই তাঁর বিশ্বতত্ত্ব বিষয়ক যুক্তিকে স্বীকার করে নেবার পথে বাধা হয়ে দাঁড়াল। সব কিছুতে সন্দেহ করতে গেলে সিদ্ধান্ত করতে হয়, ঈশ্বরের অস্তিত্ব বিষয়ক যে যুক্তিকে আমরা বৈধ বলে মেনে নিচ্ছি, তা আসলে বৈধ নয়। সব কিছুকে সন্দেহ করলে আমাদের যুক্তি বা অনুমান করার অক্ষমতাতেও সন্দেহ করতে হয়। সেইকারণে বর্তমান সময়ে জি. ই. মূর এবং অন্যান্য দার্শনিকবৃন্দ এই অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে, দেকার্তের সংশয় পদ্ধতি বিচার বুদ্ধি-বিরুদ্ধ এবং বিকৃত। মূর-এর মতে জগতে আমরা বাস করছি তার অস্তিত্ব প্রমাণের প্রয়োজনীয়তা আছে মনে করা হলে তা হবে এক, কেননা আমাদের এই বাস্তব জগতের মত আর কোন কিছুই আমাদের কাছে এতখানি সুনিশ্চিত নয়। বাস্তব জগতে এবং অন্যান্য ব্যক্তির অস্তিত্বের চেতনা নিয়েই আমরা শুরু করি। দার্শনিক দিক থেকে তার সমর্থনের কোন প্রয়োজন নেই এবং সেই সমর্থন যুগিয়ে দেওয়াও সম্ভব নয়।

দেকার্তের সংশয়-পদ্ধতির সমালোচনা

অসংগত ব্যাপার

তাছাড়া সংশয় যদি সার্বিক হয় অর্থাৎ তার ব্যাপকতা যদি এমন হয় যে, সব কিছুকেই সংশয় করা যায় তাহলে তা হয়ে পড়ে অর্থহীন। কেননা সংশয়াতীত বস্তুর অস্তিত্ব আছে এটা মেনে না নিলে সংশয়ের প্রশ্ন আসে না। যার ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতা হয়েছে এমন কোন যথার্থ বস্তুর অস্তিত্ব স্বীকার করে নিয়েই আমরা অন্য কোন কিছুর অস্তিত্বে সংশয় প্রকাশ করতে পারি। তবে সব কিছুকে সংশয় করা চলে - এই সিদ্ধান্তকে অস্বীকার করলেও এর অর্থ এই নয় যে অধ্যাস, অমূল প্রত্যক্ষ বলে কিছু নেই বা ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষকে কেন্দ্র করে কোন সমস্যাই নেই।

সংশয় সঠিক হলে তা হয়ে পড়ে অর্থহীন

খ্রীস্টানদের ধর্মগ্রন্থ বাইবেল। বাইবেলে ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণের কোন চেষ্টা হয়নি। বাইবেলে অভিজ্ঞতার উপরে ভিত্তি করে যে সব ধারণাকে স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে অথচ যেগুলিকে সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করা হয়নি সেইগুলির সঙ্গে অভিজ্ঞতাবাদীদের যুক্তির সংগতি রয়েছে। বাইবেলে ঈশ্বরের অস্তিত্ব বিনা প্রমাণে স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে। বাইবেল সমর্থকবৃন্দদের দৃষ্টিতে ঈশ্বরের অস্তিত্বকে যুক্তির সাহায্যে প্রমাণ করা এক অযৌক্তিক বা অসংগতিপূর্ণ ব্যাপার। তাঁদের কাছে ঈশ্বর এক জীবন্ত বাস্তব সত্তা, ঈশ্বর কোন অমূর্ত ধারণা নয় বা কোন বস্তু নয় যাকে ন্যায় অনুমানের সিদ্ধান্ত হিসেবে পাওয়া গেছে। বরং ঈশ্বর এমন এক সত্তা যার উপস্থিতি এক সুনিশ্চিত সত্য। ঈশ্বরই মানুষের জীবনকে অর্থপূর্ণ করে তোলে।

বাইবেলের দৃষ্টিতে ঈশ্বরের অস্তিত্বের পক্ষে যুক্তিগুলি অপ্রাসঙ্গিক। ঈশ্বর মানুষের অভিজ্ঞতার কাছে নিজেকে প্রকাশ করেন। ঈশ্বরের এই আত্মপ্রকাশকে ধর্মের দিক থেকে প্রত্যাদেশ (revelation) বলা হয় এবং এই প্রত্যাদেশ-এর প্রতি মানুষের প্রতিক্রিয়াকে বিশ্বাস বা শ্রদ্ধা (faith) বলে অভিহিত করা হয়। এই সম্পর্কে পরবর্তী অংশে আলোচনা করা হচ্ছে:

৩। প্রত্যাদেশ (Revelati n):

প্রত্যাদেশ বলতে বোঝায় সত্যের উপলব্ধি- যা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ঈশ্বরের ক্রিয়ার উপর নির্ভর (an apprehension of truth which rests, directly or indirectly on the activity of God)। প্রত্যাদেশের মাধ্যমে ঐশ্বরিক সত্তা, তাঁকে উপলব্ধির জন্য মানুষকে আমন্ত্রণ জানান। সকল কিছুর মধ্য দিয়েই ঈশ্বরের প্রকাশ, তবু মানবতাই ঈশ্বরের ক্রিয়াকে সচেতনভাবে উপলব্ধি করতে পারে।

প্রত্যাদেশের স্বরূপ

ঐশ্বরিক প্রত্যাদেশ বলতে অনেকে মনে করেন যে নাটকীয়ভাবে এই প্রত্যাদেশ ঘটে থাকে। কিন্তু এমন কোন কথা নেই যে যখন কোন প্রত্যাদেশ ঘটবে, তখনই অলৌকিকভাবে প্রত্যাদেশের আবির্ভাব ঘটবে। [1]প্রত্যাদিষ্ট হওয়ার অর্থ উদ্ঘাটিত হওয়া, প্রকটিত হওয়া, 'স্পষ্ট হওয়া'। ম্যাকগ্রেগার (*MacGregor*) প্রত্যাদেশের বিষয়টিকে উপমা দিয়ে বোঝাতে গিয়ে বলেন যে, গোলাপের কুঁড়ির পাপড়ি মেলে দেওয়ার, বা পর পর কতকগুলি সূক্ষ্ম আবরণ সরিয়ে দেওয়ার উপমাই প্রত্যাদেশকে বুঝে নেবার পক্ষে যথোপযুক্ত উপমা। তিনি বলেন, 'ঐশ্বরিক প্রত্যাদেশের ধারণা ব্যক্ত করে যেন অপরজন (the other) আমাদের কাছে নিজেকে উদ্ঘাটিত করেছে, অন্যথায় যা আমাদের কাছে গোপন থাকত।'[2] বস্তুতঃ, অনেকে মনে করেন যে মানুষ ও প্রকৃতির অন্তর্বর্তী যে ঈশ্বর তাঁকে ভাবনাত্মক চিন্তনের দ্বারা জানা যায় না। ধর্মীয় অভিজ্ঞতায় যদি ঈশ্বরকে জানা যায় তাহলে সেটা ঈশ্বর নিজেকে প্রকাশ করেন বলেই সম্ভব।

প্রত্যাদেশ অলৌকিকতার সঙ্গে যুক্ত নয়

অনেক মহান ধর্ম—যেমন খ্রীষ্টধর্ম, ইসলাম ধর্ম, ইহুদী ধর্ম মনে করে যে তাঁদের ধর্মের প্রামাণ্য হল ঐশ্বরিক প্রত্যাদেশ। 'প্রত্যাদেশ' শব্দটির একটি ব্যাপকতর এবং ক্ষুদ্রতর অর্থ আছে—সাধারণ প্রত্যাদেশ (general revelation) এবং বিশেষ প্রত্যাদেশ (special revelation)।

এই হিসেবে সব জ্ঞানই প্রত্যাদেশমূলক। সত্যকে তৈরি করা হয় না—আবিষ্কার করা হয়, চিন্তনকে এই সত্য পূর্ব থেকে স্বীকার করে নিতে হয়। ঐতিহাসিক এবং বৈজ্ঞানিককেও ঈশ্বরের উপর না হলেও, ধৈর্যের সঙ্গে ঘটনার উপর নির্ভর করতে হয়। ব্যাপকতর অর্থে বলা যেতে পারে যে, সমগ্র প্রকৃতিই এক হিসেবে ঈশ্বরের প্রত্যাদেশ, কারণ প্রকৃতি এমন এক অর্থ উদ্ঘাটিত করে, যার চরম উৎস ঈশ্বরের মধ্যে নিহিত। মানুষের অভিজ্ঞতায় নৈতিক শৃঙ্খলার যে বিকাশ এবং ইতিহাসে ধর্মীয় চেতনার বিচিত্র বিকাশকে প্রত্যাদেশই বলা যেতে পারে, কারণ মানবমনের সঙ্গে ঈশ্বরের সজীব সম্বন্ধের উপরই তাদের ভিত্তি এবং ঐ সম্বন্ধের বাইরে তাদের কোন অস্তিত্ব নেই। অন্য ভাষায় বলা যেতে পারে, যা কিছু নৈতিক এবং ধর্মীয় তা ঐশ্বরিক উদ্দেশ্যের তাৎপর্যসূচক, যে উদ্দেশ্য মানুষের মধ্য দিয়ে সিদ্ধ হয়। এইসব নৈতিক এবং ধর্মীয় অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে মানুষ তার

ব্যাপকতর অর্থে প্রত্যাদেশ

1. "To reveal is'to unfold', or 'to unveil', or even to 'unwrap'."
—MacGregor : Introduction to Religious Philosophy ; Page 30

2 But the idea of divine revelation does imply that the other is unfolding to that which otherwise would be hidden.—Ibid ; Page 30

ঈশ্বর নিয়োজিত কর্তব্য সম্পাদন করে। যদি 'প্রত্যাদেশকে' এই ব্যাপক অর্থে গ্রহণ করা হয় তাহলে নিম্নতর এবং উচ্চতর সব ধর্মই প্রত্যাদেশের নীতির পরিধির অন্তর্ভুক্ত হবে। কারণ প্রতিটি ধর্মের, তার যাই উপাদান হোক না কেন, ঐশ্বরিক জগৎ পরিকল্পনায় একটি স্থান ও অর্থ থাকবেই।

বিশেষ প্রত্যাদেশকে স্বীকার করা চলে কী?

সংকীর্ণতর অর্থে বিশেষ প্রত্যাদেশ বলতে বোঝায় ঈশ্বর নির্বাচিত ব্যক্তির কাছে ঈশ্বর কর্তৃক প্রত্যক্ষভাবে সত্যের উদ্ঘাটন। প্রশ্ন করা যেতে পারে যে, সাধারণ প্রত্যাদেশের উপরে আবার বিশেষ ধরনের কোন প্রত্যাদেশকে স্বীকার করে নেওয়া যায় কি? সর্বেশ্বরবাদে (Pantheism), যেখানে ঈশ্বরই সব কিছু, সেখানে আর বিশেষ প্রত্যাদেশের কোন স্থান নেই। কিন্তু অন্তর্বর্তী ঈশ্বরবাদে বা সর্বেশ্বরবাদে ঈশ্বর সময় সময় বিশেষ ধরনের ক্রিয়ার মাধ্যমে নিজেকে প্রকাশ করেন, এই বিষয়টিকে স্বীকার করে নেওয়া যেতে পারে। কিন্তু একটা অসুবিধা দেখা দেয়। আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতার বিকাশে যে সাধারণ প্রত্যাদেশ নিহিত তার থেকে ঈশ্বরের এক বিশেষ ধরনের প্রত্যাদেশমূলক ক্রিয়াকে কিভাবে পৃথক করা যাবে? ব্যক্তিবিশেষে দৈব অনুপ্রেরণা লাভ করেছে, ব্যক্তি বিশেষের শুধুমাত্র এই দাবীই বিশেষ ধরনের প্রত্যাদেশের মাপকাঠি হতে পারে না। তাহলে জাদুকরের উন্মাদনার সঙ্গে ধর্ম প্রবর্তকের ঈশ্বর-প্রেরিত বার্তার মধ্যে পার্থক্য করা কঠিন হয়ে পড়ে। এমন কথা বলা যেতে পারে যে, বিশেষ ধরনের প্রত্যাদেশের প্রামাণ্য থাকা প্রয়োজন। কিন্তু প্রশ্ন হল, এই প্রামাণ্যের মানদণ্ড কি? এই নিয়ে অনেক তর্ক-বিতর্ক হয়েছে। সেই কারণে আধুনিক মন, এটি প্রত্যাদেশ—যেহেতু এটি গীর্জার বাণী বা শাস্ত্রের বচন, স্বীকার করে নিতে কুণ্ঠিত হয়।

সাধারণ জ্ঞান ও প্রত্যাদেশের মধ্যে প্রভেদ

সাধারণ জ্ঞানের তুলনায় প্রত্যাদেশের মধ্যে এই ধারণা নিহিত থাকে যে প্রত্যাদেশের মধ্য দিয়ে মানুষ এমন সত্যের অধিকারী হয়, যে সত্য সে তার নিজের ক্ষমতায় কখনও লাভ করতে পারত না। আরও সহজ করে বলতে গেলে প্রত্যাদেশের ক্ষেত্রে ঈশ্বরের দ্বারা মানুষের কাছে কোন জ্ঞানের প্রকাশ ঘটে যা মানুষ নিজের চেষ্টায় কখনও অধিকারী হতে পারত না। প্রাচীন ধর্মতত্ত্ব অনুসারে সব ধর্মীয় তত্ত্ব, এইরূপ অলৌকিক উপায়েই মানুষের কাছে এসেছে। কিন্তু বর্তমান যুগে এই অভিমত কেউ স্বীকার করে না। ধর্মীয় তত্ত্ব বাইরে থেকে মানুষের কাছে আসেনি। ধর্মীয় অভিজ্ঞতা সম্পর্কীয় মানুষের চিন্তন থেকেই তাদের উদ্ভব এবং সামাজিক ও পরিবেশজাত উদ্দেশ্যের দ্বারা প্রভাবিত। ধর্মীয় অভিজ্ঞতা সম্পর্কেই প্রত্যক্ষ প্রত্যাদেশের প্রশ্ন ওঠে।

তত্ত্ব বা মতবাদ তো কোন কিছু থেকে জাত বা উদ্ভূত এবং যুগময় সময় অভিজ্ঞতার ত্রুটি-পূর্ণ বর্ণনা ছাড়া কিছুই নয়।

বিশেষ প্রত্যাদেশকে সর্বপ্রথম হতে হবে ব্যক্তিগত এবং আভ্যন্তরীণ আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা (a personal and inward spiritual experience)। কোন পবিত্র রচনা বা ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান গৌণ অর্থে প্রত্যাদেশ ব্যক্তিবিশেষের অনুপ্রেরণামূলক অভিজ্ঞতা থেকে যার উদ্ভব। অবশ্য যে কোন ব্যক্তিগত অনুভূতিকেই প্রত্যাদেশ আখ্যা দেওয়া যেতে পারে না। আধ্যাত্মিক চেতনার লক্ষ্য হল কোন ঐশ্বরিক কল্যাণ লাভ, যার মধ্য দিয়ে সব জাগতিক কল্যাণ তার পরিপূর্ণতা লাভ করে।

মানুষ যেহেতু স্বাধীন, সেহেতু তার আধ্যাত্মিক চেতনার অগ্রগতি সব সময় উপরি-উক্ত লক্ষ্যের প্রতি ধাবিত হয় না। সেই কারণেই আধ্যাত্মিক জীবনে হতাশার অন্ধকার নেমে আসে। তখনই ঈশ্বরের প্রত্যক্ষ প্রভাবের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। কাজেই সাধারণ প্রত্যাদেশের মধ্যেও বিশেষ প্রত্যাদেশের স্থান রয়েছে, যখন ঈশ্বর বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে বিশেষভাবে ক্রিয়া করে তাঁর প্রত্যক্ষ প্রভাব বিস্তার করেন। এই প্রভাবের উদ্দেশ্য মানুষের আধ্যাত্মিক বিকাশকে তার লক্ষ্যাভিমুখী করা এবং মানবমনে তার আধ্যাত্মিক লক্ষ্যের চেতনার স্ফুরণ করা। সাধারণ প্রত্যাদেশের সঙ্গে এই বিশেষ প্রত্যাদেশের পার্থক্য গুণগত নয়, মাত্রাগত। এই প্রত্যাদেশ মানব আত্মার উপর ঈশ্বরের প্রগাঢ় এবং বিশেষ উদ্দেশ্যমূলক ক্রিয়ার কথা ব্যক্ত করে।

বিশেষ প্রত্যাদেশের প্রকৃতি

বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন ব্যক্তির এই ধরনের প্রত্যাদেশের অভিজ্ঞতা হয়েছে। এই বিশেষ ধরনের প্রত্যাদেশের মাধ্যমে ব্যক্তির নতুন ঐশ্বরিক সত্যের উপলব্ধি ঘটে। এই প্রত্যাদেশের গভীরতর তাৎপর্য রয়েছে, কারণ এই প্রত্যাদেশ ব্যক্তির আধ্যাত্মিক বিকাশের পথ-নির্দেশক আলোর সঙ্কেতের কাজ করে। মানুষ যদি ঈশ্বরকে চায়, ঈশ্বরও মানুষকে তার আধ্যাত্মিক লক্ষ্যের পরিপূর্ণতার পথে চালিত করে। ব্যক্তির প্রত্যাদিষ্ট অভিজ্ঞতার মাধ্যমে ঈশ্বর ভেতর থেকেই তাকে তার আধ্যাত্মিক বিকাশের পথের নির্দেশ দেন—এই হল বিশেষ প্রত্যাদেশের গূঢ় তাৎপর্য।

বিশেষ প্রত্যাদেশের প্রকৃতিই হল এই যে এটি কোন সমষ্টিগত অভিজ্ঞতা নয়। ঐশ্বরিক প্রভাব যাদের মধ্য দিয়ে কার্যকর হবে এমন সীমিত ব্যক্তিদের অভিজ্ঞতাই হল বিশেষ প্রত্যাদেশ। পর্বতের সর্বোচ্চ চূড়া যেমন প্রথম সূর্যালোকের স্পর্শ লাভ করে, তেমনি ধর্মপ্রচারক সর্বপ্রথম দৈববার্তা লাভ করেন, যা তিনি অগণিত জনসাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে

দিব্যপ্রেরণাপ্রাপ্ত ব্যক্তি প্রত্যাদেশ লাভ করে

দেন। দিব্যপ্রেরণাপ্রাপ্ত প্রচারক এবং আধ্যাত্মিক নেতা উচ্চতর প্রত্যাদেশের মাধ্যমে তাঁদের ঐশ্বরিক সত্যের চেতনা তাঁদের চারপাশের ব্যক্তিদের জানিয়ে দেন। যখন মানুষের ধর্মীয় জীবনে নিশ্চলতা দেখা দেয়, পূজা ও উপাসনা হয়ে পড়ে কৃত্রিম, যখন মানুষ জগতের কামনা-বাসনার মধ্যে নিজেকে অবরুদ্ধ করে তার আধ্যাত্মিক লক্ষ্যের কথা বিস্মৃত হয়, তখন ঈশ্বর-নির্বাচিত এই সব মহাপুরুষদের প্রত্যাদেশের মাধ্যমে মানুষ আবার তার আধ্যাত্মিক লক্ষ্যের দিকে চালিত হয়।

এই ভাবে সমাজের ধর্মীয় জীবন বারবার জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে তার আধ্যাত্মিক লক্ষ্যের দিকে ধাবিত হয়েছে। মানুষের আত্মার কাছে উদ্ঘাটিত এই সব দিব্যপ্রেরণামূলক অভিজ্ঞতাকে 'বিশেষ প্রত্যাদেশ' নামে অভিহিত করা যেতে পারে। এই অভিজ্ঞতা নতুন আধ্যাত্মিক আন্দোলনের সৃষ্টি করেছে এবং মানুষকে ধর্মের গভীরতর অর্থ এবং ধর্মের লক্ষ্য কী, সেই সম্পর্কে অবহিত হতে সহায়তা করেছে।

কিন্তু এই সব প্রত্যাদিষ্ট সত্যের যাথার্থ্য বিচারের মাপকাঠি কি? গ্যালোয়ে (*Galloway*) বলেন, "যা যথার্থভাবে ঈশ্বরকে প্রকাশ করে, মানুষের আত্মার কাছে তার একটা প্রকাশমান মূল্য থাকবেই। যদি আলোক হয় ঐশ্বরিক, তাহলে তা হবে জীবনের আলোক[1]।" এই মানদণ্ড প্রয়োগ করে আমরা নিশ্চয়ই বলতে পারব যে হিব্রু ধর্মপ্রচারকদের নৈতিক বাণী এবং যীশুর বাণী হল 'বিশেষ প্রত্যাদেশ'।

প্রত্যাদিষ্ট সত্যের মাপকাঠি

এখন প্রশ্ন হল, প্রত্যাদেশ, সাধারণ বা বিশেষ, যাই হোক না কেন, যদি ধর্মের স্বীকার্য সত্য হয়, তাহলে ধর্মের বিজ্ঞানসম্মত ও দার্শনিক আলোচনা সম্ভব কি? এই সম্পর্কে কেয়ার্ড (*Caird*)-এর অভিমত আমরা ইতিপূর্বে আলোচনা করেছি। পূর্ব আলোচনার পুনরাবৃত্তি করে বলা যেতে পারে যে, কেয়ার্ডের অভিমতানুসারে 'প্রত্যাদেশ' (revelation) এবং বিচারবুদ্ধি (reason) পুরোপুরি পরস্পরের বিরুদ্ধ নয়। এমন সিদ্ধান্ত করা যুক্তিযুক্ত হবে না যে ধর্মসম্বন্ধীয় জ্ঞানের উৎস হিসেবে প্রত্যাদেশ বিচারবুদ্ধির বিরোধী বা বিচারবুদ্ধির ঊর্ধ্বে (contrary to reason or above reason)। যে প্রত্যাদেশ ধর্মের ক্ষেত্রে বিচারবুদ্ধিকে বর্জন করতে চায়, তা গ্রহণীয় নয়। কেননা, জ্ঞান প্রত্যাদিষ্ট হলেও, যার কাছে প্রত্যাদিষ্ট হল তার বোধগম্য হওয়া দরকার। যদি বিচারবুদ্ধি ও বিশ্বাসের

কেয়ার্ডের অভিমত

---

1. What truly reveals God will have a revealing value for souls ; if the light is divine, it will be the light of life."

—G. Galloway : The Philosophy of Religion ; Page 587

মধ্যে বিরোধিতা দেখা দেয়, এই বিরোধিতা দূর করার জন্য কোন নিরপেক্ষ বিচার-কর্তার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়, এবং এই বিচারকর্তা নিঃসন্দেহে বিচারবুদ্ধি।

প্রত্যাদেশ ও বিচারবুদ্ধি পরস্পর বিরোধী নয়

বিচারাবুদ্ধি যদি বিচারকর্তা হয় তার পক্ষে নিজেকে হেয় প্রতিপন্ন করে প্রত্যাদেশের পক্ষে যাওয়া সম্ভব নয়। আবার প্রত্যাদেশ বিচারবুদ্ধির উর্ধ্বে নয়। প্রত্যাদেশ সাধারণ বিচারবুদ্ধির অধিগম্য না হলেও অবশ্যই কোন উন্নত বিচারবুদ্ধির অধিগম্য হবে, এইরূপ সিদ্ধান্ত করলে বিচারবুদ্ধিকে উচ্চতর এবং নিম্নতর দুটি শ্রেণীতে বিভক্ত করতে হয়। কিন্তু এই দুই ধরনের বিচারবুদ্ধির মধ্যে কোন সীমারেখা টানা খুবই কঠিন। আবার যা পুরোপুরি বিচারবুদ্ধির অতিবর্তী; তাকে জানা কোন ব্যক্তির পক্ষেই সম্ভব নয়। প্রত্যাদেশের মাধ্যমে যে সত্য প্রকাশিত হয়, তা বিচারবুদ্ধির বোধগম্য না হলে, তা হবে নিছক অর্থহীন কিছু। বিচারবুদ্ধি দিয়ে যা আমরা জানতে পারি না, তাকে বিশ্বাস করা আমাদের পক্ষে অসম্ভব।

বিচারবুদ্ধি যদি প্রত্যাদেশকে পরীক্ষা করে দেখে, বিচার করে, তাহলে প্রত্যাদেশ বা আধ্যাত্মিক অন্তর্দৃষ্টিও বিচারবুদ্ধিকে পরীক্ষা করে দেখবে।

প্রত্যাদেশ বিচারবুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হবে—এইরূপ সিদ্ধান্ত করার যুক্তিসঙ্গত কারণ আছে। প্রত্যাদেশ ঈশ্বরেরই ক্রিয়া, বিচারবুদ্ধিও ঈশ্বরের দান। ঈশ্বরের

বিচারবুদ্ধি ও প্রত্যাদেশ পরস্পরের পরিপূরক

কোন একটি প্রদত্ত বিষয়ের সঙ্গে অপর প্রদত্ত বিষয়ের বিরোধিতা থাকতে পারে না। কাজেই বিচারবুদ্ধি এবং প্রত্যাদেশ পরস্পরের পরিপূরক, পরস্পরবিরোধী প্রক্রিয়া নয়।

২। অতীন্দ্রিয় অভিজ্ঞতা (Mystical Experience):

ঈশ্বরের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংযোগস্থাপন উপাসক মাত্রেরই কাম্য বস্তু। অতীন্দ্রিয় অভিজ্ঞার ক্ষেত্রে ব্যক্তি মনে করেন যে তিনি ঈশ্বরের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংযোগস্থাপনে সমর্থ হয়েছেন। এই অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে ব্যক্তির মধ্যে ঈশ্বরের উপস্থিতির বোধ জাগ্রত হয়। সমাধিস্থ অবস্থায় ব্যক্তি এই চেতনা লাভ করে।

'অতীন্দ্রিয়বাদ' (mysticism) পদটির সংজ্ঞা নিরূপণ করা খুবই কঠিন। শব্দটির প্রকৃতি প্রত্যয় নিরূপণ করলেই বোঝা যাবে কেন মানুষের ভাষায় এর যথাযথ সংজ্ঞা

mystic শব্দটির প্রকৃতি-প্রত্যয় নির্ণয়

দেওয়া কঠিন ব্যাপার। গ্রীক ভাষায় '*muo*' ক্রিয়া পদটি '*mu*' ধাতু থেকে উদ্ভূত। তার থেকেই ইংরেজী 'mystic' শব্দটির উৎপত্তি, যার অর্থ হল, 'আমি রুদ্ধ করে রাখি' (I close), বা "আমি নীরব থাকি' (I keep silent), অথবা 'আমি আমার বাক্ সংযত করি'

(I hold my tongue)। আধুনিক ইংরেজি 'mum' শব্দটির সঙ্গে এর সাদৃশ্য আছে। 'To keep mum'-এর অর্থ হল 'নীরব থাকা'। অতীন্দ্রিয়বাদী হলেন এমন এক ব্যক্তি যিনি নীরব থাকেন।

অতীন্দ্রিয়বাদীর এই নীরবতার কারণ হল তিনি দাবী করেন যে, তিনি ঈশ্বরের এমন অভিজ্ঞতা লাভ করেছেন, যা অপরের কাছে ব্যক্ত করা যায় না। এই অভিজ্ঞতা অনির্বচনীয় অর্থাৎ এই অভিজ্ঞতার আদান-প্রদান সম্ভব নয়। এর অর্থ এই নয় যে, তিনি এই অভিজ্ঞতাকে অপরের কাছে ব্যক্ত করতে চান না। আসলে এই অভিজ্ঞতা এমন এক অভিনব অভিজ্ঞতা যার জন্য এই অভিজ্ঞতাকে ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না। এই অভিজ্ঞতা অভিনব, কারণ যে সম্বন্ধের মধ্য দিয়ে এই অভিজ্ঞতা হয়, সেই সম্বন্ধই হল এক অভিনব সম্বন্ধ (unique relationship)। অতীন্দ্রিয় অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে, ব্যক্তির সঙ্গে ঈশ্বরের এক বিশেষ ধরনের সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত হয়। ব্যক্তি অপরের কাছে এই অভিজ্ঞতাকে ব্যক্ত করতে পারে না, কারণ কোন অভিজ্ঞতার আদান-প্রদান করতে হলে, আদান-প্রদানের একটা সাধারণ ভিত্তি (common basis) থাকা দরকার। কিন্তু এ ক্ষেত্রে কোন সাধারণ ভিত্তি থাকে না। বাস্তব জীবনেও লক্ষ্য করা যায় যে কোন ব্যক্তি, অপর ব্যক্তির সঙ্গে তার যে ঘনিষ্ঠ আন্তরিক সম্পর্ক, তার স্বরূপটি যথাযথভাবে ব্যক্ত করতে পারে না। অনুরূপভাবে অতীন্দ্রিয়বাদীও ঈশ্বরের সঙ্গে তার প্রত্যক্ষ সম্বন্ধের স্বরূপটিকে ব্যক্ত করতে পারেন না।

অতীন্দ্রিয়বাদী, ঈশ্বরের অনুপম অভিজ্ঞতা লাভ করে

অতীন্দ্রিয়বাদের যেসব সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে তার মধ্যে একটি সংক্ষিপ্ত সংজ্ঞা হল, অতীন্দ্রিয়বাদ এক 'অজানার চেতনা' (the consciousness of a beyond)। জে. বি. প্র্যাট (*J. B. Pratt*)-এর অভিমতানুসারে এই সংজ্ঞাটি সুনির্দিষ্টভাবে কিছু ব্যক্ত করে না। তাই তিনি অতীন্দ্রিয়বাদের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন যে, "অতীন্দ্রিয়বাদ হল সাধারণ প্রত্যক্ষমূলক প্রক্রিয়া বা বিচারবুদ্ধির মাধ্যম ছাড়া অন্য কোন উপায়ে কোন সত্তার উপস্থিতি সম্পর্কে বোধ।"[1] তিনি বলেন, অতীন্দ্রিয় অভিজ্ঞতা হল এই উপস্থিতির অনুভূতি, এই উপস্থিতিতে বিশ্বাস নয়। এটি চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ, শ্রবণ বা স্পর্শের পরিণাম নয়, এটি চিন্তনের সাহায্যে উপনীত কোন সিদ্ধান্ত নয়; এটি হল অপরোক্ষ এবং স্বজ্ঞামূলক অভিজ্ঞতা।

অতীন্দ্রিয়বাদের সংজ্ঞা

---

1. **"Mysticism may** be **defined as the sense of presence of a being or reality through other means than the ordinary perceptive process or the reason.'**

—J. B. Pratt; The Religious Consiousness. Chapter XVI; Page 337

প্র্যাট-এর অভিমতানুসারে অতীন্দ্রিয়বাদ ধর্মনিরপেক্ষ (non-religious) এবং ধর্মীয় (religious) উভয় প্রকার হতে পারে। ধর্মনিরপেক্ষ অতীন্দ্রিয়বাদের ক্ষেত্রে ব্যক্তি কোন অদৃশ্য সত্তার উপস্থিতির চেতনা লাভ করে। সেই অদৃশ্য সত্তা যে ঈশ্বর বা কোন ধর্মীয় বস্তু, তার কোন ইঙ্গিত থাকে না। ধর্মীয় অতীন্দ্রিয়বাদের ক্ষেত্রে যে সত্তার উপস্থিতির চেতনা ব্যক্তি লাভ করে সেই সত্তা হল কোন ধর্মীয় বস্তু। সোজা কথায়, ব্যক্তি ঐশ্বরিক উপস্থিতির চেতনা লাভ করে।

ধর্মীয় অতীন্দ্রিয়বাদের স্বরূপ

রাইট (*Wright*)[1]-ও ধর্মীয় অতীন্দ্রিয়বাদের সংজ্ঞা নিরূপণ করতে গিয়ে তাকে ঈশ্বরের উপস্থিতির চেতনার অনুশীলন (cultivation of the consciousness of the presence of God) বলে বর্ণনা করেছেন।

প্র্যাট ধর্মীয় অতীন্দ্রিয়বাদের দুটি রূপের কথা বলেছেন—অনুগ্র রূপ (mild type) এবং উগ্র রূপ (extreme type)। তাঁর মতে প্রথম ধরনের অভিজ্ঞতা গতানুগতিক ব্যাপার এবং সম্পূর্ণ স্বাভাবিক লোকের মধ্যে দেখা যায়। দ্বিতীয় ধরনের অতীন্দ্রিয় অভিজ্ঞতা তীব্রতা ও ফলাফলের দিক থেকে এতই উল্লেখযোগ্য যে এটি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং এটিকে অলৌকিক দৈবানুগ্রহ বা বিকারগ্রস্ত অবস্থার লক্ষণ বলে গণ্য করা হয়। উগ্র অতীন্দ্রিয়বাদের ক্ষেত্রে অজানার বোধ ভাবাবেশ এবং অলৌকিকের দর্শনে পরিণত হয়। প্র্যাট এই দুই ধরনের অতীন্দ্রিয় অভিজ্ঞতার পার্থক্যের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন এবং উগ্র অতীন্দ্রিয়বাদকে অস্বাভাবিক বলে বর্ণনা করেছেন। তাঁর মতে অনুগ্র অতীন্দ্রিয়বাদ হল 'অজানার বোধ, ঐশ্বরিক উপস্থিতির অনুভূতি' (the sense of a Beyond, the feeling of the presence of the Divine) এবং এই অতীন্দ্রিয়বাদই স্বাভাবিক।

ধর্মীয় অতীন্দ্রিয়বাদের অনুগ্র এবং উগ্ররূপ

ধর্মের ক্ষেত্রে অনুভূতির ক্রিয়া এবং মূল্য খুবই বেশী। অনুভূতি ধর্মীয় অভিজ্ঞতাকে তীব্রতর করে ব্যক্তিকে ধর্মের উপাস্য বস্তুর সঙ্গে গভীর এবং নিবিড় মিলনে সমর্থ করে। মানবাত্মা দেবতার সঙ্গে যে ঘনিষ্ঠ নিবিড় মিলন কামনা করে, চিন্তনের মাধ্যমে তা সম্ভব নয়। যুক্তিতর্কের মাধ্যমে জ্ঞান দেওয়া, সম্বন্ধের ভিত্তিতে জ্ঞান দেওয়া যে চিন্তন ক্রিয়ার ধর্ম, সেই চিন্তন ক্রিয়া এই ঘনিষ্ঠ নিবিড় মিলনের পথে বাধার সঞ্চার করে।

ধর্মের ক্ষেত্রে অনুভূতির মূল্য

1. W. K. Wright: A Student's Philosophy of Religion; Page 287

চিন্তনলব্ধ জ্ঞান সম্পর্ক সাপেক্ষ। চিন্তনের দ্বারা যে জ্ঞান পাওয়া যায় তাহল বিভিন্ন সম্বন্ধের ভিত্তিতে জ্ঞান লাভ করা। একটি বস্তুর সঙ্গে আর একটি বস্তুর সাদৃশ্য এবং বৈসাদৃশ্য নিরূপণ করে, পারস্পরিক তুলনা করে চিন্তন অগ্রসর হয় কিন্তু অন্তর কামনা করে অভিজ্ঞতার অপরোক্ষতার (immediacy of experience)। এই লক্ষ্যে উপনীত হবার জন্য সাধারণ চেতনাকে অতিক্রম করে যাওয়ার প্রচেষ্টাটি বিভিন্ন ধরনের অতীন্দ্রিয়বাদের সাধারণ বৈশিষ্ট্য। অতীন্দ্রিয়বাদী সাধারণ চেতনা-জগতের নিয়ন্ত্রণ এবং তার সীমারেখার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে চায় এবং এক বৃহত্তর সত্তার মধ্যে নিজেকে হারিয়ে ফেলতে চায়।

চিন্তনের বৈশিষ্ট্য ও অতীন্দ্রিয় অভিজ্ঞতার সঙ্গে তার পার্থক্য

গ্রেনজার (*Granger*) '*The Soul of a Christian*' গ্রন্থে অতীন্দ্রিয়বাদের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেন, "জীবনের সাধারণ বস্তুর মধ্যে থেকে আধ্যাত্মিকতা সম্পর্কে ধারণা করা এবং তার দিকে অগ্রসর হবার যে মানসিক প্রবণতা তাই হল অতীন্দ্রিয়বাদ।[1] গ্যালোয়ে (*Galloway*) উপরিউক্ত সংজ্ঞার সমালোচনায় বলেন যে, অতীন্দ্রিয়বাদের এই বর্ণনা সত্য হলেও, এটি এত ব্যাপক যে, এই বর্ণনা অতীন্দ্রিয় অভিজ্ঞতাকে উন্নত ধর্মীয় চেতনা থেকে পৃথক করে না। তিনি বলেন যে, তিনি ডক্টর ইন্‌জ (*Dr. Inge*)-এর সঙ্গে একমত যে, সব ধর্মের যেটা আসল উপাদান, অজানা সম্পর্কে অস্পষ্ট চেতনা (dim consciousness of the beyond), তার মধ্যেই অতীন্দ্রিয়বাদের মূল নিহিত। কিন্তু এই চেতনাকে বিকশিত করার ব্যাপারেই অতীন্দ্রিয়বাদের বিশেষ প্রকৃতি নিরূপিত হয় এবং ধর্মের ক্ষেত্রে এর অবদানের মূল্যায়ন করা হয়।

অতীন্দ্রিয়বাদের সংজ্ঞা

উইলিয়ম জেম্‌স (*William James*) অতীন্দ্রিয় অভিজ্ঞতার চারটি বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করেছেন:

(১) অনির্বচনীয়তা (Ineffability)। মনের যে অবস্থাকে অতীন্দ্রিয় রূপে আখ্যাত করা চলে, তাহল নঞর্থক। অতীন্দ্রিয়বাদী মনে করেন যে এই অভিজ্ঞতা অনির্বচনীয়। ভাষায় এই অভিজ্ঞতার উপাদানকে ব্যক্ত করা যায় না। কাজেই এই অভিজ্ঞতা হল অপরোক্ষ অভিজ্ঞতা। এই অভিজ্ঞতা অপরকে প্রদান করা চলে না অর্থাৎ এই অভিজ্ঞতাকে স্থানান্তরিত বা পাত্রান্তরিত করা চলে না। ট্যলার (*Tauler*) অতীন্দ্রিয় অভিজ্ঞতা

জেম্‌স-এর মতে অতীন্দ্রিয়বাদের চারটি বৈশিষ্ট্য

1. "That attitude of mind which divines and moves towards the spiritual in the common things of life."

সম্পর্কে বলেন, "এটা কি এবং কিভাবে আসে, বর্ণনার তুলনায় তা সহজে অনুভব করা যায়।" এই বৈশিষ্ট্য থাকার জন্য অতীন্দ্রিয় অবস্থা অনুভূতির অবস্থা, বিচারবুদ্ধির অবস্থা নয়।

তবে অনির্বচনীয় হলেও অতীন্দ্রিয়বাদী সুনিশ্চিত যে এই অভিজ্ঞতায় তিনি কোন-না-কোন ভাবে ঈশ্বরের সংস্পর্শ লাভ করেন। 'আমি যেমন বাস্তব, ঈশ্বরও আমার কাছে সেরকম বাস্তব', 'অনির্দিষ্ট হলেও আমি তার বাস্তব উপস্থিতি সম্পর্কে অবহিত হই', এইভাবে অতীন্দ্রিয়বাদী নিজের অভিজ্ঞতার স্বরূপকে বর্ণনা করেছেন।

(২) **বৌদ্ধিক গুণ (Noetic quality) :** অনুভূতির অবস্থার সঙ্গে সাদৃশ্য থাকলেও, অতীন্দ্রিয় অভিজ্ঞতালাভে সমর্থ ব্যক্তিরা মনে করেন যে এই অভিজ্ঞতা জ্ঞানেরও অবস্থা। অতীন্দ্রিয় অবস্থা হল যুক্তিতর্কের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয় যে বিচারবুদ্ধি, সেই বিচারবুদ্ধি যেখানে উপনীত হতে পারে না, সেই সত্যের গভীরে অন্তর্দৃষ্টি। অতীন্দ্রিয় অভিজ্ঞতা হল খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং তাৎপর্যপূর্ণ, যদিও অনির্বচনীয় এবং এই অভিজ্ঞতা-লাভে সমর্থ ব্যক্তি মনে করেন যে এই অভিজ্ঞতার প্রামাণ্য আছে।

(৩) **স্বল্পকালীন স্থায়িত্ব (Transiency) :** অতীন্দ্রিয় অভিজ্ঞতার অবস্থাকে অধিক সময় পর্যন্ত ধরে রাখা যায় না। খুব অল্প সময় ধরে এই অভিজ্ঞতা স্থায়ী হয়।

(৪) **নিষ্ক্রিয়তা (Passivity) :** অতীন্দ্রিয় অভিজ্ঞতার শুরুতে, ব্যক্তির ঐচ্ছিক ক্রিয়া যেমন মনঃসংযোগ করা, দেহকে বিশেষ অবস্থায় রাখা প্রভৃতি বিষয় এই অভিজ্ঞতার আবির্ভাবকে সহজতর করে তুলতে পারে। কিন্তু অতীন্দ্রিয় অভিজ্ঞতা যখন শুরু হয়ে যায় তখন অতীন্দ্রিয়বাদী অনুভব করেন যে তাঁর নিজের ইচ্ছা যেন নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়েছে এবং কোন বৃহত্তর শক্তি যেন তার উপর ভর করেছে।

ইভলিন আণ্ডারহিল (*Evelyn Underhill*) তাঁর '*Mysticism*' গ্রন্থে উইলিয়ম জেমস্ উল্লিখিত অতীন্দ্রিয় অবস্থার চারটি মাত্র লক্ষণে খুশী হতে পারেননি। তিনি আরও কয়েকটি বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করেছেন। প্রথমতঃ, যথার্থ অতীন্দ্রিয়বাদ সক্রিয় এবং ব্যবহারিক, নিষ্ক্রিয় এবং তাত্ত্বিক নয় (active and practical not passive and theoretical)। অতীন্দ্রিয়বাদ কোন কিছুতে নিছক বিশ্বাস নয়। অতীন্দ্রিয়বাদে ক্রিয়ার দিকও আছে। ইন্দ্রিয়ের জীবন থেকে আত্মার জীবনে উত্তরণ একটা কঠিন কর্মভার, যার জন্য প্রচেষ্টার ও দৃঢ়তার প্রয়োজন। দ্বিতীয়তঃ, অতীন্দ্রিয়বাদ পরিপূর্ণভাবে একটা আধ্যাত্মিক ক্রিয়া (spiritual activity)। জাদু বা জাদুসংক্রান্ত

আণ্ডারহিল উল্লিখিত অতীন্দ্রিয়বাদের বৈশিষ্ট্য

ধর্মের সঙ্গে অতীন্দ্রিয়বাদের এইখানেই পার্থক্য। তৃতীয়তঃ, অতীন্দ্রিয়বাদের পদ্ধতি হল ভালবাসা (method of mysticism is love), নতুন জ্ঞানের জন্য দুর্বার আকুলতা নয়। ঈশ্বরকে ভালবাসার বস্তু মনে করা অতীন্দ্রিয়বাদের বৈশিষ্ট্য। অতীন্দ্রিয়বাদীদের ভালবাসা বাহ্য আবেগ নয়, এ হল ইচ্ছার পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণ। অতীন্দ্রিয়বাদীদের কাছে ভালবাসা হল পরমতত্ত্বের জন্য ইচ্ছার সক্রিয় প্রকাশ এবং আকাঙ্ক্ষা। কারণ 'বিচারবুদ্ধি নয়, অন্তরই আমাদের পরমতত্ত্বের দিকে চালিত করে।' চতুর্থতঃ, অতীন্দ্রিয়বাদ হল এক সুনির্দিষ্ট মনস্তাত্ত্বিক অভিজ্ঞতা (a definite psychological experience)। অতীন্দ্রিয়বাদ কোন মনোভাব নয়, এটি কোন মতবাদ নয়। ঈশ্বরের সঙ্গে প্রাণবন্ত মিলন অতীন্দ্রিয়বাদীদের কাছে এক অনুপম বা অভিনব অভিজ্ঞতা।

উপরিউক্ত চারটি বৈশিষ্ট্যের অনুসিদ্ধান্ত হিসেবে আণ্ডারহিল (*Underhill*) আর একটি বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করেছেন সেটি হল প্রকৃত অতীন্দ্রিয়বাদ কখনও নিজের স্বার্থসাধনে অভিলাষী নয় (True mysticism is never self-seeking)। অতীন্দ্রিয়বাদ অতিপ্রাকৃত আনন্দলাভের আকাঙ্ক্ষা নয়, কোন উচ্চ আকাঙ্ক্ষাকে পরিতৃপ্ত করার কামনা নয়। অতীন্দ্রিয়বাদীর লক্ষ্য পরমতত্ত্বের সঙ্গে মিলনের ভাবাবেশ। অতীন্দ্রিয়বাদী পরমতৃপ্তি লাভ করে যদিও সেটাই তার প্রত্যক্ষ কাম্যবস্তু নয়। আণ্ডারহিলের মতে অতীন্দ্রিয়বাদ কোন অভিমত নয়, কোন দর্শন নয়। গূঢ় বা রহস্যময় জ্ঞান অন্বেষণের সঙ্গে এর কোন মিল নেই। অতীন্দ্রিয়বাদ শুধু শাশ্বতের ধারণা নয়, এটা হল পরমতত্ত্বের সঙ্গে ব্যক্তির চেতন সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার একটা প্রক্রিয়া। তত্ত্ববিদের পরমতত্ত্ব হল নৈর্ব্যক্তিক এবং অপ্রাপ্য। অতীন্দ্রিয়বাদীদের পরমতত্ত্ব হল ভালবাসার বস্তু, প্রাপ্য এবং সজীব।

গ্যালোয়ে (*Galloway*) অতীন্দ্রিয়বাদের দুটি প্রবণতার মধ্যে পার্থক্য করেছেন—একটি নঞর্থক, অপরটি সদর্থক। নঞর্থক প্রবণতা হল ইন্দ্রিয়, দেশ ও কালের সীমারেখার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ এবং সদর্থক প্রবণতা হল ঐশ্বরিক অভিজ্ঞতার পরিপূর্ণতার এবং অপরোক্ষতা (fullness and immediacy)-র জন্য গভীর বাসনা। ধর্মের বিকাশের এক উন্নত স্তরে অতীন্দ্রিয়বাদের আবির্ভাব, কেননা এই জগতের অপর্যাপ্ততার একটা বোধ অতীন্দ্রিয়বাদে রয়েছে, যে বোধের সঙ্গে আদিম ব্যক্তি মোটেও পরিচিত নয়। যদি আদিম ধর্মে এর অনুরূপ অভিজ্ঞতার সন্ধান করতে হয় তাহলে ভাবাবেশের ঘটনা (phenomenon of ecstasy)-র উল্লেখ করা যেতে পারে। কিন্তু

গ্যালোয়ের মতে অতীন্দ্রিয়বাদের দুটি প্রবণতা—সদর্থক ও নঞর্থক

অতীন্দ্রিয় অভিজ্ঞতা ভাবাবেশের তুলনায় ব্যাপকতর এবং গভীরতর আধ্যাত্মিক বাসনাকে পরিতৃপ্ত করে। অতীন্দ্রিয় অভিজ্ঞতা যে ধর্মীয় চেতনার আকস্মিক অবস্থা মাত্র নয়, বিভিন্ন ধর্মের ক্ষেত্রে অতীন্দ্রিয়বাদের উপস্থিতিই তার প্রমাণ বহন করে। ভারতে যোগদর্শনে এই অভিজ্ঞতার পরিচয় পাওয়া যায়। পারস্য দেশের সুফী যারা অতীন্দ্রিয় সর্বেশ্বরবাদের (mystical pantheism) উপাসক, ঈশ্বরের সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধকে ভালবাসার সম্বন্ধ বলে গণ্য করে এবং ঈশ্বরের মধ্যে মানব আত্মার অতীন্দ্রিয় সমাধি কামনা করে। গ্রীক দার্শনিক প্লোটাইনাস (*Plotinus*) এবং নব্য প্লেটোনিকদের মধ্যে অতীন্দ্রিয়বাদের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যগুলি লক্ষ্য করা যায়। এদের মধ্যেও লক্ষ্য করা যায় জ্ঞানের সাধারণ পদ্ধতি সম্পর্কে অসন্তোষ এবং অতিবর্তী ঈশ্বরের সঙ্গে পরিপূর্ণ এবং পরমানন্দময় মিলনের আকাঙ্ক্ষা।

অতীন্দ্রিয় অভিজ্ঞতা ও ভাবাবেশের মধ্যে পার্থক্য

মধ্যযুগের অতীন্দ্রিয়বাদ যথার্থই একটি আধ্যাত্মিক আন্দোলন ছিল এবং এই আন্দোলনের মাধ্যমে মানুষের আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতার পরিপূর্ণতার ধারণার প্রকাশ ঘটত। মধ্যযুগের অতীন্দ্রিয়বাদীদের মধ্যে অতীন্দ্রিয়বাদের সদর্থক এবং নঞর্থক উভয় দিকই পরিস্ফুট। যেমন, এলবার্টাস মেগনাস (*Albertus Magnus*) বলেন, "দেহকে পরিত্যাগ কর এবং অস্পষ্ট আলোকের উপর মনকে নিবিষ্ট কর।" অতীন্দ্রিয়বাদীর মন যে ঈশ্বরের সঙ্গে অভিন্ন সেটি ব্যক্ত করেছেন মাইসট্যার একহার্ট (*Meister Eckart*) এইভাবে, "আমি যখন ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ করি তখন সেই প্রত্যক্ষ ক্রিয়ায় আমি এবং ঈশ্বর এক হয়ে যাই।" রুসব্রোয়েক (*Ruysbroek*) বলেন, "এই সরল এবং গভীর চিন্তনের মধ্যে আমরা ঈশ্বরের সঙ্গে এক প্রাণ, এক আত্মা।"

মধ্যযুগের অতীন্দ্রিয়বাদ

অতীন্দ্রিয়বাদী ঈশ্বরতত্ত্ববিদদের কাছে দৃশ্যমান বস্তু হল কতকগুলি প্রতিরূপ যেগুলি আত্মাকে এক মহান অনুভূতিতে উন্নীত করে, যে অবস্থায় ধারণামূলক চিন্তনকে অতিক্রম করে যাওয়া হয়। কাজেই অতীন্দ্রিয়বাদ যে কোনরকম মধ্যস্থতাকে বাতিল করতে চায় এবং ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যকে বিলীয়মান পরিমাণ (vanishing quantity) হিসেবে গণ্য করে।

অতীন্দ্রিয়বাদে মধ্যস্থতার অস্বীকৃতি

সাধারণ ধর্মবিশ্বাসীর বিশ্বাসের সঙ্গে অতীন্দ্রিয় অভিজ্ঞতার পার্থক্য করা হয়। ম্যাকগ্রেগর (*MacGregor*) বলেন, "এটা বলা খুবই কঠিন যে, বাস্তবে কোথায় ধর্মবিশ্বাসের শেষ এবং অতীন্দ্রিয় অভিজ্ঞতার শুরু। যারা বলেন, সব ধর্মই মূলতঃ অতীন্দ্রিয় অভিজ্ঞতা, তাদের সেই বক্তব্য বিতর্কমূলক সমস্যার সৃষ্টি করে। যেটা অনস্বীকার্য সেটা হল এই যে, অতীন্দ্রিয়

বিশ্বাস এবং অতীন্দ্রিয় অভিজ্ঞতা

অভিজ্ঞতা একটা বিশেষ ধরনের জ্ঞান, এবং আমরা সাধারণতঃ কোন বস্তুর জ্ঞান বলতে যা বুঝি তার থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। অতীন্দ্রিয় অভিজ্ঞতা যে জ্ঞানের কথা বলে সেই জ্ঞানের প্রকৃতিই এমন যে সেই জ্ঞান কোন একজন মাত্র ব্যক্তির জ্ঞান নয়। এ যেন একটা দান-প্রতিদানের বা বিনিময়ের ব্যাপার, অংশীদার হওয়ার ব্যাপার যার দ্বারা দুটি সত্তা দেওয়া-নেওয়ার মধ্য দিয়ে কিছু মাত্রায় পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়ে"।[1] প্রকৃত ঈশ্বরের জ্ঞান বলতে সব সময়ই বোঝায় ঈশ্বর এবং মানুষের মধ্যে এই ধরনের এক সংযোগ।

যদিও অতীন্দ্রিয়বাদী দাবী করেন যে তাঁর অভিজ্ঞতা এক অভিনব অভিজ্ঞতা, তবু মানবীয় ভালবাসা ও বন্ধুত্বের সম্পর্কের উপমা দিয়ে এই অভিজ্ঞতার প্রকৃতিকে কিছুটা বোঝান যেতে পারে। যে ব্যক্তি কাউকে ভালবেসেছে এবং প্রতিদানে ভালবাসা লাভ করেছে তার পক্ষে যেমন সেই ভালবাসার স্বরূপকে ব্যক্ত করা কঠিন তেমনি অতীন্দ্রিয় অভিজ্ঞতায় ব্যক্তির সঙ্গে ঈশ্বরের যে প্রত্যক্ষ সংযোগ প্রতিষ্ঠিত হয়, সেখানেও ভালবাসার এই আদান-প্রদান ঘটে বলে, সেই অভিজ্ঞতা হয়ে পড়ে অনির্বচনীয়। ঈশ্বরের সঙ্গে অতীন্দ্রিয় সংযোগের যে অভিজ্ঞতা হয়, ভালবাসা হল সেই ধারণা যার দ্বারাই সেই অভিজ্ঞতাকে বর্ণনা করা যেতে পারে (love is the notion that comes closest to what is experienced in the mystical encounter with God)। এই ভালবাসা হল ব্যক্তির সমগ্র সত্তা দিয়ে ঈশ্বরকে ভালবাসা। অনেক সময় অতিন্দ্রীয়বাদীরা ঈশ্বরের সঙ্গে ব্যক্তির এই সাক্ষাৎকারকে যৌনমূলক উপমার সাহায্যে ব্যক্ত করেন। যেমন অতীন্দ্রিয় অভিজ্ঞতার বর্ণনায় বলা হয় যে অতীন্দ্রিয়বাদী ঈশ্বরের বাহুর মধ্যে গভীর নিদ্রায় মগ্ন হন এবং ঈশ্বর সেই ব্যক্তিকে আলিঙ্গন করেন। সেইণ্ট টেরেসা (*Saint Teresa*) অতীন্দ্রিয় অভিজ্ঞতাতে ব্যক্তির ঈশ্বর-সাক্ষাৎকারকে আধ্যাত্মিক বিবাহ বলে বর্ণনা করেছেন এবং জীবাত্মাকে পাত্র ও ঈশ্বরকে পাত্রীরূপে কল্পনা করেছেন।

মানবীয় ভালবাসার উপমা

যৌনমূলক উপমার সাহায্যে অতীন্দ্রিয়-বাদের প্রকৃতির ব্যাখ্যা

1. "This is knowledge which by its very nature cannot belong to a single knower, it is an exchange, a sharing by which two human lives are in some measure joined together, giving and receiving".

—MacGregor : Introduction to Religious Philosophy ; page 178

ম্যাকগ্রেগরের অভিমতানুসারে সব অতীন্দ্রিয়বাদের প্রকৃতিই হল সর্বেশ্বরবাদী ধারণার মাধ্যমে নিজেকে প্রকাশ করা। তাঁর মতে হিন্দু এবং বৌদ্ধ অতীন্দ্রিয়বাদ স্বাভাবিক ভাবেই সর্বেশ্বরবাদী (pantheistic)। কিন্তু খ্রীষ্টান অতীন্দ্রিয়বাদীরা এমন ভাষা ব্যবহার করেন যা সর্বেশ্বরবাদী চিন্তাধারার প্রকাশক।

অতীন্দ্রিয়বাদে সর্বেশ্বরবাদী ধারণার প্রকাশ

নিঃসন্দেহে ধর্মের ক্ষেত্রে অতীন্দ্রিয়বাদের এক বিশেষ মূল্য আছে। কিন্তু অতীন্দ্রিয়বাদীদের অনেকেই সংশয়ের দৃষ্টিতে দেখেন। কিন্তু এই প্রসঙ্গে মনে রাখা দরকার যে প্রকৃত অতীন্দ্রিয়বাদী অতীন্দ্রিয় অভিজ্ঞতার জন্য লালায়িত হন না এবং এই অভিজ্ঞতা তাঁর অজানিতে অপ্রত্যাশিত-ভাবেই তাঁর কাছে আসে। তখন অতীন্দ্রিয়বাদী উপলব্ধি করেন যে, ঈশ্বর সম্পর্কে তিনি বিশেষ ধরনের জ্ঞান লাভ করেছেন। অতীন্দ্রিয়বাদ অংশতঃ আবেগমূলক, অংশতঃ জ্ঞানমূলক। কেবলমাত্র উগ্র অতীন্দ্রিয়বাদই এক উপাদানহীন অনুভূতির অবস্থা। অতীন্দ্রিয়বাদের জ্ঞানমূলক এবং আবেগমূলক উপাদান পরস্পরকে প্রভাবিত করে। তীব্র আবেগ বিশ্বাসকে তীব্র করে তোলে। তীব্র ভালবাসার আবেগ অতীন্দ্রিয়বাদীর ঈশ্বরকে আরও ব্যক্তিগত (personal) করে তোলে। অনুগ্র অতীন্দ্রিয় অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে সব সময়ই এক অজানার উপস্থিতির স্বজ্ঞামূলক সুনিশ্চয়তা বর্তমান থাকে ও সাধারণ প্রত্যক্ষের ক্ষেত্রে যেমন একটা বস্তুর উপস্থিতির চেতনা থাকে তেমনি অতীন্দ্রিয় অভিজ্ঞতায় যে সত্তার উপস্থিতির চেতনা সে লাভ করছে, সেটি অভিজ্ঞতার অতিরিক্ত কিছু।

অতীন্দ্রিয় অভিজ্ঞতার স্বতঃস্ফূর্ততা

অতীন্দ্রিয় অভিজ্ঞতা অংশতঃ জ্ঞানমূলক, অংশত আবেগমূলক,

এই অভিজ্ঞতায় বিশ্বাসী অধিকাংশ ব্যক্তিই এই অভিজ্ঞতাকে আনন্দের অভিজ্ঞতা-রূপে বর্ণনা করেছেন। তবে সব অতীন্দ্রিয় অভিজ্ঞতাই আনন্দের অভিজ্ঞতা নয়। আনন্দ এবং বেদনা—এই অভিজ্ঞতায় উভয় ধরনের অনুভূতিই বর্তমান। এই বেদনার অনুভূতির দুটি দিক আছে—সদর্থক এবং নঞর্থক। সদর্থক বেদনার ক্ষেত্রে ব্যক্তি তার আকাঙ্ক্ষিত প্রতিদান লাভে বঞ্চিত হন বলে বেদনা অনুভব করেন এবং নঞর্থক বেদনার ক্ষেত্রে ব্যক্তির মধ্যে এই তীব্র বোধ জাগ্রত হয় যে তিনি ঈশ্বর কর্তৃক পরিত্যক্ত এবং তাঁর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছেন। ব্যক্তি ঈশ্বরের উপস্থিতির চেতনা অনুভব করে কিন্তু উভয়ের মধ্যে কোন ব্যবধানের সৃষ্টি হয়েছে এই বোধ তার মধ্যে জাগ্রত হয়। এ যেন শিশুর মাকে দেখার পরও মার কাছে যাবার অসামর্থ্য। তবে অতীন্দ্রিয়বাদীরা মনে করেন যে অতীন্দ্রিয় অভিজ্ঞতায় বেদনার অনুভূতির তুলনায় আনন্দের বোধেরই প্রাধান্য।

অতীন্দ্রিয় অভিজ্ঞতায় আনন্দ ও বেদনা

উইলিয়ম জেম্‌স তাঁর '*The Varieties of Religious Experience*' গ্রন্থে অতীন্দ্রিয়বাদের বিশদ আলোচনার শেষে তিনটি সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন। প্রথমতঃ, মনস্তাত্ত্বিক দিক থেকে বলতে গেলে, অতীন্দ্রিয় অভিজ্ঞতা তার কাছেই প্রামাণ্য যিনি এই অভিজ্ঞতালাভে সমর্থ হয়েছেন। দ্বিতীয়তঃ, অতীন্দ্রিয়বাদীরা দাবী করতে পারেন না যে তাঁদের বক্তব্য, যাঁরা অতীন্দ্রিয়বাদী নন, তাদের স্বীকার করে নিতেই হবে। তৃতীয়তঃ, অ-অতীন্দ্রিয়বাদী অভিজ্ঞতাই (non mystical) একমাত্র প্রামাণ্য—এই দাবীকে অতীন্দ্রিয়বাদ বাতিল করে দেয়।

জেম্‌স-এর সিদ্ধান্ত

একটা প্রশ্ন করা যেতে পারে যে, নৈতিক এবং ধর্মের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে কোন্ অবস্থায় অতীন্দ্রিয় অভিজ্ঞতাকে স্বাভাবিক বলা যেতে পারে?

রাইট[1] এই প্রশ্নের উত্তর দেবার চেষ্টা করেছেন। তাঁর মতে যে অতীন্দ্রিয় অভিজ্ঞতা ব্যক্তির চরিত্রকে সুদৃঢ় করে এবং সে যুগের শ্রেষ্ঠ চিন্তা তার জন্য এবং অপরের জন্য যে জীবনের লক্ষ্যকে স্বীকৃতি দান করেছে, সেই লক্ষ্যকে উপলব্ধি করার জন্য তাকে অধিকতর সফলতা দান করে, সেই অতীন্দ্রিয় অভিজ্ঞতাই স্বাভাবিক। যে অতীন্দ্রিয় অভিজ্ঞতার গতি বিপরীত দিকে তাহল অস্বভাবী। আবার তিনি ধর্মের যে সংজ্ঞা দিয়েছেন সেই দৃষ্টিভঙ্গি থেকেও এই প্রশ্নের আলোচনা করেছেন। তিনি ধর্মের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন, ধর্ম হল সমাজস্বীকৃত মূল্যের সংরক্ষণকে লাভ করার প্রচেষ্টা (endeavour to secure the conservation of socially recognised values)। ধর্মীয় অতীন্দ্রিয়বাদের সংজ্ঞা নিরূপণ করতে গিয়ে তিনি বলেন, অতীন্দ্রিয়বাদ হল যার মাধ্যমে সমাজস্বীকৃত মূল্যের সংরক্ষণকে চাওয়া হয়, তার উপস্থিতির চেতনাকে লাভ করার প্রচেষ্টা। সেই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে তিনি বলেন, যে অতীন্দ্রিয় অভিজ্ঞতা সমাজস্বীকৃত মূল্যের সংরক্ষণে বাধার সৃষ্টি করে তা অস্বভাবী (abnormal)। এই মানদণ্ড প্রয়োগ করলে দেখা যাবে যে অতীন্দ্রিয় অভিজ্ঞতার অনুগ্র রূপটিই (mild type) হল স্বাভাবিক। সেই অতীন্দ্রিয় অভিজ্ঞতাই কাম্য যে অভিজ্ঞতায় ঈশ্বরের উপস্থিতি কোন ব্যক্তিকে ধর্মনিষ্ঠ ও সৎ করে তোলে।

রাইটের অভিমত

অতীন্দ্রিয় অভিজ্ঞতার সত্যতা বিচারের মানদণ্ড কি? অতীন্দ্রিয়বাদীদের বিবৃতি কি এমনিতেই যৌক্তিক বা সামঞ্জস্যপূর্ণ? মানুষের সুনিশ্চিত জ্ঞানের সঙ্গে এই অভিজ্ঞতা কি সঙ্গতিপূর্ণ? রাইটের মতে সাধারণ জ্ঞান, বিজ্ঞান এবং তর্কবিদ্যার সাধারণ নিয়ম অনুসরণ করেই এর সত্যতা বিচার করতে হবে। কিন্তু অনেকে রাইটের এই অভিমতকে সমর্থন

অতীন্দ্রিয় অভিজ্ঞতার সত্যতা বিচার

1. A Student's Philosophy of Religion; Page 301

করেন না। তাঁরা মনে করেন যে যেহেতু এই অভিজ্ঞতা এক অভিনব অভিজ্ঞতা, সেহেতু এর সত্যতা বিচারের কোন মানদণ্ড নেই।

অতীন্দ্রিয় অভিজ্ঞতার মূল্য কি? অনেকে মনে করেন ধর্মের ক্ষেত্রে অতীন্দ্রিয় অভিজ্ঞতার গভীর মূল্য আছে। মুরিসিয়ার (*Murisier*) বলেন, অতীন্দ্রিয়বাদ হল ধর্মের প্রাণ। রাইটের মতে অন্যান্য ধর্মীয় অভিজ্ঞতার মতন শুধুমাত্র নতুন সত্য আবিষ্কারের ক্ষেত্রেই যে অতীন্দ্রিয় অভিজ্ঞতার মূল্য আছে তা নয়, যেসব মূল্য স্বীকৃত তার প্রতি আন্তরিক অনুরাগ ও উৎসর্গের মনোভাব জাগ্রত করার ব্যাপারেও তার মূল্য আছে। যেখানে অতীন্দ্রিয়বাদ নেই সেখানে ধর্ম ধ্বংস হয়ে যায় এবং ধর্ম অচল নিয়মানুগত্য, গতানুগতিকা ও বিচারবিযুক্তবাদে পরিণত হয়। তবে অনুগ্র ধর্মীয় অতীন্দ্রিয় অভিজ্ঞতাই শ্রেষ্ঠ অতীন্দ্রিয় অভিজ্ঞতা এবং অনুশীলনযোগ্য।

অতীন্দ্রিয়বাদের মূল্য

জেম্‌স (*James*) বলেন, অতীন্দ্রিয় অভিজ্ঞতা আমাদের কতকগুলি প্রকল্প দেয়। এই প্রকল্পগুলিকে আমরা স্বেচ্ছায় অস্বীকার করতে পারি, কিন্তু এইগুলিকে চিন্তাবিদ হিসেবে আমরা উলটিয়ে দিতে পারি না। অলৌকিকতা এবং আশাবাদ যাতে এই অতীন্দ্রিয় অভিজ্ঞতা আমাদের প্রণোদিত করে, কোন-না-কোন ভাবে ব্যাখ্যা করলে, এই অভিজ্ঞতা জীবনের অর্থের প্রতি সত্যিকারের অন্তঃদৃষ্টিরূপে গণ্য হতে পারে।

অতীন্দ্রিয়বাদের ত্রুটির কথা উল্লেখ করতে গিয়ে গ্যালোয়ে (*Galloway*) বলেন, "এটি ধর্মের বৌদ্ধিক এবং ব্যবহারিক দিককে দুর্বল করে দেয় এবং আধ্যাত্মিক মিলনের নাম করে সর্বেশ্বরবাদে অভিনিবিষ্ট করে। এর শক্তির দিক হল অতীন্দ্রিয়বাদ নির্দেশ করে যে কেবলমাত্র আধ্যাত্মিক আবেগের মধ্যে দিয়েই ধর্মের গভীরতা এবং তাৎপর্যকে উপলব্ধি করা যায়।" এই অর্থে, গ্যালোয়ে বলেন যে, আমরা স্বীকার করে নিতে পারি যে উন্নত ধর্মীয় জীবনে সব সময়ই একটা অতীন্দ্রিয় উপাদান থাকবে।

অতীন্দ্রিয়বাদের ত্রুটি

৩। বিশ্বাস (Faith):

সাধারণতঃ একটি প্রশ্ন উত্থাপিত হয় এই যে, ধর্মের সত্যগুলিকে কিভাবে জানা যায়? জ্ঞানের অন্যান্য ক্ষেত্রে সত্যগুলিকে জানার জন্য আমাদের যে শর্তগুলি পূরণ করতে হয়, ধর্মের ক্ষেত্রেও কি তাই? বৈজ্ঞানিক এবং দার্শনিক জ্ঞান যে উপায়ে আমরা লাভ করি, সেই একই উপায় অনুসরণ করে কি আমরা ধর্মসম্বন্ধীয় জ্ঞান লাভ করি? কিংবা এই জগতের ঘটনা ও বিষয়গুলিকে আমরা যেভাবে জানি, ঈশ্বরকেও সেইভাবে না জেনে

ধর্মের সত্যকে জানার পদ্ধতি কি?

ভিন্ন কোন উপায়ে জানি? বিজ্ঞান, দর্শন, ধর্ম সকল ক্ষেত্রেই কি জ্ঞানলাভের মাধ্যম একই ধরনের?

এই প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে অনেকে মনে করেন যে, যে উপায়ে দর্শন বা বিজ্ঞানের জ্ঞান লাভ করা যায় সেই উপায়ে ঈশ্বরের জ্ঞান লাভ করা যায় না; অর্থাৎ কিনা, বিচারবুদ্ধির দ্বারা ঈশ্বরের জ্ঞান লাভ করা যায় না যদিও বৈজ্ঞানিক বা দার্শনিক জ্ঞান লাভের মাধ্যম হল বিচারবুদ্ধি। তাঁদের মতে, 'বিশ্বাসে মিলায় কৃষ্ণ তর্কে বহুদূর।' বিশ্বাসের মাধ্যমেই ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্পর্কে অবহিত হওয়া যায়, ঈশ্বরের জ্ঞান লাভ করা যায়; বিচারবুদ্ধি বা যুক্তি-তর্কের মাধ্যমে নয়।

কেউ কেউ মনে করেন বিশ্বাসের মাধ্যমেই ঈশ্বরের জ্ঞান লাভ করা যায়

বুদ্ধিবাদীরা স্বাভাবিক ভাবেই মনে করেন যে, ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ করা না গেলেও যুক্তিতর্ক, বিচার বিশ্লেষণের মাধ্যমে ঈশ্বরকে জানা যায়, ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্পর্কে অবহিত হওয়া যায়। কিন্তু যাঁরা বুদ্ধিবাদীদের বুদ্ধি, যুক্তি-তর্ক প্রভৃতির উপরে আস্থা স্থাপন করতে পারেন না, তাঁরা মনে করেন যে বিচারবুদ্ধি নয়, বিশ্বাসই ঈশ্বরের জ্ঞান লাভের প্রশস্ত পথ। ঈশ্বরের প্রত্যাদেশে বিশ্বাস, ধর্মশাস্ত্রে প্রদত্ত ধর্ম-সম্বন্ধীয় সত্যতাব ব্যাখ্যা ও বর্ণনায় বিশ্বাসের মধ্য দিয়েই ধর্ম সম্বন্ধীয় জ্ঞান লাভ করা যায়।

বুদ্ধিবাদীদের অভিমত

ধর্ম-সম্বন্ধীয় জ্ঞান লাভের মাধ্যম হিসাবে বিশ্বাসের উপর যাঁরা নির্ভর করতে চান তাঁরা মনে করেন অনুমান, যুক্তি তর্ক, বিচার-বিশ্লেষণ ঈশ্বরের জ্ঞান দিতে পারে না। কারণ, মানুষের বুদ্ধি বা চিন্তাশক্তি সীমিত ও সান্ত, তার পক্ষে অসীম অনন্ত ঈশ্বরের জ্ঞান লাভ করা কি সম্ভব? চিন্তা করা মানেই হল কোন বিষয়কে সীমার মধ্যে, শর্তের মধ্যে টেনে নিয়ে আসা, কোন সম্বন্ধের মাধ্যমে তাকে জানা। ঈশ্বর সীমাহীন, শর্তহীন এবং সব সম্বন্ধ নিরপেক্ষ। কাজেই ঈশ্বরকে জানা মানুষের বুদ্ধি বা চিন্তাশক্তির পক্ষে সম্ভব নয়। তাছাড়া কোন বিষয়কে জানা মানেই সেই বিষয়কে সেই বিষয় বহির্ভূত অন্য বিষয় থেকে পৃথক করা। কিন্তু ঈশ্বর স্বয়ংসম্পূর্ণ। ঈশ্বর-বহির্ভূত অন্য কোন কিছুর সঙ্গে ঈশ্বরের তুলনা সম্ভব নয়। কাজেই বিচারবুদ্ধির মাধ্যমে ঈশ্বরের জ্ঞান লাভ করা যায় না। বিশ্বাসই ঈশ্বরকে জানার একমাত্র পথ।

বিশ্বাসের সমর্থকবৃন্দের যুক্তি

প্রশ্ন হল এই বিশ্বাসের স্বরূপ কি? বিশ্বাসের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলা হয় যে বিশ্বাস হল, ব্যক্তি যাকে সত্য বলে জানে না তাতে স্থির ভাবে আস্থা স্থাপন

করা।[1] কিন্তু বিশ্বাসের এই সংজ্ঞার মাধ্যমে বিশ্বাসের স্বরূপকে সুনির্দিষ্টভাবে বোঝা যায় না। কেননা, যখন কোন শিক্ষক বলেন যে কোন ছাত্রের উপর তার বিশ্বাস আছে বা যখন কোন নাগরিক বলে যে কোন বিশেষ রাজনৈতিক দলের আদর্শে তার বিশ্বাস আছে তখন কিন্তু উপরিউক্ত সংজ্ঞা এই সব বক্তব্যের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হচ্ছে না। কাজেই যখন কোন ব্যক্তি বলে 'আমি ঈশ্বরে বিশ্বাস করি না', তখন প্রকৃত পক্ষে সে স্পষ্ট করে কিছুই বলছে না। কেননা, 'বিশ্বাস' বলতে কি বোঝায় আগে তাই স্পষ্ট হওয়া প্রয়োজন।

বিশ্বাসের প্রকৃতি

বিশ্বাস (faith) পদটির সংজ্ঞা দেওয়া খুবই কঠিন এবং এই পদটির নানা ধরনের ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে। অনেক সময় বিশ্বাসের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলা হয়েছে, ঈশ্বরের দ্বারা অলৌকিকভাবে প্রত্যাদিষ্ট সত্যে আস্থা স্থাপন হল বিশ্বাস (belief in truths supernaturally revealed by God)। কিন্তু এই সংজ্ঞাটি অব্যাপক, কেননা, বিশ্বাস পদটি শুধুমাত্র ধর্মের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য নয়, অন্যান্য ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। আবার অভিজ্ঞতার বিশেষ প্রকৃতি অনুযায়ীও বিশ্বাসের রকমভেদ আছে; দার্শনিকের, শিল্পীর, নৈতিক কর্মকর্তার বা ধর্মপরায়ণ ব্যক্তির বিশ্বাসও বিষয়বস্তু অনুসারে অর্থাৎ যথাক্রমে বিশ্ব জগতের বোধগম্যতা, সৌন্দর্যের আদর্শ মানদণ্ড, বন্ধুর চরিত্র বা ঈশ্বর হিসেবে ভিন্ন ভিন্ন হয়। নীতিগতভাবে বিশ্বাস হল আনুমানিক প্রমাণনিরপেক্ষ সত্যতার নিশ্চয়তা। যা প্রমাণিত হয়নি, যা সংশয়মূলক, বিশ্বাসের তাই হল যথাযোগ্য বস্তু। এর অর্থ এই নয় যে, নিশ্চয়তার সঙ্গে সংশয় উপস্থিত থাকে। কারণ বিশ্বাসের স্বীকৃতি সংশয়কে বর্জন করে (the assent of faith excludes doubt)। আবার বিশ্বাসের পূর্বে সংশয় মনে জাগবেই এমন কোন কথা নেই। তবে জাগতে পারে, অনেক ক্ষেত্রে জেগে থাকে। ম্যাকগ্রেগর বলেন, 'সব যথার্থ বিশ্বাস সংশয় প্রকাশ করে। বিশ্বাসের মূলে সংশয় থাকে, একটা আশঙ্কা থাকে যে আমাদের খেয়ালখুশী থেকেই ঈশ্বর উদ্ভূত হয়েছে।[2] বিশ্বাস যতই সুদৃঢ় হোক না কেন প্রমাণ করতে ব্যর্থ হয়। বিশ্বাস হল সংশয়ের সম্ভাবনার মুখে সন্দেহাতীত ঘোষণা (faith implies unquestioning assertion in face of the possibility of doubt)।

বিশ্বাস পদটির নানা ধরনের সংজ্ঞা

---

1. "According to the famous schoolboy definition, 'faith is believing steadfastly what you know ain't true."

Quoted in MacGregor's Introduction to Religious Philosophy, Page 15

2. MacGregor : Introduction to Religious Philosophy, Page 132

[1]প্র্যাট চার ধরনের ধর্মবিশ্বাসের কথা বলেছেন।

(১) প্রামাণ্য বা **অভ্যাসগত** (authoritative or habitual): কেউ কেউ ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন কারণ, 'শৈশব অবস্থায় তাদের ঈশ্বরে বিশ্বাস করতে বলা হয়েছিল এবং সেই থেকে অনেকটা অভ্যাসবশতঃ তারা ঈশ্বরে বিশ্বাস করে আসছে। অর্থাৎ এ ক্ষেত্রে বিশ্বাস হল নিছক একটা অভ্যাসের পরিণাম। আবার অনেকের বিশ্বাসের মূলে রয়েছে কোন ধর্মগ্রন্থ বা ধর্ম প্রচারকের বাণী। 'আমাদের বিশ্বাস হল অপরের বিশ্বাসে বিশ্বাস' (our faith is faith in some one else's faith)—অধ্যাপক জেম্‌স-এর এই উক্তির মধ্যে যথেষ্ট সত্যতা আছে।

ধর্ম-বিশ্বাসের শ্রেণীবিভাগ

(২) যুক্তিভিত্তিক (reasoned): অনেকেই মনে করে যে তাদের বিশ্বাসের ভিত্তি হল কোন যুক্তি (argument), যেমন—ঈশ্বরের অস্তিত্বের পক্ষে প্রদত্ত বিভিন্ন যুক্তি।

(৩) আবেগমূলক (emotional): এই ধরনের বিশ্বাসের মূলে থাকে কোন অনুভূতি বা আন্তর অভিজ্ঞতা (inner experience)। অতীন্দ্রিয়বাদীদের ধর্ম বিশ্বাসের উল্লেখ এই প্রসঙ্গে করা যেতে পারে। আবেগমূলক বলা হলেও এই ধরনের বিশ্বাসের ধারণাগত উপাদান থাকে। এ শুধু অনুভূতির বিষয় নয়, এই ধরনের বিশ্বাসের বুদ্ধিময় উপাদানও থাকে।

(৪) ইচ্ছামূলক (volitional): এই ধরনের বিশ্বাসের মূলে রয়েছে বিশ্বাসের ইচ্ছা বা সঙ্কল্প। মানুষ যুক্তির দ্বারা বা আপ্তবাক্যের সাহায্যে অপরের মনে বিশ্বাস উৎপন্ন করতে পারে কিন্তু নিজের মনে বিশ্বাস জাগ্রত করার সব প্রচেষ্টাই নির্ভর করে বিশ্বাস করার ইচ্ছার উপর। প্র্যাটের মতে 'বিশ্বাস করার ইচ্ছা হল স্বাভাবিক সুস্থ বিশ্বাসের প্রয়োজনীয় অংশ'।

আধ্যাত্মিক জগতে যে বিশ্বাস উন্নত ও সুস্থ, প্র্যাটের মতে উপরিউক্ত চার ধরনের উৎস থেকে অবশ্যই সেই বিশ্বাস তার শক্তি সংগ্রহ করবে।

ধর্মীয় অভিজ্ঞতা যে এক বিশেষ ধরনের অভিজ্ঞতা, কেউ অস্বীকার করে না। ধর্ম-বিশ্বাসের বিশেষ প্রকৃতি বিশ্বাসের বিষয়বস্তুর দ্বারাই নির্ধারিত হয়। ধর্ম-বিশ্বাস হল ঈশ্বরে বিশ্বাস, যিনি ভক্তের পূজা ও উপাসনায় তার কাছে প্রত্যক্ষভাবে প্রকাশিত হন। ধর্ম-বিশ্বাস কোন বচনে বিশ্বাস (belief in a proposition) নয়, ব্যক্তিতে বিশ্বাস (belief in a person)। ধর্ম-বিশ্বাসকে সমর্থন করা যেতে পারে, স্বীকার করা যেতে পারে, কিন্তু

ধর্ম বিশ্বাসের বৈশিষ্ট্য

1. J. B. Pratt: The Religious Consciousness (Chapter—The Belief in a God; Pages 2?0-228.

যৌক্তিক বিচারবুদ্ধির দ্বারা তাকে উৎপন্ন করা যায় না। বিচারবুদ্ধির সাহায্যে কোন কিছুকে স্বীকার করে নেওয়া আর ধর্ম-বিশ্বাস অভিন্ন বিষয় নয়।

ঈশ্বরের অস্তিত্বের পক্ষে কোন প্রমাণই ঈশ্বরবিশ্বাসীকে পরিতৃপ্ত করতে পারে না। সে ভগবানকে জানে অনুমানের মাধ্যমে নয়, পরিচয়ের মাধ্যমে ; যেমন কোন ব্যক্তি তার ঘনিষ্ঠ বন্ধুকে জানে। সেই কারণে ধর্ম-বিশ্বাসী ব্যক্তি তার বিশ্বাসের কঠিন সমালোচনাতেও নীরব থাকে, উদাসীন মনোভাব দেখায়। কারণ সে জানে সে অন্যভাবে এই বিশ্বাসে উপনীত হয়েছে। মানুষ ধর্মীয় অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে পূর্ব থেকে প্রস্তুত ঈশ্বরের ধারণা নিয়ে আসে না। ধর্মীয় অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে ব্যক্তি নিজেকে এক মহান সত্তার সান্নিধ্যে উপস্থিত দেখতে পায়, যে সত্তা হল ঈশ্বর। তার ঈশ্বরের ধারণাকে সে ধারণার মাধ্যমে ব্যক্ত করে, যে ধারণা তার চিন্তার পরিণাম। ঈশ্বর যখন ভক্তের কাছে প্রত্যক্ষভাবে প্রকাশিত হন তখন এই প্রকাশকে ধারণামূলক চিন্তনের মাধ্যমে প্রকাশ করা যায় না। তবে সেইহেতু এটা বুদ্ধি-বর্জিত নিছক অনুভূতির ব্যাপার এটা মনে করলেও ভুল করা হবে। এটাও জ্ঞান, বৌদ্ধিক জ্ঞান : যদিও এই বৌদ্ধিকতা যুক্তিতর্কের মাধ্যমে আসেনি। বার্গ (*Burgh*) বলেন, "ধর্ম-বিশ্বাসের আবেদন আবেগের মনোভাবের কাছে নয়, যৌক্তিক বোধের কাছে নয়, বরং বৌদ্ধিক প্রজ্ঞার কাছে।"[1]

বার্গের মন্তব্য

অভিজ্ঞতার সত্যতায় স্বীকৃতি দেবার বাধ্যতা হল মনস্তাত্ত্বিক ব্যাপার, যৌক্তিক নয়। এই কারণে অনেকে, বিশ্বাসের মধ্যে যে বিচারবুদ্ধির উপাদান রয়েছে তাকে অস্বীকার করেন, তাকে ইচ্ছার ক্রিয়া বলে মনে করেন। তাঁরা অন্ধ স্বীকৃতি বা প্রামাণ্যের ভিত্তিতে বিচারবিহীন স্বীকৃতির কথা বলেন, কিন্তু এই অভিমত যথার্থ নয়। বিশ্বাস বুদ্ধিবিযুক্ত হতে পারে না, বিশ্বাস শুধুমাত্র আবেগ বা ইচ্ছার প্রতিক্রিয়া নয়, বিচারবুদ্ধিরও প্রতিক্রিয়া।

বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন জীবের পক্ষেই ধর্মপ্রবণ হওয়া সম্ভব, তবে ধর্মবিশ্বাসের ক্ষেত্রে বিচারবুদ্ধির উপাদানের অস্তিত্বের বিষয়টিকে অতিরঞ্জিত করাও সঙ্গত নয়। সেইন্ট টমাস (*St. Thomas*)-এর মতে বিশ্বাসের মধ্যে বিচারবুদ্ধি ও ইচ্ছা উভয়েরই সহযোগিতা রয়েছে। ধর্ম-বিশ্বাসের মধ্যে যে অনুভূতির উপাদান আছে তাকেও অগ্রাহ্য করা চলে না। প্র্যাট (*Pratt*) বলেন, "ধর্ম-বিশ্বাসের জন্য অনুভূতি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এর উপাদান যুগিয়ে দেবার জন্য নয় বা এর উপাদানের স্থান দখল করার জন্য নয়,

1. "The appeal of religious faith is neither to an emotional attitude, nor to the logical understanding, but to an intellectual intuition."

—W. G. De Burgh : Towards a Religious Philosophy ; Page 17

একে শক্তি যোগানোর জন্য।[1] সেইণ্ট টমাসের বক্তব্যের মধ্যে যথেষ্ট সত্যতা আছে। তিনি এক হিসেবে ঠিক কথাই বলেছেন কেননা একজন ব্যক্তির সমগ্র ব্যক্তিত্বই বিশ্বাসের অন্তর্ভুক্ত।

প্রশ্ন হল, বিশ্বাসের মাধ্যমে জানা, আর বিচারবুদ্ধির মাধ্যমে জানা— এই দুটি কি জ্ঞান লাভের ভিন্ন পদ্ধতি? পদ্ধতি হিসেবে কি দুটি পদ্ধতিই সমান যথার্থ? বিশ্বাসকে কি প্রকৃতই জ্ঞান লাভের একটি পদ্ধতিরূপে গণ্য করা চলে বা বিশ্বাস মোটেও জ্ঞান লাভের পদ্ধতিরূপে নির্ভরযোগ্য নয়?

বিশ্বাস কি জ্ঞানের পদ্ধতি?

জ্ঞান দু'ধরনের হতে পারে—প্রথমতঃ, আমাদের চারপাশে যে জগতকে দেখতে পাচ্ছি তার জ্ঞান, যে জ্ঞানের সুবিন্যস্ত রূপ আমরা দেখতে পাই প্রাকৃতিক বিজ্ঞানে। দ্বিতীয় এক ধরনের জ্ঞান যা লাভ করা যায় ব্যবহারিক পরিচয়ের মধ্য দিয়ে, যা আমরা দেখতে পাই দুটি বন্ধুর পারস্পরিক সম্পর্কের মধ্যে। বৈজ্ঞানিক জ্ঞান বৌদ্ধিক, নৈর্ব্যক্তিক এবং আবেগমুক্ত। কিন্তু যখন দুটি বন্ধু পরস্পরের সম্পর্কে ঘনিষ্ঠ জ্ঞান লাভ করে তখন সেই জ্ঞান বিচারবুদ্ধির প্রক্রিয়ার পরিণাম নয়, সেই জ্ঞান হল ব্যবহারিক অভিজ্ঞতা এবং অন্তর্দৃষ্টির মাধ্যমে লব্ধ পারস্পরিক বিশ্বাস এবং অনুরাগের উপরে প্রতিষ্ঠিত। এ হল কোন বিষয় সম্পর্কে জ্ঞান এবং কোন বিষয়ের সঙ্গে পরিচিতি, এই উভয়ের মধ্যে পার্থক্য। ধর্মসম্বন্ধীয় জ্ঞান হল শেষোক্ত ধরনের জ্ঞান। এই জ্ঞান অবরোহ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে অর্জিত ঈশ্বর সম্পর্কে তথ্য নয়। এ হল ঈশ্বরের সঙ্গে পরিচয়। একেও জ্ঞান বলে গণ্য করা চলে।

ধর্ম-সম্বন্ধীয় জ্ঞানের প্রকৃতি

এই দুই ধরনের জ্ঞানকে স্বতন্ত্র করে রাখা যুক্তিযুক্ত নয়। এই উভয় জ্ঞানের মধ্যে যে পার্থক্য, সেই পার্থক্য হল আপেক্ষিক, নিরপেক্ষ নয়। বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের মধ্যেও বিশ্বাস রয়েছে এবং বিশ্বাসের মধ্যেও যুক্তিতর্কের বা বিচারবুদ্ধির ব্যাপার আছে।

প্রকৃতির একরূপতার সত্যতা সম্পর্কে আমাদের সুদৃঢ় প্রত্যয় ধর্মীয় বিশ্বাসেরই অনুরূপ। বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার সম্পর্কে বলা যেতে পারে যে, সত্যগুলি প্রথমে বৈজ্ঞানিকের অন্তঃদৃষ্টির কাছে ধরা পড়েছিল অর্থাৎ বৈজ্ঞানিক সত্যগুলিতে বিশ্বাস স্থাপন করেছিলেন তারপর সেইগুলি প্রমাণিত হয়েছিল। কাজেই বিশ্বাসের মধ্যেই অনেক সত্য আবিষ্কৃত হয়। বার্গ বলেন, "কেবলমাত্র সত্যের অনুসন্ধানে সহায়তা করার জন্যই

বৈজ্ঞানিক সত্য আবিষ্কারে বিশ্বাসের ভূমিকা আছে

1 "Feeling is important for religious belief not in supplying its content or supplanting its content but in lending its strength."
—J. B. Pratt: The Religious Consciousness; Page 215.

নয়, সত্য আবিষ্কারের শুরুকে সম্ভব করে তোলার জন্যও বিশ্বাসের প্রয়োজন আছে।"[1] বিচারবুদ্ধিও তো বিশ্বাসের ব্যাপার। লোটজা (*Lotze*) বিচারবুদ্ধির নিজের উপর আস্থাকে বিশ্বাস বলে অভিহিত করেছেন, যা সব জ্ঞানের মূলে নিহিত। আবার ধর্ম-সম্পর্কীয় প্রকল্প, যদি যথার্থ হয়, তাহলে তার মধ্যে বিচারবুদ্ধি প্রচ্ছন্ন রয়েছে মনে করতে হবে। ধর্মীয় বিশ্বাস বিচারবর্জিত অন্ধ বিশ্বাস প্রবণতা নয়। ধর্মীয় বিশ্বাস সোজাসুজিভাবে বিচারবুদ্ধিকে অগ্রাহ্য করে না। যারা বিচারবুদ্ধি ও বিচারমূলক অনুসন্ধানকে এড়াতে চান এমন ভীরু ব্যক্তিরাই ধর্মীয় বিশ্বাসের আশ্রয় গ্রহণ করতে চান—এই অভিমত যাঁরা প্রকাশ করেন তাঁদের অভিমত যথার্থ নয়। যে অভিজ্ঞতা সুসংগত ও সুবিন্যস্ত, সেখানে বিশ্বাসের ও বিচারবুদ্ধির মধ্যে এই বিরুদ্ধতার ভাব বর্তমান থাকতে পারে না। বৈদ্ধিক অনুসন্ধান তার ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হতে পারে না, এই মনে করে ধর্মীয় বিশ্বাস বিশেষ সুবিধার দাবী করতে পারে না। ধর্মীয় বিশ্বাসের প্রকল্পগুলিকেও সকলের সামনে উপস্থিত হয়ে বিচারের সম্মুখীন হতে হবে, এটা মনে রাখতে হবে।

ধর্মীয় বিশ্বাস ও বিচারবুদ্ধির পারস্পরিক নির্ভরতা

ধর্মীয় বিশ্বাসের কেন্দ্রীয় বস্তু হল ঈশ্বর। ঈশ্বরের জ্ঞানের জন্য বিশ্বাস ও বিচারবুদ্ধি উভয়েরই প্রয়োজন আছে। কোনটিকেই উপেক্ষা করা চলে না। বিচারবুদ্ধির মাধ্যমে ঈশ্বরের প্রকৃতি বিচার বিশ্লেষণ করার বহু পূর্বেই আমাদের ব্যক্তিগত বিশ্বাসের বিষয় হয়ে ঈশ্বর আমাদের সামনে উপস্থিত হন। কাজেই বিশ্বাসকে কোন মতেই তুচ্ছ করা চলে না এবং ঈশ্বর সম্পর্কে আলোচনা করতে হলে, নিজের বিশ্বাস অপরের মধ্যে প্রবিষ্ট করতে হলে, বিচারবুদ্ধি ছাড়া কি ভাবে সম্ভব?

ঈশ্বর-জ্ঞানের জন্য বিশ্বাস ও বিচারবুদ্ধি উভয়েরই প্রয়োজন

বস্তুতঃ, বিচারবুদ্ধি ও বিশ্বাসের মধ্যে পারস্পরিক বিরোধিতার কল্পনাই নানারকম ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি করে। বিশ্বাস বলতে যদি নিছক অনুভূতি মনে করা হয় তাহলে বিশ্বাস কথাটি অত্যন্ত তুচ্ছার্থকভাবে ব্যবহার করা হবে। আসলে ধর্মীয় বিশ্বাস, নিছক অনুভূতি নয়, তাহল বুদ্ধিসঞ্জাত বিশ্বাস (rational faith)।

বিচারবুদ্ধি ও বিশ্বাসের মধ্যে বিরোধিতা নেই

1. "Faith is requisite, not only to assist the search for truth, but to "render possible its imitiation."

—W. G. De Burgh: Towards a Religious Philosophy; Page 41

প্রকৃত বিশ্বাসের সঙ্গে বিচারবুদ্ধির কোনরকম বিরোধিতা নেই। এই বিশ্বাস বিচারবুদ্ধির বিরোধী বা অ-বিচারবুদ্ধি জাতীয় কিছু নয়। এ হল বিচারবুদ্ধির উর্ধ্বে এক ভিন্ন স্তর, যা বিচারবুদ্ধির সঙ্গে বিরোধিতা করে না, তাকে অতিক্রম করে যায়। এই অবস্থায় জ্ঞাতা ঈশ্বরের সঙ্গে একাত্মতা লাভ করে এবং ঈশ্বরের জ্ঞান লব্ধ হলে বিচারবুদ্ধির মাধ্যমে তাকে উপলব্ধি করার জন্য আবার বিচারবুদ্ধির স্তরে নেমে আসে।

বিশ্বাসের যে নিশ্চয়তা তাকে অনেকেই মনোগত বা বস্তুনিরপেক্ষ (subjective) বলে অভিহিত করেন এবং বিজ্ঞানের নিশ্চয়তাকে বস্তুগত (objective) অভিহিত করে, তার থেকে একে পৃথক করতে চান। কিন্তু বিশ্বাসের নিশ্চয়তাকে মনোগত গণ্য করা যুক্তিযুক্ত নয়, কেননা তার দ্বারা মনে হতে পারে যে বিজ্ঞানের যে নিশ্চয়তা তা বিশ্বাসের নিশ্চয়তা থেকে অনেক বেশী বাস্তব।

বিশ্বাসের নিশ্চয়তা মনোগত নয়

এমন হতে পারে যে বিশ্বাসের নিশ্চয়তার একটা মনস্তাত্ত্বিক নিশ্চয়তা রয়েছে, যেটি বিশ্বাসী ব্যক্তির মানসিক গঠনের উপর নির্ভর। কিন্তু ম্যাকগ্রেগর (*MacGregor*) সমালোচনায় বলেন, ব্যাপারটা কিন্তু অন্যরূপ। যে বস্তু সম্পর্কে নিশ্চয়তা চাওয়া হয়, তার থেকে বিযুক্ত করেই বৈজ্ঞানিক নিশ্চয়তাকে লাভ করা হয়। বস্তুর সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করেই ধর্মীয় নিশ্চয়তা লাভ করা যায়। এই উভয় প্রকার নিশ্চয়তা স্বতন্ত্র, তবে স্বতন্ত্র হলেও একটি অপরটির পরিপূরক। কোন ব্যক্তি ধর্মীয় নিশ্চয়তার অধিকারী হলে বৈজ্ঞানিক নিশ্চয়তা তার হ্রাস পায় না, আবার সুনিশ্চিত বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ধর্মীয় নিশ্চয়তার ক্ষেত্রে কোন বাধার সঞ্চার করে না।

ম্যাকগ্রেগরের অভিমত

৪। স্বজ্ঞা এবং বিচারবুদ্ধি (Intuition and Reason) :

অনেকের মতে স্বজ্ঞা বা অপরোক্ষ অনুভূতির মাধ্যমেই সত্তাকে জানা যায়, বিচারবুদ্ধির মাধ্যমে নয়। এই অভিমতের যাঁরা সমর্থক সোপেনহাওয়ার (*Schopenhaur*) তাঁদের পথিকৃৎ। পরবর্তী সময়ে ফরাসী দার্শনিক বার্গসোঁ এই সজ্ঞাবাদকে আরও বিশদভাবে প্রকাশ করেন, সম্পূর্ণ মৌলিক চিন্তাধারার মাধ্যমে। প্রশ্ন হল, এই স্বজ্ঞার প্রকৃতি কি? স্বজ্ঞা কাকে বলে? ফরাসী দার্শনিক বার্গসোঁর (*Bergson*) বক্তব্য অনুসরণ করে আমরা এই স্বজ্ঞার প্রকৃতিকে জানবার চেষ্টা করতে পারি। যদিও বার্গসোঁ ধর্মের সমস্যা নিয়ে আলোচনা করেননি, তবু যুক্তিতর্কমূলক চিন্তনের সহায়তা ছাড়া প্রত্যক্ষ অবগতির মাধ্যমে কিভাবে সত্তাকে জানা যায় বার্গসোঁ তা আলোচনা করেছেন এবং এর সঙ্গে ধর্মীয় অতীন্দ্রিয়বাদের পদ্ধতির মিল লক্ষ্য করা

যায়। বস্তুতঃ অনেকে অতীন্দ্রিয়বাদের দার্শনিক সমর্থন সন্ধান করতে গিয়ে বার্গসোঁর স্বজ্ঞাবাদের উল্লেখ করেন। যাঁরা ধর্মের ক্ষেত্রে অপরোক্ষ অনুভূতির কথা বলেন, বার্গসোঁর স্বজ্ঞার আলোচনায় সেই অপরোক্ষ অনুভূতির কিছুটা পরিচয় লাভ করা যেতে পারে। কাজেই আমরা বার্গসোঁকে অনুসরণ করে সংক্ষেপে সজ্ঞার স্বরূপ এবং বিচার বুদ্ধির সঙ্গে তার পার্থক্য বুঝে নেবার চেষ্টা করব।

স্বজ্ঞার মাধ্যমে সত্তা জ্ঞেয়

স্বজ্ঞা কাকে বলে? 'স্বজ্ঞা' হল কোনরকম বিচারবুদ্ধির সহায়তা না নিয়ে একটি বস্তুকে সোজাসুজি মন দ্বারা প্রত্যক্ষ করা। স্বজ্ঞা হল কোন বিষয়ের সাক্ষাৎ প্রতীতি (direct experience)। প্রত্যক্ষ, অনুমান, যুক্তিতর্ক ও বিচার বুদ্ধির সাহায্যে লব্ধজ্ঞান বস্তুর সাক্ষাৎ প্রতীতি নয়। কারণ এইগুলি ইন্দ্রিয় ও বুদ্ধির মাধ্যমে লব্ধজ্ঞান, এ জ্ঞান প্রত্যক্ষ নয়, পরোক্ষ। সাক্ষাৎ প্রতীতি বলতে বোঝায় ইন্দ্রিয় ও বুদ্ধির সাহায্য ছাড়াই বস্তুর যথার্থ স্বরূপের উপলব্ধি। ফরাসী দার্শনিক হেনরী বার্গসোঁ এই স্বজ্ঞাবাদের একজন প্রধান সমর্থক।

স্বজ্ঞা বস্তুর সম্যক প্রতীতি

বার্গসোঁর মতে বুদ্ধি যথার্থ জ্ঞানলাভের উপায় হতে পারে না। সত্তার জ্ঞান দিতে গিয়ে বুদ্ধি সত্তার স্বরূপকে বিকৃত করে তার একটি অযথার্থ রূপ আমাদের কাছে উপস্থাপিত করে। বার্গসোঁর মতে কোন বস্তুকে দুটি উপায়ে জানার চেষ্টা হতে পারে—স্বজ্ঞার মাধ্যমে অথবা বুদ্ধির মাধ্যমে। বুদ্ধির মাধ্যমে বস্তুকে জানতে গেলে বস্তুটির প্রকাশ্য রূপটিকেই অবলোকন করা যায়, তার স্বরূপকে জানতে পারা যায় না। বুদ্ধি বস্তুটির চারপাশে কেবল ঘুরে ঘুরে বেড়ায়, তার অন্তরে প্রবেশ করতে পারে না। বুদ্ধিলব্ধ জ্ঞান যেহেতু সামান্য ধারণা বা প্রত্যয়ের সাহায্যে জ্ঞান (conceptional knowledge) সেইহেতু বস্তুর স্বরূপকে প্রকাশ করে না, বস্তুর অবভাসের জ্ঞান দেয়। কিন্তু স্বজ্ঞার মাধ্যমেই সত্তার সঙ্গে একাত্মতা লাভ করে তার স্বরূপকে জানতে পারা যায়। তত্ত্বের সাক্ষাৎ প্রতীতি বা অপরোক্ষানুভূতিই (direct experience or intuition) তত্ত্বজ্ঞান লাভে সহায়ক। বুদ্ধি নয়, স্বজ্ঞার সাহায্যেই জ্ঞাতা এবং জ্ঞেয়, বিষয় ও বিষয়ীর ব্যবধান অতিক্রম করা যায়। স্বজ্ঞার ক্ষেত্রে জ্ঞাতাই জ্ঞেয়তে রূপান্তরিত হয়। চিন্তার ক্ষেত্রে এ ব্যবধান থেকে যায়।

বুদ্ধি বস্তুর যথার্থ স্বরূপের জ্ঞান দিতে পারে না

স্বজ্ঞার স্বরূপ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বার্গসোঁ তাকে বুদ্ধিসঞ্জাত সহানুভূতি (intellectual sympathy) রূপে আখ্যা দিয়েছেন। বার্গসোঁ স্বজ্ঞার সংজ্ঞা দিতে গিয়ে

বলেছেন—'স্বজ্ঞা হল সেই বুদ্ধিসঞ্জাত সহানুভূতি যার সাহায্যে কেউ কোন বস্তুর অন্তরে প্রবেশ করে, এই উদ্দেশ্যে যে বস্তুর মধ্যে যা কিছু অসাধারণ ও অনির্বচনীয় তার সঙ্গে একাত্মতা লাভ করবে।' বার্গসোঁ স্বজ্ঞাকে অনেকটা অনুভূতির পর্যায়েই নিয়ে গেছেন। একমাত্র অনুভূতির সাহায্যেই আমরা অপরের অন্তরে প্রবেশ করতে পারি। কারও সুখে বা দুঃখে পূর্ণ সহানুভূতি থাকলেই তবে তার সুখ-দুঃখ অনুভব করা যায়। অনুরূপভাবে বুদ্ধিসঞ্জাত সহানুভূতির দ্বারা যদি কোন বস্তুর অন্তরে প্রবেশ করা যায় তবে তার স্বরূপের যথার্থ জ্ঞান লাভ করা যায়। বার্গসোঁ বলেন যে স্বজ্ঞা হল এক অভিনব অভিজ্ঞতা (unique experience)। বুদ্ধি কেন যথার্থ জ্ঞান দিতে পারে না, বার্গসোঁ কয়েকটি যুক্তির সাহায্যে তা ব্যাখ্যা করেছেন।

স্বজ্ঞা হল বুদ্ধিসঞ্জাত সহানুভূতি

প্রথমতঃ, বুদ্ধিলব্ধজ্ঞান আংশিক, বুদ্ধির কাজ হল বিশ্লেষণ (analytic)। বুদ্ধির কাজ সমগ্রকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত করে তাকে বোঝার চেষ্টা করা, যার ফলে বুদ্ধি কেবলমাত্র খণ্ড বা আংশিক জ্ঞানই লাভ করে, অখণ্ড সমগ্রের জ্ঞান লাভ করতে পারে না পরমতত্ত্ব এক অখণ্ড প্রবাহ—বিশ্লেষণাত্মক বুদ্ধি তাকে উপলব্ধি করতে পারে না।

বুদ্ধির ত্রুটি

দ্বিতীয়তঃ, বুদ্ধিলব্ধ জ্ঞান সম্পর্ক সাপেক্ষ (relative) জ্ঞান। একটা বিশেষ দিক থেকে বুদ্ধি বস্তুটিকে প্রত্যক্ষ করে, যার ফলে বস্তুর পূর্ণাঙ্গ স্বরূপ আমাদের কাছে ধরা পড়ে না।

তৃতীয়তঃ, বুদ্ধিলব্ধ জ্ঞান, বাহ্যিক (external) ও আবভাসিক। বুদ্ধি বস্তুর বাহ্য রূপটিকেই আমাদের কাছে উপস্থাপিত করে, তার অন্তর পরিচয় আমাদের দেয় না।

চতুর্থতঃ, বুদ্ধি হল স্থিতিশীল বা নিশ্চল। কাজেই নিয়ত পরিবর্তনশীল বস্তুর স্বরূপ জানা বুদ্ধির পক্ষে সম্ভব নয়। তাছাড়া বার্গসোঁর মতে প্রাণপ্রবাহই (elan vital) হল পরমতত্ত্ব। এই প্রাণ প্রবাহ অখণ্ড, অবিভাজ্য, চিরগতিময়। এই প্রাণ প্রবাহকে বুদ্ধির সাহায্যে জানা সম্ভব নয়।

স্বজ্ঞাবাদীদের মতে স্বজ্ঞা বুদ্ধির পূর্বোক্ত ত্রুটি থেকে মুক্ত। স্বজ্ঞা বিচার বিশ্লেষণের মাধ্যমে বস্তুকে না জেনে তাকে সোজাসুজি জানে। স্বজ্ঞা বস্তুর অন্তরে প্রবেশ করে তার সঙ্গে একাত্মতা লাভ করে। স্বজ্ঞাকে সম্পর্কের মাধ্যমে বস্তুর স্বরূপকে জানতে হয় না। স্বজ্ঞা বস্তুর বাহ্য স্বরূপের পরিচয় দেয়না, স্বজ্ঞার মাধ্যমে পরমতত্ত্বের যথাযথ স্বরূপকে জানা যায়। চিন্তনের সাহায্যে পরমতত্ত্বের জ্ঞান হল নিশ্চল, নিষ্প্রাণ প্রত্যয়ের (concepts মাধ্যমে পরমতত্ত্বের বাহ্য

স্বজ্ঞার উৎকর্ষ

স্বরূপ সম্পর্কে অবহিত হওয়া। পরমতত্ত্ব হল সদা গতিশীল (dynamic) ও সৃজনশীল (creative)। সেই কারণে স্থূল, বিশ্লেষণাত্মক, আপেক্ষিক, অমূর্ত ও স্থিতিশীল বুদ্ধিলব্ধ জ্ঞানের সাহায্যে পরমতত্ত্বের জ্ঞান লাভ করা যায় না।

আমরা পূর্বেই বলেছি যে বার্গসোঁর পরমতত্ত্ব হল প্রাণপ্রবাহ (elan vital)। তার প্রকৃতি আলোচনা করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। তিনি যে পদ্ধতিতে এই পরমতত্ত্বের জ্ঞান লাভ সম্ভব বলে ব্যক্ত করেছেন, অর্থাৎ কিনা, স্বজ্ঞা বা প্রত্যক্ষ অনুভূতি, তাই আমাদের আলোচ্য বিষয়। কেননা ধর্ম-চেতনা দাবী করে যে 'আধ্যাত্মিক বিষয়কে আধ্যাত্মিক ভাবেই জানতে হয়' অর্থাৎ আধ্যাত্মিক বিষয়কে বাইরে থেকে অনুধাবন করা যায় না। আধ্যাত্মিক বিষয়কে জানতে হবে ভেতর থেকে, বাইরে থেকে নয়; অর্থাৎ কিনা, আধ্যাত্মিক সত্তার সঙ্গে একাত্মতা লাভ করার অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়েই তাকে জানতে হবে। যাঁরা ধর্মকে অলীক বলে আখ্যাত করতে চান তাঁরা মানুষের অভিজ্ঞতা এবং বস্তুর যথাযথ স্বরূপ, এই দুয়ের মধ্যে ব্যবধান রচনা করতে চান যার জন্য ধর্মের কেন্দ্রীয় বস্তু ঈশ্বর মানুষের কাছে হয়ে পড়ে অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয় এবং সেইহেতু মানুষের অনধিগম্য। বার্গসোঁর মতবাদ মানুষের অভিজ্ঞতা ও বস্তুর যথাযথ স্বরূপের মধ্যে কোন ব্যবধানকে স্বীকার করে নিতে চায় না। কেননা স্বজ্ঞার মাধ্যমেই বস্তুর যথাযথ স্বরূপের সঙ্গে আন্তরিক পরিচয় সম্ভব। কাজেই এই দিক থেকে স্বজ্ঞা ধর্মের স্বার্থ রক্ষা করতে পারে।

আধ্যাত্মিক বিষয়কে জানার উপায়

কিন্তু বার্গসোঁর মতবাদের ত্রুটি হল তিনি চিন্তন ও স্বজ্ঞার মধ্যে ব্যবধান রচনা করে জ্ঞানের অর্থ ও পরিসরকে অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ করে তুলেছেন। বৌদ্ধিক চিন্তন ছাড়া স্বজ্ঞা হয়ে পড়ে একটা বিভ্রান্তিকর অনুভূতি এবং এই অনুভূতি হবে অনেকটা সহজাত প্রবৃত্তির মতনই মূক এবং অস্পষ্ট। বুদ্ধি ছাড়া স্বজ্ঞা হল ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যমূলক, ব্যক্তিগত এবং অপ্রকাশ্য। কিন্তু সত্য হল সামাজিক, সার্বিক, প্রকাশ্য, বস্তুগত; এটি সাধারণ সম্পত্তি। স্বজ্ঞামূলক অভিজ্ঞতার উপাদানের অর্থ প্রকাশ করার জন্য চিন্তার সংগঠনের প্রয়োজনীয়তা আছে।

স্বজ্ঞার ত্রুটি

ধর্মের সমস্যার উপর এই আলোচনার পরিণাম কি লক্ষ্য করা যেতে পারে। বার্গসোঁর মতে আমরা সত্তার অভিজ্ঞতা লাভ করতে পারি, ধর্ম-চেতনা দাবী করে যে সে এই অভিজ্ঞতা লাভ করেই থাকে। কিন্তু সত্তার অভিজ্ঞতা যদি আমরা লাভ করতে পারি আমাদের সেই অভিজ্ঞতাকে ধারণায় সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ করতে বাধা কোথায়? ধর্মীয় (religious

ধর্মীয় অভিজ্ঞতা ও ধর্মীয় ধারণার মধ্যে অসঙ্গতি নেই

experience) অভিজ্ঞতা ও ধর্মীয় ধারণার (religious ideas) মধ্যে অসঙ্গতি আছে—অর্থাৎ কিনা, ধর্মীয় অভিজ্ঞতা যথার্থ জ্ঞান দেয় না, এই অভিমত স্বীকার করা চলে না। এই মতবাদ ধর্মের ক্ষেত্রে দুর্জ্ঞেয়তা বা সংশয়বাদ সৃষ্ট করবে। ধর্ম যাতে নিছক অন্ধ বিশ্বাস প্রবণতায় বা অনুভূতিতে পরিণত না হয় সেইজন্য বৌদ্ধিক ধারণাকে বাদ দেওয়া চলে না। ধর্ম-সম্বন্ধীয় অভিজ্ঞতার প্রকাশের জন্য ধর্মসম্বন্ধীয় ধারণার প্রয়োজন আছে।

ইতিপূর্বে আমরা স্বজ্ঞাবাদীদের বক্তব্য এবং স্বজ্ঞার ত্রুটি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। সেই আলোচনার পুনরাবৃত্তি না করে এখানে সংক্ষেপে বলা যেতে পারে যে, স্বজ্ঞাবাদীরা মনে করেন স্বজ্ঞা বা প্রত্যক্ষ অনুভূতি ঐশ্বরিক সত্যতা সম্পর্কে আমাদের সুনিশ্চিত জ্ঞান দান করে; বিচারবুদ্ধি ধর্ম সম্বন্ধীয় জ্ঞান দেবার ব্যাপারে অনিশ্চিত, অব্যাপক এবং অনুপযোগী। তাঁরা মনে করেন যে নিশ্চয়তার মানদণ্ডের বিচারে স্বজ্ঞার স্থান বিচারবুদ্ধির ঊর্ধ্বে।

স্বজ্ঞাবাদীদের দৃষ্টিতে বিচারবুদ্ধির ত্রুটিগুলি ইতিপূর্বে আমরা আলোচনা করেছি। আমরা সেখানে একথাও বলেছি যে বিচারবুদ্ধি-বিরুদ্ধ স্বজ্ঞা সম্পর্কীয় মতবাদ গ্রহণ-যোগ্য নয়। বিচারবুদ্ধির বিরুদ্ধে স্বজ্ঞাবাদীরা যেসব অভিযোগ এনেছেন সেইগুলিও সেখানে খণ্ডন করা হয়েছে এবং শেষ পর্যন্ত আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি যে বিচারমূলক চিন্তন, অপরোক্ষ বা স্বজ্ঞামূলক জ্ঞানের বিরোধী নয়। প্রত্যক্ষ অনুভূতি যেহেতু অভিজ্ঞতানির্ভর, সেইহেতু নিশ্চয়তার ভিত্তি—এ সিদ্ধান্ত যথার্থ নয়। স্বজ্ঞা বা অপরোক্ষ জ্ঞান নিজেই নিজের সত্যতার মাপকাঠি—এ সিদ্ধান্ত গ্রহণযোগ্য নয়। স্বজ্ঞার মাধ্যমে ঈশ্বরকে জানা যেতে পারে। কিন্তু বিচারবুদ্ধির মাধ্যমেই সেই ঈশ্বর-জ্ঞানের আদান-প্রদান সম্ভব।

———

দশম অধ্যায়

ঈশ্বরের প্রকৃতি ও গুণাবলী

(The Nature and Attributes of God)

১। ঈশ্বর সম্পর্কে বিভিন্ন ধারণা (Different Conceptions of God) :

ঈশ্বর এক, না দুই, না বহু এই সম্পর্কে একাধিক মতবাদ আছে। নীচে এই মতবাদগুলি আলোচনা করা হচ্ছে :

(i) **বহু দেববাদ** (Polytheism) : বহু দেববাদ বিভিন্ন প্রাকৃতিক শক্তির পশ্চাতে একাধিক অতীন্দ্রিয় অতিমানব দেবতার সত্তায় বিশ্বাসী। এই দেবতা বিশ্বজগতের এক একটি বিভাগের কর্তা এবং নিজ নিজ বিভাগের নিয়ামক হিসেবে তাঁরা জগতের বিভিন্ন বিভাগগুলি নিয়ন্ত্রণ করেন। সেই কারণে সূর্যদেবতা, সমুদ্র দেবতা প্রভৃতি বিভিন্ন দেবতার কল্পনা করা হয়েছে। প্রাচীন মিশরের অধিবাসীরা, গ্রীক, রোমান এবং ভারতবাসীরা বহু দেববাদে বিশ্বাসী ছিলেন। তাঁরা যে কেবল বহু দেবতায় বিশ্বাস করতেন তা নয়, এই সব দেবতাদের সাধারণ মানুষের মতো কল্পনা করে তাদের মধ্যে মনুষ্যোচিত গুণ আরোপ করতেন। তাঁদের মতে দেবতাদের মানুষের মতই ইচ্ছা, প্রবৃত্তি ও অনুভূতি আছে।

বহু দেববাদ একাধিক দেবতার সত্তায় বিশ্বাসী

দেবতাদের মানুষের মত ইচ্ছা, প্রবৃত্তি আছে

সমালোচনা (Criticism) : বহু দেববাদ একটি পৌরাণিক মতবাদ। এই মতবাদকে দার্শনিক মতবাদরূপে গ্রহণ করা যেতে পারে না। দেবতাকে মানুষরূপে কল্পনা করার প্রবণতা থেকেই এই জাতীয় মতবাদের উৎপত্তি। এই মতবাদ বিচারবুদ্ধির উপর প্রতিষ্ঠিত নয়।

এই মতবাদ পৌরাণিক মতবাদ

অন্যান্য বহুত্ববাদী দার্শনিক মতবাদের মত বহু দেববাদ জগতের ঐক্য, শৃঙ্খলা এবং সামঞ্জস্য ব্যাখ্যা করতে পারে না। এই জগতকে যত গভীরভাবে জানা যায় ততই এর ঐক্যের দিকটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। বিভিন্ন দেবতার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব এবং এই জগতের বিভিন্ন বিভাগের নিয়ন্ত্রণ যুক্তিগ্রাহ্য মতবাদ নয়।

বহু দেববাদ জগতের ঐক্য ও সামঞ্জস্য ব্যাখ্যা করতে পারে না

ঈশ্বর বলতে সাধারণতঃ বোঝায় ঈশ্বর অসীম, অনন্ত ও পূর্ণ, কিন্তু একাধিক দেবতা সর্বশক্তিমান হতেও পারে না।

(ii) **দ্বীশ্বরবাদ** (Ditheism): দ্বীশ্বরবাদে দুই স্বতন্ত্র ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করা হয়েছে। এরা পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী—একজন শুভ, কল্যাণ ও মঙ্গলের স্রষ্টা, আর একজন অশুভ, অকল্যাণ ও অমঙ্গলের স্রষ্টা। মঙ্গলময় ঈশ্বর একটি সর্বাঙ্গসুন্দর জগৎ সৃষ্টি করতে চান। কিন্তু প্রতিদ্বন্দ্বী ঈশ্বর তার এই কাজে বাধা দেন। এইজন্য প্রথমে ঈশ্বরের পরিকল্পনানুযায়ী সর্বাঙ্গ সুন্দর জগৎ সৃষ্টি সম্ভব হয় না। সুতরাং এই জগৎ শুভ ও অশুভ, ভাল ও মন্দ, কল্যাণ ও অকল্যাণের সংমিশ্রণ।

দ্বীশ্বরবাদ দুই স্বতন্ত্র ঈশ্বরে বিশ্বাসী

প্রাচীন পার্শীদের ধর্মমতের মধ্যেও আমরা দ্বীশ্বরবাদ লক্ষ্য করি। যে ঈশ্বর কল্যাণের প্রতীক তাকে তারা আহুর মজ্‌ডা (Ahura Mazda) এবং যে ঈশ্বর অকল্যাণ ও অমঙ্গলের স্রষ্টা তাকে অহ্রিমন (Ahriman) নামে অভিহিত করতেন। উভয়ের পারস্পরিক ক্রিয়া ও দ্বন্দ্ব থেকেই এই জগতের শুভ ও অশুভের সৃষ্টি।

পার্শীদের অহ্রিমন ও আহুর মজ্‌ডা

সমালোচনা (Criticism): দ্বীশ্বরবাদ এই জগতের অশুভ, অকল্যাণ, দুর্দশা ও দ্বন্দ্বের ব্যাখ্যা দিতে পারলেও এই জগতের ঐক্য, শৃঙ্খলা ও সামঞ্জস্যের কোন সন্তোষজনক ব্যাখ্যা দিতে পারে না। শুধুমাত্র দ্বন্দ্ব থেকে সামঞ্জস্যের সৃষ্টি কি ভাবে হবে?

বস্তুতঃ এই জগতের শুভ ও অশুভ, কল্যাণ ও অকল্যাণ ব্যাখ্যার জন্যই দুই স্বতন্ত্র ঈশ্বরের কল্পনা করার কোন প্রয়োজন দেখা দেয় না। একই ঈশ্বর কল্যাণ ও অকল্যাণ, ভাল ও মন্দ উভয়ই সৃষ্টি করেছেন, যাতে মন্দ ও অকল্যাণের পাশে ভাল ও কল্যাণের মহিমা উজ্জ্বলভাবে প্রকাশিত হয়। তাছাড়া ভাল ও মন্দ উভয়ের অস্তিত্ব না থাকলে নৈতিক জীবনও অর্থহীন হয়ে পড়ে। ঈশ্বর সসীম জীবকে ইচ্ছার স্বাধীনতা দিয়েছেন। সসীম জীবের ইচ্ছামূলক কর্ম-সম্পাদন থেকেই এই জগতের মন্দ যে আংশিকভাবে সৃষ্ট হয়, আমাদের প্রাত্যহিক অভিজ্ঞতাও তা প্রমাণ করে।

কল্যাণ ও অকল্যাণ ব্যাখ্যার জন্য দুই স্বতন্ত্র ঈশ্বরের প্রয়োজন নেই

এই মতবাদ ঈশ্বরকে সাধারণ মানুষের মত কল্পনা করে এবং প্রবৃত্তি, ইচ্ছা, বাসনা প্রভৃতি মনুষ্যোচিত গুণ ঈশ্বরের সত্তায় আরোপ করে। কিন্তু ঈশ্বর সম্পর্কে আমাদের ধারণা, ঈশ্বর অসীম ও অনন্ত, সুতরাং পূর্বোক্ত মতবাদ ঈশ্বর সম্পর্কে আমাদের চিরাচরিত ধারণার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। তাছাড়া দুই ঈশ্বরের কল্পনা করা হলে ঈশ্বর অসীম ও অনন্ত না হয়ে সসীম ও সান্ত হয়ে পড়বে, যা আমাদের ধারণার বিরোধী।

এই মতবাদ ঈশ্বরকে সাধারণ মানুষরূপে কল্পনা করে

সুতরাং পূর্বোক্ত আলোচনার ভিত্তিতে এই সিদ্ধান্তে আসা যেতে পারে যে, দ্বৈতবাদ সন্তোষজনক মতবাদ নয়। এই মতবাদ জড় ও মনের সম্বন্ধ সঠিকভাবে ব্যাখ্যা করতে পারে না।

দ্বৈতবাদ সন্তোষজনক মতবাদ নয়

(iii) **একেশ্বরবাদ** (Monotheism) **:** বহু দেববাদ ও দ্বীশ্বরবাদ নানা দোষ ত্রুটিতে পূর্ণ, সেই কারণে সন্তোষজনক মতবাদ নয়। এইজন্যই একেশ্বরবাদের উদ্ভব হয়েছে। মানুষের উন্নত ধর্মীয় চেতনা একেশ্বরবাদেই বিশ্বাসী। এই মতানুসারে ঈশ্বর এক ও অদ্বিতীয়। তিনি অসীম, অনন্ত, সর্বব্যাপী, সর্বশক্তিমান, সর্বজ্ঞ ও পূর্ণ। এই জগতের কোন কিছুর দ্বারাই তিনি সীমিত হতে পারেন না।

ঈশ্বর এক ও অদ্বিতীয়

আমাদের ধর্মানুভূতি একেশ্বরে বিশ্বাস করেই তৃপ্তি খুঁজে পায়। ঈশ্বর এক ও অদ্বিতীয়—এই ধারণাই যুক্তিযুক্ত ও সন্তোষজনক মনে হয়।

২। ঈশ্বরের গুণাবলী (The Attributes of God) **:**

যখন আমরা ঈশ্বরের গুণাবলী আলোচনা করি তখনই আমরা ঈশ্বরের প্রকৃতি সম্পর্কে অবহিত হতে পারি। প্রতিটি ধর্মই তার ক্রমবিকাশের যে স্তরেই আসুক না কেন, ঐশ্বরিক সত্তার ক্ষেত্রে কতকগুলি বিধেয় (predicates) আরোপ করে। এই বিধেয়গুলিকেই ঈশ্বরের গুণাবলী বলা হয়। মানুষের ধর্মীয় চেতনা থেকেই এই গুণগুলির উদ্ভব, কারণ প্রতিটি ধর্মপ্রবণ ব্যক্তি ঈশ্বরে কিছু গুণের আরোপ করেন। এই গুণাবলী দু' প্রকার—(ক) তত্ত্ববিদ্যাসম্পর্কীয় গুণাবলী (The metaphysical attrributes), (খ) নৈতিক গুণাবলী (The moral attiibutes)।

ঈশ্বরের গুণাবলী ঈশ্বরে আরোপিত বিধেয়

(ক) তত্ত্ববিদ্যাসম্পর্কীয় গুণাবলী হল সেই সব গুণাবলী যেগুলিকে আমাদের বিচারবুদ্ধি, আমাদের ধর্মচেতনার বৌদ্ধিক উপাদান, জগতের আশ্রয়রূপে ঐশ্বরিক সত্তায় আরোপ করে। জগতের পরম সত্তারূপে, জগতের স্রষ্টা এবং জীব ও বস্তু দ্বারা পরিপূর্ণ জগতের সংরক্ষক হিসেবে ঈশ্বর অবশ্যই এই গুণগুলির অধিকারী হবে। ঈশ্বরে এই গুণগুলি আরোপ করতে না পারলে আমাদের বিচারবুদ্ধি পরিতৃপ্ত হয় না।

তত্ত্বসম্পর্কীয় গুণাবলী

ঈশ্বরের এই গুণাবলী হল, অসীমত্ব, অনন্তত্ব, সর্বনিরপেক্ষতা, অপরিবর্তনীয়তা, সর্বশক্তিমত্তা, সর্বত্রবিদ্যমানতা, সর্বজ্ঞতা ইত্যাদি।

এক্ষণে আমরা এই গুণগুলি একে একে আলোচনা করছি **:**

সান্ত ও সসীম মনুষ ঈশ্বরের ধারণা করতে গিয়ে তাঁকে অসীম, অনন্ত এবং এক পরমসত্তা বলে ধারণা করে। কিন্তু ঈশ্বরের ক্ষেত্রে যখন এই পদগুলি প্রয়োগ করা হয় তখন এই পদগুলির যথার্থ তাৎপর্য বুঝে নেওয়া একান্ত দরকার।

(i) **অসীমত্ব ঃ** ঈশ্বরের গুণাবলীর উল্লেখ করতে গিয়ে যখন অসীম (Infinite) পদটি ঈশ্বরের ক্ষেত্রে আরোপ করা হয় তখন ঈশ্বরকে এই অর্থে অসীম বলা হবে না যে, তিনি নিজের মধ্যেই সমস্ত অস্তিত্বশীল বিষয়কে ধারণ করে আছেন। তিনি 'অসীম' এই অর্থে যে, তাঁর নিজের ইচ্ছা থেকে নিঃসৃত নয় এমন কিছুর দ্বারা তিনি সীমিত হতে পারেন না এবং তিনি নিজেই সব সীমিত অস্তিত্বশীল বস্তুর পর্যাপ্ত হেতু। কাজেই এক দিক থেকে তিনি তাঁর থেকে স্বতন্ত্র বস্তু ও জীবের দ্বারা পরিপূর্ণ এক জগতের দ্বারা সীমিত। কিন্তু এই সীমা ঈশ্বরের কোন ত্রুটি নয়। কারণ এ হল ঈশ্বরের আত্ম-সীমিতকরণ (self-limitation) এবং সেইহেতু এর দ্বারা ঈশ্বরের ঈশ্বরত্বের হানি ঘটে না।

অসীম

এই প্রসঙ্গে মনে রাখা দরকার যে ঈশ্বরের ক্ষেত্রে যখন অসীম পদটি আরোপ করা হয় তখন অসীম পদটিকে 'যা সান্ত' তার বিপরীত—এই নঞর্থক অর্থে গ্রহণ করা হয় না। ঈশ্বরের অসীমত্ব সান্তর অস্বীকৃতি (negation of the finite) নয়, কেননা সেইক্ষেত্রে সান্ত হবে অলীক কিছু যার অসীম সত্তায় কোন স্থান থাকবে না, বা সান্ত অসীমকে সীমিত করবে। অসীমকে যদি সান্তর বিপরীত অর্থে গ্রহণ করা হয় তাহলে এ হবে হেগেলের ভাষায় ভ্রান্ত অসীম (false infinite) এবং এই অর্থে ঈশ্বরকে অসীম বলা হলে ঈশ্বরের কোন নৈতিক বা ধর্মীয় উপাদান আছে বলা যাবে না। এ হল পরিমাণগত দিক থেকে অসীমকে চিন্তা করা। ঈশ্বররূপী আধ্যাত্মিক সত্তা দেশের (space) অতিবর্তী, তার ক্ষেত্রে এই অসীমকে প্রয়োগ করা অযৌক্তিক।

অসীম সান্তর বিপরীত নয়

'অসীম' পদটির এই পরিমাণগত ও নঞর্থক প্রয়োগ ছাড়াও-এর গুণগত ও সদর্থক প্রয়োগ রয়েছে, ধর্মের দিক থেকে যার মূল্য আছে। এই সদর্থক অর্থে অসীম হল পূর্ণ (perfect)। পরিপূর্ণ (complete) এবং স্বয়ংসম্পূর্ণ অসীম সান্তকে তার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করে নেবে কিন্তু সান্তর অতিবর্তী হবে। ঈশ্বরের অসীমত্ব বলতে বোঝায় ঈশ্বর সান্ত জগতের আশ্রয়।

অসীম পদটির সদর্থক প্রয়োগ

(ii) **অনন্ত ঃ** ঈশ্বরকে যখন অনন্ত (eternal) বলে ধারণা করা হয় তখন এই ধারণার অধিকতর ধর্মীয় তাৎপর্য আছে মনে করতে হবে। অনন্ত, এই ধারণারও

একটা নঞর্থক দিক আছে। জগতের যাবতীয় বস্তুকে পরিবর্তনশীল ও ধ্বংসশীল লক্ষ্য করে মানুষের ধর্মীয় চিন্তা এমন এক সত্তার ধারণায় উপনীত হয় যে, সত্তাকে সে ধারণা করে কালের পরিবর্তনের বহু ঊর্ধ্বে এবং যিনি 'গতকালে, বর্তমানে এবং চিরকাল ধরেই এক'। কাজেই 'অনন্ত' পদটিকে নঞর্থকভাবেই প্রথম ধারণা করা হয়েছে। অনন্ত বলতে কালের সীমাহীন ব্যাপ্তিকে (unending expanse of time) বোঝাবার চেষ্টা করা হয়েছে। কিন্তু এ হল 'অনন্ত' পদটিকে পরিমাণগত দিক থেকে প্রয়োগ করা এবং সেইহেতু ঈশ্বরের ক্ষেত্রে এর প্রয়োগ অযৌক্তিক। পরিমাণগত দিক থেকে 'অনন্ত' কালের প্রক্রিয়াকে সম্পূর্ণভাবে বর্জন করে এবং অনন্ত পদের মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের ক্ষেত্রে এমন এক বৈশিষ্ট্যের আরোপ করা হয় যা কালবর্জিত।

অনন্ত

অনন্তের নঞর্থক দিক

কিন্তু অনন্ত যদি হয় কালের পরিপূর্ণ অভাব (pure negation of time) এবং ঈশ্বর যদি এই অর্থে অনন্ত হয় তাহলে কালবর্জিত ঈশ্বর (timeless god) কাল-প্রক্রিয়ার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত অস্তিত্বশীল বস্তুর দ্বারা পরিপূর্ণ এই জগৎ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন, নতুবা কালহীন সত্তা ঈশ্বরই জগতের সত্য হয়ে দাঁড়ায় এবং পরিবর্তনশীল কাল-প্রক্রিয়া হয়ে পড়ে নিছক ভ্রান্তি। কিন্তু ঈশ্বরবাদীর পক্ষে এই দুইয়ের কোন বিকল্পই গ্রহণ করা চলে না।

ঈশ্বর কালবর্জিত সত্তা নয়

ঈশ্বর কালের অধীন হতে না পারেন, কিন্তু কালের পারম্পর্যের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক থাকা দরকার। গ্যালোয়ে (*Galloway*) বলেন, 'যে ঈশ্বর সান্ত জীবের মনের কালের পরিবর্তন জানতে পারেন না, তাঁকে ঈশ্বর বলে শ্রদ্ধা করা চলে না।'[1] যে ঈশ্বর পরিবর্তন থেকে সম্পূর্ণ দূরে সরে রয়েছেন, সেই ঈশ্বর এক নৈর্ব্যক্তিক দ্রব্য (impersonal substance) হতে পারেন, কিন্তু তাকে এক সজীব এবং আধ্যাত্মিক ঈশ্বর রূপে গণ্য করা চলে না। কাজেই আমাদের সিদ্ধান্ত হল ঈশ্বর এই অর্থে অনন্ত নয় যে, তিনি সীমাহীন কালকে পূর্ণ করে রয়েছেন (God is not eternal in the sense of filling endless time)। তাহলে এই ধারণা হবে আধ্যাত্মিক মূল্যবর্জিত। আবার ঈশ্বর এই অর্থেও অনন্ত নয় যে তাঁর সঙ্গে কালের কোন সম্পর্ক নেই। কালের সঙ্গে সম্পর্কবর্জিত হয়ে ঈশ্বরের পক্ষে তাঁর আধ্যাত্মিক মূল্য বজায়

গ্যালোয়ের মন্তব্য

ঈশ্বর কালের অস্তিত্বের শর্ত

1. "A God who could not know the time-changes in finite minds could not be reverenced as God."
—Galloway : The Philosophy of Religion ; Page 479.

রাখা সম্ভব নয়। ঈশ্বর এই অর্থে অনন্ত যে, তিনি কালের উর্ধ্বে। তিনি কালরূপ প্রক্রিয়ার অস্তিত্বের পরম শর্ত এবং সেই কারণে তিনি নিজে কালের অধীন নন।

(iii) **সর্বনিরপেক্ষতা:** ঈশ্বর পরমসত্তা (Absolute)। কিন্তু পরমসত্তা পদটি যখন ঈশ্বরের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয় তখন তার যথার্থ তাৎপর্য বুঝে নেওয়া উচিত। সাধারণতঃ পরমসত্তা বলতে অনেকে মনে করেন সর্বোচ্চ সত্তা (Ultimate Reality), যে সত্তা সর্বব্যাপক, সঙ্গতিপূর্ণ এবং পরিপূর্ণ। যাঁরা এই ধারণা সমর্থন করেন তাঁরা মনে করেন যে সত্তার পথ ধরে অগ্রসর হলে আমরা অনিবার্যভাবে ঐ পথের শেষ লক্ষ্য 'পরমসত্তায়' উপনীত হই।

পরমসত্তা

আমাদের অভিজ্ঞতা কোন স্তরে বিরোধমুক্ত নয়। আমরা একটা অভিজ্ঞতা থেকে আর একটা অভিজ্ঞতায় যখন উপনীত হই তখন দেখি যে-কোন অভিজ্ঞতাই সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। কাজেই প্রতিটি অভিজ্ঞতাকে অবভাস (appearance) মনে হয় এবং যেহেতু যে সত্তা পূর্ণ, সন্তোষজনক এবং অভ্যন্তরীণ দিক থেকে সামঞ্জস্যপূর্ণ তার দিকে যাত্রা করি। শেষ পর্যন্ত পরমসত্তায় উপনীত হই। কিন্তু এই পরমসত্তাকে ঈশ্বরের সঙ্গে অভিন্ন গণ্য করা যুক্তিসঙ্গত নয়। ঈশ্বর সব কিছুর সঙ্গে অভিন্ন নয়; সব বস্তু ঈশ্বরের উপর নির্ভর। কাজেই ঈশ্বরকে পরমসত্তা বলে অভিহিত করার সময় সর্বেশ্বরবাদীরা যেমন ঈশ্বরকে সমগ্র সত্তার সঙ্গে অভিন্ন করে দেখেন, সেভাবে দেখা যুক্তিসঙ্গত নয়।

ঈশ্বর সব কিছুর সঙ্গে অভিন্ন নয়

ঈশ্বর এই অর্থে পরমসত্তা যে তিনি সান্ত অস্তিত্বশীল বস্তুর নিঃশর্ত ভিত্তি (unconditional ground) এবং তিনি সীমিত এই অর্থে যে, তিনি যে জগৎ সৃষ্টি করেছেন তার দ্বারা তিনি নিজেকে স্বেচ্ছায় সীমিত করেছেন। ঈশ্বর এই জগতের পরম ভিত্তি (Absolute ground), কারণ ঈশ্বরই এই জগতের অস্তিত্বের একমাত্র ও পর্যাপ্ত হেতু। ঈশ্বরকে পরমসত্তা আরও এক কারণে বলা যেতে পারে, কারণ তিনি এক সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং স্বয়ংসম্পূর্ণ সত্তা, যার চেতনা সমগ্র বিশ্বকে ব্যাপ্ত করে রয়েছে। সত্তার সমষ্টিরূপে যে পরমসত্তা, ঈশ্বরবাদীদের পরমসত্তা, তার থেকে পৃথক।[1]

ঈশ্বর অস্তিত্বশীল জগতের আশ্রয়

(iv) **অপরিবর্তনীয়তা:** ঈশ্বর পরিবর্তনাতীত, এর অর্থ হল যে ঈশ্বরের প্রকৃতি সকল সময়ই আত্ম সঙ্গতিপূর্ণ। তা না হলে এক অপরিবর্তনীয় সর্ব-নিরপেক্ষ সত্তা হিসেবে ঈশ্বরকে ধারণা করলে এই জগতের ক্রমবিকাশ ও প্রগতি অসম্ভব হয়ে পড়বে।

---

1. Galloway : The Philosophy of Religion ; Page 48.

(v) **সর্বশক্তিমত্তা** (Omnipotence) : ধর্মের বিকাশের প্রতিটি স্তরেই মানুষ শক্তির ধারণাকে ঈশ্বরের ধারণার সঙ্গে যুক্ত করেছে। যে ঈশ্বর শক্তিহীন, সেই ঈশ্বর কোন কাযকর মূল্যের অধিকারী হতে পারে না এবং সেইহেতু শ্রদ্ধার বস্তুও হতে পারে না। ঈশ্বর সর্বশক্তিমান অর্থে বোঝায় না যে তিনি অসম্ভবকে সম্ভব করতে পারেন।[1] তিনি সর্বশক্তিমান এই অর্থে যে তাঁর ইচ্ছার উপাদানকে বাস্তবতা দান করার ক্ষমতা তাঁর আছে এবং ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ারত ব্যক্তিদের নিয়ে সমগ্র পরিবর্তনশীল ও অস্তিত্বশীল জগতকে তিনি তাঁর ক্রিয়ার দ্বারাই ধারণ করে আছেন। ঈশ্বর সর্বশক্তিমান কারণ তিনি জগৎ-সত্তার সুনিশ্চিত এবং স্বয়ংসম্পূর্ণ আশ্রয় এবং তাঁর নিজের ইচ্ছা থেকে নিঃসৃত নয় এমন কিছুর দ্বারা তিনি সীমিত নন।

সর্বশক্তিমান কথাটির যথার্থ তাৎপর্য

ঈশ্বর সর্বশক্তিমান। তা সত্ত্বেও জগতে পাপের বা অমঙ্গলের (evil) অস্তিত্ব রয়েছে। এই বিষয়টি ঈশ্বরের দ্বারা সৃষ্ট জগতের ত্রুটিরূপে গণ্য হতে পারে বলে অনেকে মনে করেন, কিন্তু তা নয়। তবে অমঙ্গলের প্রকৃতি আলোচনা না করে এই সম্পর্কে এখানে কোন আলোচনা করা সম্ভব নয়।

(vii) **সর্বত্র বিদ্যমানতা** (Omnipresence) : ঈশ্বরে এই গুণের আরোপের মধ্য দিয়ে যে ধর্মীয় প্রয়োজনের প্রকাশ ঘটেছে তা উন্নত ধর্মীয় চেতনার ফল। আদিম ধর্ম ছিল আঞ্চলিক। আদিম ধর্মের দেবতাদের ছিল নির্দিষ্ট আবাসস্থল। বহুদেববাদে বিশেষ বিশেষ দেবতার ক্রিয়া ও প্রভাব বিশেষ বিশেষ স্থানে সীমাবদ্ধ ছিল। একেশ্বরবাদে সব অঞ্চলই এক ঈশ্বরের নিয়ন্ত্রণের অধীন, যিনি জগতের সর্বত্র বিরাজমান। ঈশ্বরের গুণাবলী সম্পর্কে যে-কোন যথার্থ ধারণা ঈশ্বরের সর্বত্র বিদ্যমানতায় বিশ্বাসী।

ঈশ্বরে সর্বত্র বিদ্যমানতা গুণের আরোপ উন্নত ধর্মীয় চেতনার ফল

ধর্মীয় চেতনা ঈশ্বরকে সর্বত্র বিরাজমান মনে করে কিন্তু দার্শনিকের কাছে প্রশ্ন হল, ঈশ্বরের এই গুণটিতে কিভাবে বুঝে নিতে হবে। ঈশ্বর সর্বত্র বিরাজমান কারণ ঈশ্বর সবকিছু—সর্বেশ্বরবাদীদের এই উত্তর ঈশ্বরবাদীকে পরিতৃপ্ত করবে না। তাছাড়া ঈশ্বর দেশের (space) সর্বত্র বিরাজমান এটাও চিন্তা করা যায় না। ঈশ্বর হল চেতন সত্তা, কাজেই দৈশিক বিস্তৃত জগতের সর্বত্র ঈশ্বর বিরাজমান একথা ভাবা চলে না। এরকম চিন্তা করার অর্থ হল দেশকে, যা ঈশ্বরের উপর নির্ভর, ঈশ্বরের পূর্ববর্তী ধারণা মনে করা। দেশ

সর্বত্র বিদ্যমানতা গুণটির তাৎপর্য

1. ঈশ্বর সর্বশক্তিমান হলে অসম্ভবকে সম্ভব করতে পারেন না কেন, এই প্রশ্ন যাঁরা উত্থাপন করেন, তাঁরা ভুলে যান যে সম্ভাব্যতা ও অসম্ভাব্যতার অমূর্ত ধারণা ঈশ্বর-পূর্ববর্তী ধারণা নয়। জগতের অস্তিত্বের ধারণার সঙ্গে সঙ্গেই এই ধারণাগুলির উদ্ভব।

ঈশ্বরের উপর নির্ভর কেননা ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ারত জীবের দ্বারা পূর্ণ জগৎ এবং যার মাধ্যমে জীব ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া করে সবই ঈশ্বরের দ্বারাই উদ্ভূত এবং জীবের সহাবস্থানের ধারণা থেকেই দেশের ধারণার উদ্ভব। কাজেই ঐশ্বরিক সত্তা দেশের দ্বারা সীমিত হতে পারে না। যেহেতু ঈশ্বর সব অস্তিত্বশীল বস্তুর সক্রিয় আশ্রয় (active ground), কাজেই তাঁর কর্মের ক্ষেত্র দেশের প্রাতটি বিন্দু পর্যন্ত প্রসারিত হবে। কাজেই ঈশ্বর সর্বত্র বিরাজমান বলার অর্থ হল যে, ঈশ্বরের সত্তাকে তাঁর ক্রিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন করা সম্ভব নয়। ঈশ্বর সর্বত্র বিরাজমান এই অর্থে যে, তিনি তাঁর ক্রিয়াকে সর্বত্র অনুভবগম্য করে তোলেন। এই ক্রিয়া যেহেতু দৈনিক শৃঙ্খলার অতিবর্তী, তাঁকে দেশের মধ্য দিয়ে পরিক্রমা করতে হয় না, বা জীবাত্মাকে ঈশ্বরের কাছে উপনীত হবার জন্য দেশের বাধা অতিক্রম করতে হয় না, কারণ ঈশ্বর জগতের সর্বকালের আশ্রয় (God is the ever present ground of the world)।[1]

(viii) **সর্বজ্ঞতা** (Omniscience): ঈশ্বরকে সর্বজ্ঞ মনে করা হয়। জগতের ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান কোন কিছুই তার অজানা নয়। মিল (*Mill*)-এর মতে ঈশ্বরের সর্বজ্ঞতা গুণকে কোন ভাবেই প্রমাণ করা যায় না। মিলের সঙ্গে একমত হয়ে আমরা বলতে পারি যে এমন কোন যুক্তি নেই যার সাহায্যে মানুষের অভিজ্ঞতা থেকে ঈশ্বরের সর্বজ্ঞতাকে আমরা অবরোহাত্মক পদ্ধতিতে নিঃসৃত করতে পারি। কিন্তু তবু ঈশ্বরবাদীরা এই গুণটিকে ঈশ্বরে আরোপ করেন। প্রশ্ন হল, দর্শন ধর্মতত্ত্বের এই দাবীকে কিভাবে সমর্থন জানাতে পারে?

সর্বজ্ঞতা পদটির তাৎপর্য

মানুষের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে ঈশ্বরকে সর্বজ্ঞ বলা যায় না। মানুষের অভিজ্ঞতা সব সময়ই আংশিক, তার জ্ঞান সীমিত, তার অন্তর্দৃষ্টি খণ্ডাত্মক। মানুষ তার অজ্ঞতা সম্পর্কে সচেতন হয়ে এবং তার দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হয়ে স্বাভাবিকভাবেই মনে করে যে তার ঈশ্বর এই ত্রুটি থেকে মুক্ত। ঈশ্বরের সঙ্গে বিশ্বজগতের সম্বন্ধের সঙ্গে ঈশ্বরের সর্বজ্ঞতার সম্ভাবনার প্রশ্নটি জড়িত। কারণ এই জগতের সব কিছুর সক্রিয় উৎস ও আশ্রয় হল ঈশ্বর। সমগ্র সত্তার সঙ্গে ঈশ্বরের প্রাণবন্ত সম্পর্ক নির্দেশ করে যে ঈশ্বরের অভিজ্ঞতা হল সার্বিক এবং তাঁর চেতনা সর্বব্যাপী।

---

1. একটা উপমার সাহায্যে ঈশ্বরের এই 'সর্বত্র বিদ্যমানতা'-রূপ বৈশিষ্ট্যকে বুঝে নেওয়া যেতে পারে। আত্মা দেহের সর্বত্র ক্রিয়াশীল এবং দেহের সমস্ত উপাদানের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সম্পর্কযুক্ত। আত্মা যেহেতু আধ্যাত্মিক সত্তা, দেহের কোন বিশেষ অংশে তার অবস্থান, এ কথা বলা যেতে পারে না, কারণ আত্মা সমগ্র দেহ জুড়ে আছে; অনুরূপভাবে ঈশ্বর তার জগতের সবটুকু জুড়ে রয়েছে এবং এই জগতের সর্বত্র ক্রিয়াশীল।

মানুষ যে ভাবে জানে, সর্বজ্ঞ মন কিন্তু সেভাবে জানে না। মানুষ জানে যুক্তিতর্কের মাধ্যমে। মানুষের জ্ঞান সত্তার সংগঠনের মধ্যে সামঞ্জস্যপূর্ণ সম্পর্ক আবিষ্কার করে জ্ঞানের সংহতি রচনা করতে চায়। কিন্তু তাহলেও মানুষ জানে খণ্ড খণ্ড ভাবে, অসম্পূর্ণ ভাবে, যা বস্তুতঃই নির্দেশ করে যে মানুষের জ্ঞান সীমিত। কিন্তু মানুষের এই খণ্ডভাবে জানার পদ্ধতি ঈশ্বরের ক্ষেত্রে প্রযোগ করা চলে না। ঈশ্বর মানুষের মতন বিচারবুদ্ধির মাধ্যমে জানেন না। কারণ বিচারবুদ্ধির মাধ্যমে জানা সময় সাপেক্ষ ব্যাপার, সে-ক্ষেত্রে অজ্ঞতাকে অতিক্রম করার ব্যাপার আছে। ঈশ্বরের সঙ্গে তাঁর জ্ঞানের বস্তুর যে অভিনব সম্পর্ক তারই ভিত্তিতে আমরা ঈশ্বরের এক উন্নত ধরনের জ্ঞানের কথা অনুমান করতে পারি। জানার জন্য ঈশ্বরকে বাইরে থেকে বস্তু গ্রহণ করতে হয় না, বস্তু তাঁর ইচ্ছার প্রকাশ এবং তাঁর উপর নির্ভরশীল।

সর্বজ্ঞ মনের জানার পদ্ধতি

কাজেই অনুমান করা যেতে পারে যে, সত্তার সব উপাদান ঈশ্বরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কযুক্ত হওয়াতে এবং ঈশ্বরের অভিজ্ঞতার বিষয় হওয়াতে ঈশ্বর তাদের 'বুদ্ধিসঞ্জাত স্বজ্ঞার' (intellectual intuition) মাধ্যমে জানেন। ঈশ্বর যা জানেন তা সঙ্গে সঙ্গেই জানেন।

গ্যালোয়ে বলেন, "সর্বশক্তিমত্তা, সর্বত্র বিদ্যমানতা এবং সর্বজ্ঞতা, সব অস্তিত্বের এবং অভিজ্ঞতার আশ্রয় যে ঈশ্বর, তাঁর পরস্পর নির্ভর গুণাবলী। চিন্তনের সাহায্যে কিভাবে গুণগুলিকে অবরোহাত্মক পদ্ধতিতে নিঃসৃত করা গেল এটা দেখাতে না পারলেও যদি দেখান যায় যে, এই গুণগুলি ঈশ্বরের ধারণার সঙ্গে, জগতের সঙ্গে ঈশ্বরের যে সম্পর্ক তার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ, তাহলেও মনে হয় যেন কিছু লাভ হল।"

গ্যালোয়ের মন্তব্য

নৈতিক গুণাবলী: তত্ত্বের দিক থেকে ঈশ্বরের প্রকৃতি নিরূপণ করতে গিয়ে আমরা ঈশ্বরের মধ্যে পূর্বোক্ত গুণগুলির কল্পনা করি। কিন্তু ধর্মের দিক থেকে বিচার করে কতকগুলি নৈতিক গুণ ঈশ্বরে আরোপ করা হয়। আমাদের ধর্ম-চেতনার আবেগগত ও ব্যবহারিক দাবী মেটানোর জন্য আমরা ঈশ্বরে নৈতিক গুণগুলি আরোপ করি। ভক্তের কাছে ঈশ্বর প্রেমময়, দয়াময়, ন্যায়পরায়ণ ও কল্যাণময়। যে ঈশ্বরের কোন নৈতিক গুণ নেই তার কোন ধর্মীয় মূল্য নেই। সংস্কৃতিসম্পন্ন মানুষ অ-নৈতিক সত্তাকে কখনও পূজা করতে পারে না। ঈশ্বর সব আদর্শের উৎস। নৈতিক আদর্শ ঈশ্বরের মধ্যেই মূর্ত।

ঈশ্বরে নৈতিক গুণাবলীর আরোপ ধর্ম-চেতনার আবেগগত প্রয়োজন সিদ্ধ করে

নৈতিক গুণগুলির মধ্যে প্রথমে উল্লেখ করা যেতে পারে যে ঈশ্বর প্রেমময় ও দয়াময়। ভক্তের বিশ্বাস, ঈশ্বরকে যথার্থভাবে ডাকলে ঈশ্বর সে ডাকে সাড়া দেন, ভক্তের কামনা পূর্ণ করেন। ঈশ্বর এক পুরুষ, তিনি পুরুষোত্তম। ঈশ্বর করুণাময়, কিন্তু করুণার ভিত্তি যদি ন্যায়বোধের উপর না হয় তাহলে সেই করুণা দুর্বলতার পরিচয়। কাজেই ঈশ্বর ন্যায়পরায়ণ। তিনি জীবের নৈতিক উৎকর্ষ অনুসারে তাকে পুরস্কৃত করেন বা শাস্তি দেন। ঈশ্বর মঙ্গলময়। জীবের মঙ্গলসাধনই ঈশ্বরের অভিপ্রেত।

ঈশ্বর প্রেমময় ও দয়াময়

ঈশ্বরে নৈতিক গুণ আরোপের বিষয়টির বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপিত হয়েছে: প্রথমতঃ, এই অভিযোগ করা হয়েছে যে ঈশ্বর নৈতিকতার ঊর্ধ্বে। কাজেই মানুষের পক্ষে তাঁর নিজের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে ঈশ্বরকে নৈতিক গুণে ভূষিত করা যুক্তিসঙ্গত নয়। ঈশ্বর হল পরমসত্তা, কাজেই ভাল-মন্দ সবই ঈশ্বরের অন্তর্ভুক্ত, কারণ সব কিছুই পরসত্তার অন্তর্ভুক্ত। পরমসত্তার মধ্যে যেহেতু ভাল ও মন্দের বিরোধিতা নেই, সেইহেতু পরমসত্তা ভাল-মন্দের ঊর্ধ্বে, সেইহেতু অতি-নৈতিক (super-moral)। মানুষের খণ্ডদৃষ্টির কাছেই ভাল-মন্দের পার্থক্য। কাজেই পরমসত্তাকে নৈতিক দিক থেকে ভাল বলা চলে না। দ্বিতীয়তঃ, ধর্মের ঈশ্বর যদি হন এক অতিবর্তী সত্তা, তবু আমরা তাঁর ক্ষেত্রে কোন নৈতিক গুণ আরোপ করতে পারি না; মানুষের সম্পর্কের ক্ষেত্রেই নৈতিক গুণগুলির অর্থ আছে। কিন্তু মানুষের সম্পর্কের অতীত কোন সত্তার ক্ষেত্রে সেইগুলি আরোপ করা হল অর্থহীন ব্যাপার। নৈতিক ঈশ্বরের কথা বলা হলে ঈশ্বরে মনুষ্যত্বের আরোপ করা হয়।

ঈশ্বরে নৈতিক গুণ আরোপ সম্পর্কে অভিযোগ

এই অভিযোগের উত্তরে বলা যেতে পারে যে, মানুষের ক্ষেত্রে নৈতিক গুণের যে তাৎপর্য বর্তমান, ঈশ্বরের নৈতিক গুণের তার থেকে এক গভীরতর ও সমৃদ্ধতর অর্থ বা তাৎপর্য বর্তমান। মানুষের মধ্যে যে ভালত্ব তার বিকাশ ক্রমিক এবং আয়াসসাধ্য। ঈশ্বরের ক্ষেত্রে এই ভালত্ব অন্তর্নিহিত। মানুষের মধ্যে ভালত্ব হল সংগ্রামের ফলস্বরূপ এবং এটিকে ধীরে ধীরে মানুষ লাভ করেছে। ঈশ্বরের ভালত্ব তা নয়। ঈশ্বরের ভালত্ব হল নিখুঁত।

অভিযোগের উত্তর

ঈশ্বরকে নৈতিক গুণ বর্জিত করার অর্থ আধ্যাত্মিকতা থেকে ধর্মকে বিচ্ছিন্ন করা। নৈতিক গুণ-বর্জিত ঈশ্বর, ধর্মের ঈশ্বর হতে পারে না। যে ঈশ্বর অ-নৈতিক অর্থাৎ নৈতিক গুণশূন্য, তিনি কখনও প্রকৃত ধর্মীয় উপাসনার বস্তু হতে পারেন না। কাজেই ঈশ্বরের থেকে নৈতিক গুণকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না। ঈশ্বরের ধারণা থেকে অবরোহ পদ্ধতির সাহায্যে আমরা নৈতিক গুণগুলিকে নিঃসৃত করে নিইনি। ঈশ্বরে নৈতিক গুণ আরোপ আমাদের আধ্যাত্মিক চেতনার দাবী। সংক্ষেপে বলা যেতে পারে যে, মানুষ যুক্তির খাতিরে নৈতিক ঈশ্বরে বিশ্বাস স্থাপন করেনি, মানুষের ধর্মীয় চেতনার প্রবণতাই হল অনিবার্যভাবে ঈশ্বরে নৈতিক গুণ আরোপ করা।

নৈতিক গুণ বর্জিত ঈশ্বর ধর্মের উপাস্য বস্তু হতে পারে না

একাদশ অধ্যায়

ঈশ্বর ও পরমসত্তা

(God and the Absolute)

১। ঈশ্বর এবং পরমসত্তা (God and the Absolute) ঃ

অদ্বৈতবাদী ভাববাদী দার্শনিকবৃন্দ এক পরমসত্তার কথা বলেন, যে সত্তা এক অদ্বৈত সত্তা, যে সত্তা সর্বনিরপেক্ষ, সর্বব্যাপী, অবিভাজ্য। এই সত্তা সকল কিছুকেই তার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করে নেয় এবং এই সত্তার বাইরে কোন কিছুর অস্তিত্ব নেই। এই পরমসত্তা এক সর্ব-সঙ্গতিপূর্ণ অভিজ্ঞতা (all consistent experience) এবং দেশে কালে যে জগতের অভিজ্ঞতা হয় তার অন্তিম ব্যাখ্যা আমরা এই পরমসত্তাতেই খুঁজে পাই। এই পরমসত্তা হল এক সার্বভৌম নীতি (universal principle) যার উপর বাস্তব এবং সম্ভাব্য সব বিশেষ (particulars) নির্ভরশীল। এই জগৎ প্রক্রিয়ার তাৎপর্য উপলব্ধির এবং ব্যাখ্যার বুদ্ধিগত প্রয়োজনীয়তার পরিণাম হিসেবেই ভাববাদী দার্শনিকদের চিন্তা থেকে এক পরমসত্তার ধারণার উৎপত্তি।

পরমসত্তার পরিচয়

ধর্মীয় অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রেও ব্যক্তি এক মহান সত্তার সঙ্গে আন্তরিক ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করে, যাকে সে ঈশ্বর বলে অভিহিত করে। এই মহান সত্তাকে সে অসীম, অনন্ত, সর্বনিরপেক্ষ, সর্বশক্তিমান, সর্বত্র বিরাজমান, সর্বজ্ঞ, শাশ্বত, প্রেমময়, দয়াময় ও কল্যাণময় বলে মনে করে। অবশ্য ধর্মের ঈশ্বরের সঙ্গে ব্যক্তির যেমন এক ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তার বোধ আছে তেমনি এক দূরত্বেরও বোধও আছে। কেননা ঈশ্বর এক অতিমানবীয় শক্তি।

ঈশ্বরের পরিচয়

স্বাভাবিকভাবেই একটা প্রশ্ন দেখা দেয়, ধর্মের ঈশ্বরই কি দর্শনের পরমসত্তা? বা ধর্মের ঈশ্বর ধর্মের ক্ষেত্রে পরমসত্তা হয়েও দর্শনের দৃষ্টিতে সান্ত বা সান্ত ও অনন্তের মধ্যবর্তী কিছু। এর উত্তরে অনেকে বলেন যে, আবেগ ও অনুভূতির দিক থেকে যখন দর্শনের পরমসত্তাকে বিচার করা হয়, দর্শনের পরমসত্তাকে সব মূল্যের আশ্রয় মনে করা হয়, এবং যখন এই সত্তার সঙ্গে ব্যক্তিগত সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করা হয় তখনই দর্শনের পরমসত্তা ধর্মের ঈশ্বরে পরিণত হয়। কাজেই দর্শনের পরমসত্তা ও ধর্মের ঈশ্বর এক ও অভিন্ন সত্তা, শুধুমাত্র দুটি ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি থেকে উভয়কে দেখা হয়। দর্শনের পরমসত্তাই ধর্মনিষ্ঠ ব্যক্তির কাছে ধর্মের ঈশ্বর।

অনেকের মতে দর্শনের পরমসত্তাই ধর্মের ঈশ্বর

কিন্তু দর্শনের পরমসত্তাই যে ধর্মের ঈশ্বর, এই অভিমত অনেকে সমর্থন করেননি। কাজেই আমরা এই সম্পর্কে বিভিন্ন অভিমতগুলি বিস্তারিত আলোচনা করব :

আমরা পরমসত্তা (Absolute) সম্পর্কে যেসব মতবাদ প্রথমে আলোচনা করব, সেইগুলি একেশ্বরবাদী বা সর্বেশ্বরবাদী। প্রাচীন গ্রীসের অন্তর্গত ইলিয়ার দর্শন সম্প্রদায়, যারা Eleatics নামে পরিচিত, তাদের দর্শনে সর্বপ্রথম এই পরমসত্তার পরিচয় আমরা পাই। পারমেনাইডিস (*Parmenides*) এই পরমসত্তাকে 'সৎ' (Being) রূপে অভিহিত করেছেন এবং তার নেতিবাচক বর্ণনা দিয়েছেন, যেহেতু তাঁর মতে 'সৎ'-এর কোন সদর্থক বর্ণনা দেওয়া সম্ভব নয়। এই 'সৎ' অবিভাজ্য, অপরিবর্তনীয়, অনাদি, অনন্ত, নিশ্চল ও স্বয়ম্ভূ। এই সৎ' অন্য কোন সত্তার উপর নির্ভরশীল নয়।

ইলিয়ার দর্শন সম্প্রদায়ের 'সৎ'-এর পরিচয়

আধুনিক পাশ্চাত্ত্য দর্শনে দার্শনিক **স্পিনোজা** পরমসত্তার পরিচয় দিতে গিয়ে বলেন যে, **ঈশ্বর এবং পরমসত্তা** (Absolute) **দুই ভিন্ন সত্তা নয়, এক ও অভিন্ন সত্তা**। স্পিনোজার ভাষায় এই পরমসত্তা হল এক অনন্ত, শাশ্বত, স্বয়ম্ভূ নির্বিশেষ দ্রব্য (substance), যিনি ঈশ্বরের সঙ্গে অভিন্ন। স্ব-নির্ভর সত্তা একটি মাত্রই আছে। সান্ত জীব ও সীমিত জড়বস্তু ঈশ্বরের প্রত্যংশ (modes)। সান্ত বস্তুর স্বনির্ভরতা ও স্বাধীনতা এবং কাল, পরিবর্তন, ক্রমবিকাশ, অগ্রগতি, এসবই অস্বাভাবিক বা অলীক বস্তু। এদের কোন যথার্থ সত্তা নেই। এটা স্পষ্ট যে, স্পিনোজার দ্রব্য হল একটা অভেদের নীতি (principle of indentity), ভেদের নয়। কারণ স্পিনোজার দ্রব্য থেকে কোন ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না যে, এক কেন বহুর মধ্য দিয়ে, যে বহু অবভাসিক, নিজেকে প্রকাশ করবে। অসীম কেন সান্ত বহুত্বের মধ্য দিয়ে নিজেকে প্রকাশ করবে? এবং প্রত্যংশ, যাদের যথার্থ সত্তা নেই, তাদের অস্তিত্বই বা আছে কেন?

স্পিনোজার মতে পরমদ্রব্য ও ঈশ্বর অভিন্ন

এক থেকে বহুর এবং এক পরম ঐক্য থেকে বিচিত্র অভিজ্ঞতার জগতের উৎপত্তি কিভাবে হয়েছে, স্পিনোজার দ্রব্য তার কোন নির্দেশ দিতে পারে না। এইজন্যই বলা হয়েছে যে স্পিনোজার দ্রব্য হল একটা সিংহের গুহা, যে গুহার অভিমুখে বহু পদচিহ্ন রয়েছে, কিন্তু যার থেকে কোন পদচিহ্ন বেরিয়ে আসেনি। অবভাসিক জগতের অস্তিত্ব এবং সান্ত বস্তুর সত্তা যদি মিথ্যাও হয়, তাহলেও কেন সেইগুলি মিথ্যা, স্পিনোজা তা ব্যাখ্যা করেননি। স্পিনোজার ঈশ্বর=দ্রব্য=প্রকৃতির অর্থ হল যা বাস্তব, তাছাড়া আর কিছুই সম্ভব নয়, এবং অনিবার্য ছাড়া আর কোন কিছুই বাস্তব নয়। **স্পিনোজার দ্রব্য ভাল-মন্দর কোন পার্থক্য স্বীকার করে না, কারণ যা অস্তিত্বশীল তাই**

ভাল। পাপ, মঙ্গল প্রভৃতি মানুষের অলীক কল্পনা। এদের কোন অস্তিত্ব স্বীকার করা যেতে পারে না, কেননা যাকে আমরা মঙ্গল বলছি তা সমগ্রের উপাদান এবং সমগ্রের পূর্ণতায় (অর্থাৎ অনন্তের সম্পূর্ণতায়) তাদের অবদান রয়েছে, সমগ্রের মধ্যে প্রতিটিই তার যথাযথ স্থানে আবশ্যিক বা অনিবার্য। ব্যক্তিগত স্বাধীনতা, গতি, কাল, এসবের কোন স্থান সেখানে নেই। জ্যামিতিক সত্যের মতন সবই যেন অনন্ত কাল ধরে সম্পূর্ণ হয়ে রয়েছে।

এক থেকে বহুর উৎপত্তির ব্যাখ্যা নেই

স্পিনোজার এই চিন্তাধারার যদিও পরিণতি এক উন্নত অতীন্দ্রিয়বাদ তবু আর এক দিক থেকে বিচার করলে এই চিন্তাধারা নিছক নিসর্গবাদে পরিণতি লাভ করেছে। কারণ তিনি সব লক্ষ্য, উদ্দেশ্য এবং মূল্যকে কঠোর নিয়ন্ত্রণবাদে রূপান্তরিত করেছেন। তিনি ঈশ্বরকে প্রকৃতির সঙ্গে অভিন্ন করে তার চিন্তাধারাকে জড়বাদে পরিণত করেছেন। স্পিনোজার পরম দ্রব্যকে স্বীকার করে নিলে ধর্ম অসম্ভব হয়ে পড়ে। জীবের স্বতন্ত্র সত্তা ও স্বাধীন ইচ্ছা স্বীকার না করলে ধর্মোপাসনা সম্ভব হয় না।

স্পিনোজার দর্শনের ত্রুটি

সাম্প্রতিককালে আর এক ধরনের অদ্বৈতবাদের সঙ্গে আমাদের পরিচয় ঘটে যার সঙ্গে দার্শনিক **হেগেল** (*Hegel*)-এর নাম যুক্ত। সকল ধরনের অদ্বৈতবাদী ভাববাদের সঙ্গে এই চিন্তাধারার এক বিষয়ে মিল আছে। তাহল, এই মতবাদ সান্ত জগৎ এবং সান্ত জীবকে এক সর্বব্যাপী পরমসত্তার প্রকাশ বলে গণ্য করে। কিন্তু অন্যান্য ভাববাদের সঙ্গে এর পার্থক্য হল যে, হেগেল যৌক্তিক ক্রমবিকাশের ধারণাকে (idea of logical development) পরম সত্তার নিছক অস্তিত্বের জন্যই আবশ্যক গণ্য করেছেন। স্পিনোজার দ্রব্য নিশ্চল বা গতিহীন, কিন্তু হেগেলের মধ্যে দেখি পরমসত্তার ধারণার গতিময় আত্মবিবর্তন (dynamic self-evolution)। হেগেল অভেদের নীতির মধ্যেই ভেদের নীতিকে আবিষ্কার করেছেন। পরমসত্তার ঐক্যের মধ্যে এই ভেদের নীতিকে তিনি ধারণার দ্বান্দ্বিক গতির (dialectic movement of concepts) সাহায্যে ব্যাখ্যা করেছেন। হেগেল দেখালেন যে, যে কোন সান্ত ধারণার মধ্যে এক অন্তর্নিহিত বিরোধ আছে, যার জন্য সেটি নিজেকে ছাড়িয়ে এক সঙ্গতি-বিধায়ক নীতির সন্ধানে চালিত হয়। প্রতিটি ধারণাই তার বিরোধী ধারণাকে নির্দেশ করে, যেমন 'জড়' 'অজড়'কে নির্দেশ করে। কিন্তু 'জড়' এবং 'অজড'-এর বিরোধকে স্বীকার করে নিয়ে চিন্তন স্থির থাকতে পারে না। যে অন্তর্নিহিত যুক্তি সদর্থক ধারণা (thesis) থেকে নঞর্থক ধারণায় (antithesis) চালিত হয় সেই যুক্তি উভয়ের সমন্বয়ের (synthesis) ধারণাতেও চালিত হয়। যার

হেগেলের মতবাদ

ফলে বিরোধ মিটে গিয়ে একটি উচ্চতর ঐক্যে উপনীত হয় সেটি হল 'দ্রব্য'। কিন্তু সমন্বয়ে এসে পৌঁছলেই দ্বান্দ্বিক পদ্ধতি শেষ হয় না, সমন্বয়কে আবার একটি সদর্থক ধারণারূপে গ্রহণ করে তার বিরোধী ধারণার সন্ধান করে এবং আরও ব্যাপকতর কোন ধারণায় এদের সমন্বয় হয়। এইভাবে দ্বান্দ্বিক পদ্ধতি ক্রমান্বয়ে এগিয়ে চলতে থাকে। শেষ পর্যন্ত দ্বান্দ্বিক পদ্ধতি পরম সমন্বয়ে (Absolute synthesis) এসে পৌঁছয় যা সব বিরোধ এবং অসঙ্গতির মধ্যে সমন্বয় বা ঐক্য সাধন করে। দ্বান্দ্বিক পদ্ধতির সবশেষে পাই এক পরমসত্তার ধারণা (Absolute thought) যার মধ্যে সব বিরোধই এক ঐক্যের সূত্রে বাঁধা পড়ে।

দ্বান্দ্বিক পদ্ধতির ব্যাখ্যা

জগতের বিবর্তন পরমসত্তার যৌক্তিক আত্ম-বিবর্তনের (logical self-evolution) সঙ্গে অভিন্ন, যার বাইরে কোন কিছু নেই। এই দ্বান্দ্বিক পদ্ধতির মাধ্যমেই পরমসত্তা নিজেকে প্রকাশ ও পরিশেষে উপলব্ধি করে। এই পরমসত্তা নিজের মধ্যে যে বিরোধ নিহিত আছে সেইগুলিকে প্রকাশ করে, সেই বিরোধগুলিকে উচ্চতর সমন্বয়ের মাধ্যমে একীভূত করে এবং এইভাবে এই জগতকে বিবর্তিত করে পরমসত্তা নিজেকে উপলব্ধি করে। **হেগেল তাঁর দর্শনে পরমসত্তাকে ধর্মের ঈশ্বরের সঙ্গে অভিন্ন গণ্য করেছেন**। হেগেলের কাছে দর্শন হল ধর্ম-বিশ্বাসের যথার্থ উপাদানের বিচারবুদ্ধিসম্মত ব্যাখ্যা (rational explanation of the true content of religious faith)। পরমসত্তার সঙ্গে ঈশ্বরের যেটুকু পার্থক্য তা হল, পরমসত্তা শুদ্ধ চিন্তার (pure thought) দ্বারা ব্যাখ্যাত হয়, ঈশ্বর সেই একই সত্তা, যিনি কল্পনা এবং আবেগের মাধ্যমেই উপস্থাপিত হন।

হেগেলের মতে ঈশ্বরই পরমসত্তা

এই মতবাদের নানা ত্রুটি দেখা যায়। একথা সত্য যে হেগেল গতিহীন নিশ্চলতার ধারণাকে বাতিল করে দিয়েছেন এবং অগ্রগতির ধারণার উপর যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করেছেন। কিন্তু তাঁর দর্শনের এক বিশেষ চিন্তাধারা অনুসারে এই অগ্রগতি যৌক্তিক (logical), ঐতিহাসিক নয়। অভিজ্ঞতায় আমরা বস্তুর অন্তরে কোন বাস্তব পরিবর্তন দেখি না, কারণ যে গতির কথা বলা হয়েছে সেই গতি হল দ্বান্দ্বিক। এই সব কিছুরই উদ্ভব হেগেলের একপক্ষীয় বুদ্ধিবাদের থেকে। তার জগৎ হল যৌক্তিক সম্বন্ধের সংগঠন। পরমসত্তার দৃষ্টিভঙ্গি থেকে ইতিহাস এবং কাল সবই মিথ্যা।

হেগেলের মতবাদের ত্রুটি

হেগেলের মতবাদে ব্যক্তির কোন সন্তোষজনক মর্যাদা নেই। ব্যক্তি পরমসত্তার বিশেষণে (mere adjective of the Absolute) পরিণত হয়েছে। পরমসত্তারই

কেবলমাত্র বাস্তবতা আছে। বিশ্বজগৎ একটা নৈর্ব্যক্তিক যৌক্তিক প্রক্রিয়াতে পরিণত হয়েছে। চিন্তন প্রক্রিয়ার যান্ত্রিকতা তার মধ্যে সব মানসিক অন্তর্মুখীতা এবং আধ্যাত্মিক উপাদানকে অন্তর্ভুক্ত করে নিয়েছে।

মানুষ পরমসত্তার দ্বারা চালিত একটি নিষ্ক্রিয় যন্ত্র মাত্র এবং আধ্যাত্মিক কর্ম-প্রচেষ্টায় ঈশ্বরের সক্রিয় সহযোগী বা অংশীদার নয়। পরমসত্তা ব্যক্তিকে নিজের মধ্যে বিলুপ্ত করার ফলে নৈতিক মূল্যের বিলোপ ঘটেছে। পরমসত্তার দিক থেকে দেখলে কোন মন্দ বা পাপের অস্তিত্ব নেই। প্রতিটি জিনিসই তার নিজের স্থানে ভাল।

হেগেল পরমসত্তাকে ঈশ্বরের সঙ্গে অভিন্ন গণ্য করেছেন। কিন্তু হেগেলের এই অভিমত গ্রহণযোগ্য নয়। নৈর্ব্যক্তিক যৌক্তিক প্রক্রিয়ার দ্বারা যে সত্তাতে দেবত্ব আরোপিত হয়েছে, বা যে পরমসত্তা সমস্ত বস্তুর সংহতির সঙ্গে বা মানুষের বিবর্তনের প্রক্রিয়ার সঙ্গে অভিন্ন, এবং যে পরমসত্তা আমাদের 'যা হয়' এবং 'যা উচিত' এই উভয়ের মধ্যে পার্থক্য করার কোন মানদণ্ড দেয় না, তাকে ঈশ্বরের সঙ্গে অভিন্ন গণ্য করা চলে না। আসলে হেগেল ঈশ্বর বা পরমসত্তার দুটি ধারণার মধ্যে ঘোরাফেরা করেছেন। প্রথম ধারণা অনুযায়ী ঈশ্বরই পরমসত্তা যিনি নিশ্চল পূর্ণতার সঙ্গে অনন্তকাল ধরে বিরাজ করছেন। দ্বিতীয় ধারণা অনুসারে তিনি মানুষের প্রগতির প্রক্রিয়ার সঙ্গে অভিন্ন। প্রথম ধারণাটি প্রগতিমূলক ধারণার বিরোধী। দ্বিতীয় মতবাদ যেটি পরমসত্তার ইতিহাসকে মানুষের অগ্রগতির ইতিহাসের সঙ্গে এক করে দেখে—ধর্মের দিক থেকে অসন্তোষজনক, কারণ এই মতবাদ ঈশ্বরের স্বাধীন সত্তা ও স্ব-নির্ভর-অস্তিত্বকে অস্বীকার করে, ঈশ্বরকে মানুষের ঈশ্বর সম্পর্কীয় চিন্তনের সঙ্গে অভিন্ন গণ্য করে এবং মানুষের সঙ্গে ঈশ্বরের সংযোগকে, মানুষের সঙ্গে মানুষের সংযোগ বলে গণ্য করে।

নব্য হেগেলপন্থীদের মতবাদ

এবার আমরা নব্য হেগেলপন্থী দার্শনিকদের মতবাদ আলোচনা করব যারা সকলেই হেগেলের মূল চিন্তাধারার, অর্থাৎ সমগ্র, অংশের মধ্য দিয়েই নিজেকে প্রকাশ করে এবং অংশ সমগ্রের মধ্যে থেকেই তার সত্যতা এবং অর্থ খুঁজে পায়, সমর্থক।

পরমসত্তা সম্পর্কে **ব্রাড্‌লি** (*Bradley*)র মতবাদের, হেগেলের তুলনায় স্পিনোজার মতবাদের সঙ্গেই মিল বেশী। তিনি কালের মধ্য দিয়ে পরমসত্তার আত্মবিকাশের হেগেলীয় নীতি গ্রহণ করেননি এবং কালের সত্যতা সম্পর্কে সংশয় প্রকাশ করেছেন। তাঁর মতে পরমসত্তা কালের সঙ্গে সম্পর্কশূন্য এবং তার কোন ইতিহাস বা অগ্রগতি নেই। যা পূর্ণ, যা যথার্থই বাস্তব, তার কোন গতি থাকতে পারে না।

কিন্তু একটি বিষয়ে ব্রাডলির সঙ্গে স্পিনোজা এবং হেগেলের পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। **তিনি পরমসত্তা ও ঈশ্বরকে অভিন্ন গণ্য করেন নি।** তিনি তাঁদের মধ্যে পার্থক্য করেছেন, তবে তিনি স্বীকার করেছেন যে ঈশ্বর পরমসত্তায় পরিণত হন। তাঁর মতে যদি পরমসত্তাকে ঈশ্বরের সঙ্গে অভিন্ন গণ্য করা হয় তাহলে সে ঈশ্বর ধর্মের ঈশ্বর হবে না, আবার যদি পরমসত্তা ও ঈশ্বরকে পৃথক করা হয় তাহলে ঈশ্বর হবে সমগ্রের মধ্যে একটি সীমিত উপাদান।......তিনি বলেন, 'ঈশ্বর সর্বেসর্বা না হলে ঈশ্বরই হবে না, আর যে ঈশ্বর সর্বেসর্বা সে কখনও ধর্মের ঈশ্বর হতে পারে না। তাঁর মতে পরমসত্তা নির্বিশেষ ও স্ববিরোধমুক্ত এক অখণ্ড ও সুসংহত পরম অভিজ্ঞতা। ঈশ্বর হল পরমসত্তার অবভাস (appearance of the absolute)। ব্রাডলি বলেন, "আমার কাছে পরমসত্তা ঈশ্বর নয়। ধর্ম-চেতনার বাইরে আমার কাছে ঈশ্বরের কোন অর্থ নেই এবং সেটাও বিশেষ করে ব্যবহারিক। পরমসত্তা আমার মতে ঈশ্বর হতে পারে না, কেননা শেষ পর্যন্ত পরমসত্তা কোন কিছুর সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত নয় এবং এই পরমসত্তার সঙ্গে জীবের সসীম ইচ্ছার (finite will) কোন ব্যবহারিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না।"

পরমসত্তা ও ঈশ্বর ভিন্ন

ব্রাডলির মতে ঈশ্বর জীবের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত হওয়াতে জীবের দ্বারা সীমিত, সেইহেতু ঈশ্বর অপূর্ণ। তাছাড়া ঈশ্বরের ধারণা স্ববিরোধমুক্ত নয়। জীবের সঙ্গে ঈশ্বরের অভেদ ও ভেদ, উভয় প্রকার পরস্পরবিরোধী সম্পর্কের ধারণা করা হয়। যখনই পরমসত্তাকে ধর্মের বস্তু করে তোলা হয় এবং তাকে উপাসনা করা হয়, তখনই তার রূপান্তর ঘটে। যে ঈশ্বর পুরুষ, তিনি বিশ্বজগতের পরম সত্য হতে পারেন না। অবশ্য তার অর্থ এই নয় যে, ঈশ্বরের ব্যক্তিত্ব আপেক্ষিকভাবে সত্য নয়। ঈশ্বরের ব্যক্তিত্বের আংশিক মূল্য আছে যেহেতু সাধারণ মানুষের ধর্ম-চেতনাকে এটি পরিতৃপ্ত করে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত পরমসত্তার ধারণাতে উপনীত হতেই হয়। ব্রাডলির মতে পরমসত্তাকে অবশ্যই অতি-পুরুষ (supra-personal) হতে হবে।

পরমসত্তা অতি-পুরুষ

ব্রাডলির উপরিউক্ত অভিমতকে সন্তোষজনক গণ্য করা চলে না। যে পরমসত্তা আসলে সাক্ষাৎ সত্তা নয়, যা তার থেকেও উচ্চতর কোন সত্তার অবভাস, ধর্ম তেমন পরমসত্তাকে উপাসনা করে কখনও পরিতৃপ্ত হতে পারে না। এই অভিমত অনুসারে ঈশ্বরের থেকে উর্ধ্বে কোন সত্তা আছে, এমন ধারণা করতে হয়। তাছাড়া ব্রাডলির ঈশ্বরের তত্ত্ববিজ্ঞানসম্মত মর্যাদা (ontological status) কতটুকু তাও বোঝা যায় না। মনে হয় ঈশ্বরের সত্তা যে-কোন মুহূর্তে পরমসত্তার মধ্যে হারিয়ে যেতে পারে।

কাজেই ব্রাডলির পরমসত্তা হল এক শূন্যগর্ভ, অমূর্ত এবং দুর্বোধ্য পরমসত্তা, যার কোন ইতিহাস নেই, কোন জীবন নেই, কোন গতি নেই, যাকে আমরা সুন্দর, নৈতিক বা সত্য কিছুই বলতে পারি না। ব্রাডলির পরমসত্তার আত্মসঙ্গতি ছাড়া অন্য কোন গুণ আছে কি না আমরা বলতে পারি না।

বোসাঙ্কয়েট (*Bosanquet*) আর একজন খ্যাতনামা অদ্বৈতবাদী। তাঁর মতে যথার্থ পরিপূর্ণ সত্তা একটিই হতে পারে সেটি হল পরমসত্তা (absolute)। **তিনিও পরমসত্তাকে ঈশ্বরের সঙ্গে অভিন্ন গণ্য করেন নি।** তিনি জীবাত্মার স্বাতন্ত্র্যকে এবং ঈশ্বরে তাদের অবস্থিতি স্বীকার করেছেন। কিন্তু তিনি ঈশ্বরের সঙ্গে জীবাত্মার ঐক্যের বিষয়টির উপর এত অধিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন যে তিনি জীবাত্মার স্বাধীন সত্তায় তেমন গুরুত্ব আরোপ করেন নি। বোসাঙ্কয়েটের ঈশ্বর সম্পর্কীয় মতবাদ ধর্মীয় চেতনাকে পরিতৃপ্ত করতে পারে না, যেহেতু ঈশ্বরকে সর্বোচ্চ সত্তারূপে গণ্য করা হয় নি।

বোসাঙ্কয়েটের মতবাদ

সমালোচনা

রয়েস (*Royce*) এবং **হেনরী জোন্স** (*Henry Jones*) এর সঙ্গে অন্যান্য ভাববাদীদের অনেক পার্থক্য থাকলেও হেগেলের সঙ্গে এক বিষয়ে মিল আছে যে, **তাঁরা ঈশ্বরকে পরমসত্তার সঙ্গে অভিন্ন গণ্য করেছেন।**

রয়েস এবং জোন্স-এর অভিমত

উপরিউক্ত পার্থক্য সত্ত্বেও অদ্বৈতবাদী ভাববাদীরা সত্তাকে একটি ঐক্যবদ্ধ আত্মনিয়ন্ত্রিত সমগ্রতা (unified self-determined whole) রূপে, যার সঙ্গে অন্য বিষয়ের আঙ্গিক সম্পর্ক রয়েছে, প্রত্যক্ষ করেন, এবং তাঁরা মনে করেন যে, কোন খণ্ড ও বিচ্ছিন্ন অভিজ্ঞতার সাহায্যে সত্তার প্রকৃতিকে জানা যায় না।

কিন্তু এই দার্শনিক মতবাদ মানবিক এবং ব্যক্তিগত মূল্যের প্রতি ন্যায় বিচার করে না। কেননা, এই মতবাদ মনে করে যে এই সব মূল্য হল খণ্ড বা বিচ্ছিন্ন অভিজ্ঞতা যেগুলি বস্তুর সমগ্রতার মধ্যে এমনভাবে পরিবর্তিত হয়ে গেছে যে তাদের আর চিনে নেওয়া যায় না। এই মতবাদ অনুসারে এই পরমমূল্যগুলি, যেগুলির অভিজ্ঞতা আমরা লাভ করি, পরমসত্তার স্বরূপ ব্যক্ত করতে পারে না। অদ্বৈতবাদী দর্শন জ্ঞানের সংহতিসাধক সূত্ররূপে সমগ্রতার শূন্যগর্ভ আকার (the empty form of totality)-কে গ্রহণ করে এবং অদ্বৈত পরমসত্তার গর্ভে সব সান্ত বস্তু ও ব্যক্তি মিলিয়ে যায়। সার্বিকের মধ্যে থেকেই বিশেষ তার যথার্থ অর্থ খুঁজে পাবে, এটাই যুক্তিযুক্ত। ধর্মের লক্ষ্যই হল ব্যক্তির

মানবিক মূল্যের প্রতি উপেক্ষা

সান্ত জীবনকে অনন্তের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ করে তোলা। কিন্তু ব্যক্তির যে অভিনবত্ব বা স্থায়ী মূল্য আছে, তা থেকে তাকে বঞ্চিত করা চলে না। বরং এটিই হল শর্ত যার উপরে ভিত্তি করে ব্যক্তিবিশেষ জীবনের পূর্ণতা ও প্রাচুর্য লাভ করতে পারে। সর্বোচ্চ ঐক্য একক, আত্মকেন্দ্রীভূত, আত্ম-নিয়ন্ত্রিত অদ্বৈত পরমসত্তার নিশ্চল ঐক্য নয়, এ হল অসংখ্য জীবাত্মার সুসংগঠিত এক চলমান ঐক্য।

সর্বোচ্চ ঐক্য নিশ্চল নয়, চলমান

অদ্বৈতবাদী শঙ্কর (Sankara)-এর ঈশ্বর সম্পর্কীয় ধারণা ব্রাড্‌লির ধারণার অনুরূপ। শঙ্করের মতে ঈশ্বরের ঊর্ধ্বে পরমসত্তা বা ব্রহ্মের স্থান। শঙ্করের মতে ব্রহ্মই একমাত্র পরমসত্তা। ব্রহ্ম নির্গুণ, নির্বিশেষ, নির্বিকল্প, নিরুপাধি ও নিষ্কল। (partless)। ব্রহ্ম অদ্বয়। ঈশ্বর ব্রহ্মের অবভাস। ব্রহ্মেরই একমাত্র যথার্থ সত্তা আছে শঙ্করের মতে সগুণ ব্রহ্মই ঈশ্বর। ঈশ্বরোপাসনার মূলে আছে উপাস্য ও উপাসকের ভেদ। যতক্ষণ পর্যন্ত ব্রহ্মজ্ঞান না জাগে ততক্ষণ পর্যন্ত সগুণ ব্রহ্ম বা ঈশ্বরের পূজা করা হয়। ঈশ্বরোপাসনা ব্যবহারিক দৃষ্টিসম্ভূত। ঈশ্বর উপাসনা নির্গুণ ব্রহ্মোপলব্ধির সোপান। বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী রামানুজ (*Ramanuja*)-এর মতে পরমসত্তা বা ব্রহ্ম এবং ঈশ্বর দুই ভিন্ন সত্তা নয়। তাঁর মতে **ব্রহ্ম** বা **ঈশ্বরই পরমসত্তা**। চিৎ এবং অচিৎ ব্রহ্মের দুই অংশ। অচিৎ অংশ থেকে জড় বস্তু এবং চিৎ অংশ থেকে চেতন জীবের সৃষ্টি। চিৎ এবং অচিৎ-এর কোন স্ব-নির্ভর সত্তা নেই। ব্রহ্মের শরীর রূপেই চিৎ-এর স্বাধীন সত্তা আছে। চিৎ এবং অচিৎ অংশ নিয়ে ব্রহ্ম এক পরম ঐক্য। এই ঐক্যের বহির্ভূত অন্য কোন কিছুর সত্তা নেই। রামানুজের মতে ব্রহ্ম ও ঈশ্বরের মধ্যে কোন প্রভেদ নেই। ঈশ্বর সচেতন পুরুষ। তিনি পুরুষোত্তম বা বাসুদেব বা ভগবান। তিনি জীবের উপাস্য। ঈশ্বর পরম করুণাময়। তিনি ভক্তবৎসল। তিনি ভক্তকে তার বাঞ্ছিত ফলদান করেন। ঈশ্বরপ্রাপ্তিই জীবের লক্ষ্য।

শঙ্করের অভিমত

রামানুজের অভিমত

সগুণ ব্রহ্ম বা ঈশ্বরের কল্পনা এবং ভক্তির মাধ্যমে ভক্তের ঈশ্বর সাক্ষাতকারের কথা বলার জন্য রামানুজের দর্শন সাধারণ মানুষের কাছে অত্যন্ত আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে। কিন্তু জড় দ্রব্য ও জীবাত্মার সঙ্গে ব্রহ্মের সম্পর্ক রামানুজ যুক্তিযুক্তভাবে ব্যাখ্যা করতে পারেননি।

বহুত্ববাদী মতবাদগুলি মনে করে যে, এই জগতের বহুত্ব এবং বৈচিত্র্যকে একটি-মাত্র নীতির সাহায্যে ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়। স্পিনোজার অদ্বৈতবাদের প্রতিক্রিয়া

স্বরূপ বহুত্ববাদী লাইবনিজের মনাদবাদ (Monadism) বা চিৎপরমাণুবাদের উদ্ভব।

বহুত্ববাদী মতবাদের বৈশিষ্ট্য

স্পিনোজার এক অসীম দ্রব্যের পরিবর্তে লাইবনিজ আমাদের দিলেন অসংখ্য স্বনির্ভর সসীম চেতন দ্রব্য। লাইবনিজের মতে যা কিছু সত্তাবান তার আদিম উপাদান হল মনাদ (Monad) বা চিৎপরমাণু। মনাদ সক্রিয়, অবিভাজ্য ও অজড়াত্মক বা আধ্যাত্মিক, স্পিনোজার দ্রব্য এক ও অসীম। লাইবনিজের দ্রব্য বিশেষ ও সংখ্যায় অনন্ত।

লাইবনিজের ঈশ্বর সম্পর্কীয় ধারণা

লাইবনিজের মতে ঈশ্বর হলেন সর্বোচ্চ মনাদ। তিনি হলেন মনাদের মনাদ (Monad of Monads)। ঈশ্বরই মনাদ সৃষ্টি করেছেন এবং গবাক্ষবিহীন আত্মকেন্দ্রিক চিৎপরমাণুগুলির মধ্যে একটি পূর্বপ্রতিষ্ঠিত শৃঙ্খলা (pre established harmony) স্থাপন করেছেন। তার জন্যই এই জগৎ সুশৃঙ্খল, সুসংবদ্ধ, সুষম, কলাকৌশলপূর্ণ এক পরম ঐক্য। কাজেই দেখা যাচ্ছে, কোন ঐক্যের পটভূমিকা ছাড়া নিছক বহুত্ববাদ বোধগম্য নয়। চিৎপরমাণুগুলি যদি ঈশ্বরের দ্বারা পূর্ব থেকে নিয়ন্ত্রিত হয়, তাহলে এদের প্রকৃতপক্ষে পরম দ্রব্য বা মৌলিক তত্ত্ব বলে গণ্য করা যায় না।

পরবর্তী বহুত্ববাদীরা লাইবনিজের পূর্বপ্রতিষ্ঠিত শৃঙ্খলাবাদ বর্জন করলেন এবং সান্ত জীবাত্মার মধ্যে প্রত্যক্ষ ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার সম্ভাবনা যা লাইবনিজ অস্বীকার করেছিলেন, তাকে স্বীকার করে নিলেন। জেম্‌স (*James*), ওয়ার্ড (*Ward*), র‍্যাসডল (*Rashdall*), ম্যাকটাগার্ট (*McTaggart*), শিলার (*Schiller*), হাওয়িসন (*Howison*) এ. জি. বেলফোর (*A. G. Balfour*) প্রমুখ বহুত্ববাদিগণ মনে করেন **ঈশ্বর ও পরমসত্তা এক ও অভিন্ন নয়,** তাদের মতে ঈশ্বর সসীম, অপরপক্ষে পরমসত্তা ঈশ্বর এবং অন্যান্য সসীম বস্তু ও জীবাত্মার সমষ্টি বা সংগঠন। পরমসত্তা ঈশ্বরের তুলনায় উচ্চতর সত্তা। ঈশ্বরকে সান্ত মনে করার এক প্রবণতা আধুনিক বহুত্ববাদীদের মধ্যে দেখা গেল। এই মতবাদের একজন পুরোধা হলেন উইলিয়ম জেমস (*William James*)। জেমসের মতে

জেম্‌স-এর মতবাদ

এই জগৎ বহু বস্তুর সমষ্টি, পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত হয়ে এরা কোন ঐক্য গঠন করেনি। এই জগৎ এক নয়, বহু বা অজস্র (It is not universe, but a multiverse); এই জগৎ কোন বদ্ধ জগৎ (block universe) নয় এবং অতিমানবীয় চেতনা, যত ব্যাপকই হোক না কেন, সান্ত। যদি কোন পরমসত্তা থাকে, তবে তাকে ধর্মের ঈশ্বরের সঙ্গে একক গণ্য করা যুক্তিসঙ্গত নয়।[1] জেম্‌সের মতে ধর্মের ঈশ্বর এক অতিমানবীয়

1. William James : A Pluralistic Universe ; Pages 34, 79, 321, 310

সত্তা যাকে এক বাহ্য পরিবেশে কাজ করতে হয়, যার সীমা আছে এবং শত্রু আছে……। ঈশ্বরের অতিরিক্ত কোন অদ্বৈত সত্তার অস্তিত্ব যদি থাকে, তাহলে সেই সত্তা হল ব্যাপকতর জাগতিক সমগ্রতা, ঈশ্বর যার সবচেয়ে আদর্শস্থানীয় বিন্দু (most ideal point)। এই বিশ্বের অন্যান্য ক্ষুদ্র অংশের ক্রিয়ার সঙ্গে ঈশ্বরের ক্রিয়ার মিল আছে।

এইচ. জি. ওয়েল্‌স (*H. G. Wells*)-ও ঐ একই অভিমত ব্যক্ত করেছেন এই বলে যে, 'ঈশ্বর পরমসত্তা নয়, ঈশ্বর সান্ত।' প্রয়োগবাদী দার্শনিক শিলার (*Schiller*)-ও নানা উল্লেখযোগ্য ভাবে সান্ত ঈশ্বরের ধারণা ব্যক্ত করেছেন। [1]শিলারের (*Schiller*) মতে যে অসংখ্য সান্ত উপাদানের দ্বারা জগৎ গঠিত, ঈশ্বর সেই বহু উপাদানের অন্যতম (one of the plural factors of which the universe is made)। তিনি ঈশ্বরের অসীমত্বের বিরোধী। ঈশ্বর পুরুষ, তবে ঈশ্বর পুরুষদের অগ্রগণ্য। জ্ঞান, শক্তি, চেতনা তাঁর মধ্যে সর্বাধিক পরিমাণে বর্তমান। অধ্যাপক হাওয়িসন[2] (*Howison*)-এর মধ্যেও ঈশ্বরকে পরমসত্তা থেকে প্রভেদ করার এক প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। হাওয়িসন মনে করেন যে, পরমসত্তা (Absolute) বহুত্ববর্জিত, কিন্তু যেহেতু এই জগতে বহু জীবাত্মার অধিষ্ঠান, তাই জগতের মূল তত্ত্ব বহুত্ব বর্জিত পরমসত্তা হতে পারে না। তাঁর মতে ঈশ্বর পুরুষ কিন্তু ঈশ্বর যেহেতু জাগতিক ও নৈতিক সব বিবর্তনের আশ্রয় এবং জীবাত্মার পরিণতি কারণ (final cause) রূপে ক্রিয়া করে, সেইহেতু শিলারের ঈশ্বরের মত সান্ত নন। তাঁকে ভাববাদীদের পরমতত্ত্বরূপে গণ্য করা উচিত। কিন্তু তিনি ঈশ্বরের যে বর্ণনা দিয়েছেন তাতে ঈশ্বর কোন আধিবিদ্যক তত্ত্ব (metaphysical reality) না হয়ে একটি যৌক্তিক ও পরিণামী উদ্দেশ্যমূলক নীতি (logical and teleological principle)-তে পরিণত হয়েছেন।

এইচ. জি ওয়েলেস্-এর অভিমত

শিলারের অভিমত

হাওয়িসনের অভিমত

র‍্যাসডল[3] (*Rashdall*)-ও ঈশ্বর ও পরমসত্তার মধ্যে প্রভেদ করেছেন এবং ঈশ্বরকে এক সান্ত পুরুষসত্তা রূপে গণ্য করেছেন। তাঁর মতে চেতনার ঐক্য রূপে (unity of consciousness) ঈশ্বর অস্তিত্বশীল যিনি ব্যক্তি-চেতনার ঐক্য বিধান করেন (unifying individual consciousness)। কিন্তু তাঁর দ্বারা প্রমাণিত হয় না যে ঈশ্বর পরমসত্তার সঙ্গে অভিন্ন, বরং ঈশ্বর ও জীবাত্মা পরমসত্তার অন্তর্ভুক্ত. ঈশ্বর পরমসত্তার অবভাস (appearance)। পুরুষ

র‍্যাসডলের অভিমত

---

1. Cf Schiller : Riddles of Sphinx : Pages 306-307
2. Howison-এর 'Limits of Evolution' গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।
3. Rashdall এর 'Personal Idealism' এবং "Theory of Good and Evil" রচনাগুলি দ্রষ্টব্য।

হওয়ার জন্য, তিনি সীমিত। তিনি অন্য জীবাত্মার দ্বারা সান্ত ও সীমিত। কিন্তু এই সান্তত্ব কোন বাহ্য কিছুর দ্বারা ঈশ্বরে আরোপিত নয়, তাঁর নিজের ইচ্ছা থেকে উদ্ভূত।

এ. জি. বেলফোর[1] (*A. G. Balfour*) ধর্মের ঈশ্বর ও দর্শনের পরমসত্তার মধ্যে প্রভেদ করেন। তাঁর মতে ঈশ্বরবাদ এবং অদ্বৈতবাদ পরস্পরবিরোধী এবং অদ্বৈতবাদী ঈশ্বরের ধারণা ধর্মের পক্ষে হানিকর। ঈশ্বরকে পুরুষরূপে গণ্য না করে ধর্ম পরিতৃপ্ত হতে পারে না। ধর্ম চায় ঈশ্বরের সঙ্গে জীবাত্মার ব্যক্তিগত সম্পর্ক থাকবে, জীবের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক হবে প্রেমের এবং পূজার। ঈশ্বর হবেন সত্য, শিব ও সুন্দর, এই মূল্যগুলির ঐক্য। সকল রকম বিভেদ, বৈচিত্র্য ও বহুত্ব বর্জিত ঈশ্বরের ধারণা করার অর্থ তাকে অ-পুরুষ গণ্য করা। কাজেই ঈশ্বরকে পুরুষ হতে হবে এবং ব্যক্তিত্বের যে বর্ণনা তিনি দিয়েছেন, তাতে তিনি সান্ত (finite) হবেন। তবে তিনি হলেন এক বৃহত্তর সান্ত সত্তা (big finite), সাধারণ সান্ত জীবের থেকে যিনি বৃহত্তর।

এ জি. বেলফোরের অভিমত

জেম্‌স ওয়ার্ড (*James Ward*)-এর মতে অভিজ্ঞতায় বহু বস্তুরই সাক্ষাৎ পাওয়া যায়, কোন অদ্বৈত পরমসত্তার সাক্ষাৎ পাওয়া যায় না। জগৎকে ঐক্যবদ্ধ করার জন্য এবং কাল, ইতিহাস ও প্রগতিকে অর্থপূর্ণ করার জন্য ঈশ্বরের ধারণার প্রয়োজন আছে। কাজেই ওয়ার্ডের অভিমত অনুযায়ী ঈশ্বরবাদের দ্বারা সম্পূরিত বহুত্ববাদই (Pluralism supplemented by theism) যথার্থ মতবাদ। বহুত্ববাদীদের মতে পরমসত্তা হল নৈর্ব্যক্তিক (impersonal) ঐক্য; অপরপক্ষে ঈশ্বর, জীবাত্মা ও জড় সকলের স্বতন্ত্র সত্তা আছে এবং এদের সমষ্টি হল পরমসত্তা, কিন্তু পরমসত্তার সামগ্রিকতা, উপাদানগুলির সুসংহত সুবিন্যস্ত ঐক্য নয়, নিছক স্বাধীন বস্তু বা উপাদানগুলির সমষ্টিমাত্র।

জেম্‌স ওয়ার্ডের অভিমত

বহুত্ববাদীদের মূল বক্তব্য

এক অদ্বৈত সর্বব্যাপক পরমসত্তার ধারণার বিরুদ্ধে বহুত্ববাদীদের অভিযোগ অহেতুক নয়। অদ্বৈতবাদকে এমনভাবে পরিবর্তিত করা প্রয়োজন যাতে জীবাত্মার অধিকার ও মূল্য এবং এই জগতে তার উদ্দেশ্যমূলক কর্ম করার সুযোগ অক্ষুণ্ণ থাকে। ধর্ম-চেতনার এবং প্রকৃত দর্শনের এমন একজন ঈশ্বরের প্রয়োজন যিনি তার উদ্দেশ্য

1. A. C. Balfour-এর 'Theism and Humanism' এবং 'Philosophical Doubt and Foundations of Belief' গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

পরিপূরণের জন্য সান্ত জীবের স্বাধীন সহযোগিতাকে স্বাগত জানাবেন, এবং এমন কোন সর্বশক্তিমান ঈশ্বরকে স্বীকার করে নেবে না, যার সর্বশক্তিমত্তা জীবাত্মাকে এই জগতে তার স্বাধীন ইচ্ছায় কোন সুযোগ দেবে না এবং এও সত্য যে মানুষের সঙ্গে ঈশ্বরের সম্পর্ক এক সান্ত সত্তার সঙ্গে অপর সান্ত সত্তার সম্পর্কের পরিপ্রেক্ষিতে ব্যাখ্যাত হতে পারে না। ঈশ্বরের ক্রিয়াকে সান্ত জীবের ক্রিয়ার সমতুল্য মনে করা ঈশ্বরের ঈশ্বরত্বের হানি করা, ঈশ্বরের অভিনবত্বকে অস্বীকার করা, যে অভিনবত্বকে ধর্ম-অভিজ্ঞতার ও বিশ্বজগতের বৌদ্ধিক ব্যাখ্যার জন্য অবশ্যই স্বীকার করে নিতে হয়।

ঈশ্বরের ক্রিয়া সান্ত জীবের ক্রিয়া নয়

বহুত্ববাদীদের অভিমতগুলির সমালোচনায় বলা যেতে পারে যে, অভিমতগুলি বিচার করলে দেখা যাবে যে, ঈশ্বর ও পরমসত্তা সম্পর্কে তাঁদের ধারণাগুলি ত্রুটিমুক্ত নয়। তাঁরা আধুনিক মানবীয় দাবীর উপর অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন এবং যুক্তি ও বিচারের মূল্যকে অগ্রাহ্য করেছেন। যে বিষয়টি শিলার এবং বেলফোরের দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে তাহল, মানুষের ধর্ম ঈশ্বরকে তার নিজের প্রতিরূপে তৈরি করে, তাকে সকল কিছুর উৎস বা সৃজনমূলক সমন্বয় (creative synthesis) রূপে কল্পনা করতে পারে না; পরমসত্তা-রূপে ঈশ্বরকে ধারণা করলেই তা সম্ভব। অধ্যাপক হাওয়িসন পুরুষ হিসেবে ঈশ্বরের ধারণা ও পরমসত্তা হিসেবে ঈশ্বরের ধারণা এই উভয়কে গুলিয়ে ফেলেছেন। ঈশ্বর যদি হন প্রতিটি জীবাত্মার অনিবার্য পূর্ব-শর্ত, সব বিবর্তনের কারণ, তাহলে ঈশ্বর অসংখ্য স্বাধীন ব্যক্তিসত্তার মধ্যে অন্যতম ব্যক্তিসত্তা হতে পারেন না। তিনি অবশ্যই পরমসত্তা হবেন। হাওয়িসন এবং রাসডল উভয়েই এক ভ্রান্ত পরমসত্তার ধারণা করেছেন। এক ও বহুর অসঙ্গতির ভীতিই এর কারণ। তাঁরা ঈশ্বরকে পুরুষ ও সান্ত গণ্য করাতে, ঈশ্বর সান্ত মানব সত্তায় পরিণত হয়েছে। ঈশ্বরকে সব কালিক সম্বন্ধের ঊর্ধ্বে গণ্য করতে হবে, যে কালিক সম্বন্ধ জাগতিক বস্তু ও ঘটনা সম্পর্কে সত্য এবং যারা ঈশ্বরের অন্তর্ভুক্ত। অমূর্ত ঐক্যরূপে পরমসত্তাকে মূর্ত পুরুষরূপে ঈশ্বরের থেকে প্রভেদ করার প্রবণতা মানুষের বিচারশক্তির দেউলিয়া হওয়ারই সামিল।

বহুত্ববাদীদের অভিমতের সমালোচনা

ঈশ্বর ও পরমসত্তা কি অভিন্ন? যদি পরমসত্তা বলতে সত্তার সমষ্টিগত সমগ্রতাকে বোঝায়, তাহলে ঈশ্বর এবং পরমসত্তা অভিন্ন হবে না। কেননা এমন বাস্তব সত্তা বা ঘটনা আছে যা ঐশ্বরিক প্রকৃতির প্রকাশক নয়, এমন ঘটনা ও ক্রিয়া আছে যা তাঁর উদ্দেশ্যের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। কাজেই ঈশ্বর বস্তুর সমগ্রতার সঙ্গে অভিন্ন হতে পারেন না। যদি পরমসত্তাকে সর্বোচ্চ সত্তা রূপে গণ্য করা হয়, যে সত্তা

পরমশক্তিরূপে সব কিছুকে ধারণা করে আছে, সব মূল্য ও আদর্শের উৎস, সব কিছুর চরম লক্ষ্য, তাহলে ঈশ্বরই পরমসত্তা, যে ঈশ্বর ভক্তের উপাস্য। যে সত্তা পরমসত্তা নয় সেই সত্তা কখনও ভক্তের উপাস্য ঈশ্বর হতে পারে না, বা জগতের দার্শনিক ব্যাখ্যায় মূলতত্ত্ব রূপে স্বীকৃতি লাভ করতে পারে না। বস্তুতঃ এই ঈশ্বরের বাইরে তাঁর সত্তা বা ইচ্ছা-নিরপেক্ষ কোন কিছুর অস্তিত্ব নেই। সান্ত জীবের স্বাধীনতা ঈশ্বর কর্তৃক জীবকে প্রদত্ত সীমিত স্বাধীনতা। যদি তাতে সিদ্ধান্ত করা হয় যে, ঈশ্বর সীমিত হয়ে গেছেন, তাহলে তা হবে ঈশ্বরের স্বেচ্ছায় নিজেকে সীমিত করা। আর যদি মনে করা হয় যে, ঈশ্বর এইভাবে নিজেকে সীমিত করতে পারেন না, তাহলে আমাদের এইরূপ ধারণার অর্থ হবে ঈশ্বরের ক্ষমতাকে সীমিত মনে করা।

কোন অর্থে ঈশ্বর পরমসত্তা ?

কাজেই ঈশ্বর সবকিছু থেকে বিচ্ছিন্ন সর্বনিরপেক্ষ অদ্বৈতবাদীদের কোন পরমসত্তা নয়। ঈশ্বর এক প্রাণবন্ত সত্তা, যে সত্তা কাল ও ইতিহাসের পরিবর্তনের সঙ্গে গভীর সম্পর্কে সম্পর্কযুক্ত।

২। ঈশ্বর কি পুরুষ? (Is God a person) :

ঈশ্বর কি পুরুষ? ধর্মদর্শনের পক্ষে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। প্রশ্নটি গুরুত্বপূর্ণ এই কারণে যে, ঈশ্বরকে পুরুষরূপে গণ্য না করলে ঈশ্বর ভক্তের উপাস্য বস্তু হতে পারে না। সে, কারণেই এই প্রশ্ন করা হয় যে, ধর্মের ঈশ্বর কোন অচেতন দ্রব্য, না কোন আত্মা যে জানে, যে ইচ্ছা করে, যে ভালবাসে? ব্যক্তির সঙ্গে বস্তুর পার্থক্য আছে। ব্যক্তি ব্যক্তিকে ভক্তি করতে পারে কিন্তু কোন বস্তুকে নিছক বস্তু জেনে ভক্তি করতে পারে না। ধর্মের ক্ষেত্রে কোন বস্তুকে যদি উপাস্য বা ভক্তির বস্তু হতে হয় তাহলে তাকে নিছক বস্তু না হয়ে বস্তুর অধিক কিছু হতে হবে।

নিছক বস্তু ধর্মের উপাস্য বস্তু হতে পারে না

কাকে পুরুষ বলা যেতে পারে? ব্যক্তি বা পুরুষের আত্মনিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা আছে। পুরুষ যন্ত্রের মতন অন্য কোন কিছুর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় না। পুরুষের ইচ্ছার স্বাতন্ত্র্য আছে। কোন পুরুষই চায় না যে তাকে বস্তু হিসেবে গণ্য করা হোক। পুরুষ বলতে কি বোঝায়? যে আত্মসচেতন জীব নিজের উদ্দেশ্যসম্পর্কে সচেতন এবং নিজেকে নিয়ন্ত্রিত করতে ক্ষমতাসম্পন্ন, তিনিই পুরুষ। আত্মসচেতনতা এবং আত্মনিয়ন্ত্রণের ক্ষমতাই ব্যক্তিত্বের মূল ভিত্তি। ব্যক্তি এক ক্রমবিকাশের ফল। শিশুকে ব্যক্তি গণ্য করা চলে না। আবার সভ্য ব্যক্তি বর্বর অসভ্য ব্যক্তিরেও

যথার্থ ব্যক্তিরূপে গণ্য করতে সম্মত হবে না। আসলে ব্যক্তি ইচ্ছা ও অনুভূতির এক স্বতন্ত্র কেন্দ্ররূপে জীবন শুরু করে এবং ধীরে ধীরে উপযুক্ত পরিবেশে পরিপূর্ণ ব্যক্তিত্বের অধিকারী হয়। স্বাতন্ত্র্যবোধ (individuality) হল ভিত্তি, যার উপর নির্ভর করে ব্যক্তিত্বের ক্রমবিকাশ ঘটে। কাজেই কোন মানুষকে ব্যক্তি বা পুরুষ গণ্য করার পূর্বে তাকে এক বিশিষ্ট সত্তা হিসেবে গণ্য করতেই হবে।

পুরুষের বৈশিষ্ট্য

ব্যক্তির সঙ্গে সামাজিক এবং নৈতিক উপাদানের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। প্রশ্ন হল, যে সত্তা ব্যক্তি-জীবনের শর্তগুলির অতীত, তার ক্ষেত্রে 'পুরুষের ধারণা' প্রয়োগ করা যেতে পারে কি? অনেকের মতে পুরুষের ধারণা ঈশ্বরের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হলে ঈশ্বরে মনুষ্যত্বের আরোপ করা হবে। তাছাড়া এই সিদ্ধান্ত করা হয় যে, যেসব উপাদানে ব্যক্তি গঠিত সে-সব উপাদানের সঙ্গে ঈশ্বরের প্রকৃতির কোন সম্পর্ক নেই। ঈশ্বরকে মানুষের মতন সামাজিক সম্পর্কের কেন্দ্র গণ্য করা চলে না। কাজেই কারও কারও মতে ঈশ্বরকে পুরুষ গণ্য করা চলে না। ঈশ্বরের অতিবর্তীতাই এই ধারণাকে স্বীকার করে নেওয়ার পক্ষে বাধাস্বরূপ। তাছাড়া মানুষের ব্যক্তিত্বের সীমা আছে, যা ঈশ্বরের থাকতে পারে না। কাজেই এইদিক থেকে ঈশ্বরকে মানুষের মাপকাঠিতে বিচার করা চলে না। ঈশ্বর অতিমানবীয় (superpersonal)। আবার অপরপক্ষে ঈশ্বর যাই হোন না কেন, যদি তাঁকে ব্যক্তিগত শ্রদ্ধা ভালবাসার বস্তু হতে হয়, তিনি অবশ্যই হবেন এক আত্মসচেতন পুরুষ এবং আত্মনিয়ন্ত্রিত ইচ্ছা। আত্মসচেতন ও আত্ম-নিয়ামক সত্তারূপে ঈশ্বরকে যদি পুরুষ গণ্য না করা হয়, তাহলে মানুষের মধ্যে ধর্মচেতনার অগ্রগতিকে নিছক অলীক গণ্য করতে হবে। প্রায় সবধর্মই ঈশ্বরকে পুরুষ গণ্য করে তাতে বিশ্বাস স্থাপন করেছে। ঈশ্বরকে যখন পুরুষরূপে ধারণা করা হয়, তখন বুঝতে হবে যে ঈশ্বর হল তুমি (Thou) বা সে (He), ইহা (It) নয়। ঈশ্বরকে পুরুষ বলে অভিহিত করলে ঈশ্বরে নরত্ব আরোপ করা হয় এই কথা যাঁরা বলেন, তাঁদের দিকে তাকিয়ে অনেক ধর্মবিজ্ঞানী ঈশ্বরকে পুরুষ (Person) না বলে 'পুরুষোচিত' (Personal) বলার পক্ষপাতি। জন হিক (*John Hick*) বলেন, "ঈশ্বর পুরুষোচিত। এই বিবৃতি যে তাৎপর্য সূচিত করছে তা হল, ঈশ্বর কমপক্ষে পুরুষোচিত (God is at least personal); ঈশ্বর আমাদের ধারণার অতীত হতে পারেন কিন্তু তিনি পুরুষের কম কিছু নন্ (no tless than personal)। মানুষের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের ক্ষেত্রে তিনি ইহা নন্. তিনি

পরমসত্তাকে পুরুষ গণ্য করা চলে না আবার ঈশ্বর পুরুষ না হলে উপাস্য হতে পারেন না

জন হিকের ব্যাখ্যা

সর্বদাই এক মহান অতীন্দ্রিয় তুমি (not a mere It in relation to man, but always the higher and transcendent Thou)।

ঈশ্বরকে ভক্তি শ্রদ্ধার বস্তু মনে করতে হলে ঈশ্বরকে পুরুষরূপে গণ্য করা ধর্মের পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয় বিষয়। **প্রশ্ন হল, দর্শনের পক্ষে ঈশ্বরের পুরুষ হবার দাবীকে স্বীকার করে নেওয়া চলে কি?** ঈশ্বর যে পুরুষ, দর্শন কি তা প্রতিষ্ঠা করতে পারে?

ঈশ্বর পুরুষ, দর্শন এই দাবী সমর্থন করতে পারে কি?

এই সম্পর্কে দার্শনিকদের মধ্যে মতভেদ লক্ষ্য করা যায়। বামপন্থী হেগেলীয় দার্শনিকবৃন্দ যেমন বিয়ার্ডম্যান (*Bierdman*), ভন্ হার্টম্যান (*Von Hartman,*) ব্রাড্‌লি (*Bradley*), বোসাংকোয়েট (*Bosanquet*) প্রভৃতি ব্যক্তিগণ ঈশ্বরকে পুরুষ গণ্য করার বিরুদ্ধে অভিমত ব্যক্ত করেছেন। তাঁদের মতে পুরুষের ধারণার সঙ্গে তুলনা ও বিরোধিতার ধারণা যুক্ত। পরমসত্তা (Absolute) সব সম্বন্ধ ও বিরোধিতার ঊর্ধ্বে এবং পরমসত্তার মধ্যে সব সম্বন্ধ ও বিরোধিতার সুষম সমন্বয় ও সামঞ্জস্য ঘটেছে। যদিও পুরুষ পরমসত্তার অন্তর্ভুক্ত, পরমসত্তা পুরুষ নয়। কিন্তু তবু পরমসত্তা আধ্যাত্মিক।

বামপন্থী হেগেলীয় দার্শনিকবৃন্দের অভিমত

দক্ষিণপন্থী হেগেলীয় দার্শনিকবৃন্দ ঈশ্বরকেই পরমতত্ত্বরূপে গণ্য করে এবং ঈশ্বরকে পুরুষ বলে অভিহিত করে। লোট্‌জা (*Lotze*) অন্য একটি দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বলেন, পরমসত্তারূপে ঈশ্বরই পরিপূর্ণ পুরুষ। কিন্তু মানুষকে যখন পুরুষ বলে অভিহিত করা হয় তখন পুরুষরূপী মানুষ ঈশ্বরের খণ্ডিত এবং অপূর্ণ প্রতিরূপ। লোট্‌জার মতে সান্তত্ব পৌরুষত্ব নিরূপণ করে না, বরং পৌরুষত্বের পরিপূর্ণ প্রকাশকে সীমিত করে। কেননা সান্তত্বই অপূর্ণতা। লোট্‌জার মতে অসীম এবং পরমসত্তাই হল পূর্ণ পুরুষ। এ সম্পর্কে দার্শনিক র‍্যাসডল-এর অভিমত লোট্‌জার বিরুদ্ধ অভিমত। তাঁর মতে অসীম সত্তার পক্ষে পুরুষ হওয়া সম্ভব নয়। ঈশ্বরই পুরুষ। দার্শনিক শিলার (*Schiller*) এর মতে ঈশ্বর পুরুষ, যেহেতু ঈশ্বরের মধ্যে বুদ্ধি, শক্তি ও চেতনা সর্বাধিক মাত্রায় বর্তমান, তিনি পুরুষের মধ্যে অগ্রগণ্য। অধ্যাপক হাওয়িসনও (*Howison*) ঈশ্বরকে পুরুষ রূপে গণ্য করেন। এ. জি. বেলফোর (*A, G. Balfour*) মনে করেন যে, ঈশ্বরকে পুরুষ গণ্য না করলে ধর্ম-চেতনা কখনও পরিতৃপ্ত হতে পারে না। পুরুষ হিসেবে ঈশ্বরের সঙ্গে জীবের সম্পর্ক প্রেম ভালবাসার সম্পর্ক। ঈশ্বর জীবের উপাসনা ও পূজার বস্তু। শঙ্করের মতে

দক্ষিণপন্থী হেগেলীয় দার্শনিকবৃন্দ

শিলার, হাওয়িসন, বেলফোর রামানুজ-এর মতে ঈশ্বর পুরুষ

নির্বিশেষ, নির্গুণ, ব্রহ্মেরই শুধুমাত্র সত্তা আছে। ঈশ্বরোপাসনা ব্যবহারিক দৃষ্টিসম্ভূত। সগুণ ব্রহ্মই ঈশ্বর। রামানুজের মতে ব্রহ্ম ও জীবের উপাস্য ঈশ্বর এক। ব্রহ্ম সবিশেষ এবং সগুণ। ব্রহ্ম হলেন অসংখ্য সদগুণের আধার। তিনি পুরুষোত্তম, তিনি সচেতন পুরুষ।

উপরিউক্ত অভিমতগুলি যদি বিচার করে দেখা যায় তাহলে দেখা যাবে যে, পরমসত্তা পুরুষ এই ধারণাকে সমর্থন করা চলে না। লোট্‌জা যে পরমসত্তাকে পুরুষ গণ্য করেছেন তাঁর সেই অভিমত ত্রুটিপূর্ণ। তাঁর মতবাদে আধিবিদ্যক (metaphysical) দিকের সঙ্গে নৈতিক (moral) দিকের কোন সঙ্গতি নেই: আধিবিদ্যক দিক থেকে সব সত্তাকে এক পরমসত্তা বা ঈশ্বরের অংশ রূপে গণ্য করা হয়েছে। আবার নৈতিক দিক থেকে জীবাত্মার ঈশ্বর বহির্ভূত অস্তিত্বের দাবী করা হয়েছে। কাজেই দেখা যাচ্ছে যে, সব অন্তর্ভুক্তিকর ঈশ্বরের ধারণা বর্জন করেই আমরা বিচার করতে পারি, ঈশ্বর পুরুষ কি পুরুষ নয়। ধর্মের ঈশ্বরকে অস্তিত্বের পরম আশ্রয় এবং সৃজনমূলক আত্মারূপে অবশ্যই গণ্য করতে হবে। কিন্তু এই ঈশ্বরকে পুরুষ গণ্য করলে ঈশ্বরের অসীমত্বের হানি ঘটবে কিনা তা বিচার করে দেখা দরকার।

লোট্‌জার অভিমতের ত্রুটি

প্রথমতঃ, পুরুষের ধারণার সঙ্গে আত্ম-সচেতনতার ধারণা যুক্ত। যিনি পুরুষ তিনি আত্মসচেতন (self-conscious)। আত্মসচেতনতার ধারণা আত্মা ও অনাত্মার পারস্পরিক তুলনা ও বিরোধের উপর নির্ভরশীল এবং এই অবস্থা মানুষের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হলেও ঈশ্বরের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। কারণ ঈশ্বর পরনির্ভর ও ক্রমবিকাশমান সত্তা নয়, ঈশ্বর ঈশ্বর-বহির্ভূত কোন কিছুর দ্বারাই প্রতিহত হন না। ঈশ্বর হল মূল সত্তা, অন্যান্য অস্তিত্বশীল সত্তা যার উপর নিরবচ্ছিন্নভাবে নির্ভর। ঈশ্বরের আত্ম-সচেতনতা অন্তঃস্থিত, তা বিবর্তিত হয় না। কিন্তু একথা কি বলা যেতে পারে যে, এক আত্মসচেতন ইচ্ছার অস্তিত্ব আছে যা নিজের সঙ্গে ছাড়া অন্য কোন কিছুর সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত নয়? লোট্‌জা (*Lotze*) এই প্রশ্নের সদর্থক উত্তর দিয়েছেন। লোট্‌জার মতে ব্যক্তি বিশেষের আত্মসচেতনতা আত্মা ও অনাত্মার পার্থক্যের উপর নির্ভরশীল নয়, বরং আত্মা ও অনাত্মার পার্থক্যই ব্যক্তির আত্মা সম্পর্কে এক মৌলিক চেতনার উপর নির্ভর।

কি অর্থে ঈশ্বর আত্ম-সচেতন

লোটজার মতে আত্ম-অনুভূতির মধ্যে আত্মার ধারণা নিহিত আছে এবং এই মৌলিক আত্ম-অনুভূতি আত্ম-স্বীকৃতির (self-recognition) প্রাথমিক উৎস। এই আত্ম স্বীকৃতিই অনাত্মার সংজ্ঞা নিরূপণ সম্ভব করে তোলে, আত্ম-স্বীকৃতি আত্মা ও

অনাত্মার সম্বন্ধের স্বীকৃতির উপর নির্ভরশীল নয়। কাজেই 'আত্মসচেতনতা' ঈশ্বরের ক্ষেত্রে আরোপিত হতে পারে এবং সেইহেতু ঈশ্বর এক পূর্ণ পুরুষ। সান্ত বস্তুর অস্তিত্বের শর্ত তার নিজের মধ্যে নিহিত নয়। কিন্তু ঈশ্বর ঈশ্বরবহির্ভূত কোন কিছুর উপর নির্ভর নয়। ঈশ্বর নিজেতে এবং নিজের জন্যই আত্মনিয়ন্ত্রিত এবং আত্মসচেতন।

লোট্‌জার অভিমত

লোট্‌জার উপরিউক্ত অভিমতের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ করা হয়েছে যে যদিও অনাত্মা থেকে বিচ্ছিন্ন আত্মাকে অনাত্মার সাহায্যে ব্যাখ্যা করা যায় না, তার থেকে এই সিদ্ধান্ত করা যায় না যে, আত্মাকে অনাত্মার সাহায্য ছাড়া ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। দ্বিতীয়তঃ, যদিও আত্মা তার সম্বন্ধের থেকে অতিরিক্ত কিছু, তবু এর দ্বারা প্রমাণিত হয় না যে সম্বন্ধগুলি অপ্রযোজনীয়। একথা সত্য যে, আমাদের মানবীয় অভিজ্ঞতা এবং তার প্রকাশের ধরন প্রমাণ করে যে, আত্মার ধারণার সঙ্গে সব সময়ই অনাত্মার ধারণা সংযুক্ত। এটাও অস্বীকার করা যায় না যে ব্যক্তির বিকাশ, ব্যক্তি ভিন্ন এক অস্তিত্বশীল জগতের ও অন্যান্য জীবাত্মার উপর নির্ভর, কিন্তু সেই সঙ্গে এটাও অস্বীকার করা যায় না যে, মানুষের ব্যক্তিগত বিকাশ হল তার আভ্যন্তরীণ স্বাতন্ত্র্যের বিকাশ সাধন এবং তাই যদি হয় তা হলে এটা স্বীকার করতে হয় যে, পূর্ণ এবং সম্পূর্ণ পুরুষরূপে ঈশ্বর বাহ্যসত্তার উপর নির্ভর নয়। কারণ ঈশ্বর তাঁর নিজের চেতন অবস্থার আশ্রয় ও পর্যাপ্ত হেতু।

লোট্‌জার অভিমতের সমালোচনা

যে ঈশ্বর শুদ্ধ ঐক্য বা ভেদহীন অভেদ, তার পক্ষে আত্মসচেতন এবং পুরুষ হওয়া সম্ভব নয়। পরিপূর্ণভাবে ভেদশূন্য চেতনাকে ধারণা করা যায় না, ধারণা করা গেলেও তার কোন ধর্মীয় মূল্য থাকবে না। পূর্ণ পুরুষ হিসেবে ঈশ্বরের ধারণা হল এক আধ্যাত্মিক আত্মার ধারণা যে, আত্মা পরিপূর্ণভাবে আত্মনিয়ন্ত্রিত এবং আধ্যাত্মিক অভেদত্বর জন্য যে পার্থক্যের সম্পদ থাকা প্রয়োজন তা তার আছে।

শুদ্ধ ঐক্য পুরুষ হতে পারে না

চেতনার ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য তার কার্যের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়। মানুষকে পুরুষ গণ্য করা হয় কেননা তার ইচ্ছা কাজের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়। অনুরূপ ভাবে ঐশ্বরিক সত্তার পুরুষোচিত বৈশিষ্ট্যও আমাদের প্রতি তার কার্যের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়। ঈশ্বর এক সৃজনমূলক আত্মা। পুরুষরূপী ঈশ্বর হলেন এমন ঈশ্বর যাঁর সৎ উদ্দেশ্য জগৎ ও জীবাত্মাকে কেন্দ্র করে যে উদ্দেশ্যমূলক শৃঙ্খলা তার মাধ্যমে প্রকাশিত হয়।

ঈশ্বরের আত্ম-প্রকাশের ধারণা করতে হলেই তাঁকে পুরুষ গণ্য করতে হয়

ঈশ্বরের আত্ম প্রকাশের মধ্য দিয়েই আমরা তার পুরুষোচিত বৈশিষ্ট্যকে উপলব্ধি করতে পারি। ঈশ্বরের আত্মপ্রকাশ দেখে তাকে পুরুষ মনে করার পূর্বেই তাকে পুরুষ গণ্য করতে হবে। ঈশ্বরের আত্ম-প্রকাশের ধারণা করতে গেলেই তিনি যে পুরুষ এই ধারণা পূর্ব থেকে স্বীকার করে নিতে হয়। ঈশ্বর পুরুষ না হলে তিনি পুরুষের মতন নিজেকে প্রকাশ করতে পারেন না।

এই জগতের আশ্রয় হল এক আত্মসচেতন, সৃজনমূলক আত্মা। ধর্মীয় অভিজ্ঞতার সঙ্গে, ঈশ্বর পুরুষ এই ধারণা গভীরভাবে যুক্ত। কারণ ধর্ম সত্য হতে পারে না যদি এই নিশ্চয়তা দেওয়া না যায় যে, ধর্মের প্রয়োজনীয় প্রত্যাশাগুলি কখনও ব্যর্থ হয় না। ঈশ্বরকে অতি-পুরুষ বলা ধর্মবিরোধী মনোভাব নয়। কারণ সেক্ষেত্রে কথাটির তাৎপর্য হবে ঈশ্বর মানুষের তুলনায় এক গভীরতর, সমৃদ্ধতর এবং পরিপূর্ণ অর্থে পুরুষ। কারণ, ঈশ্বর হল এক অতিবর্তী অপার্থিব সত্তা। মানুষ যেসব সীমার অধীন ঈশ্বর সেই সব সীমার অধীন নয়, বস্তুতঃ সেই সব সীমার অতীত।

সিদ্ধান্ত

দ্বাদশ অধ্যায়

ঈশ্বরের সঙ্গে জগতের সম্পর্ক

(Relation of God to World)

১। ঈশ্বরের সঙ্গে জগতের সম্পর্ক বিষয়ক মতবাদ (Theories of the Relation of God to world) :

ঈশ্বর ও জগতের সম্বন্ধ নিরূপণ করতে গিয়ে দার্শনিকরা যে মূল প্রশ্নটি উত্থাপন করেছেন সেটি হল, ঈশ্বর কি জগতের অতিবর্তী (transcendent), না অন্তর্বর্তী (immanent)। ঈশ্বর কি এই জগৎকে অতিক্রম করে আছেন, না এর অন্তরে আছেন? এই মূল প্রশ্নটিকে কেন্দ্র করে একাধিক মতবাদেব সৃষ্টি হয়েছে। (i) অতিবর্তী ঈশ্বরবাদ (Desim): এই মতবাদ অনুসারে ঈশ্বর সম্পূর্ণভাবে এই জগৎকে অতিক্রম করে আছেন (God is wholly transcendeat)। (ii) সর্বেশ্বরবাদ (Pantheism): এই মতবাদ অনুসারে ঈশ্বর সম্পূর্ণভাবে জগতের অন্তর্বর্তী বা জগতের অন্তরে আছেন (God is wholly immanent)। (iii) ঈশ্বরবাদ (Theism): এই মতবাদ অনুসারে ঈশ্বর জগতের অতিবর্তী ও অন্তবর্তী উভয়ই। ঈশ্বর জগৎকে অতিক্রম করে আছেন এবং জগতের অন্তরেও আছেন (God is both immanent and transcendent)।

মানুষের স্বাভাবিক প্রবণতা এক ঈশ্বরে বিশ্বাস স্থাপন করা

আমরা এক্ষণে এইসব মতবাদেব দোষগুণ আলোচনা করে কোন্ মতবাদটি সন্তোষজনক তা বিচার করে দেখব :

(i) **অতিবর্তী ঈশ্বরবাদ** (Deism): এই মতবাদ অনুসারে ঈশ্বর জগতের সম্পূর্ণ অতিবর্তী (wholly transcendent) অর্থাৎ ঈশ্বর এই জগৎকে সম্পূর্ণরূপে অতিক্রম করে আছেন।

ঈশ্বর পার্থিব বস্তুতে অন্তঃস্যূত নয। ঈশ্বর নিরবচ্ছিন্নভাবে পার্থিব বস্তুগুলিকে ধারণ কবে নেই বরং তিনি তাদের বাইরে অবস্থিত। জগতের বাইরে ঈশ্বরের অবস্থিতিই অতিবর্তী ঈশ্বরবাদের বৈশিষ্ট্য। ঈশ্বর জগৎ সৃষ্টি করেছেন কিন্তু প্রকৃতি ও মানুষের সঙ্গে ঈশ্বরের কোন ঘনিষ্ঠ ও সজীব সম্পর্ক নেই।

দার্শনিক এ্যারিস্টটল (*Aristotle*)-এর চিন্তাধারাতে অতিবর্তী ঈশ্বরবাদের প্রকাশ ঘটেছে। তাঁর মতে ঈশ্বর শুদ্ধ আকার (pure form) এবং তিনি জড় ও পার্থিব বস্তু

থেকে সদা বিচ্ছিন্ন। তিনি মনের শুদ্ধ ক্রিয়া; তাঁর কামনার বস্তুরূপে তিনি বাইরে থেকে তাঁর জগতকে চালিত করেন। আধুনিক যুগে অতিবর্তী ঈশ্বরবাদের লেখকবৃন্দ হলেন সপ্তদশ এবং অষ্টাদশ শতাব্দীর লেখকবৃন্দ, যাঁরা প্রত্যাদেশ-নিরপেক্ষ ধর্মের (natural religion) কথা বলেছিলেন। এই ধর্মের সঙ্গে আধ্যাত্মিক জীবনের কোন ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়নি। পরবর্তীকালে জে. এস. মিল (*J. S. Mill*)-এর ঈশ্বর সম্পর্কীয় মতবাদে অতিবর্তী ঈশ্বরবাদের ধারণা প্রত্যক্ষ করা যায়। তাঁর মতবাদ অনুসারে ঈশ্বর নানা ভাবে সীমিত এবং ঈশ্বর সর্বশক্তিমান নয়।

এ্যারিস্টটল ও মিলের অভিমত

অতিবর্তী ঈশ্বরবাদ অনুসারে, সর্বনিরপেক্ষ পরমপুরুষ ঈশ্বর জগৎ সৃষ্টির পূর্বে অনন্তকাল ধরে একাই ছিলেন। পরে তিনি মনে মনে একটি জগতের পরিকল্পনা করে কোন এক বিশেষ মুহূর্তে নিছক শূন্য (nothing) থেকে এই জগতের সৃষ্টি করেছিলেন কোন কোন লেখকের মতে জড় পদার্থ পূর্ব থেকেই বর্তমান ছিল এবং ঈশ্বর ঐ জড় পদার্থকে গঠন করে জগৎ সৃষ্টি করেছেন। ঈশ্বর এইভাবে জগৎ সৃষ্টি করে তাঁর মনের ধারণাকে বাস্তবে পূর্ণতা দান করলেন। এই জগৎ সৃষ্টি করার পর ঈশ্বর প্রয়োজনীয় শক্তি সৃষ্টি করলেন এবং এইগুলির উপরই জগৎকে ছেড়ে দিলেন; এই শক্তিগুলিই জগৎকে নিয়ন্ত্রিত ও চালিত করতে লাগল। ঈশ্বর এই জগতের প্রথম বা মুখ্য কারণ (First cause)। এই শক্তিগুলি হল দ্বিতীয় বা গৌণ কারণ (Second cause)। ঈশ্বর যেমন জড় দ্রব্য সৃষ্টি করলেন তেমনি বহু জীবাত্মাও সৃষ্টি করলেন। তিনি এই সব জীবাত্মাকে ইচ্ছার স্বাধীনতা (freedom of will) দিলেন যাতে তারা নিজ নিজ ইচ্ছানুসারে কর্ম সম্পাদন করতে পারে। ঈশ্বর জগৎ সৃষ্টি করার পর এই জগৎ থেকে দূরে সরে গেলেন। জগৎ ঈশ্বর-বহির্ভূত স্বতন্ত্র সত্তা লাভ করল এবং একটি বিরাট ও বিস্ময়কর যন্ত্ররূপে কাজ করতে লাগল। যন্ত্র সৃষ্টি হবার পর তার সঙ্গে যন্ত্রীর যেমন বিশেষ সম্বন্ধ থাকে না, কেবলমাত্র প্রয়োজন দেখা দিলে যন্ত্রের মেরামত যন্ত্রী করে, তেমনি এই জগৎ সৃষ্টির পরবর্তীকালে ঈশ্বরের নিয়ন্ত্রণ বা হস্তক্ষেপ ছাড়া আপন মনেই চলতে থাকে। যদি কোন কারণে এই জগতের মধ্যে কোন বিপর্যয় দেখা দেয় ও জগতের স্বাভাবিক কাজ ব্যাহত হয়, তখনই কেবলমাত্র ঈশ্বর হস্তক্ষেপ করেন। জীবাত্মা স্বাধীন ইচ্ছা-শক্তির বলে এমন কার্য করতে পারে যা ঈশ্বরের সৃষ্টি-পরিকল্পনাকে ব্যাহত করে

ঈশ্বর অনন্তকাল ধরে একাই ছিলেন এবং বিশেষ এক মুহূর্তে এই জগৎ সৃষ্টি করেন

ঈশ্বরের সৃষ্ট শক্তিই গৌণ কারণরূপে জগৎকে নিয়ন্ত্রিত করতে লাগল

ঈশ্বর প্রয়োজনে জগতের কাজে হস্তক্ষেপ করেন

বিপর্যয় সৃষ্টি করতে পারে। আবার প্রাকৃতিক দুর্যোগ মানুষের জীবনে দুঃখ-কষ্টের সৃষ্টি করেও বিপর্যয় ঘটাতে পারে। এইসব ক্ষেত্রে ঈশ্বরকে হস্তক্ষেপ করতে হয়।

সৃষ্টির পর ঈশ্বর জগতের বাইরে অবস্থান করেন

সুতরাং এই মতানুসারে এই জগৎ সৃষ্ট হবার পর ঈশ্বর জগতের বাইরে অবস্থান করছেন। ঈশ্বর ও জগৎ দুই-ই স্বতন্ত্র স্ব-নির্ভর সত্তা, উভয়ের মধ্যে কোন আন্তর সম্পর্ক নেই।

অতিবর্তী ঈশ্বরবাদ নিম্নলিখিত বিষয়গুলি পূর্ব থেকে স্বীকার করে নেয়:

(১) **বিশেষ সময়ে জগতের সৃষ্টি:** এমন এক সময় ছিল যখন জগতের কোন অস্তিত্ব ছিল না, বিশেষ এক সময়ে এই জগৎ সৃষ্ট হয়।

(২) **ঈশ্বরের দ্বি রূপ:** জগৎ ছাড়া ঈশ্বরের এক রূপ এবং জগৎ সৃষ্ট হবার পর ঈশ্বরের জগৎ বহির্ভূত রূপ।

(৩) **প্রথম বা মুখ্য কারণ এবং দ্বিতীয় বা গৌণ কারণের মধ্যে প্রভেদ:** জগৎস্রষ্টা হিসেবে ঈশ্বর হলেন প্রথম বা মুখ্য কারণ। জগৎকে নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত করার জন্য যে শক্তি তিনি সৃষ্টি করেছিলেন সেইগুলি হল দ্বিতীয় বা গৌণ কারণ।

(৪) **প্রয়োজনবোধে ঈশ্বরের হস্তক্ষেপ:** যদিও ঈশ্বর জগৎ-বহির্ভূত, তবু প্রয়োজনবোধে ঈশ্বর জগতের কাজে হস্তক্ষেপ করেন।

(৫) **ঈশ্বর সম্পূর্ণভাবে জগৎ-বহির্ভূত:** জগৎ সৃষ্ট হবার পর ঈশ্বর সম্পূর্ণভাবে এই জগতের বাইরে অবস্থান করেন।

সমালোচনা (Criticism):

অতিবর্তী ঈশ্বরবাদের স্বপক্ষে বলা যেতে পারে যে, এই মতবাদ মনে করে ঈশ্বর এক সুনির্দিষ্ট সত্তা, কোন দুর্বোধ্য ধারণা বা কোন নৈর্ব্যক্তিক ধী-শক্তি (impersonal reason) নয়। এই মতবাদ অনুসারে ঈশ্বর কোন ছলনাময় পরমসত্তা নয়, বরং এক সুনির্দিষ্ট সত্তা, জগতের সঙ্গে ও মানুষের সঙ্গে যার সম্বন্ধও সুনির্দিষ্ট। যে সত্তা, জগতের উপর নির্ভর নয়, জগতের অতিবর্তী, নিঃসন্দেহে সেই ধরনের সত্তা মানুষের ধর্মপ্রাণ মনের কল্পনাকে পরিতৃপ্ত করতে পারে।

অতিবর্তী ঈশ্বরবাদের গুণ

কিন্তু এই মতবাদের অনেক ত্রুটি আছে।

এই মতবাদ ঈশ্বরকে জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন করে এবং জগৎকে এক ভ্রান্ত স্ব-নির্ভরতার অধিকারী করে। ধর্মের ক্ষেত্রে উপাস্য ও উপাসকের, অর্থাৎ জীবাত্মা ও ঈশ্বরের মধ্যে যে আন্তরিক সম্পর্কের কথা কল্পনা করা হয়, এই মতবাদে তার স্বীকৃতি মেলে না।

অতিবর্তী ঈশ্বরবাদ মনে করে যে মানুষ বিচারবুদ্ধির অধিকারী হওয়াতে জগতে

অন্যের উপর নির্ভরশীল না হয়ে, নিজেকে নিজে চালিত করছে। কাজেই অতিবর্তী ঈশ্বরবাদের প্রবণতা হল ধর্মের শুদ্ধ বুদ্ধিবাদী ব্যাখ্যা দেওয়া, কিন্তু এই ধরনের ব্যাখ্যা মনস্তাত্ত্বিক দিক থেকে ভ্রান্ত এবং আধ্যাত্মিক দিক থেকে অনুপযোগী।

অতিবর্তী ঈশ্বরবাদের দোষ

জগতের উৎপত্তি সম্পর্কে অতিবর্তী ঈশ্বরবাদ সৃষ্টিবাদ সমর্থন করে। কিন্তু সৃষ্টিবাদ বিজ্ঞানসম্মত নয় এবং নানাকারণে যুক্তিগ্রাহ্য মতবাদ নয়, সেইহেতু অতিবর্তী ঈশ্বরবাদও গ্রহণযোগ্য নয়।

অতিবর্তী ঈশ্বরবাদ অনুযায়ী ঈশ্বর কোন এক বিশেষ মুহূর্তে এই জগৎ সৃষ্টি করেছেন। ঈশ্বর যখন জগৎ ছাড়াই ছিলেন তখন হঠাৎ এই জগৎ সৃষ্টির প্রয়োজন দেখা দিল কেন? কোন অভাববোধ কি এই জগৎ সৃষ্টির কারণ? কিন্তু ঈশ্বর পূর্ণ, তাঁর কোন অভাববোধের প্রশ্ন ওঠে না।

অতিবর্তী ঈশ্বরবাদ অনুযায়ী ঈশ্বর হল মুখ্য কারণ এবং প্রাকৃতিক শক্তি যেগুলি জগৎকে নিয়ন্ত্রিত করে, সেইগুলি হল গৌণ কারণ। কিন্তু নিয়ন্ত্রণ চেতনা বা বুদ্ধি-সাপেক্ষ ব্যাপার; সেইজন্য চেতনাহীন গৌণ কারণ কখনই জগৎকে নিয়ন্ত্রিত করতে পারে না। বস্তুতঃ, প্রাকৃতিক শক্তি ঈশ্বরেরই শক্তি এবং সেই কারণে সেই শক্তি ঈশ্বর থেকে বিযুক্ত হয়ে নিজে নিজেই জগৎ নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না। তাছাড়া, অনন্ত জীবনের মত অনন্ত সক্রিয়তাই ঈশ্বরের ধর্ম; নিষ্ক্রিয়তা তাঁর স্বভাববিরোধী ধর্ম। এটা চিন্তা করা বিচারবুদ্ধিজনোচিত নয় যে, যে ঈশ্বর নিরবচ্ছিন্ন সক্রিয়তা, সেই ঈশ্বর জগৎ সৃষ্টির পর জগৎ থেকে নিজেকে অপসারিত করে নেবেন এবং নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়বেন। মার্টিন্যু (*Martineau*) যথার্থই বলেছেন, 'অনন্ত সত্তার কাছে, অনন্ত জীবন, অর্থাৎ অনন্তসক্রিয়তা পূর্ণতার অবশ্যই প্রয়োজনীয় উপাদান। সব জাগতিক শক্তি হল ইচ্ছা এবং সব জাগতিক ইচ্ছা তাঁর ইচ্ছা। তিনি প্রকৃতির মধ্যে একটি কারণ যা বিচিত্র উপায়ে ক্রিয়া করছেন। সুতরাং জগৎ গৌণ কারণের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়— এই মতবাদ গ্রহণযোগ্য নয়।

চেতনাহীন গৌণ কারণ জগৎকে নিয়ন্ত্রিত করতে পারে না

অতিবর্তী ঈশ্বরবাদ অনুযায়ী ঈশ্বর জগৎ সৃষ্টি করার পর সম্পূর্ণরূপে জগতের বাইরে অবস্থান করেন। অর্থাৎ জগৎ ও ঈশ্বর দুটি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র সত্তা। কিন্তু তাতে জগতের সত্তা ঈশ্বরের সত্তাকে সীমিত করবে। ঈশ্বর অনাদি, অসীম ও অনন্ত। তিনি কোন কিছুর দ্বারাই সীমিত হতে পারেন না। সুতরাং ঈশ্বর-বহির্ভূত জগতের স্বতন্ত্র সত্তা স্বীকার করা যায় না। জীবজগৎ ঈশ্বরের বাইরে স্বতন্ত্র সত্তারূপে অবস্থান করলে ঈশ্বরের অনন্তত্বের হানি ঘটবেই।

ঈশ্বর-বহির্ভূত জগৎ ঈশ্বরকে সীমিত করবে

অতিবর্তী ঈশ্বরবাদীদের মতে ঈশ্বর প্রয়োজনমত জগতের কাজে হস্তক্ষেপ করেন। এই মতবাদ ঈশ্বরকে সাধারণ মানুষ-যন্ত্রী হিসেবে কল্পনা করে। যন্ত্রী যেমন যন্ত্র বিকল হলে যন্ত্র মেরামত করে, ঈশ্বরও প্রয়োজনে জগতের কাজে হস্তক্ষেপ করেন। কিন্তু ঈশ্বরকে সাধারণ যন্ত্রীরূপে কল্পনা করা কোন মতেই যুক্তিসঙ্গত নয়।

ঈশ্বরের দ্বারা সৃষ্ট জগতে দোষত্রুটি দেখা দেবে কেন?

এই জগৎ যদি ঈশ্বরই সৃষ্টি করে থাকেন তবে জগতের মধ্যে দোষত্রুটি দেখা দেবে কেন? জগতের মধ্যে এত দুঃখকষ্ট কেন? ঈশ্বর পূর্ণ, তাঁর সৃষ্ট জগৎও সর্বাঙ্গসুন্দর হবে, এ সিদ্ধান্তই যুক্তিসংগত। অতিবর্তী ঈশ্বরবাদের একটি রূপ অনুসারে এই জগৎ সৃষ্টির পূর্বে জড় পদার্থ ছিল এবং ঈশ্বর সেই পদার্থ থেকে জগৎ সৃষ্টি করেছেন। সে-কারণে জগতের এত দোষত্রুটি। তাই যদি হয় তবে সেই জড়পদার্থ ঈশ্বরের থেকে পৃথক সত্তা এবং তা ঈশ্বরের সত্তাকে সীমিত করে ঈশ্বরের অনন্তত্বের হানি ঘটাবে।

জগৎ ছাড়া ঈশ্বরের অস্তিত্ব কল্পনা করা যায় না

এই মতবাদ স্ব-বিরোধপূর্ণ। এই মতবাদ অনুসারে সৃষ্টির পূর্বেও অনন্তকাল ধরে ঈশ্বরকে এক আত্মসচেতন চিন্তাশীল সত্তারূপে ধারণা করা হয়েছে; কিন্তু চেতনার বস্তু ছাড়া চৈতন্য, চিন্তার বিষয়বস্তু ছাড়া চিন্তন প্রক্রিয়া, প্রকাশ ছাড়া নিছক অমূর্ত শক্তির কোন অর্থ হয় না। সুতরাং জগৎ ছাড়া ঈশ্বরের অস্তিত্ব কল্পনা করা যায় না।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শুরু থেকেই অতিবর্তী ঈশ্বরবাদের প্রতি এক বিরূপ মনোভাব লক্ষ্য করা যায়। বিবর্তনের ধারণার উদ্ভব ও প্রসার অতিবর্তী ঈশ্বরবাদের বিরোধিতা সাধন করেছে।

(ii) **সর্বেশ্বরবাদ** (Pantheism): সর্বেশ্বরবাদ অতিবর্তী ঈশ্বরবাদের বিরুদ্ধ মতবাদ এবং ঐতিহাসিক দিক থেকে অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ। সুদূর প্রাচ্যে, প্রাচীন মিশরে, গ্রীসদেশে, মধ্যযুগের এবং বর্তমান যুগের পাশ্চাত্ত্য চিন্তাবিদদের মধ্যে এই

সর্বেশ্বরবাদের গুরুত্ব

মতবাদের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। অতিবর্তী ঈশ্বরবাদের তুলনায় ধর্ম-চেতনার কাছে সর্বেশ্বরবাদের আবেদন অনেক বেশী। ধর্মের একটা অতীন্দ্রিয় দিক আছে, এবং অতীন্দ্রিয়বাদ ঈশ্বরের সঙ্গে ভক্তের মিলন কামনা করে, যার অর্থ ঈশ্বরের মধ্যে মিলিয়ে যাওয়া। অতীন্দ্রিয়বাদ যখন এই গভীর মিলনের বিষয়টিকে বিচারবুদ্ধির দ্বারা সমর্থন করতে চায় তখনই অতীন্দ্রিয়বাদ কোন সর্বেশ্বরবাদী রূপ পরিগ্রহ করে।

অতিবর্তী ঈশ্বরবাদ অনুযায়ী ঈশ্বর জগতের সম্পূর্ণ বাইরে অবস্থান করেন। কিন্তু সর্বেশ্বরবাদ অনুযায়ী ঈশ্বর সম্পূর্ণভাবে জগতেই অন্তঃস্থিত (wholly immanent)

এবং জীব ও জগতের মধ্যেই ব্যাপ্ত। জগৎ ও ঈশ্বর এক। ঈশ্বরই সবকিছু (God is all) এবং সবকিছুই ঈশ্বর (All is God)। (*Pan=all* বা সব; *Theos=God* বা ঈশ্বর। ঈশ্বর-নিরপেক্ষ জগতের কোন স্বতন্ত্র সত্তা নেই। সুতবাং জগতের। দ্বারা ঈশ্বরের সীমিত হবার কোন প্রশ্ন ওঠে না। যেহেতু জগৎ ও ঈশ্বর এক, ঈশ্বর-বহির্ভূত যে কোন সত্তাই অলীক বা মিথ্যা।

সর্বেশ্বরবাদ অনুযায়ী ঈশ্বরই সব এবং সবই ঈশ্বর

সর্বেশ্বরবাদ হল কেবলাদ্বৈতবাদ (abstract monism) যা একের সত্তাই স্বীকার করে এবং বহুর কোন অস্তিত্ব স্বীকার করে না। যা কিছু অস্তিত্বশীল, জড়, প্রাণ, মন —সবই সর্বব্যাপী ঈশ্বরের সত্তায় নিহিত। জগতের কোন স্বতন্ত্র সত্তা না থাকায় এই মতবাদের অন্যতম সম্ভাব্য পরিণতি হল যে, এই জগতের কোন যথার্থ অস্তিত্ব নেই। যে কোন বস্তু, বিষয় বা জীব এক ও অদ্বিতীয় ঈশ্বরেরই প্রকাশ। এর প্রকৃত কোন সত্তা নেই। জীবের চেতনা ঈশ্বরেরই চেতনা, জাগতিক শক্তি ঈশ্বরেরই শক্তি। মানুষের ইচ্ছার কোন স্বাধীনতা নেই। সর্বেশ্বরবাদের পরিণতি হল নিয়ন্ত্রণবাদ। সব কিছুই ঈশ্বরের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।

সর্বেশ্বরবাদ বহুর অস্তিত্ব স্বীকার করে না

এক হিসেবে সর্বেশ্বরবাদ বহুত্ববাদেরও (Pluralism) বিরুদ্ধ মতবাদ। বহুত্ববাদীদের সিদ্ধান্ত, বহুই সত্য, এক মিথ্যা। সর্বেশ্বরবাদীদের সিদ্ধান্ত একই সত্য, বহু মিথ্যা। জীব-জগৎ মিথ্যা অবভাস (unreal appearance)। আমাদের জড় জগতের প্রত্যক্ষণ ভ্রম দর্শন ব্যতীত কিছুই নয়। বহুত্ববাদীরা জগতের বহুত্বই স্বীকার করেছেন, তার ঐক্যকে উপেক্ষা করেছেন। আর সর্বেশ্বরবাদীরা ঐক্যকে বড় করে দেখেছেন এবং এই ঐক্যের কাছে বহুকে আহুতি দিয়েছেন।

সর্বেশ্বরবাদ বহুত্ববাদের বিরোধী মতবাদ

পাশ্চাত্য দর্শনে স্পিনোজা সর্বেশ্বরবাদের একজন প্রধান সমর্থক। তাঁর মতে ঈশ্বরই একমাত্র দ্রব্য। চেতনা ও বিস্তৃতি ঈশ্বরের অসংখ্য গুণের মধ্যে দুটি গুণ। জীবাত্মা অনন্ত চেতনার প্রকাশ, সান্ত বস্তু অনন্ত বিস্তৃতির প্রকাশ। সমুদ্র ছাড়া তরঙ্গের যেমন নিজস্ব কোন সত্তা নেই তেমনি ঈশ্বর ছাড়া সান্ত জীব ও সসীম বস্তুর কোন নিজস্ব সত্তা নেই, ঈশ্বর নিত্য, তাঁর কোন পরিবর্তন নেই। ঈশ্বর পরমদ্রব্য, সেইহেতু ঈশ্বর কোন পুরুষ নয়। ঈশ্বরের বুদ্ধি, ইচ্ছা বা কোন লক্ষ্য নেই। সব কিছুই ঈশ্বরের থেকে অনিবার্যভাবে নিঃসৃত হয়। 'বুদ্ধি-সঞ্জাত অনুরাগ' (intellectual love of God), যা স্রষ্টার

স্পিনোজা সর্বেশ্বরবাদের একজন প্রধান সমর্থক

সমগোত্রীয়, তার মাধ্যমে মানুষ এই সত্য উপলব্ধি করতে পারে। সান্ত জীবের কোন ইচ্ছার স্বাধীনতা নেই।

প্রাচীন গ্রীসের অন্তর্গত ইলিয়ার দর্শন সম্প্রদায় যারা *Eleatics* নামে পরিচিত, তারাও একমাত্র সৎ-এর (Being) সত্তাই স্বীকার করেছিল এবং ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতের সত্তা অস্বীকার করেছিল। দার্শনিক পার্মিনাইডিস্ (*Parmenides*) এই 'সৎ'-এর পরিচয় দিতে গিয়ে তার নেতিবাচক বর্ণনা দিয়েছেন, যেহেতু 'সৎ'-এর কোন সদর্থক বর্ণনা দেওয়া সম্ভব নয়। এই 'সৎ' অবিভাজ্য, অপরিবর্তনীয়, অবিনাশ্য, অনাদি, অনন্ত, নিশ্চল ও স্বয়ম্ভু। এই 'সৎ' অন্য কোন সত্তার উপর নির্ভরশীল নয়।

ইলিয়ার দর্শন সম্প্রদায় একমাত্র 'সৎ'-এর সত্তাই স্বীকার করেছেন

ভারতীয় দর্শনে কেবলাদ্বৈতবাদী দার্শনিক শঙ্করের মতানুসারে ব্রহ্মই সত্য, জগৎ মিথ্যা, অর্থাৎ জগতের কোন সত্তা নেই। ব্রহ্ম অসীম, নির্গুণ, নির্বিশেষ, নিরবয়ব এবং সকল প্রকার ভেদরহিত, জগৎ মিথ্যা হলেও ব্রহ্মই জগতের আশ্রয়। একই সত্য, বহুত্ব মিথ্যা, বহুত্বের ব্যবহারিক সত্যতা থাকলেও পারমার্থিক সত্যতা নেই।

শঙ্করের মতে ব্রহ্মই সত্য, জগৎ মিথ্যা

সমালোচনা (Criticism) :

সর্বেশ্বরবাদ এক শূন্যগর্ভ অদ্বৈতবাদ। সর্বেশ্বরবাদ একমাত্র ঈশ্বরের সত্তা স্বীকার করে এবং জগৎ ও জীবাত্মার সত্তা স্বীকার করে না। এই মতবাদ বহুকে উপেক্ষা করে এককে এবং বিভেদকে উপেক্ষা করে ঐক্যকেই কেবলমাত্র স্বীকার করে। কিন্তু বহুকে অস্বীকার করে শুধু মাত্র একের ধারণা এক শূন্যগর্ভ ধারণা, এক নিছক শূন্য ছাড়া কিছুই নয়। এক যদি বহুর মাধ্যমে নিজেকে প্রকাশ না করে, বহুত্বের মধ্য দিয়েই যদি ঐক্যের প্রকাশ না হয়, তাহলে সেই সত্তা নিছক এক কাল্পনিক ধারণা মাত্র।

সর্বেশ্বরবাদ শূন্যগর্ভ অদ্বৈতবাদ

সর্বেশ্বরবাদ আমাদের অভিজ্ঞতার জগৎকে মিথ্যা বলে উড়িয়ে দিতে চায়, কিন্তু আমরা আমাদের অভিজ্ঞতার সাহায্যে এই জগতের সত্যতা উপলব্ধি করি। একে মিথ্যা বা মায়া বলে উড়িয়ে দিলেই এর কোন সন্তোষজনক ব্যাখ্যা দেওয়া হয় না।

অভিজ্ঞতার জগতকে মিথ্যা বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় না

সর্বেশ্বরবাদ আমাদের আত্মসচেতনতা ও নৈতিক চেতনার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। আমরা প্রত্যেকে যে এক একটি স্বতন্ত্র সত্তা, আমাদের যে আত্মনির্ধারণের ক্ষমতা আছে, আত্ম-সচেতনতার সাহায্যেই আমরা তা জানতে পারি। তাছাড়া আমাদের যে ইচ্ছার স্বাধীনতা আছে, আমরা যে ভাল ও মন্দের মধ্যে প্রভেদ

করতে পারি, আমাদের কাজের নৈতিক দায়িত্ব যে আমাদের—এই সম্পর্কেও আমরা সচেতন। কিন্তু সর্বেশ্বরবাদ জীবাত্মার কোন স্বাধীন সত্তা বা ইচ্ছার স্বাধীনতা স্বীকার করে না। ফ্লিণ্ট (*Flint*) বলেন, "যদি মানুষের ব্যক্তিত্ব এবং স্বাধীনতা অলীক হয় তাহলে বাধ্যতাবোধ, অপরাধ এবং কুকর্মের প্রতিফল হবে উদ্ভট ধরনের অলীক বস্তু। সর্বেশ্বরবাদ মানুষকে নিছক যন্ত্র মনে করে এবং মানুষকে ঈশ্বরের উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল গণ্য করে, যে মানুষের কোন স্বাধীনতা এবং স্বাধীন মর্যাদা নেই।"

এই মতবাদ আমাদের আত্মসচেতনতা ও নৈতিক চেতনা ব্যাখ্যা করতে পারে না

সর্বেশ্বরবাদ স্বীকার করে নিলে, ধর্ম সম্পর্কীয় অনুভূতির কোন যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভব হয় না। পার্থক্যকে আশ্রয় করেই ধর্মের অস্তিত্ব সম্ভব। কিন্তু সর্বেশ্বরবাদ অনুযায়ী জীব ও ঈশ্বর, উপাস্য ও উপাসক অভিন্ন। জীবের যদি স্বাধীন ইচ্ছা না থাকে, তাহলে ধর্মোপাসনার কোন অর্থ হয় না। এইজন্য জীবের স্বতন্ত্র সত্তা ও স্বাধীন ইচ্ছা অস্বীকার করে সর্বেশ্বরবাদ ধর্মের মূলে কঠোর আঘাত হেনেছে।

সর্বেশ্বরবাদ ধর্মের মূলে কঠোর আঘাত হানে

সর্বেশ্বরবাদ জগৎ ও ঈশ্বরকে অভিন্ন মনে করে। এর অনিবার্য পরিণতি হল স্বভাববাদ (Naturalism) এবং জড়বাদ (Materialism)। কোন কোন ক্ষেত্রে সর্বেশ্বরবাদ প্রকৃতি পূজার (nature worship) মাধ্যমে নিজেকে প্রকাশ করেছে।

সর্বেশ্বরবাদের অনিবার্য পরিণতি স্বভাববাদ ও জড়বাদ

যেহেতু ঈশ্বরই সব, জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়, মন ও প্রকৃতির প্রভেদ সর্বেশ্বরবাদে স্বীকার করা হয়নি। কিন্তু জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়র প্রভেদ স্বীকার করে না নিলে জ্ঞান সম্ভব নয়।

সর্বেশ্বরবাদীরা বহুবাদীদের মতনই একদেশদর্শী। সেই মতবাদই সন্তোষজনক, যে মতবাদে আমরা এক ও বহু, বিভেদ ও ঐক্যের এক সুষম সমন্বয় লক্ষ্য করি। সেই মতবাদ হল ঈশ্বরবাদ বা সর্ব-ধরেশ্বরবাদ, যে মতবাদ বহু এবং একের মধ্যে এক আঙ্গিক সম্পর্ক স্বীকার করে।

সর্বেশ্বরবাদ একদেশদর্শী মতবাদ

সর্বেশ্বরবাদের গুণ (Merits of Pantheism): সর্বেশ্বরবাদের বহু ত্রুটি সত্ত্বেও কতকগুলি গুণ আছে। সর্বেশ্বরবাদ এই জগতের ঐক্য ও আধ্যাত্মিকতা, এই জগতের মধ্যে ঈশ্বরের ব্যাপ্তি এবং এক ও অদ্বিতীয় ঈশ্বরের সর্বব্যাপকতার উপর গুরুত্ব আরোপ করে এই মতবাদের প্রতি মানুষের আগ্রহকে জাগ্রত করে তুলেছে। বহুত্ববাদ, দ্বৈতবাদ এবং অতিবর্তী ঈশ্বরবাদের প্রতিক্রিয়া স্বরূপ এই মতবাদের উদ্ভব। বস্তুতঃ, ঈশ্বর সর্বত্র বিদ্যমান—এমন এক মনোভাব থেকেই এই মতবাদের সৃষ্টি। এই

সর্বেশ্বরবাদ ঈশ্বরের সর্বব্যাপকতা স্বীকার করেছে

মতবাদ সৃষ্টি এবং স্রষ্টা, ঈশ্বর এবং জগৎ, মন এবং জড়ের দ্বৈত দূরীভূত করে ঈশ্বর যে সর্বব্যাপী বা বিভু—এই সত্যই প্রচার করেছে এবং এই জগৎ যে ঈশ্বরের শক্তির উপর একান্তভাবে নির্ভর তা মুক্ত কণ্ঠে ঘোষণা করেছে।

সর্বেশ্বরবাদ এই সত্যই জানিয়েছে যে, ঈশ্বর আমাদের দূরে নয়, আমাদের অন্তরস্থিত সত্তা। সর্বেশ্বরবাদের মূল মন্ত্র সবরকম 'অহং' বিসর্জন দিয়ে সবরকম আত্মাভিমান বর্জন করে নিজেকে ঈশ্বরের অংশ মনে করে গৌরব অনুভব করা। কাজেই ধর্মজীবনের আকুতি অপরিতৃপ্ত করা দূরে থাক, বরং মানুষের ধর্ম-সম্পর্কীয় অনুভূতি এই মতবাদে এক অসীম সার্থকতা লাভ করেছে। সব কিছুই ঈশ্বরের প্রকাশ—এই জাতীয় ধারণার মধ্যেই এক বিরাট গৌরব নিহিত আছে।

ঈশ্বর আমাদের অন্তঃস্থিত সত্তা

সর্বেশ্বরবাদ মানুষকে এক বিরাট নৈতিক শক্তিতে উদ্বোধিত করে। আপাতদৃষ্টিতে মনে হয়—এই ধারণা স্ববিরোধী, কেননা ইতিপূর্বে আমরা আলোচনা করেছি যে, মানুষের স্বাধীন সত্তা বা ইচ্ছা না থাকলে মানুষের নৈতিক জীবনের কোন প্রশ্ন ওঠে না। কিন্তু সর্বেশ্বরবাদ যখন প্রচার করে যে, ঈশ্বর মানুষের সত্তার মধ্যেই ব্যাপ্ত, তার অন্তর্যামী শক্তি, যিনি তার হৃদয়ের মধ্যে অধিষ্ঠিত থেকে তার মাধ্যমে ক্রিয়া করছেন, তখন মানুষ এক বিরাট নৈতিক শক্তির অধিকারী হয়। মানুষের জীবনের শ্রেষ্ঠ মুহূর্ত সেইগুলিই, যখন মানুষ নিজের ত্রুটি, বিচ্যুতি, দুর্বলতার কথা বিস্মৃত হয়ে ঈশ্বরের সঙ্গে নিজের একাত্মতা অনুভব করতে পারে।

সর্বেশ্বরবাদ মানুষকে এক বিরাট নৈতিক শক্তিতে উদ্বোধিত করে

ভাববাদী সর্বেশ্বরবাদ (Idealistic Pantheism) **:**

এইসব কারণে আর এক ধরনের সর্বেশ্বরবাদের আবির্ভাব ঘটেছে যাকে ভাববাদী সর্বেশ্বরবাদ (Idealistic Pantheism) নামে অভিহিত করা হয়। জগৎ ও ঈশ্বরের সম্পর্ক সম্বন্ধীয় হেগেলের অভিমতকে কোন কোন হেগেলীয় দার্শনিক যেমন, ফেক্‌নার (*Fechner*) সর্বেশ্বরবাদী ব্যাখ্যা দেবার চেষ্টা করেছেন। এঁদের মতে জগতের সঙ্গে ঈশ্বরের সম্পর্ক হল মানুষের দেহ ও আত্মার সম্বন্ধের অনুরূপ। তিনি মনে করেন যে, সমস্ত প্রকৃতিই হল দেহ, ঈশ্বর যার অন্তর্যামী আত্মা। স্পিনোজার সঙ্গে এই ধরনের সর্বেশ্বরবাদের পার্থক্য হল যে, স্পিনোজার ক্ষেত্রে দ্রব্য (substance) হল দৈহিক-মানসিক সমগ্রতা, যেখানে দেহ এবং মন, প্রকৃতি ও মন-এর সমমর্যাদা বর্তমান এবং পরস্পরকে পরস্পরের সমান্তরাল গণ্য করা হয়। কিন্তু ভাববাদী সর্বেশ্বরবাদে পরম সত্তা হল দৈহিক মানসিক সমগ্রতা,

ভাববাদী সর্বেশ্বরবাদের স্বরূপ

কিন্তু প্রকৃতি হল দেহ যার অন্তর্যামী আত্মা হল বিশ্বচেতনা। বিশ্বচেতনা (Universal consciousness)-ই হল আন্তর সত্তা (inner reality), যা তার বিষয়রূপে প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রণ করে। এইখানেই আমরা সব ভাববাদের মূল সূত্র খুঁজে পাই। কাজেই এই ধরনের সর্বেশ্বরবাদকে ভাববাদী সর্বেশ্বরবাদ আখ্যা দেওয়া যায়।

স্পিনোজার সর্বেশ্বরবাদের তুলনায় ফেকনারের ভাববাদী সর্বেশ্বরবাদও ত্রুটিপূর্ণ, তবে একটি বিষয়ে উন্নত সেটি হল এই মতবাদে বাহ্য জড় জগতের সত্তা স্বীকৃত। কেননা বাহ্য জগতকে যথার্থ সত্তা বিশ্ব-চেতনার দেহরূপে গণ্য করা হয়েছে।

ভাববাদী সর্বেশ্বরবাদের ত্রুটি

জীবাত্মা এবং তাদের ব্যক্তিত্ব বিশ্বচেতনার মধ্যে হারিয়ে গেছে। কাজেই গতানুগতিক এবং ভাববাদী সর্বেশ্বরবাদ, উভয় ধরনের সর্বেশ্বরবাদের নৈতিক ফলাফল সমান অসন্তোষজনক।

অবশ্য কেউ কেউ মনে করেন হেগেল ঈশ্বরবাদী বা সর্বধরেশ্বরবাদী, সর্বেশ্বর বাদী নয়।

সর্বেশ্বরবাদের ত্রুটিই ঈশ্বরবাদের (Theism) পথ প্রশস্ত করে দিল।

(iii) **ঈশ্বরবাদ** (Thesim): ঈশ্বরবাদ অতিবর্তী ঈশ্বরবাদ (Deism) এবং সর্বেশ্বরবাদের (Pantheism) দোষ-ত্রুটি দূর করে উভয় মতবাদের সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করেছে। অতিবর্তী ঈশ্বরবাদ অনুযায়ী ঈশ্বর জীব ও জগতের সম্পূর্ণ বাইরে অবস্থান করেন; ঈশ্বরের সঙ্গে জগতের কোন অনিবার্য সম্পর্ক নেই। সর্বেশ্বরবাদ অনুযায়ী ঈশ্বর জীব ও জগতের মধ্যে ব্যাপ্ত। সব ঈশ্বর, ঈশ্বরই সব। অতিবর্তী ঈশ্বরবাদ অনুযায়ী ঈশ্বর জগতের সম্পূর্ণ অতিবর্তী, সর্বেশ্বরবাদ অনুযায়ী ঈশ্বর সম্পূর্ণ ভাবেই জগতের মধ্যেই ব্যাপ্ত। ঈশ্বরবাদ এই দুই বিরুদ্ধ মতবাদের সমন্বয় সাধন করেছে এই বলে যে, ঈশ্বর জীব ও জগতের ভেতরেও অবস্থিত (immanent) এবং বাইরেও অবস্থিত (transcendent)। 'সব কিছুই ঈশ্বর'—এই মতবাদের বদলে আমরা পেলাম 'সব কিছুই ঈশ্বরের উপর নির্ভর'। মার্টিন্যু, লোট্জা প্রমুখ এই সব মতবাদের সমর্থক।

ঈশ্বরবাদ অতিবর্তী ঈশ্বরবাদ ও সর্বেশ্বর-বাদের মধ্যে সমন্বয় সাধন করেছে

এই মতবাদ অনুসারে ঈশ্বর অসীম ও অনন্ত। ঈশ্বর থেকেই জীব ও জগৎ উদ্ভূত। এই সসীম জগৎ ও সান্ত জীবের মাধ্যমে ঈশ্বর নিজেকে প্রকাশ করেছেন এবং এই প্রকাশের মধ্য দিয়ে নিজেকে উপলব্ধি করছেন। এই মতানুসারে ঈশ্বর জীব ও জগতের মধ্যে আছেন, কিন্তু ঈশ্বরের অনন্ত সত্তা জীব ও জগতের মধ্যেই নিঃশেষ হয়ে যায়নি। জীব ও

সসীম জগৎ ও সান্ত জীবের মাধ্যমে ঈশ্বর নিজেকে প্রকাশ করেছে

জগৎ অতিক্রম করেও ঈশ্বরের সত্তা বিদ্যমান। এই জীব ও জগৎকে ঈশ্বরই ধারণ করে আছেন। এই মতানুসারে ঈশ্বরের সঙ্গে জগতের, একের সঙ্গে বহুর, অসীমের সঙ্গে সসীমের, পূর্ণের সঙ্গে অপূর্ণের এক অনিবার্য ও আঙ্গিক সম্পর্ক রয়েছে।

জগৎ ছাড়া ঈশ্বর এক শূন্যগর্ভ শক্তিমাত্র

একটি ছাড়া আর একটি অর্থহীন, বস্তুতঃ একের মধ্য দিয়েই অপরের পূর্ণতা। জগৎ ছাড়া ঈশ্বর এক শূন্যগর্ভ অমূর্ত শক্তি মাত্র। ঈশ্বরের বিবর্তনমূলক, সমন্বয়সাধক এবং সংরক্ষণমূলক শক্তি ছাড়া এই জগৎ কখনও উদ্ভূত হতে পারত না। সুতরাং ঈশ্বরের যেমন জগতের প্রয়োজন আছে, জগতেরও তেমনি ঈশ্বরের প্রয়োজন আছে।

ঈশ্বরবাদের সঙ্গে ধর্ম চেতনার সঙ্গতি

ঈশ্বরবাদ ব্যক্তির ধর্ম চেতনার দাবীর সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। কেননা ঈশ্বরবাদ অতিবর্তী ঈশ্বরবাদ ও সর্বেশ্বরবাদ উভয়কে সমন্বিত করতে চায়। উপাসক এমন একজন ঈশ্বরের উপাসনা করতে চায়, যে উপাস্য খুব দূরের বস্তু নয়, কাছের বস্তু। কিন্তু এই জগতে ঈশ্বরের উপস্থিতির দাবীর সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম চেতনা এমন এক ঈশ্বরের কথা বলে, যে ঈশ্বরকে জগতের এবং মানুষের উর্ধ্বে স্থাপন করা হয়, যে ঈশ্বরের সত্তার রহস্য মানুষের বিচারবুদ্ধির পরিপূর্ণ অধিগম্য নয়। কাজেই ঈশ্বরবাদ সর্বেশ্বরবাদের মতন ঈশ্বরকে জগতের সঙ্গে অভিন্ন গণ্য করে না। জগৎ ঈশ্বরের উপর নির্ভর নয়—ঈশ্বরবাদ এই সত্য অস্বীকার করে। অপর দিকে ঈশ্বরবাদ সর্বেশ্বরবাদ প্রচারিত সত্যকে পরিবর্তিত করে নিয়ে বলে—সব কিছুই ঈশ্বর নয়, সব কিছু ঈশ্বরের উপর নির্ভর। অন্যভাবে প্রকাশ করতে গেলে বলতে হয় ঈশ্বরবাদের বক্তব্য হল যে, জগতের সব উপাদান এক সার্বিক চেতনার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত এবং একটি মাত্র ইচ্ছার দ্বারা সংরক্ষিত। সর্বেশ্বরবাদ ধর্মীয় চেতনার ক্ষেত্রে ঈশ্বর ও জীবাত্মার একাত্মতার কথা বলে। ঈশ্বরবাদ ধর্মীয় উপাসনা ও ধর্মীয় জীবনে জীবাত্মার ঈশ্বরের সঙ্গে সহযোগিতার কথা বলে। কাজেই ঈশ্বর ও জীবাত্মার অভিন্নতার ধারণাকে যা ধর্ম-চেতনার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়, এক আধ্যাত্মিক ও নৈতিক ঘনিষ্ঠতার সম্পর্কে রূপান্তরিত করা হয়েছে।

সবকিছুই ঈশ্বরের উপর নির্ভর

সর্বেশ্বরবাদে ঈশ্বরের অন্তর্বর্তীতার অর্থ হল, তিনি প্রকৃতি ও জীবাত্মা উভয়ের সঙ্গেই অভিন্ন। কিন্তু ঈশ্বরবাদীর দৃষ্টিতে ঈশ্বরের অন্তর্বর্তীতার অর্থ হল, ঈশ্বরের ইচ্ছা থেকে জগতের সৃষ্টি এবং ঈশ্বরের ইচ্ছাই জগতকে ধারণ করে আছে। কিন্তু জীবাত্মার সঙ্গে ঈশ্বরের সম্পর্কের ক্ষেত্রে, জীবাত্মার স্বাধীনতা অস্বীকৃত হয়নি।

ঈশ্বর মানুষের আত্মার উপর এমন ভাবে ক্রিয়া করে না যাতে মানুষ ঈশ্বরের নিছক নিষ্ক্রিয় যন্ত্রে পরিণত হয়। মানুষের নিজের ইচ্ছা আছে। ঈশ্বর ব্যক্তির ইচ্ছাকে জানেন এবং ঈশ্বর ও ব্যক্তির ইচ্ছা দুটি সম্পূর্ণ ভিন্ন বিষয়। ঈশ্বরবাদীদের মতে জীবাত্মার চেতনা ঈশ্বরের চেতনা নয়, যদিও ঈশ্বর এই চেতনার প্রকৃতি জানেন।

মানুষ নিষ্ক্রিয় যন্ত্র নয়

মার্টিন্যু (*Martineau*), লোট্‌জা (*Lotze*)-এর মতে ঈশ্বর জগতের অন্তর্বর্তী কিন্তু সম্পূর্ণভাবে জীবের অতিবর্তী। মার্টিন্যুর ভাষায়, সর্বেশ্বরবাদ এবং ঈশ্বরবাদের বিরোধ হল 'পরিপূর্ণ অন্তর্বর্তীতা' (all immanences) এবং 'কিছু অতিবর্তীতা' (some transcendences)। ঈশ্বরবাদের মতে ঈশ্বর জীবাত্মা সৃষ্টি করার পর তাকে ইচ্ছার স্বাধীনতা দিয়েছেন এবং নিজের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা জীবের উপরই অর্পণ করেছেন।

মার্টিন্যুর অভিমত

মার্টিন্যুর ভাষায় 'সমগ্র বাহ্য বিশ্ব জগৎকে আমরা অন্তর্যামী ইচ্ছার কাছে সমর্পণ করি, যে বিশ্বজগত তার সুসংহত প্রকাশ। কিন্তু নৈতিক সত্তার ঐচ্ছিক প্রকৃতিকে সর্বেশ্বরবাদী গ্রাস থেকে রক্ষা করা উচিত, যা ঐশ্বরিক সত্তা ভিন্ন এক স্বাধীন কারণ, যদিও ঐশ্বরিক সত্তার সঙ্গে সমজাতীয়।'

সিদ্ধান্ত: ঈশ্বরের সঙ্গে জীব ও জগতের সম্পর্ক সম্বন্ধীয় বিভিন্ন মতবাদগুলির তুলনামূলক বিচারে ঈশ্বরবাদই সন্তোষজনক ও যুক্তিগ্রাহ্য মনে হয়। প্রথমতঃ, অতিবর্তী ঈশ্বরবাদ এবং সর্বেশ্বরবাদের এক সুষম সমন্বয় এই মতবাদে দেখতে পাই। তাছাড়া, সর্বেশ্বরবাদের দোষত্রুটি থেকেও এই মতবাদ মুক্ত। সর্বেশ্বরবাদ হল শূন্যগর্ভ অদ্বৈতবাদ। সর্বেশ্বরবাদ বহুকে উপেক্ষা করে একবেই সত্য বলে মনে করেছে, আর বহুত্ববাদ একবে উপেক্ষা করে বহুকে, বা ঐক্যকে উপেক্ষা করে বিভেদকেই সত্য বলে মনে করেছে। ঈশ্বরবাদ এক এবং বহুর, ঐক্যের এবং বিভেদের মধ্যে সমন্বয়-সাধন করেছে। ঈশ্বর বহুর মধ্যে এক (unity-in plurality), বিভেদের মধ্যে ঐক্য (identity-in-difference)। যে ঈশ্বর জীব ও জগতের মধ্য দিয়ে নিজেকে প্রকাশ করে না, সেই ঈশ্বর এক অমূর্ত শক্তি, সেই ঈশ্বর অপূর্ণ। কিন্তু ঈশ্বরবাদীদের মতে ঈশ্বর কোন অমূর্ত শক্তি নয়; এ হল জীব ও জগৎ নিয়ে এক মূর্ত সত্তা।

ঈশ্বরবাদ সন্তোষজনক মতবাদ নয়

ঈশ্বর বহুর মধ্যে এক, বিভেদের মধ্যে ঐক্য

এই মতবাদ নানা কারণে সন্তোষজনক। এই মতবাদ সীমা ও অসীম, সান্ত ও অনন্তের যে দ্বৈত তার সমাধান করতে পারে, কারণ অসীম অনন্ত ঈশ্বর, সান্ত ও

অসীমের মধ্য দিয়েই নিজেকে প্রকাশ করেন। এই মতবাদ জীবের নৈতিকতা ও ধর্মসম্পর্কীয় অনুভূতিরও যথার্থ ব্যাখ্যা দিতে পারে। ঈশ্বর জীবের মধ্যে অন্তঃস্থিত হলেও জীব ঈশ্বরের দ্বারাই সম্পূর্ণ ভাবে নিয়ন্ত্রিত নয়। জীবের স্বাধীন ইচ্ছা আছে এবং সেই কারণে কৃতকর্মের নৈতিক দায়িত্ব জীবেরই। যেহেতু এই মতবাদ জীবের স্বাধীন ইচ্ছা ও স্বতন্ত্র সত্তা স্বীকার করে, সেইহেতু জীবের ধর্মসম্পর্কীয় অনুভূতি অলীক বা মিথ্যা নয়। এই মতবাদ জগতের স্বতন্ত্র সত্তা এবং ঈশ্বরের সঙ্গে এই জগতের অনিবার্য ও আংগিক সম্পর্ক স্বীকার করে। সুতরাং এই জগৎ অলীক বা মিথ্যা নয়। ঈশ্বর এক পরম ধীশক্তি, যিনি এই জগতের মধ্য দিয়ে নিজেকে প্রকাশ করেছেন। সেইকারণেই এই জগতে ঐক্য, শৃংখলা, সামঞ্জস্য রয়েছে এবং এই জগৎ উদ্দেশ্যমূলক। এই জগতের কোন কিছুই আকস্মিক নয়। জ্ঞানের উৎপত্তি এবং জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়র বা মন ও জড়ের যে সম্বন্ধ, এই মতবাদ তা সন্তোষজনকভাবে ব্যাখ্যা করতে পারে। মন ও জড় বা জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় একই পরমসত্তা বা ঈশ্বর থেকে উদ্ভূত। কাজেই মন ও প্রকৃতি কোন বিজাতীয় সত্তা নয়, সেই কারণে উভয়ের পারস্পরিক ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া সম্ভব। এই মতবাদ আমাদের জীবনের পরমমূল্যগুলিকেও সন্তোষজনক ভাবে ব্যাখ্যা করতে পারে। সত্য, শিব ও সুন্দরের আদর্শ ঈশ্বরেই মূর্ত। সসীম জীব এই পরমমূল্যগুলিকে নিজের জীবনে উপলব্ধি করতে চায়। সুতরাং সব দিক থেকে বিচার করে দেখলে এই মতবাদই সবচেয়ে সন্তোষজনক মতবাদ মনে হয়।

এই মতবাদ সীমা ও অসীম, সান্ত ও অনন্তের যে দ্বৈত তার সমাধান করতে পারে

এই মতবাদ জগতের সঙ্গে ঈশ্বরের আংগিক সম্পর্ক স্বীকার করে

মন ও প্রকৃতির সম্বন্ধ ঈশ্বরবাদ সন্তোষজনক ভাবে ব্যাখ্যা করে

সত্য শিব ও সুন্দরের আদর্শ ঈশ্বরেই মূর্ত

তবে মার্টিন্যুর ঈশ্বরবাদের বিরুদ্ধে নীচের অভিযোগগুলি আনা যেতে পারে: ঈশ্বর যদি জীবের বাইরে থাকেন, তাহলে জীবের স্বতন্ত্র সত্তা ঈশ্বরের সত্তাকে সীমিত করবে। কিন্তু অসীম ঈশ্বর কোন কিছুর দ্বারা সীমিত হতে পারেন না, সুতরাং জীবের স্বতন্ত্র সত্তার ধারণার মধ্যে আত্মবিরোধ আছে।

মার্টিন্যু মনে করেন যে, জীব সম্পূর্ণভাবে স্বাধীন, যদিও জীবের স্বাধীনতা ঈশ্বর থেকেই উদ্ভূত। কিন্তু জীবের ইচ্ছা সম্পূর্ণ স্বাধীন হতে পারে না, কারণ জীবের পূর্ণ স্বাধীনতা উচ্ছৃংখলতারই নামান্তর। তাছাড়া, জীবের ইচ্ছা জগতের সত্তার দ্বারা সীমিত, সুতরাং জীবের ইচ্ছা সম্পূর্ণ স্বাধীন হতে পারে না। আরও এক কারণে জীবের ইচ্ছা সীমিত, কারণ জীবের পক্ষে ঈশ্বরের উদ্দেশ্য ও পরিকল্পনার বাইরে যাওয়া সম্ভব নয়। ঈশ্বরের ইচ্ছা জীবের ইচ্ছার

জীবের ইচ্ছা সম্পূর্ণ স্বাধীন হতে পারে না

মধ্যে আংশিক ভাবে ব্যাপ্ত থেকে জীবের ইচ্ছাকে নিয়ন্ত্রিত করছে, মার্টিন্যু নিজেই এই কথা স্বীকার করেছেন। মার্টিন্যুর মতে ঈশ্বর আমাদের সকল সম্ভাব্য অবস্থার কারণ হতে পারেন, কিন্তু তিনি আমাদের কৃতকর্মের জন্য দায়ী নন। ঈশ্বর আমাদের কাজের মোটামুটি ধারণা নির্ধারণ করে দিয়েছেন যদিও তার বিস্তারিত পরিকল্পনা ঈশ্বর পূর্ব থেকে নির্ধারণ করে দেননি। ঈশ্বর আরও একভাবে জীবের মধ্যে আংশিকভাবে ব্যাপ্ত। নৈতিক আদর্শের মাধ্যমে তিনি মানুষের মধ্যে নিজেকে প্রকাশ করেন।

মার্টিন্যুর মতে নৈতিক আদর্শ বাইরে থেকে মানুষের উপর ঈশ্বর কর্তৃক আরোপিত হয়। আমরা জানি নৈতিক আদর্শ আমরাই আমাদের উপর আরোপ করি। আমাদের বৃহত্তর সত্তা আমাদের ক্ষুদ্রতর সত্তার উপরই এই আদর্শ প্রয়োগ করে—এই ধারণা নৈতিকতার দিক থেকে অধিক যুক্তিসংগত ধারণা।

ভারতীয় দর্শনে ঈশ্বরের অতিবর্তীতা ও অন্তর্বর্তীতা (Immanence and Transcendence of God in Indian Philosophy) **:** ভারতীয় দর্শনে ঈশ্বরের অতিবর্তীতা ও অন্তর্বর্তীতার উল্লেখ দেখা যায়। ঋগ্বেদের বিভিন্ন মন্ত্রে একাধিক দেবতার স্তুতি করা হয়েছে। দেবতাদের মধ্যে ইন্দ্র, অগ্নি, বায়ু, বরুণ প্রভৃতি প্রধান। বৈদিক সংহিতায় উল্লিখিত এই সব দেবতাদের বর্ণনা থেকে বোঝা যায় যে, জড় প্রকৃতির বিভিন্ন জড়বস্তু—যেমন ঝড়, ঝঞ্ঝা, মেঘ, বিদ্যুৎ, বৃষ্টি, বন্যা, দাবাগ্নি প্রভৃতির অধিষ্ঠাতা রূপে এক একটি দেবতার কল্পনা করা হয়েছে। বৈদিক ঋষিগণ বিভিন্ন প্রাকৃতিক ঘটনার অন্তরালে এক সর্বব্যাপী নিয়ম ও শৃঙ্খলার অস্তিত্বে বিশ্বাস করতেন। একেই বেদে ঋত নামে অভিহিত করা হয়েছে। এই ঋত কেবল বহির্জগতের নিয়ম নয়, অন্তর জগতেরও নিয়ম।

ঋগ্বেদে এক সর্বব্যাপী নিয়ম ও শৃঙ্খলার কথা আছে

বেদে বহু দেবতার বর্ণনা লক্ষ্য করে অনেকে বেদকে বহু ঈশ্বরবাদী (polytheistic) বলে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু ম্যাক্সমুলার (*Maxmuller*) বলেন যে, আসলে বেদের যে দেবতাতত্ত্ব তাকে বহু ঈশ্বরবাদ বলে আখ্যাত না করে 'এক পরম সত্তায় বহু দেবতার মিলন' (henotheism) বলে অভিহিত করাই শ্রেয়ঃ। ঋগ্বেদের বিভিন্ন দেবতা যে এক পরম সত্তার বিকাশ তা ঋগ্বেদের বিভিন্ন মন্ত্র থেকে বেশ সুন্দরভাবে বোঝা যায়।

এক পরম সত্তায় বহু দেবতার মিলন

ঋগ্বেদের পুরুষ সূক্তে এক পরম পুরুষের বর্ণনা পাওয়া যায় যিনি বিশ্বব্যাপী হয়েও বিশ্বাতিগ অর্থাৎ বিশ্বকে অতিক্রম করে আছেন। পাশ্চাত্য ধর্মতত্ত্বে এই অভিমত ঈশ্বরবাদ বা সর্বধরেশ্বরবাদের অনুরূপ। ঋগ্বেদের প্রসিদ্ধ নাসদীয় সূক্তে বিশ্বের

সৃষ্টি রহস্যের বর্ণনায় এক নির্বিশেষ পরম সত্তার উল্লেখ পাওয়া যায়। এই সত্তা সৎ নন, আবার অসৎ নন। তিনি অনির্বচনীয়। তিনি সদসতের অতীত অবস্থা।

এক পরম পুরুষের বর্ণনা

যে পরমতত্ত্ব বা এক সর্বব্যাপী সত্তার ধারণা বৈদিক ঋষিদের অন্তর্দৃষ্টির কাছে ধরা পড়েছে, তাই যুক্তিতর্কের মাধ্যমে আলোচিত হয়ে উপনিষদে একটি সুস্পষ্ট, সুবিন্যস্ত দার্শনিক মতবাদরূপে গড়ে উঠেছে। এই পরম সত্তাকেই উপনিষদে কখনও ব্রহ্ম, কখনও আত্মা, কখনও ভগবান, বা কখনও কেবলমাত্র সৎ বলে অভিহিত করা হয়েছে। ব্রহ্ম কেবল সৎ স্বরূপ বা চিৎস্বরূপ নন, তিনি আনন্দ স্বরূপও।

বিভিন্ন উপনিষদে সৃষ্টির যে বর্ণনা দেওয়া হয়েছে তার মধ্যে মিল নেই, কিন্তু সবাই একমত যে, ব্রহ্ম জগতের স্রষ্টা এবং জগতের উপাদান কারণ। কিন্তু ব্রহ্ম কি সত্যই জগৎ স্রষ্টা এবং সৃষ্ট জগৎ কি সত্য? কিংবা ব্রহ্ম প্রকৃতই কোন জগৎ সৃষ্টি করেন নি, জগৎ মায়িক অবভাস মাত্র।

শংকরের মতে ব্যবহারিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে জগৎ সত্য এবং ব্রহ্ম জগতের স্রষ্টা, পালক ও সংহারক। ব্যবহারিক দৃষ্টিতে ব্রহ্ম সগুণ এবং সগুণ ব্রহ্মই ঈশ্বর। এই ঈশ্বর ভক্তের ভগবান, উপাসকের উপাস্য দেবতা। কিন্তু পারমার্থিক দৃষ্টিতে ব্রহ্ম শুদ্ধ নির্বিশেষ চৈতন্য। অজ্ঞ ব্যক্তিরাই জগৎ ও ঈশ্বর উভয়কেই সত্য মনে করেন কিন্তু যাঁরা বিজ্ঞ তাঁরা জানেন, জগৎ অবভাস মাত্র এবং প্রকৃতপক্ষে জগৎ স্রষ্টার অস্তিত্ব নেই। শংকরের মতে ঈশ্বরের অতিবর্তীতাকে এবং অন্তর্বর্তীতাকে উপনিষদে এইভাবে বুঝে নিতে হবে। কাজেই শংকর ব্যবহারিক ও পারমার্থিক দুটি দৃষ্টিভঙ্গি থেকে ঈশ্বরের অতিবর্তীতা ও অন্তর্বর্তীতায় বিশ্বাস করেন।

শংকরের মতবাদ

রামানুজের মতে ঈশ্বর বা ব্রহ্ম নিজের স্বাভাবিক শক্তির সাহায্যে এই বিশ্বজগৎ সৃষ্টি করেছেন। কাজেই ঈশ্বরের সৃষ্ট কার্য সত্য। রামানুজের মতে ব্রহ্ম যেমন সত্য, ব্রহ্মের সৃষ্ট জগৎও অনুরূপ সত্য। কোনটিই মিথ্যা নয়। কাজেই রামানুজের মতবাদ হল ঈশ্বরবাদ।

কাজেই ভারতীয় দর্শনে ঈশ্বরের সঙ্গে জগতের সম্বন্ধ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে কোথাও তাকে অন্তর্বর্তী বলে ব্যাখ্যা করা হয়েছে যা সর্বেশ্বরবাদে পরিণত হয়েছে। আর কোথাও অন্তর্বর্তী, আবার কোথাও অতিবর্তী ও অন্তর্বর্তী উভয়ভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

—

ত্রয়োদশ অধ্যায়

ঈশ্বর এবং জীবাত্মা

(God and the Individual Self)

১। ঈশ্বর এবং জীবাত্মা (God and the Individual Self) :

ঈশ্বর এবং জীবাত্মার সম্বন্ধ নিরূপণ করার পূর্বে আমাদের বুঝে নিতে হবে ঈশ্বর এবং জীবাত্মা বলতে আমরা কি বুঝি। ঈশ্বর হল এক অতীন্দ্রিয় পরমসত্তা যিনি অসীম, অনন্ত, সর্বশক্তিমান, বিভু, সর্বজ্ঞ ও পূর্ণ এবং সকল আদর্শের উৎস। ঈশ্বর এই জগতের স্রষ্টা ও নিয়ামক। তিনি এই জগতের আশ্রয়। জীবাত্মা হল এক সান্ত সত্তা, যে সত্তা ব্যক্তিত্বসম্পন্ন, যে সত্তা সীমিত স্বাধীনতা ও স্বাতন্ত্র্যের অধিকারী। জীবাত্মা নিজ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য কর্মসম্পাদন করে এবং জগতে একটি বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে।

ঈশ্বর এবং জীবাত্মার প্রকৃতি

ঈশ্বর জীবের সঙ্গে কিভাবে সম্পর্কযুক্ত, ধর্মতত্ত্ব বা ধর্মদর্শনের পক্ষে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। প্রকৃতির যেটি অনাত্মার দিক (non-human aspect) তার তুলনায় ঈশ্বর জীবাত্মার সঙ্গেই যে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কযুক্ত, এই বিষয়টি সকল ঈশ্বরবাদীই স্বীকার করেন। কারণ তাঁরা মনে করেন, মানুষ বা জীবাত্মা ঈশ্বরেরই প্রতিরূপ। ঈশ্বরের সঙ্গে জীবাত্মার সম্বন্ধের স্বরূপ নিয়ে দার্শনিকদের মধ্যে মতভেদ দেখা যায়।

ঈশ্বরের সঙ্গে জীবাত্মার সম্বন্ধ নিরূপণ করতে গিয়ে জন টলেণ্ড (*John Toland*), চাব (*Chubb*) প্রমুখ অষ্টাদশ শতাব্দীর অতিবর্তীবাদীরা (Deists) মনে করেন, ঈশ্বর জীবাত্মার সম্পূর্ণ অতিবর্তী সত্তা। ঈশ্বর জগৎ সৃষ্টি করার পর যেমন জড় দ্রব্য সৃষ্টি করলেন, তেমনি বহু জীবাত্মা সৃষ্টি করলেন। তিনি এইসব জীবাত্মাকে ইচ্ছার স্বাধীনতা দিলেন যাতে তারা নিজ নিজ ইচ্ছানুসারে কর্ম করতে পারে। জীবাত্মা স্বাধীন ইচ্ছাশক্তির বলে এমন কার্য করতে পারে যা ঈশ্বরের সৃষ্টি পরিকল্পনাকে ব্যাহত করে বিপর্যয় সৃষ্টি করতে পারে। তখন প্রয়োজনে ঈশ্বর হস্তক্ষেপ করেন।

অতিবর্তী ঈশ্বরবাদীদের মতে ঈশ্বর ও জীবাত্মার সম্বন্ধ

অতিবর্তী ঈশ্বরবাদ ঈশ্বর ও জীবাত্মার সম্পর্ক সন্তোষজনকভাবে ব্যাখ্যা করতে পারে না। এই মতবাদ জীবাত্মার পূর্ণ স্বাধীনতা ও স্বাতন্ত্র্য স্বীকার করে, যা স্বীকার করা যুক্তিসংগত নয়। মানুষের স্বাধীনতা আপেক্ষিক। এই স্বাধীনতা ঐশ্বরিক ইচ্ছার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ ও সংগতিপূর্ণ। তাছাড়া ঈশ্বর বহির্ভূত জীবাত্মার স্বাধীন সত্তা ঈশ্বরের সত্তাকে সীমিত

অতিবর্তী ঈশ্বরবাদের সমালোচনা

করবে। ঈশ্বর অনাদি, অসীম ও অনন্ত, তিনি কোন কিছুর দ্বারা সীমিত হতে পারেন না। অতিবর্তী ঈশ্বরবাদ ধর্ম জীবনের আকুতি পরিতৃপ্ত করতে পারে না। ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি ঈশ্বরের নিবিড় সান্নিধ্য লাভের প্রয়াসী। জগৎ-বহির্ভূত ঈশ্বরের সঙ্গে জীবাত্মার নিবিড় সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না।

স্পিনোজার সর্বেশ্বরবাদ

সর্বেশ্বরবাদ (Pantheism) অনুসারে ঈশ্বর সম্পূর্ণভাবে জীবাত্মার মধ্যেই ব্যাপ্ত। ঈশ্বর নিরপেক্ষ জীবাত্মার কোন স্বতন্ত্র সত্তা নেই। দার্শনিক স্পিনোজা (*Spinoza*) এই মতবাদের একজন সমর্থক। তাঁর মতে ঈশ্বরই একমাত্র পরম দ্রব্য। তিনি অসীম ও অনন্ত। ঈশ্বরের অনন্ত গুণের মধ্যে মানুষের মন মাত্র দুটিকে জানতে পারে। একটি চিন্তন (thought) এবং অপরটি বিস্তৃতি। জীবাত্মা ঈশ্বরের অনন্ত চেতনার প্রকাশ। ঈশ্বরেরই যথার্থ সত্তা আছে। সমুদ্র ছাড়া তরঙ্গের যেমন নিজস্ব কোন সত্তা নেই তেমনি ঈশ্বর ছাড়া সান্ত জীবাত্মার নিজস্ব কোন সত্তা নেই। জীবাত্মা ঈশ্বরের প্রত্যংশ (modes)। প্রত্যংশ হল সীমিত রূপ যার মাধ্যমে ঈশ্বর নিজেকে প্রকাশ করেন। প্রত্যংশ ঈশ্বরের অবভাস (appearance)।

সমালোচনা

এই মতবাদও ঈশ্বরের সঙ্গে জীবাত্মার সম্বন্ধ সন্তোষজনকভাবে ব্যাখ্যা করতে পারে না। এই মতবাদ জীবাত্মার কোন স্বাধীন সত্তা বা ইচ্ছার স্বাধীনতা স্বীকার করে না। জীবের যদি স্বাধীন ইচ্ছা না থাকে, ধর্মোপাসনার কোন অর্থ হয় না, নৈতিক দায়িত্বও হয়ে পড়ে একটি শূন্যগর্ভ নৈতিক ধারণা। জীবাত্মা যে একটি স্বতন্ত্র সত্তা, জীবাত্মা তার আত্মনির্ধারণের ক্ষমতা ও আত্মসচেতনতার মাধ্যমেই তা জানতে পারে।

দার্শনিক হেগেলের পরব্রহ্ম সসীম জগত ও সান্ত জীবাত্মার মধ্য দিয়ে নিজেকে প্রকাশ ক'রে, নিজেকে উপলব্ধি করে। পরব্রহ্মের আত্মজ্ঞান ও আত্মোপলব্ধির পথে জীবাত্মা হল একটি স্তর মাত্র। জীবাত্মা পরব্রহ্মের দ্বারা চালিত নিছক যন্ত্র মাত্র। অনেকের মতে হেগেলের মতবাদেও জীবাত্মার যথার্থ স্বাধীনতা অস্বীকৃত।

মার্টিন্যুর অভিমত

মার্টিন্যু-র মতে ঈশ্বর জড়বস্তুর অতিবর্তী না হলেও সম্পূর্ণভাবে জীবের অতিবর্তী। ঈশ্বর জীবাত্মা সৃষ্টি করার পর তাকে ইচ্ছার স্বাধীনতা দিয়েছেন এবং নিজের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা জীবের উপরই অর্পণ করেছেন। মার্টিন্যুর মতে ঈশ্বর যদি জীবের অন্তঃস্থিত হন তাহলে জীবের স্বাধীন অস্তিত্ব ও ইচ্ছার হানি ঘটবে এবং জীবের কৃত পাপ ঈশ্বরের গৌরবকে কলঙ্কিত করবে। কাজেই ঈশ্বর স্বেচ্ছায় নিজের অনন্তত্বকে (infinity) সীমিত করে জীবের অতিবর্তী

হয়েছেন। সুতরাং জগতের সঙ্গে ঈশ্বরের অনিবার্য ও অন্তরঙ্গ সম্পর্ক থাকলেও জীবের সঙ্গে ঈশ্বরের সম্পর্ক অনেকটা বহিরাগত সম্পর্কে পরিণত হয়েছে।

মার্টিন্যুও ঈশ্বর এবং জীবের সম্পর্ক সন্তোষজনক ভাবে ব্যাখ্যা করতে পারেননি। মার্টিন্যু মনে করেন, জীব সম্পূর্ণভাবে স্বাধীন, যদিও জীবের স্বাধীনতা ঈশ্বর থেকে উদ্ভূত। জীবের ইচ্ছা সম্পূর্ণ স্বাধীন হতে পারে না, কারণ জীবের পূর্ণ স্বাধীনতা উচ্ছৃঙ্খলতারই নামান্তর হবে। জীবের ইচ্ছা আরও এক কারণে সীমিত, কেননা জীবের পক্ষে ঈশ্বরের উদ্দেশ্য ও পরিকল্পনার বাইরে যাওয়া সম্ভব নয়। এছাড়াও ঈশ্বর যদি সম্পূর্ণভাবে জীবের বাইরে থাকেন, জীবের স্বতন্ত্র সত্তা ঈশ্বরের সত্তাকে সীমিত করবে।

সমালোচনা

ভারতীয় দর্শনে অদ্বৈতবাদী শংকরের মতে এক অদ্বয় ব্রহ্মেরই সত্তা আছে; জীবের কোন স্বতন্ত্র সত্তা নেই। জীবের ব্যবহারিক সত্তা আছে কিন্তু কোন পারমার্থিক সত্তা নেই। পারমার্থিক দৃষ্টিতে জীবই ব্রহ্ম। জীব মায়া বা অবিদ্যার সৃষ্টি। ব্রহ্ম শুদ্ধ নির্বিশেষ চৈতন্য। মায়া প্রভাবে সগুণ ব্রহ্ম বহু জীবাত্মায় নিজেকে প্রকাশ করেন। তত্ত্বজ্ঞানে অবিদ্যা দূরীভূত হলে জীব ও ব্রহ্মের ভেদাভেদ লোপ পায় এবং জীব ব্রহ্মের ঐক্য সাধিত হয়। শংকরের অদ্বৈতবাদী দর্শনে সগুণ ব্রহ্ম বা ঈশ্বর এবং জীবাত্মার, উভয়ের কারও পারমার্থিক সত্তা নেই, কিন্তু উভয়ের মধ্যে পার্থক্য আছে। ঈশ্বর সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিমান। কিন্তু জীবের জ্ঞান ও শক্তি সীমিত। ঈশ্বর নিয়ন্তা, জীব ঈশ্বরের নিয়ম্য। ব্যবহারিক দৃষ্টিতে ব্রহ্ম সগুণ এবং সগুণ ব্রহ্মই ঈশ্বর। ঈশ্বর জগতের নিয়ন্তা, ঈশ্বর ভূতাধিপতি, ঈশ্বর ভূতপালক। এই ঈশ্বরই ভক্তের ভগবান, উপাসকের উপাস্য দেবতা।

শংকরের অভিমত

সমালোচনায় বলা যেতে পারে, শংকরের অদ্বৈতবাদী দর্শনে পারমার্থিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে জীবাত্মার যথার্থ কোন সত্তা স্বীকৃত হয়নি। জীবাত্মা ব্রহ্মের মধ্যে লীন হয়ে গেছে।

ব্র্যাড্‌লি (*Bradley*)-র মতানুসারে পরব্রহ্ম হল এক সর্বব্যাপক পরম অভিজ্ঞতা (Absolute Experience) যার মধ্যে সব অভিজ্ঞতার সুষম সমন্বয় ও সামঞ্জস্য ঘটেছে। এই পরব্রহ্ম এক নির্বিশেষ ও স্वবিরোধমুক্ত, অখণ্ড, পূর্ণ সুসংহত অভিজ্ঞতা। তাঁর মতে ঈশ্বর এবং পরব্রহ্মের মধ্যে পার্থক্য আছে। পরব্রহ্ম পুরুষ নয়, ঈশ্বর পুরুষ। পরব্রহ্ম সব দ্বৈত এবং সম্বন্ধের ঊর্ধ্বে। অপরপক্ষে ঈশ্বর জীবের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত হওয়াতে জীবের দ্বারা সীমিত, সেইহেতু সান্ত ও অপূর্ণ। ব্র্যাড্‌লির মতে ঈশ্বর ও জীবের কোন পারমার্থিক সত্তা নেই। উভয়ই

ব্র্যাড্‌লির অভিমত

পরব্রহ্মের আভাসমাত্র (mere appearance)। যেহেতু পরব্রহ্ম সব সম্বন্ধের ঊর্ধ্বে, সেইহেতু জীবের সসীম ইচ্ছাশক্তির সঙ্গে পরব্রহ্মের কোন ব্যবহারিক সম্পর্ক থাকতে পারে না।

বোসাংকয়েটের অভিমত

ব্রাড্‌লির মতন বোসাংকয়েট (*Bosonquet*)-ও মনে করেন যে, পরমসত্তা এক পূর্ণ সুসংহত সত্তা, ধর্মের ঈশ্বরের সঙ্গে এক ও অভিন্ন নয়। ব্রাডলি ও বোসাংকয়েট উভয়ের মতে পরব্রহ্মের স্ববিরোধমুক্ত ও সুসংহত সত্তার মধ্যে জীব তার স্বকীয় বৈশিষ্ট্য ও স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করে অস্তিত্বশীল হতে পারে না। পরম সত্তার মধ্যে জীবাত্মা সম্পূর্ণ রূপান্তরিত হয়ে বিরাজ করে। অর্থাৎ জীবাত্মার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়ে যায়।

প্রিঙ্গল প্যাটিসনের অভিমতের সমালোচনা

ব্রাড্‌লি ও বোসাংকোয়েট-এর পরব্রহ্মবাদের সমালোচনা করতে গিয়ে প্রিঙ্গল প্যাটিসন (*Pringle Pattison*) বলেন যে, জীবাত্মাকে পরব্রহ্মের আভাসমাত্র বলা চলে না। আমাদের ধর্মীয় অভিজ্ঞতা ও উন্নত নীতিবোধ প্রমাণ করে যে, জীবাত্মা নিজ নিজ ব্যক্তিত্ব ও বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ণ রেখে পরম সত্তা ঈশ্বরের সঙ্গে অখণ্ড ঐক্য স্থাপন করে তাকে উপলব্ধি করতে পারে। প্রিঙ্গল প্যাটিসন বলেন, "যে আত্মা অপর আত্মার নিছক প্রকাশপথ বা মুখপাত্র, সেই আত্মা প্রকৃত আত্মা নয়। আত্মার প্রকৃতিই হল যে, আত্মা চিন্তা করে, ক্রিয়া করে এবং তার নিজের কেন্দ্র থেকে জগতকে প্রত্যক্ষ করে……[1]

শিলার, ওয়ার্ড ও হাওয়িসন প্রমুখ বহুত্ববাদীদের অভিমত

শিলার (*Schiller*), হাওয়িসন (*Howison*), ওয়ার্ড (*Ward*) প্রমুখ বহুত্ববাদিগণ জীবাত্মাকে ঈশ্বর থেকে স্বতন্ত্র সত্তা রূপে গণ্য করেন। শিলারের মতে ঈশ্বর জীবাত্মাকে সৃষ্টি করেন না। জীবাত্মা স্বয়ং সৃষ্ট। তিনি ঈশ্বরকে এক অসীম সত্তারূপে কল্পনা করেন না। তাঁর মতে জীবাত্মা এবং ঈশ্বর উভয়েই পুরুষ। কেবলমাত্র ঈশ্বরের মধ্যে জ্ঞান, শক্তি ও চেতনা সর্বাধিক মাত্রায় থাকায় তিনি পুরুষদের মধ্যে প্রধান। অধ্যাপক হাওয়িসন মনে করেন—ঈশ্বর পুরুষ, তবে শিলারের ঈশ্বরের মতন কোন সান্ত সত্তা নয়। তাঁর মতে এই জগৎ অসংখ্য জীবাত্মার দ্বারা পূর্ণ এবং প্রতিটি জীবাত্মার আত্মসচেতনতা আছে, যা জীবাত্মাকে পরস্পরের থেকে স্বতন্ত্র করে।

---

1. "A self which is merely the channel or mouthpiece of another self is not a self. It is of the very nature of a self that it thinks and acts and views the world from its own centre ....."

—Pringle Pattison: The Idea of God; Page 288

পুরুষত্ব বা ব্যক্তিত্ব (personality) যেহেতু সামাজিক বিষয়, সেইহেতু অন্যের সঙ্গে সম্পর্ক নির্দেশ করে। ঈশ্বর যেহেতু পুরুষ, ঈশ্বর জীবাত্মার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। ঈশ্বর জীব-সমাজের সভ্য। তিনি জীব সমাজের অধিকর্তা। কাজেই ঈশ্বর যেহেতু স্বাধীন জীবের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত, সেইহেতু সীমিত। কিন্তু তিনি সান্ত (finite) নন। কাজেই হাওয়িসনের মতে ঈশ্বর ও জীবাত্মা উভয়েই পরম ও স্বাধীন সত্তা। জেমস্ ওয়ার্ড (*James Ward*)-ও জীবাত্মার বহুত্ব ও স্বাধীন সত্তা স্বীকার করেন।

এই সব বহুত্ববাদী দার্শনিকদের অভিমতের সমালোচনায় বলা চলে যে এঁরাও ঈশ্বরের সঙ্গে জীবাত্মার সম্পর্ক যথাযথভাবে ব্যাখ্যা করতে পারেননি। এরা জীবের

সমালোচনা

স্বাধীন সত্তা স্বীকার করেছেন কিন্তু ঈশ্বরের অখণ্ড ঐক্যের সঙ্গে তার সম্পর্ক যথাযথভাবে নিরূপণ করতে পারেননি। ঈশ্বরের সান্তত্ব স্বীকার করা চলে না, বা ঈশ্বরের সঙ্গে জীবাত্মার সম্পর্ক ব্যাখ্যা করতে গিয়ে একটি সান্ত সত্তার সঙ্গে আর একটি সান্ত সত্তার সম্পর্কের পরিপ্রেক্ষিতে ঈশ্বর ও জীবাত্মার সম্পর্ক ব্যাখ্যাত হতে পারে না। ধর্মের জন্য ঈশ্বরের অসীমত্ব, অনন্তত্ব ও অভিনবত্বের প্রয়োজন আছে। কাজেই ঈশ্বরের ক্রিয়াকে জীবাত্মার ক্রিয়ার সঙ্গে অভিন্ন গণ্য করা চলে না। ঐক্যের মধ্যেই বহু তার অর্থ ও মূল্য খুঁজে পেতে পারে, তাদের অসংগতি দূরীভূত হলেও সংগতিপূর্ণ হতে পারে, যে ঐক্য বহুকে ব্যাখ্যা করবে এবং তাদের মধ্যে অসংগতি দূর করে তাদের সমন্বয় সাধন করবে। জীবাত্মা ও ঈশ্বরের যথাযথ সম্পর্ক ব্যাখ্যার জন্য ঈশ্বরকে উপরিউক্ত এক মূর্ত ঐক্য ও শক্তিরূপে গণ্য করতে হবে, যে ঐক্যের মধ্যে জীবাত্মা তার স্বকীয় বৈশিষ্ট্য বজায় রেখে জীবনের পরমমূল্যগুলিকে এবং ঐশ্বরিক জীবনকে উপলব্ধি করবে।

ভারতীয় দর্শনে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী রামানুজস্বামী ব্রহ্ম বা ঈশ্বরকেই পরমসত্তা গণ্য করেন। তবে তাঁর মতে চিৎ ও অচিৎ ব্রহ্মের দুই অংশ। অচিৎ অংশ থেকে জড়বস্তু

রামানুজের ব্যাখ্যা

এবং চিৎ অংশ থেকে চেতন জীবের সৃষ্টি। রামানুজ জীবাত্মার সত্তা স্বীকার করলেও তাদের স্ব-নির্ভর সত্তা স্বীকার করেননি। কারণ ব্রহ্মের শরীর রূপেই জীবাত্মার সত্তা আছে। জীবাত্মার কোন স্বাধীন সত্তা নেই। চিৎ এবং অচিৎ ব্রহ্মের শরীর, ব্রহ্ম তাদের আত্মা এবং নিয়ামক। ব্রহ্ম ছাড়া তাদের কোন অস্তিত্ব নেই। চিৎ এবং অচিৎ অংশ নিয়ে ব্রহ্ম এক পরম ঐক্য।

কিন্তু রামানুজ জীবাত্মার সঙ্গে ব্রহ্মের সম্পর্ক ব্যাখ্যা করার জন্য কখনও অংশ

সমালোচনা

অংশী, দেহ আত্মা বা রাজা প্রজার উপমা ব্যবহার করেছেন। কিন্তু উভয়ের মধ্যে সম্পর্কের যথার্থ স্বরূপ তিনি সুস্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করেননি।

দার্শনিক রয়েস (*Royce*)-এর মতে ঈশ্বর হলেন পরম আত্মচৈতন্য (Absolute self-consciousness)। ঈশ্বর ও পরব্রহ্ম অভিন্ন। ঈশ্বর পুরুষ, ঈশ্বর এক আত্ম-সচেতন সত্তা, যিনি তাঁর ইচ্ছাকে এই জগতে কার্যকর করছেন। ঈশ্বর এক সর্বব্যাপক ইচ্ছা বা অভিজ্ঞতা (all-inclusive will or experience)। আমাদের ইচ্ছা ঈশ্বরের ইচ্ছা রূপেই এবং আমাদের চিন্তা ঈশ্বরের সর্বব্যাপী চিন্তার অংশ রূপেই অস্তিত্বশীল হতে পারে। ঈশ্বরের পরম উদ্দেশ্য হল জীব সমূহের বহুবিধ উদ্দেশ্যের সমন্বয় বা অখণ্ড ঐক্য। কাজেই জীবাত্মা ঈশ্বরের অবভাস নয়, বরং সর্বব্যাপী চিন্তার মূর্ত ঐক্যের (concrete unity of universal thought) বাস্তব উপাদান। রয়েসের মতে যদিও ঈশ্বরের বাইরে জীবাত্মার কোন সত্তা নেই, তবু এই জীবাত্মা ঐশ্বরিক জীবনে বিলুপ্ত হয়ে যায় না। পরম সত্তা ঈশ্বরের পরম উদ্দেশ্যের মধ্যে জীবের নিজস্ব ব্যক্তিত্ব অক্ষুণ্ণ থাকে। সান্ত জীবাত্মা ঐশ্বরিক জীবনের অংশীদার।

দার্শনিক রয়েসের অভিমত

বহুত্ববাদী জেমস্ (*William James*) মনে করেন, উপরিউক্ত মতবাদ যেহেতু এক ধরনের সর্বেশ্বরবাদ সেইহেতু ঈশ্বরের জীবন-নিরপেক্ষ জীবাত্মার কোন স্বতন্ত্র অস্তিত্ব থাকে না। জীবাত্মা হয়ে পড়ে ঈশ্বরের ইচ্ছার অভিনব প্রকাশমাত্র তার কোন ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য থাকে না। জেমস্ মনে করেন যে, ঈশ্বর এবং জীবাত্মার মধ্যে যে সম্বন্ধের কথা চিন্তা করা যায় তা হল একটা সাধারণ উদ্দেশ্য সিদ্ধ করার জন্য নিযুক্ত সহকর্মীদের পারস্পরিক সম্বন্ধ, যে উদ্দেশ্যের লক্ষ্য হল মঙ্গলের সৃষ্টি এবং অমঙ্গলের বিরুদ্ধে সংগ্রাম। কিন্তু জেমস্-এর এই অভিমত স্বীকার করে নিলে ঈশ্বরের ঈশ্বরত্বের হানি ঘটে। ঈশ্বর তাঁর অনন্তত্ব হারিয়ে সান্ত সত্তায় পরিণত হবেন। কারণ তিনি অন্য জীবাত্মার অস্তিত্বের দ্বারা সীমিত হয়ে পড়বেন। এই মতবাদ স্বীকার করে নিলে ঈশ্বরকে পরম সত্তারূপে গণ্য করা চলবে না এবং অমঙ্গল ও অপূর্ণতা ঈশ্বর-বহির্ভূত বস্তুরূপে গণ্য হবে। জেমস্-এর সান্ত ঈশ্বর আমাদের ধর্মীয় চেতনাকে পরিতৃপ্ত করতে পারে না। কেননা যে সত্তা পরম সত্তা নয়, সেই সত্তা ছাড়া অন্য কোন সত্তা জীবাত্মার উপাস্য হতে পারে না। ঈশ্বরের ঐক্যমূলক জীবনের মধ্যেই তার অবশ্য প্রয়োজনীয় উপাদানরূপেই অমঙ্গলকে অন্তর্ভুক্ত করে নিতে হবে। অমঙ্গলের পটভূমিকাকে বাদ দিয়ে মঙ্গলের অস্তিত্ব থাকতে পারে না। বস্তুতঃ, অমঙ্গল এবং দুঃখকে জয় করার মধ্য দিয়েই জীবাত্মা শ্রেষ্ঠ নৈতিক মূল্যগুলিকে লাভ করতে পারে। কাজেই মঙ্গল এবং অমঙ্গলের মধ্যে সমন্বয় সাধিত হতে পারে না, তা নয়।

পরমসত্তাই ধর্মের উপাস্য বস্তু হতে পারে, কোন সান্ত সত্তা নয়

ঈশ্বরই সব, সবকিছুই ঈশ্বর। ঈশ্বরের মধ্যে জীবাত্মা বিলুপ্ত হয়ে যায়, তার কোন স্বতন্ত্র সত্তা থাকে না। রয়েসের মতবাদকে উপরিউক্ত সর্বেশ্বরবাদের সঙ্গে অভিন্ন গণ্য করা চলে না। যদিও জীবাত্মার ইচ্ছা ঈশ্বরের ইচ্ছার অংশ, তবু জীবাত্মার স্বতন্ত্র স্বাধীন অস্তিত্ব আছে। অসীম পুরুষ হিসেবে ঈশ্বর বা পরমাত্মা জীবাত্মাকে তাঁর অস্তিত্বের বহির্ভূত করে না, বা জীবাত্মার অস্তিত্বকে অস্বীকার করে না। ঈশ্বরের আত্মোপলব্ধির জন্য জীবাত্মার আবশ্যকীয়তা আছে এবং জীবাত্মার ভিত্তি হিসেবে ঈশ্বরের প্রয়োজনীয়তা আছে। ঈশ্বর ও জীবাত্মা উভয়ই বাস্তব। সসীম অসীমের মধ্যে থেকে এবং অসীমের মধ্য দিয়ে ও অসীম সসীমকে নিজের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করে নিয়ে এবং সসীমের মধ্য দিয়েই বাস্তব হয়ে ওঠে। ঈশ্বর এবং জীবাত্মার মধ্যে উপরিউক্ত সম্বন্ধই উভয়ের মধ্যে যথার্থ সম্বন্ধ নির্দেশ করে। কিভাবে এই সম্বন্ধ কার্যকর হয় তা হয়ত রহস্যাবৃত। আমরা হয়ত এই সম্বন্ধের পূর্ণ স্বরূপ জানিনা, কিন্তু ঈশ্বর এবং জীবাত্মা উভয়েই কোন না কোন অর্থে অবশ্যই বাস্তব।

সমালোচনা

ঈশ্বর ও জীবাত্মা উভয় উভয়ের পক্ষে প্রয়োজনীয়

অসীম সত্তার মধ্যে সান্ত জীবাত্মা মিশে যায়, হারিয়ে যায়, যেমন ভাবে সমুদ্রের মধ্যে নদী তার নিজস্ব সত্তা হারিয়ে ফেলে। এক জীবাত্মার সঙ্গে অন্য জীবাত্মার স্বাতন্ত্র্য অসীম সর্বব্যাপক অভিজ্ঞতার মধ্যে বজায় থাকে না। কাজেই পরমসত্তা বা পরমতত্ত্ব হয়ে পড়ে এমন এক রাত্রি, যেখানে সব গরুকেই কাল দেখায়। কাজেই সান্ত জীবাত্মা এক পরমসত্তার মধ্যে হারিয়ে যায়।

কিন্তু এই জাতীয় ধারণার অর্থ হল ঈশ্বরেরই যথার্থ সত্তা আছে; জীবাত্মার যথার্থ সত্তা নেই। এই ভেদহীন অভেদ সত্তা ঈশ্বরই হল সর্বেশ্বরবাদীদের পরব্রহ্ম বা পরমাত্মা। এই মতানুসারে সার্বিকেরই যথার্থ সত্তা আছে, বিশেষ হল ভ্রান্তি। কিন্তু বিশেষের মধ্য দিয়েই সার্বিক যথার্থ হতে পারে এবং সার্বিকের ভিত্তিতেই বিশেষের বাস্তবতা বা যাথার্থ্য। হেগেল (*Hegel*)-এর মূর্ত অদ্বৈতবাদকে, যাকে রয়েস মোটামুটি অনুসরণ করেছেন, বলেন যে, ঈশ্বরেই মানুষের ভিত্তি এবং জীবাত্মার মধ্যে আত্মপ্রকাশের মধ্য দিয়েই ঈশ্বর বাস্তব সত্তা রূপে গণ্য হতে পারে। জীবাত্মার যদি কোন সত্তা না থাকে, ঈশ্বর হয়ে পড়ে উপাদান-বর্জিত এক শূন্যগর্ভ সত্তা, কাজেই মূর্ত অদ্বৈতবাদ (Concrete Monism)-কে যথার্থ দার্শনিক মতবাদ রূপে গণ্য করে জীবাত্মা এবং ঈশ্বর উভয়কেই বাস্তব বলে স্বীকার করতে হয় এবং ঈশ্বর ও জীবাত্মার মধ্যে এক আন্তর সম্পর্কও স্বীকার করতে হয়। নৈতিক জীবনে মানুষ স্বাধীন কর্মকর্তা, কাজেই তার এক স্বাধীন জীবন আছে,

জীবাত্মা ও ঈশ্বর উভয়ই বাস্তব

যদিও ঈশ্বরের সার্বিক জীবনের সে অংশীদার। ঈশ্বর জীবাত্মার মধ্য দিয়ে নিজেকে প্রকাশ করে এবং জীবাত্মা ঈশ্বরের মধ্য দিয়েই তার সার্থকতা লাভ করে।

ঈশ্বরের সঙ্গে জীবাত্মার ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের কথা স্বীকার করে নিয়ে বলা যেতে পারে যে, জীবের তিনটি দিক আছে—দৈহিক দিক, বৌদ্ধিক দিক এবং নৈতিক দিক। সুতরাং ঈশ্বরের সঙ্গে জীবের সম্বন্ধ অনুধাবন করতে হলে, জীবের এই তিনটি দিকের সঙ্গে ঈশ্বরের সম্বন্ধ অনুধাবন করতে হবে।

(ক) জীবের দৈহিক দিকের সঙ্গে ঈশ্বরের সম্বন্ধ: জীবের দৈহিক দিক হল এক নিষ্ক্রিয় উপাদান যার মাধ্যমে ঈশ্বর নিজেকে এক অসীম আত্মসচেতন জীবরূপে প্রকাশ করেন। এই উপাদান ঈশ্বর থেকেই উদ্ভূত।

(খ) জীবের বৌদ্ধিক দিকের সঙ্গে ঈশ্বরের সম্পর্ক: জীবদেহ জড়বস্তু, অন্য কোন উদ্দেশ্য সাধনের উপায়স্বরূপ। জীবদেহ নিজে কোন উদ্দেশ্য নয়, জীবদেহের আত্মনিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা নেই। কিন্তু আত্মসচেতন জীবাত্মার স্বাধীনভাবে নিজ উদ্দেশ্য নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা আছে। জীবাত্মা পরমাত্মা বা পরমধীশক্তিরই খণ্ড বা সীমিত প্রকাশ, যেহেতু জীবাত্মার ধারণা ঈশ্বরের মনের ধারণারই খণ্ড প্রকাশ।

(গ) জীবের নৈতিক দিকের সঙ্গে ঈশ্বরের সম্পর্ক: জীব এক স্বাধীন সচেতন ব্যক্তি-সত্তা। কিন্তু জীবের স্বাধীনতা যদিও ঈশ্বর থেকে উদ্ভূত, তবু জীবের ইচ্ছার স্বাধীনতা এবং আত্মনিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা আছে। তবে জীবের ইচ্ছার স্বাধীনতা সীমিত, জীবের পক্ষে ঈশ্বরের পরিকল্পনার বাইরে যাবার কোন উপায় নেই।

২। জীবাত্মার স্বাধীনতা (Freedom of the Individual Self):

জীবাত্মা কি স্বাধীন? জীবাত্মার স্বাধীনভাবে কর্ম করার ক্ষমতা আছে কি? স্বাধীনভাবে ক্রিয়া করতে গেলে জীবাত্মার স্বাধীন সত্তা স্বীকার করে নিতে হয়। জীবাত্মার স্বাধীন বা স্ব-নির্ভর সত্তা আছে কি? অর্থাৎ জীবাত্মার স্বাধীন ব্যক্তিত্ব ও ইচ্ছাশক্তির স্বাধীনতা আছে কি?

ধর্ম ও নৈতিকতার জন্য জীবাত্মার স্বাধীনতাকে স্বীকার করে নিতেই হয়। কিন্তু অনেকে জীবাত্মার স্বাধীন ইচ্ছার অস্তিত্বকে স্বীকার করতে চান না। আবার অনেকে মনে করেন যে, জীবাত্মার কোন স্বাধীন সত্তা নেই। জীবাত্মার আবভাসিক সত্তা আছে, যথার্থ সত্তা নেই।

ঈশ্বর ও পরম সত্তার সম্বন্ধ এবং ঈশ্বর ও জীবাত্মার সম্বন্ধ আলোচনা করতে গিয়ে জীবাত্মার স্বাধীন সত্তার বা ব্যক্তিত্বের প্রশ্নটি ইতিপূর্বেই আলোচিত হয়েছে। যে সব

দার্শনিক পরম সত্তাকেই ঈশ্বর গণ্য করেন, তাঁরা পরম সত্তার ইচ্ছা-বহির্ভূত কোন কিছুর অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। ফলে জীবাত্মার কোন স্বাধীন সত্তা স্বীকৃত হয় না। দার্শনিক স্পিনোজা (*Spinoza*) ঈশ্বরকে পরম সত্তার (Absolute) সঙ্গে অভিন্ন গণ্য করেন। পরম সত্তা বা ঈশ্বর হল এক অসীম দ্রব্য। স্পিনোজার মতে এই এক অসীম দ্রব্যেরই যথার্থ সত্তা আছে, বহুর কোন যথার্থ সত্তা নেই। জীবাত্মা অসীম দ্রব্য বা ঈশ্বরের প্রত্যংশ (modes)। প্রত্যংশের নিজস্ব কোন সত্তা নেই। প্রত্যংশ অসীম দ্রব্য বা ঈশ্বরের অবভাস। দার্শনিক হেগেলও ঈশ্বরকেই পরব্রহ্ম গণ্য করেন।

স্পিনোজার মতে জীবের স্বাধীন সত্তা নেই

হেগেলের পরব্রহ্ম সসীম জগৎ ও সান্ত জীবাত্মার মধ্য দিয়ে নিজেকে প্রকাশ করে, নিজেকে উপলব্ধি করে। বিশ্ব জগতের বিবর্তন পরব্রহ্মের যৌক্তিক আত্ম-বিবর্তন। পরব্রহ্মের আত্মজ্ঞান ও আত্মোপলব্ধির প্রক্রিয়ার পথে সব সান্ত বস্তুই হল স্তর মাত্র। হেগেলের মতবাদে জীবের স্বাধীনতা অস্বীকৃত। জীবাত্মা পরব্রহ্মের দ্বারা চালিত নিষ্ক্রিয় যন্ত্র মাত্র, কাজেই হেগেলের মতবাদেও সান্ত জীবাত্মার কোন স্বাধীন সত্তা নেই।

হেগেলের পরব্রহ্মবাদেও জীবের স্বাধীন সত্তা অস্বীকৃত

ব্র্যাডলির পরব্রহ্ম ঈশ্বর নয়। পরব্রহ্ম কোন কিছুর সঙ্গেই সম্বন্ধযুক্ত নয়। কেননা সব সম্বন্ধই সীমিত, সেইহেতু অপূর্ণ; পরব্রহ্ম অপূর্ণ হতে পারে না। ব্র্যাডলির মতে ব্যক্তির স্বাধীন সত্তা অলীক বস্তু। ব্র্যাডলির মতন বোসাংকোয়েটও মনে করেন পরম সত্তাই প্রকৃত ও পূর্ণ সুসংগত সত্ত, ঈশ্বরের সঙ্গে অভিন্ন নয়। উভয়ের মতে পরম সত্তার মধ্যে জীব নিজ বৈশিষ্ট্য ও স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে থাকতে পারে না। এরা সম্পূর্ণভাবে রূপান্তরিত হয়ে বিরাজ করে। দার্শনিক শংকরের মতে এক অদ্বয় ব্রহ্মেরই যথার্থ সত্তা আছে। জীবের কোন স্বতন্ত্র স্বাধীন সত্তা নেই। জীবের ব্যবহারিক সত্তা আছে, কিন্তু কোন পারমার্থিক সত্তা নেই।

ব্র্যাডলি ও বোসাংকোয়েটের অভিমত

উপরের আলোচনা থেকে দেখা যায় যে, এইসব অদ্বৈতবাদী দার্শনিক এক অদ্বৈত সত্তাকে পরব্রহ্মরূপে গণ্য করে খণ্ড জীবাত্মাকে অলীক ও অবাস্তব গণ্য করেন। অদ্বৈতবাদের উপরিউক্ত কোন রূপটিই ধর্মের দিক থেকে গ্রহণযোগ্য নয়। অবশ্য শংকরাচার্য ব্যবহারিক দিক থেকে জগৎ ও জীবাত্মার সত্তা স্বীকার করেছেন। তাঁর মতে সগুণ ব্রহ্ম বা ঈশ্বরই ভক্তের ভগবান, জীবের উপাস্য দেবতা। আবিদ্যক নামরূপ উপাধির দ্বারা উপহিত হওয়ার জন্যই ঈশ্বরের ঈশ্বরত্ব, সর্বজ্ঞত্ব ও সর্বশক্তিত্ব, কিন্তু পারমার্থিক দৃষ্টিতে তিনি অদ্বয়। আসল কথা হল, শুধুমাত্র একের সত্তাকে স্বীকার

করে, বহুর সত্তাকে অস্বীকার করা চলে না। একের সঙ্গে বহুর সম্বন্ধকে যথাযথভাবে ব্যাখ্যা করা যে-কোন দার্শনিকেরই কর্তব্য।

ধর্মের লক্ষ্য হল ঈশ্বরের সঙ্গে জীবাত্মার সংযোগ প্রতিষ্ঠা করা। কাজেই ধর্মের ঈশ্বর হল পুরুষ। কিন্তু ধর্মের ঈশ্বর পরব্রহ্ম থেকে নিম্নস্তরের সত্তা, ব্র্যাডলির এই অভিমত স্বীকার করা চলে না। ব্র্যাডলি বলেন, "ঈশ্বর যদি পূর্ণ হন, তাহলে ধর্মের মধ্যে অসঙ্গতি থাকবে এবং এই সংগতির সন্ধান করতে গিয়ে আমরা এক সান্ত ঈশ্বরের দিকে চালিত হই।" কিন্তু ব্র্যাড্‌লির এই অভিমত স্বীকার করা চলে না। ধর্মপ্রবণ ব্যক্তি যখন কোন ঈশ্বরের উপাসনা করেন তখন তিনি মনে করেন না যে এই ঈশ্বর পরম সত্তা নন। যে সত্ত পরম সত্ত্ব নয়, সান্ত বা সীমিত সত্তা, তা ধর্মপ্রবণ ব্যক্তির ধর্মচেতনা উদ্দীপিত করতে পারে না। আসলে ঈশ্বব ও পরব্রহ্মকে দুটি ভিন্ন সত্তা গণ্য করা যুক্তিসঙ্গত নয়। যে পরব্রহ্ম জীবাত্মাকে নিজের মধ্যে বিলুপ্ত করে দেয়, জীবাত্মার স্বাধীন সত্তাকে স্বীকৃতি দেয় না, সেই পরব্রহ্ম ধর্মের উপাস্য বস্তু হতে পারে না। ধর্মের লক্ষ্য অসীমের মধ্যেই সান্ত তার সার্থকতাকে উপলব্ধি করবে, কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, জীবাত্মার কোন স্বাধীন সত্তা নেই। পরম ঐক্য, পরব্রহ্মের নিশ্চল আত্মকেন্দ্রীভূত, আত্ম-নিয়ন্ত্রিত ঐক্য নয়। এ হল জীবাত্মার উদ্দেশ্যের সমন্বয়, এক অখণ্ড সক্রিয় ঐক্য, যে জীবাত্মা ভালবাসার বা প্রেমের মধ্য দিয়ে ও পারস্পবিক সম্প্রীতির মধ্য দিয়ে তার শ্রেষ্ঠ লক্ষ্যকে সিদ্ধ করতে চায়। প্রিঙ্গল প্যাটিসন, অধ্যাপক রয়েস প্রমুখ স্বীকার করেন না যে, জীবাত্মার কোন স্বাধীন সত্তা নেই বা জীবাত্মা পরম সত্তাব আভাস মাত্র। প্রিঙ্গল প্যাটিসনেব মতে জীবাত্মা আপন আপন ব্যক্তিত্ব ও বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ণ রেখে ঈশ্বরের সঙ্গে ঐক্য স্থাপন করে ঈশ্বরকে উপলব্ধি করতে পারে। অধ্যাপক রয়েসও মনে করেন, পরম সত্তা ঈশ্বরের পরম ইচ্ছার মধ্যেও জীবের নিজ বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ণ থাকে, কারণ জীবের ব্যক্তিত্ব অসীম ব্যক্তিত্বপূর্ণ ঈশ্বরের অপরিহার্য ও অবিচ্ছেদ্য অংশ।

ধর্মের উপাস্য ঈশ্বরও পরম সত্তা

প্রিঙ্গল প্যাটিসন ও অধ্যাপক রয়েসের অভিমত

ঈশ্বরেই পরম সত্তা, ঈশ্বরই পরম তত্ত্ব। তিনি সব মূল্যের উৎস, ঈশ্বর সর্বশক্তিমান তবু তিনি মানুষকে কিছুটা স্বাধীনতা দিয়েছেন। কিন্তু তার দ্বারা ঈশ্বর সীমিত হয়ে পড়েন নি, কেননা ঈশ্বর স্বেচ্ছায় নিজের ইচ্ছাকে কিছুটা সীমিত করেছেন। ঈশ্বর যদি পরমসত্তা হন তাহলে তাঁর নিজেকে সেইভাবে সীমিত করার ক্ষমতা নেই, একথা বলা চলে না। কিন্তু ধর্মের ঈশ্বর কোন পরম সত্তা নয়, এক সীমিত সত্তা।

জীবাত্মার স্বাধীনতা বাস্তব, অলীক নয়। ঈশ্বর সর্বশক্তিমান, তবু তিনি জীবাত্মাকে স্বাধীনভাবে ক্রিয়া করার ক্ষমতা দিয়েছেন। জীবাত্মার স্বাধীনতা জীবাত্মাকে ঈশ্বর প্রদত্ত উপহার, কাজেই এর দ্বারা ঈশ্বর সীমিত হয়ে পড়েন না। জীবাত্মা ঈশ্বরের শক্তি ও ভালবাসার প্রকাশ।

জীবাত্মার স্বাধীনতা বাস্তব

কাজেই ঈশ্বর সর্ব-নিরপেক্ষ অদ্বৈতবাদীদের পরব্রহ্ম নয় এবং জীবাত্মার সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক এক ঘনিষ্ঠ অন্তরঙ্গতার সম্পর্ক।

জীবাত্মার ইচ্ছার স্বাধীনতা: আধ্যাত্মিক ও নৈতিক জীব হিসেবে জীবাত্মা স্বাধীন। সে নিজেই ইচ্ছানুযায়ী বিকল্প কর্মপন্থার মধ্যে একটিকে নির্বাচিত করে নিয়ে কার্য করতে পারে এবং এই ব্যাপারে কোন বাহ্য শক্তির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় না। কিন্তু এই বিষয়টি অনেকে স্বীকার করতে চান না। ইচ্ছার স্বাধীনতার বিষয়টিকে কেন্দ্র করে মতভেদ দেখা যায়। ইচ্ছার স্বাধীনতা অর্থে বোঝায় স্বাধীনভাবে কর্মপন্থা নির্বাচন করে অপরের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত না হয়ে ক্রিয়া করার ক্ষমতা। প্রশ্ন হল, বিকল্প কর্মপন্থার মধ্যে আমাদের কোন একটিকে ইচ্ছামত নির্বাচন করে নেওয়ার ক্ষমতা আছে কি, বা আমরা কোন বহির্শক্তির চাপে ঐ কর্মপন্থাকে নির্বাচন করে নিতে বাধ্য হই? যারা মনে করেন জীবাত্মার স্বাধীন ইচ্ছা নেই তাদের নির্বন্ধবাদী (Determinists) বলা হয়। আর যারা জীবাত্মার স্বাধীন ইচ্ছাকে অস্বীকার করেন তাদের অনির্বন্ধবাদী (Libertarians) বলা হয়।

ইচ্ছার স্বাধীনতার অর্থ

মধ্যযুগের খ্রীষ্টান পাদরীরা মানুষের স্বাধীন ইচ্ছায় বিশ্বাস করতেন। কেননা পাপের (sin) ব্যাখ্যার জন্য স্বাধীন ইচ্ছাকে স্বীকার করার প্রয়োজন ছিল। তাঁদের মতে ঈশ্বর যেহেতু সর্বাঙ্গসুন্দর ও কল্যাণের মূর্তরূপ, সেইহেতু এই জগতের পাপের জন্য ঈশ্বরকে দায়ী করা চলে না। মানুষকে ঈশ্বর ইচ্ছার স্বাধীনতা দিয়েছেন, তাই ঈশ্বরের বিধান বা আদেশ মেনে চলা মানুষের ইচ্ছা নির্ভর। কাজেই মানুষ যখন স্বেচ্ছায় ঈশ্বরের বিধান লঙ্ঘন করে তখনই পাপের উদ্ভব। সুতরাং পাপের জন্য মানুষ দায়ী। ধর্মতত্ত্বে ঈশ্বরের সত্তা রক্ষা করার জন্য মানুষের ইচ্ছার স্বাধীনতার প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল। কিন্তু ধর্মতত্ত্বের কথা বাদ দিলেও নৈতিকতার জন্যই জীবাত্মার স্বাধীন ইচ্ছাকে স্বীকার করে নিতে হয়। ইচ্ছার স্বাধীনতা নৈতিকতার স্বীকার্য সত্য (postulate)। হয় ইচ্ছার স্বাধীনতার অস্তিত্ব আছে, নয়ত নৈতিকতা নিছক ভ্রান্তি। মানুষের ইচ্ছা যদি স্বাধীন না হয়, জাগতিক বা অন্য কোন শক্তির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়, তাহলে নৈতিক

খ্রীষ্টান পাদরীরা ইচ্ছার স্বাধীনতাকে স্বীকার করেছিলেন

কর্তব্য, নৈতিক বাধ্যতাবোধ, গৌরব, অগৌরব, পাপ, পুণ্য, মনস্তাপ, নৈতিক দায়িত্ব, নৈতিক নিয়ম লঙ্ঘনের জন্য প্রদত্ত শাস্তি প্রভৃতি অর্থহীন হয়ে পড়ে। মানুষ স্বেচ্ছায় তার কর্মপন্থা নির্বাচন করে নেয়, কাজেই কাজের নৈতিক দায়িত্ব তার।

নির্বন্ধবাদ (Determinism): নির্বন্ধবাদীরা ইচ্ছার স্বাধীনতা স্বীকার করেন না। তাঁরা মনে করেন যে, শুধুমাত্র জীবাত্মার ইচ্ছা নয়, জগতের প্রতিটি ঘটনাই অপরিবর্তনীয় নিয়মের অধীন। জগতের কোথাও স্বাধীনতা নেই, শুধু অনিবার্যতার অস্তিত্ব আছে। ভারতীয় কর্মবাদ অনুসারে মানুষের সব কর্মই তার অতীতের জীবনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত—মানুষের ভাগ্য বিশ্বজগতের নিয়মের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। নির্বন্ধবাদীরা মনোবিদ্যার দিক থেকে যুক্তি দিতে গিয়ে বলেন যে, ঐচ্ছিক ক্রিয়া ব্যক্তির উদ্দেশ্যের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়, কাজেই জীবের ইচ্ছার স্বাধীনতা নেই।

তত্ত্ববিজ্ঞানের সার্বভৌম যান্ত্রিকতাবাদ এবং কেবলাদ্বৈতবাদ থেকে নির্বন্ধবাদ অনিবার্যভাবে নিঃসৃত হয়। যদি কার্য তার পরবর্তী কারণের দ্বারা যান্ত্রিক ভাবে নির্ধারিত হয় তাহলে স্বাধীনতার প্রশ্নই অবান্তর হয়ে পড়ে। ইচ্ছা যদি স্বাধীন হয় এবং কোন পূর্ববর্তী কারণের দ্বারা নির্ধারিত না হয় তাহলে মনে করতে হবে যে, কারণ ছাড়াও কার্যের উৎপত্তি সম্ভব, অর্থাৎ ইচ্ছারূপ কার্যের কোন কারণ নেই। কিন্তু কার্যকারণ নিয়মানুযায়ী সব ঘটনারই কারণ থাকবে। কাজেই ইচ্ছা স্বাধীন হতে পারে না। অনেক সময় আমাদের কাজের কারণ আমাদের কাছে অজ্ঞাত থাকে বলেই আমরা মনে করি আমরা স্বাধীন। কিন্তু এ আমাদের ভ্রান্ত ধারণা। মানুষের কাজের যে সব পূর্ববর্তী কারণ সেইগুলিকে সম্পূর্ণভাবে জানতে পারলে কাজ সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করা যেতে পারে।

স্পিনোজার কেবলাদ্বৈতবাদ অনুসারে এক পরম সত্তা থেকে সব কিছু অনিবার্যভাবে নিঃসৃত হয়। যেহেতু সব কিছু তার অস্তিত্বের জন্য পরম সত্তা বা পরম দ্রব্যের উপর নির্ভর, কাজেই কোন কিছুই স্বাধীন নয়। ব্যক্তিমন পরম দ্রব্যের প্রত্যংশ, কাজেই ব্যক্তি স্বাধীন কর্মকর্তা হিসেবে কোন কার্য সম্পাদন করতে পারে না। স্বাধীনতার বোধ ভ্রান্তি মাত্র, ব্যক্তি তার কাজের যথার্থ কারণ সম্পর্কে অজ্ঞাত।

ঈশ্বর যদি সর্বজ্ঞ হন তাহলে মানুষের ইচ্ছার স্বাধীনতাকে স্বীকার করা যায় না। ঈশ্বর পূর্ব থেকেই জানেন যে মানুষ কি কাজ করবে। বস্তুতঃ, মানুষের কার্যকলাপ কোন্ পথে চলবে ঈশ্বর পূর্ব থেকেই তা নির্ধারণ করে রেখেছেন। কাজেই ঈশ্বরের পূর্ব-জ্ঞান মানেই পূর্ব-নিয়ন্ত্রণ। সুতরাং মানুষের ইচ্ছার কোন স্বাধীনতা নেই।

সমালোচনা : ইচ্ছার স্বাধীনতার বিপক্ষে যে সব যুক্তি দেওয়া হয়েছে অনির্বন্ধবাদীরা সেইগুলির সমালোচনা করেন। তাঁদের মতে যান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণবাদ বিশ্বজগতের সর্বস্তরে কাযকর নয়, নিম্নস্তরে কার্যকর হলেও, উচ্চস্তরে উদ্দেশ্যবাদ ও ইচ্ছার স্বাধীনতা কার্যকর। মানুষের ঐচ্ছিক ক্রিয়া তার পরিবেশের দ্বারা নির্ধারিত হলেও, ব্যক্তির নিজস্ব চিন্তাধারাকে অগ্রাহ্য করা যায় না। স্পিনোজার কেবলাদ্বৈতবাদ মানুষের যথার্থ সত্তা অস্বীকার করে। কিন্তু তত্ত্ববিজ্ঞানের দিক থেকে স্পিনোজার কেবলাদ্বৈতবাদ যথার্থ মতবাদ নয়।

শক্তিশালী উদ্দেশ্যই ইচ্ছাকে নিয়ন্ত্রিত করে, এর দ্বারা ইচ্ছার স্বাধীনতা নেই, প্রমাণিত হয় না। কেননা শক্তিশালী উদ্দেশ্য মনের দ্বারাই নির্ধারিত হয়। সুতরাং ইচ্ছার নিয়ন্ত্রণ হল আত্মনিয়ন্ত্রণ, মনের নিয়ন্ত্রণ। মানুষের চরিত্র প্রধানতঃ অভ্যাসজাত ইচ্ছা নিয়েই গঠিত। এইজন্য কিরূপ পরিস্থিতিতে মানুষ কিরূপ আচরণ করবে তা ভবিষ্যদ্বাণী করা কিছু কঠিন নয়। যেহেতু ব্যক্তির কাজের ভবিষ্যদ্বাণী করা চলে, তার দ্বারা একথা প্রমাণিত হয় না যে, ইচ্ছা সম্পূর্ণভাবে পূর্বনিয়ন্ত্রিত। ইচ্ছার স্বাধীনতার সঙ্গে কার্যকারণ নিয়মের কোন বিরোধ নেই। ইচ্ছার স্বাধীনতা আছে তার অর্থ এই নয় যে, ইচ্ছার কোন কারণ নেই। আমাদের মনই ইচ্ছার কারণ। ঈশ্বরের পূর্বজ্ঞান ইচ্ছার স্বাধীনতার বিরুদ্ধে খুব জোরালো যুক্তি নয়। যদি বলা হয় যে, ঈশ্বর স্বেচ্ছায় নিজের অভিজ্ঞতাকে সীমাবদ্ধ রেখে মানুষের ইচ্ছাকে স্বাধীনতা দিয়েছেন তবে তার বিরুদ্ধে যুক্তি দেখান সম্ভব নয়।

অনির্বন্ধবাদীদের ইচ্ছার স্বাধীনতার স্বপক্ষে যুক্তি : অনির্বন্ধবাদীরা বলেন, ইচ্ছার স্বাধীনতা জীবাত্মার আত্মচেতনা ও নৈতিক চেতনার সঙ্গে সংগতিপূর্ণ। আমাদের ইচ্ছা বহিরাগত কারণের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নয়। আমরা যখনই কোন কাজ করি তখন আমাদের মনে এই চেতনা জাগে যে আমরা স্বাধীনভাবেই ইচ্ছা করছি এবং নিজের উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য অনুযায়ী নিজের কাজের কার্যসূচী নির্ধারণ করছি। কাজ করার পর আমরা উপলব্ধি করতে পারি যে কাজটি ভাল হয়েছে কি মন্দ হয়েছে এবং মন্দ হলে আমাদের মনে অনুতাপ জাগে ও সেইজন্য নিজেদের অপরাধী মনে করি। ইচ্ছার স্বাধীনতা আছে বলেই এই নৈতিক চেতনা সম্ভব। ইচ্ছার স্বাধীনতা আছে বলেই কর্তব্য, দায়িত্ব, ন্যায়-অন্যায়, গৌরব, অগৌরব, লজ্জা, পুণ্য, নিন্দা, প্রশংসা এইগুলির অর্থ আছে, নতুবা এইগুলি অর্থহীন শব্দমাত্র। আবার ইচ্ছার স্বাধীনতার মানে এই নয় যে, কোন নিয়ন্ত্রণই নেই, মানুষ যা খুশী তাই করতে পারে। আসলে মানুষের ইচ্ছা সম্পূর্ণ পরবশ নয়, আবার সম্পূর্ণ স্বাধীন নয়। মানুষের ইচ্ছা

স্ব-পরিচালিত, মানুষ নিজেই নিজের ইচ্ছাকে নিয়ন্ত্রিত করে। মানুষের ইচ্ছা তার চরিত্র থেকেই নিঃসৃত হয়, তার চরিত্রের দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হয়। মানুষের ইচ্ছা মানুষের নিজের অধীন, অপরের নয়।

৩। ঈশ্বরের সর্বশক্তিমত্তা ও সর্বজ্ঞতা এবং মানুষের ইচ্ছার স্বাধীনতা (Omnipotence and Omniscience of God and Freedom of Human will) :

ঈশ্বর যদি সর্বশক্তিমান ও সর্বজ্ঞ হন তাহলে মানুষের ইচ্ছার স্বাধীনতাকে কিভাবে ব্যাখ্যা করা যাবে ?

মানুষের ইচ্ছা যদি তার দ্বারাই নির্ধারিত হয় তাহলে ভবিষ্যতে তার ইচ্ছা কি রূপ গ্রহণ করবে কারও পক্ষে জানা বা ভবিষ্যদ্বাণী করা সম্ভব নয়। আবার ঈশ্বর যেহেতু সর্বশক্তিমান ও সর্বজ্ঞ, সেইহেতু ঈশ্বর পূর্ব থেকেই সব ঘটনা সম্পর্কে অবহিত থাকবেন, এটাই স্বাভাবিক। মানুষ কি করতে চলেছে, ঈশ্বর পূর্ব থেকেই তা জানবেন।

নানাভাবে এই সমস্যার সমাধানের চেষ্টা করা হয়েছে।

মার্টিন্যু, ওয়ার্ড এবং অন্যান্য ধর্মবিদ্‌গণ মনে করেন যে, মানুষের ইচ্ছার স্বাধীনতাকে অস্বীকার করা চলে না, কাজেই মানুষের স্বাধীন কাজের কোন পূর্বজ্ঞান সম্ভব নয়। কাজেই ঈশ্বরের পক্ষেও মানুষের কাজের কোন পূর্বজ্ঞান থাকতে পারে না। এই দিক থেকে ঈশ্বরের জ্ঞান সীমিত। কিন্তু এই সীমা ঈশ্বর স্বেচ্ছায় নিজের উপর আরোপ করেছেন। কাজেই এতে ঈশ্বরের পূর্ণতার হানি ঘটছেনা। নৈতিকতার খাতিরেই ঈশ্বর স্বেচ্ছায় নিজের উপর এই সীমা আরোপ করেছেন।

মার্টিন্যু ও ওয়ার্ডের অভিমত

এই অভিমতের সমালোচনায় বলা যেতে পারে যে, ঈশ্বর স্বেচ্ছায় নিজের ক্ষেত্রে সীমা আরোপ করলেও, তাতে ঈশ্বরের অসীমতা খণ্ডিত হয় এবং এর ফলে অনন্ত ঈশ্বরের পরিবর্তে আমরা পাই সান্ত ঈশ্বর। কাজেই এই অভিমত অসন্তোষজনক।

সমালোচনা

হেগেল এবং তাঁর সমর্থকবৃন্দ মনে করেন যে, মানুষের স্বাধীন ক্রিয়া সম্পর্কে ঈশ্বরের কোন পূর্বজ্ঞান নেই, কেবল স্বজ্ঞামূলক জ্ঞান আছে। পূর্বজ্ঞানের অর্থ—ইচ্ছা পূর্ববর্তী কারণের অনিবার্য পরিণাম। কাজেই মানুষের স্বাধীন ক্রিয়ার কোন পূর্বজ্ঞান থাকা সম্ভব নয়। কিন্তু ঈশ্বরের জ্ঞান স্বজ্ঞামূলক, বা প্রত্যক্ষ অনুভবমূলক। ঈশ্বর এক 'অনন্ত বর্তমানের' মাধ্যমে

হেগেল ও তাঁর অনুগামীদের মত

অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ সব কিছুকে প্রত্যক্ষ করতে পারেন। মানুষের অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রেই কালের প্রয়োগ, কিন্তু ঈশ্বরের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে কাল (time) অবভাস মাত্র।

এই মতবাদ কালের সত্তাকে অস্বীকার করে সমস্যার সমাধান করতে চায়। কিন্তু কালকে অস্বীকার করার অর্থ হল, নৈতিক অগ্রগতি ও আধ্যাত্মিক অগ্রগতিকে অস্বীকার করা। কেননা অগ্রগতি বলতে বোঝায় কম থেকে বেশীর দিকে, পূর্ববর্তী অবস্থা থেকে পরবর্তী উন্নত অবস্থার দিকে যাত্রা। কাজেই কালকে অস্বীকার করলে নৈতিক ও ধর্মীয় অভিজ্ঞতা অর্থহীন হয়ে পড়বে।

সমালোচনা

রয়েস এই সমস্যার অন্যভাবে সমাধান করার চেষ্টা করেছেন। তাঁর মতে ঈশ্বরের চেতনা কালের সঙ্গে সমব্যাপক। কালের বিস্তৃতি যতদূর, ঈশ্বরের চেতনার বিস্তৃতি ততদূর। যদিও একটি বাস্তব কালনির্ভর জগতের অস্তিত্ব রয়েছে, এই সমগ্র জগতই ঈশ্বরের চেতনা বা প্রত্যক্ষের মধ্যে বর্তমান। কাজেই কালের এই ধারণার সঙ্গে ঐশ্বরিক চেতনার সম্পর্ক মানুষের স্বাধীন ক্রিয়া ও সেই সম্পর্কে ঈশ্বরের জ্ঞানের প্রশ্নটির সমাধান করতে পারে।

রয়েসের অভিমত

কাজেই মানুষের স্বাধীন ইচ্ছার সঙ্গে ঈশ্বরের সর্বজ্ঞতার কোন বিরোধ নেই।

৪। আত্মার অমরতা (Immortality of the Individual Self) :

(ক) আত্মার অমরতায় বিশ্বাসের প্রাচীনতা ও ব্যাপকতা (Antiquity and prevalance of the belief in Immortality of soul) : আত্মার অমরতার প্রশ্ন বিতর্কমূলক প্রশ্ন, কেননা আত্মার অমরতায় বিশ্বাসের বিষয়টিকে অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে প্রমাণ করা বা মিথ্যা প্রতিপাদন করা সম্ভব নয়। আত্মার অমরতা বা মৃত্যুর পরেও আত্মার অ-বিনাশ অভিজ্ঞতার সাহায্যে প্রমাণ করা যায় না। কিন্তু আত্মার অমরতায় বিশ্বাস আমাদের আত্মোপলব্ধির ধারণার বা ব্যক্তিত্বের বিবর্তনের ধারণার অনিবার্য পরিণাম। ঈশ্বরে বিশ্বাসের মতনই আত্মার অমরতায় বিশ্বাস মনুষ্য জাতির মহান ধর্মগুলির পক্ষে এক মৌলিক বিশ্বাস। কিন্তু প্রশ্ন হল, বিচার বুদ্ধির উপরই কি এই বিশ্বাসের ভিত্তি বা এ-হল অন্ধ বিশ্বাস প্রবণতা যার কোন বৌদ্ধিক ভিত্তি নেই?

আত্মার অমরতায় বিশ্বাস ধর্মের পক্ষে এক মৌলিক বিশ্বাস

ইতিহাসের দিকে তাকালে দেখা যায় যে, মানুষের ধর্ম বিশ্বাসের মধ্যে আত্মার অমরতায় বিশ্বাসের স্থান রয়েছে। অমরতায় বিশ্বাসকে সর্বজনীন বলে অভিহিত করা

চলে না সত্য, কিন্তু এই বিশ্বাসের যে অস্তিত্ব ছিল এবং ব্যাপকভাবেই যে এর অস্তিত্ব ছিল তা অস্বীকার করা চলে না। আদিম নরনারী বিশ্বাস করত যে, ব্যক্তির মৃত্যুর পরেও তার আত্মা বেঁচে থাকে এবং সক্রিয় থাকে। ম্যাকগ্রেগর (*MacGregor*) আদিম মানুষের অমরতায় বিশ্বাসের উৎস হিসেবে আদিম মানুষের স্বপ্ন দেখার কথা উল্লেখ করেছেন। স্বপ্নে সে মৃত ব্যক্তিদের দেখত এবং তার সেই অভিজ্ঞতা যখন অপরকে ব্যক্ত করত তখন সেও অনুরূপ স্বপ্ন-অভিজ্ঞতার কথা ব্যক্ত করত। কাজেই প্রেতাত্মায় বিশ্বাসের উদ্ভব হল এবং এই বিশ্বাস মৃত্যুর পরেও মানুষের বেঁচে থাকার বিষয়টি সূচিত করল। কিন্তু এই বিশ্বাসের কোন নৈতিক তাৎপর্য ছিল না। তাছাড়া আদিম মানুষ মৃত্যুর পরে সাময়িকভাবে আত্মার অস্তিত্বে বিশ্বাস করত, কিন্তু মৃত্যুর পরে আত্মার নিরবচ্ছিন্ন, অস্তিত্বে, অমরতা বলতে যা বোঝায়, বিশ্বাস করত না। এমন কি সংস্কৃতির এক উন্নত স্তরেও মৃত্যুর পরে আত্মার অস্তিত্বে বিশ্বাসের ব্যাপারটির সঙ্গে মানুষের ধর্মীয় ও নৈতিক জীবনের কোন সম্পর্ক ছিল না।[1]

আদিম ধর্মে অমরতার ধারণা

উদাহরণস্বরূপ প্রাচীন গ্রীক এবং হিব্রুদের মৃত্যুর পরেও আত্মার অস্তিত্বে বিশ্বাসের বিষয়টির উল্লেখ করা যেতে পারে। প্রাচীন মিশরবাসীর ধর্মে, অমরতায় বিশ্বাস একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করেছিল এবং ঐ ধর্ম অমরতার নৈতিক তাৎপর্যের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছিল। কিন্তু খ্রীষ্টান ধর্মেই অমরতায় বিশ্বাসের আধ্যাত্মিক এবং নৈতিক তাৎপর্য সুস্পষ্টভাবে প্রকাশিত। সামগ্রিকভাবে একথা বলা যেতে পারে যে, আত্মার অমরতায় বিশ্বাস কোন না কোন ভাবে ধর্মের ইতিহাসে বিশেষ করে খ্রীষ্টধর্ম, বৌদ্ধধর্ম এবং ইসলাম ধর্ম প্রভৃতি উন্নত ধর্মগুলির ক্ষেত্রে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছে। ভারতীয় দার্শনিক মাত্রেই কর্মবাদে বিশ্বাসী। এই কর্মবাদের উপরেই জন্মান্তরবাদ প্রতিষ্ঠিত। জন্মান্তরবাদ অনুসারে মৃত্যুর পর আত্মা নতুন দেহ ধারণ করে। জীব যে সকল কর্ম করে তার ফলভোগ এক জীবনে শেষ না হলে জীবকে নতুন জন্ম পরিগ্রহ করে ফলভোগের জন্য সংসারে আসতে হয়। বৌদ্ধদর্শন কোন সনাতন আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করে না। কিন্তু তাহলেও বৌদ্ধ দর্শন কর্মবাদে বিশ্বাসী এবং কর্মফল ভোগের জন্য জীবের পুনর্জন্ম গ্রহণের কথাও স্বীকার করে।

উন্নত ধর্মগুলিও আত্মার অমরতার বিশ্বাসী

সভ্য মানুষ অবশ্য আদিম মানুষের মৃত্যুর পরেও বেঁচে থাকার বিশ্বাসের ভিত্তিকে

1. 'A more important point in conection with these early beliefs is that they are not inspired by any ethical or religious motives.'

—Pringle Pattison : The Idea of Immortality ; Page 13

স্বীকার করে নেয়নি। কিন্তু সভ্য মানুষও বিশ্বাস করে যে, মৃত্যুর পরে মানুষ বেঁচে থাকে। ম্যাকগ্রেগর সভ্য মানুষের এই বিশ্বাসের হেতু বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বলেন যে, সভ্য মানুষের এই বিশ্বাসের উদ্ভব ঘটেছে তার উদ্দেশ্যের বোধ (sense of purpose) এবং জীবদ্দশায় সেই উদ্দেশ্যের পরিপূর্ণতার অসম্ভাব্যতার বোধ থেকে।

সভ্য মানুষের অমরতায় বিশ্বাসের ভিত্তি

(খ) **অমরতায় বিশ্বাসের এবং অবিশ্বাসের মনস্তাত্ত্বিক উৎস** (The Psychological sources of belief and disbelief in immortality) : জে. বি. প্র্যাট (*J. B. Pratt*) মৃত্যু-পরবর্তী জীবনেতে বিশ্বাসের উৎপত্তি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে চারটি উৎসের কথা ব্যক্ত করেছেন, যার যে-কোন একটি থেকেই এই বিশ্বাসের উদ্ভব হতে পারে। (১) আদিম বিশ্বাস প্রবণতা, অভ্যাস এবং আপ্ত বাক্য ; (২) বিচারবুদ্ধি ; (৩) কোন এক ধরনের অনুভূতি এবং (৪) ইচ্ছা। ব্যক্তিগত অমরতায় মানুষ কেন বিশ্বাস করে এই সম্পর্কে প্রশ্ন করে প্র্যাট নানা ধরনের উত্তর পেয়েছেন। কেউ উত্তর দিয়েছেন, 'আমি ব্যক্তিগত অমরতায় বিশ্বাস করি কারণ আমাকে এটা শেখানো হয়েছে।' যে প্রামাণ্যের ভিত্তিতে এই শিক্ষা তার উল্লেখ করতে গিয়ে কেউবা বাইবেল, কেউ বা যীশুখ্রীষ্ট, কেউ বা গীর্জার কথা উল্লেখ করেছেন। আবার কেউ উত্তর দিয়েছেন, 'আমার বর্তমান অস্তিত্বকে যুক্তিযুক্তভাবে ব্যাখ্যা করতে গেলে আমার বিচারবুদ্ধি এই জাতীয় বিশ্বাসের দাবী জানায়।' আবার কেউ বা উত্তর দেন যে তার এই জাতীয় বিশ্বাসের মূলে আছে আধ্যাত্মিক গবেষণার কার্য-বিবরণী (proceedings of Psychical Research Society)। অমরতায় বিশ্বাসের ভিত্তি নির্দেশ করতে গিয়ে কেউ কেউ চেতনা ও তার প্রক্রিয়া এবং জড় জগৎ ও তার নিয়ম এই উভয়ের পার্থক্য উল্লেখ করে বলেন, 'যেহেতু আমার মধ্যে যে প্রাণ আছে তা জড়াত্মক নয়, সেইহেতু জড় বস্তুর মত তা ধ্বংস হয়ে যেতে পারে না।' কেউ বা অনুভূতির দিক থেকে এই বিশ্বাসের উদ্ভব ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন, 'আমি অনুভব করি যে আমি নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে পারি না।' সময় সময় এই বিশ্বাস অনেকটা অতীন্দ্রিয় ধরনের। এই দিক থেকে এই বিশ্বাসের উদ্ভব ব্যাখ্যা করতে গিয়ে কেউ বলেন, 'অন্তরের মধ্যে ঐশ্বরিক জীবনের চেতনা এই জ্ঞান এনে দেয় যে, জীবনের কোন মৃত্যু নেই।' অনেক সময় ব্যক্তির মনে এই বিশ্বাসের মূলে থাকে আত্মার প্রয়োজনীয় উৎকর্ষ সম্পর্কে প্রত্যক্ষ উপলব্ধি। তারই প্রকাশ ঘটে যখন ব্যক্তি বলে, 'আমার মন বিশ্বাস করতে অরাজী হয় যে তার অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়ে যেতে পারে।'

মৃত্যু-পরবর্তী জীবনেতে বিশ্বাসের চারটি উৎস

'কেন তুমি একটি ভবিষ্যৎ জীবন কামনা কর'? এর উত্তরে কেউ বলেছেন, 'কারণ সমাধির অন্তরালে শূন্যগর্ভ অসারতার চিন্তা আমি পছন্দ করি না।' আবার কেউ বলেছেন, 'আমি ভবিষ্যৎ জীবনের কামনা করি, এর কারণ ধ্বংস হয়ে যাওয়ার ধারণা একটা ভয়ঙ্কর চিন্তা, তবে অপরের প্রতি ভালবাসাই আমাকে এই চিন্তা করায়।' আবার কেউ বলেছেন, 'জীবনের অস্তিত্বের যদি কোন অর্থ বা যুক্তি থাকে তাহলে সেটা চলতে থাকবে'।

মৃত্যু-পরবর্তী জীবনের প্রতি সংশয় বা তার অস্বীকৃতির মূলে কি মনস্তাত্ত্বিক প্রভাব কার্যকর সেইগুলি বিশ্লেষণ করতে গিয়ে প্র্যাট বলেন যে, অনেক লোকের মতে পরবর্তী জীবনের প্রতি কোন কামনা না থাকাটা তাদের ঐ জীবনের প্রতি বিশ্বাসের ক্ষেত্রে সংশয় সৃষ্টি করেছে। কামনাই বিশ্বাস সৃষ্টি করে। মানুষ যখন মৃত্যু পরবর্তী জীবনের কথা চিন্তা করে তখন ঐ জীবন তাদের কাছে তেমন স্পষ্ট হয়ে ওঠে না এবং তার ফলে এটি কামনার বস্তুও হয়ে ওঠে না। আবার অমরতার স্বপক্ষে প্রদত্ত যুক্তিগুলি সাধারণ মানুষের বিচারে দুর্বল প্রতীয়মান হওয়াতে অমরতাকে লোকে কম বাস্তব মনে করেছে এবং সেইকারণে আন্তরিকভাবে একে কামনা করেনি।

মৃত্যু-পরবর্তী জীবনের প্রতি অবিশ্বাসের মূলে যেসব মনস্তাত্ত্বিক প্রভাব কার্যকর

বিজ্ঞানের ছাত্র হয়ত অমরতায় তেমন বিশ্বাস কবতে চাইবে না, তার কারণ তার শিক্ষা তার মধ্যে জড় জগৎ সম্পর্কীয় বৈজ্ঞানিক নিয়মগুলিকে শ্রদ্ধার চোখে দেখার অভ্যাস সৃষ্টি করেছে, যে শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে একজন খ্রীষ্টান তার ধর্মশাস্ত্রের শিক্ষার দিকে তাকান। আসল সত্য হল, অবিশ্বাস, বিশ্বাসের মতন, শুধু যুক্তি থেকে নয়, আপ্ত বাক্য থেকে তার শক্তি সংগ্রহ করে। আবার বিশ্বাস ও অবিশ্বাসের সঙ্গে কল্পনার বিষয়টি নিবিড়ভাবে জড়িত। যে বিষয়ের একটা প্রতিরূপ কল্পনায় মনের সামনে তুলে ধরা যায় না, তাতে বিশ্বাস করা খুব কঠিন হয়ে পড়ে। ব্যতিক্রমকে স্বীকার করে নিয়েও বলা যায় যে, যারা মৃত্যু-পরবর্তী জীবনের অস্তিত্বে বিশ্বাস করতে চায় না তাঁরা সুস্পষ্টভাবে তাকে মনের সামনে তুলে ধরতে পারেন না। একজন চিকিৎসক মৃত্যু-পরবর্তী জীবনের ছবিটা তেমন কল্পনা করতে পারেন না, কিন্তু একজন পাদরী অতি সহজেই তা করতে পারেন। এর কারণ হয়ত চিকিৎসক মৃত্যুকে দেহের দিক থেকে চিন্তা করেন, একজন পাদরী তাকে মনোগত দিক থেকে অর্থাৎ আত্মার দিক থেকে চিন্তা করেন। অমরতায় বিশ্বাস যুক্তিযুক্ত হলেও চিকিৎসক মৃত্যু-পরবর্তী জীবনের কল্পনা করতে ব্যর্থ হন। আবার মৃত্যু একজন পাদরীর কাছে একটা বস্তুনিরপেক্ষ অভিজ্ঞতা, কোন শরীরবিদ্যাগত

অবিশ্বাসও আপ্ত বাক্যের দ্বারা প্রভাবিত হয়

ঘটনা নয়। এর ফলে তিনি সহজেই চেতন অস্তিত্বের নিরবচ্ছিন্নতার কথা কল্পনা করতে পারেন। যে অমূর্ত সত্যের ধারণা করা যেতে পারে, কিন্তু কল্পনা করা যেতে পারে না, তাতে বিশ্বাস সাধারণতঃ একটু অস্পষ্ট হয়। আমাদের মানস ছবির সঙ্গে যত বাস্তব উপাদান মনে মনে সংযুক্ত করা যায়, সেই ছবি তত বাস্তব হয়। অমূর্ত সত্যের কল্পনার ব্যর্থতাই ঐ সত্যে বিশ্বাসকে শিথিল করে। মৃত্যু-পরবর্তী জীবনের মানস চিত্রকে আমরা বাস্তব উপাদানের সংযোগে কল্পনায় তেমন বাস্তব করে তুলতে পারি না। সেই কারণে অমরতায় বিশ্বাস তেমন জোরালো হয় না।

অবশ্য কিছু লোক আছে যাদের অমরতায় বিশ্বাসের ক্ষেত্রে উপরিউক্ত অসুবিধাগুলি কোন প্রভাব বিস্তার করতে পারে না। এমন কিছু লোক আছে, সুস্পষ্ট কল্পনার অভাব তাদের ক্ষেত্রে মৃত্যু-পরবর্তী জীবনে বিশ্বাসের ব্যাপারে অসুবিধা সৃষ্টি করতে পারে না। আবার যারা অন্ধ বিশ্বাসী, যাদের বিশ্বাস আপ্ত বাক্য নির্ভর বা যাদের বিশ্বাস খুবই দৃঢ় তারা কল্পনায় মৃত্যু-পরবর্তী জীবনের ছবি মনের সামনে তুলে ধরতে না পারলেও তাতে তাদের বিশ্বাস শিথিল হয় না। এই জাতীয় লোকেরা বলবে যে, তারা মৃত্যু-পরবর্তী জীবন কেমন হবে তার শুধু ধারণা করা নয়, কল্পনা করা অর্থাৎ তার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভ করতে পারে।

মৃত্যু-পরবর্তী জীবনকে কল্পনায় বাস্তব করে তোলার অসুবিধা

কিন্তু অতীন্দ্রিয়বাদী নয়, এমন বেশীর ভাগ লোকই মৃত্যু-পরবর্তী জীবনকে কল্পনায় বাস্তব করে তুলতে পারে না। তাদের ক্ষেত্রে এই জীবনে বিশ্বাস তেমন দৃঢ় হয় না। প্র্যাট বলেন, "ঈশ্বরে বিশ্বাসের মতন ভবিষ্যৎ জীবনে বিশ্বাস হল সাধারণতঃ একটা মনোভাব (attitude), ভবিষ্যতের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করার একটা ধারণা যার সংজ্ঞা দেওয়া যায় এমন একটা ধারণা এবং যেটি বিশদ বিবরণপূর্ণ একটি চিত্রের থেকেও সুনিশ্চিতভাবে অধিক কিছু।"

(গ) আত্মার অমরতা বলতে কি বোঝায়? (What is immortality of the soul) ?) : আত্মার অমরতায় বিশ্বাস সূচনা করে যে, মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই ব্যক্তির অস্তিত্বের পরিসমাপ্তি ঘটে না। মৃত্যুর পরে দেহের বিনাশ ঘটে, কিন্তু আত্মার বিনাশ ঘটে না। আত্মার অমরতাকে কাণ্ট ধর্মের পক্ষে অবশ্য স্বীকার্য সত্য রূপে গণ্য করেছেন এবং এর সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেন, 'আত্মার অমরতা বলতে বোঝায় এক ও অভিন্ন বৌদ্ধিক সত্তার অনন্তকাল ধরে স্থায়ী অস্তিত্ব এবং ব্যক্তিত্ব'। কাণ্ট অবশ্য অমরতাকে টিকে থাকা (survival) থেকে পৃথক করেছেন। কেননা মৃত্যুর পরে টিকে থাকলেই যে সেই টিকে থাকা অনন্তকাল ধরে স্থায়ী হবে এমন কোন কথা নেই।

আত্মার অমরতা আত্মার অনন্তকাল ধরে স্থায়ীত্বের কথা বলে

ব্রড বলেন, মৃত্যুর পরেও চূড়ান্তভাবে বিনষ্ট না হওয়া পর্যন্ত দেহ যেমন কিছু সময়ের জন্য অস্তিত্বশীল থাকে, তেমনি আত্মার ক্ষেত্রেও তা ঘটা সম্ভব। কিন্তু তা আত্মার অমরতা হবে না। কাজেই আত্মার কিছু সময়ের জন্য টিকে থাকা এবং আত্মার অনন্তকাল ধরে স্থায়ীত্ব, যা অমরতা নির্দেশ করে, এক ও অভিন্ন বিষয় নয়।

(ঘ) আত্মার অমরতায় বিশ্বাসের পক্ষে ও বিপক্ষে প্রমাণ (Arguments for and against the belief in the immortality of the soul):

আত্মার অমরতায় বিশ্বাসের বিপক্ষে প্রমাণ (Arguments against belief in the immortality of the soul): আত্মার অমরতায় বিশ্বাসের বিপক্ষে যে প্রমাণগুলি উপস্থাপিত করা হয় আমরা সর্বপ্রথমে সেইগুলি আলোচনা করব। আত্মার অমরতায় যারা সংশয় করেন তাঁরা বলেন, আত্মার অমরতায় বিশ্বাস অভিজ্ঞান-সম্মত, কারণ এই বিশ্বাসের স্বপক্ষে কোন অভিজ্ঞতাভিত্তিক প্রমাণ উপস্থাপিত করা যায় না। পদার্থবিদ্যা ও রসায়ন শাস্ত্রের সত্যগুলিকে পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষণের সাহায্যে প্রমাণ করা যায়। কিন্তু দেহের বিনাশের পরেও আত্মা অনন্তকাল ধরে টিকে থাকে, আত্মা অমর, আত্মার ধ্বংস নেই—এই বিষয়কে অভিজ্ঞতাভিত্তিক বা প্রত্যক্ষগ্রাহ্য প্রমাণের সাহায্যে সমর্থন করা চলে না। সাম্প্রতিক কালে আত্মার ক্রিয়াকলাপ প্রত্যক্ষভাবে পর্যবেক্ষণ করে আত্মার অমরতাকে বিজ্ঞানসম্মতভাবে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করা হয়েছে। আধ্যাত্মিক গবেষণা সমিতির (The Society for Psychical Research), সভ্য স্যার অলিভার লজ, উইলিয়ম্ জেমস্ প্রমুখ চিন্তাবিদ্ এবং মনীষিগণ দেহের বিনাশের পরেও আত্মার স্থায়ীত্বের প্রত্যক্ষগ্রাহ্য প্রমাণ সংগ্রহ করেছেন বলে দাবী করেন। তাঁদের মতে 'যোগক্রিয়া বলে ব্যক্তির উপর প্রেতাত্মার ভর করা', 'ব্যক্তিকে মাধ্যম (medium) রূপে ব্যবহার করে পরলোকগত আত্মার সঙ্গে কথাবার্তা বলা', 'পরলোকগত আত্মার কাছ থেকে প্রেরিত বাণী', 'স্বয়ংক্রিয় লিখন', 'জ্যোতির্ময় মূর্তির ও সঙ্গীতের আবির্ভাব' প্রভৃতি যেসব ঘটনার কোন জাগতিক কারণ নিরূপণ করা যায় না, সেইগুলি আত্মার ক্রিয়া ছাড়া কিছুই নয়। অনেকেই মনে করেন যে, এই সব আত্মার ক্রিয়াকলাপ সম্পর্কীয় ঘটনা আত্মার অমরতা প্রমাণ করে।

সংশয়বাদীদের অভিমত

আধ্যাত্মিক গবেষণা সমিতি প্রদত্ত তথ্য অমরতার পক্ষে যুক্তি হিসেবে প্রদত্ত হয়

কিন্তু সংশয়বাদীরা মনে করেন যে, এই সব ঘটনাকে স্বাভাবিক মনস্তাত্ত্বিক কারণের সাহায্যে ব্যাখ্যা করা চলে এবং এইগুলির দ্বারা আত্মার অমরতা প্রমাণিত হয় না।

এইসব অভিজ্ঞতামূলক প্রমাণের মূল্য সংশয়াত্মক। অনেকে মনে করে পেশাদার মিডিয়াম (proffessional medium) দূরদর্শনকারী, দূরশ্রবণকারী, ভবিষ্যৎবক্তা প্রমুখ নিছক প্রতারক ছাড়া কিছুই নয়। এইসব মনস্তাত্ত্বিক গবেষণা সম্পর্কে খুব উদার দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করে বলা যেতে পারে যে, মৃত্যুর পরেও মানসিক ক্রিয়ার অস্তিত্ব হয়ত এর দ্বারা প্রমাণিত হতে পারে, কিন্তু একি মৃত্যুর পরে আত্মার স্বল্পকালীন স্থায়ীত্ব, নাকি আত্মার নিরবচ্ছিন্ন স্থায়ীত্ব তা নিরূপণ করা কঠিন। অপরেরা এটুকুও স্বীকার করতে রাজী নন। তাঁরা বলেন যে, আত্মার ক্রিয়াকলাপকে দূরশ্রবণ (Telepathy) অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের যোগাযোগ ব্যবস্থা ছাড়া অন্য কোন উপায়ে মনের সঙ্গে মনের সংযোগ (the communication of mind with mind by means other than the recognised channels of sense) প্রভৃতি স্বাভাবিক কারণের সাহায্যেই ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। জাতিস্মর সম্বন্ধে যে সব কাহিনী সংবাদপত্রে দেখা যায় সেইগুলির সত্যতায় অনেকে সন্দেহ করেন এবং কাহিনীগুলি আত্মার অমরতা সঠিকভাবে প্রমাণ করতে পারে বলে মনে করেন না।

আধ্যাত্মিক গবেষণালব্ধ তথ্যকে সংশয়বাদীরা অমরতার প্রমাণরূপে গ্রহণ করে না

কাজেই এই সম্পর্কে সিদ্ধান্ত হল যে, আত্মাব অমরতার পক্ষে কোন অভিজ্ঞতামূলক প্রমাণ নেই। কিন্তু ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য প্রমাণই একমাত্র প্রমাণ নয়। যা যাথার্থ তাই ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে প্রমাণযোগ্য—এ হল যা প্রমাণ করতে হবে তাকে পূর্ব থেকে স্বীকার করে নেওয়া। যদি আত্মার অমরতা সম্পর্কে অন্য প্রমাণের সন্ধান পাওয়া যায় তাহলে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য প্রমাণের অভাবে কিছু যায় আসে না।

সমালোচনা

অমরতার বিপক্ষে আর যে যুক্তি উপস্থাপিত হয় তাহল দেহ ও মনের ঘনিষ্ঠ ও নিবিড় সম্পর্ক। দেহতেই যদি চেতনার অবস্থান, তাহলে দেহের বিনাশের সঙ্গে সঙ্গেই চেতনার বিনাশ ঘটবে। জড়বাদীরা মনে করে, চেতনা হল উপবস্তু এবং মস্তিষ্ক চেতনা উৎপন্ন করে। মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে মস্তিষ্কের বিলোপ ঘটে এবং আর কোন কিছুই থাকে না। মস্তিষ্কে আঘাত লাগলে যদি সাময়িকভাবে চৈতন্যের লোপ ঘটে তাহলে মস্তিষ্কের ধ্বংসের সঙ্গে সঙ্গেই চৈতন্যেরও স্থায়ী লোপ ঘটবে।

অমরতার বিপক্ষে অন্য যুক্তি

কিন্তু এই যুক্তি মোটেও জোরালো নয়। জড়বাদ সন্তোষজনক মতবাদ নয়। জড়বাদীরা মনের সাহায্যে জড়ের ব্যাখ্যা করে এবং জড়ের সাহায্যে মনের ব্যাখ্যা

করে। জড়বাদ প্রাণ ও মনের সন্তোষজনক ব্যাখ্যা দিতে পারে না। আসলে দেহ ও মনের সম্বন্ধ একটি কঠিন সমস্যা। দেহ বা মস্তিষ্কই মানসিক প্রক্রিয়া সৃষ্টি করে, এটা এখনও প্রমাণিত হয়নি অর্থাৎ চেতনাকে মস্তিষ্কের ক্রিয়া গণ্য করলেও এই ক্রিয়া উৎপাদনমূলক বা সৃজনমূলক না হয়ে প্রেরণা-মূলক (transmissive) হতে পারে। জেমস-এর তাই অভিমত। এই অভিমতকে সমর্থন করেছে এফ. সি. এস. শিলার। বার্গসোঁ (*Bergson*)-ও মনে করেন যে মস্তিষ্ক হল মনের উদ্দেশ্য সাধনের জন্য যন্ত্রস্বরূপ। এমন হতে পারে যে দেহ মনকে অর্থাৎ মস্তিষ্ক চেতনাকে তার মধ্য দিয়ে কাজ করতে দেয়। কাজেই দেহের বিনাশের পরেও আত্মা অস্তিত্বশীল থাকতে পারে। উন্মেষমূলক অভিব্যক্তিবাদ (Theory of Emergent Evolution) অনুসারে জীবদেহকে আশ্রয় করে মনের প্রকাশ ঘটলেও মন এক নতুন সত্তা। আত্মা দেহ নির্ভর হয়েও স্বাধীন সত্তা হওয়াতে অমর হতে পারে। কাজেই মন দেহকে একটি যন্ত্ররূপে ব্যবহার করে। সুতরাং দেহের বিনাশের সঙ্গে সঙ্গেই আত্মা বিনষ্ট হয় না।

সমালোচনা

আত্মার অমরতায় বিশ্বাসের স্বপক্ষে যুক্তি (Arguments in favour of the belief in the immortality of soul) :

(i) শক্তির নিত্যতার উপমায় আত্মার নিত্যতায় বিশ্বাস (Argument on the analogy of the Conservation of energy) :

শক্তির নিত্যতা নীতি অনুসারে শক্তি কখনও ধ্বংস হয় না। শক্তির শুধুমাত্র রূপান্তর সম্ভব। যান্ত্রিকশক্তি রাসায়নিক শক্তিতে, আবার রাসায়নিক শক্তি বৈদ্যুতিক শক্তিতে রূপান্তরিত হতে পারে। কিন্তু এই রূপান্তরে শক্তির কোন হ্রাস বৃদ্ধি হয়না।

শক্তির নিত্যতার উপমা

শক্তির নিত্যতার সঙ্গে তুলনা করে আত্মাকেও নিত্য মনে করা যেতে পারে। শক্তির যেমন বিনাশ নেই, আত্মারও তেমনি বিনাশ নেই। সুতরাং আত্মা অমর।

সমালোচনা : উপমা কোন বিষয়কে বুঝে নেওয়ার পক্ষে সহায়ক হতে পারে কিন্তু উপমা কোন বিষয় সংশয়াতীতভাবে প্রমাণ করতে পারে না। সুতরাং শক্তির নিত্যতার উপমার দ্বারা কখনও আত্মার নিত্যতা বা অমরতা সংশয়াতীতভাবে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না।

উপমা প্রমাণ নয়

(ii) **ধী-শক্তির প্রকাশের ভিত্তিতে প্রমাণ** (Argument on the revelation of the intellect) : মানুষের ধী-শক্তির প্রকাশ লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে তার চিন্তন, স্মৃতি এবং কল্পনা দেশকালের সীমারেখার মধ্যে আবদ্ধ না থেকে

তাকে অতিক্রম করে যেতে পারে। অর্থাৎ কিনা, মানুষের ধী-শক্তি তার পারিপার্শ্বিক অবস্থা থেকে মুক্ত হয়ে ক্রিয়া করতে পারে। প্রত্যয় বা সার্বিক ধারণার মাধ্যমেই চিন্তন ক্রিয়া করে। চিন্তন দেশকালের সীমার মধ্যে আবদ্ধ থাকে না। স্মৃতির ক্ষেত্রে দেখা যায়, বস্তুর অনুপস্থিতিতেই, বস্তুর জ্ঞান হয়। কল্পনার ক্ষেত্রে সহজেই দেশকালের সীমারেখা অতিক্রম করা যায়। ধী-শক্তি আত্মারই শক্তি। ধী-শক্তি যদি জাগতিক বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে ক্রিয়া করতে পারে, আত্মার পক্ষেও জাগতিক বন্ধন অর্থাৎ কিনা, দেহের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে অস্তিত্বশীল থাকা সম্ভব। কাজেই দেহের বিনাশের সঙ্গে সঙ্গেই আত্মা বিনষ্ট না হওয়াই স্বাভাবিক। সুতরাং আত্মাকে অমর বলতে হয়।

ধী-শক্তি জাগতিক বন্ধন মুক্ত ; আত্মাও দেহ বন্ধন মুক্ত

সমালোচনা : মানুষের ধী-শক্তির সঙ্গে তার মস্তিষ্কের সম্বন্ধ। কাজেই মস্তিষ্ক ধ্বংস হওয়ার পর ব্যক্তির ধী-শক্তি অস্তিত্বশীল থাকে এমন সিদ্ধান্ত করা যেতে পারে না। সুতরাং ধী-শক্তির প্রকাশের ভিত্তিতে আত্মার অমরতা প্রমাণিত হয় না। আসলে এই যুক্তি যে সিদ্ধান্তে উপনীত হয় তা আশ্রয় বাক্য থেকে অনিবার্যভাবে নিঃসৃত হয় না। যদি ধরেও নেওয়া হয় যে, দেশকালের সীমারেখাকে অতিক্রম করে যাওয়ার ক্ষমতা আত্মার আছে তার থেকে কি এই সিদ্ধান্ত করা যেতে পারে যে, মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে যে দৈহিক সংগঠনের বিনাশ ঘটে তার উপর নির্ভর না করেও আত্মার এই ক্ষমতা ক্রিয়া করতে পাবে ?

ধী-শক্তির প্রকাশের ভিত্তিতে আত্মার অমরতা প্রমাণিত হয় না

(iii) **অমরতার বিশ্বাস সম্বন্ধে তত্ত্ববিজ্ঞানের প্রমাণ** (Meta-physical Arguments for Immortality) **:** তত্ত্ববিজ্ঞানে আত্মার অমরতা সম্পর্কে অনেক যুক্তি দেখানো হয়েছে। এই প্রসঙ্গে আমরা কয়েকজন বিশিষ্ট দার্শনিকের অভিমত আলোচনা করব :

প্রাচীন গ্রীক দার্শনিক প্লেটো আত্মার অমরতায় বিশ্বাসী ছিলেন। আত্মা অমরতা প্রমাণ করতে গিয়ে তিনি একাধিক যুক্তি দিয়েছেন। প্রথমতঃ, আত্মা এক আধ্যাত্মিক দ্রব্য, যেহেতু আত্মা সরল ও অযৌগিক (simple) দ্রব্য। কোন আধ্যাত্মিক দ্রব্যই যৌগিক হতে পারে না। যা যৌগিক তা বিভিন্ন উপাদানে বিশ্লিষ্ট (dissolved) হতে পারে। কিন্তু যা অযৌগিক তার বিভিন্ন উপাদানে বিশ্লিষ্ট হওয়া সম্ভব নয়। যা বিশ্লিষ্ট হতে পারে না তার ধ্বংস বা মৃত্যু নেই। কাজেই আত্মারও ধ্বংস নেই, আত্মা অমর। দ্বিতীয়তঃ,

প্লেটোর যুক্তি

প্লেটো মনে করতেন যে, আত্মার ঐশ্বরিক বৈশিষ্ট্য আছে, সেইহেতু আত্মা অমর। ঈশ্বর জীবাত্মার উৎস। ঈশ্বর সনাতন, কাজেই ঈশ্বরের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত জীবাত্মাও সনাতন। তৃতীয়তঃ, প্লেটো মনে করতেন যে, সৎ (Being)-এর সঙ্গে অ-সৎ (Becoming)-এর পার্থক্য আছে এবং ধারণার বা প্রত্যয়ের জগৎ (world of ideas)-এর সঙ্গে পরিবর্তনশীল দৃশ্যমান জগতের (world of phenomena) পার্থক্য আছে। তাঁর মতে আত্মা এই দুই এর মধ্যবর্তী। আত্মার সঙ্গে অন্তহীন ধারণার জগতের সম্বন্ধ আছে। কারণ আত্মা প্রজ্ঞার অধিকারী। আত্মার বৌদ্ধিক প্রকৃতি আছে। আবার পরিবর্তনশীল জগতের সঙ্গেও এর সম্পর্ক আছে। কারণ দেহ রূপ আধারের মধ্যে আত্মার মূর্ত অস্তিত্ব আছে। চতুর্থতঃ, প্রকৃত জ্ঞান ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতা নির্ভর নয়। প্রকৃত জ্ঞান শাশ্বত। আত্মা শাশ্বত জ্ঞানের আধার, তাই অবিনশ্বর। যদিও দেহ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতের অন্তর্ভুক্ত এবং ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতের মতনই পরিবর্তনশীল এবং অস্থায়ী; বুদ্ধি বা প্রজ্ঞা অপরিবর্তনীয় সত্তার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। এই অপরিবর্তনীয় সত্তার সম্পর্কে আমরা অবহিত হই যখন আমরা বিশেষ বিশেষ কল্যাণময় বস্তুর কথা চিন্তা করি না, কল্যাণেরই (goodness itself) কথা চিন্তা করি, বিশেষ বিশেষ ন্যায়পরায়ণ ক্রিয়ার কথা চিন্তা করি না, ন্যায়পরায়ণতার (justice itself) কথাই চিন্তা করি। এছাড়াও আমরা অন্যান্য সামান্য (universals) বা শাশ্বত ধারণার (eternal Ideas) কথা চিন্তা করি, যে ধারণাগুলির জন্য জাগতিক বস্তু এবং ঘটনা নিজ নিজ বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। কাজেই পরিবর্তনশীল ইন্দ্রিয়ের জগতের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত না হয়ে উচ্চতর এবং স্থায়ী জগতের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত হওয়াতে বুদ্ধি বা আত্মা অমর। কাজেই কোন ব্যক্তি দেহের পরিবর্তনশীল কামনার প্রতি আকৃষ্ট না হয়ে, যদি শাশ্বত সত্তার চিন্তনে নিজেকে ব্রতী করে, তাহলে সেই ব্যক্তি দেখতে পাবে যে মৃত্যুতে তার দেহ ধূলায় পরিণত হলেও, তার আত্মা অবিনশ্বর অপরিবর্তনশীল রাজ্যে বিচরণ করবে। যে বুদ্ধি শাশ্বত সত্যকে জানে তাও শাশ্বত। শাশ্বত বুদ্ধির ধারক আত্মা অবশ্যই অমর। পঞ্চমতঃ, সব জ্ঞানই যা জন্ম-পূর্ববর্তী অবস্থায় আমরা জানতাম, (all knowledge is recollection of what we know in a prenatal state) তারই স্মরণ। প্লেটোর এই যুক্তিটিকে নীতিগতভাবে পরবর্তীকালে অনেক চিন্তাবিদ্ গ্রহণ করেছেন।

আধুনিক দর্শনে দেকার্ত প্লেটোর এই যুক্তিকেই অন্যভাবে উপস্থাপিত করেছেন।

দেকার্ত-এর অভিমত

তিনিও আত্মাকে এক সরল, অবিনশ্বর এবং অজড় দ্রব্য রূপে গ্রহণ করেছেন। তাঁর মতে শুদ্ধ চেতনাই (pure consciousness) আত্মার স্বরূপ। যেহেতু চৈতন্য আত্মার স্বরূপ, সেইহেতু চৈতন্যের কোন

বিনাশ নেই। জগতের কোন আত্মাই ধ্বংস হতে পারে না। কেননা তাহলে নিত্যতার নীতির বিরোধিতা করা হবে। কাজেই আত্মা নতুন দেহ ধারণ করে অস্তিত্বশীল থাকবে।

সমালোচনাঃ আত্মার অমরতা সম্পর্কে প্লেটোর প্রমাণ, তাঁর আত্মা সম্বন্ধে বিশেষ ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত। আত্মা যদি আধ্যাত্মিক দ্রব্য না হয়, তাহলে প্লেটোর প্রমাণও মূল্যহীন হয়ে পড়ে।

প্লেটোর মতবাদ যে কারণে গ্রহণযোগ্য নয়, দেকার্তের মতবাদও সেই কারণে গ্রহণযোগ্য নয়। লাইবনিজ দেকার্তের অভিমতের সমালোচনা করতে গিয়ে বলেন যে, দেকার্তের যুক্তি ব্যক্তিগত অমরতা প্রমাণ করতে পারে না। লাইবনিজ বলেন, যদি আমার মৃত্যুর পরে আমি সম্পূর্ণ ভিন্ন ব্যক্তিসত্তায় রূপান্তরিত হই, যদি ব্যক্তি অভিন্নতা নিরূপণের কোন সম্ভাবনা না থাকে, তাহলে মৃত্যুর পরে আমি বেঁচে থাকি বা না থাকি, তাতে কি আসে যায়?

লাইবনিজের দেকার্তের সমালোচনা

যদিও পূর্বোক্ত দার্শনিকেরা বিভিন্ন তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে অমরতার সমস্যা আলোচনা করেছেন তবু তাঁদের ধারণার মধ্যে একটি সাধারণ বিষয়ের উপস্থিতি রয়েছে এবং তা হল আত্মা একটি দ্রব্য। কান্ট আত্মার ক্ষেত্রে 'দ্রব্য' এই অমূর্ত ধারণার (abstract category) প্রয়োগের কঠোর সমালোচনা করেছেন। তিনি বলেন যে, যেহেতু আত্মাকে আমরা মনে মনে দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করতে পারি. বাস্তবে যে আত্মা ও দেহকে পরস্পরের থেকে বিচ্ছিন্ন করা যেতে পারে, তা প্রমাণিত হয় না। কান্টের মতে আত্মা সব সময়ই জ্ঞাতা। আত্মা কখনও জ্ঞানের বিষয়বস্তু হতে পারে না।

আত্মা কোন আধ্যাত্মিক দ্রব্য নয়। আত্মা হল চিন্তা, অনুভূতি ও ইচ্ছা প্রভৃতি মানসিক প্রক্রিয়ার অতিরিক্ত এক সংশ্লেষণমূলক ঐক্য বিধায়ক প্রক্রিয়া (synthetic unity of apperception) যা বিচ্ছিন্ন সংবেদনগুলিকে ঐক্যবদ্ধ করে অভিজ্ঞতাকে সম্ভব করে তোলে।

কান্টের আত্মা সম্পর্কীয় মতবাদ সম্পর্কে আমাদের বক্তব্য যাই থাকুক না কেন, তিনি অধ্যাত্ম দ্রব্য রূপে আত্মার যে সমালোচনা করেছেন তাকে অগ্রাহ্য করা যায় না। তাঁর মতে অজড় দ্রব্য রূপে আত্মার ধারণা হল অমূর্ত ধারণা, এবং তারপরে সেই দ্রব্যকে অবিনশ্বর মনে করা স্পষ্টতঃই অমরতাকে প্রমাণ না করে স্বীকার করে নেওয়া। কান্ট বললেন যে, যদিও এটা সত্য যে, কোন সরল দ্রব্য বিশ্লিষ্ট হতে পারে না। চেতনার তীব্রতা হ্রাস পেতে পেতে শূন্যতায় উপনীত হয়ে, চেতনা অস্তিত্বহীন হতে পারে।

আধুনিক মনোবিজ্ঞানও এই প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন যে, মনকে একটি সরল দ্রব্য বলে গণ্য করা চলে কিনা। আধুনিক মনোবিজ্ঞানের মতে মন হল কেবলমাত্র আপেক্ষিক ঐক্য (relative unity)-এর একটি সংগঠন যা সাধারণভাবে ভাল মতনই স্থায়ী এবং ঐক্যবদ্ধ কিন্তু জোরাজুরি করা হলে, তাকে বিভিন্ন মাত্রায় বিভক্ত এবং বিশ্লিষ্ট করা চলে। মনোবিজ্ঞানের এই ধরনের মন্তব্য থেকে এটা পরিষ্কার বোঝা যায় যে, আত্মা সরল দ্রব্য—এই অনুমান অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত নয়। এটি একটি অধিবিদ্যাসম্পর্কীয় মতবাদ। কাজেই এটি আত্মার অমরতার সাধারণ প্রমাণের ভিত্তিরূপে গ্রাহ্য হতে পারে না। [1]আধুনিক তত্ত্ববিদ্‌রা, যাঁরা অমরতার পক্ষে যুক্তি দেখিয়েছেন, সকলেই ধারণা করেছেন যে, আত্মার স্বরূপের মধ্যেই নিত্যতার এবং অন্তহীনতার বৈশিষ্ট্য বর্তমান। যেমন, তাঁরা বলেছেন যে আত্মার সত্তা হল অন্তহীন, বা আত্মা পরব্রহ্মের স্বতন্ত্র রূপ। কাজেই আত্মা অবিনাশী। যে তত্ত্ববিদ্যার উপর তাঁদের এই ধারণা প্রতিষ্ঠিত, সেই তত্ত্ববিদ্যাই সংশয়জনক। কাজেই এই ধারণার যৌক্তিকতা কতটুকু তাও সংশয়জনক।

কাজেই আমাদের সিদ্ধান্ত হল যে, তত্ত্ববিদ্যায় প্রদত্ত বিভিন্ন যুক্তি অমরতার স্বপক্ষে কোন প্রত্যক্ষ প্রমাণ উপস্থাপিত করতে পারে না।

(iv) **অমরতা সম্বন্ধে নৈতিক প্রমাণ** (The Moral Argument): কাণ্ট নৈতিক জীবনের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করার জন্য আত্মার অমরতাকে স্বীকার করে নিয়েছেন।

কাণ্টের নৈতিক প্রমাণের দুটি দিক

অমরতা সম্বন্ধে কাণ্টের প্রমাণ দর্শনের ইতিহাসে নৈতিক প্রমাণ নামে পরিচিত। এই প্রমাণ বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। এই প্রমাণের দুটি দিক আছে। প্রথমতঃ, ন্যায় বিচার (Justice) আত্মার অমরতা নির্দেশ করে। এই জীবনে সৎ ব্যক্তি তার সততার জন্য পুরস্কৃত হন না। কিন্তু ন্যায় বিচার দাবী করে যে, সৎ ব্যক্তি তার সততার জন্য পুরস্কৃত হবে এবং অসৎ

---

1. দার্শনিক লাইবনিজের মতে মনাদ (monad) অবিনশ্বর এবং প্রত্যক্ষণ ও ক্ষুধা, যা মনাদের বৈশিষ্ট্য তা কখনও বিলুপ্ত হতে পারে না। তাহলে অনবচ্ছেদ নীতি ভঙ্গ করা হবে। কাজেই মৃত্যু যথার্থ নয়, আপাতপ্রতীয়মান বিষয়।

হার্বার্ট (Herbert)-এর মতে আত্মা অন্তহীন এবং অবিনশ্বর।

ম্যাকটেগার্ট (McTaggart)-এর মতে পরব্রহ্ম (Absolute) হল পরম সত্তা, যে সত্তা একটি সমিতির মতন, ব্যক্তি যার সভ্য। প্রতিটি সভ্যই নিজের সঙ্গে অভিন্ন এবং আত্মা-সম্পূর্ণ দ্রব্য। কাজেই ম্যাকটেগার্ট ব্যক্তিগত অমরতার সমর্থক। কেননা আত্মা হল স্বয়ংসম্পূর্ণ দ্রব্য যার নিজের একটা অতীত এবং বর্তমান ইতিহাস আছে।

ব্যক্তি তার অসততার জন্য শাস্তি পাবে। তা না হলে নৈতিকতার (morality) কোন তাৎপর্য থাকে না। কিন্তু বাস্তবে আমরা দেখি না যে সৎ ব্যক্তি তার সততার জন্য পুরস্কৃত হচ্ছেন। কাজেই কোন ভবিষ্যৎ জীবনের অস্তিত্ব স্বীকার করে নিতে হয়, যে জীবনে সৎ ব্যক্তি তার সততার জন্য পুরস্কৃত হবেন। সুতরাং ন্যায়বিচারের জন্য আত্মার অমরতা স্বীকার করতে হয়।

ন্যায় বিচারের জন্য আত্মার অমরতাকে স্বীকার করতে হয়

যুক্তিটির অন্য দিক হল, নৈতিক জীবন হল এমন এক আদর্শের জন্য সংগ্রাম, যে আদর্শ আমরা এই জীবনেই লাভ করতে পারি না—এই আদর্শ হল পূর্ণ সততার আদর্শ। এই আদর্শ যদি কখনই লাভ করা না যায় তাহলে নৈতিকতার আদর্শ হয়ে পড়ে এক অলীক বস্তু। আর নৈতিক আদর্শ যদি সত্য হয় তাহলে নৈতিক কর্মকর্তার মৃত্যুর পরেও অস্তিত্ব থাকবে এই সিদ্ধান্ত করতে হয়। অর্থাৎ কিনা, নৈতিক আদর্শের বাস্তবতা প্রতিপাদনের জন্য আত্মার অমরতা স্বীকার করতে হয়। কাণ্টের ভাষায় "নৈতিক প্রচেষ্টা হল সিদ্ধির নিম্নস্তর থেকে উচ্চতর স্তরে অগ্রগতি, সততাকে লাভ করার বিরামবিহীন প্রচেষ্টা। এই অন্তহীন অগ্রগতি সম্ভব হয় যদি আমরা পূর্ব থেকে স্বীকার করে নিই যে বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন জীবের অস্তিত্ব অনন্তকাল পর্যন্ত চলবে এবং এই সমগ্র সময় জুড়ে সে তার ব্যক্তিত্ব বজায় রাখতে পারবে। আত্মার অমরতা বলতে আমরা এই বুঝি। কাজেই সর্বশ্রেষ্ঠ কল্যাণ ব্যবহারিক দিক থেকে সম্ভব, কেবল মাত্র যদি আমরা আত্মার অমরতাকে পূর্ব থেকে স্বীকার করে নিই।"

নৈতিক আদর্শের বাস্তবতা প্রতিপাদন করার জন্য আত্মার অমরতাকে স্বীকার করে নিতে হয়

কাণ্টের যুক্তি

সমালোচনা : কাণ্টের মতে আত্মার অমরতা নৈতিকতার স্বীকার্য সত্য। কিন্তু আত্মার অমরতাকে স্বীকার করে না নিলে নৈতিকতা তাৎপর্যহীন হয়ে পড়ে—এই সিদ্ধান্ত সংশয়মূলক।

(ঙ) ধর্মের ক্ষেত্রে অমরতায় বিশ্বাসের মূল্য (Value of Belief in Immortality in Religion) **:** অধ্যাপক উইলিয়ম জেমস্-এর মতে আত্মার অমরতায় বিশ্বাস হল অনুভূতির ব্যাপার। অনুভূতির উত্তাপের স্পর্শে এই বিশ্বাস সজীব হয়ে ওঠে এবং অনুভূতির অভাবই এই বিশ্বাসের প্রতি সংশয় ও উপেক্ষার মনোভাব সৃষ্টি করে। জেমস্-এর এই মন্তব্যের মধ্যে যথেষ্ট সত্যতা থাকলেও, ধর্মপ্রবণ মন জেমস্-এর এই উক্তিকে স্বীকার করে নিতে পারে না। কিন্তু প্রশ্ন হল, আত্মার এক দেহ ছেড়ে অন্য দেহ আশ্রয়

জেমস্-এর অভিমত

করা কিভাবে সম্ভব হয়? লাইবনিজের আত্মা বা কেন্দ্রীয় মনাদের ধারণা এই সমস্যার সম্ভাবনার একটা ইঙ্গিত দিতে পারে। কিন্তু সম্ভাবনা প্রত্যক্ষ প্রমাণ নয়। কাজেই আত্মার অমরতার বিষয়টি নৈতিক এবং আধ্যাত্মিক দিক থেকেই গুরুত্বপূর্ণ, অন্য দিক থেকে নয়। যাঁরা আত্মার অমরতাকে সমর্থন করেন তাঁদের দেখাতে হবে যে তাঁদের এই ধারণা বিচারবুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গতিহীন নয়। কিন্তু আত্মার অমরতার ধারণা বিচারবুদ্ধির তুলনায় বিশ্বাসের বিষয়বস্তু হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমাদের সব বিশ্বাস ও প্রত্যাশার আদি ভিত্তি হল ঈশ্বর, যাঁর থেকে সব আধ্যাত্মিক জীবনের শুরু। এটা একটা খুব যুক্তিযুক্ত বিশ্বাস যে পরমাত্মা, তার থেকেই উদ্ভূত যে সত্তা, তাকে বিনষ্ট না করে তাকে তার লক্ষ্য এবং যথার্থ পূর্ণতার দিকে চালিত করবে। নৈতিক ঈশ্বর অবশ্যই মূল্যকে সংরক্ষিত করবেন, তাকে ধ্বংস করবেন না। কাজেই অমরতায় বিশ্বাসের দাবির ভিত্তি হল আধ্যাত্মিক জীবনের অন্তর্নিহিত বৈশিষ্ট্য।

ধর্মে অমরতায় বিশ্বাসের মূল্য

অমরতার ধারণা মানুষের নৈতিক অভিজ্ঞতার মধ্যে সঙ্গতি আনে, সামাজিক উন্নতির লক্ষ্য সম্পর্কে যথোপযোগী ধারণা গঠন করতে সমর্থ করে এবং আমাদের এই নিশ্চয়তা দেয় যে, আধ্যাত্মিক মূল্যগুলি সংরক্ষিত হবে। মানুষের উন্নত ধর্মীয় জীবনে অমরতায় বিশ্বাস গৌণ বা আকস্মিক বৈশিষ্ট্য নয়। মানুষের উন্নত ধর্মীয় চেতনা জগৎকে অতিক্রম করে যায় এবং এক অপার্থিব ঈশ্বরের দিকে ধাবিত হয়। যে আত্মা তার আধ্যাত্মিক লক্ষ্য লাভ করার জন্য এই পার্থিব জগৎকে অতিক্রম করে যায়, সেই আত্মাই অন্যান্য পার্থিব বস্তুর মতন ধ্বংস হয়ে যাবে, এটা চিন্তা করার মধ্যেই বিরোধিতা রয়েছে।

জে. বি. প্র্যাট-এর অভিমত

[1]জে. বি. প্র্যাট-এর অভিমতানুসারে মনস্তাত্ত্বিক দিক থেকে অমরতায় বিশ্বাসের মূল খুব গভীরে এবং মনস্তাত্ত্বিক দিক থেকে এই বিশ্বাস সমর্থনযোগ্য। কারণ একটি মহান সত্যের সুস্পষ্ট উপলব্ধি এবং একটি মহান স্বীকার্য সত্যের উপর এই বিশ্বাস প্রতিষ্ঠিত। এই সত্যটি হল মূল্য এবং চেতন জীবন অন্যোন্য-নিরপেক্ষপদ, (co-relative terms) এবং উভয়ের প্রতিটিই অপরকে ছাড়া অসম্ভব। স্বীকার্য সত্যটি হল যে, আধ্যাত্মিক জীবন জড় জগৎ এবং তার নিয়ম ও ক্রিয়া থেকে স্বতন্ত্র এবং বিশেষ করে তার উপর নির্ভর নয়। কিন্তু এই দুটি নিবিড় ভাবে পরস্পরের সঙ্গে মিশে আছে; তারা যে অভিন্ন নয় মানব আত্মা তার উপর সর্বদা গুরুত্ব আরোপ করেছে এবং দাবি করেছে যে, তাদের একেবারে বিচ্ছিন্ন করা যায় না। মানব আত্মার অমরতায় বিশ্বাস

1. J. B. Pratt: The Religious Consciousness; Page 224

—এই স্বীকার্য সত্যের মহান প্রকাশ এবং মানব প্রকৃতির অন্তর্নিহিত আদর্শগত দাবি হল যে বিশ্বজগতের মূল্যগুলি সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস হয়ে যাবে না। ঈশ্বরে বিশ্বাসের তুলনায় এই বিশ্বাস আরও বেশী মৌলিক মানবীয় বিশ্বাস। কারণ এ হল মানবতার নিজেতেই বিশ্বাস, মানবতার তার জ্ঞাত সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ আধ্যাত্মিক জীবনে বিশ্বাস। মানুষের পরিবর্তনশীল অবস্থার সঙ্গে সঙ্গে এই বিশ্বাসের বিশেষ বিশেষ রূপের পরিবর্তন ঘটেছে কিন্তু চেতন ও বৌদ্ধিক জীবনের নিরবচ্ছিন্ন স্থায়িত্বের দাবী, মানুষের আদর্শ ও প্রত্যাশা যতকাল স্থায়ী হবে, ততকাল স্থায়ী হবে।

(চ) মূল্যের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে অমরতা (Immortality from the stand point of Value): অনেক দার্শনিক মূল্যের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে অমরতার প্রশ্নটি আলোচনা করেছেন। ইতিপূর্বে আমরা যে আলোচনা করেছি তাতে দেখতে পাই যে, আত্মাকে দ্রব্যরূপে অনেকে স্বীকার করেন না। অনেকের মতে আত্মা কোন দ্রব্য নয়।

মৃত্যুর পরেও ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের সংরক্ষণের প্রশ্নই অমরতার প্রশ্নই

প্রতিটি মানুষ হল একজন ব্যক্তি। তার ব্যক্তিত্ব দৈহিক, সামাজিক এবং মনস্তাত্ত্বিক উপাদানের সঙ্গতিপূর্ণ সমন্বয়। কাজেই মৃত্যুর পরেও নিরবচ্ছিন্ন ভাবে আত্মা স্থায়ী হয় কিনা, সেই প্রশ্ন নয়—মৃত্যুর পরেও ব্যক্তিত্ব সংরক্ষিত হয় কিনা, এটাই প্রশ্ন।

এই সম্পর্কে দার্শনিকদের মধ্যে মতবিভেদ লক্ষ্য করা যায়। নব্য হেগেলীয় দার্শনিকদের মধ্যে ব্র্যাডলি এবং বোসাংকোয়েট মনে করেন যে, মৃত্যুর পর ব্যক্তি

ব্র্যাডলি ও বোসাংকোয়েটের অভিমত

আর বেঁচে থাকে না। ব্যক্তিকে তার অস্তিত্বের জন্য দৈহিক সংগঠনের উপর নির্ভর করতে হয়। দেহের বিনাশের সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তির ব্যক্তিত্বও ধ্বংস হয়ে যায়। ব্যক্তি যেসব মূল্য এই জগতে সৃষ্টি করে, সেইগুলি মৃত্যুর পরেও স্থায়ী হয়। কিন্তু ব্যক্তির কোন অস্তিত্ব থাকে না। পরব্রহ্ম (Absolute) এই মূল্যগুলিরই হিসেব নেন, কেননা পরব্রহ্ম সব সম্ভাব্য মূল্যের শ্রেষ্ঠ মূর্তরূপ। পরব্রহ্মের স্ববিরোধমুক্ত ও সুসংহত সত্তার মধ্যে ব্যক্তির স্বকীয় বৈশিষ্ট্য ও স্বাতন্ত্র্য বজায় থাকে না। ঐ পরব্রহ্মে জীবাত্মাগুলি সম্পূর্ণভাবে রূপান্তরিত হয়ে বিরাজ করে, যাদের ব্যক্তি অভিন্নতা আর নিরূপণ করা সম্ভব হয় না। এদের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়ে যায়। কাজেই তারা

প্রিঙ্গল প্যাটিসনের সমালোচনা

বিনষ্ট হয়, হারিয়ে যায়। ব্র্যাডলি মনে করেন যে, পরব্রহ্মে জীবাত্মা পূর্ণতা ও সঙ্গতি লাভ করে। কিন্তু প্রিঙ্গল প্যাটিসন ব্যঙ্গচ্ছলে বলেন যে, জীবাত্মা তার উদ্দেশ্য সিদ্ধ করতে গিয়ে পরব্রহ্মে অদৃশ্য হয়ে যায়। কাজেই ব্র্যাডলি এবং বোসাংকোয়েট মনে করেন,

ব্যক্তি মৃত্যুর পরে বেঁচে থাকে না। মূল্যের অবদানের ভিত্তিতেই ব্যক্তির মূল্য। পরব্রহ্মে মূল্যই কেবলমাত্র থাকে, কিন্তু ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব হারিয়ে যায়।

ব্র্যাডলি এবং বোসাংকোয়েটের অভিমতের বিরুদ্ধে প্রিঙ্গল প্যাটিসন এবং যোসিয়া রয়েস মনে করেন যে, পরব্রহ্ম মূল্যগুলিকে সংরক্ষিত করলেও ব্যক্তিকে উপেক্ষা করে না। পরব্রহ্মের কাছে ব্যক্তিও মূল্য এবং তাদের মধ্য দিয়েই পরব্রহ্ম তার সত্তা রক্ষা করে। তাঁদের মতে পরব্রহ্ম এক সর্বব্যাপক সঙ্গতি (all inclusive harmony), যে সঙ্গতির মধ্যে বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিরা হল স্পন্দনের মত। একটি ব্যক্তিও যদি হারিয়ে যায় তাহলে পরব্রহ্মের সঙ্গতি ক্ষুন্ন হবে। প্রিঙ্গল প্যাটিসন মনে করেন, ব্র্যাডলি এবং বোসাংকোয়েট যখন জীবাত্মাকে পরব্রহ্মের সত্তার বিশেষণ রূপে গণ্য করেন তখন তাঁদের সিদ্ধান্তকে যুক্তিযুক্ত মনে করা যেতে পারে না। কেননা বিশিষ্ট বস্তু বা জীবের নিজস্ব একটি সত্তা আছে যাকে অগ্রাহ্য করা যায় না। জীবাত্মা তার আপন আপন ব্যক্তিত্ব ও বৈশিষ্ট্য অক্ষুন্ন রেখে পরম সত্তা ঈশ্বরের সঙ্গে অখণ্ড ঐক্য স্থাপন করে তাকে উপলব্ধি করতে পারে।

প্রিঙ্গল প্যাটিসনের অভিমত

অধ্যাপক রয়েস[1] ব্যক্তির ইচ্ছার উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন এবং এই ইচ্ছাকে তিনি পরব্রহ্মের মধ্যে সম্পূর্ণভাবে মিশিয়ে দিতে চান না। জীবাত্মার ইচ্ছা ছাড়া পরব্রহ্ম অর্থহীন। পরব্রহ্ম জীবাত্মাকে উপেক্ষা করতে পারে না। কেননা তারাই পরব্রহ্মের জীবন। রয়েস আরও মনে করেন যে, পরব্রহ্মে জীবাত্মা জীবাত্মারূপেই, পরব্রহ্মের ইচ্ছার অভিনব প্রকাশ হিসেবে নিজেকে জানে। তাঁর মতে ঈশ্বরের পরম উদ্দেশ্যের মধ্যে জীবের স্বকীয় ব্যক্তিত্ব অক্ষুন্ন থাকে কারণ জীবেব স্বকীয় ব্যক্তিত্ব অসীম দায়িত্বপূর্ণ ঈশ্বরের অবিচ্ছেদ্য অংশ। ঈশ্বরের উদ্দেশ্য জীবদের উদ্দেশ্যের সমন্বয়মূলক অখণ্ড ঐক্য।

অধ্যাপক রয়েসের অভিমত

কাজেই জীবাত্মা পরব্রহ্মের অভিনব প্রকাশ। জীবাত্মা ছাড়া পরব্রহ্ম, পরব্রহ্ম হতে পারে না। কাজেই পরব্রহ্মে ব্যক্তি হারিয়ে যেতে পারে না, ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব অবশ্যই সেখানে সংরক্ষিত হবে।

এ হল পূর্ণতার অবস্থা, যাকে আমরা অমরতা নামে অভিহিত করতে পারি এবং অমরতার এই অবস্থা হল পরমমূল্যের উপলব্ধি। এই অবস্থা জৈবিক-মানসিক ব্যক্তিত্ব অস্বীকার করলেও, আধ্যাত্মিক ব্যক্তিত্বকে অস্বীকার করে না। ভারতীয় দর্শনে

1. J. Royce: The Religious Aspects of Philosophy and the World and the Individual. —Vol. II Lecture X.

অমরতার এই অবস্থাকেই মোক্ষের বা বন্ধনমুক্তির অবস্থারূপে অভিহিত করা হয়। কারণ এই অবস্থায় জৈবিক-মানস অবস্থা ব্যক্তির উপর যে সীমারেখা আরোপিত করে সেইগুলি থেকে ব্যক্তি মুক্ত হয়। ভারতীয় দর্শনে জীবন্মুক্ত অবস্থায় ব্যক্তি জৈবিক-মানস অবস্থার দ্বারা প্রভাবিত না হয়ে সত্য, শিব ও সুন্দর এই পরমমূল্যগুলি উপলব্ধি করে। তারপর জৈবিক-মানস অবস্থাগুলি বিনষ্ট হয়ে গেলে, ব্যক্তি নিজেই মুক্তি লাভ করে। ঈশ্বর সব অভিজ্ঞতা ও মূল্যের ঐক্যরূপে আধ্যাত্মিক ব্যক্তিসত্তাকে গ্রাস না করে তাঁর পরম প্রকৃতিকে এই সব আধ্যাত্মিক ব্যক্তি সত্তার মধ্য দিয়ে উপলব্ধি করেন।

ভারতীয় দর্শনে মোক্ষই অমরতার অবস্থা

৫। আত্মার অমরতা, না মানুষকে নতুন করে সৃষ্টি করা (Immortality of Soul or Re-creation of Man) :

ইহুদী-খ্রীষ্টান ধর্মে আত্মার অমরতার কথা না বলে মানুষের যে নতুন করে সৃষ্টির বা পুনঃ সৃষ্টির কথা বলা হয়, তার স্বরূপ কি? প্রাচীন গ্রীসদেশে দেহ-মনের পার্থক্যের বিষয়টি সর্বপ্রথম একটি দার্শনিক মতবাদ রূপে উপস্থাপিত হয়। মধ্যযুগেও এই মতবাদ প্রচারিত হয় এবং আধুনিক জগতে; জন হিকের ভাষায়, এটি একটি স্বতঃপ্রামাণ্য সত্যের মর্যাদা লাভ করে। সপ্তদশ শতাব্দীতে দার্শনিক দেকার্ত পুনরায় তাঁর ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া মতবাদের মাধ্যমে সমস্যাটিকে পুনরায় ব্যক্ত করেন এবং দেহ-মনের দ্বৈতকে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর থেকে দীর্ঘকাল ধরে দেকার্তের দেহ ও মন বা জড় ও মনের দ্বৈত অনেকেরই স্বীকৃতি বা সমর্থন লাভ করে। কিন্তু দেকার্তের এই মতবাদ সমালোচনা এড়াতে পারে না। যাঁরা দেকার্তের যুক্তির সমালোচনা করেন তাঁদের বক্তব্য হল, যে শব্দগুলির মাধ্যমে মানসিক বৈশিষ্ট্য এবং ক্রিয়ার বর্ণনা দেওয়া হয়, যেমন, 'বুদ্ধিমান', 'চিন্তনশীল', 'সুখী', 'দুর্ভাবনাহীন', 'হিসাবী' প্রভৃতি বাস্তবে মানুষের বিশেষ ধরনের আচরণ বা আচরণগত প্রবণতার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। অর্থাৎ যে মানুষকে আমরা অভিজ্ঞতায় প্রত্যক্ষ করি, অভিজ্ঞতায় প্রত্যক্ষগোচর যে ব্যক্তি—যে জন্মায়, বড় হয়, নানা ধরনের ক্রিয়া করে, নানা কিছু অনুভব করে, তার ক্ষেত্রেই উপরোক্ত শব্দগুলিকে আমরা প্রয়োগ করি। কোন অপ্রত্যক্ষগোচর আত্মার ক্ষেত্রে সেইগুলিকে প্রয়োগ করছি এমন মনে করি না। কাজেই মানুষ হল তাই, যেমন তাকে দেখি: রক্তমাংসের মানুষ, যার ক্রিয়ার অন্ত নেই, যে বিচিত্রভাবে ক্রিয়া করে। একটি অপ্রাকৃতিক আত্মা একটি প্রাকৃতিক দেহের সঙ্গে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ারত—এই ভাবে মানুষকে আমরা দেখি না।

দেকার্তের মতবাদের সমালোচনা

দেহ-মনের যে দ্বৈত, দেকার্তের মতবাদে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, বিংশ শতাব্দীর মধ্য-দর্শনে সেই মতবাদকে কেন্দ্র করে নতুন ধরনের চিন্তন শুরু হওয়াতে, সেই দর্শন মানুষকে দেখল নতুন দৃষ্টিতে—বাইবেলে যে ভাবে তার উল্লেখ করা হয়েছে। মানুষের ক্ষেত্রে এক শাশ্বত আত্মা, অস্থায়ী ভাবে বিনাশশীল দেহের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে, এইভাবে মানুষকে দেখা যুক্তিযুক্ত নয়; মানুষ হল এক সীমিত, বিনাশীল দেহ-মানসজীবন। প্লেটো এবং নব্য প্লেটো-দার্শনিক চিন্তার ক্ষেত্রে মৃত্যুর প্রতি যে দৃষ্টিভঙ্গি সূচিত হয়েছিল উপরিউক্ত ধরনের চিন্তার ফলে মৃত্যুর প্রতি ভিন্ন ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি সূচিত হল।

দেকার্তের দেহ-মনের দ্বৈতকে নতুন দৃষ্টিতে দেখা

ব্যক্তির মৃত্যুর পরেও ব্যক্তিকে কেন্দ্র করে ঈশ্বরের উদ্দেশ্য সম্পর্কে যখন একটা সুস্পষ্ট ধারণার উদ্ভব ঘটল তখনই দেহের পুনরুজ্জীবনের ধারণা দেখা দিল যা প্লেটোর বিশ্বাসের বিরোধী ধারণা। প্লেটোর আত্মার অমরতায় বিশ্বাস এবং ইহুদী-খ্রীষ্টানদের দেহের পুনরুজ্জীবন (resurrection of the body) এই দুই-এর মধ্যে ধর্মগত পার্থক্য বর্তমান। শেষোক্ত মতবাদ নতুন করে সৃষ্টি করা রূপ এক বিশেষ ঐশ্বরিক ক্রিয়াকে স্বীকার করে নেয়। এই ধারণা মৃত্যুকালে, মানুষের ঈশ্বরের উপর, এক পরম নির্ভরতার বোধ সৃষ্টি করে। কাজেই ইহুদী-খ্রীষ্টান ধারণা অনুসারে মৃত্যু হল বাস্তব এবং ভয়াবহ। মৃত্যু পুরাতন জীর্ণ পোশাক ত্যাগ করে নতুন পোশাক পরিধান করা নয়, বা কক্ষ থেকে কক্ষান্তরে যাওয়া নয়। মৃত্যু হল পরিপূর্ণভাবে বিনাশ বা ধ্বংস হয়ে যাওয়া, একেবারে মুছে যাওয়া—উজ্জ্বল আলোকে উদ্ভাসিত বিচিত্র জীবন থেকে মৃত্যুর সীমাহীন অন্ধকারে উত্তীর্ণ হওয়া। কেবলমাত্র সার্বভৌম ক্ষমতাসম্পন্ন ঈশ্বরের সৃজনশীল ভালবাসা সমাধির পরেও মানুষের ক্ষেত্রে এক নতুন অস্তিত্বের সম্ভাবনা এনে দিতে পারে।

ইহুদী-খ্রীষ্টান ধর্মমতে দেহের পুনরুজ্জীবনের ধারণা

মৃতের পুনরুজ্জীবন বলতে কি বোঝায়? সেইণ্ট পল (*Saint Paul*)-এর আলোচনা থেকে খ্রীষ্টধর্মের এই পুনরুজ্জীবনের ধারণা লাভ করা যেতে পারে। যীশু খ্রীষ্টের যে বিশেষ ধরনের পুনরুজ্জীবন, অর্থাৎ কবর থেকে পুনরুত্থান, তার কথা বাদ দিলে, সাধারণ পুনরুজ্জীবন বলতে খ্রীষ্টধর্মানুসারে শেষ বিচারের দিনে মৃত ব্যক্তিদের আত্মাসমূহের কবর থেকে পুনরুত্থান বুঝায় না। ঈশ্বরের নতুন করে সৃষ্টি বলতে বোঝায় ব্যক্তির দৈহিক-মানস সত্তার নতুন সংগঠন নয় বা নতুন করে সৃষ্টি করা নয়। অর্থাৎ যে ব্যক্তির দেহ বিনষ্ট হয়েছে বা মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছে তাকে আবার বাঁচিয়ে তোলা নয়।

মৃতের পুনরুজ্জীবনের অর্থ

ঈশ্বর ব্যক্তিকে পুনরুজ্জীবিত করেন এই অর্থে যে তার দৈহিক-মানসিক সত্তা এক আধ্যাত্মিক দেহরূপে (spiritual body) পুনর্গঠিত হয়। জড় দেহ যেমন বর্তমান জড় জগতে বিচরণ করে তেমনি 'এই আধ্যাত্মিক দেহ' আধ্যাত্মিক জগতে বিচরণ করে, কাজেই ব্যক্তির পুনরুজ্জীবন তার জড়দেহের পুনর্সংগঠন নয়, এক আধ্যাত্মিক দেহের আধ্যাত্মিক জগতে বিচরণ।

ব্যক্তি অভিন্নতার সমস্যা

কিন্তু এই ধরনের মতবাদের ক্ষেত্রে যে সমস্যাটি দেখা দেয় তাহল ব্যক্তি-অভেদ বা ব্যক্তি-অভিন্নতার (personal identity) সমস্যা। জড় জগতের জীবন এবং পুনরুজ্জীবন-উত্তর জীবন, এই দুইয়ের যোগ সাধিত না হলে মৃত্যু-পূর্ব ব্যক্তি এবং মৃত্যুর পরে পুনরুজ্জীবিত ব্যক্তির অভেদ বা অভিন্নতা নিরূপিত হবে কি ভাবে? অবশ্য পল বিশেষ ভাবে এই প্রশ্নের আলোচনা করেন নি।

তাহলে ঈশ্বর কর্তৃক দেহসমন্বিত মানব সত্তার নতুন সৃষ্টিকে (recreation) কিভাবে বুঝে নেওয়া যেতে পারে? পল যে ধারণা ইতিপূর্বে ব্যক্ত করেছেন তার সেই চিন্তাধারাকে এইভাবে বিকশিত করা যেতে পারে।

পল-এর চিন্তাধারার বিকাশ

মনে করা যাক, লণ্ডনে বসবাসকারী একজন ব্যক্তি নাম রবার্ট জনসন হঠাৎ তার বন্ধুদের কাছ থেকে অদৃশ্য হয়ে গেল এবং তারই এক অবিকল প্রতিরূপ ভারতের দিল্লীতে আবির্ভূত হল। ভারতে যে ব্যক্তির আবির্ভাব, তার দৈহিক এবং মানসিক বৈশিষ্ট্য লণ্ডনে বসবাসকারী ব্যক্তিটি যে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল, তার সঙ্গে অবিকল এক। দৈহিক বৈশিষ্ট্য, যেমন চোখ, কেশ, বা অন্যান্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গের বৈশিষ্ট্যের মধ্যে মিল রয়েছে। এছাড়াও মিল রয়েছে উভয়ের বিশ্বাস, অভ্যাস, আবেগ এবং মানসিক মনোভাবে। এছাড়াও রবার্ট জনসনের যে অবিকল প্রতিরূপ, সে নিজেকে রবার্ট জনসন বলেই মনে করছে, যে রবার্ট জনসন লণ্ডন থেকে অদৃশ্য হয়ে গেছে। সবরকম পরীক্ষার পরে, রবার্ট জনসনের অবিকল প্রতিরূপকে রবার্ট জনসন বলে গ্রহণ করতে তার বন্ধুরা দ্বিধা করবে না, এবং তার এক মহাদেশ থেকে নিরুদ্দেশ হয়ে অন্য মহাদেশে আবির্ভাবের সমস্যা নিয়ে তারা মাথা ঘামাবে না।

এবার মনে করা যাক, রবার্ট জনসন লণ্ডন থেকে অদৃশ্য না হয়ে মারা গেল এবং তার মৃত্যু সময়ে রবার্ট জনসনের এক অবিকল প্রতিরূপ ভারতে দেখা দিল রবার্ট জনসনের সব বৈশিষ্ট্য নিয়ে, এমনকি তার স্মৃতি নিয়ে। সেক্ষেত্রে লণ্ডনে যে রবার্ট জনসন মারা গেল এবং ভারতে তার যে অবিকল প্রতিরূপ, এই দুইকে অভিন্ন বলে গণ্য করতে কি আমরা দ্বিধা করব? জন হিক এই আলোচনা প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেন

যে, আমাদের বলতে হবে যে লণ্ডনের রবার্ট জনসন অন্য স্থানে রহস্যজনকভাবে নতুন করে সৃষ্ট হয়েছে। ('We could have to say that he had been miraculously, recreated in another place')।

এখন ধরা যাক, রবার্ট জনসনের মৃত্যুর পর তার অবিকল প্রতিলিপি বা প্রতিরূপ (replica)-র ভারতে আবির্ভাব না ঘটে, তার এক পুনরুজ্জীবিত প্রতিলিপির এক ভিন্ন জগতে আবির্ভাব ঘটল, যে জগতে শুধুমাত্র পুনরুজ্জীবিত ব্যক্তিদেরই বসবাস এবং যে জগৎ আমাদের চিরপরিচিত জগত থেকে ভিন্ন।

অন্য এক ভিন্ন জগতে পুনরুজ্জীবিত ব্যক্তির বিচরণ

উপরে যে ব্যাখ্যা দেওয়া হল, এই ব্যাখ্যা অনুসরণ করে, কোন ব্যক্তি ঈশ্বর কর্তৃক দেহ সমন্বিত ব্যক্তি-সত্তার নতুন করে সৃষ্টির তাৎপর্যটুকু উপলব্ধি করতে সক্ষম হবে। এই ধরনের ব্যাখ্যার বৈশিষ্ট্য হল যে এই ব্যাখ্যাতে বিস্ময়কর, অপরিচিত এবং রহস্যজনক উপাদানকে যতদূর সম্ভব হ্রাস করা সম্ভব, তা করা হয়েছে।

প্রশ্ন হল, মৃত্যুর পরে মানবসত্তার পুনর্গঠন বা ঈশ্বরের মানবসত্তাকে নতুন করে সৃষ্টি করা—ইহুদী খ্রীষ্টান ধর্মের এই বিশ্বাসের ভিত্তি কি? এর উত্তরে বলা হয় যে, মৃত্যুর পরে জীবনের কথা যিশু জীবনী ও যিশুর শিষ্যদের কার্যকলাপের বিবরণ সম্বলিত বাইবেলের অন্তখণ্ডে (New Testament) উল্লিখিত হয়েছে। বাইবেলের পূর্বভাগেও কোথাও কোথাও এর উল্লেখ দেখা যায়। কিন্তু এছাড়াও অন্য গভীরতর কারণ আছে। মানুষের পুনরুজ্জীবনেতে বিশ্বাসের মূলে রয়েছে ঈশ্বরের সার্বভৌম উদ্দেশ্যে বিশ্বাস বা শ্রদ্ধা, মানুষের মৃত্যুতে যার পরিসমাপ্তি ঘটে না এবং যা মানুষের স্বাভাবিক মরণশীলতার পরেও কার্যকর হয়।

পুনরুজ্জীবনে বিশ্বাসের ভিত্তি

মার্টিন লুথার-এর কথায়, "যার সঙ্গেই ঈশ্বর কথা বলেন, ক্রোধবশতঃ বা করুণাবশতঃ, সে অবশ্যই অমর হবে।" আরও একটা যুক্তির কথা বলা হয়। ঈশ্বর যখন সীমিত মানুষকে সৃষ্টি করেছেন তখন ঈশ্বরের পরিকল্পনা যদি এই হয় যে, তাঁর সৃষ্ট মানুষের সাহচর্যের অংশীদার তিনি হবেন এবং সেভাবেই তার সৃষ্ট মানুষ অস্তিত্বশীল হবে, তাহলে মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে যদি মানুষের অস্তিত্ব বিলীন হয়ে যায় তাহলে এই বিলীন হওয়ার ঘটনাটি ঈশ্বরের ইচ্ছা বা সংকল্পকে ব্যর্থ করবে এবং তাঁর সৃষ্ট মানুষের প্রতি, যিনি তাঁর নিজের ভাবমূর্তিতে তাদের সৃষ্টি করেছেন এবং তাদের সাহচর্য লাভ করতে চান, সেই ধারণার বিরোধীতা করবে। তাছাড়া মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে মানুষের

অস্তিত্ব বিলীন হয়ে গেলে মানুষকে কেন্দ্র করে ঈশ্বরের যে উদ্দেশ্য তা অনেকাংশেই অপূর্ণ থেকে যাবে।

মানুষকে কেন্দ্র করে ঈশ্বরের উদ্দেশ্য রূপ লাভ করে, যার মধ্য দিয়ে মানুষের প্রকৃতির পরিপূর্ণ সম্ভাবনা সার্থকতা লাভ করে। ঈশ্বরের উদ্দেশ্যের পরিপূর্ণতা লাভের প্রতিশ্রুতি থেকেই 'স্বর্গের' পরিকল্পনার উল্লেখ বাইবেলের অন্তখণ্ডে আমরা দেখি।

মানুষের মধ্য দিয়েই ঈশ্বরের উদ্দেশ্য সার্থকতা লাভ করে

স্বর্গ হল একটা প্রতীক যেখানে সকলের মৃত্যুর পরে আনন্দ-অভিসার ঘটে। এক অনন্ত, অসীম কল্যাণের অস্তিত্বে বিশ্বাসকে নাকচ করা কোন ধর্মমতের পক্ষেই সম্ভব নয়। অবশ্য খ্রীষ্টধর্মে 'নরক'-এর কথাও রয়েছে। আপাতঃদৃষ্টিতে দু-এর বিরোধ লক্ষ্যণীয়। কিন্তু 'নরক' বলতে যদি বোঝায়, এই জগতের দুঃখভোগ, যা পরিণামে ব্যক্তির চিত্ত শোধন করে তাকে স্বর্গের অনন্ত কল্যাণের দিকে পরিচালিত করে তাহলে উভয়ের মধ্যে যে বিরোধ তা দূর হয়ে যায়। আবার 'নরক'-এর ধারণাকে প্রতীকরূপেও গ্রহণ করা যেতে পারে। মানুষের স্রষ্টার অর্থাৎ ঈশ্বরের সঙ্গে মানুষের সম্পর্কের যে স্বাধীনতা রয়েছে এবং এই স্বাধীনতা যে কতখানি দায়ীত্বপূর্ণ নরক-এর ধারণা তারই প্রতীক। কাজেই ঈশ্বর কর্তৃক ঈশ্বরের সৃষ্ট মানুষের কল্যাণসাধন যাতে পরিপূর্ণ সার্থকতা লাভ করতে পারে তার জন্যই মৃত্যুর পরেও মানুষের পুনরুজ্জীবনের প্রয়োজন। এ জগতে মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে মানুষের অস্তিত্ব নিঃশেষ হয়ে গেলে ঈশ্বরের সংকল্প বা উদ্দেশ্য তার পূর্ণ সার্থকতা লাভ করতে পারবে না।

চতুর্দশ অধ্যায়

অমঙ্গলের সমস্যা ও দুঃখবাদ

(The Problem of Evil and Pessimism)

১। অমঙ্গলের সমস্যা (The Problem of Evil) ঃ

(ক) অমঙ্গল কা'কে বলে ? (What is evil ?) :

অমঙ্গল (evil) বলতে আমরা কি বুঝি ? অমঙ্গল বলতে আমরা বুঝি এমন কিছু যা মন্দ, অশুভ, ক্ষতিকর, অবাঞ্ছনীয় এবং বিরক্তিকর বা দূষণীয়, যেমন—রোগ, শোক, দুঃখ। অমঙ্গলের ধারণা কোন নঞর্থক ধারণা নয় বা অমঙ্গলের অস্তিত্ব নেই, বা অমঙ্গল অলীক বা ভ্রান্তি মাত্র—এই দৃষ্টিভঙ্গি মোটেও বাস্তব নয়। অমঙ্গলের বাস্তব অস্তিত্ব অস্বীকার করা যায় না। মানুষ তার অভিজ্ঞতায় যে দুঃখ, বেদনা, ব্যর্থতা, নৈরাশ্য, রোগ, শোক প্রত্যক্ষ করে তার অস্তিত্বকে অস্বীকার করা চলে না। তবে বাস্তব দিক থেকে বিচার করলে মানুষের জীবন ভাল, মন্দ, কল্যাণ, অকল্যাণ, সুখ-দুঃখের সংমিশ্রণ। ভাল প্রতীয়মান হয় মন্দের পাশে থাকার জন্য, মন্দের বেলায়ও সেই একই কথা। ভাল ও মন্দ দুইই অভিজ্ঞতার বিষয় এবং পারস্পারিক তুলনার মধ্য দিয়েই তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে ওঠে। ভাল ও মন্দ, মঙ্গল ও অমঙ্গল হল অন্যোন্যসাপেক্ষ ঘটনা (correlative fact)। কাজেই ভালর বা মঙ্গলের সঙ্গে যুক্ত না করে মন্দ বা অমঙ্গলকে বোঝা কখনও সম্ভব হতে পারে না।

অমঙ্গলের স্বরূপ

[1]ম্যাকগ্রেগর (*MacGergor*) যথার্থই বলেছেন যে, অমঙ্গলের সমস্যা বাস্তবিকই একটি বৃহত্তর সমস্যার অংশ স্বরূপ, যেটি হল মঙ্গল এবং অমঙ্গলের সমস্যা। কেননা অমঙ্গলের মত মঙ্গলেরও বাস্তব অস্তিত্ব আছে। সুখ, আনন্দ, সৌন্দর্য, সাফল্য, সততা, এইগুলির অস্তিত্বও অস্বীকার করা যেতে পারে না।

ম্যাকগ্রেগরের অভিমত

অনেকে মনে করেন যে, অমঙ্গল হল সমন্বয়ন বা উপযোজনের অভাব (want of adjustment)—যেমন, প্রাকৃতিক অমঙ্গল হল ব্যক্তির প্রকৃতির (nature) সঙ্গে এবং

---

1. "So, the problem of evil is really only part of a greater problem which is the problem of good and evil."—MacGregor : Introduction to Religious Philosophy ; Page 270

নিজের সঙ্গে উপযোজনের বা সমন্বয় প্রতিষ্ঠার ব্যর্থতা। নৈতিক অমঙ্গল বা পাপ হল ব্যক্তির নিজের ইচ্ছার সঙ্গে অপর ব্যক্তির ইচ্ছার উপযোজনের অভাব। কিন্তু অনেকের ধারণা অমঙ্গলকে এই দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখা হল অমঙ্গলকে সদর্থক বিষয়রূপে গণ্য না করে নঞর্থক বিষয়রূপে গণ্য করা।

(খ) অমঙ্গলের শ্রেণী বিভাগ (Classification of evils) :

নানাভাবে অমঙ্গলের শ্রেণীবিভাগ করা হয়েছে। সাধারণতঃ চার প্রকারের অমঙ্গল প্রত্যক্ষ করা যায়। কষ্ট (pain), ভ্রম (error), কদর্যতা (ugliness) এবং পাপ (sin)। এইগুলি যথাক্রমে সুখ (happiness), সত্য (truth), সৌন্দর্য (beauty) এবং সততা (goodness)—এই চার প্রকারের সদগুণের বিপরীত।

এই অমঙ্গলগুলিকে সাধারণতঃ দুটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়—প্রাকৃতিক অমঙ্গল (Natural Evil) এবং নৈতিক অমঙ্গল (Moral Evil)। নৈতিক অমঙ্গল মানুষের ইচ্ছার প্রয়োগের উপর নির্ভর। কিন্তু প্রাকৃতিক অমঙ্গল মানুষের ইচ্ছা-নির্ভর নয়। দুর্ভিক্ষ, বন্যা, ঘূর্ণিবাত্যা, ঝড়, মৃত্যু, রোগ এই গুলি প্রাকৃতিক অমঙ্গলের উদাহরণ। এই সব প্রাকৃতিক অমঙ্গল মানুষের অশেষ অকল্যাণ করে। মানুষ এইগুলিকে আংশিক ভাবে রোধ করতে পারে, সম্পূর্ণভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না। নৈতিক অমঙ্গল মানুষের ইচ্ছা নির্ভর। যখন মানুষ ইচ্ছাপূর্বক নৈতিক নিয়ম লঙ্ঘন করে তখনই নৈতিক অমঙ্গলের উদ্ভব হয়। অনেকে মনে করেন অমঙ্গলের উপরিউক্ত শ্রেণীবিভাগ অতিরিক্ত সরল হওয়াতে সন্তোষজনক নয়। অনেক অমঙ্গলের অস্তিত্ব আছে যেগুলি অংশতঃ নৈতিক এবং অংশতঃ প্রাকৃতিক। হত্যাকাণ্ড নিঃসন্দেহে নৈতিক অমঙ্গল, যদি মানুষকে তার কাজের জন্য দায়ী করতে হয়; কিন্তু এই অমঙ্গল হয়ত অংশতঃ প্রাকৃতিক অমঙ্গল, কেননা যে অবস্থার উপর মানুষের কোন নিয়ন্ত্রণ ছিল না তেমন অবস্থা হয়ত হত্যাকাণ্ডের চিন্তাটি খুনীর মনে জাগ্রত করেছিল।

নৈতিক অমঙ্গল ও প্রাকৃতিক অমঙ্গলের মধ্যে পার্থক্য

দার্শনিক লাইবনিজ প্রাকৃতিক অমঙ্গল এবং নৈতিক অমঙ্গলকে অতিপ্রাকৃত অমঙ্গল (Metaphysical evil)-এর অন্তর্ভুক্ত করেছেন। তাঁর মতে সসীম সত্তার সসীমত্ব (finitude of finite beings) থেকেই এই অতিপ্রাকৃত অমঙ্গলের উদ্ভব। সসীম মানুষ তার সসীমত্বের জন্যই দোষত্রুটিপূর্ণ হয়। লাইবনিজের মতে ঈশ্বরের পক্ষেও কোন সীমিত বস্তুকে পূর্ণ বা সর্বত্রুটিমুক্ত করে তোলা সম্ভব নয়।

লাইবনিজের অমঙ্গলের শ্রেণী বিভাগ

প্রাচীন ধর্মতত্ত্ববিদ্‌দের মতবাদ অনুযায়ী এই জগতে প্রথমে নৈতিক অমঙ্গলের আবির্ভাব এবং মানুষের পাপকর্ম করার জন্য তার দণ্ড স্বরূপ পরবর্তীকালে প্রাকৃতিক অমঙ্গলের আবির্ভাব। কিন্তু এই অভিমত সঠিক নয়। পাপের ধারণা করার বহু পূর্বেই জগতে প্রাকৃতিক অমঙ্গলের অস্তিত্ব ছিল। এই দুই ধরনের অমঙ্গলকে অভিন্ন গণ্য করা যুক্তিসঙ্গত নয়। মানুষকে নৈতিক অমঙ্গলের জন্য দায়ী করা হলেও, প্রাকৃতিক অমঙ্গলের জন্য দায়ী করা চলে না, যদিও এই উভয় প্রকার অমঙ্গলের মধ্যে সম্বন্ধ বর্তমান।

নৈতিক অমঙ্গলের পরে প্রাকৃতিক অমঙ্গলের আবির্ভাব—মতবাদ সঠিক নয়

দুঃখ, রোগ, মৃত্যু—এই সব প্রাকৃতিক অমঙ্গলগুলি প্রাকৃতিক জগতের গঠন ও বিন্যাসের সঙ্গে যুক্ত। মানব জীবনের সঙ্গে দুঃখ যুক্ত। প্রকৃতিই এমন জীবাণু সৃষ্টি করেছে যেগুলি রোগ ও মৃত্যুর কারণ। বস্তুতঃ, কিছু লোকের কল্যাণ অন্য ধরনের জীবের দুঃখ ও মৃত্যুর উপর নির্ভর। তাছাড়া প্রাকৃতিক নিয়মগুলিও জগতে নানা ধরনের দুর্যোগ সৃষ্টি করে। স্বাভাবিকভাবে এই সব বিপযয় মানুষের মনে এই প্রশ্ন জাগায় যে, এই সব বিপর্যয় কার কল্যাণের জন্য ঘটে ? আবার এই সব দুঃখ কষ্টও মানুষের মধ্যে সমভাবে বণ্টিত নয়। সাধু ব্যক্তি অযথা কষ্ট পায়। অসাধু ব্যক্তি বিনা বাধায় জীবনে উন্নতি করতে থাকে।

প্রাকৃতিক অমঙ্গল জগতের গঠনের সঙ্গে যুক্ত

প্রাকৃতিক অমঙ্গল নৈতিক অমঙ্গলের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে যুক্ত। প্রাকৃতিক অমঙ্গল নৈতিক অমঙ্গলের আবির্ভাবের ক্ষেত্র তৈরি করে দেয়। ক্ষুধা, অভাব, বেদনা, বস্তুতঃ সবরকমের দুঃখই মানুষকে সক্রিয় করে তোলে, এবং এইগুলি অনেক সময়ই নৈতিক অমঙ্গলের কারণ হয়।

প্রাকৃতিক অমঙ্গল যদি মানুষকে পাপকর্ম করতে উত্তেজিত না করত, হয়ত মানুষ পাপকর্ম থেকে বিরত থাকত। অবশ্য দুঃখ, অভাব, অজ্ঞতা এরা নিজেরাই নৈতিক অমঙ্গলে পরিণত হতে পারে না। নৈতিক অমঙ্গল ঘটবার জন্য ব্যক্তিগত ইচ্ছার প্রয়োজনীয়তা আছে। মানুষের প্রাকৃতিক উত্তেজনার ক্ষেত্রে যখন ইচ্ছা ক্রিয়া করে তখনই নিছক ইন্দ্রিয়গত বিষয় নৈতিক ক্রিয়ায় রূপান্তরিত হয়। মানুষের স্বাভাবিক প্রবণতা হল এই সব উত্তেজনাকে পরিতৃপ্ত করা, যেমন আত্মরক্ষার উত্তেজনা।

নৈতিক অমঙ্গলের ক্ষেত্রে ইচ্ছার গুরুত্ব আছে

মানুষের ব্যক্তিগত ইচ্ছা কিভাবে পরিচালিত হবে সমাজ তার একটা মানদণ্ড নিরূপণ করে দেয় এবং ইচ্ছা যখন এই আদর্শের সঙ্গে সংগতি রক্ষা করে না তখনই নৈতিক অমঙ্গলের সৃষ্টি হয়। যখন নৈতিক নিয়মকে

পাপ

কোন ঐশ্বরিক শক্তির অধীন করা হয় তখন নৈতিক অমঙ্গল ধর্মীয় তাৎপর্য লাভ করে, যাকে আমরা 'পাপ' (sin) কথাটি দিয়ে আখ্যাত করি। পাপ বলতে বোঝায় ঈশ্বরের বিধানের সঙ্গে সংগতি রক্ষার ব্যর্থতা।

ব্যক্তির পাপ করার সামর্থ্য তার বিচারবুদ্ধিপ্রসূত নির্বাচন ক্ষমতা নির্দেশ করে। পাপের বোধ তখনই ব্যক্তির মধ্যে জাগে যখন সে একটি আদর্শ বা নিয়ম স্বীকার করে নেয়, যেটি তার মেনে চলা উচিত এবং যেটা সে স্বেচ্ছায় পালন করেছে। কিন্তু পাপের ক্ষেত্রে যেটি তাত্ত্বিক প্রশ্ন সেটি হল, এই জগতে পাপের অস্তিত্বের সার্থকতা কী? যারা এই প্রশ্ন তোলে তারা একটা বিষয় পূর্ব থেকেই স্বীকার করে নেয় যে, এই জগত মঙ্গলের দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হওয়া উচিত। কিন্তু কেন এই বিশ্বজগৎ সর্বোচ্চ কল্যাণের সঙ্গে সংগতি রক্ষা করতে পারে নি? এই ত্রুটি যদি জগতের অন্তর্নিহিত ত্রুটি না হয় তবে সর্বজ্ঞ ঈশ্বর কেন তাতে বাধা দেননি? যাঁরা মঙ্গলবাদী, তাঁরা মনে করেন এই জগৎ মঙ্গলময় এবং পাপ সর্বোতোভাবে মঙ্গলের বশীভূত। কিন্তু দুঃখবাদীরা তা স্বীকার করতে নারাজ। অমঙ্গল তত্ত্বের সবটুকু চাপ গিয়ে পড়ে ঈশ্বরবাদীর উপর, যাকে তার স্বীকার্য সত্য—ঈশ্বর হিতৈষী ও মঙ্গলময়—এর সঙ্গে অমঙ্গলের অস্তিত্বের সমন্বয়সাধন করতে হয়।

পাপের অস্তিত্বের সার্থকতার প্রশ্নের উত্তর ঈশ্বরবাদীদের দিতে হয়

(গ) অমঙ্গল সম্পর্কীয় মতবাদ (Theories of evil):

অমঙ্গলের কোন ব্যাখ্যা দেবার পূর্বে মায়েল এডওয়ার্ডস্ (*Miall Edwards*) অমঙ্গলের সমস্যা সম্পর্কে যে বিষয়টি স্মরণে রাখার কথা বলেছেন তা বিশেষ করে মনে রাখতে হবে। তাঁর মতে ধর্মীয় জীবনের পরিসরের মধ্যেই অমঙ্গলের সমস্যার উদ্ভব। ধর্মের দৃষ্টিভঙ্গিকে স্বীকার করে নিয়েই তবে এটি ধর্মের বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন করে। ঈশ্বরের সততা ও সর্বশক্তি-মত্তায় পূর্ব থেকে বিশ্বাস না করলে দুঃখ ও পাপের অস্তিত্ব কোন সমস্যাই সৃষ্টি করে না। জড়বাদীদের (Materialits) ও নিসর্গবাদীদের (Naturalists) মতবাদ স্বীকার করে নিলে, কোন অমঙ্গলের সমস্যারই অস্তিত্ব নেই। এই জগৎ যদি অন্ধ অচেতন জড় শক্তির দ্বারা চালিত হয়, তাহলে সৎব্যক্তি কেন দুঃখভোগ করে এবং অসাধু ব্যক্তি কেন পরমানন্দে কালাতিপাত করে, এই সব প্রশ্ন অর্থহীন হয়ে পড়ে। কিন্তু ঈশ্বরকে যদি প্রেমময়, করুণাময়, ন্যায়পরায়ণ, সর্বশক্তিমান মনে করা হয়, তা হলেই অমঙ্গলের সমস্যা দেখা দেয়।

ধর্মীয় জীবনের পরিসরের মধ্যেই অমঙ্গলের সমস্যার উদ্ভব

জড়বাদী ও নিসর্গবাদীদের মতবাদ

আসলে অমঙ্গলের সমস্যা সকল যুগে সকল চিন্তাবিদ্‌দের কাছে একটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যারূপে দেখা দিয়েছে। ঈশ্বর যদি এই জগতের নৈতিক শাসনকর্তা হন, ঈশ্বর যদি সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান, সর্বব্যাপী ও হিতৈষী হন তাহলে ঈশ্বর পরিচালিত এই জগতে এত অমঙ্গল, দুঃখ, কষ্টের অস্তিত্ব কেন? এই অমঙ্গলের অস্তিত্ব কি প্রমাণ করে না যে, ঈশ্বর সর্বাঙ্গসুন্দর বা পূর্ণ নন? ঈশ্বর যদি ন্যায়পরায়ণ হন তাহলে তিনি কি পাপীকে ক্ষমা করতে পারেন? কাজেই ঈশ্বরবাদই (Theism) অমঙ্গলের সমস্যার সৃষ্টি করে। [1]ম্যাকগ্রেগর (*MacGregor*) বলেন, "যদি কোন ব্যক্তি এই অভিমত গ্রহণ করে যে, জগতের অন্তরে এক পরমসত্তার অস্তিত্ব আছে, যিনি সব মূল্যের উৎস, তখনই তাকে এই প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়। 'কোথা থেকে অমঙ্গল আসে, মূল্য নয় এমন বিষয় কী?"

ঈশ্বরবাদই অমঙ্গলের সমস্যার সৃষ্টি করে

দার্শনিক হিউম (*Hume*)-এর মতে ঈশ্বরের মধ্যে অনন্তশক্তি ও বুদ্ধিমত্তা ও অপরদিকে অসীম সত্যতা ও হিতৈষা, এই উভয়প্রকার গুণের একত্র উপস্থিতি সম্ভব নয়। হিউমের মতে জগতের অমঙ্গল যদি ঈশ্বরের অভিপ্রেত হয় তাহলে তিনি হিতৈষী নন, আবার যদি অমঙ্গল তার অনভিপ্রেত হয় তাহলে তাঁকে সর্বশক্তিমান বলা চলে না।

অমঙ্গলের রহস্য ব্যাখ্যা করার জন্য নানা ধরনের মতবাদ উপস্থাপন করা হয়েছে। আদিম মানুষ তার চারপাশে যে অমঙ্গলের অস্তিত্ব লক্ষ্য করত, সেইগুলির ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে আত্মার জগতকে (spirit world) তার উৎস হিসেবে নির্দেশ করত। আদিম মানুষ মনে করত যে মানুষকে সহায়তা করার জন্য যেমন হিতৈষী আত্মার অস্তিত্ব রয়েছে, তেমনি অনেক অহিতৈষী আত্মার অস্তিত্ব আছে যাদের মন্দ কাজের জন্যই মানুষের এত দুঃখ কষ্ট। বহু দেববাদে বিশ্বাসী যে ধর্ম, সেই ধর্মও ঐ একই নীতির সাহায্যে অমঙ্গলের ব্যাখ্যা দেবার জন্য চেষ্টা করেছে। বহু দেববাদ (Polytheism) বিভিন্ন প্রাকৃতিক শক্তির পশ্চাতে একাধিক অতীন্দ্রিয় অতিমানব দেবতার সত্তায় বিশ্বাসী। এই সব দেবতা জগতের এক একটি বিভাগের কর্তা এবং নিজ নিজ বিভাগের নিয়ামক হিসেবে তারা জগতের বিভিন্ন বিভাগগুলি নিয়ন্ত্রণ করেছে। যেসব প্রাকৃতিক শক্তি মানুষের দুঃখ কষ্টের কারণ, প্রাকৃতিক অমঙ্গলের হেতু, সেইগুলি কতকগুলি অশুভ দেবতার নিয়ন্ত্রণের অধীন। দ্বীশ্বরবাদ (Ditheism) দুই স্বতন্ত্র ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করে তার সাহায্যে অমঙ্গলের ব্যাখ্যা দেবার চেষ্টা করেছে। এই দুই স্বতন্ত্র ঈশ্বর পরস্পরের

আদিম মানুষের ব্যাখ্যা

বহু-দেববাদ প্রদত্ত অমঙ্গলের ব্যাখ্যা

দ্বীশ্বরবাদের ব্যাখ্যা

1. Introduction to Religious Philosophy; Page 270

প্রতিদ্বন্দ্বী। একজন শুভ, কল্যাণ ও মঙ্গলের স্রষ্টা; আর একজন অশুভ, অকল্যাণ ও অমঙ্গলের স্রষ্টা। মঙ্গলময় ঈশ্বর একটি সর্বাঙ্গসুন্দর জগৎ সৃষ্টি করতে চান। কিন্তু প্রতিদ্বন্দ্বী ঈশ্বর তাঁর এই কাজে বাধা দেন। এইজন্য প্রথম ঈশ্বরের পরিকল্পনানুযায়ী সর্বাঙ্গসুন্দর জগৎ সৃষ্টি করা সম্ভব হয় না। সুতরাং এই কারণেই জগতে অমঙ্গলের অস্তিত্ব।

প্রাচীন পার্শীদের ধর্মমতে অমঙ্গলের ব্যাখ্যা

প্রাচীন পার্শীদের ধর্মমতের মধ্যেও অনুরূপ ব্যাখ্যা দৃষ্টিগোচর হয়। যে ঈশ্বর কল্যাণের প্রতীক, তাকে তারা আহুরমজ্‌ডা (Ahrua Mazda) এবং যে ঈশ্বর অকল্যাণ ও অমঙ্গলের স্রষ্টা তাকে আহ্‌রিমন (Ahriman) নামে অভিহিত করতেন। উভয়ের পারস্পরিক ক্রিয়া ও দ্বন্দ্ব থেকেই এই জগতের শুভ ও অশুভের সৃষ্টি। খ্রীষ্টধর্মেও অমঙ্গলের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে হিতৈষী ঈশ্বরের প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে শয়তানের (Satan) কল্পনা করা হয়েছে যে শয়তান হল এক অমঙ্গলজনক ও বিঘ্নকারী শক্তি যার থেকে সব অমঙ্গল ও পাপের সৃষ্টি।

সমালোচনা

উপরিউক্ত মতবাদগুলির সমালোচনায় বলা যায় যে, এই মতবাদগুলি অমঙ্গলের সমস্যার সন্তোষজনক ব্যাখ্যা দিতে পারে না। বহুদেববাদ পৌরাণিক মতবাদ। এই মতবাদ দেবতাকে মানুষ রূপে কল্পনা করে। দ্বীশ্বরবাদও ঈশ্বরকে সাধারণ মানুষের মত কল্পনা করে এবং প্রবৃত্তি, ইচ্ছা, বাসনা প্রভৃতি মনুষ্যোচিত গুণ ঈশ্বরের সত্তায় আরোপ করে। তাছাড়া একাধিক ঈশ্বর বা দুই ঈশ্বরের কল্পনা করলে ঈশ্বর অসীম ও অনন্ত না হয়ে সসীম ও সান্ত সত্তায় পরিণত হবে, যার ফলে ঈশ্বরের ঈশ্বরত্বের হানি ঘটবে। এই মতবাদ অমঙ্গলকে মানুষের উপর ঈশ্বর প্রদত্ত শাস্তি রূপে গণ্য করে এবং প্রাকৃতিক বা নৈতিক অমঙ্গলকে ব্যক্তির অভিজ্ঞতার অনিবার্য অংশরূপে গণ্য করে না। বস্তুতঃ, এই জগতের অমঙ্গলের ব্যাখ্যার জন্য একাধিক বা দুই স্বতন্ত্র ঈশ্বরের কল্পনার কোন প্রয়োজন দেখা যায় না। এমন ধারণা করা যেতে পারে যে, একই ঈশ্বর কল্যাণ ও অকল্যাণ, ভাল ও মন্দের সৃষ্টি করেছেন যাতে মন্দ ও অকল্যাণের পাশে ভাল ও কল্যাণের মহিমা উজ্জ্বলভাবে প্রকাশিত হয়।

প্লেটোর ব্যাখ্যা

গ্রীক দার্শনিক প্লেটো (*Plato*) মনে করতেন যে, যে জড় উপাদান থেকে জগতের সৃষ্টি, তাই অমঙ্গলের কারণ। বিচারবুদ্ধির নীতি (The Principle of Reason) বা কল্যাণের ধারণা (Idea of the Good) জগতের স্রষ্টা নয়, কারিগর মাত্র, যার ক্রিয়া মূল জগত উপাদানের ব্যাহতার্থক প্রকৃতির দ্বারা সীমিত।

প্লোটাইনাস (*Plotinus*) প্লেটোকে অনুসরণ করে সুস্পষ্টভাবে এবং সুনির্দিষ্টভাবে অমঙ্গলকে জড়ের সঙ্গে যুক্ত করেন। তাঁর মতে জড়ই অমঙ্গলের মূল উৎস। মধ্যযুগের ধর্মতত্ত্ববিদ্‌গণ অমঙ্গলের জন্য মানুষের ইচ্ছাকেই দায়ী করেন। এঁদের লক্ষ্য ছিল জগতে পাপের অস্তিত্বের দায়ীত্ব থেকে ঈশ্বরকে অব্যাহতি দেওয়া। এই সব ধর্মতত্ত্ববিদগণ মনে করতেন যে, মানুষকে সৎ করেই সৃষ্টি করা হয়েছিল। কিন্তু মানুষকে ঈশ্বর প্রদত্ত ইচ্ছার স্বাধীনতাই, মানুষের স্বভাবের পরিবর্তনের জন্য দায়ী।

প্লোটাইনাসের ব্যাখ্যা

মধ্যযুগের ধর্মতত্ত্ববিদদের ব্যাখ্যা

এইসব মতবাদও জগতের অমঙ্গলের দায়ীত্ব থেকে ঈশ্বরকে মুক্ত করতে চায়। কিন্তু যে মতবাদ মানুষের ইচ্ছার স্বাধীনতার সঙ্গেই অমঙ্গলের বিষয়টিকে যুক্ত করতে চায়, ধর্মতত্ত্বের উপর তার প্রভাব থাকলেও, সব ধর্মতত্ত্ববিদ্ এই বিষয়টিকে স্বীকার করে নেননি।

সমালোচনা

আর এক ধরনের মতবাদ দেখতে পাওয়া যায়, যেগুলি অমঙ্গলের সমস্যার যথার্থ ব্যাখ্যা না দিয়ে, সমস্যাটিকে এড়িয়ে যেতে চায়। এইসব মতবাদ অনুসারে পরম দৃষ্টিভঙ্গি থেকে প্রাকৃতিক বা নৈতিক, উভয় প্রকারের অমঙ্গলের যথার্থ কোন অস্তিত্ব নেই। এদের মতে এই জগৎ শুভ ও কল্যাণকর। আবার কোন কোন মতবাদ অমঙ্গলের উৎপত্তির সমস্যাটিকে এড়িয়ে যাবার উদ্দেশ্যে অমঙ্গলকে এই বিশ্বের একটি মৌলিক উপাদান রূপে গণ্য করে এবং মনে করে মঙ্গল ও অমঙ্গল সমশ্রেণীভুক্ত।

সেণ্ট অগাস্টিন এই মতবাদের সমালোচনা করেন। তাঁর মতে অমঙ্গল হল মঙ্গলের ভুল পথে যাওয়া। তাঁর মতে এই বিশ্বজগৎ মঙ্গলজনক। অর্থাৎ কিনা, এক কল্যাণকর ঈশ্বর মঙ্গলজনক উদ্দেশ্য নিয়ে এই জগৎ সৃষ্টি করেছেন। জড় অমঙ্গলজনক —এই অভিমত তিনি ব্যক্ত করেছেন। অগাস্টিনের মতে উচ্চতর, নিম্নতর, অধিকতর, স্বল্পতর, প্রচুর এবং বিচিত্র ধরনের কল্যাণের অস্তিত্ব রয়েছে। যা কিছুর অস্তিত্ব আছে তা নিজের দিক থেকে এবং কোন বিশেষ মাত্রায় কল্যাণকর, যদি না তা নষ্ট বা বিকৃত না হয়। যদি এই বিশ্বজগতে অমঙ্গলজনক ইচ্ছা, কোন দুঃখ ব্যাথা বা প্রকৃতিতে কোন বিশৃঙ্খলা বা ধ্বংস লক্ষ্য করা যায়, তা ঈশ্বর সেখানে প্রতিষ্ঠিত করেননি। এগুলি হল যা আদতে মূল্যবান তার বিকৃতি। যা কিছু অস্তিত্বশীল তা তার স্থানমত কল্যাণকর; অকল্যাণ কল্যাণের পরগাছাজাতীয়। মৌলিকভাবে যা কল্যাণকর সৃষ্টি, অকল্যাণ তার মাঝে বিশৃঙ্খলা এবং বিকৃতি। কেউ কেউ মনে করেন যে, অগাস্টিনের মতে 'অস্তিত্বশীল সব বস্তুই

অগাস্টিনের ব্যাখ্যা

ভাল। অমঙ্গলের অস্তিত্ব নেই। অমঙ্গল অলীক ও নঞর্থক।' কিন্তু জন হিকের মতে অগাস্টিন অমঙ্গলকে অলীক মনে করেননি।

সর্বেশ্বরবাদীগণও (Pantheists) মনে করেন এই জগতের তথাকথিত অমঙ্গলগুলি মূলতঃ অবাস্তব। এদের কোন প্রকৃত সত্তা নেই। পারমার্থিক দৃষ্টিতে এইগুলি ভ্রম, ব্যবহারিক দৃষ্টিতেই এইগুলি বাস্তব বলে প্রতীয়মান হয়। স্পিনোজা (*Spinoza*)-র মতে অসীম দ্রব্য ঈশ্বরই একমাত্র সত্তা, ঈশ্বর ভাল মন্দের অতীত। মঙ্গল ও অমঙ্গল মনোগত বা বস্তুনিরপেক্ষ ধারণা, সেইহেতু পূর্ণ সত্তা ঈশ্বরের ক্ষেত্রে তাদের আরোপ করা চলে না। ঈশ্বরের মধ্যে অমঙ্গল ও অসংগতির কোন স্থান থাকতে পারে না। স্পিনোজার মতে ভাল ও মন্দের ধারণা ভ্রমাত্মক ধারণা। যেহেতু সব সান্ত বস্তু এক পরম দ্রব্য ঈশ্বরের প্রকাশ সেইহেতু বাস্তবে ভাল ও মন্দের কোন অস্তিত্ব নেই।

স্পিনোজার ব্যাখ্যা

বিভিন্ন বস্তুর পারস্পরিক তুলনা করতে গিয়ে ভাল ও মন্দ এই আপেক্ষিক ধারণার মাধ্যমে আমরা বস্তুটিকে প্রকাশ করি। কাজেই মন্দ হল আপেক্ষিক, অস্তিবাচক কিছু নয়। মন্দ হল নঞর্থক বা অভাবাত্মক কিছু, যা সান্ত মনের কাছে ভাবাত্মক বা অস্তিত্ববাচক বলে মনে হয়। যা ব্যক্তির পক্ষে উপকারী বা হিতকর তাই ভাল, যা ভালকে পাবার পথে বাধার সঞ্চার করে তাই মন্দ। দার্শনিক হেগেলের মতেও অমঙ্গলের যথার্থ সত্তা নেই। অমঙ্গল অবাস্তব। আংশিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে অমঙ্গলকে বাস্তব বলে মনে হয়, কিন্তু সমগ্রের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বিচার করলে অমঙ্গলের কোন যথার্থ সত্তা নেই। হেগেলের মতে যেহেতু সমগ্র বিশ্বজগৎ সংগঠনের দিক থেকে বৌদ্ধিক (rational) এবং যেহেতু অমঙ্গল হল অ-বৌদ্ধিক (irrational) সেইহেতু অমঙ্গল হল প্রাতিভাসিক (apparent), যথার্থ নয়। হেগেল বলেন যে, পাপ হল ইচ্ছার ব্যাপার। সীমিত দৃষ্টিভঙ্গি থেকে যা অমঙ্গল সেটা আসলে মঙ্গলই, যা প্রস্তুতির পথে (Good in the making)। অমঙ্গলের প্রতি ব্র্যাড্‌লি এবং বোসাংকোয়েট-এর দৃষ্টিভঙ্গিও হেগেলের অনুরূপ। তাঁদের মতে 'অমঙ্গল হল ভুল জায়গাতে মঙ্গলের অবস্থান' (evil is good in the wrong place)। দার্শনিক লাইবনিজ (*Leibnitz*)-এর অভিমত স্পিনোজা ও হেগেলের অমঙ্গল সম্পর্কীয় অভিমত থেকে ভিন্ন। লাইবনিজ অমঙ্গলের বাস্তব সত্তা অস্বীকার করেন না। তবে তিনিও মনে করেন অমঙ্গল পূর্ণতার অভাব। তাঁর মতে প্রাকৃতিক অমঙ্গল ও নৈতিক অমঙ্গল অতিপ্রাকৃত অমঙ্গলের (metaphysical evil) অন্তর্ভুক্ত। ঈশ্বরের থেকে

হেগেলের অভিমত

লাইবনিজের অভিমত

ক্ষুদ্র বা নিকৃষ্ট সব সসীম সত্তার সসীমত্ব থেকেই অমঙ্গলের উদ্ভব। এই অমঙ্গল সীমিত সত্তার সসীমত্ব থেকে উদ্ভূত দোষ ত্রুটি। ঈশ্বরের পক্ষেও কোন সীমিত বস্তুকে পূর্ণ বা সর্ব ত্রুটিমুক্ত করে তোলা সম্ভব নয়। ঈশ্বরকে এই অমঙ্গলের অস্তিত্ব অত্যাবশ্যক অস্তিত্বরূপে স্বীকার করে নিতে হয়। কাজেই যে অমঙ্গলকে আংশিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দেখলে অসংগতি মনে হয়, সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দেখলে সেটিই সমগ্রের সংগতি বিধান করে। কাজেই লাইবনিজের মতে এই জগৎ সব সম্ভাব্য জগতের মধ্যে উৎকৃষ্টতম (the best of all possible worlds), যদিও এর থেকে আরও নিখুঁত জগতের কথা কল্পনা করা যেতে পারে।

প্রায় সব ভারতীয় দর্শনই স্বীকার করে যে অবিদ্যা বা অজ্ঞতাহেতু জীবের দুঃখানুভূতি। তত্ত্বজ্ঞান বা যথার্থ জ্ঞানের দ্বারা অবিদ্যা দূরীভূত হলে জীব দুঃখ থেকে আত্যন্তিক নিবৃত্তি লাভ করে। তত্ত্বজ্ঞানীর কাছে দুঃখ কষ্ট ও অমঙ্গলের অস্তিত্ব সম্পূর্ণ অবাস্তব।

এইসব মতবাদ অমঙ্গলকে বাস্তব বা সদর্থক গণ্য না করে অবাস্তব বা নঞর্থক গণ্য করে। এঁদের মতে অমঙ্গল মঙ্গলের অভাব বা আংশিক দৃষ্টিভঙ্গির জন্যই অমঙ্গলের অস্তিত্ব। কাজেই অমঙ্গলের বাস্তব সত্তাকে অস্বীকার করার জন্য এই সব মতবাদ সন্তোষজনক নয়।

সমালোচনা

ইহুদী খ্রীষ্টান ধর্ম অমঙ্গলকে অলীক বলে গণ্য করে না। বাইবেলে মানুষের অভিজ্ঞতায় মঙ্গল অমঙ্গলের মিশ্রণের কথা বলা হয়েছে। বাইবেলে মানুষের প্রতিটি দুঃখ কষ্টের বিবরণের, মানুষের প্রতি মানুষের প্রতিটি অমাঙ্গলিক আচরণ এবং এই জগতে তার দুঃখজনক নিরাপত্তাবিহীন অস্তিত্বের উল্লেখ লক্ষ্য করা যায়। অমঙ্গলকে বাইবেলে অন্ধকারময়, ভীতিজনকভাবে কুৎসিত, হৃদয়বিদারক এবং সর্বনাশকারী হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে। খ্রীষ্টান ধর্মগ্রন্থে এই অমঙ্গলের চরমরূপের কথা উল্লেখ করতে গিয়ে যীশুর ক্রুশবিদ্ধ হওয়ার কথা বলা হয়েছে। কাজেই খ্রীষ্টান ধর্মে অকল্যাণ নিঃসন্দেহে অকল্যাণ। এর বাস্তব অস্তিত্বকে অস্বীকার করা চলে না।

লোট্জা (*Lotze*)-র বক্তব্য এই প্রসঙ্গে প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন, অন্ধকার যেমন আলোকের অভাব, অমঙ্গল তেমনি মঙ্গলের অভাব নয়। একথা সত্য যে মনোমত কিছু পেতে গেলে, অস্বস্তি, উদ্বেগ বা দুঃখ কষ্ট পেতে হয় এবং পরে সমগ্র প্রক্রিয়াটি পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, সেই দুঃখ দুঃখই নয়। অনেক দুঃখই পরে বিচার করলে আশীর্বাদ মনে হয়, কিন্তু তা বলে অমঙ্গলের অস্তিত্ব অস্বীকার করা চলে না, বা অমঙ্গলের সমস্যাকে লঘু গণ্য করা চলে না। যে ব্যক্তি চরম দুঃখভোগ করছে, তাকে যদি বলা হয় যে তার দুঃখ অবাস্তব, অলীক বা তার সান্তত্ব থেকে উদ্ভূত

কোন ত্রুটি, তাহলে দুঃখীর কাছে এই বক্তব্য কোন সান্ত্বনা বহন করে আনতে পারে না। যে ব্যক্তির দুঃখের অভিজ্ঞতা হয়, দুঃখ তার কাছে এক নিদারুণ বাস্তবতা, এবং উচ্চতর দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দেখলে দুঃখের বা অমঙ্গলের কোন অস্তিত্ব নেই বলা, বাস্তব ঘটনাকে অগ্রাহ্য করার সামিল। বিশেষ করে নৈতিক অমঙ্গল বা পাপের প্রসঙ্গে এই সমস্যা আরও গুরুতরভাবে দেখা দেয়। নৈতিক অমঙ্গল বস্তুর পরিকল্পনায় একটি মৌলিক ত্রুটি; কোন উচ্চতর দৃষ্টিভঙ্গিই তাকে মঙ্গলে রূপান্তরিত করতে পারে না বা তাকে অমঙ্গলজনক বলে আখ্যাত করতে পারে না। পাপকে কোন উচ্চতর লক্ষ্য সাধনের পথে প্রক্রিয়ামাত্র গণ্য করে তার বাস্তব অস্তিত্বকে অগ্রাহ্য করা যায় না। পাপকে পাপ ছাড়া অন্য কিছুতে পরিণত বা রূপান্তরিত করা চলে না। কোন মন্দ কার্যকে ভবিষ্যৎ প্রয়োজন সাধক মনে করে ভাল বলে আখ্যাত করলেও, কর্মকর্তার মন্দ ইচ্ছাকে ভাল বলা চলে না। অপরাধের অভিজ্ঞতা, অনুতাপের অভিজ্ঞতা হল অভিনব অভিজ্ঞতা। সেইগুলি স্পষ্টই প্রমাণ করে যে পাপ পাপই, পাপ ছাড়া অন্য কিছু নয়।

দার্শনিক লোট্জা হেগেলপন্থী হলেও ঈশ্বরের সঙ্গে অমঙ্গলের সম্বন্ধের ব্যাপারে একটি স্বাধীন ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তিনি বিশ্বজগতে মঙ্গল এবং অমঙ্গল উভয়ের বাস্তব অস্তিত্ব স্বীকার করে নিয়েছেন। তিনি অমঙ্গলকে অবাস্তব গণ্য করেননি, বা তাকে অমঙ্গলের ছদ্মবেশে মঙ্গল বলেও আখ্যাত করেননি। কিন্তু তিনি মনে করেন যে অমঙ্গলের স্বরূপ বিচার করার প্রচেষ্টা হল ঈশ্বরের মনের বিচার করা। মানুষের মন শুধু জানতে পারে যে এই জগৎ ঈশ্বরের কল্পনা থেকেই উদ্ভূত। ঈশ্বরের কর্মধারা মানুষের বিচারবুদ্ধির পক্ষে দুর্জ্ঞেয়। কাজেই এই জগতে অমঙ্গলের অস্তিত্বকে অস্বীকার করা না গেলেও তাকে ঈশ্বরের জ্ঞান, সততা এবং শক্তির পক্ষে হানিকর বলে ব্যাখ্যা করা যুক্তিসঙ্গত নয়। অমঙ্গলকে ঈশ্বরের সৃজনমূলক কল্পনারই প্রকাশ বলে গণ্য করা যুক্তিযুক্ত।

লোট্জার অভিমত

লোট্জার অভিমতের সমালোচনায় বলা যেতে পারে তিনি ঈশ্বরের সঙ্গে অমঙ্গলের সম্বন্ধের কোন সন্তোষজনক ব্যাখ্যা দেবার চেষ্টা করেননি এবং অমঙ্গলের সমস্যাটিকে মানুষের বিচারবুদ্ধির পক্ষে একটি দুর্বোধ্য সমস্যা বলে অভিহিত করেছেন।

সমালোচনা

উপরিউক্ত মতবাদগুলি আলোচনা করার পর আমরা এই সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে, জগতে অমঙ্গলকে বাস্তব বলে গণ্য করে, এবং এই জগতে অমঙ্গলের স্থান, ক্রিয়া এবং গুরুত্ব নির্ণয় করেই আমরা অমঙ্গলের প্রকৃতি ও কার্য বুঝে নিতে পারি বা ঈশ্বরের সঙ্গে তার সম্বন্ধ নিরূপণ করতে পারি।

মন্তব্য

ঈশ্বর পরম হিতৈষী হলেও ঈশ্বরের পক্ষে অমঙ্গল সৃষ্টি করার একান্ত প্রয়োজনীয়তা আছে এবং জগতের পক্ষেও এর অস্তিত্বের অনিবার্যতা বর্তমান, এই অভিমতের স্বপক্ষে ঈশ্বরবাদীরা নানা ধরনের যুক্তি দিয়েছেন।

ঈশ্বরবাদীদের যুক্তি

প্রথমতঃ, মঙ্গলের গৌরব ও মাধুর্যের বৃদ্ধির জন্য তার পাশে অমঙ্গলের অস্তিত্বের প্রয়োজনীয়তা আছে। চিত্রে ছায়া (shade) এবং সংগীতে অসংগতির (discord) যে কাজ, অমঙ্গলের কাজও তাই। কাজেই অমঙ্গল পূর্ণতার হ্রাস না ঘটিয়ে তার বৈপরীত্যের দ্বারা তার বৃদ্ধি ঘটায়।

অমঙ্গল মঙ্গলের গৌরব বৃদ্ধি করে

দ্বিতীয়তঃ, অনেক অমঙ্গল আছে যাকে মঙ্গল থেকে বিচ্ছেদ করা চলে না। যেমন—অন্ধকার ছাড়া আলোক, দুঃখ ছাড়া আনন্দ অর্থহীন ধারণা মাত্র। তেমনি অমঙ্গল ছাড়া মঙ্গল, অসততা ছাড়া সততার ধারণা করা যায় না।

তৃতীয়তঃ, রোগ, শোক, দুঃখ, বেদনা প্রভৃতি প্রাকৃতিক মঙ্গলের উদ্দেশ্য মানুষের সংশোধন করা ও মানুষের শিক্ষাবিধান করা। এই প্রকার অমঙ্গল ঐশ্বরিক উদ্দেশ্য সাধন করে। ঈশ্বরবাদী মার্টিন্যু-র মতে প্রাকৃতিক অমঙ্গল, যেমন—দুঃখ-কষ্ট অর্থহীন নয়। এইগুলির শিক্ষামূলক উপযোগিতা আছে এবং এইগুলি শৃঙ্খলা ও সামঞ্জস্য প্রতিষ্ঠা করার ব্যাপারে সহায়ক। সোনাকে যতই পোড়ান যায় ততই সোনা বিশুদ্ধ হয়। দুঃখ কষ্ট মানুষকে তার ত্রুটি বিচ্যুতি দূর করে তাকে ধীর ও সাহসী হতে শিক্ষা দেয়। দুঃখ-কষ্ট, বাধা-বিপত্তি চরিত্র গঠন ও আধ্যাত্মিক আদর্শলাভের পক্ষে সহায়ক। স্বেচ্ছায় নৈতিক নিয়ম লঙ্ঘন করার জন্য ব্যক্তিকে ঈশ্বরের বিধান অনুযায়ী শাস্তি ভোগ করতে হয়। সুতরাং ঈশ্বর অহিতৈষী নন, বা তার শক্তিও সীমিত নয়। তিনি সর্বশক্তিমান ও হিতৈষী, জগতের স্রষ্টা ও নৈতিক শাসক।

অমঙ্গল মানুষকে সংশোধন করে

চতুর্থতঃ, যা আপাতদৃষ্টিতে অমঙ্গলজনক, তা পরিণতিতে শুভ ও মঙ্গলজনক। কাজেই মানুষ তার সীমিত দৃষ্টি এবং অপরিপূর্ণ বোধের জন্য বস্তুর যথাযথ স্বরূপ সকল সময় বুঝে উঠতে পারে না।

পঞ্চমতঃ, এই জগতে নিরবচ্ছিন্ন সুখ-শান্তির প্রত্যাশাও জাগতিক অমঙ্গলকে আমাদের কাছে জটিল ও বিভ্রান্তিকর করে তোলে।

মানুষের দুঃখের একটা বিরাট অংশের উৎস হিসেবে যদিও মানুষের স্বাধীনতার অপব্যবহারকে দায়ী করা যায়, মানুষের দুঃখের অন্যান্য উৎসও রয়েছে,যেগুলি মানুষের স্বাধীন ইচ্ছা-নিরপেক্ষ। উদাহরণ স্বরূপ ভূমিকম্প, ঝড়, ঘূর্ণিবাত্যা, বন্যা, অনাবৃষ্টি, রোগ ইত্যাদির উল্লেখ করা যেতে পারে। বাস্তবে মানুষের ইচ্ছা-স্বাধীনতার অপব্যবহারে উদ্ভূত দুঃখ এবং ইচ্ছা-স্বাধীনতা নিরপেক্ষ প্রাকৃতিক দুঃখের মধ্যে সীমারেখা টানা

কঠিন হয়ে পড়ে, কেননা মানুষের অভিজ্ঞতায় এই দুইয়ের একত্র মিশ্রণ অনেক ক্ষেত্রে লক্ষ্য করা যায়, যে দু'প্রকার দুঃখকে পরস্পরের থেকে বিছিন্ন করা অনেক ক্ষেত্রে সম্ভব হয় না। দ্বিতীয় ধরণের যে দুঃখের কথা উপরে বলা হয়েছে তার অস্তিত্বকে অস্বীকার করা যায় না এবং মনে হয় বিশ্ব জগতের সংগঠনের মধ্যেই এই দুঃখ নিহিত। কাজেই যেহেতু জগতে এই দুঃখ, কষ্ট, বিপদ, আপদকে অস্বীকার করা যায় না, সেইহেতু সিদ্ধান্ত করতে হয় যে, এই জগৎ কোন পরম মহানুভব এবং সর্বশক্তিমান ঈশ্বর কর্তৃক সৃষ্ট হতে পারে না। আমরা ঈশ্বরের সততায় ও ক্ষমতায় সংশয় করি। আমরা ধারণা করি যে জগতকে পরিপূর্ণ সুখে-শান্তিতে রাখা পূর্ণ ঈশ্বরের ক্ষমতার বাইরে। কিন্তু জীবনে সুখবাদের আদর্শে অতিরিক্ত বিশ্বাসই আমাদের মনে এই সংশয় ও বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে। তাই আমরা মনে করি ঈশ্বর-সৃষ্ট জগতে নিরবচ্ছিন্ন সুখ বর্তমান থাকবে।

নিরবচ্ছিন্ন সুখশান্তির প্রত্যাশা অমঙ্গলকে বিভ্রান্তিকর করে তোলে

কিন্তু এই জাতীয় সিদ্ধান্ত করার অর্থ হল এই যে, জগৎ সৃষ্টির পিছনে ঈশ্বরের যে উদ্দেশ্য রয়েছে তা হল এই জগতকে একটি স্বর্গে পরিণত করা যেখানে মঙ্গল ছাড়া কোন অমঙ্গল থাকবে না। কিন্তু তাহলেও অসুবিধা দেখা দেবে। যদি এই জগৎ হয় সুখের আলয়, যদি এই জগতে কোন দুঃখ কষ্টের স্থান না থাকে তা হলে এর পরিণতি কতদূর গড়ায় দেখা যাক। এই ধরনের জগতে কেউ কাউকে কোন আঘাত করবে না। কেননা আঘাত করা হল অকল্যাণজনক কর্ম। প্রতারণা, ষড়যন্ত্র, চক্রান্ত, চুরি ডাকাতি এমন জগতে ঘটবে না বা ঘটলেও সমাজ তার দ্বারা ক্ষতিগ্রস্থ হবে না। কেউ কোন দুর্ঘটনায় আঘাত পাবে না। ক্রীড়ারত শিশু কোন উঁচু জায়গা থেকে মাটিতে পড়ে গেলেও কোন আঘাত পাবে না। কোন কাজ করার প্রয়োজন হবে না। কেননা কাজ না করলে কোন ক্ষতির সম্ভাবনা নেই। যেহেতু ক্ষতি হল অকল্যাণ, অপরের বিপদে পাশে দাড়াবার প্রয়োজন দেখা দেবে না। কারণ এই ধরনের জগতে কোন বিপদের অস্তিত্ব থাকার প্রশ্ন ওঠে না।

জগতে দুঃখের অস্তিত্বকে অস্বীকারের পরিণতি

বেশ বোঝা যাচ্ছে যে, সাধারণ জাগতিক নিয়মে এমন জগৎ চলতে পারে না, জগতের বিশেষ ধরনের দূরদর্শিতার প্রয়োজন হবে। জগতের নিয়মগুলি হবে প্রয়োজনে পরিবর্তনশীল, জগতে কখনও মাধ্যাকর্ষণ নিয়ম ক্রিয়া করবে, কখনও করবে না। এই জগতে বিজ্ঞান বলতে কিছু থাকবে না। কারণ কোন স্থায়ী জগৎ সংগঠন থাকবে না যে তার প্রকৃতি অনুসন্ধান করতে হবে। জাগতিক পরিবেশে কোন দুঃখ, কষ্ট না থাকাতে জীবন হবে একটা স্বপ্ন।

এই রকম একটা জগতের কথা কল্পনা করা যেতে পারে। এটা স্পষ্ট যে এই ধরনের জগতে আমাদের বর্তমান নৈতিক ধারণাগুলি হবে অর্থহীন। কেননা এই জগতে কোন মন্দ কার্য থাকবে না এবং মন্দের সঙ্গে পৃথক করার জন্য কোন ভাল বা যথোচিত কাজেরও অস্তিত্ব থাকবে না। মানুষের চরিত্রের যে সব সংগুণের কথা আমরা বলে থাকি, সাহস, ধৈর্য, এইগুলির কোন অস্তিত্ব থাকবে না ; কেননা এই জগতে কোন বিপদ বা অসুবিধার অস্তিত্ব থাকবে না। মহানুভবতা, দয়া, স্বার্থহীন ভালবাসা, অস্বার্থপরতা এবং অন্যান্য নৈতিক সংগুণগুলি এইরকম জগতে জন্ম নেবে না। কাজেই এইরকম জগৎ সুখের আলয় হলেও, মানুষের ব্যক্তিত্বের নৈতিক গুণগুলির বিকাশের পক্ষে মোটেও উপযুক্ত হবে না। কাজেই মানুষের ব্যক্তিত্ব গঠনের দিক থেকে বিচার করলে এই জগৎ সব সম্ভাব্য জগতের মধ্যে নিকৃষ্ট জগৎ বলে ধারণা করতে হয়। কাজেই স্বাধীন ইচ্ছাসম্পন্ন মানুষের মধ্যে যদি চরিত্রের সংগুণগুলির জন্ম হোক, এটাই যদি অভিপ্রেত হয়, তাহলে যে পরিবেশের প্রয়োজন, সেটির সঙ্গে আমাদের বর্তমান জগতের পরিবেশের অনেকখানি সাদৃশ্য থাকা দরকার। সেই পরিবেশ সাধারণ এবং নির্ভরযোগ্য নিয়মের দ্বারা চালিত হবে এবং আমাদের এই জগতে যেমন দেখি, তেমনি ঐ পরিবেশেও থাকবে প্রকৃত বিপদ আপদ, অসুবিধা, সমস্যা, বাধা, দুঃখ, ব্যর্থতা, কষ্ট, হতাশা এবং পরাজয়ের সম্ভাবনা।

অকল্যাণ বর্জিত জগতে নৈতিক সংগুণ জন্ম নেবে না

নৈতিক সংগুণের উদ্ভবের জন্য বর্তমান জগতের পরিবেশই উপযুক্ত

আমাদের এই জগতের দিকে তাকালে বোঝা যায় যে, এই জগত হল এমন একটা জায়গা যেখানে প্রকৃত মানুষ তৈরি হবে, যেখানে স্বাধীন ইচ্ছাসম্পন্ন ব্যক্তিরা একটি সাধারণ পরিবেশে দুঃখ বিপদ আপদের সঙ্গে মোকাবিলা করে ঈশ্বরের সন্তান হবে এবং অনন্ত জীবনের উত্তরাধিকারী হবে। কাজেই দুঃখ, হতাশা, নৈরাশ্যে ভরা এই জগৎ হল এমন একটা পরিবেশ যেখানে অনন্ত সুখ, দুঃখের কোন অস্তিত্ব থাকবে না, এমনভাবে এটি পরিকল্পিত হয়নি। বরং মানুষকে যেখানে প্রকৃত মানুষ হয়ে গড়ে উঠতে হবে বা যেখানে জন হিকের ভাষায়, আত্মা তৈরি হবে (soul making), এমন উদ্দেশ্যের সঙ্গে সংগতি রক্ষা করেই জগৎ গঠিত হয়েছে। কাজেই জগতে অমঙ্গলের অস্তিত্ব এক কল্যাণময় সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাসের ব্যাপারে বাধা হয়ে দাঁড়ায় না। কাজেই সুখবাদের আদর্শের ভিত্তিতে বিচার করলেও সান্ত মানুষ দুঃখ বেদনার পটভূমিতেই গভীরতর আনন্দের অনুভূতি লাভ করতে পারে।

এই জগতই মানুষ-আত্মা গঠনের উপযুক্ত স্থান

ষষ্ঠতঃ, এই জগৎ ব্যক্তির চরিত্র গঠনের ও বিকাশের একটি উপযুক্ত মাধ্যম। দুঃখ জয় ও বাধা বিপত্তি অতিক্রম করার প্রশ্ন না থাকলে ধৈর্য, সহানুভূতি, সাহস, কুশলতা, বিজ্ঞতা, আত্মোৎসর্গ প্রভৃতি বহু সৎ গুণ জগতের বুক থেকে মুছে যেত। প্রাকৃতিক পরিবেশ মানুষের জীবনে যে দুঃখ আনে, যে পরাজয়ের গ্লানি তার জীবনে এনে দেয়, সেইগুলি ব্যক্তির চরিত্র গঠনের জন্য অনিবার্যভাবে প্রয়োজন।

অমঙ্গল না থাকলে মঙ্গলের অস্তিত্ব থাকত না

সপ্তমতঃ, মানুষের ইচ্ছার স্বাধীনতাকে স্বীকার করে নিলে পাপের সম্ভাবনাকে তার যৌক্তিক পরিণামরূপে স্বীকার করে নিতেই হয়। পাপের সম্ভাবনা না থাকলে সততার সম্ভাবনা থাকে না। সৎ জীবনের পূর্ববর্তী অবস্থারূপে নৈতিক অমঙ্গলকে স্বীকার করে নিতেই হবে। ইচ্ছার স্বাধীনতা না থাকলে সততার অস্তিত্ব থাকে না। আবার ইচ্ছার স্বাধীনতা থাকলে মানুষ মাঝে মাঝে অসদাচারে লিপ্ত হবেই। কাজেই নৈতিক অমঙ্গল বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন জীবের স্বাধীন ইচ্ছার ফলস্বরূপ। এই অমঙ্গল ঈশ্বরের অনুমত হলেও তার ঈপ্সিত নয়। ঈশ্বর মানুষকে ইচ্ছার স্বাধীনতা দিয়েছেন, কিন্তু মানুষ যদি তার সদ্ব্যবহার না করে তার অপব্যবহার করে, তার জন্য ঈশ্বরকে দায়ী করা চলে না। কাজেই পাপ হল মানুষের স্বাধীনতার স্বেচ্ছাচারিতা। এই প্রসঙ্গে মনে রাখা দরকার, মানুষকে ইচ্ছার স্বাধীনতা দিয়ে ঈশ্বর নিজের স্বাধীনতাকে কিছুটা সীমিত করছেন। কিন্তু এটি ঈশ্বরের স্বেচ্ছায় নিজের ইচ্ছার সীমিতকরণ, ঈশ্বরের আত্মবিনাশ (self-annihilation) নয়, বা মানুষের জীবনের পরিসর থেকে ঈশ্বরের আত্মনির্বাসনও নয়। ঈশ্বরই দুঃখের ঘাত প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে মানুষকে জীবনের পথে চালিত করেন।

অমঙ্গল বা পাপ—ইচ্ছার স্বাধীনতার যৌক্তিক পরিণাম

পাপ হল মানুষের স্বাধীনতার স্বেচ্ছাচারিতা

ঈশ্বর কি এমন মানুষ সৃষ্টি করতে পারতেন না, যার স্বাধীন ইচ্ছা থাকবে, অথচ যে কখনও অন্যায় করবে না।

ব্যক্তি বলতে বোঝায় যার ইচ্ছার স্বাধীনতা আছে, যে আপেক্ষিক ভাবে স্বাধীন এবং নিজেকে নিজে চালিত করতে পারে এবং নিজের সিদ্ধান্তের দায়ীত্ব গ্রহণ করে। ইচ্ছা-স্বাধীনতা থাকার অর্থ ই হল ন্যায়ভাবে বা অন্যায় ভাবে কার্য করা। ব্যক্তিকে সকল সময়ই সঠিক ভাবে কাজ করতে হবে—এইরূপ ধারণা আত্মবিরোধিতা দোষে দুষ্ট। পূর্ব থেকে এমন কোন নিশ্চয়তা দেওয়া যেতে পারে না যে, যে ব্যক্তি যথার্থভাবে

স্বাধীন নৈতিক কর্মকর্তা, সে কখনও অন্যায় কিছুকে নির্বাচন করবে না। কাজে কাজেই, অন্যায় বা পাপ সম্পাদনের সম্ভাবনাকে ঈশ্বরের সাম্ভ মানুষ-সৃষ্টির বিষয়টি থেকে যৌক্তিক ভাবে বিচ্ছিন্ন করা যায় না এবং যদি একথা বলা হয় যে, ঈশ্বরের এমন মানুষ সৃষ্টি করা উচিত ছিল যে কখনও পাপ কাজ করবে না, তাহলে এই জাতীয় কথা বলার অর্থ হবে, ঈশ্বরের মানুষ সৃষ্টি করা উচিত হয়নি।

মানুষের সান্তত্বই তার অন্যায় আচরণের উৎস

কেউ কেউ এমন অভিমত প্রকাশ করেছেন যে, ঈশ্বর এমন মানুষ সৃষ্টি করতে পারতেন যে প্রকৃত পক্ষে স্বাধীন, কিন্তু যে সব সময় ন্যায়ভাবে কাজ করবে—এই ধরনের উক্তি বিরোধিতা দোষে দুষ্ট নয়। এর উত্তরে বলা হয়েছে যে, মানুষের প্রকৃত স্বাধীনতাকে স্বীকার করে নেওয়া হবে অর্থাৎ ঈশ্বরের সঙ্গে সম্পর্কের ব্যাপারে মানুষ প্রকৃত স্বাধীন—এটা মেনে নেওয়া হবে অথচ ঈশ্বর এমনভাবে মানুষকে সৃষ্টি করবেন যে মানুষ অনিবার্যভাবে এক নির্দিষ্ট উপায়ে অর্থাৎ সৎভাবে কাজ করবে, এই অভিমত বিরোধিতা দোষে দুষ্ট। আমাদের সব চিন্তা এবং ক্রিয়া যদি ঈশ্বর কর্তৃক পূর্ব থেকে নিয়ন্ত্রিত হয়, আমরা যতই স্বাধীন এবং নৈতিক দিক থেকে নিজেদের দায়িত্বশীল মনে করি না কেন, ঈশ্বরের দৃষ্টিতে আমরা স্বাধীন এবং নৈতিক দিক থেকে দায়িত্বশীল হতে পারি না। আমরা হব ঈশ্বরের হাতে অসহায় পুতুল।

মানুষের ইচ্ছার স্বাধীনতা স্বীকার করে নিলে মানুষ সব সময় সৎ আচরণ করবে এটা স্বীকার করা চলে না

এই প্রসঙ্গে আর একটি অভিযোগ উপস্থাপিত হয়। অভিযোগটি হল : যদি এমন কথা বলা হয় যে, ঈশ্বর এমন মানুষ সৃষ্টি করতে অসমর্থ, যে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা উদ্ভূত অসুবিধা থেকে মুক্ত নয়, তাহলে কি ঈশ্বরের সর্বশক্তিমত্তাকে অস্বীকার করা হয় না? এর উত্তরে বলা হয়, এইরূপ মানুষ সৃষ্টি করা যুক্তিযুক্তভাবে অসম্ভব ব্যাপার। অর্থাৎ যৌক্তিক দিক থেকে অসম্ভব। ঈশ্বর তা সম্পাদন করতে পারে না। এটি ঈশ্বরের শক্তির ক্ষেত্রে সীমা আরোপ করা নয়। ঈশ্বরকে মানুষ সৃষ্ট করতে হবে, অথচ তারা মানুষ হবে না—এই ধরনের বক্তব্য বিরোধিতা দোষে দুষ্ট। ঈশ্বর যে কোন ধরনের মানুষ সৃষ্টি করতে পারেন। কিন্তু যে জীবের মধ্যে নৈতিক স্বাধীনতা নেই, তারা মানুষের থেকে অন্যান্য বিষয়ে যত শ্রেষ্ঠ জীবই হোক না কেন, তাদের মানুষ বলতে যা বোঝায়, সেই মানুষ নামে অভিহিত করা চলবে না, একমাত্র মানুষই ঈশ্বরের সন্তান হতে পারে, যে মানুষ স্রষ্টার সঙ্গে ব্যক্তিগত সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা

যে মানুষ অন্যায় করবে না এমন মানুষ সৃষ্টি করা যুক্তিযুক্তভাবে অসম্ভব

করতে পারে এবং ঈশ্বরের ভালবাসার প্রতি স্বাধীনভাবে, কারও দ্বারা বাধ্য না হয়ে প্রতিক্রিয়া করতে পারে।

মঙ্গলকে স্বীকার করে নিলেই পাপের তাৎপর্য বোঝা যায়

অষ্টমতঃ, ঈশ্বর হিতৈষী ও জগতের নৈতিক শাসনকর্তা—এই সুদৃঢ় বিশ্বাস থেকেই পাপের ধারণার উদ্ভব। কাজেই মঙ্গলকে স্বীকার করে নেওয়ার জন্যই পাপের তাৎপর্য আমাদের কাছে পরিস্ফুট। সুতরাং মঙ্গল বা কল্যাণকে লাভ করতে হলে অমঙ্গলের অনিবার্য অস্তিত্ব স্বীকার করে নিতে হয়।

মানুষের পূর্ণতালাভের জন্য অমঙ্গলের প্রয়োজনীয়তা আছে

নবমতঃ, রয়েস (*Royce*)-এর মতে ব্যক্তির পার্থিব সত্তা তাকে পূর্ণ পরিতৃপ্তি দান করে না। এই অপূর্ণতা-প্রসূত অতৃপ্তি তাকে ভবিষ্যতে পূর্ণতা লাভের জন্য প্রণোদিত করে। ব্যক্তি উপলব্ধি করে যে, বাধা বিপত্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেই সে পূর্ণতা লাভ করতে পারে। কাজেই ঈশ্বরের অনন্ত পূর্ণতার মধ্যেও জাগতিক দুঃখের প্রয়োজনীয়তা নিহিত আছে। ঈশ্বরের সর্বশক্তিমত্তা ও হিতৈষার সঙ্গে জীবের দুঃখ কষ্ট ও বাধা বিপত্তির কোন অসংগতি নেই।

যাঁরা দুঃখ কষ্ট ভোগ করেছেন তাঁরাই ঈশ্বরের সত্তায় বিশ্বাসী

দশমতঃ, বাস্তব জীবনে দেখা যায় যে, দুঃখ কষ্টে যাঁরা সবচেয়ে বেশী ভুগেছেন তাঁরাই ঈশ্বরের সততায় সবচেয়ে বেশী বিশ্বাসী।

সুতরাং উপরিউক্ত যুক্তির ভিত্তিতে ঈশ্বরবাদীরা এই সিদ্ধান্ত করেন যে, একই ঈশ্বর ভাল ও মন্দ, মঙ্গল ও অমঙ্গলের স্রষ্টা। ঈশ্বর উভয়েরই সাধারণ ভিত্তি। এই জগতে অমঙ্গল অর্থহীন বা অবাস্তব কিছু নয়। অমঙ্গলের বাস্তব অস্তিত্ব আছে এবং এই জগতে অমঙ্গলের অস্তিত্বেরও সার্থকতা আছে। অমঙ্গলের মধ্য দিয়েই মানুষের নৈতিক শিক্ষা সম্ভব হয়, চরিত্র গঠিত হয় এবং এই বিশ্বজগতে ঈশ্বরের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়। সর্বশক্তিমান ঈশ্বর এমনভাবে জগৎ গঠন করতে পারতেন যে মানুষের পাপ করার কোন সুযোগ থাকত না, অথচ সে মঙ্গলকে লাভ করতে পারত। ঈশ্বরবাদীরা বলেন যে, যাঁরা এই ধরনের যুক্তি দেন তাঁরা মঙ্গলের প্রকৃতি সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণা করে থাকেন। যে মঙ্গলকে মানুষ লাভ করে সেই মঙ্গল হল পাপের উপর জয়লাভ (a triumph over sin)। এক্ষেত্রে

সিদ্ধান্ত

পছন্দ বা মনোনয়নের একটি ব্যাপার আছে এবং এই মনোনয়নের সম্ভাবনা ছাড়া, এই মঙ্গলের কোন সম্ভাবনা থাকত না। কোন সর্বশক্তিমান ঈশ্বর এমনভাবে জগতকে গঠন করতে পারতেন না যে মানুষ শুধু মঙ্গলকে লাভ করবে এবং অমঙ্গলকে লাভ করার কোন সম্ভাবনা থাকবে না। এ হল পরীক্ষায়

সাফল্যের কথা বলা যে পরীক্ষায় অকৃতকার্যতার কোন সম্ভাবনা নেই। এই সাফল্য কোন সাফল্যই নয় এবং পরীক্ষার যত মূল্যই থাকুক না কেন, অকৃতকার্যতার সম্ভাবনা না থাকলে সাফল্যের কোন মূল্য থাকে না। ঈশ্বরবাদীরা যখন জীবের মঙ্গলের কথা বলেন তখন তাঁরা মনে করেন জীবের মঙ্গল লাভের সম্ভাবনার সঙ্গে তার পাপ করার সম্ভাবনা সংশ্লিষ্ট রয়েছে।[1] ম্যাগগ্রেগর বলেন, "ঈশ্বরবাদীরা এমন মঙ্গলের কথা কিছুই জানেন না যাকে কোন না কোন ভাবে না পেয়েও ভোগ করা যেতে পারে।" অমঙ্গলের অস্তিত্ব ঈশ্বরের স্বাধীনতা, সর্বশক্তিমত্তা ও সত্যতার হানি করে না। বস্তুতঃ, এই বিশ্বজগতে অমঙ্গলের অস্তিত্ব ঈশ্বরের সর্বশক্তিমত্তা, পূর্ণতা, সততার সঙ্গে অসংগতি-পূর্ণ নয়।

২। দুঃখবাদ (Pessimism) :

দুঃখবাদ অনুসারে এই জগত মূলতঃ মন্দ ও অশুভ, অমঙ্গলে ভরা এবং নিরবচ্ছিন্ন দুঃখে পূর্ণ। এই জগতে ও জীবনে কোন সুখ ও আনন্দ নেই। দুঃখবাদ এই জগতের প্রতি এক বিশেষ ধরনের দৃষ্টিভঙ্গির সূচনা করে। মাইল এড-ওয়ার্ডস (*Miall Edwurds*)-এর ভাষায় দুঃখবাদ এই জগতের প্রতি একটি আবেগগত মনোভাব বা মানসিক অবস্থার (an emotional attitude in mind) পরিচায়ক, যা ধর্মের স্বীকার্য সত্যগুলিকে স্বীকার করে নেওয়ার পথে নানারকম বাধার সৃষ্টি করে। ঈশ্বরবাদ মনে করে ঈশ্বর পরম হিতৈষী, তাঁর সৃষ্ট জগতও সুন্দর ও কল্যাণময়। দুঃখবাদ ধর্মের এই স্বীকার্য সত্যগুলিকে মেনে নিতে নারাজ। দুঃখবাদ অনুসারে এই জগৎ দুঃখ, জ্বালা যন্ত্রণায় পূর্ণ; আপাতদৃষ্টিতে যা সুখ বলে প্রতীয়মান হয় তাও দুঃখে পূর্ণ।

এই জগৎ মূলতঃ মন্দ ও অশুভ

যা কিছু অলৌকিক বা অতি প্রাকৃতিক (super natural), যা কিছু আধ্যাত্মিক বা অভিজ্ঞতা-উর্ধ্ব; প্রকৃতিবাদ (Naturalism) তার বিরোধী। প্রকৃতিবাদীর কাছে জগৎ ভালও নয়, মন্দও নয়। জগৎ-ভাল মন্দ নিরপেক্ষ। এইজগৎ মানবিক মূল্যের প্রতি উদাসীন (indifferent to human values)। কিন্তু দুঃখবাদ এই জগতকে মূলতঃ এবং সুনিশ্চিতভাবে অনিষ্টকর বলে আখ্যাত করে। দুঃখবাদ অনুসারে এই জগতে মন্দ, অকল্যাণ বা অমঙ্গলের প্রাধান্য এত বেশী এবং এই জগতে এত বেশী দুঃখ, জ্বালা, যন্ত্রণা, নৈরাশ্য, নিষ্ঠুরতা ও অন্যায়ের

প্রকৃতিবাদীর দৃষ্টিতে অমঙ্গল

---

1. "Theism knows nothing of a goodness that could be enjoyed without its being in some way or other achieved."

—MacGregor : Introduction to Religious Philosophy ; Page 275

অস্তিত্ব যে, এই জগতের কোন উদ্দেশ্য আছে স্বীকার করে নেওয়া হলেও এই উদ্দেশ্য মঙ্গলকারক নয়, অমঙ্গলকারক। জগতের প্রতি এই জাতীয় দৃষ্টিভঙ্গিকেই দুঃখবাদ নামে অভিহিত করা হয়। বস্তুতঃ দুঃখবাদী দৃষ্টিভঙ্গি সোপেনহাওয়ার (*Schopenhauer*) এবং তাঁর অনুগামী ভন্ হার্টম্যানের (*Von Hartman*) বা বৌদ্ধ দর্শনের ক্ষেত্রে, শুধুমাত্র দৃষ্টিভঙ্গির সূচনা না করে, একটা সুস্পষ্ট দর্শনের রূপ গ্রহণ করেছে। সোপেনহাওয়ারের কাছে জীবন যে বাস্তবিকই অমঙ্গলজনক শুধুমাত্র তা নয়, এটি বিশেষ করে এবং অনিবার্যভাবে অমঙ্গলজনক। কারণ বাঁচা মানেই ইচ্ছা করা, ইচ্ছা করা মানেই কামনা করা, কামনা করার অর্থ ই কোন কিছুর অভাব বোধ করা যা কোন অপূর্ণতার বা ত্রুটির এবং সেইহেতু দুঃখের নির্দেশ করে। আমরা জানি মানুষের জীবনে তার ধর্মীয় বিশ্বাস এক বিরাট প্রত্যাশার বাণী বহন করে নিয়ে আসে। মানুষের দুঃখের দিনে এই বিশ্বাস উদ্ভূত উন্নত ধরনের চিন্তা তাকে সান্ত্বনা দেয়। সোপেনহাওয়ারের মতে ধর্মীয় বিশ্বাস হল এক ক্ষতিকব অলীক বস্তু এবং সোপেনহাওয়ার নিজের জীবনে এই বিশ্বাসের প্রয়োজন আছে বলে মনে করতেন না। তাঁর মতে কোন ব্যক্তিত্বসম্পন্ন ঈশ্বরের অস্তিত্ব নেই। এক অ-বৌদ্ধিক এবং অচেতন ইচ্ছাই (an irrational and unconscious will) এই জগতের ভিত্তি। কাজেই বস্তুর অন্তরে কোন উদ্দেশ্য নিহিত নেই এবং ঐতিহাসিক প্রক্রিয়া কোন ক্রমবর্ধমান মঙ্গলকে প্রকাশিত করবে এইরূপ প্রত্যাশা করারও কোন অবকাশ নেই। সোপেনহাওয়ারের মতে চিন্তন ও ধারণা মানুষের ইচ্ছা থেকে উৎপন্ন গৌণ বিষয় এবং ইচ্ছার প্রকৃতিই হল শূন্যগর্ভ ও উদ্দেশ্যহীন প্রচেষ্টাতে পর্যবসিত হওয়া। একটির পর একটি কামনা আমাদের মধ্যে জাগ্রত হয় এবং যাকে কখনও পরিতৃপ্ত করা সম্ভব নয়, মানুষ তাকে পরিতৃপ্ত করার ব্যর্থ প্রচেষ্টায় নিজেকে নিয়োজিত করে। কাজেই অপরিতৃপ্ত কামনা উদ্ভূত দুঃখভোগেতেই মানুষের জীবন নিঃশেষিত হয় এবং তার সুখভোগের স্বপ্ন শূন্যগর্ভ ও নৈরাশ্যে পরিণত হয়। সোপেনহাওয়ার মঙ্গলবাদ বা আশাবাদকে (Optimism) মানুষের অবর্ণনীয় দুঃখের নিদারুণ পরিহাস (a bitter mockery of the unspeakable suffering of mankind) রূপে বর্ণনা করেছেন।

সোপেনহাওয়ারের অভিমত

বস্তুতঃ, দুঃখবাদীরা জগতের মঙ্গল ও আনন্দের দিককে অগ্রাহ্য করে, জগতের দুঃখ-কষ্ট, বেদনা, অকল্যাণ ও অমঙ্গলের দিকেই শুধু দৃষ্টিপাত করে। মানুষের জীবনে এমন তিক্ত অভিজ্ঞতা ঘটে, যে অভিজ্ঞতার জন্য দুঃখবাদী মনে করে এই জগৎ অকল্যাণ, দুঃখ ও বেদনায় পরিপূর্ণ। জীবনে বেঁচে থাকার কোন সার্থকতা নেই, না

জন্মালেই ভাল হত। জার্মান কবি [1]হিউন্ (*Hune*) লেখেন, "নিদ্রা মধুর, মৃত্যু আরও ভাল। সবচেয়ে ভাল হত কখনও না জন্মান।" এই দুঃখ, কষ্ট, নৈরাশ্য অনেক সময় আশাবাদীকেও দুঃখবাদী করে তোলে। তাই আশাবাদী লুথারের (*Luther*) মতন ব্যক্তিকেও বলতে শোনা যায়, "এই জীবন সম্পর্কে আমি ভীষণভাবে ক্লান্ত। আমি ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি যে তিনি এসে আমায় নিয়ে যান।" আশাবাদী গ্যাটে (*Goethe*) বলেন, "আমি সুদৃঢ়ভাবে ব্যক্ত করতে পারি যে, আমার পচাত্তর বছরের জীবনের মধ্যে আমি চার সপ্তাহও সত্যিকারের স্বস্তিতে কাটাতে পারিনি।"

দুঃখবাদীদের অভিমত

ভারতীয় বৌদ্ধ দর্শনে এই দুঃখবাদের এক সুস্পষ্ট রূপ দেখতে পাওয়া যায়। বৌদ্ধদর্শনে বলা হয়েছে, 'সর্বং দুঃখম্'—সকলই দুঃখময়। জন্ম দুঃখ, জরা দুঃখ, রোগ দুঃখ, মরণ দুঃখ, প্রিয় বিয়োগ দুঃখ, অপ্রিয় সংযোগ দুঃখ, কামনার ব্যাঘাত দুঃখ।' এই জগতে সবই দুঃখপূর্ণ। যাকে সুখ বলে মনে হয়, সেই সুখের মধ্যেও দুঃখের বীজ প্রচ্ছন্ন আছে।

বৌদ্ধদর্শনে দুঃখবাদ

দুঃখবাদী দৃষ্টিভঙ্গির কারণ নিরূপণ করতে গিয়ে শারীরিক ও মানসিক নানা প্রকার কারণের উল্লেখ করা হয়েছে। এই দৃষ্টিভঙ্গির মানসিক কারণের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে ব্যক্তির কামনা বাসনার ব্যর্থতা, তার প্রত্যাশার বিলম্বিত পরিতৃপ্তি, নানা প্রকারের হতাশা ও নৈরাশ্য, সুযোগের সদ্ব্যবহারের অক্ষমতা-জনিত-বেদনা প্রভৃতির উল্লেখ করা হয়েছে।

দুঃখবাদী দৃষ্টিভঙ্গির কারণ

ঈশ্বরবাদ দুঃখবাদীদের এই দৃষ্টিভঙ্গিকে অগ্রাহ্য করে। এই মতবাদ মনে করে যে, অমঙ্গল হল নিছক একটা অনুভূতির ব্যাপার। এই জগতে সুখ-শান্তি ও আনন্দের অস্তিত্ব আছে। মানুষ অজ্ঞতাহেতু অমঙ্গলের তাৎপর্য উপলব্ধি করতে পারে না। পূর্ণ ঈশ্বর এই জীব ও জগতের মধ্য দিয়ে নিজেকে প্রকাশ করেছেন। কাজেই এই জগৎ মূলতঃ শুভ ও মঙ্গলজনক, অশুভ ও অমঙ্গলজনক নয়।

ঈশ্বরবাদীদের অভিমত

মঙ্গলবাদীরা (Optimists) মনে করে না যে, এই জগৎ শুধু অমঙ্গলে ভরা বা নিরবচ্ছিন্ন দুঃখে পূর্ণ। মঙ্গলবাদীরা জগতে অমঙ্গলের অস্তিত্ব অস্বীকার করে না, তবে মঙ্গলবাদীদের মতে এই জগতে অমঙ্গলের তুলনায় মঙ্গলের আধিক্য। মঙ্গলবাদ দুঃখবাদের বিরোধী মতবাদ। এই মতবাদ জগতকে সুন্দর, শুভ ও মঙ্গলময় গণ্য করে। যা কিছু নৈরাশ্যপূর্ণ ও দুঃখপূর্ণ মঙ্গলবাদ

মঙ্গলবাদীদের বক্তব্য

1. "Sweet is sleep, but death is better
Best of all is never to be born."

তার মধ্যেও মঙ্গল ও আনন্দ আবিষ্কার করে। মঙ্গলবাদীদের কাছে নিদারুণ দুঃখও আশা ও উদ্দীপনার বাণী বহন করে নিয়ে আসে। মঙ্গলবাদী দার্শনিক লাইবনিজ মনে করেন, এই জগৎ সব সম্ভাব্য জগতের মধ্যে উৎকৃষ্টতম জগৎ। অনন্ত জ্ঞান, অনন্ত শক্তি ও অনন্ত কল্যাণরূপী ঈশ্বর এই জগতকেই সর্বশ্রেষ্ঠ জগৎরূপে সৃষ্টি করেছেন। 'সব আংশিক অমঙ্গল সর্বজনীন মঙ্গল'—পোপের এই সংক্ষিপ্ত বাণীর মধ্য দিয়ে তাঁর আশাবাদ ব্যক্ত হয়েছে। আশাবাদীরা মনে করেন সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিকাশ, বিজ্ঞানের জয়যাত্রা ও শিক্ষার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে জগতের অনেক অমঙ্গলই হ্রাস পেয়েছে এবং মানুষের মন অহেতুক ভীতি এবং ঘৃণ্য কুসংস্কার থেকে মুক্ত হয়েছে। কাজেই মানুষের জীবন ও জগতকে মঙ্গলবাদীরা আশার দৃষ্টিতে দেখেন।

মঙ্গলবাদীদের অভিমতের সমালোচনায় বলা যেতে পারে যে তাঁরা কতকগুলি বিষয়কে অগ্রাহ্য করেছেন। সভ্যতার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের সুখ বাড়ছে এটা অস্বীকার করা চলে না। সভ্যতার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে নতুন নতুন অভাবের সৃষ্টি হচ্ছে, যেগুলিকে পরিতৃপ্ত করতে না পারার জন্য মানুষের দুঃখের শেষ নেই।

সমালোচনা

দুঃখবাদের সমালোচনায় বলা যেতে পারে যে দুঃখবাদীরা একদেশদর্শী, তাঁরা কেবল ছবির একটি দিকে দেখেন অপর অংশ দেখেন না। এই জগতে অমঙ্গলের অস্তিত্ব যেমন অস্বীকার করা যায় না, তেমনি মঙ্গলের অস্তিত্বকেও জোর করে অস্বীকার করা যায় না। দুঃখ যেমন আছে, সুখও তেমন আছে। নৈরাশ্যের বেদনা যেমন আছে, তেমনি সাফল্যের আনন্দও আছে। দ্বিতীয়তঃ, সুখবাদের আদর্শের (ideal of hedonism) উপর অত্যধিক নির্ভরতাও দুঃখবাদীদের এই একদেশদর্শী দৃষ্টিভঙ্গির কারণ। দুঃখবাদীরা এই জগতে শুধু নিরবচ্ছিন্ন সুখের অস্তিত্ব প্রত্যাশা করেন এবং তাদের মনোভাবকে সুখবাদী আদর্শের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হতে দেন। তাঁদের মতে এই জগৎ নিরবচ্ছিন্ন সুখে পূর্ণ থাকবে, কোথাও কোন দুঃখ কষ্ট থাকবে না। এর উত্তরে বলা যেতে পারে যে, সুখভোগের আদর্শ ই (hedonistic ideal) মানুষের জীবনে একমাত্র আদর্শ নয়। আর যদি সুখভোগের আদর্শকে স্বীকার করেও নেওয়া যায় তাহলেও স্বীকার করতে হয় যে, দুঃখ বেদনার পরিপ্রেক্ষিতেই গভীর আনন্দের বোধকে উপলব্ধি করা যায়। দুঃখ ছাড়া নিরবচ্ছিন্ন সুখের জীবনও মানুষের পক্ষে দীর্ঘদিন ভোগ করা ক্লান্তিকর মনে হবে।

দুঃখবাদের সমালোচনা

দুঃখবাদ এবং ঈশ্বরবাদকে আপাতদৃষ্টিতে পরস্পর বিরোধী মতবাদ মনে হয়।

কিন্তু একটু চিন্তা করলেই দেখা যাবে যে উভয়ের মধ্যে কোন বিরোধ নেই। দুঃখবাদ ঈশ্বরবাদের বিরোধী মতবাদ নয়। উভয় মতবাদের বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে অমঙ্গলের ধারণার মধ্যেই মঙ্গলের অস্তিত্ব নিহিত আছে। কোন কিছুকে মঙ্গলজনক আখ্যাত করা যায় না, যদি তাকে আমরা অমঙ্গলের সঙ্গে তুলনা না করি। অমঙ্গলের অস্তিত্বকে স্বীকার করে নিয়েই দুঃখবাদের শুরু এবং অমঙ্গলকে পূর্ব থেকে স্বীকার করে না নিলে ঈশ্বরের শক্তি ও হিতৈষা সম্পর্কে কোন প্রশ্নই ওঠে না। কাজেই দুঃখবাদের স্বীকার্য সত্যতেই ঈশ্বরবাদ তার সুদৃঢ় ভিত্তি আবিষ্কার করে। দুঃখবাদ অন্য আর একদিক থেকে আমাদের মধ্যে ঈশ্বরবাদী মনোভাব গঠনে সহায়তা করে। ঈশ্বরবাদ আমাদের আধ্যাত্মিক ক্ষমতাকে উদ্দীপ্ত করে অমঙ্গলের সঙ্গে সংগ্রাম করতে এবং তাদের জয় করতে উৎসাহ যোগায়। দুঃখবাদ ঈশ্বরবাদকে যে দ্বন্দ্বে আহ্বান করে, ঈশ্বরবাদ সেটি গ্রহণ করে।

দুঃখবাদ ও ঈশ্বরবাদ পরস্পরর বিরোধী মতবাদ নয়

ভারতীয় দর্শনকে দুঃখবাদী বলা হয়। কিন্তু ভারতীয় দর্শনের এই দুঃখবাদের বিচার করলে দেখা যাবে যে, ভারতীয় দর্শন বলে যে দুঃখ থেকে পরিত্রাণ লাভের উপায় আছে এবং মানুষ নিজের চেষ্টায় দুঃখময় জীবন থেকে পরিত্রাণ লাভ করতে পারে। বুদ্ধদেব দুঃখের কথা বললেও দুঃখের নিবৃত্তি ও দুঃখ থেকে পরিত্রাণ লাভের উপায় নির্দেশ করেছেন। ভারতীয় দর্শন শুরুতে দুঃখবাদী হলেও, পরিণামে নয়। ভারতীয় দর্শন মনে করে অনন্তের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে প্রত্যক্ষ করলে কোন অমঙ্গলের অস্তিত্ব নেই, শুধু আছে শান্তি, সন্তোষ ও সুখ। ভারতীয় দার্শনিক মনে করে মোক্ষ এক আত্যন্তিক দুঃখ নিবৃত্তির অবস্থা। মোক্ষের অবস্থা এক হিতৈষী ঈশ্বরের স্বরূপ প্রকাশ করে এবং অমঙ্গলকে তুচ্ছ জ্ঞান করে। দুঃখবাদ যদি ঈশ্বরবাদ বিরোধী হয় তাহলে কোন প্রত্যাশা এবং সুখের বাণী বহন করে আনতে পারে কী?

ভারতীয় দর্শনে দুঃখবাদ সুরুতে, পরিণামে নয়

সোপেনহাওয়ারের দুঃখবাদও একদেশদর্শী মতবাদ। প্রত্যেক ব্যক্তিরই দুঃখের অভিজ্ঞতা আছে। কিন্তু ধর্ম-কার্য সম্পাদনে যে পরিতৃপ্তি মনে জাগে, যে সুখবোধের উদ্রেক হয় তাকে অগ্রাহ্য করা যায় কিভাবে? মানুষের প্রয়োজন দুঃখবাদী মনোভাব সৃষ্টি করতে ব্যর্থ হয়। কেননা অভাব বা প্রয়োজন পরিতৃপ্ত করার মধ্যেও আনন্দ আছে, যদিও এই পরিতৃপ্তি চূড়ান্ত বা সম্পূর্ণ নয়। কামনা-বাসনা মানুষের মধ্যে হতাশা জাগায় না, অসঙ্গত বস্তুর জন্য কামনার কল্পনাই নৈরাশ্যের সৃষ্টি করে। মানুষ আশা করেছে বা চেষ্টা করেছে

সোপেনহাওয়ারের বক্তব্যের সমালোচনা

বলে বিরক্তি ও কষ্ট অনুভব করে না। যা করেছে তা বৃথাই করেছে, বা তার আশা পূর্ণ হল না, এই কারণেই নৈরাশ্যবোধ করে। সোপেনহাওয়ার অন্তহীন কামনাবাসনার ভীতি মানব মনে উদ্রেক করে তাঁর দুঃখবাদী দৃষ্টিভঙ্গিকে সমর্থন করতে চেয়েছেন। কিন্তু কামনা বাসনা না থাকলে মানুষ একটা উন্নত আনন্দজনক অবস্থাকে লাভ করতে চাইবে কেন? এর মধ্যে কি একটা আপাতবিরোধ নেই? মানুষ তার ব্যর্থতার জন্য জগতে পরিপূর্ণ তৃপ্তি খুঁজে পাচ্ছে না। এর সঙ্গে জগতের ঐশ্বরিক নিয়ন্ত্রণে বিশ্বাসের কোন বিরোধ নেই। যে মানবজীবন কামনা-বাসনা, প্রত্যাশা ও প্রচেষ্টাশূন্য সেই জীবন নীচ, পশুসুলভ। গ্যালোয়ে (*Galloway*) বলেন, 'দুঃখবাদীরা যে অবস্থার কথা বলেছেন তা সুস্থ প্রাণীর উপযোগী, সজীব আত্মার নয়।' হয়ত এই কারণেই পলসেন (*Paulsen*) বলেছেন যে, দুঃখবাদী দার্শনিক যে ইচ্ছার বর্ণনা দিয়েছেন সেই ইচ্ছা সুস্থ মানুষের ইচ্ছা নয়, 'মেজাজী এবং নষ্ট শিশুর ইচ্ছা'। মানুষের কামনা এবং প্রত্যাশা যদিও কখনও চরম পরিতৃপ্তি লাভ করে না, তবু তা মানুষের মহত্ত্বেরই পরিচায়ক। সোপেনহাওয়ারের মতে দুঃখবাদ হল ইচ্ছার বেঁচে থাকার স্বীকৃতি। কিন্তু অমঙ্গলের অস্তিত্বের জন্য জীবন যদি বাঁচার যোগ্য না হয় তাহলে এই জাতীয় ইচ্ছা কিভাবে সম্ভব হয়? কাজেই সোপেনহাওয়ারের বক্তব্য দুঃখ-বাদের অতিরিক্ত কিছু নির্দেশ করে।

সুতরাং দুঃখবাদ জগতের প্রতি যথার্থ দৃষ্টিভঙ্গি নয়, বা দার্শনিক মতবাদ হিসেবেও সংগতিপূর্ণ নয়। এই জগতে অমঙ্গলের অস্তিত্ব আছে সত্য, তবে মঙ্গলেরও অস্তিত্ব আছে যার দ্বারা জগতের ভারসাম্য রক্ষিত হয়েছে। ঈশ্বর বিশ্বাসীরা মনে করে যে, জগতে অমঙ্গলের অস্তিত্ব ঈশ্বরে পূর্ণতা ও সর্বশক্তিমত্তার হানি করে না, এবং জগতের শুধুমাত্র অমঙ্গলের দিকে দৃষ্টিপাত করে এবং মঙ্গলের অস্তিত্বকে অগ্রাহ্য করে ঈশ্বরকে অ-হিতৈষী গণ্য করাও যুক্তিসংগত নয়। মানুষের প্রচেষ্টা থেকে কল্যাণের উদ্ভব সম্ভব। সিদ্ধান্তে একথা বলা যেতে পারে যে, দুঃখবাদ ঈশ্বরবাদ বিরোধী মতবাদ নয়, যদিও আপাতদৃষ্টিতে তাই প্রতীয়মান হয়। মানুষ বিশ্বাস করে তার সান্তত্বের ঊর্ধ্বে এক পূর্ণতার অবস্থা বিদ্যমান, যা তাকে আধ্যাত্মিক তৃপ্তি দিতে পারে। দুঃখবাদ এবং ঈশ্বরবাদ বিভিন্ন উপায়ে ঐ লক্ষ্যে উপনীত হতে চায়। কাজেই দুঃখবাদ এবং ঈশ্বরবাদ সুরুতে পৃথক হলেও পরিণতিতে একই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়।

দুঃখবাদ ও ঈশ্বরবাদের দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে কোন বিরোধ নেই

পঞ্চদশ অধ্যায়

ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস-বিরোধী মতবাদ
(Antitheistic Theories)

১। ভূমিকা (Introduction) :

দর্শনে এমন কতকগুলি মতবাদ আছে যেগুলি ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাসের বিরোধিতা করে। এই সব মতবাদ এই প্রশ্ন উত্থাপন করে যে, জগত সম্পর্কে ধর্ম-বিশ্বাস, জগতের যে চিত্র আমাদের সামনে তুলে ধরে তার বস্তুগত যার্থাথ্য আছে কী? ঈশ্বর কি বাস্তব, না অলীক কিছু? ধর্ম-সম্বন্ধীয় স্বীকার্য সত্যগুলির কোন যাথার্থ্য আছে কি? না এগুলি শূন্যগর্ভ বা ফাঁকা বচনমাত্র। ধর্মের মধ্য দিয়ে মানুষ কি তার মনোগত মূল্যগুলিকেই বস্তুগত করে তুলতে চায়? ঈশ্বর-বিহীন ধর্ম সম্ভব কি? এই সব মতবাদগুলির বক্তব্য বিষয়কে পরীক্ষা করে দেখা ধর্মদর্শনের কাজ। সুতরাং আমরা নীচে এই জাতীয় কয়েকটি মতবাদ আলোচনা করব :

কোন কোন মতবাদ ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাসের বিরোধিতা করে

২। জড়বাদ (Materialism) :

ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যবর্তী সময়ের শেষের দিকে জগত সম্পর্কে এমন একটি মতবাদের আবির্ভাব ঘটে যা প্রকৃতিবাদ (Naturalism) নামে পরিচিত। এই মতবাদ প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের ধারণা ও নীতির সাহায্যে জগতকে ব্যাখ্যা করার প্রয়াসী। এই মতবাদ যা কিছু অলৌকিক বা অতি-প্রাকৃতিক, তার বিরোধী। চেতনা, মূল্য, উদ্দেশ্য, ঈশ্বর প্রভৃতির সাহায্যে জগত ব্যাখ্যার প্রচেষ্টাকে এই মতবাদ অর্থহীন মনে করে। এই প্রকৃতিবাদের নানাধরনের রূপ আছে, যাকে মোটামুটি দুভাগে ভাগ করা যায় : (ক) বিচারহীন প্রকৃতিবাদ বা জড়বাদ (Dogmatic Naturalism or Materialism) এবং (খ) অজ্ঞেয়তাবাদী প্রকৃতিবাদ (Agnostic Naturalism) বা প্রকৃতিবাদ। আমরা প্রথম জড়বাদের আলোচনা করব। তারপর অন্যান্য মতবাদগুলি আলোচনা করব।

প্রকৃতিবাদ প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের ধারণার সাহায্যে জগতকে ব্যাখ্যা করতে চায়

জড়বাদ জড়কেই পরম সত্তা মনে করে। এই বিশ্বের সব কিছুই জড় থেকেই উদ্ভূত—এমন কি প্রাণ এবং মনও। জড় এবং গতির সাহায্যে জগতের সব প্রক্রিয়া এমন কি জৈবিক এবং মানসিক প্রক্রিয়াকেও ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে, এই জড় বস্তুগুলি পরমাণুরই সমষ্টি। এই পরমাণু অবিচ্ছেদ্য, অভেদ্য, অবিনশ্বর ও শাশ্বত এবং এইসব

জড়বাদ জড়কেই পরম সত্তা বলে মনে করে

পরমাণুর আকস্মিক ও যান্ত্রিক সমাবেশ থেকেই সব কিছুর উদ্ভব। এই পরমাণুবাদের (atomism) উপরই জড়বাদের প্রতিষ্ঠা।

এই মতবাদকে বিচারহীন প্রকৃতিবাদ নামে অভিহিত করার কারণ, এই মতবাদের সমর্থকবৃন্দ বিনা বিচারে জড়কেই পরম সত্তা রূপে গ্রহণ করেন এবং বিনা বিচারে আধ্যাত্মিকতাকে অস্বীকার করেন।

জড়বাদীদের মূল বক্তব্যগুলি নীচে আলোচনা করা হল :

প্রত্যক্ষণই একমাত্র প্রমাণ

প্রথমতঃ, জড়বাদীরা প্রত্যক্ষণকেই একমাত্র প্রামাণ্য বলে গ্রহণ করে। যা প্রত্যক্ষের বিষয় নয়, তার অস্তিত্ব স্বীকার করা চলে না। একমাত্র জড়কেই আমরা প্রত্যক্ষ করি, তাই কেবলমাত্র জড়েরই অস্তিত্ব আছে, সত্যতা আছে—আর সব কিছু অলীক।

জড়বাদ অলৌকিক-বাদের বিরোধী

জড়বাদ অলৌকিকবাদের বিরোধী, অলৌকিক বা অপ্রাকৃত ঘটনায় জড়বাদ বিশ্বাস করে না। প্রাকৃতিক নিয়মের সাহায্যে ঘটনাকে ব্যাখ্যা করাই বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির লক্ষণ। আত্মার কোন অস্তিত্ব নেই ; আত্মার অমরতা, পরলোক, ঈশ্বর প্রভৃতির ধারণা অলীক ধারণা মাত্র। নৈতিক আদর্শের জগৎ এবং ধর্ম-সম্পর্কীয় অনুভূতির জগৎ হল ছায়ার জগৎ। ঈশ্বরের অস্তিত্বের পক্ষে যে-সব যুক্তি উপস্থাপিত করা হয় সেইগুলি সবই ভ্রান্ত, যেহেতু জড় এবং পার্থিব শক্তির সাহায্যে এইগুলির ব্যাখ্যা করা চলে না।

জড়ের কাজ যান্ত্রিক-ভাবেই সম্পন্ন হয়

দ্বিতীয়তঃ, জড়ের কাজ যান্ত্রিকভাবেই সম্পন্ন হয়। জড়বাদ যান্ত্রিক কার্যকারণ সম্পর্কের দ্বারাই বিভিন্ন ঘটনার পারস্পরিক সম্পর্ককে ব্যাখ্যা করে। যান্ত্রিক কার্যকারণ সম্পর্কের বৈশিষ্ট্য হল কোন ঘটনাকে তার পূর্ববর্তী কারণের দ্বারা ব্যাখ্যা করা। জড় ও গতির যে ক্রিয়া তার মূলে কোন উদ্দেশ্য নেই। সেই কারণে জড়বাদীরা এই জগতের মূলে কোন উদ্দেশ্য স্বীকার করে না।

জড় থেকেই প্রাণের উদ্ভব

তৃতীয়তঃ, জড় থেকেই প্রাণের উদ্ভব। জড়ের সঙ্গে প্রাণের কোন গুণগত পার্থক্য নেই। জড়ের তুলনায় প্রাণ জটিল। সাম্প্রতিক বৈজ্ঞানিকরা দেখাবার চেষ্টা করেছেন যে, জীবকোষ (Protoplasmic cell) কার্বন, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন ও নাইট্রোজেন গ্যাসের দ্বারা সৃষ্ট।

চতুর্থতঃ, মন বা চৈতন্য জড় থেকেই উদ্ভূত। মস্তিষ্কের ক্রিয়ার অতিরিক্ত কোন স্বাধীন চেতন প্রক্রিয়ার অস্তিত্ব নেই। আধুনিক জড়বাদীদের মতে মন হল উপবস্তু (Epiphenomenon)। জড়ই প্রকৃত বস্তু। কারণ, জড়েরই সত্তা আছে, চেতনার কোন বস্তুসত্তা নেই। দুটি কঠিন বস্তুর ঘর্ষণের ফলে যেমন আলোর রেখা বেরিয়ে আসে, তেমনি মস্তিষ্কের কোষের অনবরত ঘর্ষণের ফলেই চেতনার উৎপত্তি।

পঞ্চমতঃ, জড়বাদীরা যান্ত্রিক বিবর্তনবাদে (mechanical evolution) বিশ্বাসী। জড় থেকেই বিশ্ব জগতের উদ্ভব, জড় থেকেই প্রাণের উদ্ভব। জীবদেহ একটি জটিল যন্ত্র ছাড়া কিছুই নয়—প্রাণ শক্তি জড়শক্তিরই ভিন্ন রূপ মাত্র। মন জড়েরই উপবস্তু। জড়শক্তি বিভিন্ন রূপ পরিগ্রহ করতে পারে এবং জড়শক্তি জগতের বিবর্তনের পথে প্রাণশক্তিতে এবং মানসিক শক্তিতে পরিবর্তিত হয়। প্রাণশক্তি এবং মানসিক শক্তি পার্থিব শক্তিরই জটিল রূপ মাত্র।

জড়বাদীরা যান্ত্রিক বিবর্তনবাদে বিশ্বাসী

ষষ্ঠতঃ, জড়বাদ অনুসারে ইচ্ছার কোন স্বাধীনতা নেই। আমাদের ইচ্ছা জাগতিক নিয়মের দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হয়। পূর্ববর্তী ঘটনাই আমাদের কার্যকে নিয়ন্ত্রিত করে বা আমাদের কোন একটি কর্মপন্থা নির্বাচন করায়। ব্যক্তি-ইচ্ছার স্বাধীনতা অলীক কল্পনা ছাড়া কিছুই নয়।

জড়বাদীরা ইচ্ছার স্বাধীনতা স্বীকার করে না

সপ্তমতঃ, জড়বাদ নৈতিকতার মূলে কঠিন আঘাত হেনেছে। ব্যক্তি-ইচ্ছার স্বাধীনতার উপরই নীতিবিজ্ঞান দাঁড়িয়ে আছে। মানুষের যে-সব কাজ তার স্বাধীন ইচ্ছার ফলে উৎপন্ন হয়, সেইগুলি নৈতিক বিচারের বিষয়বস্তু। কিন্তু মানুষের ইচ্ছার স্বাধীনতা যদি না থাকে, মানুষের সব কাজই যদি জাগতিক নিয়মের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়, তাহলে মানুষের কাজের কোন নৈতিক দায়িত্ব তার উপর আরোপ করা যেতে পারে না, সুতরাং ভাল-মন্দ, ঠিক-বেঠিক এসব ধারণাও অর্থহীন হয়ে পড়ে। জড়বাদের অনিবার্য পরিণতি হল মনস্তত্ত্বমূলক-সুখবাদ, (Psychological Hedonism) অর্থাৎ সুখই মানুষের একমাত্র কাম্যবস্তু এবং প্রতিটি মানুষই সকল সময় সুখ অন্বেষণ করে।

জড়বাদ নৈতিক দায়িত্ব অস্বীকার করে

জড়বাদীদের দৃষ্টিতে ধর্ম : জড়বাদ সবরকম অলৌকিকতাকে অস্বীকার করে। জড়বাদীরা ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষকেই জ্ঞানের একমাত্র উৎসরূপে গণ্য করে। ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে যাকে প্রত্যক্ষ করা যায় না, তার কোন সত্তা নেই। জড়বাদীরা অতীন্দ্রিয় আত্মা ও ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস করে না। ঈশ্বরের ধারণা কাল্পনিক ধারণা। ধর্মীয় চেতনা অলীক বা মিথ্যা। ধর্মীয় বিশ্বাসের অনুরূপ কোন প্রকৃত বস্তুর অস্তিত্ব নেই। সত্য, শিব ও সুন্দর—এই মূল্যগুলির যথার্থ সত্তা নেই।

জড়বাদ ধর্মের মূলে কঠিন আঘাত হানে। মানুষ সসীম হয়েও অসীমকে উপলব্ধি করতে চায়। আধ্যাত্মিক অনুভূতি মানুষের মনে অসীমকে উপলব্ধি করার আকুলতা এনে দেয়। মানুষ কল্পনা করে এই অসীম সত্তা সত্য, শিব ও সুন্দর। এই অসীম হল পূর্ণতা। জড়বাদীদের মতে অসীম সত্তার কোন অস্তিত্ব নেই। তাদের দৃষ্টিতে ধর্ম হল অলীক কল্পনা,

জড়বাদীদের মতে ধর্ম হল অলীক কল্পনা

এ একটা স্বপ্ন মাত্র। সুবিধাবাদী লোকদের স্বার্থ মেটাবার জন্য এ হল ছল বা চাতুরী। জড়বাদীদের মতে ঈশ্বর, আত্মা, আত্মার অমরতা, এগুলির কোন অস্তিত্ব নেই। পরম মূল্যের (higher value) আদর্শও অলীক কল্পনা।

সমালোচনা (Criticism)) :

জড়বাদীদের মতে পরমাণু ও গতির সাহায্যেই জগতের সব প্রক্রিয়াকেই ব্যাখ্যা করা যায় এবং জগৎ প্রক্রিয়ার মূলে কোন বুদ্ধির অস্তিত্ব নেই। কিন্তু তাহলে বলতে হয় যে, এই জগতের ঐক্য, শৃঙ্খলা, সামঞ্জস্য, সূক্ষ্ম কলা-কৌশল কেবলমাত্র পরমাণুর আকস্মিক সংযোগের ফল। কিন্তু কোন বস্তুকে আকস্মিক সংযোগের ফল বলার অর্থ স্বীকার করে নেওয়া যে তার কোন বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা সম্ভব নয়। জড়ের সাহায্যে বিশ্বের ঐক্য ও সামঞ্জস্য সন্তোষজনক ভাবে ব্যাখ্যা করা চলে না।

পরমাণু ও গতির সাহায্যে এ জগতের ঐক্য, শৃঙ্খলা ও সামঞ্জস্যকে ব্যাখ্যা করা যায় না।

জড়বাদীরা জগতের এই বিবর্তনের মূলে কোন উদ্দেশ্যের অস্তিত্ব স্বীকার করে না এবং যান্ত্রিক বিবর্তনবাদের সাহায্যে জগতের পরিবর্তিত রূপকে ব্যাখ্যা করতে চেষ্টা করে। কিন্তু মানুষ যন্ত্র নয়, মানুষের কার্যকলাপ যান্ত্রিক পদ্ধতিতে সাধিত হয় না। উদ্দেশ্যই মানুষের কর্মকে নিয়ন্ত্রিত করে। জগৎ প্রক্রিয়ার মূলে কোন বুদ্ধি বা চেতনার অস্তিত্ব স্বীকার না করলে জগতের বিবর্তনকে ব্যাখ্যা করা যায় না। প্রাণ ও মনের ক্ষেত্রে জড়বাদীদের যান্ত্রিক ব্যাখ্যা একেবারেই অচল। জীবের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার, ইচ্ছার স্বাধীনতা, মনের সৃজন ক্ষমতা প্রভৃতি যান্ত্রিক কার্যকারণ সম্পর্কের দ্বারা ব্যাখ্যা করা যায় না। জড়বাদীদের মতে প্রাণ জড় থেকেই উদ্ভূত। প্রাণশক্তি ও জড়শক্তি স্বরূপতঃ অভিন্ন। জড়-বাদীদের এই মতবাদ ভ্রান্ত। রাসায়নিক উপাদানের সাহায্যে কৃত্রিম পদ্ধতির আশ্রয় গ্রহণ করে পরীক্ষণাগারে এখনও পর্যন্ত সজীব জীবকোষ সৃষ্টি করা সম্ভব হয়নি। যে জীবকোষ কৃত্রিমভাবে তৈরি করা হয়েছে তা নির্জীব। তাছাড়া, জীবের এমন কতকগুলি বৈশিষ্ট্য আছে, যেমন—বৃদ্ধি, বংশবৃদ্ধি, আত্মসংস্কার, পরিবেশের সঙ্গে সামঞ্জস্যবিধান করে চলা প্রভৃতি যেগুলিকে জড়শক্তির দ্বারা ব্যাখ্যা করা চলে না।

উদ্দেশ্য ছাড়া মানুষের কার্যকলাপ ব্যাখ্যা করা যায় না।

যান্ত্রিক পদ্ধতির সাহায্যে প্রাণ ও মনের ব্যাখ্যা করা যায় না।

জড়ের সাহায্যে প্রাণের ব্যাখ্যা সম্ভব নয়

জড়বাদীদের মতে মন হল মস্তিষ্কের উপবস্তু। কিন্তু মন বা চেতনাকে যদি মস্তিষ্কের উপবস্তু মনে করা হয়, তাহলে মনের পক্ষে স্বাধীনভাবে কাজ করার ইচ্ছা ও দেহকে নিয়ন্ত্রিত করার কোন ক্ষমতা থাকত না। অথচ মন যে ইচ্ছা ও দেহকে নিয়ন্ত্রিত করে

তা প্রত্যক্ষের সাহায্যে জানা যায়। তাছাড়া, দেহ ও মন পরস্পরের উপর নির্ভরশীল বলে উভয়কে এক ও অভিন্ন মনে করার কোন সংগত কারণ নেই। মস্তিষ্কের ক্রিয়া ও মানসিক ক্রিয়া নিবিড় সম্পর্কে সম্পর্কযুক্ত; কিন্তু তারই ভিত্তিতে মনকে মস্তিষ্কের ক্রিয়া মনে করার কোন সংগত যুক্তি নেই। জড়বাদ মনের ক্রিয়ার ঐক্য এবং ধারাবাহিকতাকে (unity and continuity) ব্যাখ্যা করতে পারে না।

মন মস্তিষ্কের উপবস্তু হলে মনের স্বাধীনতাকে ব্যাখ্যা করা যায় না

জড়বাদীরা জ্ঞানোৎপত্তির কোন যুক্তিযুক্ত ব্যাখ্যা দিতে পারে না। জ্ঞানের উৎপত্তির জন্য জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়বস্তুর অর্থাৎ মন বা চেতনা ও জড় বস্তুর স্বতন্ত্র অস্তিত্ব স্বীকার করে নিতে হয়। মনকে যদি জড় বস্তুতে, বা জড বস্তুকে যদি মনে রূপান্তরিত করা হয়, তাহলে জ্ঞান সম্ভব হয় না। চেতনা যদি জড় বস্তুর গুণ হয়, তাহলে চেতনার পক্ষে জড় বস্তুকে জানা কখনও সম্ভব হয় না।

জড়বাদ জ্ঞান ব্যাখ্যা করতে পারে না

জড়বাদীদের মতবাদ চক্রক দোষে দুষ্ট। কেননা জড়বাদীরা মনের সাহায্যে জড়ের ব্যাখ্যা করে এবং জড়ের সাহায্যে মনের ব্যাখ্যা করে। জড়বাদীরা যখন বলে যে তাদের মতবাদ সত্য, তখন সত্য বলতে তারা কি বোঝে? সত্যতা তো জড়ের ধর্ম হতে পারে না, মনই সত্য-মিথ্যা বিচার করে।

জড়বাদ চক্রক দোষে দুষ্ট

জড়বাদীরা ঈশ্বর বা অন্যান্য অতি-প্রাকৃতিক বা অলৌকিক বস্তুর অস্তিত্ব অস্বীকার করেছে, যেহেতু সেইগুলি প্রত্যক্ষগোচর নয়। কিন্তু প্রত্যক্ষই যে একমাত্র প্রমাণ, তারই বা প্রমাণ কোথায়? জড়বাদীরা নানাভাবে পরোক্ষকেও প্রমাণ বলে স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে।

জড়বাদ কর্তৃক নৈতিক ও ধর্ম সম্পর্কীয় অনুভূতিকে মনের অলীক কল্পনা বলে ধরে নেওয়ার এবং পরমমূল্যের আদর্শগুলিকে কেবলমাত্র মনোগত ধারণা মনে করার কোন যুক্তিসংগত কারণ নেই। সত্য, শিব ও সুন্দরের আদর্শ বস্তুগত এবং মনোগত উভয়ই।

জড়বাদের বিরুদ্ধে নানারকম যুক্তি আনা হয়েছে। আধুনিক মনের ধর্মবিশ্বাসের পথেও জড়বাদ কোন সত্যিকারের প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করতে পারে না। উনবিংশ শতাব্দীর জড়বাদী বাকনার (*Buchner*), কার্ল ভগ (*Karl Vogt*), হেকেল (*Heckel*) এবং লিওব (*Loob*)-এর মতবাদও আজ আর মনকে আকর্ষণ করে না। জড়বাদীরা বিশ্বের গুণগত বৈচিত্র্যকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে তাকে জড় ও গতির প্রকাশেতেই রূপান্তরিত করেছে। জড়বাদীদের বিরুদ্ধে প্রধান অভিযোগ এই যে, বিশ্বের এই জটিলতা, তার এই বৈচিত্র্য, তার অফুরন্ত সম্পদ সব কিছুকে কেবলমাত্র জড়ে রূপান্তরিত করে, তারা জটিল বিষয়-বস্তুকে অতি সরল করে তুলেছেন বটে, কিন্তু তাতে বিশ্বের যে রূপ আমরা পাই তাহল

খণ্ড ও বিকৃত। জড়বাদীরা মূল্য বা আদর্শকে কোন স্বীকৃতি দেয় না। কিন্তু সত্য, শিব ও সুন্দর—এই মূল্যগুলিকে যদি জীবন থেকে নির্বাসিত করা যায় তাহলে জীবনের কোন অর্থই থাকে না।

সুতরাং পূর্বোক্ত আলোচনার ভিত্তিতে জড়বাদকে এই জগতের সন্তোষজনক ব্যাখ্যা মনে করার কোন যুক্তিসংগত হেতু নেই এবং জড়বাদের যুক্তি অনুসরণ করে ধর্মকে অলীক মনে করাও যুক্তিসংগত নয়।

৩। ধর্ম সম্পর্কে চার্বাক মতবাদ (Carvaka view of Religion) :

চার্বাক দার্শনিকরা ভারতীয় দর্শনে জড়বাদের প্রচারক। পাশ্চাত্ত্য জড়বাদীদের মতন চার্বাক দার্শনিকরা জড়কেই একমাত্র তত্ত্ব বলে মনে করে। চার্বাক দার্শনিকরা আত্মা, ঈশ্বর প্রভৃতি আধ্যাত্মতত্ত্বের অস্তিত্ব ও বেদের প্রামাণ্য স্বীকার করে না, ইহলোক, পরলোক, পাপপুণ্যে বিশ্বাস করে না এবং ইন্দ্রিয় সুখভোগকেই জীবনের একমাত্র কাম্য বস্তু মনে করে।

চার্বাক মতে জড়ই একমাত্র তত্ত্ব

চার্বাকদের মতে ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষই একমাত্র প্রমাণ। অনুমানকে প্রমাণ রূপে গ্রহণ করা চলে না। অনুমানলব্ধ জ্ঞান সম্ভাব্য মাত্র, সুনিশ্চিত নয়। আপ্তবাক্যকেও প্রমাণ রূপে গ্রহণ করা চলে না। আপ্তবাক্য বা শব্দ হল বিশ্বাসযোগ্য ব্যক্তির বচন। কোন ব্যক্তি বিশ্বাসযোগ্য কিনা তার আচরণ ব্যবহার, কথাবার্তা বা চরিত্র থেকে অনুমান করে নিতে হয়। কিন্তু অনুমান যখন প্রমাণ নয় তখন আপ্তবাক্য বা শব্দকে প্রমাণ রূপে গ্রহণ করা চলে না।

ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষই একমাত্র প্রমাণ

প্রত্যক্ষই যদি একমাত্র প্রমাণ হয় তাহলে যাকে প্রত্যক্ষ করা চলে তারই সত্তা স্বীকার করে নিতে হয়। ঈশ্বর, আত্মা, স্বর্গ, নরক, অদৃষ্টশক্তি প্রভৃতির সত্তাতে বিশ্বাস স্থাপন করা যায় না কারণ এইগুলির কোন সত্তা নেই। বস্তুতঃ জড় বস্তুরই সত্তা আছে, কারণ জড় বস্তু প্রত্যক্ষগোচব। অতীন্দ্রিয় বস্তু যেহেতু প্রত্যক্ষগোচর নয় সেইহেতু তার কোন সত্তা নেই। জড় বস্তুর অস্তিত্বই কেবল মাত্র প্রত্যক্ষের বিষয়। জড়ের কেবল মাত্র সত্তা আছে। চার্বাক মতে প্রত্যক্ষগ্রাহ্য চারটি মহাভূত ক্ষিতি, (earth), অপ্ (water), তেজ (fire) ও মরুৎ (air)-এর দ্বারাই এই জগৎ ও জগতের যাবতীয় বস্তু গঠিত। চেতনা যেহেতু প্রত্যক্ষগ্রাহ্য, চার্বাক মতে তার অস্তিত্ব আছে কিন্তু চেতনার আশ্রয় রূপে কোন অজড় নিত্যদ্রব্যরূপ আত্মার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নেই। চেতনা দেহের ধর্ম। ক্ষিতি, অপ্, তেজ ও মরুৎ এই চারটি উপাদানের সংমিশ্রণে যখন জীবদেহ উৎপন্ন হয়

প্রত্যক্ষই যেহেতু প্রমাণ, অতীন্দ্রিয় সত্তার অস্তিত্ব নেই

তখন সেই দেহে চৈতন্যরূপ একটি নতুন গুণের আবির্ভাব ঘটে। চৈতন্য হল উপবস্তু (epiphenomenon) ; চৈতন্যবিশিষ্ট দেহই আত্মা। যেহেতু দেহ ভিন্ন চৈতন্যের অস্তিত্ব নেই, সেইহেতু আত্মার অমরতার প্রশ্ন অবাস্তর। দেহের মৃত্যুতেই জীবনের পরিসমাপ্তি। জন্মান্তর, পরলোক, স্বর্গ, নরক এইগুলি কতকগুলি অর্থহীন শব্দ মাত্র। এগুলি কাল্পনিক বিষয়।

চৈতন্যবিশিষ্ট দেহই আত্মা

ধর্মের প্রতি চার্বাক দর্শনের দৃষ্টিভঙ্গি : ধর্ম হল অবাস্তব, একটা মানসিক রোগ। যেহেতু অতীন্দ্রিয় ঈশ্বর প্রত্যক্ষের বিষয় নয়, সেইহেতু ঈশ্বরের কোন অস্তিত্ব নেই। অনুমান অসিদ্ধ, সে কারণে অনুমানের দ্বারাও ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ করা যায় না। চার্বাক মতে জগতের স্বষ্টি কর্তা হিসেবে কোন জগৎ স্রষ্টার অস্তিত্ব অনুমান করা নিষ্প্রয়োজন। ক্ষিতি, অপ্, তেজ ও মরুৎ এই চারটি জড় উপাদান নিজ নিজ অন্তর্নিহিত স্বভাবধর্মবশতঃ ক্রিয়া করে এবং তার ফলে এই জগৎ ও জগতের যাবতীয় বস্তুর স্বষ্টি হয়েছে। সুতরাং ঈশ্বরের কোন প্রয়োজনীয়তা নেই। চার্বাকরা বৈদিক ক্রিয়া কর্মের অনুষ্ঠানকে খুবই বিদ্রূপ করেছে। স্বর্গ, নরক, ধর্ম, অধর্ম, পাপ ও পুণ্য এইগুলির প্রকৃত কোন অস্তিত্ব নেই। এইগুলি অলীক কল্পনা ছাড়া কিছুই নয়। ধর্মশাস্ত্রে এইগুলির বর্ণনা আছে কিন্তু ধর্মশাস্ত্র বিশ্বাসযোগ্য নয়, পারলৌকিক ক্রিয়া কর্ম অনুষ্ঠান নিতান্ত অর্থহীন। প্রকৃতি সব মানবিক মূল্য নিরপেক্ষ এবং ভাল ও মন্দের প্রতি উদাসীন।

ধর্ম হল অবাস্তব

জগৎ স্রষ্টা হিসেবে ঈশ্বরের অস্তিত্বের অনুমান প্রয়োজনহীন

চার্বাক মতে জগতের যাবতীয় বস্তু কোনো উদ্দেশ্যের পরিণাম, এর কোন প্রমাণ নেই। জগতের সব বস্তু চারটি ভূতের সংমিশ্রণে উৎপন্ন। সুতরাং চার্বাক দর্শন যেহেতু কোন ঈশ্বরে বিশ্বাসী নয়, সেইহেতু নাস্তিক।

৪। প্রকৃতিবাদ (Naturalism) :

ইংরেজী '*Naturalism*' শব্দটিকে নানা অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। বর্তমান যুগে '*Naturalism*' বা প্রকৃতিবাদ অর্থে আমরা বুঝি সেই মতবাদ যে মতবাদ অতি-প্রাকৃতিকবাদের (Supernaturalism) বিরোধী। যা কিছু অলৌকিক (Supernatural) বা অতি-প্রাকৃতিক, যা কিছু আধ্যাত্মিক (Spiritual) বা অভিজ্ঞতা-ঊর্ধ্ব (Transcendent of experience) তার বিরোধিতা করে যেসব মতবাদ গড়ে উঠেছে সেইগুলি সবই প্রকৃতিবাদের অন্তর্ভুক্ত।

প্রকৃতিবাদ সকল রকম অপ্রাকৃতিক বা অলৌকিক বিষয়বস্তু, উদ্দেশ্য, মূল্য বা মানকে পরিহার করে কেবলমাত্র প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের ধারণা ও স্বীকার্য সত্যের

সাহায্যেই জাগতিক ঘটনাগুলিকে ব্যাখ্যা করে। প্রকৃতিবাদের নানারকম রূপ আছে। আমরা মোটামুটি তাকে দু-ভাগে ভাগ করতে পারি; যথা—(ক) বিচারহীন প্রকৃতিবাদ বা জড়বাদ (Dogmatic Naturalism or Materialism) এবং (খ) অজ্ঞেয়তাবাদী প্রকৃতিবাদ (Agnostic Naturalism) বা শুধু প্রকৃতিবাদ। এছাড়াও সাম্প্রতিক কালে (গ) মনস্তত্ত্বমূলক প্রকৃতিবাদ (Psychological Naturalism) নামে আর এক নতুন মতবাদের উদ্ভব ঘটেছে। বিচারহীন প্রকৃতিবাদ বা জড়বাদ (Dogmatic Naturalism or Materialism) অনুসারে জড়বস্তুই এই বিশ্বের একমাত্র আদিম সত্তা (Ultimate Reality) যার থেকে সকল কিছুই উদ্ভূত হয়েছে। এ মতবাদ পূর্বে আলোচিত হয়েছে।

উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগের শেষের দিকে প্রকৃতিবাদের আবির্ভাব। মানুষের মধ্যে যখনই বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি জাগ্রত হয়েছে তখনই এই প্রকৃতিবাদের আবির্ভাব ঘটেছে। বিজ্ঞান ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির সাহায্যে বিষয়বস্তুকে ব্যাখ্যা করার আগ্রহ থেকেই এই মতবাদের উদ্ভব। প্রাচীন গ্রীসে বিভিন্ন বিষয়বস্তুকে অলৌকিকভাবে বা আধ্যাত্মিকভাবে ব্যাখ্যা করা হত। কিন্তু সোফিস্ট (*Sophist*) দর্শন সম্প্রদায়, দার্শনিক লিউকিপাশ (*Leucippus*), ডেমোক্রিটাস (*Democritus*), এপিকিউরাস (*Epicurus*), আধ্যাত্মিকতা বা অলৌকিকতাকে বর্জন করে প্রাকৃতিক নিয়মের সাহায্যে বিষয়বস্তুর ব্যাখ্যা দেবার চেষ্টা করেন এবং চিন্তাজগতে প্রকৃতিবাদের সূচনা করেন।

প্রাচীনযুগের প্রকৃতিবাদ

এঁরা ছিলেন জড়বাদী বা বস্তুবাদী (Materialists)। ঈশ্বরের অস্তিত্বে এবং সকল রকম অলৌকিক ও আধ্যাত্মিক বিষয়বস্তু সম্বন্ধে এঁরা অবিশ্বাসী। এঁদের মতে কেবলমাত্র গতি (Motion) ও পরমাণুর (Atoms) সাহায্যে এই জগতের সকল কিছুকেই ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। মধ্যযুগে ধর্মীয় কর্তৃপক্ষের চাপে পড়ে এবং প্রাকৃতিক বিষয়বস্তুতে মানুষের আগ্রহের অভাবের জন্য এই প্রকৃতিবাদ তেমন বিকাশলাভ করতে পারেনি।

আধুনিক যুগে প্রকৃতির প্রতি মানুষের নতুন করে আগ্রহ দেখা দিয়েছে। মানুষের মন বিচারহীন মানসিক প্রবণতা ও ধর্মীয় কর্তৃপক্ষের গোঁড়ামির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ জানিয়েছে। আধুনিক বিজ্ঞানের জন্মের সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃতিবাদের নতুন করে আবির্ভাব ঘটেছে। ষোড়শ, সপ্তদশ এবং অষ্টাদশ শতাব্দীতে প্রকৃতিবাদ ছিল জড়বাদ এবং নাস্তিকতাবাদ। কোন কোন ক্ষেত্রে প্রকৃতির প্রতি তীব্র অনুরাগের জন্য সর্বেশ্বরবাদের (Panthesim) উদ্ভব হয়েছে। সর্বেশ্বরবাদের মূল বক্তব্য হল সবই ঈশ্বর। 'প্রকৃতি ও ঈশ্বর এক এবং অভিন্ন।' ডারউইন (*Darwin*)-এর মতে বিবর্তনবাদ প্রকৃতিবাদকে

নতুন শক্তি ও প্রেরণা দেয়। মানুষ, জগৎ এবং সব কিছুকেই প্রাকৃতিক নিয়মের সহায়তায় ব্যাখ্যা করার জন্য আগ্রহী হয়। অবশ্য প্রাচীন প্রকৃতিবাদ যেভাবে অতি প্রাকৃতিকবাদের (Supernaturalism) বিরোধিতা করেছে, আধুনিক প্রকৃতিবাদ তা করে নি। প্রাচীন প্রকৃতিবাদ কোন রকম বিচারের আশ্রয় গ্রহণ না করেই অলৌকিকতা বা অতি-প্রাকৃতিকতাকে বাতিল করতে চেয়েছে এবং 'জড়'কেই একমাত্র সত্তা হিসেবে স্বীকার করেছে। আধুনিক প্রকৃতিবাদ 'অজ্ঞেয়তাবাদ' (Agnosticism)-এর সঙ্গে হাত মিলিয়ে অলৌকিকতাকে স্বীকারও করল না, অস্বীকারও করল না। আধুনিক প্রকৃতিবাদ যেন এ কথাই বলতে চায়, "অলৌকিক কিছু যদি থাকে, তার সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক নেই।" অবশ্য এই দৃষ্টিভঙ্গি সংগত বা বুদ্ধিগ্রাহ্য কিনা তা বিতর্কের বিষয়।

আধুনিক প্রকৃতিবাদের বৈশিষ্ট্য

প্রকৃতিবাদের লক্ষ্য হল, কোন রকম অলৌকিকতার বা অতি-প্রাকৃতিক বিষয়বস্তুর সাহায্য না নিয়ে সব কিছুকে সরল ও সহজভাবে অপরের বুদ্ধিগ্রাহ্য করে, জটিলকে সরল করে, কতকগুলি প্রাকৃতিক নিয়মের সাহায্যে যে-কোন বিষয়কে ব্যাখ্যা করা। জড়বাদ এবং প্রকৃতিবাদ এক ও অভিন্ন নয়। জড়বাদীদের মতে সব কিছুই জড়ের প্রকাশ, কিন্তু প্রকৃতিবাদীরা প্রাকৃতিক নিয়ম ও কার্যকারণসম্বন্ধ, শক্তি ও গতির সাহায্যে সকল কিছুকে ব্যাখ্যা করতে চান।

বিবর্তনবাদের নিয়মানুসারে সরল থেকেই জটিলের উদ্ভব। জগতের ক্রম-বিকাশের ধারাগুলি লক্ষ্য করলে দেখা যাবে এর প্রতিটি স্তর পূর্ববর্তী স্তর থেকেই উদ্ভূত। পূর্ববর্তী কারণের সাহায্যে পরবর্তী ঘটনার ব্যাখ্যাই বুদ্ধিসংগত ব্যাখ্যা। প্রকৃতিবাদ বৈজ্ঞানিক কারণকেই (Scientific Cause) মানে; অন্য কোন রকম অপ্রাকৃতিক কারণ সে স্বীকার করতে চায় না; অন্ত-কারণ (Final Cause) বলে কিছু নেই। প্রকৃতিবাদের লক্ষ্য ঘটনার কারণকে জানা, তার উদ্দেশ্যকে নয়। সুতরাং প্রকৃতিবাদ জগৎকে একটি যান্ত্রিক দৃষ্টিতে দেখে থাকে। প্রকৃতিবাদীর দৃষ্টিতে মন হল একটি উপবস্তু (Epiphenomenon) এবং ইচ্ছার কোন স্বাধীনতা নেই; ইচ্ছা পূর্ব থেকে নির্ধারিত। প্রকৃতিবাদীরা প্রত্যক্ষবাদীদের (Positivist) দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করে বলতে চায়, বাহ্যিক ঘটনাকেই আমরা জানি ও বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতির সাহায্যেই তাদের জানা যায় এবং প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের বাইরে আমাদের জ্ঞান যেতে পারে না। প্রকৃতিবাদীরা পরিণামবাদ বা উদ্দেশ্য-

প্রকৃতিবাদ জড়বস্তু ও কার্যকারণের সাহায্যে সব কিছু ব্যাখ্যা করে.

প্রকৃতিবাদ প্রত্যক্ষবাদী

বাদকে (Teleology) স্বীকৃতি দেয় না, অর্থাৎ তাঁদের মতে এ জগতের বিবর্তন যান্ত্রিক নিয়ম অনুসারেই সাধিত হচ্ছে; এর মূলে উদ্দেশ্য বা পরিণামের অস্তিত্ব নেই। প্রকৃতিবাদ ঈশ্বরের অস্তিত্ব, ইচ্ছার স্বাধীনতা, আত্মার অমরত্ব এবং অলৌকিক বিষয়-বস্তুর অস্তিত্ব স্বীকার করে না।

৫। নিম্নতর এবং উচ্চতর প্রকৃতিবাদ (The Lower and the Higher Naturalism):

প্রিংগল্ পেটিসন (*Pringle Pattison*) তাঁর 'Idea of God' গ্রন্থে নিম্নতর এবং উচ্চতর প্রকৃতিবাদ সম্পর্কে এক মনোজ্ঞ আলোচনা করেছেন। প্রকৃতিবাদের আলোচনা প্রসঙ্গে তাঁর অভিমত সংক্ষেপে আমরা এখানে আলোচনা করব।

প্রিংগল পেটিসন বলেন যে প্রকৃতি শব্দটি সুনির্দিষ্ট অর্থবোধক শব্দ নয়, অর্থাৎ শব্দটি দ্ব্যর্থক এবং প্রকৃতিবাদও তাই, কারণ প্রকৃতিবাদ (naturalism) শব্দটির উৎপত্তি 'প্রকৃতি' (nature) থেকেই। প্রকৃতি অনুযায়ী জীবন যাপন বলতে বিভিন্ন দর্শন সম্প্রদায় এবং দার্শনিক ভিন্ন ভিন্ন ভাবে তাকে ব্যাখ্যা করেছেন। যেমন স্টোয়িক সম্প্রদায়-এর মতে প্রকৃতি অনুযায়ী জীবন যাপন হল সমাজের মধ্যে থেকে বিচারবুদ্ধির সহায়তায় জীবন যাপন, মানবিক ভ্রাতৃত্বের কথা স্মরণ রেখে সৎভাবে জীবন যাপন। তাঁদের মতে সাধুতা ও কর্তব্যনিষ্ঠাই হবে জীবনের পরম লক্ষ্য। সিনিক (Cynic)-দের মতে

বিভিন্ন দার্শনিকের দৃষ্টিতে প্রকৃতিবাদ

প্রকৃতি অনুযায়ী জীবন যাপনের অর্থ হল আইন এবং সমাজের রীতিনীতির নিয়ন্ত্রণকে অগ্রাহ্য করে প্রকৃতির মুক্ত উদার অঙ্গনে বিহার করা, সভ্য সমাজের আদব কায়দাকে অগ্রাহ্য করা, সমাজের প্রশংসা ও নিন্দাকে তুচ্ছ জ্ঞান করা। অষ্টাদশ শতাব্দীর আবেগবাদীরা (sentimentalists) 'প্রকৃতির রাজ্যে ফিরে যাও' বুঝতে প্রকৃতির সঙ্গে সভ্যতার বিরোধিতাকে স্বীকার করে নিয়ে আদিম যুগের প্রকৃতির রাজ্যে বিচরণ করাকে বুঝতেন। নীটসে (*Nietzsche*) প্রকৃতির রাজ্যে ফিরে যাও বলতে বুঝতেন সব স্বীকৃত নৈতিকতা এবং ধর্মের উপর বিদ্রোহ ঘোষণা। তাঁর দৃষ্টিতে ধর্ম এবং নৈতিকতা ভ্রান্তির বিষয়; যা কিছু সহজাত প্রবৃত্তিমূলক, তাই ভাল।

দর্শনে প্রকৃতিবাদ বলতে সেই মতবাদকে বোঝায় যে মতবাদ অনুসারে মানব এবং অ-মানবিক প্রকৃতি (non-human nature)-র মধ্যে এক নিরবচ্ছিন্নতা (continuity) বর্তমান। অ-মানবিক প্রকৃতি থেকেই মানবের উদ্ভব। মানব এবং প্রকৃতির মধ্যে পার্থক্যকে পুরোপুরি অগ্রাহ্য করা না হলেও এদের মধ্যে যে পার্থক্য বর্তমান, তা নিতান্তই তুচ্ছ। জাগতিক শক্তির ক্রিয়ার ক্ষেত্রে মানব জীবনের ভূমিকা

এবং গুরুত্বের বিষয়টি এই মতবাদ অস্বীকার করে। মানব-চেতনা বিশ্বজগতে নিছক একটা ঘটনা মাত্র, একটা আকস্মিক কিছু। জগতের মৌলিক প্রকৃতি সম্পর্কে এই মানবচেতনা কোন আলোকপাত করে না। এর আবির্ভাব ঘটে, এর তিরোধান ঘটে; বস্তুর ভৌতিক ভিত্তি (physical basis) অপরিবর্তনীয় থেকে যায়। প্রিংগল্ পেটিসন্ তাই মনে করেন যে যাকে জড়বাদ (materialism) রূপে অভিহিত করা হয়, প্রকৃতিবাদ, কোন কোন দিক থেকে তারই পরিবর্তে ব্যবহৃত একটি শব্দ, যেটি জড়বাদের তুলনায় ব্যাপকতর শব্দ। তবে কিছুটা আলগাভাবে কথাটি ব্যবহৃত হয়।

ওয়ালেসের মন্তব্য

প্রকৃতিবাদ বিশ্বজগত সম্পর্কে একটা দার্শনিক মতবাদরূপেই উপস্থাপিত হয়। কিন্তু অধ্যাপক ওয়ালেস (*Wallace*) প্রকৃতিবাদের এই জাতীয় ব্যবহারের বিরুদ্ধে আপত্তি জানিয়েছেন। তিনি যা বলতে চান তা হল, যা প্রমাণ করা যায় তাকে স্বীকার করে নেওয়ার এবং এই বিশ্বজগৎ সম্পর্কে যে সব স্বীকৃত সত্য আছে তাদের মেনে নেওয়ার আকাঙ্ক্ষা থেকেই প্রকৃতিবাদের উদ্ভব। অলৌকিকতার ভুল ভ্রান্তির প্রতিক্রিয়া থেকেই প্রকৃতিবাদের উদ্ভব। তিনি বলেন, "সুরুতে প্রকৃতিবাদ যে নিছক অলৌকিকতাবাদকে বাতিল করে দিতে চায় বা তার বিরোধিতা করে তা নয়। যে অলৌকিকতা অসংগতিপূর্ণ, শৃঙ্খলাবর্জিত এবং খেয়াল খুশীর পরিণতি, তারই বিরোধিতা করে প্রকৃতিবাদ। প্রকৃতিবাদ বিশেষ প্রত্যাদেশ (special revelation)-কে মেনে নিতে চায় না।" ওয়ালেস প্রকৃতিবাদের মূল ধারণাকে যথাযথ বলে স্বীকার করেছেন। তিনি মনে করেন যে প্রকৃতিবাদ বিজ্ঞানের বিশ্বাসের প্রতি সমর্থন জানায়। এই বিশ্বাস হল, যুক্তি এবং নিয়মের দ্বারাই এই জগৎকে বুঝে নিতে হবে।

দর্শনে প্রকৃতিবাদ

নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে এইসব ধারণাই প্রকৃতিবাদের প্রাণশক্তি যুগিয়ে দেয়। প্রকৃতিবাদ দাবী করে যে মানুষের জাগ্রত বিচারবুদ্ধি সব ঘটনা এবং অস্তিত্বশীল বিষয়কে প্রাকৃতিক কারণের সাহায্যে ব্যাখ্যা করতে চায়, সব ঘটনা এবং অস্তিত্বশীল সত্তাকে, এক সুশৃঙ্খল পরিবর্তন প্রক্রিয়ার পথে, বিভিন্ন স্তর বলে গণ্য করে। কোন রকম অসুবিধা দেখা দিলেই কোন অতীন্দ্রিয় সত্তার বা কর্মকর্তার সহায়তায় সেইগুলিকে ব্যাখ্যার জন্য সচেষ্ট হয় না বা বিশেষ সৃষ্টিবাদের (theory of special creation) সাহায্যে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করে না। ধর্ম-বিজ্ঞান, যতদূর সম্ভব সেই ঈশ্বরের ধারণাকে বর্জন করেছে যে ঈশ্বর মাঝে মাঝে স্বাভাবিক জাগতিক ঘটনার ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ করে নিজের অস্তিত্বটুকু জাহির করেন। ঈশ্বরের ধারণা

নিম্নতর প্রকৃতিবাদ

মাত্রই নিয়ম বা সংহতি—এইরকম ধারণার কোন স্থান দর্শনে নেই। প্রকৃতিবাদ প্রাকৃতিক প্রক্রিয়ার মধ্যে যে নিরবচ্ছিন্নতা বর্তমান তার উপর গুরুত্ব আরোপ করে। প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত এই যুগে, প্রকৃতিবাদ প্রাকৃতিক প্রক্রিয়ার যে নিরবচ্ছিন্নতার কথা বলে, তা একটা বিশেষ গুরুত্ব লাভ করে। কিন্তু নিরবচ্ছিন্নতার বিষয়টির প্রতি যেমন বৈজ্ঞানিকের আগ্রহ রয়েছে, তেমনি রয়েছে দার্শনিকের আগ্রহ। আমাদের জ্ঞানের সংহতি সাধনের পক্ষে এই ধারণাটি একটি ক্রিয়ামূলক নীতি বা পূর্ব ধারণা। কাজেই যদি কোন ভাববাদী দার্শনিক প্রকৃতিবাদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ উত্থাপন করেন, সেটা করেন এই প্রকৃতিবাদের উপরোক্ত ব্যাখ্যার জন্য নয়। বরং সাধারণ প্রকৃতিবাদ 'প্রকৃতিকে' অসংগতভাবে সংকীর্ণ অর্থে গ্রহণ করেছে এবং ঘটনার ব্যাখ্যা দেওয়ার সময় ভ্রান্ত ধারণাকে গ্রহণ করেছে যার ফলে প্রকৃতিবাদ যথার্থ পার্থক্য বা স্বাতন্ত্র্যের বিষয়গুলিকে অস্বীকার করেছে বা তাদের ব্যাখ্যা না করে এড়িয়ে যেতে সচেষ্ট হয়েছে। একেই প্রিংগল্ পেটিসন্ নিম্নতর প্রকৃতিবাদ (lower naturalism) বলে অভিহিত করেছেন।

নিম্নতর প্রকৃতিবাদের ত্রুটি হল যে, যে প্রকৃতিবাদ মানুষকে প্রকৃতি থেকে উদ্ভূত বলে ধারণা করেছে সেই মতবাদ কিন্তু মানুষের থেকে নিম্নতর সত্তা যে প্রকৃতি তার সঙ্গে মানুষকে মিশিয়ে দেবার চেষ্টা করেছে। প্রকৃতির মধ্যে গুণগত পার্থক্যের মাত্রা বর্তমান এবং এটা মেনে নিলে প্রকৃতির প্রকৃতি হিসেবে বৈশিষ্ট্যের হানি ঘটে না। আসলে নিরবচ্ছিন্নতার নীতিটির ভুল ব্যাখ্যা দেওয়া হয় যদি মনে করা হয় যে প্রকৃতির সব ঘটনাকে একই ধরনের ঘটনাতে রূপান্তরিত করা যায়। যে প্রকৃতিবাদ এই জাতীয় প্রচেষ্টা থেকে বিরত তাকে প্রিংগল্ পেটিসন **উচ্চতর প্রকৃতিবাদ** (higher naturalism) বলে অভিহিত করেছেন। উচ্চতর প্রকৃতিবাদ সব ঘটনাকেই একই ধরনের ঘটনাতে রূপান্তরিত করতে সচেষ্ট হয় না, যেখানে পার্থক্য দেখে সেখানে পার্থক্যকে উপেক্ষা করে না। উচ্চতর প্রকৃতিবাদ সেই পার্থক্যকে স্বীকার করে নেয় এবং মনে করে না যে, এই পার্থক্যকে স্বীকার করে নেওয়ার জন্য প্রকৃতির প্রক্রিয়ার কোন একটি স্তরের সঙ্গে অপর একটি স্তরের মধ্যে কোন ফাঁক তৈরি করা হচ্ছে—যে ফাঁক বোঝাতে হলে অতীন্দ্রিয় বিষয়ের সহায়তার প্রয়োজন দেখা দেবে।

উচ্চতর প্রকৃতিবাদ

প্রকৃতিবাদের ব্যাখ্যা অর্থাৎ বিজ্ঞানের ব্যাখ্যা এবং দার্শনিক ব্যাখ্যা—এই দুই-এর মধ্যে মৌলিক পার্থক্য আছে। বিজ্ঞানের ব্যাখ্যা বলতে বোঝায় কোন ঘটনা ঘটবার শর্তগুলিকে বিবৃত করা। এই কার্যকারণ ব্যাখ্যার ধরন হল, যে ঘটনাটি ঘটেছে তার পূর্ববর্তী ঘটনাগুলি আবিষ্কার করা, যে ঘটনাগুলিকে পরবর্তী ঘটনাটি অনুসরণ

করে, বা যার উপরে নির্ভর। এই অর্থে ব্যাখ্যা হল পরবর্তী ঘটনাকে পূর্ববর্তী ঘটনার সাহায্যে ব্যাখ্যা করা। কিন্তু লক্ষ্য করার বিষয় এই যে, এই জাতীয় ব্যাখ্যা শেষ পর্যন্ত পর্যবসিত হয় কিভাবে বিষয় ঘটে তার বর্ণনাতে বা সত্তার আচরণের বৈশিষ্ট্যমূলক ধরনগুলির বর্ণনাতে। আচরণের এই মৌলিক ধরণগুলি (these ultimate modes of behaviour)-কে স্বীকার করে নিতে হয়। কিন্তু এভাবে আচরণের মৌলিক ধরনগুলিকে স্বীকার করে নিলে এবং বর্ণনা করলে, শুধুমাত্র পূর্ববর্তী ঘটনার সাহায্যে ঘটনাকে ব্যাখ্যা করার ক্ষেত্রে অন্য এক অসুবিধা দেখা দেয়। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এই জাতীয় পদ্ধতি প্রয়োগের ক্ষেত্রে কোন অসুবিধা নেই, কারণ এখানে ঘটনাগুলি সব এক ধরনের—জড় এবং গতির রূপান্তর। পরিবর্তন বা রূপান্তর থাকলেও, কোন অগ্রগতি নেই, নতুন কিছু নেই। কিন্তু জীববিজ্ঞানে যেখানে বেড়ে ওঠা বা বৃদ্ধির বিষয়টি হল মৌলিক বিষয়, অর্থাৎ যেখানে প্রকৃত বিবর্তনের বিষয় রয়েছে, সেখানে এই পদ্ধতি প্রয়োগ কি যথার্থ? যা অধিকতর বিকশিত তাকে কম বিকশিতের দ্বারা ব্যাখ্যা করা হলে অধিককে কমে রূপান্তরিত করা, অর্থাৎ কিনা, যাকে ব্যাখ্যা করতে হবে তাকে অস্বীকার করা হয়। এই পদ্ধতি প্রয়োগের মধ্যে এই ত্রুটি বা অসুবিধা নিহিত রয়েছে। এই অসুবিধা দেখা দেয় বিশেষ করে যখন এক ধরনের ঘটনা থেকে অন্য ধরনের ঘটনাতে আমরা অগ্রসর হই। যখন অজৈব প্রকৃতি থেকে জৈব সম্পর্কীয় ঘটনাতে বা প্রাণীর চেতনা থেকে মানুষের প্রত্যয়মূলক বিচারবুদ্ধি এবং আত্মসচেতনতার ঘটনাতে অগ্রসর হই।

বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার বৈশিষ্ট্য

উপরিউক্ত ব্যাখ্যার ত্রুটি

প্রাণ এবং আত্ম-সচেতনতা তাদের পূর্ববর্তী অবস্থা থেকে উদ্ভূত, যে পূর্ববর্তী অবস্থায় এই বৈশিষ্ট্যপূর্ণ গুণগুলির অস্তিত্ব নিরূপণ করা যায় না। কিন্তু যদি তাদের অজৈব এবং অ-বৌদ্ধিক বিষয়ের অধিক কিছু বলে গণ্য না করা হয়, যেগুলি হল তাদের পূর্ববর্তী বিষয়, তাহলে উপযুক্ত বা যুক্তিযুক্ত ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে এমন কথা বলা যাবে না। এ যেন একটি বিষয়কে সরল বিষয়ে রূপান্তরিত করে তাকে অন্যদের সমান স্তরে নিয়ে আসা। এই সরলীকরণের মধ্যে একটা বিমূর্তকরণের বিষয় রয়েছে। এটা হল, যে মূর্ত বিষয়টিকে ব্যাখ্যা করতে হবে, তার কিছু উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যকে অগ্রাহ্য করা। এই পদ্ধতি যথার্থ কার্য কারণ সম্পর্কীয় ব্যাখ্যা নয়। এই ব্যাখ্যার ত্রুটির ফলেই আমরা প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের গতিশীল কণা (moving particles)-গুলিকেই মৌলিক তত্ত্বরূপে গ্রহণ করতে বাধ্য হই।

প্রাণ এবং চেতনার ক্ষেত্রে এই ব্যাখ্যার অসুবিধা

প্রাণের ক্ষেত্রে এই ভ্রান্তিজনক ব্যাখ্যা অত্যন্ত নিপুণভাবে প্রয়োগ করা হয়েছে। ষোড়শ এবং সপ্তদশ শতাব্দীতে জড় থেকে প্রাণের উৎপত্তির বিষয়টিকে কেন্দ্র করে অনেক বিতর্ক দেখা দিয়েছে এবং তারপরে জৈব প্রক্রিয়াকে পদার্থবিদ্যাগত ও রসায়নগত পদের সহায্যে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা হয়েছে। প্রাণের বৈশিষ্ট্যগুলিকে অস্বীকার করার মধ্যে যে ধারণাটি বর্তমান তা হল যে, এইরূপ বৈশিষ্ট্যকে স্বীকার করার অর্থ প্রকৃতির নিরবচ্ছিন্নতার মধ্যে ফাঁক বা ছেদকে মেনে নেওয়া—এ হল প্রাণের বৈশিষ্ট্যকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে আধিবিদ্যক কার্যকারণ (metaphysical causation)-এর অস্তিত্বকে স্বীকার করে নেওয়া এবং এই ফাঁকটুকুকে ব্যাখ্যা করার জন্যই অনেক ধর্মবিজ্ঞানী 'বিশেষ ধরনের সৃষ্টি সম্পর্কীয় মতবাদের' প্রবর্তন করলেন। এইভাবে ঈশ্বরকে টেনে নিয়ে আসাতে প্রকৃতিবাদীদের সংশয় অনেক বেড়ে গেল এবং এর সঙ্গে যুক্ত হল প্রাণের যথার্থ ব্যাখ্যা দেবার অসুবিধা। কিন্তু নিছক জড় ও প্রাণের মধ্যে যে পার্থক্য তা অসংস্কারসম্পন্ন নিরপেক্ষ পর্যবেক্ষকদের কাছে বিশেষ গুরুত্ব লাভ করল এবং স্পেন্সার তাঁর 'Principles of Biology' গ্রন্থে স্পষ্টই স্বীকার করলেন যে, প্রাণকে নিছক পদার্থবিদ্যা ও রসায়ন শাস্ত্রসম্পর্কীয় ধারণার সাহায্যে ব্যাখ্যা করা চলে না।

জৈব প্রক্রিয়াকে পদার্থবিদ্যা ও রসায়ন-শাস্ত্রের সাহায্যে ব্যাখ্যা করার প্রচেষ্টা

প্রকৃতিতে এক ধরনের ঘটনা থেকে আর এক ধরনের ঘটনাতে রূপান্তরের বিষয়টি মিল (*Mill*) খোলাখুলিভাবে তাঁর 'লজিক' গ্রন্থে আলোচনা করেছেন এবং এই ঘটনাটি প্রকৃতপক্ষে বিজ্ঞানের ক্রমোচ্চ শ্রেণীবিভাগের ভিত্তিস্বরূপ। এর একটা গুরুত্বপূর্ণ দার্শনিক তাৎপর্য রয়েছে এবং 'সৃজনমূলক সংহতি' (creative synthesis)-র ধারণাটি সাম্প্রতিক আলোচনাতে একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করেছে।

অভিজ্ঞতায় যে নতুন বৈশিষ্ট্যগুলি দৃষ্টিপথে পড়ে, সেইগুলি সৃষ্টিমূলক সংহতির পরিণতি স্বরূপ। জীব বিজ্ঞানে 'epigenesis' শব্দটিও এই ধারণাই প্রকাশ করেছে। সংহতির একটি উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত যদি হয় প্রাণের আবির্ভাব, যাকে পূর্ববর্তী অবস্থাতে বিশ্লেষণ করা যায় না, তবু বৈজ্ঞানিকরা প্রকৃতির নিরবচ্ছিন্নতার ধারা বজায় রাখার জন্য ধর্মবিজ্ঞানের 'বিশেষ ধরনের সৃষ্টি সম্পর্কীয় মতবাদের' বিরোধিতা করে কেলাসন বা দানা বাঁধা (Crystallization)-র উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। কিন্তু দুটি ক্ষেত্রের মধ্যে পার্থক্য আছে। জড় অনবরতই দানা অবস্থায় থেকে দানা বাঁধা অবস্থাতে রূপান্তরিত হচ্ছে এবং পরীক্ষক উপযুক্ত অবস্থার সৃষ্টি করে অতি সহজেই পরিবর্তন

অজৈব অবস্থা থেকে জীবনের উৎপত্তির দৃষ্টান্ত প্রত্যক্ষ করা যায় না

সংঘটিত করতে পারেন কিন্তু প্রাণের ক্ষেত্রে এমন কোন দৃষ্টান্ত দেখান যাবে না যেখানে অজৈব অবস্থা থেকে জীবনের উৎপত্তি ঘটছে।

প্রিংগল্ পেটিসন বলেন যে, দর্শনে যে বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ সেটি হল দুই ধরনের ঘটনার অর্থাৎ জড় ও প্রাণের প্রকৃতির মধ্যে পার্থক্য। কখন একটি থেকে আর একটির উদ্ভব ঘটল বা কিভাবে ঘটল, কিভাবে একটির সঙ্গে আর একটি যুক্ত হল এই ঐতিহাসিক বিষয়টির উদ্ভবের তেমন কোন গুরুত্ব নেই। জড় ও প্রাণের মধ্যকার অন্তর্বর্তী স্তরগুলি যদি নিরূপণ করা যায়, তা হলেও এটা একটা ঘটনা হিসেবে খুব বৈশিষ্ট্যপূর্ণ যে, প্রাণের ক্ষেত্রে এক নতুন অস্তিত্বের স্তরে আমরা উপনীত হই যা পূর্ববর্তী অবস্থা থেকে গুণগত দিক থেকে স্বতন্ত্র। প্রাণ যে, যেসব জীব প্রাণবান, তাদের সামনে এক নতুন সম্ভাবনার স্তর উন্মুক্ত করে দিচ্ছে তাকে অস্বীকার করা চলে না।

এই পৃথিবীতে জীবনের বা প্রাণের সুরু কি ভাবে হল সেই প্রশ্নে দার্শনিক আগ্রহী নয়। আসলে বিজ্ঞান প্রাণের উৎপত্তির বিষয়টি নিয়ে তার অনুসন্ধান কার্যে অনেক সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে কিন্তু তার থেকে মনে হয় বিষয়টির ব্যাখ্যার পথে কোনও

দার্শনিকের কাছে কাল-পারম্পর্যের বিষয়টি অপ্রাসঙ্গিক

বড় রকমের ভুল ঘটেছে। দার্শনিকদের কাছে কাল-পারম্পর্যএর বিষয়টি অপ্রাসঙ্গিক বিষয়। দার্শনিক যে বিষয়ে আগ্রহী সেটি হল বিশ্বজগতের প্রকৃতি বা তার বিশেষ গঠন (character or essential structure)। দার্শনিক মনে করেন, বিশ্বজগতের এই প্রকৃতিকে জানা যাবে যদি আমরা বিশ্ব জগতের সমগ্র প্রকাশকে আমাদের দৃষ্টির সামনে তুলে ধরতে সচেষ্ট হই এবং তার প্রকাশমান বৈশিষ্ট্যগুলিকে তাদের অন্তর্নিহিত প্রকৃতি অনুসারে সংযুক্ত করি এবং তা করতে গিয়ে দেখা যাবে যে তা হল মূল্য বা উৎকর্ষের ক্রম অনুসারে সম্পর্ক (a relations according to a scale of value or worth)। কিন্তু প্রকৃতিতে, কালে কখন তার আবির্ভাব

কালগত পারম্পর্য মূল্যের উপর কোন আলোকপাত করতে পারে না

ঘটে সেই বিষয়টির উপর নির্ভর করে কোন একটি বিশেষ স্তরের আভ্যন্তরীণ প্রকৃতি বা মূল্য পরিবর্তিত হয় না, অর্থাৎ কালগত পারম্পর্য, মূল্যের উপর কোন আলোকপাত করতে পারে না। সেই কারণেই দার্শনিক কালের দিক থেকে কখন প্রাণের বা চেতনার আবির্ভাব ঘটেছে সেই প্রশ্নে উদাসীন। নতুন বৈশিষ্ট্য নিয়ে যার আবির্ভাব সেটি বিশ্বজগতের একটি প্রকাশ, এটাই দার্শনিকের কাছে বড় কথা।

লয়েড মর্গান (*Lloyd Morgan*) যখন অজৈব ও জৈব-এর মধ্যে কোন ফাঁক (hiatus)-এর ধারণাকে অদার্শনিক মনে করে বর্জন করতে চান এবং প্রাণ শক্তির

(vital force) ধারণাকে প্রকৃতির পরিচিত গণ্ডীর বহির্ভূত বলে গণ্য করেন তখন প্রিংগল্ পেটিসন তাঁকে সমর্থন করেন।

প্রাণবাদ অর্থে যদি মনে করা হয় যে সজীব জড়ের কিছু উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য আছে, যদি 'প্রাণ' (vital) শব্দটিকে কার্য-কারণ অর্থে ব্যবহার না করে বর্ণনামূলক অর্থে ব্যবহার করা হয় অর্থাৎ এক বিশেষ ধরনের আচরণকে ব্যাখ্যা করবার জন্য, যা প্রকৃতির আর কোথাও দৃষ্ট হয় না, এই অর্থে ব্যবহার করা হয় তাহলে পদের ঐ জাতীয় ব্যবহার দোষযুক্ত নয়। সেক্ষেত্রে লয়েড মর্গান মনে করেন যে, প্রাণশক্তি হবে অনেকটা মাধ্যাকর্ষণ শক্তির বা রাসায়নিক শক্তির মতন। কাজেই তিনি বলেন যে, যদি বিভিন্ন ক্ষেত্রে আমরা শক্তির কথা বলি তাহলে সেই শক্তিকে প্রকৃতির রাজ্যে এক অপরিচিতের অনধিকার প্রবেশ রূপে গণ্য করা যুক্তিযুক্ত হবে না, এক স্বয়ম্ভূ-কারণের বিচিত্র প্রকাশ (differential modes or manifestations of the Self-existent Cause) রূপে গণ্য করা যুক্তিযুক্ত হবে।

অধ্যাপক লয়েড মর্গান স্পেন্সার-এর ভাষাতেই তাঁর সিদ্ধান্তকে প্রকাশ করেছেন এবং তিনি বিজ্ঞান ও অধিবিদ্যার সম্পর্ক ব্যাখ্যা করতে গিয়ে যখন বলেন যে বিজ্ঞান অভিজ্ঞতার জগতকে নিয়ে এবং অধিবিদ্যা অতীন্দ্রিয় জগৎ নিয়ে আলোচনা করেন, তখন তার বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন করা যেতে পারে। কিন্তু প্রিংগল পেটিসন মনে করেন যে, তাঁর বক্তব্য অন্তর্বর্তীতা (immanence) এবং নিরবচ্ছিন্নতা (continuity), এই দুই দিক থেকে সমর্থনযোগ্য। তিনি মনে করেন যে, অধ্যাপক বোসাঙ্কয়েট (*Bosanquet*) যে-যুক্তি অধিবিদ্যার দিক থেকে তার গ্রন্থ 'The Bodily Basis of the Mind'-এ দিয়েছেন তা, লয়েড মর্গান বিজ্ঞানের দিক থেকে যে যুক্তি দিয়েছেন, তা প্রায়ই একই ধরনের। বোসাঙ্কয়েট মনে করেন চেতনার আবির্ভাব এবং আত্মার উদ্ভবের ক্ষেত্রে ঐ একই নীতি প্রয়োগ করা চলে। তিনি মনে করেন যে, যখন জড়বাদীরা বলেন যে, চেতনা হল জড় উপাদানের সংমিশ্রণের ফলস্বরূপ, তখন জড়বাদীরা যে সত্যটি নির্দেশ করেন তা হল যে, চেতন সত্তা তার পরিবেশের সঙ্গে বিশেষভাবে যুক্ত বা তার পরিবেশের উপর প্রতিষ্ঠিত, যে পরিবেশে বা যে পরিবেশ থেকে একটি ঐক্যের নীতিকে সে নিয়ে আসে। কাজেই আত্মার ধারণা করতে গিয়ে আমরা বলতে পারি এক সর্বনিরপেক্ষ সত্তা কিছু বাহ্য জটিল অবস্থা বা বিন্যাসের ক্ষেত্রে উৎকর্ষ আনয়ন করে। তিনি বলেন, কার্যকারণ সম্পর্ক বা অন্তর্বর্তীতা বলতে এছাড়া আর কি বোঝাতে পারে? এই মতবাদে, জড় বা অ-আধ্যাত্মিক বলে কিছু নেই। কেননা

লয়েড মর্গান ও বোসাঙ্কয়েটের অভিমত

প্রতীয়মান জগতের বিকাশের ক্ষেত্রে তা অজৈব, জৈব বা যৌক্তিক; যাই হোক না কেন, আসলে নিয়ম হল স্রোতের উৎস থেকে আরও উর্ধ্বে উঠতে হবে।

প্রিংগল্ পেটিসন বলেন যে, অন্য উদাহরণের সাহায্যেও এক ধরনের ঘটনা থেকে অন্য ধরনের ঘটনায়; বা এক স্তরের অভিজ্ঞতা থেকে অন্য স্তরের অভিজ্ঞতায় সংক্রমণের বিষয়টি ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। যেমন প্রাণীজগতের অর্ধ-নিষ্ক্রিয় প্রত্যক্ষণ এবং অনুষঙ্গ এবং মানুষের সুস্পষ্ট সক্রিয় প্রত্যয়মূলক বিচারবুদ্ধি। লক বলেন, প্রত্যয় বা সাধারণ ধারণা গঠন করার ব্যাপারে মানুষ এবং ইতর প্রাণীর মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য আছে। কিন্তু বিবর্তনবাদীরা হয়ত এটা অস্বীকার করবেন। প্রিংগল্ পেটিসন বলেন যে, বিবর্তন যদি কিছু প্রমাণ করে থাকে তা হল এই যে, এই দুই অবস্থার মধ্যে কোন গুণগত পার্থক্য নেই—আছে মাত্রাগত পার্থক্য।

কিন্তু প্রিংগল পেটিসন বলেন যে, দুই-এর মধ্যে যে গুণগত পার্থক্য আছে, তা কোন মতেই অস্বীকার করা চলে না। মানুষের মন মানসিক বিকাশের এক আদর্শ স্তর। প্রাণী-মন এই বিকাশের একটা বিশেষ স্তর অতিক্রম করতে পারলেই সেখানে পৌছতে পারবে, যদি মানসিক বিকাশের নিরবচ্ছিন্নতার বিষয়টি স্বীকার করে নেওয়া হয়।

প্রিংগল পেটিসনের অভিমত

কাজেই জগতের ইতিহাসের দুটি বৈশিষ্ট্য—একটি হল প্রক্রিয়ার নিরবচ্ছিন্নতা (continuity of the process) বা ছেদের অভাব এবং অপরটি হল যথার্থ বা প্রকৃত পার্থক্যের উন্মেষ (emergence of real differences)। দুটি বিষয়ই সুস্পষ্টভাবে মনে রাখতে হবে, একটি যেন অপরটিকে দুর্বোধ্য করে না তোলে। নিরবচ্ছিন্নতার মধ্যে ছেদ (break) একথা বললে মনে হতে পারে যে, অসঙ্গতিপূর্ণ উক্তি করা হচ্ছে, কিন্তু 'ছেদ' বলতে তিনি বলেন আমরা যেন প্রকৃতির মধ্যে বহিরাগত কোন কিছুর অনুপ্রবেশ ঘটেছে বলে মনে না করি। তা যদি মনে না করি তাহলে অধ্যাপক ওয়ালেস (*Wallace*) যখন বলেন যে, 'সব বিকাশের ক্ষেত্রেই ছেদ আছে, তবু নিরবচ্ছিন্নতা বজায় থাকে', তখন আর এই উক্তি অসঙ্গতিপূর্ণ মনে হয় না। কিন্তু এই ভাবে বলা হলে, বিকাশ রূপ প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে প্রকৃত পার্থক্যের বা পৃথক কিছুর উন্মেষ বা আবির্ভাবকে স্বীকার করে নিতে হবে, যখন পরিমাণ গুণে এবং মাত্রাগত পার্থক্য গুণগত পার্থক্যে রূপান্তরিত হবে।

নিরবচ্ছিন্নতা এবং প্রকৃত বা যথার্থ পার্থক্যের উন্মেষ

টিণ্ডেল (*Tyndale*) অভিমত প্রকাশ করেছিলেন যে, 'জড়ের মধ্যে সব পার্থিব জীবের সম্ভাবনা লুকিয়ে রয়েছে'। তাহলে কোলরিজের ভাষায় বলতে হয় যে, এটা

হল কিছু-কিছু না, সব কিছু, যা আমরা জানি সব কিছু করতে পারে। 'এই জাতীয় বর্ণনা সত্যই অর্থহীন।' প্রিংগল পেটিসন বলেন, পরবর্তী স্তর পূর্ব থেকেই আদি স্তরে উপস্থিত রয়েছে, একথা বলার অর্থ বিবর্তন-প্রক্রিয়ার যথার্থ প্রকৃতিকে উপেক্ষা করা। কেননা বিবর্তন প্রক্রিয়ার বিভিন্ন স্তরে যথার্থ পৃথক বস্তুর বা সত্তার উন্মেষ ঘটে এবং তা সুরু বা প্রারম্ভকে অতিক্রম করে যায়।

টিণ্ডেল-এর বক্তব্যের সমালোচনা

যদি আমরা মনে করি যে ভৌতিক, প্রাণ এবং চেতন সত্তা পরস্পর সংযুক্ত একই প্রক্রিয়ার বিভিন্ন স্তর, তাহলেই আমরা বলতে পারি যে, যা কিছু পরে আসবে তা ভৌতিকের মধ্যে সুপ্ত সম্ভাবনা (potentiality) রূপে বর্তমান। সুপ্ত সম্ভাবনায় দার্শনিক অর্থ হল সেই অন্তর্দৃষ্টি যা হল, কোন প্রক্রিয়ার ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে সমগ্র প্রক্রিয়াকে বিচার করে দেখতে হবে, যদি আমরা তার মধ্য দিয়ে প্রকাশমান সত্তার প্রকৃতিকে জানতে চাই। অন্য কথায়, প্রতিটি বিবর্তনের প্রক্রিয়াকে তার শেষ স্তরের পরিপ্রেক্ষিতে বুঝে নিতে হবে (every evolutionary process must be read in the light of its last term)। অ্যারিস্টটল উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য সম্পর্কীয় মতবাদ অর্থাৎ পরিণতিবাদ (Doctrine of the Telos or End)-কে যখন ব্যাখ্যার পক্ষে চরম নীতি বলে ঘোষণা করেছেন, তখন তার অন্তর্নিহিত অর্থ হল তাই যা উপরে ব্যক্ত করা হয়েছে।

অ্যারিস্টটলের পরিণতিবাদ

উচ্চতর সত্তাকে নিম্নতর সত্তার সাহায্যে ব্যাখ্যা করা দর্শনের দিক থেকে কখনও যুক্তিযুক্ত নয়[1]। পূর্বগ কখনও অনুগ-এর কারণ হতে পারে না, কারণ প্রকৃতিবাদ পূর্বগ বলতে মনে করে অনুগ থেকে বিচ্ছিন্ন করে যে পূর্বগ তাকে। এইভাবে ধারণা করলে পূর্বগ (উদাহরণস্বরূপ জড়, শক্তি)-র কোন যথার্থ অস্তিত্ব নেই, তারা এক বিশ্বজগতের অমূর্ত বিষয় (abstract aspects) হয়ে দাঁড়ায়। সব দার্শনিক ব্যাখ্যাই পরিণতির দিকে লক্ষ্য রেখে অগ্রসর হবে। সর্বশেষে অনুগকে দূরবর্তী পূর্বগ-এর সঙ্গে যুক্ত করলেই বিশ্বজগৎ এক, (one) কিংবা এক নয় আমরা বলতে পারব।

সব দার্শনিক ব্যাখ্যাই প্রকৃতি

প্রিংগল পেটিসন বলেন যে, যথার্থ এবং অযথার্থ দর্শনের মধ্যে প্রভেদ আছে। অযথার্থ দর্শন তার কাছে যে উপাদান উপস্থাপিত হয়, কেবলমাত্র তার একটা অংশের

1. "All explanation of the higher by the lower is philosophically a hysteron-proteron." —Pringle Pattison The Idea of God; Page 106.

উপর মনোনিবেশ করে এবং সমগ্রকে এমন একটা নীতির দ্বারা ব্যাখ্যা করে যা শুধুমাত্র তার অংশ বা পৃথক পৃথক স্তরগুলির ক্ষেত্রে ব্যাখ্যার পক্ষে উপযোগী। যথার্থ দর্শন অপর পক্ষে জীবনকে ধীর স্থির ভাবে প্রত্যক্ষ করে এবং তাকে সমগ্রভাবে প্রত্যক্ষ করে। কাজেই যথার্থ দর্শনের নীতি বাস্তবের প্রতিটি স্তরকেই ব্যাখ্যা করার উপযোগী হয়ে ওঠে যদি ঐ নীতির বিবর্তন ঘটে।

যথার্থ দর্শন ও অযথার্থ দর্শনের নীতি

৬। অজ্ঞেয়তাবাদী প্রকৃতিবাদ (Agnostic Naturalism) :

অজ্ঞেয়তাবাদী প্রকৃতিবাদীরা বিচারহীন প্রকৃতিবাদীদের মতন মতামত দেবার ব্যাপারে এতখানি অসংযত নয়। অজ্ঞেয়তাবাদীরা বলতে চান যে, পরমসত্তা অজ্ঞেয়, তাকে কিছুতেই জানা যায় না। জাগতিক বস্তু ও ঘটনাগুলিকে যেভাবে প্রত্যক্ষ করা যায় সেইটাই তাদের আসল স্বরূপ। এর অন্তরালে যদি কোন পরমসত্তা থাকে তাহলে তা মানুষের অজ্ঞেয়।

এই মতবাদ অনুযায়ী 'জড়' এবং 'আত্মা', এর কাউকে দ্রব্য হিসেবে জানা সম্ভব নয়। দ্রব্যরূপে উভয়ই আনুমানিক ধারণা মাত্র। পরমসত্তা যেহেতু অজ্ঞেয় এবং এই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগৎ প্রত্যক্ষগোচর, সেই হেতু জাগতিক ঘটনার সাহায্যেই এই বিশ্বকে ব্যাখ্যা করা যুক্তিযুক্ত। অলৌকিক বা অতি-প্রাকৃতিক বিষয়বস্তু মানুষের জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করতে অক্ষম এবং এর জ্ঞানও অর্থহীন। এই মতবাদের একজন সমর্থক হলেন হাক্সলে। তিনি চিন্তার রাজ্য থেকে সকল রকম অলৌকিকতাকে নির্বাসিত করার কথা বলেছেন। তাঁর মতে অলৌকিকতা হল একান্তই অর্থহীন এবং বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এই জাতীয় ধারণা কেবলমাত্র দুর্বোধ্যতা ও হতবুদ্ধিতা সৃষ্টি করে।

সমালোচনা (Criticism) : (ক) অজ্ঞেয়তাবাদী প্রকৃতিবাদের সমালোচনা করতে গিয়ে জেম্‌স ওয়ার্ড বলেছেন, "এই মতবাদ হল জড়কে বাদ দিয়ে জড়বাদ; এই মতবাদে জড়বাদের অধিকাংশ সিদ্ধান্তই বর্তমান, কেবলমাত্র তত্ত্বমূলক দিকটি ছাড়া।"[1] কাজেই জড়বাদীদের বিরুদ্ধে যেসব অভিযোগ আনা হয়েছে সেইগুলি অজ্ঞেয়তাবাদী প্রকৃতিবাদের বিরুদ্ধেও প্রযোজ্য।

(খ) এই মতানুসারে চিন্তার ক্ষেত্রে আধ্যাত্মিক ধারণার কোন মূল্য নেই। প্রকৃতিবাদ মনে করে এ বিশ্বজগতে শুধু জড়, গতি এবং যান্ত্রিক শক্তিই রয়েছে। যদি একথা বলা হয় যে, মানুষের চেতনার জগতে আধ্যাত্মিক ধারণাগুলি ক্রিয়াশীল, তাহলে

1. "Materialism without matter, materialism with most of its consequences but divested of metaphysics."

—J. Ward : Naturalism and Agnosticism, 3rd Ed. (1906). Vol. II ; Page 206.

তার উত্তরে এই মতবাদ বলবে যে মানুষের সঙ্গে যন্ত্রের কোন পার্থক্য নেই। মানুষ হল চেতনাযুক্ত স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র (conscious automaton)। ধাবমান গাড়ীর সঙ্গে তার ছায়ার যে সম্পর্ক মানুষের সঙ্গে চেতনার সম্বন্ধও সেরূপ। চেতনা হল একটা উপবস্তু (Epiphenomenon)। সেই কারণে সার্বিক চেতনাযুক্ত যে ঈশ্বরের অস্তিত্ব অনুমান করা হয় সে-ঈশ্বরও হচ্ছে একটা ছায়া মাত্র, যা এই বিশ্বজগতের গতিকে অনুগমন করছে।

(গ) অজ্ঞেয়তাবাদী প্রকৃতিবাদের যে কোনি মূল্য নেই তা নয়। এই মতবাদ যান্ত্রিকতাবাদকে স্বীকৃতি দিয়েছে এবং বিবর্তনবাদের প্রাকৃতিক নির্বাচনকে এর সংগঠন-মূলক নীতি হিসেবে গ্রহণ করেছে। বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যায় এর যথেষ্ট মূল্য আছে।

দার্শনিক মত হিসেবে অজ্ঞেয়তাবাদ অচল

মায়েল এডওয়ার্ডস্[1] (*Miall Edwards*)-এর মতে প্রকৃতিবাদ নির্দিষ্ট অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি হিসেবে মূল্যবান। কিন্তু মানুষের সমগ্র অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য দর্শন হিসেবে একে গ্রহণ করা যেতে পারে না, যেহেতু জীবনকে সম্পূর্ণভাবে ব্যাখ্যা করতে গেলে তাৎপর্য, মূল্য, উদ্দেশ্য, আদর্শ—এইগুলিকে বর্জন করা চলে না। মায়েল এডওয়ার্ডস্-এর কথায়, "বর্ণনার ক্ষেত্রেই এর সফলতা, মূল্যাবধারণের ক্ষেত্রে এ একেবারেই ব্যর্থ।"[2]

(ঘ) প্রকৃতিবাদ নিম্নতরের সহায়তায় উচ্চতরকে ব্যাখ্যা করে, যেমন এতে সামাজিক এবং মনস্তত্ত্বমূলক বিষয়কে জীববিদ্যার সাহায্যে ব্যাখ্যা করা হয়, আবার জীববিদ্যাকে ব্যাখ্যা করা হয় পদার্থবিদ্যা ও রসায়নবিদ্যার সহায়তায় এবং এইগুলিকে শেষ পর্যন্ত রূপান্তরিত করা হয় কতকগুলি সংখ্যামূলক সম্পর্কতে। কিন্তু এতে আদর্শমূলক বিজ্ঞান, সৌন্দর্যবিজ্ঞান, তর্কবিজ্ঞান ও ধর্মবিজ্ঞানের কোন মূল্য স্বীকৃতি লাভ করে না এবং শেষ পর্যন্ত এতে 'জগতের মর্মার্থের বিপুল ঐশ্বর্য পরমাণুর নৃত্যে বিলুপ্ত হয়ে যায়' ('The world's wealth of meaning is lost in the dance of atoms.')।

(ঙ) এই মতবাদ অনুযায়ী মন উপবস্তু (epiphenomenon) ছাড়া কিছুই নয়। কিন্তু মন যদি উপবস্তুই হয় তাহলে মনের প্রয়োজনীয়তা কি? তাছাড়া, প্রাকৃতিক নির্বাচন অনুযায়ী যা অপ্রয়োজনীয়, বিবর্তনের নিয়মানুসারে তা ধীরে ধীরে বিলুপ্ত

---

1. Miall Edwards; The Philosophy of Religion; Page 224.

2. "Its success lies in the sphere of description, it fails absolutely in the realm of valuation." —Ibid: page 225.

হয়ে যায়। দেহই যদি সব কাজ করতে সক্ষম তবে চেতনাযুক্ত মনের প্রয়োজন কি? বস্তুতঃ, দৈনন্দিন ঘটনাই এ মতবাদের অসারতা প্রমাণ করে। তাছাড়া, মানুষের আধ্যাত্মিক স্বভাবের যা বৈশিষ্ট্য—মানুষের স্বাধীনতা, চরিত্র, ব্যক্তিত্ব, কামনা, ইচ্ছা, আদর্শ—এ সকলই এই মতানুসারে হয়ে পড়ে অবান্তর ও অপ্রাসঙ্গিক।

(চ) অজ্ঞেয়তাবাদী প্রকৃতিবাদ ধর্মচেতনাকে অলীক মনে করে। মানুষের ধর্মচেতনা পরমকল্যাণ বা পরমার্থের বাস্তব অস্তিত্বকে স্বীকার করে নেয়। আমরা আগেই দেখেছি ধর্মকে উচ্চতর দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দেখলে এ হল সত্য, শিব ও সুন্দরের আরাধনা। কিন্তু প্রকৃতিবাদ এই সত্য, শিব ও সুন্দরকে কোন স্বীকৃতিই দেয় না। এর যান্ত্রিক জগৎ, তার নৈর্ব্যক্তিকতা এবং নিয়ন্ত্রিতবাদ মানুষের এ সকল পরম মূল্যকে একান্তই তুচ্ছ জ্ঞান করে। কিন্তু সত্য, শিব ও সুন্দর আকস্মিক উপবস্তু নয়, অণু-পরমাণুর যান্ত্রিক সংঘর্ষণের ফলে তাদের সৃষ্টি নয়। সত্য, শিব ও সুন্দর হল পরম সত্তার প্রকাশ। রাধাকৃষ্ণান-এর মতে লৌকিক জগৎ এবং অলৌকিক জগতের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। তিনি বলেন, 'অলৌকিক হল লৌকিকই—তবে তার পার্থক্য গভীরতায় এবং অসীমতায়। প্রকৃতি থেকে এ আলাদা কিছু নয়।"[1]

প্রকৃতিবাদ ধর্ম চেতনাকে স্বীকৃতি দেয় না

৭। ধর্মের মনঃসমীক্ষণমূলক বিচার (Psychoanalytical Examination of Religion) :

মনস্তত্ত্বমূলক প্রকৃতিবাদের সমর্থকবৃন্দ ও নব্য মনোবিজ্ঞানীর দল ধর্মবিশ্বাসের প্রকৃতি এবং উৎপত্তির মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যার সাহায্যে ধর্ম-চেতনার অবাস্তবতা প্রমাণ করতে চান। তাঁদের মতে ধর্মবিশ্বাস নির্জ্ঞান (Unconscious) মনের সৃষ্টি—এসব ধর্মবিশ্বাসের উৎস হিসেবে কোন বস্তুগত সত্তা নেই। ধর্মেতে মানুষের সঙ্গে ঈশ্বরের সংযোগ প্রতিষ্ঠিত হয়, এ বিশ্বাস ভ্রান্ত, কেননা ঈশ্বরের কোন অস্তিত্ব নেই। মনঃসমীক্ষণবিদ্‌দের মতে মানুষের জীবনে তার জন্মগত প্রবৃত্তি ও কামনারই আসল গুরুত্ব এবং বিচারবুদ্ধির কাজ এই প্রবৃত্তির ও কামনার কাজগুলিকে পরিপূর্ণ করা। কতকগুলি কাল্পনিক জীবকে কেন্দ্র করে যে ধর্মসম্পর্কীয় প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি, সেইগুলি আমাদের বুদ্ধিবৃত্তিশূন্য প্রকৃতির মনস্তত্ত্বমূলক ক্রিয়া। "ধর্ম হল কেবলমাত্র যৌন উল্লাসের অপপ্রকাশ" (A mere misrepresentation of sex ecstacy)। "ধর্মসম্পর্কীয় রহস্যময় অনুভূতি বিকৃত মনের অসুস্থ কামনার প্রক্ষেপণ" (The mystic

1. S. Radhakrisnan : An Idealistic View of Life ; page 58.

experiences are the projections of the morbid cravings of the psychologically perverted)। এ মতবাদের সমর্থক হলেন—ভুণ্ডট্ (*Wundt*), উইলিয়ম জেম্‌স (*William James*), স্টেনলে (*Stanley*), হল্ (*Hall*), স্টারবাক্ (*Starbuck*), লিউবা (*Leuba*), কাইস্ প্রেট্ (*Cyes Pratt*), ফ্রয়েড (*Freud*), ইয়ুঙ (*Juug*) ইত্যাদি মনোবিজ্ঞানীগণ।

জেম্‌স বলতে চান যে, আমাদের ধর্মসম্পর্কীয় চেতনা আসলে অচেতন বা নির্জ্ঞান মনেরই ব্যাপার। দুরখীম্ (*Emile Durkheim*)-এর মতে সমাজই ঈশ্বরের ধারণা মানুষের মনের উপর জোর করে চাপিয়ে দিয়েছে। লিউবা, তাঁর '*Psychological study of Religion*' নামক গ্রন্থে বলেন যে, 'ধর্মসম্পর্কীয় ব্যাপার হল নেহাত সামান্য ব্যাপার এবং অলীক বস্তু ছাড়া কিছুই নয়; মানুষের কথাই স্বর্গের আদেশবাণী বলে ভ্রম হয়।'

মনোবিজ্ঞানী ফ্রয়েড এবং ইয়ুঙ এই মতকে আরও অনেক দূর টেনে নিয়ে গেছেন। সিগমুণ্ড ফ্রয়েড (*Sigmund Freud*), যিনি মনঃসমীক্ষণের উদ্ভাবক, ধর্মের প্রকৃতি নিরূপণের ব্যাপারে বিশেষভাবে ব্রতী হয়েছিলেন। ধর্মীয় বিশ্বাসকে তিনি অলীক বলে গণ্য করতেন। তাঁর মতে ধর্মীয় বিশ্বাস হল মানুষের সবচেয়ে প্রাচীন, শক্তিশালী এবং সুদৃঢ় ইচ্ছার পরিপূর্ণতা ছাড়া কিছুই নয়।

ফ্রয়েড (*Freud*)-এর মতে মানুষের অবচেতন মনের অনেক অভিজ্ঞতাই অবদমিত হয়ে থাকে এবং পরোক্ষভাবে ছদ্মবেশে সে-সব অভিজ্ঞতা চেতনার স্তরে প্রবেশ করে। অবচেতন মনের এসব অভিজ্ঞতা স্বপ্নের মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ করে। স্বপ্ন হল আমাদের অপরিপূর্ণ ইচ্ছা যেগুলি আমরা চেতন মন থেকে বিতাড়িত করি, কিন্তু যেগুলি মানুষের মনের অবচেতন স্তরে বিরাজ করে। এই সকল ইচ্ছার উৎস মানুষের যৌনাকাঙ্ক্ষা। ফ্রয়েডের দৃষ্টিতে ধর্ম হল প্রকৃতির ভয়াবহ ঘটনা যেমন ভূমিকম্প, বন্যা, ঝড়, রোগ, মৃত্যু প্রভৃতির বিরুদ্ধে একধরনের মানসিক প্রতিরোধ। ফ্রয়েডের মতে এইসব ঘটনা বা শক্তির মাধ্যমে প্রকৃতি মানুষের কাছে ভয়াবহ, নিষ্ঠুর, অপ্রতিরোধী রূপে আবির্ভূত হয়। কিন্তু মানুষের কল্পনা প্রকৃতির এই শক্তিগুলিকে প্রাকৃতিক শক্তিরূপে গণ্য না করে, এই শক্তিগুলিকে কতকগুলি রহস্যময় ব্যক্তিগত (personal) শক্তিতে রূপান্তরিত করে। ফ্রয়েড বলেন, নৈর্ব্যক্তিক শক্তি এবং ঘটনার বিরুদ্ধে করার কিছু নেই, তারা সব সময়ই মানুষের থেকে অনেক দূরে অবস্থান করে। কিন্তু এই সব ঘটনা বা শক্তিকে নৈর্ব্যক্তিক মনে না করে যদি ব্যক্তিগত মনে করা হয়, যদি ভাবা যায় যে আমাদের মতন তারাও আবেগের

Freud-এর মতে ধর্মের স্বরূপ

অধিকারী, তাদের মনেও ক্রোধ জাগে তাহলে আর তেমন হতাশার ভাব জাগে না। যদি মনে করা হয় মৃত্যু মানুষের জীবনের স্বাভাবিক পরিণতি নয়, বরং কোন মন্দ ইচ্ছার নিষ্ঠুর ক্রিয়া, যদি মনে করা যায় যে প্রকৃতিতে আমাদের মতন সত্তার অস্তিত্ব আছে, যাদের আমরা নিয়ত আমাদের সমাজে দেখি, তাহলে আমরা স্বস্তি বোধ করি। অতিপ্রাকৃত বা অপার্থিব হলেও আমরা তেমন ভয় পাই না এবং আমাদের অসহায় উদ্বেগকে মনস্তাত্ত্বিক উপায়ে দূর করা যায় কিনা ভেবে দেখি। আমরা হয়তো সঙ্গে সঙ্গেই কোন প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারি না। তবে অসহায় হয়ে আমরা নিষ্ক্রিয়তার শিকার হয়ে পড়ি না। অন্ততঃপক্ষে আমরা প্রতিক্রিয়া করতে পারি। আমরা যে কোন প্রতিকারের ব্যবস্থা করতে পারি না, এটাও হয়ত সত্য নয়। আমাদের সমাজে বিরোধী শক্তির বিরুদ্ধে আমরা যে ভাবে প্রতিক্রিয়া করি এইসব ভয়ঙ্কর অতিমানবের ক্ষেত্রেও আমরা সেই জাতীয় প্রতিক্রিয়ার কথা চিন্তা করি।

প্রাকৃতিক ঘটনাতে ব্যক্তিত্ব আরোপ

'আমরা এদের সনির্বন্ধ অনুরোধ জানাতে পারি, এদের খুশী করতে পারি, এদের উৎকোচ প্রদান করতে পারি এবং এইভাবে এদের উপর প্রভাব বিস্তার করে এদের থেকে কিছু ক্ষমতা হরণ করে নিতে পারি। ইহুদী-খৃষ্টান ধর্মে এর সমাধান খোঁজা হয়েছে এক মহান পিতার কল্পনা করে, যিনি এক মহান শক্তিরূপে আমাদের রক্ষা করেন।

ফ্রয়েড-এর মতে ধর্ম হল সার্বিক স্নায়বিক পীড়া বা উন্মায়ু রোগ যা মানুষকে আবিষ্ট করে রেখেছে (the universal obsessional neurosis of humanity)। এই রোগ থেকে মুক্ত হওয়া সম্ভব হবে যদি মানুষ অলীকতার উপর নির্ভর না করে বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের উপর ভিত্তি করে এই রোগের মোকাবিলা করতে সচেষ্ট হয়।

'টোটেম এবং টেবু' (*Totem and Taboo*) গ্রন্থে ফ্রয়েড মানুষের ধর্মীয় জীবনের প্রচণ্ড আবেগগত তীব্রতা এবং তার সঙ্গে সংযুক্ত অপরাধবোধ এবং দেবতাদের নির্দেশ মান্য করার জন্য যে বাধ্যতাবোধ, তা ব্যাখ্যা করার জন্য [1]'ইডিপাস এষণা' (Oedipus Complex)-র গুরুত্বপূর্ণ ধারণাটির প্রবর্তন করেছেন। ইডিপাস এষণা বলতে ফ্রয়েড মনে করেন শিশুর অজানিতে পিতার প্রতি ঈর্ষা এবং মাতাকে আকাঙ্ক্ষা করা। তিনি মানুষের প্রাচীন-ইতিহাসে এমন একটি স্তরের কথা বলেছেন, যখন গোষ্ঠীর একক (unit) ছিল একটা 'আদিম দল' যা গঠিত হত পিতা, মাতা ও সন্তানকে নিয়ে। দলে পিতারই ছিল প্রাধান্য, স্ত্রীলোকদের উপর তাঁর ছিল একাধিপত্য এবং তার

1. গ্রীক কাহিনীতে ইডিপাস না জেনে পিতাকে হত্যা করে মাতাকে বিবাহ করেছিল।

সন্তানদের মধ্যে কেউ যদি তার ক্ষমতা বা অবস্থা সম্পর্কে কোন রকম অভিযোগ উত্থাপন করত তাহলে তাকে সঙ্গে সঙ্গে বিতাড়িত করা হত।

ফ্রয়েড প্রদত্ত ধর্মের উৎপত্তির ব্যাখ্যা

যখন সন্তানেরা দেখল যে একক ব্যক্তি হিসেবে পিতাকে পরাস্ত করা সহজ নয় তখন তারা একত্রিত হয়ে তাকে হত্যা করল। এই হল আদিম অপরাধ, পিতৃহত্যা—যা মানুষের মনে উত্তেজনার সৃষ্টি করেছে, যার থেকে জন্ম নিয়েছে, নৈতিক দিক থেকে নিষিদ্ধ বিবেচনা করে, মন্দ কার্য থেকে বিরত হওয়ার প্রবৃত্তি, টোটেমবাদ (totemism) এবং ধর্মের অন্যান্য বিষয়। কিন্তু পিতাকে হত্যা করার পর সন্তানদের মনে অনুতাপ জাগে। তারা দেখতে পায় যে সকলের পক্ষে পিতার স্থান গ্রহণ করা সম্ভব নয় এবং সংযমের প্রয়োজন রয়েছে। পিতৃ-হত্যাজাত বিধিনিষেধ এক নতুন নৈতিক কর্তৃপক্ষের সৃষ্টি করল যা নিষিদ্ধ আত্মীয়-কুটুম্বের সঙ্গে যৌনসংসর্গকে নিষিদ্ধ করল।

ফ্রয়েডের মতে 'ইডিপাস এষণা' এক সঠিক ঘটনা, কোন অলীক বিষয় নয়। ইডিপাস এষণার সঙ্গে ধর্ম সংযুক্ত হয়ে প্রতিটি ব্যক্তির মধ্যে নবরূপ গ্রহণ করল। ইডিপাস এষণার সঙ্গে ধর্মের এই সংযোগ থেকেই মানুষের মনে রহস্যময় ঈশ্বরের কর্তৃত্বের বিষয়টির সন্ধান পাওয়া যায় এবং তীব্র অপরাধবোধ, যা মানুষকে এই অলীক বিষয়ের কাছে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য করে, তার ব্যাখ্যাও পাওয়া যায়। ধর্ম হল যারা দমিত হয়েছে তাদের প্রত্যাবর্তন (return of the repressed)।

আদিম দল (primal horde)-এর ধারণাটি ফ্রয়েড ডারউইন এবং রবার্টসন স্মিথের কাছ থেকে গ্রহণ করেছিলেন কিন্তু এটি বর্তমানে নৃ-বিজ্ঞানীদের দ্বারা পরিত্যক্ত। 'ইডিপাস এষণার' উপর ফ্রয়েড যে গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন, বর্তমানে তাঁর অনেক অনুরাগী সব রকম ঘটনার ব্যাখ্যার ব্যাপারে তাকে তেমন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বলে গণ্য করেন না।

ইয়ুঙ (*Jung*) তাঁর 'Psychology of the Unconscious' গ্রন্থে বলেছেন যে, সমস্ত ধর্মবিশ্বাসের উৎপত্তি হল যৌন ইচ্ছা। এই ইচ্ছাগুলি দিবাস্বপ্ন ছাড়া আর কিছুই নয়। শিশু হল জাতির যৌন-জীবনের প্রতিমূর্তি। এই শিশু শৈশবে মাতা ও পিতার উপর একান্তভাবেই নির্ভর। মাতাপিতার স্মৃতি, শৈশবের কোমল অনুভূতি, অস্তিত্বশীল বিশ্বপিতার ধারণা এনে দেয়। ঈশ্বরের কল্পনা হল জাতির অবদমিত ইচ্ছার ফলস্বরূপ। ঈশ্বর অবচেতন মনের সৃষ্টি, যা নিছক কল্পনা ছাড়া কিছুই নয়।

সমালোচনা (Criticism):

(ক) ধর্মসম্পর্কীয় ধারণাকে অবচেতন মনের কামনায় রূপান্তরিত করার অর্থ ধর্মসম্পর্কীয় ধারণাকে অলীক প্রমাণ করা নয়। অর্থাৎ বিশ্বাসের মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা

তার সত্যতা বা মিথ্যাত্বকে প্রমাণ করে না, কারণ কোন বিষয়ের উৎপত্তি এবং সত্যতা—এ দুটি সম্পূর্ণ ভিন্ন।

(খ) নব্য মনোবিজ্ঞানীদের ধর্মসম্পর্কীয় অভিজ্ঞতার ব্যাখ্যা ধর্মসম্পর্কীয় অভিজ্ঞতাকে অলীক প্রমাণিত না করে, তার ব্যক্তিনিরপেক্ষ সত্যতাকেই প্রমাণ করে। তাঁদের মতে আমাদের কামনাই ধর্মসম্পর্কীয় ধারণাগুলি সৃষ্টি করে। কিন্তু একথা অস্বীকার করা যায় না যে, আমাদের ও বহির্জগতের মধ্যে যে ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া চলেছে তার ফলেই কামনা বাসনার সৃষ্টি হয় এবং একথাও অস্বীকার করা চলে না যে, জগতের যতটুকু আমাদের কাছে এই পারস্পরিক ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে প্রকাশিত হয় সেটুকু অলীক নয়, সত্যের যথার্থ প্রকাশ। জগতের সঙ্গে আমাদের কামনা-বাসনার যে পারস্পরিক ক্রিয়া তা জগতের অস্তিত্বই প্রমাণ করে। তবে তার অর্থ এই নয় যে, মানুষের যে কোন ইচ্ছারই সত্যতা আছে। বোসাঙ্কোয়েট-এর মতে আমাদের ক্ষিধে যেমন প্রমাণ করে দেয় যে খাদ্যের অস্তিত্ব আছে, ঈশ্বরের জন্য আমাদের সহজাত আকাজ্ক্ষা তেমনি প্রমাণ করে যে ঈশ্বরের অস্তিত্ব রয়েছে।

(গ) ফ্রয়েডের ধর্ম সম্পর্কীয় ব্যাখ্যাকে অনেক কঠিন সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয়েছে। ধর্মীয় বিশ্বাস যে মানুষের এক 'অসহায়জনক মনস্তাত্ত্বিক অবলম্বন' এবং অলীক চিন্তন, এটিকে সমর্থন করেছেন অনেক ব্যক্তি। তাঁদের মতে সাধারণতঃ ধর্ম বলতে যা বোঝায় তার ক্ষেত্রে ফ্রয়েডের ধারণা প্রযোজ্য হতে পারে। অভিজ্ঞতা-ভিত্তিক ধর্ম (empirical religion)-এর মধ্যে নানা উপাদানের এক বিভ্রান্তিকর মিশ্রণ দেখা দেয় এবং অনেকধর্মপ্রাণ ব্যক্তির ক্ষেত্রে ইচ্ছা পরিপূরণ যে এক উল্লেখযোগ্য বিষয়, তা অস্বীকার করা চলে না।

জন হিক ফ্রয়েডের ধর্মসম্পর্কীয় অভিমতের আলোচনা প্রসঙ্গে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেন যে, পিতার প্রতিরূপের কথা বলতে গিয়ে তিনি হয়ত ঈশ্বর কিভাবে মানুষের মনে তাঁর একটি ধারণা সৃষ্টি করে দেন তার কলাকৌশলের কথাই বলেছেন। ইহুদী-খ্রীষ্টান ধর্মে ঈশ্বরের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ককে পিতার সঙ্গে পুত্রের সম্পর্কের অনুরূপ বলে ঘোষণা করা হয়েছে। কাজেই এটা বিস্ময়জনক কিছু নয় যে, মানুষ ঈশ্বরকে স্বর্গীয় মহান পিতারূপে চিন্তা করবে এবং শিশুর পিতার উপর একান্ত নির্ভরতা এবং পরিবারের পরিবেশে ভালবাসা ও নিয়মনিষ্ঠার মধ্য দিয়ে শিশুর বড় হয়ে ওঠার পরিপ্রেক্ষিতে, মানুষ ঈশ্বর সম্পর্কে অবহিত হবে। যে মন এখনও পর্যন্ত প্রাকৃতিক ব্যাখ্যা দেবার ব্যাপারে তৈরি হয়ে ওঠেনি, সেই মনের ক্ষেত্রে মনস্তাত্ত্বিক ঘটনার ধর্মীয় এবং প্রাকৃতিক ব্যাখ্যা দুই-ই সম্ভব হতে পারে।

জন হিকস্ উপসংহারে বলেন যে, ধর্ম সম্পর্কে ফ্রয়েডীয় তত্ত্ব সত্য হলেও হতে পারে। কিন্তু সত্য বলে তাকে দেখান হয়নি বা তার সত্যতা প্রমাণিত হয়নি।

৮। প্রত্যক্ষবাদ (Positivism) ঃ

প্রত্যক্ষবাদ হল সেই দার্শনিক মতবাদ যে মতবাদ অনুসারে প্রত্যক্ষগোচর ঘটনা বা ক্রিয়ারই যথার্থ সত্যতা আছে। প্রত্যক্ষবাদী দার্শনিক অতীন্দ্রিয় বিষয়ের সত্যতা স্বীকার করে না। প্রত্যক্ষবাদের সঙ্গে ফরাসী দার্শনিক অগস্ত কোঁৎ (*August Comte*)-এর নামই বিশেষভাবে যুক্ত। তাঁর মতে যা কিছু প্রত্যক্ষ করা যায় তাই সত্য। আদি কারণ, পরমসত্তা প্রভৃতি অতীন্দ্রিয় বিষয়ের অনুসন্ধান কার্যের কোন সার্থকতা নেই। বাস্তব ঘটনা, বা প্রত্যক্ষগ্রাহ্য বিষয় অর্থাৎ বিষয়বস্তু আমাদের বাস্তব অভিজ্ঞতায় যেভাবে প্রকাশিত হয়, মানুষের উচিত তারই জ্ঞানে নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখা। প্রত্যক্ষগ্রাহ্য ঘটনার অন্তরালে বস্তুর আসল সত্তাকে জানার প্রচেষ্টা অর্থহীন। ঘটনার পারস্পরিক সম্বন্ধ এবং যে অনিবার্য পদ্ধতিতে ঘটনা ক্রিয়া করে তা আবিষ্কার করার কাজেই দর্শনের উচিত নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখা।

যা প্রত্যক্ষগোচর তারই অস্তিত্ব আছে

সমাজবিজ্ঞানেই কোঁৎ-এর সমধিক আগ্রহ ছিল এবং তিনি মনে করতেন যে মানব কল্যাণের জন্য সমাজবিজ্ঞানের আলোচনার ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির প্রয়োগ বাঞ্ছনীয়। প্রত্যক্ষবাদ মনে করে যে বিজ্ঞানই হল মানবচিন্তার সর্বোচ্চ স্তর বা চরম পরিণতি। বিজ্ঞান যে বিষয় নিয়ে আলোচনা করে তা সুনিশ্চিত, প্রয়োজনীয়, প্রত্যক্ষগ্রাহ্য। বিশেষ করে আমাদের সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে সর্বাঙ্গসুন্দর করে তোলার জন্য যা প্রয়োজন বিজ্ঞান তাই নিয়ে আলোচনা করে।

বিজ্ঞান মানব চিন্তার চরম পরিণতি

হিউমের সংশয়বাদ (scepticism) এবং কান্টের আবভাসিক ভাববাদ (phenomenalistic idealism) থেকেই কোঁতের প্রত্যক্ষবাদী দর্শনের উদ্ভব। তিনি হিউমের সঙ্গে একমত যে, ইন্দ্রিয়ের কাছে প্রতীয়মান বিষয়ই আমরা প্রত্যক্ষ করতে পারি। যে অবস্থায় ঘটনা ঘটে সেইগুলি প্রত্যক্ষ করে আমরা ঘটনা সম্পর্কীয় নিয়মগুলি প্রণয়ন করতে পারি। ঘটনার অন্তরালে কোন কারণ বা দ্রব্যকে আমরা জানতে পারি না। কোঁৎ-এর প্রত্যক্ষবাদ এবং হিউমের সংশয়বাদের মধ্যে পার্থক্য খুব অল্পই। সংবেদনের অজ্ঞাত কারণের জ্ঞান লাভ করা বা কান্টের ভাষায় 'বস্তু আসলে যা' (things in themselves) তার জ্ঞান লাভ

প্রত্যক্ষবাদের উৎস হিউমের সংশয়বাদ ও কান্টের আবভাসিক ভাববাদ

করার ব্যাপারে হিউমের মতন কোঁৎ-ও সংশয় প্রকাশ করেছেন। কিন্তু হিউমের তুলনায় কোঁৎ সুস্পষ্টভাবে প্রত্যক্ষ করতে পেরেছিলেন যে, বিজ্ঞান আমাদের অনেক জ্ঞান দিতে পারে। বিজ্ঞান আমাদের বলতে পারে কি ঘটেছে। বিজ্ঞান এমন নিয়ম প্রণয়ন করতে পারে যার সাহায্যে ভবিষ্যতের ঘটনা সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করা যেতে পারে। এই সব নিয়ম জানা থাকলে ভবিষ্যৎ সম্পর্কে পরিকল্পনা করা সম্ভব হয় এবং কোন কোন ক্ষেত্রে ঘটনার গতিপথ পরিবর্তিত করে আমরা আরও ভাল সমাজের পরিকল্পনা করতে পারি। যা আমরা জানতে পারি না সংশয়বাদীরা তাতেই মনোনিবেশ করেছেন। প্রত্যক্ষবাদীরা আমাদের সব জ্ঞানকে একত্র করে মানুষের উন্নতির জন্য ব্যবহার করতে বলেছেন।

সংবেদনের অজ্ঞাত কারণের জ্ঞান লাভ করা সম্ভব নয়

কোঁৎ-এর একটি মৌলিক মতবাদ হল তিন পর্যায়ের নীতি (Law of the three stages)—ধর্মসম্বন্ধীয়, তত্ত্ববিদ্যাসম্বন্ধীয় ও প্রত্যক্ষসম্বন্ধীয়। প্রথম স্তরে মানুষ সব বস্তুকে সজীব কল্পনা করে এবং মনে করে বস্তু নিজের ইচ্ছানুযায়ী ক্রিয়া করে। এই কারণে শক্তিশালী আত্মাগুলিকে প্রসন্ন করা দরকার। বিবর্তনের পরবর্তী স্তরে বহু দেববাদের আবির্ভাব এবং শেষ স্তরে একেশ্বরবাদের আবির্ভাব, যখন বহু দেবতার এক দেবতায় সমন্বয় ঘটে, যিনি সব কিছুকে নিয়ন্ত্রণ করেন।

তিন পর্যায়ের নীতি

দ্বিতীয় স্তর বা পর্যায় হল তত্ত্ববিদ্যার স্তর (metaphysical stage) যে স্তরে দেবতাকে বা আত্মাকে ব্যক্তিত্বসম্পন্ন সত্তা বা পুরুষরূপে কল্পনা না করে কতকগুলি অমূর্ত শক্তিতে পরিণত করা হয়। তৃতীয় এবং চরম স্তর বা পর্যায় হল প্রত্যক্ষের স্তর যখন বৈজ্ঞানিকরা ঘটনার নিয়ম প্রত্যক্ষ করাতেই নিজেদের নিয়োজিত করেন, কোন অদৃষ্ট এবং অজ্ঞাত আত্মা বা অমূর্ত শক্তিকে ঘটনার কারণরূপে অভিহিত করেন না। কোঁৎ-এর মতে বর্তমানে সমাজ বিভ্রান্ত। কেননা কিছু ব্যক্তি উপরিউক্ত কোন একটি স্তরের পরিপ্রেক্ষিতে এবং অপরেরা অন্য স্তরের পরিপ্রেক্ষিতে চিন্তা করছে। শৃঙ্খলা ও প্রগতি তখনই আসবে যখন মানুষের জীবনের এবং চিন্তার ভিত্তি হবে শেষ স্তর বা পর্যায় অর্থাৎ প্রত্যক্ষের পরিপ্রেক্ষিতে চিন্তা করা।

কোঁৎ-এর দৃষ্টিতে তার নিজের প্রত্যক্ষবাদই হল নীতিবিজ্ঞান, যাকে তিনি সব বিজ্ঞানের শীর্ষে স্থাপন করেন। মধ্যযুগে গীর্জা যে নৈতিক প্রামাণ্য ও শৃঙ্খলার সংরক্ষক ছিল, কোঁৎ তাকে সমর্থন করেন। তিনি মনে করেন যে গীর্জা অতীতে যে মূল্যের সংরক্ষণ করত, প্রত্যক্ষবাদ অবশ্যই সেই মূল্যের সংরক্ষণ করবে।

প্রত্যক্ষবাদই সব বিজ্ঞানের শীর্ষে

কোঁৎ-এর ধর্ম সম্বন্ধীয় দৃষ্টিভঙ্গি : কোঁৎ মানবতা ধর্মের পূজারী এবং সাধারণ ঈশ্বর পূজার পরিবর্তে মানবতার পূজার কথা উল্লেখ করেছেন। এই বৈজ্ঞানিক যুগে যা অতীন্দ্রিয় তাতে বিশ্বাস স্থাপন করা চলে না। প্রাক্-বৈজ্ঞানিক যুগে মানুষ অভিজ্ঞতামূলক তথ্য বা ঘটনাকে অতীন্দ্রিয় কারণের সাহায্যে ব্যাখ্যা করতে চাইত। কিন্তু সেই ব্যাখ্যা এই যুগে অচল। বর্তমান বৈজ্ঞানিক যুগে প্রত্যক্ষগোচর ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতাই একমাত্র বাস্তব সত্তা যার জ্ঞান লাভ করা সম্ভব। কাজেই সাধারণ ধর্মে যে ঈশ্বরের কথা বলা হয়, সেই ঈশ্বর অতীন্দ্রিয় সত্তা, তাতে বিশ্বাস স্থাপন করা সম্ভব নয়। কাজেই বাহ্য ঘটনার নিয়ামকরূপে ঘটনার আড়ালে অবস্থিত কোন ঈশ্বরের অস্তিত্ব কোঁৎ-এর পক্ষে স্বীকার করে নেওয়া সম্ভব নয়। ঘটনার নিয়ম প্রণয়ন করা প্রত্যক্ষবাদী বিজ্ঞানেরই কাজ।

মানবতার পূজাই ধর্ম

কিন্তু সেই কারণে ধর্মের প্রয়োজনকে অস্বীকার করা চলে না। মানুষ স্বভাবতঃ ধার্মিক, তাই ধর্মের প্রয়োজনীয়তা আছে। মানুষ যেহেতু অপূর্ণ সত্তা, সেইহেতু কোন পূর্ণ সত্তাকে উপাসনা না করে সে থাকতে পারে না। কাজেই অতীতে যে ঈশ্বরের প্রতি মানুষ তার আনুগত্য, শ্রদ্ধা ও ভক্তি প্রদর্শন করেছে তার একটা বিকল্পের প্রয়োজন আছে। ঈশ্বর এমন হওয়া দরকার যাকে প্রত্যক্ষগোচর অভিজ্ঞতার সহায়তায় প্রমাণ করা যেতে পারে। এই বিকল্প কোৎ খুঁজে পেলেন মানবতার (humanity) মধ্যে। কোঁৎ-এর মতে অভিজ্ঞতার জগতে মানুষ ছাড়া পূজা এবং শ্রদ্ধা পাবার আর কিছু নেই। কারণ অ-মানবীয় (non-human) প্রকৃতির মধ্যে নয়, মানুষের মধ্যেই সমস্ত সৎ গুণের সমাবেশ। বিশেষ কোন মানুষকে পূজা করা যেতে পারে না। ঈশ্বরের পরিবর্তে সমগ্র মানবতাই পূজা ও উপাসনার বস্তু। চিন্তন, ভাষা, আবেগ, বিশ্বাসের মাধ্যমে সব মানুষই পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত। কাজেই কোঁৎ এক মহান মানবতার ধারণায় উপনীত হলেন যে মানবতা হল জগতের সব মানুষের সমন্বয়। মানবতা বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিকে অতিক্রম করে যায়। যুগ থেকে যুগে এর অস্তিত্ব। সব মহান ব্যক্তি, যাঁরা মানুষের সেবা করেছেন, এই মানবতার অন্তর্ভুক্ত।

মানবতার আদর্শ ঈশ্বরের বিকল্প

প্রিংগল পেটিসন বলেন যে, কোঁৎ-এর এটা ছিল একটা অহঙ্কারের বিষয় যে, তাঁর ঈশ্বর অর্থাৎ মানবতা অধিবিদ্যার অমূর্ত দেবতার তুলনায় প্রত্যক্ষযোগ্য, বিজ্ঞানের বিষয়ের মতনই প্রমাণযোগ্য। এটি এমন একটা বিষয় যাকে মানুষের অনুধাবন করতে অসুবিধা হয় না। কিন্তু যেহেতু তিনি আঙ্গিক দৃষ্টিভঙ্গির উপর গুরুত্ব আরোপ করেন এবং এক রহস্যময়

প্রিংগল পেটিসনের মন্তব্য

সত্তায় (mystical body) ভবিষ্যৎ, বর্তমান এবং অতীতকে ঐক্যবদ্ধ করেন, আদর্শ মানবতা (ideal humanity) কোঁৎ এবং তার অনুগামীদের দৃষ্টিতে দেবতার রূপ এবং বৈশিষ্ট্য লাভ করেছে।

প্রিংগল পেটিসন বলেন যে, কোঁৎ-এর মানবতার ধারণা ঈশ্বরের ধারণার মতনই রহস্যময়। মানবতা হল ঐশ্বরিক সত্তার প্রকাশ এবং প্রকাশের মাধ্যম, যেমন ব্যক্তিবিশেষ হল কোন সম্প্রদায়ের প্রকাশ এবং প্রকাশের মাধ্যম।

কোঁৎ-এর মতে ধর্ম হল আমাদের অস্তিত্বের সমন্বয়মূলক আদর্শীকরণ (synthetic idealisation of our existence)। কিন্তু কোঁৎ-এর মতে বাস্তব মানবতা বহু ত্রুটিতে পরিপূর্ণ। কাজেই তাকে উপাসনা করা যায় না। একটা আদর্শ মানবতা (ideal humanity) আছে যা এই সব ত্রুটি থেকে মুক্ত। এই আদর্শ মানবতাই পূজা পাবার যথার্থ বস্তু। কোঁৎ-এর মতে বাস্তব মানবতাকে আদর্শ মানবতার আলোকে মহৎ করে তোলার জন্য সচেষ্ট হওয়া উচিত। কাজেই তাঁর মতে আদর্শ মানবতাই হল পূজার যথাযথ বস্তু। এই মানবতার উদ্দেশ্যে স্তবগান ও ধর্মীয় অনুষ্ঠান সম্পাদিত হওয়া প্রয়োজন।[1]

আদর্শ মানবতাই যথার্থ উপাসনার বিষয়

কোঁৎ ব্যক্তিগত অমরতায় বিশ্বাসী নন। আমাদের পরে যেসব ব্যক্তির আগমন ঘটবে, আমাদের প্রচেষ্টার জন্য যাদের জীবন উন্নত হবে, তাদের স্মৃতিতে আমরা বেঁচে থাকতে পারি। মানুষের স্মৃতিতে বেঁচে থাকা—এই অমরতায় কোঁৎ বিশ্বাসী। তিনি মৃত্যুর পরে কোন সনাতন আত্মার অস্তিত্বে বিশ্বাসী নন। যে অমরতায় তিনি বিশ্বাসী তা হল যৌথ অমরতা (corporate immortality)। যে-কোন ব্যক্তি, যত সামান্য ব্যক্তিই হোক না কেন এই অমরতা ভোগ করতে পারে। ব্যক্তি যদি জনকল্যাণের জন্য তার জীবন উৎসর্গ করে, তার প্রভাব দীর্ঘস্থায়ী হবে এবং মানবতার একজন অংশীদার হিসেবে তাকে গণ্য করা হবে। অমরতার এই ধারণা আত্মসুখবাদের কামনায় ব্যক্তিকে প্রণোদিত না করে বহুসুখবাদের কামনায় প্রণোদিত করে। ব্যক্তি আত্মপরিতৃপ্তির কথা চিন্তা না করে অপরের সেবার আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়।

ব্যক্তিগত অমরতা নয়, যৌথ অমরতার অস্তিত্ব আছে

ম্যাক্স প্লেঙ্ক (*Max Planc*) প্রত্যক্ষবাদী দর্শনের সমালোচনা করেছেন। প্রত্যক্ষ ইন্দ্রিয়-অভিজ্ঞতার অতীত কোন জগৎ সম্পর্কে আমরা কিছু জানতে পারি না বা এজাতীয় জগতের সঙ্গে আমাদের কোন সম্পর্ক নেই, প্লেঙ্ক এই অভিমত একেবারে বাতিল করে দেন।

ম্যাক্স প্লেঙ্ক-এর সমালোচনা

1. কোঁৎ মানবতাকে নারীর প্রতীকরূপে ধারণা করেছেন।

প্লেঙ্ক বলেন যে, বিজ্ঞানকেও আজ স্বীকার করে নিতে হয় যে আমাদের জ্ঞান প্রক্রিয়া থেকে স্বতন্ত্র এক বাস্তব বাহ্য জগতের অস্তিত্ব আছে, যদিও এই জগতকে প্রত্যক্ষভাবে জানা সম্ভব নয়। কিন্তু এই জগতকে পরোক্ষভাবে জানা যায়, এই জগতের পরিপূর্ণ জ্ঞানই মানুষের লক্ষ্য। কিন্তু এই লক্ষ্যকে কখনও বাস্তবে লাভ করা যাবে না। প্লেঙ্ক বলেন, এই বাহ্য জগতের স্বরূপকে জানতে গিয়ে বৈজ্ঞানিককে পরিমাপের (measurement) উপর নির্ভর করতে হয়। এইসব পরিমাপ করতে গিয়ে এবং সব প্রত্যক্ষণ ও পরীক্ষণের ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিককে প্রকল্প (hypothesis) রচনা করতে হয়, যে প্রকল্পগুলি এই বাহ্য জগতের স্বরূপ উদ্ঘাটন করতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করে। কাজেই বৈজ্ঞানিকের মন থেকেই বিজ্ঞানের উদ্ভব, একথা বলা যেতে পারে। সুতরাং বিজ্ঞানের আলোচনা যথার্থ বস্তুগত আলোচনা এবং তত্ত্ববিদ্যার আলোচনা নিরর্থক-একথা বলা যুক্তিসঙ্গত নয়। কোঁৎ (*Comte*) বিজ্ঞানকে অধিবিদ্যা বা তত্ত্ববিদ্যার উপরে স্থান দিয়ে, তত্ত্ববিদ্যা সম্পর্কে ভ্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করেছেন।

বৈজ্ঞানিক প্রকল্পের প্রয়োজনীয়তা

সমালোচনা: ধর্ম সম্পর্কে প্রত্যক্ষবাদীদের অভিমত ধর্মপ্রবণ ব্যক্তিকে পরিতৃপ্ত করতে পারে না। প্রত্যক্ষবাদীদের ধর্ম সম্পর্কীয় অভিমত সম্পর্কে বলা যেতে পারে যে, মানবতার ধর্ম ধর্মীয় জীবন ও অভিজ্ঞতার কিছু মূল্যকে সংরক্ষিত করে, এবং কোন ধর্মকে স্বীকার না করার তুলনায় এই দৃষ্টিভঙ্গি শ্রেয়।

কোঁৎ-এর ধর্ম সম্বন্ধীয় অভিমতের সমালোচনা

তবে অনেক ধর্মদার্শনিকই মনে করেন যে ঈশ্বরের অস্তিত্ব এবং আত্মার অমরতাকে সংশয়াতীতভাবে প্রমাণ করা না গেলেও, উভয় ধারণাকে একেবারে বাতিল করে দেওয়া যায় না। কাজেই কোঁৎ এর পক্ষে ঈশ্বরকে অমূর্ত ধারণা মনে করা এবং অমরতাকে কল্পনার বস্তু গণ্য করা এবং ঈশ্বরের ধারণাকে অস্বীকার করা যুক্তিসঙ্গত হয়নি। তাছাড়া আদর্শ মানবতাও ত কল্পনার বিষয়। মানুষ একনিষ্ঠভাবে কখনও নিজের মনের দ্বারা সৃষ্ট কাল্পনিক বিষয়কে উপাসনা করতে পারে না। নিছক আদর্শকে পূজা করে মানুষ তৃপ্ত হতে পারে না। নিছক আদর্শের উপাসনা মানুষের মধ্যে সত্যিকারের ধর্মীয় উদ্দীপনা সৃষ্টি করতে পারে না। ফ্লিন্ট (*Flint*) যথার্থ ই বলেছেন, 'আদর্শ কখনও দেবমূর্তি হতে পারে না' (Ideals cannot even be idols)।

আদর্শ মানবতা কল্পনার বিষয়

কোঁৎ অভিযোগ করেন যে গতানুগতিক ঈশ্বরতত্ত্বের ঈশ্বর এবং অধিবিদ্যা ঈশ্বরের পরিবর্তে যে প্রকৃতির কথা বলেন তা হল অমূর্ত এবং শূন্যগর্ভ পদ। তার উত্তরে বলা

যেতে পারে যে, সত্তাকে তার প্রকাশ থেকে বিচ্ছিন্ন করলে তা অজ্ঞাত সত্তার শূন্যগর্ভ অমূর্ততাতে পরিণত হয়। কিন্তু ঈশ্বরের ক্ষেত্রে ঈশ্বরকে তার প্রকাশ থেকে বিচ্ছিন্ন করার প্রয়োজন দেখা দেবে কেন? ঈশ্বরের প্রকাশের মধ্য দিয়েই আমরা ঈশ্বর সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করতে পারি। যেমন, একজন ব্যক্তির কথা ও কাজ থেকে তার চরিত্র আমরা জানতে পারি। কার্লাইল (*Carlyle*) বলেন, প্রকৃতি জ্ঞানী ব্যক্তিদের কাছে ঈশ্বরকে প্রকাশিত করে, মূর্খদের কাছ থেকে ঈশ্বরকে লুকিয়ে রাখে। যেসব দার্শনিক ঈশ্বরকে তাঁর প্রকাশ থেকে বিচ্ছিন্ন করে ঈশ্বরকে জানতে চান তারা ঐ মূর্খদের দলে। তাঁরা ঐভাবে ঈশ্বরকে জানতে না পেরে হয় ঈশ্বরের অস্তিত্ব অস্বীকার করেন বা মনে করেন ঈশ্বরকে জানা যায় না। আসলে জ্ঞান সম্পর্কে মিথ্যা আদর্শ ই মানুষকে বিপথগামী করে, প্রত্যক্ষবাদে আমরা তারই পরিচয় পাই।

কোঁৎ-এর পরম সত্তা হল আদর্শ মানবতা, কিন্তু মানবতা যেমন সীমিত এই পরম-সত্তাও সীমিত। সীমিত মানুষ সীমিত সত্তার উপাসনা করতে পারে না। একমাত্র অলীক সত্তা, যে সত্তা মানুষের চেয়ে উচ্চতর ও পবিত্রতর, মানুষের পূজ্য বস্তু হতে পারে। প্রকৃত ধর্ম ঈশ্বরের সঙ্গে মানুষের ব্যক্তিগত সংযোগ নির্দেশ করে। ধর্ম মৃত সাধু পুরুষ, বা বীর পুরুষ বা নৈর্ব্যক্তিক অর্থহীন আদর্শের পূজা নয়। তাছাড় কোঁৎ-এর মানবসত্তার সমন্বয়ও অসম্পূর্ণ। মানুষই এই জগতে একমাত্র সত্তা নয়, মানুষ ছাড়াও অ-মানবীয় প্রকৃতির অস্তিত্ব আছে, এই প্রকৃতি ছাড়া মানুষ বাঁচতে পারে না। কাজেই এই দুইয়ের মধ্যে আন্তর সম্পর্ক আছে, যাকে কোঁৎ স্বীকৃতি দেননি। কোৎ-এর মতে ঈশ্বর ইন্দ্রিয়াতীত বলে ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস করা যায় না। কিন্তু আদর্শ মানবতা কি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য? এও ত ইন্দ্রিয়াতীত। কাজেই একই কারণে আদর্শ মানবতার অস্তিত্বেও অবিশ্বাস করা চলে। আদর্শ মানবতা ধর্মে ঈশ্বরের স্থান গ্রহণ করতে পারে না। মানবতার ধর্ম মনুষ্য জাতির ভবিষ্যৎ-ধর্ম, কোঁৎ-এর এই স্বপ্নও সার্থকতা লাভ করেনি।

আদর্শ মানবতাও ইন্দ্রিয়াতীত বিষয়

৯। প্রত্যক্ষবাদ এবং অজ্ঞেয়তাবাদ (Positivism and Agnosticism):

অজ্ঞেয়তাবাদ অনুসারে মানুষ কেবল মাত্র প্রত্যক্ষগোচর ঘটনার অর্থাৎ বস্তু আমাদের কাছে যেভাবে প্রকাশিত হয় তার যথার্থ জ্ঞান লাভ করতে পারে। যা প্রত্যক্ষগোচর ঘটনার অতীত যেমন ঈশ্বর, অমরতা প্রভৃতি তাকে স্বীকারও করা চলে না, অস্বীকারও করা চলে না। কারণ এমন কোন প্রমাণ নেই যার ভিত্তিতে এই স্বীকার বা অস্বীকার করা যায়। যে দার্শনিক

অজ্ঞেয়তাবাদের স্বরূপ

চিন্তা এবং ধর্মীয় মনোভাব এই মতবাদের মাধ্যমে সূচিত হয়েছে, সংশয়বাদের (Scepticism) মতনই তা প্রাচীন তবে সংশয়বাদ সব জ্ঞানের যাথার্থ্যেই সংশয় প্রকাশ করে আর অজ্ঞেয়তাবাদ প্রত্যক্ষগোচর ঘটনাতেই জ্ঞানকে সীমাবদ্ধ রাখে।

অজ্ঞেয়তাবাদের সঙ্গে নাস্তিক দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য

অজ্ঞেয়তাবাদীর দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে নাস্তিকের দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য আছে। নাস্তিক ঈশ্বরের অস্তিত্বে অবিশ্বাসী, কিন্তু অজ্ঞেয়তাবাদ ঈশ্বরের নাস্তিত্বের কথা বলে না। অজ্ঞেয়তাবাদীদের মতে ঈশ্বরের অস্তিত্ব আছে, কিন্তু আমরা ঈশ্বরকে জানতে পারি না।

'অজ্ঞেয়তাবাদ' পদটি যদিও হাক্সলে (*Huxley*) প্রথমে ব্যবহার করেছেন তবু হারবার্ট স্পেন্সারের নামের সঙ্গেই এই মতবাদ বিশেষভাবে যুক্ত। স্পেন্সারের মতে জ্ঞান সম্পর্ক নির্ভর; কোন বস্তুকে জানা মানে হল সেটি অন্য বস্তুর সঙ্গে কিভাবে সম্পর্কযুক্ত, সেই সম্বন্ধের ভিত্তিতে লব্ধ আপেক্ষিক জ্ঞান। যা কিছু জ্ঞেয়, তা যে মন জ্ঞাতা, তার উপরে নির্ভর অর্থাৎ জ্ঞাতার সম্পর্ক নির্ভর, সেইহেতু আপেক্ষিক। চিন্তন, সম্বন্ধের অতিরিক্ত কিছু প্রকাশ করতে পারে না, কাজেই আমাদের বুদ্ধির প্রকৃতি থেকেই যে বিষয়টি অনুসৃত হচ্ছে, তাহল এই যে, অবভাসের অন্তরালে যে সত্তার অস্তিত্ব রয়েছে তা পরিপূর্ণভাবে এবং সর্বসময়ের জন্য আমাদের বুদ্ধির কাছে অনধিগম্য। হারবার্ট স্পেন্সার এক পরমসত্তার (Absolute) অস্তিত্ব স্বীকার করেন, যে পরমসত্তা অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয় (unknown and unknowable)। পরমসত্তা হল সর্বব্যাপক, অসীম, সর্বনিরপেক্ষ সত্তা। যেহেতু পরমসত্তা, সেইহেতু পরমসত্তা কোন কিছুর সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত নয়। কেননা পরমসত্তার বাইরে এমন কিছু নেই যার সঙ্গে সেই সম্পর্কযুক্ত হতে পারে। যা কিছু আপেক্ষিক ও শর্তযুক্ত পরমসত্তা তার বিরোধী। কোন কিছুকে জানার অর্থ তাকে অন্য বিষয়ের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত করা, তাকে সীমিত করা। সেই কারণে পরমসত্তাকে জানা যায় না।

হারবার্ট স্পেন্সারের পরমসত্তা অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয়

স্যার ই. আর. লেঙ্কেস্টার (*E. R. Lankestar*) বলেন যে, মানুষের জ্ঞানের সব সম্ভাবনাকে একটি বন্ধনীর মধ্যে আবদ্ধ করে সেই বন্ধনীর বাইরে আমরা 'x' নামক উৎপাদককে রেখে দিতে পারি, যে x হবে অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয় সম্ভাবনার প্রতিনিধিস্বরূপ, মানুষের কল্পনা যাকে সূচিত করার ব্যাপারে কখনও ক্লান্তি বোধ করবে না। প্রিংগল পেটিসন বলেন যে, একই উৎপাদক x-কে হারবার্ট স্পেন্সার ধর্মের ক্ষেত্রে অজ্ঞেয় সত্তারূপে উপাসনার বস্তু হিসেবে উপস্থিত করার প্রস্তাব করেছেন।

স্পেন্সার বলেন ধর্ম হল এ-যাবৎ অধিক বা কম মাত্রায় অ-ধর্মীয় কিছু (more or less irreligious) কেননা ধর্ম এযাবৎ ঘোষণা করে এসেছে যে, যা জ্ঞানকে অতিক্রম করে যায়, তার সম্পর্কে সে কিছু জ্ঞান দিতে পারে। আমাদের উপাসনার বস্তুতে, তিনি বলেন, কোন গুণ আরোপ করা থেকে আমরা বিরত থাকব। আমাদের কর্তব্য হবে, যার জন্য যা কিছু অস্তিত্বশীল, তাকে অজ্ঞেয় বলে গণ্য করা।

শুদ্ধ অজ্ঞেয়তাবাদ (Pure Agnosticism) অসংগতিপূর্ণ মতবাদ। স্পেন্সার তাঁর বক্তব্যকে প্রকাশ করতে গিয়ে যে শব্দসমষ্টি ব্যবহার করেছেন, বস্তুতঃ, সেই শব্দগুলিই তাঁর বক্তব্যের বিরোধিতা করেছে বলে প্রিংগল পেটিসন মনে করেন। যে শক্তি সকল অস্তিত্বের মধ্যে দিয়ে আমাদের কাছে প্রকাশমান (the power manifested to us through all existence)—এইভাবে অজ্ঞাত (unknowable)-কে বর্ণনা করা একান্তভাবেই অসংগতিপূর্ণ।

শুদ্ধ অজ্ঞেয়তাবাদ অসংগতিপূর্ণ

তাছাড়া অজ্ঞাত শক্তির পরিচয় দিতে গিয়ে স্পেন্সার বলেছেন যে, এই শক্তি জড়-জগতের বুদ্ধিগ্রাহ্য শৃঙ্খলা এবং বিন্যাসের মধ্য দিয়ে নিজেকে প্রকাশ করেছে। আমাদের চেতনার মধ্য দিয়েও তার প্রকাশ ঘটেছে, যা মানুষকে তার সব সামর্থ্য, প্রত্যাশা এবং বিশ্বাস-এর দ্বারা অনুপ্রাণিত করেছে, ধীরে ধীরে তাকে সভ্যতা এবং সত্যতার পথে চালিত করেছে। স্পেন্সার বলেছেন আমরা সব সময়ই এক অসীম এবং অনন্ত শক্তির সান্নিধ্যে রয়েছি, যে শক্তির দ্বারা সব কিছু সৃষ্ট এবং সংরক্ষিত। সহানুভূতিশীল ঈশ্বরবাদীরা স্পেন্সারকে অবশ্যই একজন আস্তিক বলে গণ্য করবে যখন তিনি বলেন, "আমি সব সময়ই বলে এসেছি যে অজ্ঞাত সত্তা হল পরম সত্তা—একমাত্র অস্তিত্বশীল সত্তা; চেতনার কাছে যা কিছু উপস্থিত হয়, তা হল তারই প্রকাশ"। 'অসীম এবং অনন্ত শক্তি আমাদের মধ্যে এবং আমাদের বাইরে সমান-ভাবে প্রকাশমান।' 'এই অসীম সত্তার ক্ষেত্রে শুধু যে তাঁর প্রকাশকেই আরোপ করতে পারি তা নয়, তাদের বিন্যাস বা শৃঙ্খলা যে নিয়মের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত তাকেও আরোপ করতে পারি।' স্পষ্টতঃই, এই সব উক্তি প্রমাণ করে যে অজ্ঞাত সত্তার অনেক সদর্থক বৈশিষ্ট্য তিনি স্বীকার করেছেন এবং এই সত্তাকে তিনি এমন ভাবে নিজের কাছে তুলে ধরেছেন যা মানুষের ধর্ম-সম্পর্কীয় আবেগকে পরিতৃপ্ত করতে পারবে।

স্পেন্সার অজ্ঞাত সত্তার নানাধরনের বর্ণনা দিয়েছেন

কিন্তু বিকৃত জ্ঞান সম্পর্কীয় মতবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়াতে, অজ্ঞাত সত্তা হয়ে উঠেছে এক শুদ্ধ অভাবাত্মক ধারণা (a negative conception)। এর অস্তিত্ব

সব কিছুর তুলনায় সব চেয়ে সুনিশ্চিত। কিন্তু তবু তিনি ঘোষণা করেন যে এর প্রকৃতি যে শুধুমাত্র অজ্ঞাত তা নয়, আমাদের বুদ্ধিকে বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে যে, তা প্রমাণ করে দেয় যে, এই সত্তা হল অজ্ঞেয় (unknowable)। নিজের বক্তব্যের উপসংহার টেনে দিতে গিয়ে তিনি শেষ পর্যন্ত বলেছেন যে, 'নিখুঁত ধর্মীয় চেতনা হল এক সর্বশক্তিমান শক্তির চেতনা, যার ক্ষেত্রে কোন গুণই আরোপ করা চলে না।'

প্রিংগল পেটিসন সমালোচনায় বলেন যে, এ হল বুদ্ধির বিকৃতি, কাজেই বিপথগামী বুদ্ধি এর বেশী আর কতদূর অগ্রসর হতে পারে?

স্পেন্সার যা স্বরূপতঃ অজ্ঞেয় এবং যাকে জেনে শেষ করা যায় না—এই দুই-এর পার্থক্য বুঝে উঠতে পারেন নি

প্রিংগল পেটিসন মন্তব্য করতে গিয়ে বলেন যে, স্পেন্সার যা স্বরূপতঃ অজ্ঞেয় এবং যা অজ্ঞাত (the inherently unknowable, and that of the unknown)—এই দুই-এর মধ্যে পার্থক্যকে বুঝে নেবার চেষ্টা করেননি। স্বরূপতঃ অজ্ঞেয় হল তাই যাকে কখনই জানা যাবে না এবং যা অজ্ঞাত বলতে বোঝায়, যাকে এখনও পরিপূর্ণভাবে জানা যায়নি, যাকে হয়ত কখনও পরিপূর্ণভাবে জানা যাবে না। তবে যতটুকু জানা গেছে তার থেকে আরও ভালভাবে জানা যাবে। হ্যামিলটন এই বিষয়টাকে এক জায়গায় ব্যক্ত করতে গিয়ে বলেছেন যে, মানুষের জ্ঞানের পরিণতি হল এই চেতনা যে, যাকে আমরা জানি, তা, যাকে আমরা জানি না, তার তুলনায় কিছুই নয় এবং হ্যামিলটনের এই উক্তিকে কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তিই অস্বীকার করতে পারবে না।

স্পেন্সারের ব্যবহৃত শব্দগুলিও দুর্বোধ্য। যখন তিনি বলেন যে, সব কিছুই এমন এক শক্তির প্রকাশ যা আমাদের জ্ঞানকে অতিক্রম করে যায় তখন 'যা আমাদের জ্ঞানকে অতিক্রম করে যায়' (that transcends our knowledge)—এর অর্থ দাঁড়াতে পারে, স্পেন্সারের মতবাদ অনুসারে, যা আমাদের জ্ঞানের পক্ষে পরিপূর্ণভাবে অনধিগম্য। আবার এর অর্থ হতে পারে যা আমাদের জ্ঞানকে ছাড়িয়ে যায় (that which overpasses our knowledge), সাধারণ মানুষের পক্ষে যাকে পরিপূর্ণভাবে জানা সম্ভব নয়। বুদ্ধির অনধিগম্য (inaccessible), আর বুদ্ধি যাকে জেনে শেষ করতে পারে না (inexhunstible)—এই দুই-এর মধ্যে পার্থক্য আছে। শেষের পদটির ক্ষেত্রে কোন দ্বৈত পদ নেই। এখানে শুধু একথাই বোঝায় যে এমন একটা শক্তি আছে যা স্বপ্রকাশ। কিন্তু তার প্রকাশকে পরিপূর্ণভাবে জেনে ওঠার বিষয়টি জ্ঞাতার ক্ষমতার দ্বারা সীমিত।

মিঃ হ্যারিসন (*Harrison*) যিনি ইংরেজ প্রত্যক্ষবাদীদের অগ্রগণ্য, ধর্মীয় বিশ্বাসের ভিত্তিরূপে অজ্ঞাত এবং অজ্ঞেয় সত্তার ধারণাকে উপহাস করেছেন। তিনি বলেছেন ধর্মের ক্ষেত্রে বিস্ময় এবং রহস্যের স্থান রয়েছে, তবে তার স্থান হল গৌণ। ধর্মের মূল নিহিত রয়েছে ভালবাসাতে, শ্রদ্ধাতে, সহানুভূতিতে, কৃতজ্ঞতাতে, নিজেকে ছোট এবং পরনির্ভর মনে করাতে, নিয়ন্ত্রণ মেনে নেওয়াতে, উদ্দেশ্যের প্রকাশেতে এবং ঈশ্বরের মহত্ত্ব ও মহিমার প্রতি শ্রদ্ধা এবং ভক্তি জানানোতে। যেখানে এসব নেই, সেখানে ধর্মও নেই।

মিঃ হ্যারিসনের আসল উদ্দেশ্য হল একজন সৎ প্রত্যক্ষবাদী হিসেবে মানবতার ধর্মকে ভবিষ্যতের ধর্মরূপে নির্দেশ করা। কিন্তু স্যার জেমস্ স্টেপহেন (*Stephen*) উপাহাসচ্ছলে ঘোষণা করলেন যে, মানবতা বা Humanity হল বড় অক্ষরের 'H' এবং অজ্ঞেয় (unknowable), যাকে বড় অক্ষরের U দিয়ে চিহ্নিত করা যায়, তার তুলনায় ঈশ্বর হবার পক্ষে কম বা বেশী উপযোগী নয়। প্রত্যেকটিই হল এক শূন্যগর্ভ অমূর্ততা, যাতে, যার যা খুশী সেই অর্থ আরোপ করা যেতে পারে।

প্রিংগল পেটিসন বলেন যে স্যার জেমস্ স্টেপহেন-এর তুলনায়, অধিকতর সহানুভূতিশীল কোন নিরপেক্ষ দর্শক, যিনি ধর্মের উদ্দেশ্য এবং অনুভূতি সম্পর্কে ভাল-ভাবে অবহিত, এমন কথা বলতে পারেন যে উপরিউক্ত দুই ব্যক্তিই সত্যকে নিজেদের মধ্যে ভাগাভাগি করে নিযেছেন। মিঃ হ্যারিসন তাঁর বক্তব্যকে উপস্থাপিত করতে গিয়ে সঠিক কথাই বলেছেন যখন তিনি ধর্মের উপাদানগুলিকে ব্যক্ত করেছেন এবং সেই সব গুণের কথা উল্লেখ করেছেন যা আমাদের মনে কৃতজ্ঞতা, শ্রদ্ধা এবং ভালবাসা জাগিয়ে তোলে। স্পেন্সারও সঠিকভাবেই বলেছেন যে, যা অসীম বা পূর্ণ নয়, তার থেকে হীন কোন কিছুকে উপাসনা করা চলে না, এবং যেহেতু মানবতা হল সীমিত বস্তু, যা কালে বিকশিত হয়, তা কখনও ঈশ্বরের স্থান গ্রহণ করতে পারে না। স্পেন্সার বলেন যে শ্রদ্ধা এবং কৃতজ্ঞতা যদি ধর্মের দুটি প্রয়োজনীয় উপাদান হয় তাহলে তারা সেই পরম কারণ (Ultimate Cause)-এর ক্ষেত্রেই আরোপিত হতে পারে যার থেকে মানবতা, ব্যক্তিবিশেষ এবং সমগ্রভাবে অন্য সব কিছুই উদ্ভূত হয়েছে। সভ্য মানব সমাজ, বিবর্তনের পথে যা সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ উৎপাদিত বস্তু, তার সম্পর্কে যদি প্রশ্ন করা হয় যে, এর অপার বিস্ময়ের মূল কোথায়, তাহলে উত্তরে বলতে হবে সেই অজ্ঞাত কারণ থেকেই এর উদ্ভব, সমগ্র বিশ্ব যার প্রকাশ। বুদ্বুদ দেখে যে নদীর কথা ভুলে যায় সে কোঁৎ-এর শিষ্য হবার উপযুক্ত, কারণ তিনি মানবতার পূজা করতে গিয়ে সেই সৃজনমূলক শক্তির মহান প্রবাহকে বিস্মৃত হয়েছেন, মানবতা যার ক্ষণস্থায়ী সৃষ্টি মাত্র।

প্রিংগল পেটিসন বলেন যে, মানবতার উপাসনা এবং অজ্ঞেয় সত্তার উপাসনা, প্রতিটিই নিজ নিজ দিক থেকে অসমর্থনযোগ্য। উভয় মতবাদই অর্ধ-সত্য বা আংশিক সত্যকে প্রকাশ করেছে এবং তার থেকে তার প্রাণশক্তি সংগ্রহ করেছে। এই অর্ধ-সত্যের মূলে রয়েছে সত্তা এবং তার অবভাস—এই দুই-এর সম্পর্ককে বিকৃত করে, একে অপর থেকে দূরে বিচ্ছিন্ন করে রাখা।

অজ্ঞেয়তাবাদীদের মতে জড়, গতি, শক্তি, চেতনা এগুলি পরমসত্তার প্রকাশ, এবং এগুলিকেই আমরা জানতে পারি। পরমসত্তা অজ্ঞেয়। স্পেন্সারের অজ্ঞেয়তাবাদ এক ধরনের প্রত্যক্ষবাদ, তবে উগ্র ধরনের নয়। কারণ তিনি এক অজ্ঞেয় সত্তা স্বীকার করেন, যা কোঁৎ-এর মত প্রত্যক্ষবাদীও স্বীকার করতে নারাজ। হাক্সলে অজ্ঞেয়তাবাদ কথাটিকে ধর্মের দিক থেকে ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁর মতে যদিও আমরা ঈশ্বরের অস্তিত্ব অস্বীকার করতে পারি না, তবু তার যথার্থ স্বরূপ সম্পর্কে আমরা কিছুই জানতে পারি না। প্রত্যক্ষবাদীরা মনে করে আদর্শ মানবতা (Ideal humanity) হল ঈশ্বর এবং আদর্শ মানবতাকে জানা যায়। অজ্ঞেয়তাবাদীরা মনে করেন যে ঈশ্বরকে জানতে না পারলেও, আমরা ঈশ্বরের প্রকাশকে জানতে পারি। কিন্তু অজ্ঞেয়তাবাদীরা ভুলে যান যে ঈশ্বরের প্রকাশকে জানার অর্থ-ই হল ঈশ্বরকে জানা, সেক্ষেত্রে ঈশ্বরকে অজ্ঞাত বলা যুক্তিসঙ্গত নয়।

প্রত্যক্ষবাদের সঙ্গে অজ্ঞেয়তাবাদের পার্থক্য

স্পেন্সার পরমসত্তাকে অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয় বলেন। কিন্তু তাহলে স্পেন্সার কিভাবে জানলেন যে জড়, গতি, শক্তি ঐ অজ্ঞেয় পরমসত্তার প্রকাশ? জড়, গতি, শক্তি যে পরমসত্তার প্রকাশ, এ যদি জানা যায় তাহলে পরমসত্তা অজ্ঞেয় হন কিভাবে? প্রত্যক্ষবাদীরা মানবতাকেই ঈশ্বর গণ্য করে ভুল করেছেন এবং অজ্ঞেয়তাবাদীরা ভুলে গেছেন যে মানুষের মধ্যেই ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠ প্রকাশ। উভয়েই দুটি অর্ধসত্য প্রকাশ করেছেন—যে দুটিকে একত্রিত করলে আমরা উপাসনার যথার্থ বস্তু খুঁজে পাব। সেটি হল, ঈশ্বর এক পরমসত্তা যিনি জড়, গতি, শক্তি সকল কিছুর মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয়েছেন এবং মানুষের মধ্য দিয়ে তাঁর শ্রেষ্ঠ প্রকাশ ঘটেছে।

পরমসত্তা অজ্ঞেয় হতে পারে না

১০। ধর্মের মার্কসীয় ব্যাখ্যা (The Marxist Interpretation of Religion) :

ধর্মের প্রতি মার্কসবাদীরা বিরূপ মনোভাব পোষণ করেন। তাঁরা ইতিহাসের জড়বাদী ব্যাখ্যা দিয়েছেন। দৈহিক, মানসিক, সামাজিক সব ঘটনাই জড়াত্মক

উপাদান অর্থাৎ কিনা অর্থনৈতিক উপাদানের দ্বারা নির্ধারিত হয়। তাঁদের মতে জড়েরই একমাত্র সত্তা আছে, কোন অতীন্দ্রিয় সত্তার অস্তিত্ব নেই। স্বাভাবিক ভাবে মার্কসীয় দর্শন ধর্মীয় চেতনার অস্তিত্বকে স্বীকার করে নিতে পারে না। ধর্মীয় চেতনা, অলীক বা মিথ্যা ; এর আসলে কোন অস্তিত্ব নেই। ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি মনে করেন যে ধর্মীয় চেতনা জীবাত্মার সঙ্গে পরমাত্মার মিলন সূচনা করে। কিন্তু মার্কসবাদীদের মতে জীবাত্মা বা পরমাত্মার কোন অস্তিত্ব নেই। যে ধর্মীয় অনুষ্ঠান ও আচারাদির মাধ্যমে ধর্মীয় চেতনার প্রকাশ ঘটে, সেইগুলি প্রকৃতপক্ষে প্রাকৃতিক শক্তির উপর মানুষের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করার হাস্যকর প্রচেষ্টা। মানুষ যতই প্রাকৃতিক ঘটনা সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক জ্ঞান অর্জন করে ততই সে এই জাতীয় আচার-অনুষ্ঠানের ব্যবহারিক উপযোগিতায় অবিশ্বাস করে।

মার্কসীয় মতবাদ অনুযায়ী মানুষই ধর্মকে সৃষ্টি করেছে, ধর্ম মানুষকে সৃষ্টি করেনি। ধর্মকে রাষ্ট্র বা সমাজই সৃষ্টি করেছে। ধর্ম হল এক বিপরীত জগৎ-চেতনা (a reversed world consciousness)। ধর্ম সঠিক জগতের ছবি মানুষের সামনে তুলে না ধরে জগতের একটা উলটো ছবি মানুষের সামনে তুলে ধরেছে। ধর্মের যুক্তি, ধর্মের নৈতিক শাসন, এর সার্থকতা সবই এই বিপরীত জগৎ-চেতনা থেকে উদ্ভূত।

কার্ল মার্কস (*Karl Marx*) ধর্মের তীব্র সমালোচনা করেছেন। তাঁর মতে ধর্মীয় অনুভূতির কোন ব্যবহারিক মূল্য নেই। ধর্ম মানুষের মনের অলীক কল্পনা মাত্র। ধর্ম মানুষের দাসত্ব মনোভাবের পরিচায়ক এবং সমাজের অত্যাচারিত ও নিপীড়িত ব্যক্তির করুন বিলাপই ধর্মের মধ্যে দিয়ে প্রকাশ পায়।

কার্ল মার্কস-এর মতে ঈশ্বরের সম্বন্ধে ধারণা হল বিকৃত সভ্যতার মূল-নির্ভর (The idea of God is the key-stone of a perverted civilisation)।

Marx-এর মতে ধর্ম জনগণের আফিং

অ্যাঙ্গলস্ (*Engels*) বলেন, 'ধর্মের প্রথম কথাই হল মিথ্যা' (The first word of religion is a lie)। লেনিন (*Lenin*)-এর মতে ধর্ম হল আধ্যাত্মিক নিপীড়নের একটা দিক (Religion is one of the aspects of spiritual oppression) এবং আধ্যাত্মিক নিপীড়ন বস্তুতঃ অর্থনৈতিক নিপীড়ন।

ধর্মের প্রতি মার্কসবাদীদের দৃষ্টিভঙ্গি একটিমাত্র বচনের মাধ্যমে সুস্পষ্টভাবে প্রকাশিত হয়েছে। মার্কস বলেন, **'ধর্ম হল জনগণের আফিং'** (Religion is the opium of the people)। মার্কস এবং তাঁর সমর্থকবৃন্দের মতে মুষ্টিমেয় পুঁজিপতির দ্বারা অগণিত শ্রমজীবীদের শোষণের উপরই আধুনিক সমাজের

অস্তিত্ব। এই শোষণ নীতিকে অব্যাহত রেখে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে পুঁজিপতিরা বিভিন্ন ধর্ম প্রতিষ্ঠানগুলিকে তাদের যন্ত্ররূপে ব্যবহার করে। ধর্ম হল একপ্রকার আধ্যাত্মিক মাদক যা অগণিত শ্রমজীবীকে সম্মোহিত করে রাখে। ধর্মের প্রভাবে তারা মানবতা বিসর্জন দিয়ে নিজেদের পঙ্গু ও নির্জীব করে তুলেছে; সুস্থ, সুন্দর জীবনযাপনের ইচ্ছাও যেন তাদের বিনষ্ট হয়ে গেছে। ধর্মের নামেই পুঁজিপতিরা শোষণ ব্যবস্থাকে ন্যায়সঙ্গত বলে প্রতিপাদন করে। অগণিত শ্রমজীবী অবিরাম পরিশ্রম করে, নিজেদের দারিদ্র্যের কবলে নিষ্পেষিত করে পুঁজিপতিদের স্বার্থপূরণ করে। তাদের বোঝান হয় যে, তারা পরিশ্রমের পুরস্কার লাভ করবে এ জগতে নয়, মৃত্যুর পরপারে যে স্বর্গরাজ্য বর্তমান সেখানে। ধর্ম এসব নিঃস্ব শ্রমজীবীদের ধৈর্য অবলম্বন করতে শিক্ষা দেয়, ভবিষ্যতে পুরস্কার প্রাপ্তির সান্ত্বনা শোনায়।

ঈশ্বরে বিশ্বাস শ্রমজীবীদের মনে এই ধারণা সৃষ্টি করে যে জীবনের দুঃখ-কষ্ট তাদের প্রাপ্য। এর ফলে তাদের মধ্যে নিষ্ক্রিয়তার ভাব জাগে এবং ঈশ্বরের কাছে তারা নিজেদের সমর্পণ করে দেয়। এই সমর্পণের জন্য তারা তাদের দুর্ভাগ্যের প্রকৃত কারণ সম্পর্কে অবহিত হয়ে তাদের প্রকৃত অবস্থা জানতে পারে না এবং জীবনের দুঃখ-কষ্ট দূর করার জন্য সচেষ্ট হয় না। ধর্ম মার্কসবাদীদের মতে ব্যক্তির স্বাধীন চিন্তাশক্তি বিনষ্ট করে। ধর্মীয় চেতনা বৈজ্ঞানিক চেতনার বিরুদ্ধ চেতনা।

মার্কসবাদীরা ধর্ম ও একেশ্বরবাদের উদ্ভব নিম্নলিখিত ভাবে ব্যাখ্যা করেছেন :

মার্কস ও অ্যাঙ্গেলস (Marx and Engles)-এর মতে ধর্মবিশ্বাস মানুষের মনে এই ভ্রান্ত ধারণা আনে যে, প্রকৃতির অন্তরালে বা ঊর্ধ্বে এমন কেউ কেউ আছে যাদের প্রার্থনার দ্বারা সন্তুষ্ট করা চলে। ধর্মবিশ্বাস প্রাকৃতিক শক্তিগুলির উপর গুরুত্ব আরোপ করে এবং বহু দেবদেবীর অস্তিত্ব কল্পনা করে। মানুষ যদিও সকল সময় পার্থিব শক্তির দ্বারা পরিচালিত হয়, তবু ধর্মের শিক্ষানুসারে এই সমস্ত পার্থিব শক্তিকে সে আধ্যাত্মিক শক্তিরূপে কল্পনা করে।

এই লেখকদ্বয়ের মতে সমাজ-জীবনের বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে প্রাকৃতিক শক্তি ছাড়াও কতকগুলি সামাজিক শক্তিও সক্রিয় হয়ে ওঠে এবং প্রাকৃতিক শক্তির মতই মানুষকে নিয়ন্ত্রিত করে। ফলে প্রাকৃতিক শক্তির অন্তরালে মানুষ যেসব অলৌকিক শক্তি বা দেবতার কল্পনা করেছিল সেগুলি সামাজিক গুণ অর্জন করল এবং ধর্মের বিবর্তনের পরবর্তী স্তরে এসব বিভিন্ন দেবতার প্রাকৃতিক এবং সামাজিক গুণগুলি একটি সর্বশক্তিমান দেবতায় আরোপিত হল। তাঁদের মতে এভাবে একেশ্বরবাদের উদ্ভব। মানুষ যেহেতু প্রাকৃতিক শক্তির হাতে ক্রীড়নক ছিল, সেইহেতু নিজেদের অত্যন্ত অসহায় মনে করত। সেই কারণে প্রার্থনা, উপাসনা, পূজা প্রভৃতির মাধ্যমে দেবতাকে তুষ্ট করতে চাইত। শীঘ্রই মানুষ উপলব্ধি করল যে তারা কেবল প্রাকৃতিক শক্তির দ্বারাই নিপীড়িত নয়, যে ধনতান্ত্রিক শ্রেণী, বস্তুতঃ সমাজের শাসনকর্তা, তাদের দ্বারাও নিপীড়িত। তখন অত্যাচারের হাত থেকে নিজেদের পরিত্রাণের জন্য সাধারণ মানুষ

ধর্মের মধ্যেই তাদের সান্ত্বনা খুঁজতে লাগল। অর্থনৈতিক অত্যাচার ও নিপীড়নে দুর্দশাগ্রস্ত মানুষের কাছে ধর্মই সান্ত্বনা বহন করে নিয়ে এল। নীরবে এই অত্যাচার সহ্য করলেই তারা স্বর্গের সুখ ও শান্তি ভোগ করবে, এই বিশ্বাস তাদের জন্মাল। এই কারণেই মার্কস বলেছেন যে, ধর্মই হল জনগণের আফিং।

মার্কস-এর মতে ধর্ম সত্যকে বিকৃত করে। ধর্মপ্রচারকগণ দারিদ্র্যকে মহানরূপে অঙ্কিত করে মানুষের বিবেক, দয়া, ধৈর্য, ক্ষমা প্রভৃতি দুর্বল গুণগুলিকে বড় করে দেখায়। ধর্ম মানুষের মূল্যবোধ সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি করেছে।

মার্কস এবং তাঁর সমর্থকদের মতে বর্তমান ধনতান্ত্রিক সমাজের যে অর্থনৈতিক ও উৎপাদনের ব্যবস্থার দ্বারা মানুষ নিয়ন্ত্রিত হয়, সেইগুলি মানুষ নিজেই সৃষ্টি করেছে। শ্রেণীবিরোধ হল এই উৎপাদন ব্যবস্থার অবদান। যতদিন ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা বর্তমান থাকবে ততদিন শ্রেণীবিরোধ বর্তমান থাকবে। যতদিন মুষ্টিমেয় শোষকশ্রেণী উৎপাদনের উপকরণগুলিকে করায়ত্ত করে, তার উপর মালিকানাকে প্রতিষ্ঠিত করে সর্বহারা শ্রমিকদের উপর শোষণ চালিয়ে যাবে ততদিন পর্যন্ত ধর্মের বিলোপসাধন সম্ভব নয়। কিন্তু যখন এই ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার অবসান ঘটবে এবং উৎপাদন যন্ত্রের উপর সামাজিক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে, যখন সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার মাধ্যমে সমাজ সমস্ত মানুষকে অত্যাচার ও শোষণ থেকে মুক্ত করে তুলবে—অ্যাঙ্গলস্-এর ভাষায় "কেবলমাত্র তখনই সর্বশেষ বহিরাগত শক্তি যা ধর্মের মধ্যে এখনও প্রতিফলিত হচ্ছে, তা অদৃশ্য হবে এবং তার সঙ্গে অদৃশ্য হয়ে যাবে ধর্ম-সম্পর্কীয় চিন্তাধারা; তার সোজা কারণ হল, তখন চিন্তা করার জন্য কিছুই বাকি থাকবে না।"[1] তখনই সমাজ-তন্ত্রবাদ শ্রমজীবীদের সুখস্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ জীবনের সন্ধান দিয়ে তাদের ধর্মের মোহ থেকে মুক্ত করবে। সমাজতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় ধর্মের কোন স্থান নেই।

ধর্ম হল শোষণের হাতিয়ার

মার্কস বলেন, "ধর্ম হল অত্যাচারিত জীবনের নিদর্শন, হৃদয়হীন জগতের হৃদয়স্থল—এ যেন প্রাণহীন পরিবেশের প্রাণকেন্দ্র".[2] মানুষের প্রকৃত সুখের জন্য তাদের অলীক সুখ অর্থাৎ ধর্মকে বিলুপ্ত করতে হবে। ধর্মের সমালোচনা আসলে

1. "Only then will the last alien force which is still reflected in religion vanish, and with it also will vanish the reflection itself, for the simple reason that there will be nothing left to reflect."

—Engles: Anti-Duhring (On Religion)

2. 'Religion is the sign of the oppressed creature, the heart of a heart-less world just as it is spirit of spiritless situation.'

—Karl Marx: On Religion

মানুষের দুঃখের বিরুদ্ধে সমালোচনা। ধর্মের সমালোচনার এই প্রয়োজন রয়েছে কেননা এতে মানুষের মোহমুক্তি ঘটে। মানুষকে চিন্তা করে, বিচার করে নিজের ভাগ্য নিজেকেই গঠন করতে হবে। কার্ল মার্কস-এর কথায় "ধর্ম হল অলীক সূর্য যা মানুষের চারপাশে আবর্তিত হয়, যতদিন পর্যন্ত না মানুষ তার নিজের চারপাশে আবর্তিত হয়। মানুষ যদি নিজের চারপাশে আবর্তিত হয়, তাহলে মানুষের মধ্যে আত্মবিশ্বাস থাকে, কোন অলীক শক্তির কাছে মাথা নত করার প্রশ্ন ওঠে না।"[1] ইতিহাসের কাজ হল, জগতের সত্যকে প্রকাশ করা। কার্ল মার্কস বলেন, "স্বর্গের সমালোচনা হয়ে পড়ে পৃথিবীর সমালোচনা, ধর্মের সমালোচনা হয়ে পড়ে অধিকারের সমালোচনা এবং ধর্মবিজ্ঞানের সমালোচনা হয়ে পড়ে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সমালোচনা।"[2]

১১। ধর্মের মার্কসীয় ব্যাখ্যার সমালোচনা (Criticism of the Marxian Interpretation of Religion) :

(ক) ধর্ম সম্পর্কে মার্কসীয় ব্যাখ্যা জড়বাদী দর্শনের উপরে প্রতিষ্ঠিত। জড়বাদ জড়েরই একমাত্র সত্তা আছে মনে করে এবং সব কিছুকেই জড়ের প্রকাশ রূপে গণ্য করে। কিন্তু জড়বাদ প্রাণ ও মনের উৎপত্তির সন্তোষজনক ব্যাখ্যা দিতে পারে না। যেহেতু জড়বাদ ভ্রান্ত মতবাদ, সেইহেতু জড়বাদের উপরে প্রতিষ্ঠিত ধর্মের মার্কসীয় ব্যাখ্যাও ভ্রান্ত হতে বাধ্য।

(খ) মার্কস এবং তাঁর সমর্থকবৃন্দ ধর্মকে অত্যন্ত সংকীর্ণ ও বিকৃত অর্থে গ্রহণ করেছেন এবং সেজন্য ধর্ম তাদের কাছে অলৌকিকতা, বাহ্যিক আচার-অনুষ্ঠান, অনুশাসনবাক্য এবং উপদেশবাণী ছাড়া আর কিছুই নয়। কিন্তু নিরপেক্ষ ভাবে বিচার করলে ধর্মবিশ্বাসকে অলৌকিকতা, বাহ্যিক আচার-অনুষ্ঠান, রীতি-নীতি বা অনুশাসন বাক্যের সঙ্গে এক করা যায় না। ধর্মবিশ্বাস বা ধর্মচেতনার মাধ্যমে মানুষের যে আকাঙ্ক্ষা রূপ লাভ করে তা হল জীবনের শ্রেষ্ঠ মূল্যগুলিকে (Highest Values) উপলব্ধির আকাঙ্ক্ষা; এই অর্থে ধর্ম সকলেরই কাম্য। রাধাকৃষ্ণাণ (*Radhakrishnan*) বলেন, "প্রতিটি সভ্যতা

মার্কস ধর্মকে এক বিশেষ বিকৃত অর্থে গ্রহণ করেছেন

1. "Religion is only the illusory sun which revolves round man as long as he does not revolve round himself."—Karl Marx.

2. "Thus the criticism of heaven turns into the criticism of the earth, the criticism of religion into the criticism of right and the criticism of theology into the criticism of politics."

Contribution to the 'Critique of Hegel's Philosophy of Right
—Karl Marx and Engles : On Religion ; Page 4.

হল একটি ধর্মের প্রকাশ।, কারণ ধর্ম হল পূর্ণ পরমার্থে বিশ্বাস এবং তাদের উপলব্ধি করার জন্য জীবনের একটি বিশেষ পন্থা।"[1]

(গ) মার্কস-এর মতে ধর্ম জনগণের আফিং, কিন্তু এ ধারণা ভ্রান্ত। প্রকৃত ধর্ম চেতনা মানুষের মধ্যে আত্মপ্রসাদের ভাব সৃষ্টি করে না বা তাকে নিষ্ক্রিয় করে তোলে না। প্রকৃত ধর্ম-চেতনা মানুষের মধ্যে সাহস ও আশা সঞ্চারিত করে এবং জীবনের দুঃখ-কষ্টের সঙ্গে সংগ্রাম করার জন্য তাকে প্রণোদিত করে। নিষ্ক্রিয়তা সৃষ্টি করার বদলে তার মধ্যে সক্রিয়তা সৃষ্টি করে। প্রকৃত ধর্ম চেতনা যাদের মধ্যে প্রবল, তেমন ব্যক্তিরাই জনকল্যাণের জন্য জীবন উৎসর্গ করে। ধর্মবোধই মানুষকে অকল্যাণের বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্য প্রেরণা দেয়, মানুষকে লোভ এবং লালসা থেকে রক্ষা করে, নৈতিক শক্তির অধিকারী করে।*

মার্কস-এর মতে ধর্মবোধের চেতনা হল বিপরীত জগৎ চেতনা (reversed world consciousness), অলীক জগতের চেতনা। কিন্তু এ ধারণা ভ্রান্ত। ধর্মবোধ কোন অলীক চেতনাজাত বিষয় নয়, মানুষের গূঢ় প্রয়োজনবোধ থেকে উদ্ভূত। রাধাকৃষ্ণাণ-এর ভাষায় "আধ্যাত্মিকতার জগৎ আমাদের প্রত্যেকের মধ্যে আছে, সকল সময় রয়েছে এবং সকল সময় থাকবে।"[2] মানুষের ধর্মবোধ মানুষের অন্তরের মধ্যেই নিহিত, কোন বাইরের কর্তৃপক্ষ মানুষের মনে এই চেতনার সৃষ্টি করে নি।

মানুষের আধ্যাত্মিক প্রেরণা অনস্বীকার্য

1. "Every civilisation is the expression of a religion, for religion signifies faith in absolute values and a way of life to realise them,"

—S. Radhakrishnan: Religion and Society; Page 21.

* রাধাকৃষ্ণাণ (S. Radhakrishnan)) বলেন, "দুঃখ এবং অসন্তোষ একমাত্র দারিদ্র্য থেকেই উদ্ভূত হয় না। মানুষ হল অদ্ভুত জীব এবং অন্যান্য প্রাণীর থেকে সে মূলতঃ পৃথক। তার আছে দূর দিগবলয়, অজেয় আশা, সৃষ্টিমূলক শক্তি, আধ্যাত্মিক শক্তি, আধ্যাত্মিক ক্ষমতা। তাঁর মতে, এইগুলি যদি অ-বিকশিত এবং অ-পরিতৃপ্ত থাকে, তাহলে মানুষ জীবনে পার্থিব সুখ এবং ঐশ্বর্যের অধিকারী হয়েও মনে করতে পারে যে তার জীবন অর্থহীন "(Unhappiness and discontent spring not only from poverty. Man is a strange creature fundamentally different from the other animals. He has far horizons, invincible hopes, creative energies, spiritual powers")।

—S. Radhakrishnan: Religion and Society; Page 23.

2. "The kingdom of spirit is, always has been and always will be, within each of us". —S. Radhakrishnan: Religion and Society; Page 40.

মার্কস এর মতে সমাজে শ্রেণীবিরোধ রয়েছে এবং ধনিক শ্রেণী শ্রমজীবী শ্রেণীকে শোষণের জন্যই ধর্মকে হাতিয়াররূপে ব্যবহার করে। মার্কসের মতে শোষিত শ্রেণী, যারা জাগতিক সুখ থেকে বঞ্চিত তারাই কেবলমাত্র জীবনের দুঃখ-কষ্টে সান্ত্বনা লাভ করার জন্য ধর্মের প্রতি ধাবিত হয়। তাঁদের মতে মানুষের অসন্তোষের মূলে রয়েছে দারিদ্র্য। কিন্তু মার্কসবাদীদের এই অভিমত যথার্থ নয়। মানুষের সব কামনা-বাসনার মূলে, অপরিতৃপ্তির মূলে কেবলমাত্র জাগতিক অভাবই বর্তমান নেই। দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজন মিটলেই মানুষ সম্পূর্ণভাবে পরিতৃপ্ত হয় না। তাছাড়া, কেবলমাত্র শোষিত শ্রেণীর মধ্যেই যে ধর্মীয় চেতনা বর্তমান, তা নয়। ধর্ম হল মানুষের চিন্তা ও আচরণের এক সর্বব্যাপক রূপ। ধর্ম কোন পার্থিব তত্ত্ব নয়, এ হল অনুশীলন, নিয়মনিষ্ঠা; যা কিছু সুন্দর এবং সত্য তার প্রতি অনুরাগ। ধর্ম হল এমন এক পরমসত্তার জন্য আকাঙ্ক্ষা, যে পরমসত্তা কেবল মাত্র অসীম ও অনন্ত নয়; এ হল সত্য, শিব ও সুন্দরের মূর্তরূপ। ধর্মবোধ হল মানুষের বৃহত্তর বা পরমসত্তার উপলব্ধি, জীবনের মূল্যবোধের উন্মেষ। ধর্মের মধ্যেই ব্যক্তি তার প্রকৃত মূল্য এবং মর্যাদাকে আবিষ্কার করে এবং এক বৃহত্তর সত্তার সঙ্গে তার সম্পর্ক সম্বন্ধে সচেতন হয়। এই বোধের জন্য মানুষ কেবলমাত্র জাগতিক সুখে তৃপ্ত হতে পারে না। বস্তুতঃ, ইতিহাসে এরূপ যথেষ্ট দৃষ্টান্ত আছে যেখানে বহু পার্থিব সুখের অধিকারী হয়েও মানুষ পরমার্থ লাভের জন্য সে-সব ত্যাগ করেছে।

(ঘ) মার্কসবাদীরা ধর্মের উৎপত্তির যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন তা যথার্থ নয়। আদিম ধর্মীয় ধারণা ও অনুষ্ঠান ছাড়াও মানুষের প্রকৃতির অন্যান্য উপাদান—যেমন, বিস্ময়, শ্রদ্ধামিশ্রিত ভয়, রহস্যের অনুভূতি, অসীমের অনুভূতি, যা বহু ধর্মীয় ধারণা ও বিশ্বাসের মূলে বর্তমান, সেইগুলিকে মার্কসবাদীরা উপেক্ষা করেছেন।

(ঙ) মার্কসবাদীদের বিশ্বাস যে সমভোগবাদী সমাজে (Communistic Society) ধর্মের কোন স্থান থাকবে না। কিন্তু এ ধারণা যথার্থ নয়। ধর্মীয় চেতনা মানুষের প্রকৃতির মধ্যে নিহিত, প্রকৃত ধর্মের বিলোপ সাধিত হতে পারে না। সমভোগবাদী সমাজ ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান, উপাসনা পদ্ধতির বিলোপসাধন করতে পারে, কিন্তু যে ধর্মীয় চেতনার স্থান মানুষের মনে তার বিলোপসাধন করতে পারে না।

(চ) মার্কস মনে করেন, সমাজের পরিবর্তনেই মানুষের পরিবর্তন, কিন্তু এর বিপরীত ধারণাই সত্য। মানুষের স্বভাবের পরিবর্তন না হলে মানুষের জীবন ও সমাজ-জীবনের পরিবর্তন সাধন সম্ভব নয়। কিন্তু এই পরিবর্তন নিজে নিজেই আসে না। রাধাকৃষ্ণণ-এর কথায়, "এ হল পরমসত্তায় আত্মসমর্পণ। এ হল ধর্মাচরণ।"

১২। ধর্ম সম্পর্কে সামাজিক মতবাদ (The Sociological Theory of Religion) :

ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস-বিরোধী মতবাদগুলির মধ্যে অপর একটি মতবাদ হল ধর্ম সম্পর্কে সামাজিক মতবাদ। ফরাসীদেশের সমাজ বিজ্ঞানীরা বিশেষ করে এই মতবাদের প্রবর্তক। তবে এঁদের মধ্যে এমিলি ডুরখীম (*Emile Durkheim*)-এর নামই বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য।

সমাজের সভ্যদের মনকে ভাল বা মন্দ পথে চালিত করার শক্তি যে সমাজের আছে, এ সম্পর্কে আজ সবাই মোটামুটি সচেতন। উপরিউক্ত মতবাদে সমাজের এই ক্ষমতার কথাই ব্যক্ত করা হয়েছে। ধর্ম সম্পর্কে সামাজিক মতবাদ ব্যক্ত করে যে, যে-সব দেবতাদের মানুষ উপাসনা করে তারা সকলেই কাল্পনিক সত্তা। সমাজ অজ্ঞানিতে এই সব কাল্পনিক সত্তাকে সৃষ্টি করেছে, যাতে সমাজ এদের মাধ্যমে সমাজের অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তির চিন্তন এবং আচরণকে নিয়ন্ত্রিত করতে পারে।

দেবতা মানুষ সৃষ্ট কাল্পনিক সত্তা

এই মতবাদ বলে যে মানুষের মনে যখন এই ধর্মীয় অনুভূতি জাগে যে, সে এক বৃহৎ শক্তির সামনে উপস্থিত, যে শক্তি তাদের ব্যক্তিগত জীবনকে অতিক্রম করে যায় এবং এই শক্তি তার ইচ্ছাকে নৈতিক আদর্শরূপে তাদের উপর চাপিয়ে দেয় তখন প্রকৃতপক্ষে তারা এক বৃহত্তর পরিবেশগত সত্তার (environing reality) উপস্থিতিই অনুভব করে, কোন ঈশ্বরের নয়। এই সত্তা কোন অতীন্দ্রিয় অলৌকিক সত্তা নয়, এই সত্তা হল সমাজ, যা এক স্বাভাবিক বাস্তব বস্তু। সমাজের সভ্যদের কাছে, তাদের পরিবেষ্টনকারী যে বৃহত্তর মানব গোষ্ঠী, তাই দেবতার রূপ পরিগ্রহ করে, দেবতার গুণে অভিসিক্ত হয়ে ওঠে এবং সভ্যদের মনে ঈশ্বরের ধারণা জাগিয়ে তোলে। আসলে এই ঈশ্বর সমাজের প্রতীক।

ঈশ্বর সমাজের প্রতীক

ঈশ্বর এক পবিত্র মহান সত্তারূপে উপাসকের পরিপূর্ণ আনুগত্য দাবী করে। এর ব্যাখ্যাতে বলা হয়েছে যে, এ আর কিছু নয়; সমাজের, সমাজের সভ্যদের একনিষ্ঠ আনুগত্য দাবী করা। আদিম সমাজে সভ্যদের উপর গোষ্ঠীর ছিল অখণ্ড প্রতাপ, সভ্যদের কোন রকম প্রশ্ন না তুলেই সমাজের প্রতি আনুগত্য ও বাধ্যতা প্রদর্শন করতে হত। সম্প্রদায় ছিল একটা চেতনা বিশিষ্ট জীবদেহ। সভ্য মানুষ হল সেই জীবদেহের কোষ বিশেষ।

গোষ্ঠী-মন বা গোষ্ঠী-চেতনা থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে ব্যক্তির কোন অবস্থান নেই। সম্প্রদায়ের রীতিনীতি, বিশ্বাস, প্রয়োজন, বিধিনিষেধ ছিল এক হিসেবে

সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী। সমবেত ভাবে এরা সমাজের প্রতি শ্রদ্ধামিশ্রিত ভয়ের ভাব জাগিয়ে তুলত যেমন মানুষ, ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি ও শ্রদ্ধা জানায়।

ধর্মের ক্ষেত্রে ঈশ্বর মানুষের পরম পরিত্রানকর্তা, ঈশ্বর তার নিরাপত্তা বিধান করেন। সমাজও তার সভ্যদের বিপদে আপদে রক্ষা করেন। তাদের নিরাপত্তা সংরক্ষিত হয় সমাজের দ্বারা। মানুষ একান্তভাবেই সামাজিক, তার সমগ্র সত্তাই সামাজিক, সে তার গোষ্ঠীর উপর একান্তভাবে নির্ভর এবং সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হলে সে অসুখী। সে তার মানসিক প্রাণশক্তি সমাজ থেকেই সংগ্রহ করে এবং সমাজের অন্য সকলের সঙ্গে মিলে যখন সে ধর্ম আচরণ করে তখন সমাজ থেকেই সে শক্তি সংগ্রহ করে। ঐ ধর্মই তাদের সকলকে একত্রে বেঁধে রাখে।

কাজেই এক বৃহত্তর পরিবেশগত সত্তা, যা ব্যক্তিকে পরিবেষ্টন করে থাকে, এমন সত্তা হিসেবে, সমাজই ঈশ্বরের প্রতীকে রূপান্তরিত হয়েছে। ব্যক্তি দেখে সমাজ তার থেকে অনেক বড়, তার আবির্ভাবের আগে সমাজের অস্তিত্ব ছিল এবং তার মৃত্যুর পরেও সমাজের অস্তিত্ব থাকবে। সমাজের চাপ থেকেই ঈশ্বরের প্রতীকের সৃষ্টি, অতীন্দ্রিয় ঈশ্বরের অলৌকিক সান্নিধ্যের বোধের সৃষ্টি। এই মতবাদ মানুষের প্রতীক সৃষ্টির স্বাভাবিক প্রবণতাকে স্বীকার করে নেয়।

কাজেই এই মতবাদে ধর্মের প্রত্যক্ষগ্রাহ্য বিষয়গুলি ব্যাখ্যা করা হয়েছে। অথচ এই মতবাদে অলৌকিক সত্তা রূপে ঈশ্বরের কথা বা ঈশ্বর এই জগত সৃষ্টি করেছেন যেখানে মানুষ বসবাস করছে, এমন কোন কথা ব্যক্ত করা হয়নি। এই মতবাদ অনুসারে মানুষই তার সামাজিক অস্তিত্ব বজায় রাখার জন্য ঈশ্বরের ধারণা সৃষ্টি করেছে।

সমালোচনা : এই মতবাদের বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ উত্থাপিত হয়েছে। এইচ. এইচ. ফার্মার (*H. H. Farmar*) এই মতবাদের ব্যাপক সমালোচনা করেছেন।

প্রথমতঃ, এই মতবাদ ব্যাখ্যা করতে পারে না, সময় সময় ধর্মীয় চেতনা সমাজের সীমিত গণ্ডি অতিক্রম করে সমগ্র মানব জাতির সঙ্গে এক নৈতিক সম্পর্কের কথা ব্যক্ত করে কিভাবে?

ধর্মপ্রবর্তকরা সমগ্র মানবজাতির প্রতি ভালবাসার কথা ব্যক্ত করেছেন, যেমন করেছেন খ্রীষ্টধর্মের প্রবর্তক যীশু। তাঁর মহান বাণীতে বলা হয়েছে যে ঈশ্বর সমগ্র মানবজাতিকে ভালবাসেন এবং ঈশ্বর সকলকেই আহ্বান করেন ভ্রাতৃরূপে পরস্পরের দেখাশোনা করার জন্য। ধর্ম সম্পর্কীয় সামাজিক মতবাদে এই বিষয়ের সন্তোষজনক ব্যাখ্যা পাওয়া যাবে না। ঈশ্বরের আহ্বান বলতে যদি মনে করি, সমাজ তার সভ্যদের উপরে এক ধরনের আচরণবিধি চাপিয়ে দিচ্ছে, যা করা হচ্ছে সমাজেরই স্বার্থে, তাহলে

সকল মানুষের কর্তব্য বলে যাকে অভিহিত করা হচ্ছে, সেই কর্তব্যবোধের উৎস কি? সকল মানুষের নৈতিক বাধ্যতাবোধ কার কাছে? সমগ্র মানবজাতি ত সমাজ নয়। বস্তুতঃ সামাজিক মতবাদ সমাজ বলতে সমগ্র মানবজাতিকে বোঝেও না। কাজেই ঈশ্বরের আহ্বানকে একটা গোষ্ঠীর বক্তব্য বলে অভিহিত করা চলে কি? গোষ্ঠী কি গোষ্ঠী বহির্ভূত ব্যক্তির প্রতি সমানভাবে কর্তব্য করার কথা বলে? অথচ ঈশ্বরের বাণীতে গোষ্ঠী বহির্ভূত ব্যক্তির প্রতিও গোষ্ঠীর সুখসুবিধা সম্প্রসারিত করার কথা বলা হয়।

দ্বিতীয়তঃ, এই মতবাদ ধর্ম প্রবর্তকদের নৈতিক সৃজনশক্তিকে অস্বীকার করে। নৈতিক ধর্মপ্রবর্তক গোষ্ঠী-স্বীকৃত নৈতিকতাকে অতিক্রম করে যান এবং তাঁর শিষ্যদের জীবনে নৈতিকতার নতুন নতুন দিকগুলিকে সূচিত করেন, নানা ধরনের নৈতিক শিক্ষা দেন। গোষ্ঠী-স্বীকৃত সীমিত নৈতিক আচরণবিধি অর্থাৎ গোষ্ঠীর আত্মসংরক্ষণ ও বৃদ্ধির জন্য যে অভিজ্ঞতা, তাই যদি নৈতিকতার মানদণ্ড হয়, তাহলে উপরিউক্ত ঘটনাকে ব্যাখ্যা করা যাবে কি ভাবে? ধর্মপ্রবর্তকদের অন্তর্দৃষ্টির ফলে যে নৈতিক অগ্রগতি সমাজে গোষ্ঠীর নৈতিক অগ্রগতির বহুপূর্বে ঘটেছে, তাকে ব্যাখ্যা করা যাবে কিভাবে?

তৃতীয়তঃ, এই মতবাদ সমাজ-বিযুক্ত বিবেকের শক্তির বিষয়টিকে ব্যাখ্যা করতে পারে না। অনেক ধর্মপ্রবর্তক ধর্ম প্রচার করতে গিয়ে সমাজের বিরুদ্ধাচরণ করেছেন। তাঁরা মনে করেন তাঁরা ঈশ্বরের সমর্থন লাভ করেছেন। কিন্তু ঈশ্বর যদি সমাজ ছাড়া আর কিছু না হয় তাহলে ধর্মপ্রবর্তনের পক্ষে ঈশ্বরের সহায়তা লাভ করা সম্ভব হয় না। সমাজের বিরোধিতা যত তীব্রভাবে ধর্ম প্রবর্তকদের জীবনে দেখা দিয়েছে, তখন সেই পরিস্থিতিতে তাঁরা ঈশ্বরের সমর্থন তত পরিপূর্ণভাবে লাভ করেছেন। ঈশ্বর যদি ছদ্মবেশী বা প্রচ্ছন্ন সমাজ হয় তাহলে ধর্মপ্রবর্তকদের পক্ষে ঈশ্বরের সমর্থন লাভ করা সম্ভব নয়। ঈশ্বরের আহ্বান ঐ সঙ্কটময় পরিস্থিতিতে তাঁরা সব সময় শুনেছেন। নিজেদের লোকের দ্বারা পরিত্যক্ত হয়ে পরিপূর্ণভাবে ঈশ্বরের সান্নিধ্য ও ঘনিষ্ঠতা লাভ করেছেন। কিন্তু এ কিভাবে সম্ভব হয়, যদি সমাজই ঈশ্বর হয়?

কাজেই দেখা যাচ্ছে, ধর্মের শুদ্ধ প্রাকৃতিক ব্যাখ্যা দেবার যে প্রচেষ্টা সামাজিক মতবাদের সমর্থকবৃন্দ করেছেন তাঁদের সেই চেষ্টা সার্থক হয়নি। অর্থাৎ এই মতবাদ যা প্রমাণ করতে চায় তা প্রমাণ করতে পারেনি।

ষোড়শ অধ্যায়

ধর্মের সামাজিক ভূমিকা

(The Social Role of Religion)

১। সাধারণ সামাজিক বিষয়রূপে ধর্ম (Religion as a common social phenomena) :

ধর্মের স্বরূপ বা প্রকৃতির আলোচনা প্রসঙ্গে ধর্মের বিভিন্ন সংজ্ঞা ধর্মের যে অর্থই সূচনা করুক না কেন, সমাজ-দার্শনিকের কাছে ধর্মের যে দিকটি মূল্যবান তাহল ম্যাকেঞ্জির ভাষায়—"এক সর্বোচ্চ ও সর্বাধিক মূল্যবান সত্তার প্রতি অব্যাহত ভক্তিময় অনুরাগ" (A certain absolute devotion to what is recognised as highest and most valuable)। প্রকৃত ধর্ম হল গঠনমূলক এবং সৃষ্টিমূলক। খ্রীষ্টধর্মও সামাজিক ঐক্যের আদর্শের প্রতি অনুরাগ এবং এই আদর্শকে রক্ষা করার ও উন্নত করার জন্য যা কিছু প্রয়োজনীয় তার উপর গুরুত্ব আরোপ করেছে। ধর্মের মধ্যে যে মানবতার দিকটি বর্তমান, যে দিকটি বৌদ্ধধর্ম, কোঁতের (*Comte*) মানবতাবাদ বা খ্রীষ্টধর্মের মধ্যে বর্তমান, সেটি ধর্মের এই সামাজিক দিকটিকেই বড় করে দেখেছে। এই ধর্মকে পরিপূর্ণ করে তুলতে হলে এর সঙ্গে আর যা কিছুই যুক্ত করা হোক না কেন, সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে আমরা ধর্মের মানবতার দিকটিকেই বড় করে দেখব, যেহেতু এটি সামাজিক ঐক্যেরই যোগসূত্র। ম্যাকেঞ্জি বলেন, "ধর্মকে মানুষের জীবনকে পূর্ণ করে তোলার জন্য উৎসর্গমূলক মনোভাব বলে গণ্য করলেই যথেষ্ট হবে।"[1] তাছাড়া ধর্মের প্রকৃত তাৎপর্য উপলব্ধি করতে পারলে বোঝা যাবে যে, ধর্ম বাহ্যিক আচার-অনুষ্ঠান, রীতিনীতি, উপদেশ বা আদেশবাণী নয়, অলৌকিকতাও নয়। ধর্ম হল মানুষের জীবনের শ্রেষ্ঠ মূল্যগুলির (Values) স্বীকৃতি—অর্থাৎ সত্য, শিব ও সুন্দরের উপলব্ধি। সেই কারণেই রাধাকৃষ্ণাণ বলেছেন, "সুন্দর, শিব ও সত্যের জন্য মনের যে অন্বেষণ তাই হল ঈশ্বরান্বেষণ;"[2]

---

1. "It may be enough to regard religion as meaning the spirit of devotion to the perfection on human life."

—Mackenzie : Outlines of Social Philosophy ; page 210.

2. "The search of the mind for beauty, goodness and truth is the search for God." —S. Radhakrishnan : Religion and Society ; Page 47

মায়েল এডওয়ার্ডস্-ও ধর্মকে এই দৃষ্টিতেই দেখেছেন। তিনি বলেন, "ধর্ম সম্পর্কীয় জাগতিক দৃষ্টিভঙ্গির সত্যতার প্রশ্ন প্রধানতঃ আমাদের পরমমূল্যের বাস্তবতার প্রশ্ন।"[1] সামাজিক বিষয়রূপে ধর্মকে এই দৃষ্টিতেই দেখব—তাহল, ধর্মের মূল্যবোধের দিকটি, মানবতার দিকটি এবং তার সামাজিক সংহতির দিকটি।

ধর্ম যদিও এক হিসেবে ব্যক্তিবিশেষের বিশ্বাসের ব্যাপার, তবু সমাজ-জীবনে ধর্মের একটা বিশিষ্ট ভূমিকা আছে। সমাজবিজ্ঞানী ব্লেকমার এবং গিলিন (*Blackmar and Gillin*)-এর মতানুসারে ধর্ম যতখানি না ব্যক্তিগত ব্যাপার তার তুলনায় অনেক বেশী সামাজিক। তাঁদের মতানুযায়ী সামাজিক উপাসনা ছাড়া, শুধুমাত্র ব্যক্তিগত উপাসনার মধ্য দিয়ে ধর্ম বেঁচে থাকতে পারে না। ইতিহাস থেকে জানা যায় যে, যখন কোন গোষ্ঠী সমবেতভাবে উপাসনা করা থেকে বিরত হয়, তখন তাঁদের ধর্মেরও পরিসমাপ্তি ঘটে।

সমাজ জীবনে ধর্ম নানাভাবে নিজেকে প্রকাশ করে। বিভিন্ন পারিবারিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানের উপর ধর্ম তার প্রভাব বিস্তার করে। ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলি সামাজিক মেলামেশার গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র। সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর ব্যক্তিরা পূজা, উপাসনা প্রভৃতির জন্য এসব ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলিতে সমবেত হয়।

ধর্ম ও সমাজ-জীবন

এই সামাজিক মেলামেশার ফলে সমাজস্থ ব্যক্তিদের মধ্যে পারস্পরিক সহানুভূতি ও প্রীতির সঞ্চার হয়। কাজেই ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলি মানুষের মধ্যে ভ্রাতৃত্ববোধ জাগ্রত করার গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র। ধর্মীয় মনোভাব অনেক সময় মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করে ও জনকল্যাণমূলক কার্য সম্পাদন করার জন্য প্রণোদিত করে। বস্তুতঃ, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলি ধর্মবোধ জাগ্রত করা ছাড়াও নানা ধরনের কার্য সম্পাদন করে। অনেক ধর্ম-প্রতিষ্ঠান বিদ্যালয়, হাসপাতাল, অনাথ আশ্রম প্রভৃতির পরিচালনার দায়িত্বভার গ্রহণ করে।

সমাজ-নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে ধর্মের কার্যকারিতা যে এখনও অক্ষুণ্ণ আছে তা বোঝা যায় যখন আমরা দেখি যে সমাজ-জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে ধর্মীয় আচার ও অনুষ্ঠান মানুষের কর্মপদ্ধতিকে এখনও প্রভাবিত করে। ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের মাধ্যমেই সাধারণতঃ ব্যক্তির ধর্মীয় অনুভূতির প্রকাশ ঘটে। আদিম ধর্মীয় অনুষ্ঠান যদিও তার প্রকৃতির বিচারে ছিল কিছুটা স্থূল, তবু আদিম সমাজে ব্যক্তি-জীবনের প্রায়

---

1. "..... the question of the truth of the religious world view is largely the question of the objectivity of our highest values."

—Miall Edwards : The Philosophy of Religion, Page 255.

সর্বক্ষেত্রেই তার প্রকাশ ঘটেছিল। আদিম সমাজে সমাজজীবনের প্রায় সর্বক্ষেত্রেই যেমন—জন্ম, দীক্ষা, বিবাহ, রোগ, মৃত্যু, কৃষিকার্য প্রভৃতিকে কেন্দ্র করে নানারকম ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের প্রকাশ ঘটত। বর্তমান যুগেও জন্ম, বিবাহ, মৃত্যু প্রভৃতি নানা সামাজিক অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের আয়োজন লক্ষ্য করা যায়। মানুষের অর্থনৈতিক জীবনের বিবিধ অনুষ্ঠানে যেমন—শস্য বপন, শস্য কর্তন, শিকার, মাছধরা প্রভৃতির ক্ষেত্রেও ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানের আয়োজন দেখা যায়। এ ছাড়াও সামাজিক জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে যেমন—গৃহপ্রবেশ, নতুন কর্মভার গ্রহণ, কোন শুভ কার্য শুরু করার সময় প্রায় সব সমাজেই ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের প্রয়োজন প্রচলিত। নতুন কর্মভার গ্রহণের সময় শপথ গ্রহণের রীতি বর্তমান সমাজে দেখা যায়। ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের আয়োজন থেকে নির্দিষ্ট কর্মপদ্ধতির উদ্ভব ঘটে, যার ফলে সমাজ-নিয়ন্ত্রণের বিষয়টি সহজতর হয়। আদিম যুগে সামাজিক ঐক্য বজায় রাখার ব্যাপারে ধর্মের ভূমিকা ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ক্রিস্টোফার ডসন (*Christopher Dawson*), টয়েনবি (*Arnold J. Toynbee*) এবং ডেমেণ্ট (*V. A. Dement*) প্রভৃতি লেখকবৃন্দ তাঁদের রচনার মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন যে, ধর্মই হল সভ্যতার কেন্দ্রস্থিত উপাদান এবং ধর্মের বিপর্যয় ঘটলে সভ্যতারও বিপর্যয় ঘটবে।[1]

সমাজ-নিয়ন্ত্রণে ধর্মের কার্যকারিতা

ধর্ম মানুষের চরিত্রকে প্রভাবিত করে সামাজিক জীবনকে গঠিত করে। ধর্ম ব্যক্তির মনে সামাজিক মূল্যের বোধ সঞ্চারিত করে, ধর্ম ব্যক্তিকে সামাজিক নিয়ম মেনে চলতে, অপরের চিন্তা ও অনুভূতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে, সামাজিক দায়িত্ব পালন করতে এবং চিন্তায় ও কার্যে বিবেকবুদ্ধি-সম্পন্ন হতে শিক্ষা দেয়। ধর্ম কেবলমাত্র এক ধর্ম সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তির প্রতি নয়, সমস্ত বিশ্বের মানুষের প্রতি প্রীতি ও শুভেচ্ছার ভাব জাগরিত করে।

ধর্ম সমাজ-জীবন গঠন করে

মার্কস এবং তাঁর সমর্থকবৃন্দ মনে করেন যে, ধর্ম হল জনগণের আফিং এবং তাঁদের মতে ধর্মকে হাতিয়ার করে সমাজের এক শ্রেণী আর এক শ্রেণীর উপর

1. রাধাকৃষ্ণাণ (S. Radhakrishnan) বলেন, "আধ্যাত্মিক মূল্যের প্রতি শ্রদ্ধা, সত্য ও সুন্দরের প্রতি অনুরাগ, সততা, ন্যায়পরতা ও অনুকম্পা, অত্যাচারিতদের প্রতি সহানুভূতি এবং মানুষের ভ্রাতৃত্বে বিশ্বাস হল সেই সকল গুণ যেগুলি বর্তমান সভ্যতাকে রক্ষা করবে" (**"Regard for spiritual values, love of truth and beauty, righteousness, justice and mercy, sympathy with the oppressed and belief in the brotherhood of man, are qualities which will save modern civilisation,"**)।

—Radhakrishnan : Religion and Society; Page 18.

শোষণ চালিয়ে যাচ্ছে। কোন কোন ক্ষেত্রে যে ধর্মকে হাতিয়ার করে জনসাধারণের উপর অত্যাচার এবং দমননীতি চালান হয়েছে একথা অস্বীকার করা চলে না।

ধর্মবোধের দ্বারা সামাজিক উন্নতি ও সংস্কার সম্ভব

তবে তার থেকে এই সিদ্ধান্ত করা যায় না যে, ধর্মের সাহায্যে সমাজ-জীবনে কোন উন্নতি সম্ভব হয়নি। অনেক ক্ষেত্রে সামাজিক উন্নতি, সংস্কার, বিপ্লব ইত্যাদি মানুষের ধর্মবোধের জন্যই সম্ভব হয়েছে। অনেক সামাজিক এবং অর্থনৈতিক আন্দোলনের মূলে ধর্ম বর্তমান। অনেক সময় ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলি অত্যাচার ও নিপীড়নের প্রতিরোধ করেছে। তাছাড়া, ধর্মই বহু মঙ্গলজনক সামাজিক ক্রিয়া-কর্মের উদ্দীপক।

যথার্থ ধর্মভাব যদি প্রচার করা যায় তাহলে ধর্মের মাধ্যমে সামাজিক ঐক্য প্রতিষ্ঠার কাজ সহজতর হতে পারে। অনেক মনীষী বিশ্বঐক্য ও বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য যথার্থ ধর্মভাব প্রচারের প্রয়োজনীয়তাকে স্বীকার করে নিয়েছেন। অনেক সময় আমরা ধারণা করি, ধর্ম মানুষের পারস্পরিক সম্পর্কের মধ্যে বৈষম্য সৃষ্টি করে ভেদাভেদ আনয়ন

ধর্মের মাধ্যমে সামাজিক ঐক্য প্রতিষ্ঠা সম্ভব

করে, মানুষকে ক্ষুদ্র স্বার্থবুদ্ধির দ্বারা প্রণোদিত করে জনকল্যাণের আদর্শ লাভের পথে বাধার সঞ্চার করে। কিন্তু আমাদের মনে রাখা দরকার, যে ধর্ম সমাজ-জীবনে এই ভূমিকা গ্রহণ করে তা যথার্থ ধর্ম নয়, তা ধর্মের বিকৃত রূপ। ধর্মান্ধতাই সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ সৃষ্টি করে, সামাজিক ঐক্যের বন্ধনকে শিথিল করে; যথার্থ ধর্মভাব তা করে না। যথার্থ ধর্মভাব মানুষকে সমাজকল্যাণমূলক কাজে আত্মনিয়োগের জন্য প্রেরণা দেয়। স্বামী বিবেকানন্দের মতে জীব সেবাই ঈশ্বর সেবা। যথার্থ ধর্মভাব মানুষকে সংযত করে, সহনশীল করে, মানুষকে নৈতিক শক্তি যোগায় এবং অপরের সঙ্গে সম্প্রীতির সূত্রে আবদ্ধ হয়ে সামাজিক ঐক্যের আদর্শ রক্ষায় প্রণোদিত করে।

বস্তুতঃ, যা কিছু শুভ, শ্রেয় ও সুন্দর তার প্রতি অনুরাগ আসলে ধর্মসম্পর্কীয় অনুরাগ। ধর্ম নৈতিকতার অন্যতম উৎস। মহান ধর্ম মাত্রই কোনটা ভাল, কোনটা মন্দ শিক্ষা দেয়। বর্তমানে যেসব সমাজ-কল্যাণমূলক ও জনকল্যাণমূলক কাজ আমরা দেখি, তার মূলেও ধর্মের মনোভাব অনেক সময় বর্তমান থাকে। অনেক সময় শিক্ষা এবং দাতব্য প্রতিষ্ঠানগুলি প্রতিষ্ঠিত হয় এমন ব্যক্তিদের দ্বারা যাঁদের লক্ষ্য হল ধর্মমূলক। অনেক সময় কোন প্রতিষ্ঠান হয়ত ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান নয়, কিন্তু ধর্মীয় মনোভাব এসব প্রতিষ্ঠানের মূলে উপস্থিত রয়েছে দেখা যায়।

২। সংহতি শক্তিরূপে ধর্মের ভূমিকা (Role of Religion as a social cohesive force) :

ধর্ম কি সংহতি শক্তি, না বিচ্ছেদ সৃষ্টি করার শক্তি? ধর্ম কি সামাজিক ঐক্যকে সুদৃঢ় করে, না সামাজিক ঐক্যের বিনাশ সাধন করে?

ধর্মের দুটি প্রধান ভূমিকা আছে— একটি হল ব্যক্তিগত জীবনে ধর্মের উন্মেষ যার জন্য ব্যক্তি সসীম হলেও এক অসীম সত্তার মাঝে নিজের পূর্ণতা ও অমরত্বকে খুঁজে পেতে চায় এবং তার সঙ্গে মিলিত হতে চায়। কিন্তু এ ছাড়াও আছে ধর্মের একটা সামাজিক দিক। এই দিকটিই মানুষকে পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত করে। যে বন্ধন মানুষকে ঈশ্বরের সঙ্গে যুক্ত করে, সেই বন্ধনই মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ককে সুদৃঢ় করে, মানুষের ঐক্যকে শক্তিশালী করে তোলে। গিসবার্ট বলেন, "ঈশ্বরের পিতৃত্বের অধীনে মানুষের ভ্রাতৃত্বের এই হল ভিত্তি।"[1]

ধর্মের ব্যক্তিগত ও সামাজিক ভূমিকা

ট্রটার (*W. Trotter*)-এর মতে যূথ-মনোভাবের উপরই ধর্মের ভিত্তি। ধর্ম সমষ্টিগত অনুভূতির প্রকাশ। তাঁর মতে ব্যক্তি যদি পরস্পরের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বসবাস করে তাহলে তাদের মধ্যে এক অসম্পূর্ণতাবোধ জাগে। সেই কারণেই তারা ধর্মীয় গোষ্ঠী গঠন করে।

ধর্ম সমষ্টিগত অনুভূতির প্রকাশ

এমিলি দুরখীম (*Emile Durkheim*)-এর মতেও সমষ্টিগত চেতনা বা গোষ্ঠী চেতনার প্রকাশই হল ধর্ম। ধর্মের প্রধান কাজ সামাজিক ঐক্য বা সংস্কৃতিকে সুদৃঢ় করে তোলা। তাছাড়াও ধর্ম বিভিন্ন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে মানুষের সংযোগসাধন করে তাদের পরস্পরের বন্ধু করে তোলে। গীর্জা বা অন্যান্য উপাসনালয়ে বিভিন্ন ব্যক্তি উপাসনা বা ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের জন্য সমবেত হয়। অনেক সময় এ সকল প্রতিষ্ঠান গরীব-দুঃখীদের জন্য অর্থ সংগ্রহ করে বা অন্যান্য জনকল্যাণমূলক কার্য করে থাকে বা শিক্ষা ও আমোদ-প্রমোদের জন্য নানারকম অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। সকল সময়ই এ সব কাজ যে পুরোপুরি ধর্মসম্পর্কীয় তা নয়। তবে ধর্মের আদর্শই প্রত্যক্ষভাবে সকল কাজে প্রেরণা দান করে।

ধর্মের বন্ধনই সামাজিক ঐক্যের সুদৃঢ় ভিত্তি

অনুষ্ঠান-পদ্ধতি ও উৎসব সামাজিক জীবনের উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে। এসব উৎসব ও অনুষ্ঠান যে সব সময় প্রত্যক্ষভাবে ধর্মমূলক তা নয়, তবে এসব অনুষ্ঠান

1. McDougall : An Introduction to Social Philosophy ; page 267.

ও উৎসবের অনেকগুলিরই মূলে ধর্মসম্পর্কীয় মনোভাব বিদ্যমান। ব্যক্তির জীবনে এসব ধর্মীয় উৎসব ও অনুষ্ঠান মানুষকে পরস্পরের সঙ্গে সংযুক্ত করে। অনেক ক্ষেত্রে বহু সামাজিক অনুষ্ঠান, যেমন—বীজবপন, শস্য সংগ্রহ, গৃহপ্রবেশ, শপথ গ্রহণ প্রভৃতি ধর্মাচরণরূপে অনুষ্ঠিত হয়। সুতরাং সমাজ-জীবনে সংহতি শক্তিরূপে ধর্ম এখনও পর্যন্ত খুব প্রবল ও সজীব। ধর্মই সমাজের স্থায়িত্বের অন্যতম কারণ। ধর্মীয় গোষ্ঠীর সভ্যদের মধ্যে গোষ্ঠীচেতনা খুব প্রবলভাবেই আত্মপ্রকাশ করে যার জন্য এই সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তিরা পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকতে ভালবাসে না, এমন কি, মৃতের সঙ্গেও সম্পর্ক ত্যাগ করতে তারা প্রস্তুত নয়।

ধর্মীয় অনুষ্ঠান ব্যক্তিকে পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত করে

সমাজস্থ ব্যক্তি সমবেতভাবে ধর্মীয় অনুষ্ঠান সম্পাদন করে। এই মিলিত ধর্মানুষ্ঠানের মাধ্যমে সমাজস্থ ব্যক্তিদের সাধারণ অনুভূতি ও বিশ্বাসের প্রকাশ ঘটে, যা গোষ্ঠীর লক্ষ্যের প্রতি ব্যক্তিবিশেষের শ্রদ্ধা ও আনুগত্যকে সুদৃঢ় করে। গোষ্ঠীর আদর্শের সঙ্গে ব্যক্তি যাতে তার ব্যক্তিগত আচরণের সংগতি রক্ষা করে, ধর্ম ব্যক্তিকে তার জন্য প্রেরণা যোগায় এবং ব্যক্তিকে ক্ষুদ্র স্বার্থের উর্ধ্বে উঠে সমাজস্থ ব্যক্তিদের সঙ্গে একাত্মতা অনুভব করতে প্রণোদিত করে।

ধর্ম গোষ্ঠীর লক্ষ্যের প্রতি ব্যক্তির আনুগত্যকে সুদৃঢ় করে

ধর্মীয় গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত সভ্যদের মধ্যে একই অবস্থায় একই ধরনের অনুভূতি দেখা যায় এবং গোষ্ঠীর নেতাদের নির্দেশ বিনা বিচারে গ্রহণ করার প্রবণতা দৃষ্ট হয়। ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের সংগঠনের মূলে যূথ-মনোবৃত্তি উল্লেখ-যোগ্যভাবে ক্রিয়া করে। ম্যাক্‌ডুগ্যাল (*McDougall*)-এর মতে ধর্মসম্পর্কীয় গোষ্ঠীর মধ্যে ঐক্য ও সংহতি বেশ উল্লেখযোগ্যভাবেই পরিলক্ষিত হয়।

ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের সংগঠনের মূলে যূথ মনোবৃত্তি

প্রত্যেক ধর্মেরই কতকগুলি পবিত্র প্রতীক আছে। এই পবিত্র প্রতীক সমাজস্থ কিছু ব্যক্তির মনে মূল্য বোধের সঞ্চার করে যার ফলে সেই সব ব্যক্তির মধ্যে এক ঐক্যের বোধ জাগ্রত হয়, যেমন হিন্দুদের গো-উপাসনা।

ধর্ম একই ধরনের মূল্য বোধের সঞ্চার করে

সমাজ তার ব্যক্তির সামনে যে আদর্শ তুলে ধরে, ধর্ম তার প্রতি অনুমোদন জানিয়ে, সেই আদর্শের সংরক্ষণে সহায়তা করে। ধর্ম অনেক সময় সমাজানুমোদিত আচরণের সংজ্ঞা নির্দেশ করে, ভাল কাজের প্রতি সমর্থন জানায়, মানুষকে তার আচরণে মধ্যপন্থা অবলম্বনের কথা বলে, মানুষের মধ্যে ভ্রাতৃত্ববোধকে জাগ্রত করে। এই সব ক্রিয়া সামাজিক ঐক্যকে সুদৃঢ় করে।

সামাজিক আদর্শের সঙ্গে সংগতি রক্ষায় ধর্ম সহায়তা করে

ধর্ম সামাজিক নিয়ন্ত্রণের মাধ্যম রূপেও সামাজিক ঐক্যকে সুদৃঢ় করে। ধর্ম নির্দেশ করে যে সৎ কাজ পুরস্কৃত হবে এবং অসৎ কাজের জন্য শাস্তি পেতে হবে। অনেক আচরণই যে শুধু সমাজের বিরুদ্ধে আচরণ তা নয়, ঈশ্বরের বিরুদ্ধে আচরণ—এই কথা বলে ধর্ম ব্যক্তিকে পাপ কার্য থেকে বিরত করতে চায়। ধর্ম বলে অনেক সামাজিক আচরণ ঈশ্বরানুমোদিত। সমাজস্থ ব্যক্তিদের আচরণকে যথার্থ পথে চালিত করে ধর্ম-সামাজিক শৃঙ্খলা রক্ষায় সহায়তা করে।

ধর্ম সামাজিক নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে সামাজিক ঐক্যকে সুদৃঢ় করে

অনেকের ধারণা ধর্ম ব্যক্তি ও সমাজের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে, সমাজজীবনকে উপেক্ষা করে, ব্যক্তি-জীবনের উপরই গুরুত্ব আরোপ করে। ব্যক্তিগত উন্নতির উপর অত্যধিক মনঃসংযোগ করার ফলে সামাজিক চেতনা এবং কল্যাণের দিকটিকে অবহেলা করা হয়। তাছাড়া, ব্যক্তির আচার-অনুষ্ঠান পালনের উপর ধর্ম এতখানি গুরুত্ব আরোপ করে যে, ব্যক্তির আধ্যাত্মিক শক্তির বিকাশের দিক হয়ে পড়ে গৌণ। ধর্মের মধ্যে সর্বব্যাপক আদর্শের কথা যাই থাক না কেন, প্রতিটি ধর্মেরই একটি স্থানীয় বৈশিষ্ট্য এবং বিশেষ রূপ আছে যার জন্য বিভিন্ন ধর্মের অস্তিত্ব মানুষের সঙ্গে মানুষের সংযোগ সাধনের পথে অনেক সময় অন্তরায় সৃষ্টি করে। প্রোটেসট্যান্ট ও রোমান ক্যাথলিকদের মধ্যে যে বিরোধের কথা ইতিহাস পাঠে জানা যায়, তা বিশেষতঃ ধর্মমূলক। ষোড়শ শতাব্দীর ধর্মীয় যুদ্ধের ভিত্তি হল ধর্ম সম্পর্কীয় বিরোধ। প্রতিটি ধর্মই নিজ নিজ আচার-অনুষ্ঠানের উপর অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করে।

ধর্মের বিরুদ্ধে অভিযোগ

কিন্তু, বিভিন্ন ধর্মের বাহ্যিক প্রকাশভঙ্গির মধ্যে যত পার্থক্যই থাক না কেন, ধর্মের মূল তাৎপর্যটুকু উপলব্ধি করলেই বোঝা যাবে যে, সংযোগকারী বা সংহতি শক্তি হিসেবে ধর্ম মোটেই অনুপযোগী নয়। প্রতিটি ধর্মেরই মূল লক্ষ্য এক পরম সত্তার (Supreme Reality) উপলব্ধি, ধর্ম হল সসীম মনের অসীমকে জানার প্রচেষ্টা ও আগ্রহ।

মানুষ যখন উপলব্ধি করে যে, এই পরম সত্তা সত্য, শিব ও সুন্দরের মূর্ত প্রতীক এবং সব মানুষই এক পরম সত্তার প্রকাশ তখনই মানুষের মধ্যে যথার্থ ধর্মবোধ জাগরিত হয়। প্রকৃত ধর্মবোধ জাগরিত হলে মানুষের সমস্ত ক্ষুদ্র স্বার্থবুদ্ধি তিরোহিত হয়, মানুষ অপরকে ভালবাসতে শেখে; প্রেম, মৈত্রী ও ভালবাসার নিগূঢ় বন্ধনে মানুষ পরস্পরের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কে সম্পর্কযুক্ত হয়। প্রকৃত ধর্ম মানুষকে মানুষের কাছে টেনে নিয়ে আসে, ধর্মান্ধতা বা বিকৃত ধর্মই মানুষের মধ্যে বৈষম্য সৃষ্টি করে।

যথার্থ ধর্মবোধ মানুষকে অপরের ভাব, বিশ্বাস ও ধারণাকে শ্রদ্ধা করতে শেখায়, মানুষকে ত্যাগী, ক্ষমাশীল, উদারমনা ও সংযমী করে তোলে।

ধর্মকে কেন্দ্র করে মানুষ যে সকল মনগড়া ধারণার সৃষ্টি করেছে, সেগুলিকে অতিরিক্ত প্রাধান্য দেওয়ার কোন সংগত কারণ নেই। রাধাকৃষ্ণাণ (*Radhakrishnan*) বলেন; "যখন আমরা সংস্কার বা সংজ্ঞা নিয়ে মতবিরোধ সৃষ্টি করি তখন আমরা পৃথক হয়ে পড়ি। কিন্তু যখন আমরা ধর্ম-জীবনের প্রার্থনা এবং ধ্যানকে আশ্রয় করি তখনই আমরা একত্র হই।"[1] অর্থাৎ ধর্মের আচারগত দিকটির উপর গুরুত্ব না দিয়ে ধর্মের মূল ভাবকে উপলব্ধি করতে পারলেই মানুষ বুঝতে পারে যে, সব ধর্মই এক; সব মানুষ এক পরম সত্তার প্রকাশ। মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক হল আধ্যাত্মিক সম্পর্ক। সব মানুষই এক বিশ্ব-সত্তার অংশ। একই ঐক্যের সূত্রে সমস্ত মানুষের মধ্যে এক নিগূঢ় বন্ধন বর্তমান। রাধাকৃষ্ণাণের মতে এই মূলীভূত ঐক্যের স্বীকৃতিই মানবজাতির সামগ্রিক কল্যাণের ভিত্তিতে কিছু পরিমাণ সহযোগিতাকে সম্ভব করে তুলবে।[2] বস্তুতঃ ধর্মই বিশ্বঐক্য ও বিশ্বশান্তির প্রতিষ্ঠার পথকে সুগম করে তুলতে পারে। সুতরাং সংহতি শক্তিরূপে ধর্মের উপযোগিতা কোনমতেই উপেক্ষণীয় নয়।

যথার্থ ধর্ম ও আচার অনুষ্ঠান পৃথক

৩। আন্তর্জাতিক ধর্ম (International Religion):

জগতের সব প্রধান প্রধান ধর্মই মানুষের ধর্মবোধকে ক্ষুদ্রতা ও সংকীর্ণতা থেকে মুক্ত করে তাকে উদার ও জনকল্যাণমূলক করে তোলার জন্য সচেষ্ট। বস্তুতঃ, ধর্মকে যদি নিছক আচার-অনুষ্ঠানের সঙ্গে অভিন্ন করে না দেখা হয় এবং সত্যকে জানা, সুন্দরকে ভালবাসা এবং ন্যায়পরতা ও জনকল্যাণের আদর্শে কাজ করাকেই যদি যথার্থ ধর্মের লক্ষণ বলে মনে করা হয়, তাহলে কোন ধর্মই নিজেকে আচার-অনুষ্ঠান ও স্বার্থের ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ রাখতে পারে না।

বস্তুতঃ, মানুষের সঙ্গে মানুষের বন্ধুত্ব, ভালবাসাকে সুদৃঢ় ও পারস্পরিক সম্পর্ককে ঘনিষ্ঠ করে তোলার জন্য বর্তমানে আন্তর্জাতিক সংঘের প্রতিষ্ঠা হয়েছে। দেশ, জাতি ও সম্প্রদায়ের ঊর্ধ্বে যে বৃহৎ মানবতার আদর্শ আছে তাকে সকলের সামনে

২. "The recognition of this fundamental unity should make possible a certain measure of co-operation on a common basis for the good of mankind as a whole"

—S. Radhakrishnan: Religion and Society; Page 51.

১. "When we dispute over dogmas and definitions we are divided. But when we take to the religious life of prayer and contemplation we are brought together."

—S. Radhakrishnan: Religion and Society: Page 53.

তুলে ধরে আন্তর্জাতিক বন্ধুত্ব ও সম্প্রীতিকে সুদৃঢ় করে তোলার জন্য এই আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান সচেষ্ট হচ্ছে। এই আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান বা সংঘ যদি জাতি-ধর্মনির্বিশেষে জনকল্যাণের আদর্শকেই সক্রিয়ভাবে প্রচার করতে চায় তাহলে এই সংঘের দৃষ্টিভঙ্গি মূলতঃ ধর্মমূলক দৃষ্টিভঙ্গি বলেই বিবেচিত হবে।

বিশ্বধর্মের প্রয়োজনীয়তা

ধর্মকে উচ্চতর দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দেখলে ধর্ম হল সত্য, শিব ও সুন্দরের প্রতি অনুরাগ। প্রত্যেক ধর্মের যেমন একটা আচার-অনুষ্ঠানের দিক আছে, তেমনি একটি নৈতিক দিকও আছে। এই আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সঙ্গে যদি এক আন্তর্জাতিক ধর্ম (international religion) বা বিশ্বধর্মের (world religion) উদ্ভব না হয়, তাহলে বিভিন্ন ধর্মের পার্থক্যহেতু যে তিক্ততা, বিবাদ ও শত্রুতা মাঝে মাঝে দেখা যায় তার পরিসমাপ্তি কখনই ঘটবে না। প্রতিটি ধর্মই যদি তার নীতি ও আচার অনুষ্ঠানের মধ্যে যা গতানুগতিক তাকে বড করে না দেখে, যা সত্য, সুন্দর ও কল্যাণজনক তাকেই বড় করে দেখে এবং সত্য, সুন্দর ও কল্যাণের আদর্শের প্রতি মানুষের অনুরাগকে সুদৃঢ় করতে সচেষ্ট হয় তাহলেই মানুষ ধর্ম-সম্পর্কীয় ক্ষুদ্রতা ও সংকীর্ণতাকে অতিক্রম করে সর্ব মানবের ঐক্যের আদর্শকে উপলব্ধি করতে পারবে। এই আন্তর্জাতিক ধর্ম বা বিশ্বধর্মই মানবতার বৃহত্তর আদর্শকে কার্যকরী করে তুলে আন্তর্জাতিক কলহ ও শত্রুতার পরিসমাপ্তি ঘটাতে এবং বিশ্বের মানুষকে এক ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে সংযুক্ত করে বিশ্বের শান্তি ও ঐক্যের নীতিকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হবে।

৪। বর্তমান কালে ধর্মের ভূমিকা (The Role of religion today):

বর্তমান যুগ বিজ্ঞানের যুগ, সেইহেতু বিজ্ঞানের প্রভাব স্বাভাবিকভাবেই মানুষের জীবনে এসে পড়েছে। এই বৈজ্ঞানিক প্রভাব মানুষকে অনেকখানি সংস্কারমুক্ত করে তুলেছে, বিচার বিশ্লেষণের মাধ্যমে ঘটনাকে ব্যাখ্যা করার জন্য উদ্বুদ্ধ করে তুলেছে। সেই কারণে অলৌকিক ঘটনামাত্রই মানুষের মনে তেমনভাবে আর বিস্ময় বা ভীতির ভাব জাগিয়ে তোলে না। কিন্তু তা বলে এমন ধারণা করা ভুল হবে যে এই বৈজ্ঞানিক প্রভাব মানুষের ধর্মভাবের বিলুপ্তি ঘটাতে পেরেছে। ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনে ধর্মের প্রয়োজনীয়তার প্রশ্ন কারও কারও মনে জেগেছে। বিশেষ করে ধর্মে বিশ্বাস নেই এমন লোকেরও যেমন অভাব সমাজে দেখা যায় না, তেমনি সমাজের এক বৃহত্তর অংশের মধ্যে ধর্ম-চেতনা এখনও খুবই প্রবল।

সমাজের বৃহত্তর অংশের মধ্যে ধর্মচেতনা এখনও প্রবল

পূর্বের মতো বর্তমান যুগে ধর্মের কোন প্রয়োজনীয়তা আছে কি না, কেউ কেউ এমন প্রশ্ন করেন। 'সত্য, শিব ও সুন্দরের' আরাধনাই যদি যথার্থ ধর্মভাবের পরিচায়ক হয় তাহলে এই বৈজ্ঞানিক যুগেও ধর্মের প্রয়োজনীয়তা আছে তা সহজেই বলা যেতে পারে। বরং এমন কথাও বলা যেতে পারে যে, মানুষের সবরকম ভেদাভেদ দূর করে দিয়ে, বিশ্ব ঐক্যের পথ সুগম করে তুলতে পারে একমাত্র ধর্মই।

ধর্মই বিশ্ব ঐক্যের পথ সুগম করে তুলতে পারে

বর্তমান যুগে ধর্মের প্রধান ভূমিকা হবে মানুষের সঙ্গে মানুষের প্রীতির বন্ধনকে দৃঢ় করে তোলা। ধর্মের বহিরঙ্গ অর্থাৎ বাহ্যিক আচার-অনুষ্ঠান, রীতি-নীতি, নিষ্ঠাভবে পালন করাই যে যথার্থ ধর্মবোধের পরিচায়ক নয়, বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায়ভুক্ত মানুষকে সেই শিক্ষাই দিতে হবে। প্রতিটি ধর্ম যেন মানুষকে এই শিক্ষাই দেয় যে, যথার্থ ধর্মবোধ এমন এক পরমসত্তায় বিশ্বাস সূচিত করে যিনি সত্য, শিব ও সুন্দরের মূর্তরূপ। অপরের প্রতি বিদ্বেষ, ঘৃণা, হিংসার মনোভাব বহন করা যথার্থ ধর্মবোধের পরিচায়ক নয়। ধর্ম প্রতিটি মানুষকে নীতিপরায়ণ, সদাচারী, কর্তব্যপরায়ণ, উদার ও সংযমী হতে শিক্ষা দেবে—ব্যক্তিগত ও সামাজিক উভয় প্রকার কর্তব্য সম্পাদনে মানুষকে সমানভাবে সচেতন করে তুলবে এবং জীবনের পরম মূল্যগুলিকে লাভ করে নিজের চারিত্রিক পূর্ণতা লাভে তাকে উদ্বুদ্ধ করে তুলবে। ধর্মের প্রকৃত অর্থ উপলব্ধি করলে মানুষ বুঝতে পারবে যে ধর্মান্ধতাই মানুষকে সংকীর্ণমনা, ক্ষুদ্রচেতা, স্বার্থপর ও নির্বিচারী করে তোলে, যথার্থ ধর্মভাব নয়। প্রতিটি ধর্মকেই নিজ নিজ ধর্মের দোষত্রুটি সম্পর্কে সচেতন হয়ে সেইগুলিকে সংশোধন করতে হবে এবং বিশ্বশান্তি ও ঐক্যের পথে ধর্ম যেন কোন বাধা সৃষ্টি করতে না পারে তার দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। বস্তুতঃ যখন প্রতিটি মানুষ উপলব্ধি করবে যে আমরা সবাই একই ঈশ্বরের সন্তান, একই পরম সত্তার প্রকাশ তখনই সব রকম ভেদাভেদ দূরীভূত হবে, মানুষ যথার্থ মনুষ্যত্ববোধে উদ্বোধিত হয়ে পারস্পরিক মিলনের যোগসূত্রটি দৃঢ় করে তুলতে পারবে। এ কঠিন কর্তব্য একমাত্র ধর্মের দ্বারাই সম্ভব। সেইকারণে অতীতের তুলনায় বর্তমান যুগে ধর্মের ভূমিকা আরও বেশী গুরুত্বপূর্ণ।

বর্তমান যুগে ধর্মের কর্তব্য

সপ্তদশ অধ্যায়

ধর্ম এবং জ্ঞানের সমস্যা

(Religion and Problem of Knowledge)

১। সত্তার প্রকৃতি এবং জ্ঞানের সমস্যা (The Nature of Reality and Problem of Knowledge) :

ধর্মের প্রকৃতি সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে আমরা দেখেছি যে ধর্ম এক পরম সত্তার অস্তিত্বে বিশ্বাসী। স্বাভাবিকভাবেই মনে প্রশ্ন জাগে, মানুষের মন কি এই পরম সত্তাকে জানতে সক্ষম? অলৌকিকের প্রকৃতিকে কি মানুষ জানতে পারে?

জ্ঞানের সমস্যা এবং সত্তার সমস্যা পরস্পর সম্পর্কযুক্ত

অধিবিদ্যার অন্যতম শাখা জ্ঞানবিদ্যা মানুষের জ্ঞানের প্রকৃতি, উৎপত্তি, সম্ভাবনা এবং সীমা নিয়ে আলোচনা করে। কাজেই অনেকে মনে করেন উপরিউক্ত প্রশ্নের উত্তর দেবার দায়িত্ব জ্ঞানবিদ্যার। একটা বিষয়কে স্বীকার না করে উপায় নেই যে, সত্তার প্রকৃতিকে কেন্দ্র করে যে সমস্যা, জ্ঞানকে কেন্দ্র করে যে সমস্যা, এই দুই সমস্যাকে পরস্পরের থেকে বিচ্ছিন্ন করা চলে না। কেননা সত্তার প্রকৃতি সম্পর্কে আমরা যে রকম ধারণা করব তার উপরেই নির্ভর করছে জ্ঞানের সম্ভাবনা এবং প্রকৃতির ধারণা এবং এর বিপরীত কথাও সমানভাবে সত্য।

জ্ঞানের উৎসগুলির বিশ্বাসযোগ্যতা অনুসন্ধান করে দেখা প্রয়োজন

সংশয়বাদীরা যখন বলেন যে মনের পক্ষে পরমতত্ত্বকে জানা সম্ভব নয়, তখন নিঃসন্দেহে ধর্মের ভিত্তি দুর্বল হয়ে পড়ে। কাজেই যার মাধ্যমে আমরা জ্ঞান লাভ করি, জ্ঞানের সেই উৎসগুলি কতদূর পর্যন্ত বিশ্বাসযোগ্য বা নির্ভরযোগ্য তা অনুসন্ধান করে দেখা প্রয়োজন।

বুদ্ধিবাদীদের মতে সত্যতা বুদ্ধির দ্বারা জ্ঞেয়

বিশ্বের অধিকাংশ চিন্তাবিদ্‌ই সত্য আবিষ্কারের মাধ্যম বা উৎস হিসেবে মানুষের বিচারবুদ্ধির (reason) উপর পরম আস্থা জ্ঞাপন করেছেন। প্রাচীন দার্শনিকদের মধ্যে প্লেটো, অ্যারিস্টটল এবং আধুনিক দার্শনিকদের মধ্যে দেকার্ত, স্পিনোজা, লাইবনিজ, হেগেল প্রমুখ ব্যক্তির নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। এই সব দার্শনিক চিন্তন এবং সত্যতার মধ্যে কোন ফাঁক আছে বলে মনে করেন নি। কিন্তু মানুষের বিচারবুদ্ধি বা মানুষের মন বিষয়ের সত্যতাকে উপলব্ধি করতে পারে—এই বিষয়টিকে সকলে স্বীকার করে নিতে পারেন নি। মন যে সত্যতাকে উপলব্ধি করতে পারে, এই ব্যাপারে—প্রাচীন গ্রীসদেশে সোফিস্ট নামে এক শ্রেণীর কূটতার্কিক পণ্ডিত এবং সংশয়বাদীরা সংশয় প্রকাশ করেছিলেন।

বর্তমান যুগে দৃশ্যমান বা আবভাসিক জগত (phenomenal world) সম্পর্কীয় জ্ঞানের অগ্রগতি বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হলেও, আবভাসিক জগতের অন্তরালে অবস্থিত সত্তার জ্ঞান লাভ করার ক্ষমতায় কেউ কেউ সংশয় প্রকাশ করেছেন, আবার কেউ কেউ বা একেবারেই তাকে অস্বীকার করেছেন।

ফরাসী দার্শনিক দেকার্ত সংশয়বাদী দার্শনিক ছিলেন না। তিনি ছিলেন বুদ্ধিবাদী দার্শনিক। জ্ঞানের সম্ভাবনায় তাঁর পুরোপুরি আস্থা ছিল। ইংরেজ অভিজ্ঞতাবাদীরা, দার্শনিক লক ছিলেন যাদের পুরোধা, চিন্তনকে এমন পথে চালিত করলেন যার পরিণতি সংশয়বাদে, অর্থাৎ সত্তার যথার্থ জ্ঞানের সম্ভাবনায় সংশয় প্রকাশ করা হল। লক এবং তাঁর অনুরাগীবৃন্দের মতে ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষণই জ্ঞানের একমাত্র উৎস এবং এই জ্ঞান বিশেষ ঘটনা থেকে কখনও সামান্য এবং অনিবার্য সত্যের দিকে মনকে চালিত করতে পারে না। লকের মতে আমরা বস্তু জগতকে জানতে পারি না, আমরা যা জানি তা হল ধারণা। কিন্তু লক-এর মতে বিস্তৃতি, গতি, আকার, আকৃতি প্রভৃতি মুখ্য গুণগুলি বস্তুতে অবস্থিত। কিন্তু বর্ণ, শব্দ, উত্তাপ প্রভৃতি গৌণ গুণগুলি বস্তুর প্রতিলিপি (copies) নয়; এগুলি মনে অবস্থিত সংবেদন মাত্র, যেগুলিকে আমরা বস্তুতে আরোপ করি। দার্শনিক বার্কলে আর এক ধাপ এগিয়ে গেলেন। তিনি মুখ্য গুণগুলিকে (primary qualities) মনের আভ্যন্তরীণ বা আন্তর অবস্থাতে (internal states) রূপান্তরিত করলেন। অর্থাৎ মুখ্যগুণগুলিও বস্তুগত নয়, মনোগত। কাজেই একমাত্র মন এবং ধারণার অস্তিত্বই স্বীকার করা চলে। দর্শনে এই মতবাদ আত্মগত ভাববাদ বা মানসবাদ (subjective idealism or mentalism) নামে পরিচিত। দার্শনিক হিউমের হাতে এই অভিজ্ঞতাবাদ পরিণতিলাভ করল পরিপূর্ণ সংশয়বাদে। হিউম সুস্পষ্টভাবেই প্রকাশ করলেন যে সামান্য যথার্থ জ্ঞান লাভ করা সম্ভব নয়। এর ফলে জ্ঞান সত্তা থেকে সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ল।

লক, বার্কলে এবং হিউমের অভিজ্ঞতাবাদ

হিউমের মতবাদের পরিণতি দার্শনিক কাণ্টকে বাধ্য করল সমস্ত সমস্যাটিকে খুঁটিয়ে দেখতে। দার্শনিক কাণ্ট জ্ঞানের সার্বিকতা এবং অনিবার্যতাকে স্বীকার করে নিলেন। কিন্তু তিনি যে অভিমত প্রকাশ করলেন তা হল এই যে, মনের পক্ষে সার্বিক এবং অনিবার্য জ্ঞান লাভ করা সম্ভব হলেও, মন পরমসত্তার জ্ঞান লাভ করতে পারে না। বস্তু যেভাবে প্রকাশিত হয় তাকেই জানা সম্ভব, স্বরূপতঃ বস্তুর জ্ঞান লাভ করা সম্ভব নয়।

কাণ্টের মতে স্বরূপতঃ বস্তুর জ্ঞান লাভ করা সম্ভব নয়

হাক্সলে (*Huxley*) এবং হারবার্ট স্পেন্সার (*Herbert Spencer*)-এর অভিমতানুসারে পরম সত্তা অজ্ঞাত এবং অজ্ঞেয়। কোঁৎ এবং প্রত্যক্ষবাদীরা (positivists) চরম অজ্ঞেয়তাবাদী। তবে এই চরম অজ্ঞেয়তাবাদ এখন দর্শনে অচল।

হাক্সলে এবং স্পেন্সার-এর মতে পরম সত্তা অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয়

ইংরেজ অভিজ্ঞতাবাদ এবং কাণ্টের বিচারবাদ জ্ঞানের ক্ষেত্রে যে অচল অবস্থার সৃষ্টি করল, তার ফলে দার্শনিকরা সত্তার জ্ঞানলাভের জন্য ভিন্ন কোন পদ্ধতির কথা চিন্তা করতে লাগলেন। অবশ্য এই প্রচেষ্টার কৃতিত্ব কিন্তু জার্মান দার্শনিক ইমানুয়েল কাণ্টের। তিনি ব্যবহারিক বিচারবুদ্ধি (practical reason) বা নৈতিক ইচ্ছা (moral will)-র উপর গুরুত্ব আরোপ করলেন এবং নৈতিক ইচ্ছার স্বীকার্য সত্যরূপে ঈশ্বর, ইচ্ছার স্বাধীনতা এবং অমরতার কথা ব্যক্ত করলেন। তাঁর মতে তাত্ত্বিক বা মননধর্মী বিচারবুদ্ধির (speculative reason) পক্ষে পরম তত্ত্বকে জানা সম্ভব নয়। শুদ্ধ বিচারবুদ্ধির দৃষ্টিতে এই পরম নীতিগুলি হল আদর্শ বা নিয়ামক ধারণা (regulative ideas)। এগুলিকে প্রমাণও করা যায় না এবং অপ্রমাণও করা যায় না। যে নৈতিক নিয়ম শর্তহীন আদেশ, তাকে যদি বৈধ হতে হয়, তাহলে উপরিউক্ত স্বীকার্য সত্যগুলিকে অবশ্যই বৈধ হতে হবে।

কাণ্টের নৈতিক ইচ্ছার স্বীকার্য সত্য

কাণ্টের বক্তব্যের এই দিকটি থেকে উদ্ভূত হল নানা ধরনের স্বজ্ঞাবাদ (intuitionism)। স্বজ্ঞাবাদীরা শুদ্ধ বিচারবুদ্ধি ছাড়াও পরম সত্তাকে জানার জন্য অন্য পদ্ধতি অনুসরণে সচেষ্ট হল। এই সব দার্শনিকদের মধ্যে অগ্রগণ্য হলেন দার্শনিক সোপেনহাওয়ার। কাণ্টের মতন তিনিও ইচ্ছার উপর গুরুত্ব আরোপ করলেন। তাঁর মতে, চিন্তনের মাধ্যমে নয়, স্বজ্ঞা বা প্রত্যক্ষ অনুভূতি (intuition)-র মাধ্যমে আমরা আমাদের মধ্যে ইচ্ছার অস্তিত্ব সম্পর্কে অবহিত হই। আমরা নিজেদের সম্পর্কে অবহিত হতে গেলেই এই বিষয়টি জানতে পারি। বার্গসোঁ-ও বৌদ্ধিক চিন্তনের মধ্য দিয়ে নয়, যে মানুষের চেতনা নিজের কাছে প্রত্যক্ষভাবে প্রকাশিত হয়, সেই চেতনার মধ্য দিয়েই সত্তার জ্ঞান লাভ করা যায় বলে মনে করেন। অবশ্য বার্গসোঁ ধর্মসম্পর্কীয় জ্ঞানের সমস্যা নিয়ে আলোচনা করেননি। তবে তিনি যা বলতে চেয়েছেন তার সঙ্গে ধর্মবিষয়ক অতীন্দ্রিয়বাদের (religious mysticism) মিল লক্ষ্য করা যায়। বার্গসোঁ-র মতে পরমতত্ত্বকে জানতে হবে প্রত্যক্ষ উপলব্ধির মাধ্যমে, বিচারধর্মী চিন্তনের মাধ্যমে নয়। ধর্মবিষয়ক অতীন্দ্রিয়বাদেও বলা হয় যে আধ্যাত্মিক বিষয়কে আধ্যাত্মিক

সোপেনহাওয়ার এবং বার্গসোঁ-র প্রত্যক্ষ অনুভূতি বা স্বজ্ঞা

ভাবেই জানতে হবে (spiritual things are spiritually discerned)। আধ্যাত্মিক বিষয়কে বাইরে থেকে দেখে উপলব্ধি করা যাবে না। তাদের ভেতর থেকে উপলব্ধি করতে হবে। এর অর্থই হল আধ্যাত্মিক সত্তার সঙ্গে সহানুভূতিমূলক একাত্মতাবোধ।

জ্ঞান বলতে যদি বোঝায় যৌক্তিক জ্ঞান বা প্রত্যয়ের মাধ্যমে জ্ঞান তাহলে পরম তত্ত্বকে তার মাধ্যমে কখনও জানা সম্ভব হবে না। একমাত্র স্বজ্ঞা বা প্রত্যক্ষ অনুভূতির মাধ্যমেই পরম তত্ত্ব জ্ঞেয়। কাজেই দেখা যাচ্ছে যে ধর্মীয় অভিজ্ঞতার সঙ্গে বার্গসোঁ-র মতবাদ অসঙ্গতিপূর্ণ নয়। যদি মানবীয় অভিজ্ঞতা এবং বস্তুর যথার্থ প্রকৃতির মধ্যে কোন ভেদরেখা টানা হয়, যদি পরমতত্ত্ব হয়ে পড়ে অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয়, মানবমনের প্রবেশাধিকার যেখানে নেই তাহলে ধর্ম অসম্ভব হয়ে পড়ে। স্বজ্ঞা বা প্রত্যক্ষ অনুভূতির মধ্য দিয়েই বস্তুর যথাযথ প্রকৃতির সঙ্গে এক গভীর অন্তরঙ্গতা সূচিত হওয়া সম্ভব। কাজেই কেউ কেউ মনে করেন বার্গসোঁ ধর্মের স্বার্থ রক্ষা করতে সক্ষম হয়েছেন। বিচারবুদ্ধির তুলনায় স্বজ্ঞা মনে হয় অধিকতর ব্যাপক। কিন্তু সমালোচনায় একথা বলা হয় যে, ধর্মের স্বার্থ রক্ষা করতে গিয়ে বার্গসোঁ চিন্তন ও স্বজ্ঞার মধ্যে যে পার্থক্যের রেখা টেনেছেন তাতে জ্ঞানের অর্থ ও পরিসর খুবই সঙ্কুচিত হয়ে পড়েছে। অনেকে মনে করেন যে, চিন্তন ও স্বজ্ঞার মধ্যে কোন ভেদরেখা নেই। বিচারবুদ্ধিসম্মত মনন ব্যতিরেকে যদি স্বজ্ঞার কথা বলা হয় তাহলে তা হবে এক বিভ্রান্তি সৃষ্টিকারী অনুভূতি এবং তা হবে সহজাত প্রবৃত্তির মতনই মূক এবং অস্পষ্ট। বিচারবুদ্ধিকে পরিহার করার অসুবিধা অনেক, বিচারবুদ্ধিকে বর্জন করলে ব্যক্তিগত আবেগের প্রবেশপথ অতি সহজেই উদ্ঘাটিত হয়। বিচারবুদ্ধিবর্জিত স্বজ্ঞা হয়ে উঠে ব্যক্তিকেন্দ্রিক, একান্ত নিজস্ব কিছু, যাকে প্রকাশ করা কঠিন হয়ে পড়ে, যার অংশীদার হওয়া চলে না। স্বজ্ঞা আদান-প্রদানের যোগসূত্র হয়ে উঠতে পারে না। কিন্তু সত্যতা হল বস্তুগত, সামাজিক ; সকলেই এর অংশীদার হতে পারে, অপরের কাছে একে প্রকাশ করা যায়। এ যেন সাধারণের সম্পত্তি।

বার্গসোঁর মতবাদ ধর্মীয় অভিজ্ঞতার সঙ্গে অসঙ্গতিপূর্ণ নয়

স্বজ্ঞার অসুবিধা

বার্গসোঁ স্বীকার করেন যে পরমতত্ত্বের অভিজ্ঞতা লাভ করা সম্ভব এবং ধর্মীয় চেতনাও দাবী করে যে সে পরম তত্ত্বের অভিজ্ঞতা লাভ করতে পারে। কিন্তু পরম সত্তার অভিজ্ঞতা লাভ যদি সম্ভব হয়, সুস্পষ্ট ধারণার মাধ্যমে তাকে প্রকাশ করার পথে বাধা দেখা দেবার প্রশ্ন ওঠে না। ধর্মীয় অভিজ্ঞতা এবং ধর্মীয় ধারণার মধ্যে কোন অনিবার্য অসংগতি নেই। ধর্ম যদি নিছক অনুভূতির ব্যাপার না হয় তবে বৌদ্ধিক

পরমসত্তার অভিজ্ঞতা অবশ্যই সুস্পষ্ট ধারণার মাধ্যমে ব্যক্ত করা প্রয়োজন

ধারণাকে স্বীকার করে নিতেই হবে। কেননা ধর্মদর্শনের প্রধান সমস্যা হল পরম সত্তাকে প্রকাশ করার ব্যাপারে ধর্মীয় ধারণা উপযোগী হয়ে উঠেছে কিনা, সেটি বিচার করে দেখা।

প্রয়োগবাদ (Pragmatism)-এর মধ্যেও বিচারবুদ্ধি বিরোধী মনোভাব পরিলক্ষিত হয়। এই মতবাদ অনুসারে মানুষের প্রকৃতিতে বিচারবুদ্ধির স্থান মুখ্য নয়, গৌণ; বিচারবুদ্ধি ইচ্ছার যন্ত্র বা উপায়স্বরূপ। সব চিন্তনই ব্যক্তিগত এবং উদ্দেশ্যমূলক। ধারণা, কোন পূর্বস্থিত সত্তার প্রতিলিপি নয়, মানুষের প্রয়োজনে সৃষ্ট যন্ত্র বা মাধ্যম মাত্র। ধারণা হল ধারণা যা করে। ধারণা সত্য হয় তার ক্রিয়ার মাধ্যমে। সত্যতা হল এক কার্যকর প্রকল্প মাত্র। উদ্দেশ্য বর্জিত ধারণার কোন অস্তিত্ব নেই। নিজে নিজে অস্তিত্বশীল বা যে সত্যতা নিজেকে নিজে ধারণ করে আছে এমন কোন সত্যতাকে জানার প্রশ্নই ওঠে না। সত্যতাকে জানাতে গিয়েই আমরা তাকে সত্য করে তুলি। সত্যকে আমরা আবিষ্কার করি না। কেননা পূর্ব থেকে এমন কোন সত্যতার অস্তিত্ব নেই, যাকে আবিষ্কার করা যেতে পারে। প্রমাণ করা মানে সত্যতার সন্ধান পাওয়া নয়; সত্যতাকে তৈরি করা। অর্থাৎ কিনা, সত্তাকে তৈরি করা। কাজেই জ্ঞান সত্তার মনন বা অনুধাবন নয়। আমাদের উদ্দেশ্য অনুসারে সত্তাকে গঠন করা। কাজেই সত্যতা ও জ্ঞানের মধ্যে কোন ফাঁক নেই।

প্রয়োগবাদীদের বিচার-বুদ্ধিবিরোধী মনোভাব

আমাদের উদ্দেশ্য অনুসারে আমরা সত্তাকে গঠন করি

উদ্দেশ্য বর্জিত সত্যতার অনুসন্ধান যে এক অসম্ভব ব্যাপার, সেই বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করে প্রয়োগবাদীরা ঠিক কাজই করেছেন। কিন্তু প্রয়োগবাদীদের বক্তব্য—মানুষ সত্যতা তৈরি করে, তাকে আবিষ্কার করে না বা পূর্বস্থিত কোন সত্যকে দেখার প্রশ্ন ওঠে না—এ জাতীয় অভিমত পরম সত্য বা বস্তুগত সত্যতাকে অস্বীকার করারই সামিল। আমরা সত্তা (reality) গঠন করি, এই অভিমতও গ্রহণযোগ্য নয়। সত্তার গঠন যদি অসমাপ্ত হয়ে থাকে তাকে সম্পূর্ণতা দানের ব্যাপারে আমাদের ভূমিকা রয়েছে, একথা বলা যেতে পারে। কিন্তু কোন পূর্বস্থিত সত্তাকে স্বীকার করে নিলেই তবে আমরা এমন কথা বলতে পারি। জ্ঞানের সমস্যাই হল যে, পূর্বস্থিত বস্তুর সংগতিকে কি ভাবে আমরা জানতে পারি। আগে থেকে একটা কিছু আছে যাকে আমরা জানি। জানতে গিয়ে আমরা তাকে তৈরি করি, এটা ভাবা নিতান্তই ভুল। প্রয়োগবাদীরা সত্যতা এবং সত্যতাকে জানার প্রক্রিয়া— এই দুটিকে অভিন্ন গণ্য করে

প্রয়োগবাদীদের অভিমতের সমালোচনা

সত্যতা সম্পর্কীয় জ্ঞান লাভের সমস্যাকে খুব সহজ করে তুলেছেন। জ্ঞানের ক্ষেত্রে প্রদত্ত সত্তা, যা জ্ঞেয়, তাকে অস্বীকার করার অর্থ জ্ঞানের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদানকে অস্বীকার করা। নিঃসন্দেহে এটি একটি জটিল সমস্যা সমাধানের একটি অতি সহজ উপায়, যাকে সমর্থন করা চলে না।

জ্ঞানবিদ্যাসম্পর্কীয় অজ্ঞেয়তাবাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করলেন এক দল দার্শনিক, যাঁরা নব্য-বস্তুবাদী (neo-realists) নামে পরিচিত। বার্ট্রাণ্ড রাসেল, স্যামুয়েল আলেকজাণ্ডার প্রমুখ দার্শনিক এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। এঁরা মনে করেন বিশ্লেষণ এবং ধারণার মাধ্যমেই সত্তাকে জানা যেতে পারে এবং সত্তার জ্ঞান-নিরপেক্ষ অস্তিত্ব আছে।

অজ্ঞেয়তাবাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ জানালেন নব্য বস্তুবাদী রাসেল, আলেকজাণ্ডার প্রভৃতি দার্শনিক

দার্শনিক মনোভাবাপন্ন বৈজ্ঞানিক যেমন এ. এন. হোয়াইট হেড (*A. N. Whitehead*) মুখ্য ও গৌণ গুণের পার্থক্যকে অস্বীকার করলেন এবং সুস্পষ্টভাবে এই অভিমত ব্যক্ত করলেন যে, যা কিছু প্রত্যক্ষিত হয়, সবই প্রকৃতিতে রয়েছে। একটিমাত্র প্রকৃতির অস্তিত্ব আছে, আমাদের প্রত্যক্ষণমূলক জ্ঞানের ক্ষেত্রে যাকে আমরা আমাদের সামনে উপস্থিত দেখতে পাই। প্রত্যয় (concepts)-এর চেতনা-নিরপেক্ষ বাস্তব অস্তিত্ব আছে, যেমন দেশে অবস্থিত বস্তুর অস্তিত্ব রয়েছে। বার্ট্রাণ্ড রাসেলও মনে করেন যে ইন্দ্রিয় উপাত্তের মতন সামান্যের (universals)-ও তাৎক্ষণিক জ্ঞান লাভ করা যায়।

হোয়াইট্‌হেড-এর মন্তব্য

নব্য বস্তুবাদীরা চিন্তনের উপর মানুষের আস্থাকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করলেন, কেননা তাঁরা স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করলেন যে মানুষের চিন্তন তার নিজের ক্ষমতার দ্বারাই সত্যকে জানতে পারে। কিন্তু নব্য বস্তুবাদীরা প্রকৃতি সম্পর্কে তাঁদের বক্তব্য যত সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করলেন, পরম মূল্য (ultimate values) এবং বিশ্বজগতের বা সমগ্র অভিজ্ঞতার অর্থ অনুধাবনের ব্যাপারে চিন্তন কতখানি উপযোগী তা সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করলেন না। মূল্যের জগৎ সম্পর্কে তাঁরা নীরব। বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের ক্ষেত্রে নব্য-বস্তুবাদীরা ব্যক্তি-সাপেক্ষতা এবং অজ্ঞেয়তাবাদের হাত থেকে মানুষকে মুক্ত করতে সহায়তা করলেও, আধ্যাত্মিক জীবনের মূল্য ও মৌলিক সত্যকে জানার ব্যাপারে চিন্তন কতখানি উপযোগী তার সম্পর্কে কোন সুস্পষ্ট বক্তব্য রাখতে পারেন নি।

নব্য বস্তুবাদীদের অভিমতের সমালোচনা

পরম সত্তাকে জানার ব্যাপারে চিন্তনের উপযোগিতার উপর আরও অধিক আস্থা স্থাপন করলেন এক ধরনের ভাববাদ, হেনরী জোনস্, বোসাঙ্কোয়েট, হেলডেন

প্রভৃতি যাঁর সমর্থক। বোসাঙ্কোয়েট বললেন সত্যকে জানাই মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক, ভ্রমই ব্যতিক্রম। মনের চিন্তন যদি শুদ্ধ ও ত্রুটিমুক্ত হয় তাহলে এই চিন্তনের মাধ্যমে সত্তার সত্য পরিচিতি উদ্‌ঘাটিত হবে। কেননা চিন্তার ধর্মই হল সত্তার বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে আমাদের পরিচয় করিয়ে দেওয়া। এটাই চিন্তনের স্বাভাবিক কাজ। বার্কলের ভাববাদের সঙ্গে পার্থক্য করার জন্য হেনরী জোনস্ এঁকে 'বস্তুবাদী ভাববাদ' (realistic idealism) নামে আখ্যাত করেছেন।

বস্তুবাদী ভাববাদের বক্তব্য

বস্তুবাদীদের মতন এঁরা মনে করেন যে ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষগ্রাহ্য এই জগতের জ্ঞান-নিরপেক্ষ অস্তিত্ব আছে। কিন্তু এঁরা আরও মনে করেন যে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য এই জগৎ, যে জগৎ স্বাভাবিক অভিজ্ঞতার ও বৈজ্ঞানিক বর্ণনার বিষয়, সমগ্র সত্তার একটা অংশ মাত্র এবং মানুষের মন এই সমগ্র সত্তাকে জানতে পারে, যখন তার অনুধাবনের ক্ষমতা ব্যাপকতর হয়, তার অন্তর্দৃষ্টি গভীরতর হয়। তখন এই অখণ্ড সত্তার বিভিন্ন অংশের মধ্যে যে অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক আছে তা সে উপলব্ধি করতে পারে এবং তাদের অন্তর্নিহিত গভীরতর অর্থও তার কাছে সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। ধর্মীয় অভিজ্ঞতাও মনে করে যে সমগ্র বিশ্বজগতের অস্তিত্বের পক্ষে যে অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য তার অন্তর্দৃষ্টি লাভ করা সম্ভব; হতে পারে এই অন্তর্দৃষ্টি একেবারে নিখুঁত নয়, তবে এই অন্তর্দৃষ্টির ব্যাপকতা যতদূর, এর সত্যতা ও যাথার্থ্যের ব্যাপকতাও ততখানি।

বিশ্বজগত সম্পর্কে অভ্রান্ত এবং চূড়ান্ত জ্ঞানের অধিকারী কোন মানুষই কখনও এই বিষয়টি দাবী করতে পারে না, কারণ মানুষের অভিজ্ঞতা অসম্পূর্ণ এবং তার ক্রমবর্ধমান অভিজ্ঞতার সঙ্গে সঙ্গে তার জ্ঞানও বাড়তে থাকে। আমাদের জ্ঞান যে শুধু অসম্পূর্ণ তা নয়, জ্ঞানের ক্ষেত্রে ভুলভ্রান্তি দেখা দিতে পারে, এবং যা অলীক তার সম্পর্কেও আমরা জ্ঞান লাভ করেছি, ভাবতে পারি। আমাদের ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষ আমাদের অনেক ক্ষেত্রে প্রতারিত করে এবং বিজ্ঞানের অনেক গৃহীত সত্য পরবর্তীকালে ভ্রান্ত প্রমাণিত হয়েছে। আমাদের অনেক সুনিশ্চিত বিশ্বাস-এর সমর্থনে তর্কবিদ্যাসম্মত প্রমাণ উপস্থাপিত করা কঠিন। যেমন, নিজের অস্তিত্ব ছাড়া, অপর ব্যক্তির এবং বাহ্য জগতের অস্তিত্ব যুক্তিসম্মত উপায়ে প্রমাণ করা কঠিন হয়ে পড়ে। বিষয়বস্তু যত অমূর্ত (abstract) এবং আকারগত (formal) হয়, ততই বিষয়বস্তুর প্রাঞ্জল আলোচনা সম্ভব হয় এবং আলোচনাকে একটা পরিণতির দিকে টেনে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়। যদিও এসব ক্ষেত্রে জ্ঞান হয়ে ওঠে অনেকটা

বিষয়বস্তু অমূর্ত হলে তার প্রাঞ্জল আলোচনা সম্ভব

আপেক্ষিক। গণিতশাস্ত্র অমূর্ত বিষয় নিয়ে আলোচনা করে, এবং সেই কারণে আমরা গণিতশাস্ত্রে প্রমাণমূলক নিশ্চয়তা লাভে সক্ষম হই এবং আলোচনার ক্ষেত্রে উপসংহার টানতে পারি। কিন্তু পরমতত্ত্ব সম্পর্কে যদি প্রমাণমূলক নিশ্চয়তা লাভ এবং চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণে আমরা অসমর্থ হই তাহলে তাতে বিস্ময়ের কিছু আছে বলে আমরা মনে করতে পারি কি?

কাজেই মায়েল এডওয়ার্ডস-এর ভাষায় অতীন্দ্রিয় রহস্যের প্রতি আমাদের মনোভাবের ক্ষেত্রে সশ্রদ্ধ অজ্ঞেয়তাবাদ (reverent agnosticism)-এর প্রয়োজন আছে। এই সশ্রদ্ধ অজ্ঞেয়তাবাদই ধর্মের প্রাণ। এই সশ্রদ্ধ অজ্ঞেয়তাবাদের অর্থ হল

অতীন্দ্রিয় রহস্যের প্রতি সশ্রদ্ধ অজ্ঞেয়তাবাদ

যে, মানুষের চিন্তন এবং ভাষার সম্পর্ক এতই অপর্যাপ্ত যে, যে অনির্বচনীয় শক্তি সকল বস্তুকে নিয়ন্ত্রিত করে, তার সব সত্যতা এবং অর্থকে প্রকাশ করার ব্যাপারে মানুষের চিন্তন ও ভাষা অক্ষম। সব রকম গভীর আধ্যাত্মিকতার ক্ষেত্রে পরম সত্তার সুগভীর রহস্য উদ্ঘাটনের ব্যাপারে আমাদের উপলব্ধির সব রকম মানবীয় মাধ্যমের বা উপায়ের অপর্যাপ্ততা সম্পর্কে চেতনা লেগেই থাকে। পরমতত্ত্বের অলৌকিক প্রকৃতি এবং অস্তিত্ব সম্পর্কে নিছক অনিশ্চয়তার বোধ এবং পরমতত্ত্বের মহত্ত্ব সম্পর্কে ধর্মপ্রবণ আত্মার উপলব্ধির ফলে যে সশ্রদ্ধ ভয়ের চেতনা—এই দুই এর মধ্যে অবশ্যই পার্থক্য আছে। [1]মায়েল এডওয়ার্ডস যথার্থই বলেছেন যে, "সুস্থ অতীন্দ্রিয়তাবাদ এবং অকৃত্রিম সংশয়বাদ অপরিহার্যভাবে পরস্পরের বিরোধী।"

এর অর্থ হল যদিও আমরা সবকিছু জানি না, আমাদের জ্ঞানের বিস্তৃতি যতদূর তার বৈধতাও ততদূর। পরিপূর্ণ সংশয়বাদ অযৌক্তিক এবং নিজেকেই নিজে খণ্ডন করে। কেননা সংশয়বাদীরা বলেন যে আমরা যা জানতে পারি না তা আমরা জানি। প্রশ্ন হল, তাহলে, তিনি তা জানলেন কিভাবে? সংশয় এক ধরনের বিশ্বাস। সংশয় করতে গেলে নিশ্চয়তার কোন মানদণ্ড পূর্ব থেকে স্বীকার করে নিতে হয়, কোন জ্ঞানের পূর্ণতার আদর্শকে পূর্ব থেকে স্বীকার করে নিতে হয়, যে আদর্শ নীতিগতভাবে

আত্মকেন্দ্রিকতাবাদ ব্যবহারিক দিক থেকে গ্রহণযোগ্য নয়

আমাদেরই আদর্শ। আত্মকেন্দ্রিকতাবাদীরা (solipsists) যখন বলেন যে আমি ছাড়া অন্য ব্যক্তি ও কোন বাহ্য জগতের অস্তিত্ব যুক্তিযুক্তভাবে সিদ্ধান্ত করা যায় না তখন তাত্ত্বিক দিক থেকে এই অনিশ্চয়তাকে গ্রহণ করা সম্ভব হলেও ব্যবহারিক দিক থেকে সম্ভব নয়। আমি

1. "Healthy mysticism and genuine scepticism are thus intrinsically opposites." —Miall Edwards: The Philosophy of Religion; Page 206

ছাড়া অন্য ব্যক্তির অস্তিত্ব এবং একটা বাহ্য-জগতের অস্তিত্ব যদি স্বীকার করে নেওয়া না হয় তাহলে আমাদের জীবন হয়ে উঠবে অসহনীয় এবং বৈজ্ঞানিক কাজকর্ম হয়ে উঠবে অসম্ভব। আর যদি কোন বাহ্য-জগতের অভিজ্ঞতা আমরা লাভ করতে পারি সেই অভিজ্ঞতাকে বা সেই সম্পর্কে ধারণাকে প্রকাশ করার পথে বাধা কোথায়?

পরমতত্ত্ব সম্পর্কে আমাদের চিন্তন বা অভিজ্ঞতা পরমতত্ত্ব সম্পর্কে আমাদের পরিপূর্ণ অভিজ্ঞতা নাও হতে পারে। কিন্তু পরমতত্ত্ব সম্পর্কে যতই ব্যাপকতর অভিজ্ঞতা এবং মনন ক্রিয়া সম্ভবপর হবে, ততই আমাদের পূর্ববর্তী অভিজ্ঞতা বা মনন ক্রিয়ার ভুল-ত্রুটি সংশোধনের অবকাশ ঘটবে। আমাদের পরিমার্জিত চিন্তন, যে চিন্তনকে পিছনে ফেলে এগিয়ে এসেছে, তাদের সঙ্গে এক নিরবচ্ছিন্নতার সূত্রে আবদ্ধ হবে। তা না হলে তারা বোধগম্য হবে না। যেসব ধারণাকে আমরা বাতিল করেছিলাম সেইগুলিও কিছুকাল পর্যন্ত সত্য হয়েছিল। কাজেই কোন চরম সত্যতা বা মিথ্যাত্ব নেই। প্রশ্ন হল অপর্যাপ্ততার, অংশকে সমগ্র মনে করা।

কোন চরম সত্যতা বা মিথ্যাত্ব নেই

ব্র্যাডলে (*Bradley*) এবং হেলডেন (*Haldane*) জ্ঞানের আপেক্ষিকতা বা মাত্রার কথা বলেছেন। তাঁদের মতে অপর্যাপ্ত বা অসম্পূর্ণ অভিমত তাঁদের নিজ নিজ দৃষ্টিভঙ্গির বা তাদের প্রসঙ্গ ক্ষেত্রের দিক থেকে সত্য। কিন্তু ব্যাপকতর না হওয়ার জন্য বা পরিণতিমূলক না হওয়ার জন্য মিথ্যা। চরম ভ্রান্তি এবং চরম সত্যতার মধ্যে কোন ফাঁক নেই। মানুষের সত্তা সম্পর্কে অভিজ্ঞতা যতই নিরবচ্ছিন্ন ভাবে চলতে থাকে, হোক না সেই অভিজ্ঞতা অপর্যাপ্ত, তবু জ্ঞানের ক্ষেত্রে যথার্থ অগ্রগতি পরিলক্ষিত হয়।

ব্র্যাডলে এবং হেলডেন-এর অভিমত

সুতরাং এরূপ সিদ্ধান্ত করা অযৌক্তিক হবে না যে এক বস্তুগত সত্তা (objective reality)-র অস্তিত্ব আছে যা স্ব-প্রকাশ। সত্যতা মানুষের তৈরি নয়, সত্যতা হল সত্তার উপলব্ধি, যে সত্তা মনোগত নয়, বস্তুগত। এই সত্তা হল প্রদত্ত কিছু যা তার সব শক্তি নিয়ে আমাদের কাছে এসে উপস্থিত হয়, অবশ্য তাকে আমাদের গ্রহণ করার ব্যাপার রয়েছে। কোন ধারণা সত্য হয় বলেই তা কার্যকর হয়। তার কার্যকারিতার জন্যই সেটি সত্য, তা কিন্তু নয়। ধর্মের ক্ষেত্রে প্রত্যাদেশ সম্পর্কীয় মতবাদ বলতে যা আমরা বুঝি, সত্তা স্বপ্রকাশ বলতে আমরা তাই বুঝি। ধর্মের ক্ষেত্রে প্রত্যাদেশের অর্থ হল যে, সত্তার ধর্মই হল নিজেকে প্রকাশ করা এবং যার শোনার মত কান রয়েছে এবং সাড়া দেবার ইচ্ছা রয়েছে, তার কাছে সত্তা নিজেকে প্রকাশ করবেই। এই অর্থে

এক বস্তুগত সত্তার অস্তিত্ব আছে

প্রত্যাদেশ (revelation) শুধু ধর্মীয় অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ নয়। মানুষের জ্ঞানের এটি একটি অনিবার্য শর্ত। অবশ্য ধর্মীয় প্রত্যাদেশের ক্ষেত্রে সত্তা অর্থাৎ ঈশ্বর মানুষের কাছে নিজেকে প্রকাশ করে।

২। ধর্মীয় জ্ঞানের প্রকৃতি কি? (What is the Nature of Religious Knowledge) :

তাহলে প্রশ্ন হল, অন্যান্য ক্ষেত্রে সত্যকে আবিষ্কারের জন্য যে শর্ত মেনে চলতে হবে, তা কি ধর্মের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য? ধর্মীয় জ্ঞান কি বৈজ্ঞানিক এবং দার্শনিক জ্ঞানের সঙ্গে অভিন্ন? এই ভৌতিক জগতের বিভিন্ন ঘটনা এবং নিয়মকে আমরা যে উপায়ে জানি, ঈশ্বরকে কি তার থেকে ভিন্ন উপায়ে জানি? তাহলে জানার কি দুটি উপায় আছে, একটি বিশ্বাস (faith) এবং অপরটি বিচারবুদ্ধি? যদি তাই হয়, এর সবগুলিই কি সমান ভাবে বৈধ? বিশ্বাস কি প্রত্যক্ষই জানার বা জ্ঞান লাভের কোন মাধ্যম বা বিশ্বাসের ক্ষেত্রে পূর্ব থেকে আমরা কোন কিছুকে বিনা বিচারে স্বীকার করে নিচ্ছি? এইসব প্রশ্ন তুলেছেন মায়েল এডওয়ার্ডস্ তাঁর ধর্ম এবং জ্ঞানের সমস্যা বিষয়ক আলোচনাতে। তাঁর মতে এরকম বলা যেতে পারে যে, দু' ধরনের জ্ঞান আছে। প্রথম ধরনের জ্ঞান হল বিশ্বজগতের বিভিন্ন ঘটনার জ্ঞান, যার পরিপূর্ণ রূপ আমরা বিভিন্ন প্রাকৃতিক বিজ্ঞানে দেখতে পাই। দ্বিতীয় ধরনের জ্ঞান হল অভিজ্ঞতার মাধ্যমে লব্ধ ব্যবহারিক পরিচয় ও অন্তরঙ্গতা, এর সঙ্গে যুক্ত হয় সহানুভূতিসূচক প্রত্যক্ষ অনুভূতি এবং মূল্যায়ন। মানুষের পারস্পরিক বন্ধুত্বের ক্ষেত্রে এই পরিচয় আমরা লাভ করি।

দু'প্রকারের জ্ঞান

বৈজ্ঞানিক জ্ঞান হল কঠোরভাবে বৌদ্ধিক, নৈর্ব্যক্তিক এবং আবেগবর্জিত। কিন্তু বন্ধুর বন্ধু সম্পর্কে যে আন্তরিক জ্ঞান তা কোন যুক্তি তর্কের ফলে উদ্ভূত নয় বা বৈজ্ঞানিক গবেষণার পরিণতি নয়। এই জ্ঞান হল পারস্পরিক বিশ্বাস ও ভালবাসার উপর প্রতিষ্ঠিত, ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা এবং অন্তর্দৃষ্টির মাধ্যমে যা লব্ধ। ধর্মীয় জ্ঞান হল শেষোক্ত ধরনের। এই জ্ঞান আরোহানুমানের সাহায্যে লব্ধ ঈশ্বর সম্পর্কে কোন তথ্য নয়। এ হল ঈশ্বরের সঙ্গে পরিচয়, যার সঙ্গে যুক্ত রয়েছে একটা গভীর আবেগের দিক। মানুষের বন্ধুত্বের ক্ষেত্রে এই বিষয়টি দেখা যায়। একে জ্ঞান বলে অভিহিত করার ব্যাপারে কোন বাধা নেই।

ধর্মীয় জ্ঞান হল ঈশ্বরের সঙ্গে পরিচয়

তবে এই দু-ধরনের জ্ঞানকে পরস্পরের থেকে স্বতন্ত্র করে রাখা যুক্তিসঙ্গত হবে না। কেননা জ্ঞান মূলতঃ এক। জ্ঞানের এই পার্থক্য সাময়িক। চূড়ান্ত নয়, এ হল

আপেক্ষিক, চরম পার্থক্যের ব্যাপার নয়। দুটির মধ্যে কোন সুস্পষ্ট ভেদরেখা টানা চলে না। বৈজ্ঞানিক জ্ঞান বিশ্বাস সূচিত করে। আবার ধর্মীয় বিশ্বাসের ক্ষেত্রেও যুক্তি তর্কের ব্যাপার আছে। বিচারবুদ্ধির ক্ষেত্রে বিশ্বাসের উপাদান এবং বিশ্বাসের ক্ষেত্রে বিচারবুদ্ধির উপাদান রয়েছে। বিজ্ঞানের আবিষ্কারগুলি প্রমাণিত ঘটনার পূর্বে বিশ্বাসের বস্তুই ছিল। বিশ্বাস আবিষ্কারের জনক। বিচারবুদ্ধি নিজেই বিশ্বাসের বিষয়বস্তু।

ধর্মীয় প্রকল্পকে বিচার বুদ্ধি সম্মত হতে হবে

বিচারবুদ্ধির নিজের উপর আস্থাকে দার্শনিক লোট্জা বিশ্বাস বলেই অভিহিত করেছেন, যা সব ধরনের জ্ঞানের মূলে নিহিত। ধর্মীয় প্রকল্প যদি বৈধ হয় তাহলে তাকে অবশ্যই বিচারবুদ্ধিসম্মত হতে হবে। কেননা তাকে অবশ্যই সমর্থনযোগ্য এবং প্রমাণযোগ্য হতে হবে, একই উপায়ে, যে উপায়ে অন্য প্রকল্পকে আমরা প্রমাণ করি। ধর্মীয় বিশ্বাস কোন বিশেষ সুবিধা দাবী করতে পারে না এই বলে যে, এর ক্ষেত্রে কোন বিচাববুদ্ধিসম্মত অনুসন্ধানকার্য চালান যাবে না। অন্যান্য প্রকল্পের মতনই একেও বিচামূলক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে।

যদিও আমরা জ্ঞানের অভেদত্বের উপর গুরুত্ব আরোপ করছি, আমাদের ভুললে চলবে না যে এই অভেদ হল ভেদের মধ্যে অভেদ (unity in difference)। আমাদের

জ্ঞান বিভিন্ন ধরনের

হেলডেন (*Haldane*)-এর কথা মনে রাখতে হবে যে, জ্ঞান সব সময় এক ধরনের নয়। জ্ঞানের স্তর বা মাত্রা আছে যারা পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত, কিন্তু যাদের একটিকে আর একটিতে রূপান্তরিত করা যাবে না। সত্তার অনেক স্তর আছে, সত্তার জ্ঞানেরও বিভিন্ন স্তর আছে। প্রতিটি নতুন স্তরে নতুন ধারণার প্রয়োজন, যা নিম্নতর স্তরের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। কাজেই জানার মাধ্যম এক নয়, বহু। প্রতিটি স্তরে অভিজ্ঞতা জ্ঞানের একটি শর্ত। সত্তা যে উচ্চ স্তরে অবস্থিত, জ্ঞাতাকে সেই উচ্চ স্তরে উঠে সত্তাকে জানতে হবে। যার মধ্যে সুরবোধ নেই, সঙ্গীতের মহিমা উপলব্ধি করা তার পক্ষে কি সম্ভব? যে প্রাণীর মন নেই, সে মনের ক্রিয়াকলাপ বুঝবে কি ভাবে? যে সত্তার ক্ষেত্রে নৈতিকতা,

ধর্মকে ভেতর থেকে জানতে হবে

অনৈতিকতার প্রশ্ন ওঠে না, সে নৈতিক মূল্যের প্রকৃতি বুঝবে কি ভাবে? কাজেই ধর্মসম্পর্কীয় জ্ঞানকে যদি সম্ভব এবং অর্থবহ হতে হয় তাহলে ধর্মীয় জীবনকে জানতে হবে ভেতর থেকে এবং তার নিজস্ব যে স্তর সেই স্তরে আরোহণ করে। **"আধ্যাত্মিক বিষয়কে আধ্যাত্মিক ভাবে জানতে হবে।"** ধর্ম থেকে নিম্নে অবস্থিত কোন মানদণ্ডের সহায়তায়

আমরা ধর্মের মূল্য নিরূপণ করতে পারি না। কোন কিছুর বৈধতা প্রমাণ করার সময় আমাদের স্মরণ রাখতে হবে যে নিম্নস্তরে যা অবস্থিত তার দ্বারা উঁচু স্তরে যা অবস্থিত তার ব্যাখ্যা দেওয়া যায় না। উচ্চতর ধারণাকে নিম্নতর ধারণাতে রূপান্তরিত করাও যুক্তিযুক্ত নয়।

কাজেই জ্ঞানের সমস্যা পরিণত হল অভিজ্ঞতার সমস্যাতে। যখন আমরা বলি ধর্ম কি সত্য, তখন প্রশ্ন হল মানুষের সমগ্র অভিজ্ঞতার জগতে ধর্ম কি কোন অখণ্ড স্থান অধিকার করে আছে? আমাদের অভিজ্ঞতা-বহির্ভূত কোন বস্তুর সঙ্গে আমাদের অভিজ্ঞতায় অবস্থিত কোন বস্তুর তুলনা আমরা করতে পারি না, এই উদ্দেশ্যে যে একটি আর একটির অনুরূপ কিনা আমরা দেখতে চাই। যা আমরা করতে পারি তাহল অভিজ্ঞতার এক অংশকে অন্য অংশের সঙ্গে তুলনা করা এবং এর পেছনে যে উদ্দেশ্য তা হল এক সুবিন্যস্ত সংহতির মধ্যে তাদের সঙ্গতি বজায় থাকে কিনা, তা লক্ষ্য করা। অভিজ্ঞতার যে অংশটুকু সমগ্রের মধ্যে শিথিল মনে হয়, তার বৈধতা সম্পর্কে মনে সংশয় জাগে। আমাদের অভিজ্ঞতার মধ্যে যা সন্তোষজনক নয়, যা আমাদের শিথিলতা, অসংগতি এবং অবিন্যস্ততার সম্পর্কে এক অপ্রীতিজনক অনুভূতি সৃষ্টি করে, যা সজীবতার এবং বৃদ্ধির পথ রোধ করে দাঁড়ায়, যা জীবনের উপর প্রভুত্ব বিস্তারের ব্যাপারে বাধা হয়ে দাঁড়ায়, যা পৃথিবীর সম্পদকে কাজে লাগানর ব্যাপারে বাধা সৃষ্টি করে তাকেই আমরা অসত্য গণ্য করতে বাধ্য হই।

প্রশ্ন হল, সন্তোষের অনুভূতির কথা বলার জন্য মানদণ্ডটি কি বস্তুনিরপেক্ষ বা মনোগত (subjective) হয়ে উঠল? মায়েল এডওয়ার্ড মনে করেন তা নয়। কেননা এই সন্তোষের অনুভূতি বলতে একটা ক্ষণিক সন্তোষের অনুভূতি বোঝাচ্ছে না। এই সন্তোষের অনুভূতি হল স্থায়ী স্বাভাবিক সন্তোষের অনুভূতি। এই সন্তোষের অনুভূতি পেতে হলে, তাকে অনেক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হয়। জীবনের এবং পৃথিবীর নানা ক্ষেত্রে নানা ভাবে তাকে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হয়। দ্বিতীয়তঃ, অভিজ্ঞতা বলতে নিছক তাৎক্ষণিক অভিজ্ঞতাকে বোঝায় না। এর একটা বৃহত্তর অর্থ আছে—আমার ধারণা বা প্রত্যয় (concepts) এবং প্রত্যক্ষরূপ (percepts) এর অন্তর্ভুক্ত। প্রত্যক্ষরূপ থেকেই ধারণার উৎপত্তি এবং সমগ্র অভিজ্ঞতার প্রসঙ্গক্ষেত্রেই রয়েছে তার স্থান। শুধু অনুভূতি নয়, যে অনুভূতি চিন্তনের মধ্য দিয়েই বোধগম্য হয়ে ওঠে। অভিজ্ঞতা ব্যক্তিসাপেক্ষ বা মনোগত নয়। অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে জ্ঞাতা এবং জ্ঞেয়, দুই-এরই উপস্থিতি স্বীকার করে নিতে হয়। অভিজ্ঞতা বলতে বোঝায় কোন কিছুর অভিজ্ঞতা। এক স্বপ্রকাশ সত্তার অভিজ্ঞতা, যে সত্তা নিজেকে অপরের কাছে জ্ঞেয় করে তুলতে চায়। এইভাবেই আমরা সত্তাকে জানি এবং ধর্মীয় অভিজ্ঞতা হল একটি উপায় যার মাধ্যমে আমরা সত্তাকে জানি। ইতিপূর্বে অভিজ্ঞতাকে ব্যাপকতর অর্থে গ্রহণ করা হয়েছে এবং সেই অর্থে অভিজ্ঞতার পরীক্ষায় যদি ধর্ম উত্তীর্ণ হতে না পারে, তাহলে ধর্মের পরিসমাপ্তি ঘটাই শ্রেয়। মায়েল এডওয়ার্ডস বলেন, "আমরা বিশ্বাস করি যে সত্তাকে জানার ব্যাপারে ধর্ম হল এক বৈধ উপায় কারণ অভিজ্ঞতার পরীক্ষায় এ উত্তীর্ণ হতে সক্ষম, যে অভিজ্ঞতার পরীক্ষাই হল সত্যতার মানদণ্ড, আমরা যার অধিকারী।"

অষ্টাদশ অধ্যায়

ধর্মের ভাষা

(Religious Language)

১। ভাষার অপর্যাপ্ততার সমস্যা (The Problem of Linguistic Inadequacy):

ধর্মের ভাষার প্রকৃতি বিশ্লেষণ করার পূর্বে আমরা একটি প্রশ্নের আলোচনা করতে পারি সেটি হল, যে-কোন ভাষাই কি অপর্যাপ্ত (Is any language inadequate)? অর্থাৎ মনের ভাবকে যথাযথ প্রকাশ করার ব্যাপারে ভাষা কি উপযোগী? আমরা কি ভাষার মাধ্যমে আমাদের মনের ভাবকে যথাযথ প্রকাশ করতে পারি? অনেকেই এ ব্যাপারে সংশয় প্রকাশ করেছেন। যেমন—হোয়াইটহেড (*Whitehead*) বলেন, "বাচনিক শব্দসমষ্টিকে বচনের যথাযথ বিবৃতি বলে গ্রহণ করা নিছক বিশ্বাসের ব্যাপার"।[1] "কোন বাচনিক বিবৃতিই কোন বচনের যথাযথ প্রকাশ নয়"।[2] তাছাড়া ভাষা, যেরকম সাধারণ ভাবে তার ব্যবহার করা হয়ে থাকে; অধিবিদ্যার সূত্রগুলির খুব কম গভীরেই প্রবেশ করতে পারে। দার্শনিকরা কখনও চূড়ান্তভাবে অধিবিদ্যার মূল সূত্রগুলি ব্যক্ত করতে পারেন না। অন্তর্দৃষ্টির দুর্বলতা ছাড়াও ভাষাগত অসম্পূর্ণতা এই কাজে বাধা হয়ে দাঁড়ায়।

যে কোন ভাষাই কি অপর্যাপ্ত?

হোয়াইটহেড-এর উপরিউক্ত মন্তব্যগুলি সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করতে চায় যে, ভাষা ত্রুটিযুক্ত এবং অসম্পূর্ণ এবং ভাষা তার অভীষ্ট পূরণ করতে পারে না। ভাষা যেন অনেকটা দরজীর তৈরি জামা যা মানানসই হয় না। কিন্তু অনেকে এই বিষয়টি স্বীকার করে নিতে চান না। তাঁরা বলেন যে, দার্শনিকগণ ভাষার সংস্কারসাধন করতে চান এবং তাঁদের সেই চেষ্টা দেখে এমন মনে হয় যে ভাষার সংস্কারসাধন হয়ত সম্ভব। কিন্তু কোন কোন লেখক যেমন এলিস এমব্রোস (*Alice Ambrose*) মনে করেন যে, ভাষার সংস্কারসাধন সম্ভব নয়।[3]

ভাষা ত্রুটিযুক্ত এবং অসম্পূর্ণ

সাধারণ ভাষার ক্ষেত্রে নানারকম সমালোচনা করা হয়। এই সব সমালোচনার মধ্যে কিছু কিছু সমালোচনা সঠিক, অবশিষ্টগুলি নয়। সঠিক সমালোচনা বলতে বোঝায় সেইসব সমালোচনা যেসব ক্ষেত্রে ভাষার ত্রুটি নির্দেশ করা হয় এবং

1. Process and Reality; Page 17
2. Ibid; Page 20.
3. The Problem of Linguistic Inadequency; Page 15, incorporated in the book 'Philosophical Analysis' Edited by Max Black.

প্রতিকারের কথাও বলা হয়, যে প্রতিকার, ভাষার ক্ষেত্রে যে অসন্তোষ, তাকে দূর করতে পারে। প্রথমতঃ ভাষার দুর্বোধ্যতা। ভাষা যদি দ্ব্যর্থবোধক হয়, তাহলে একটু চেষ্টা করলেই ভাষার এই ত্রুটিকে দূর করা যায়। অসংগতি (inconsistency) ভাষার অপর এক ত্রুটি। এই ত্রুটিও দূর করা যেতে পারে। এছাড়াও রয়েছে অভিধানগত অপর্যাপ্ততার বিষয় (vocabulary inadequacy), অস্পষ্টতা, বক্তব্য বিষয়ের সুনির্দিষ্টতার অভাব ইত্যাদি। এই ধরনের ভাষাগত ত্রুটির প্রতিকারের সঙ্গে আমরা সুপরিচিত।

কিন্তু দার্শনিকগণ ভাষার বিরুদ্ধে কতকগুলি অভিযোগ উত্থাপন করেন। এই সব অভিযোগের অনেকগুলিই তাঁদের একটি বক্তব্যের সঙ্গে বিশেষভাবে যুক্ত, সেটি হল: আমরা যা ব্যক্ত করতে চাই, তা ব্যক্ত করার পক্ষে আমাদের অভিধান একান্তই সীমিত। ভাষার মধ্যে ছেদ বা ফাঁক আছে। এ. এন. হোয়াইটহেড এই প্রসঙ্গে যে মন্তব্য করেছেন তা হল ভাষা অসম্পূর্ণ ও খণ্ডাংশ এবং ভাষা এমন একটা স্তর নির্দেশ করে যেটি বানরের মানসতা (ape-mentality)-র স্তর ছাড়িয়ে কিছুটা এগিয়ে গেছে মাত্র। কিন্তু শব্দপ্রকরণ এবং ব্যাকরণের মধ্যে বিধৃত যে অর্থ (meanings), মানুষের অন্তর্দৃষ্টি সেই অর্থকে অতিক্রম করে অধিকতর কিছু অর্থ উপলব্ধি করতে সক্ষম। সেকারণেই সাহিত্য, প্রাকৃতিক বিজ্ঞান এবং দর্শন, প্রত্যেকেই নানাভাবে, যে অর্থ এখনও পর্যন্ত অপ্রকাশিত বা অব্যক্ত, তার ভাষাগত প্রকাশ কিভাবে সম্ভব হতে পারে তাই অনুসন্ধানে ব্যস্ত।

ভাষার বিরুদ্ধে দার্শনিকগণের অভিযোগ

সময় সময় আমরা বলি ঠিক শব্দটি খুঁজে পাচ্ছি না। কিন্তু যখন একথা বলি তখন আমরা জানি যে এর প্রতিকার আছে। দার্শনিকরা যখন ভাষার বিরুদ্ধে নালিশ জানায় তখন তাদের অভিযোগ এই নয় যে ঠিক শব্দটি খুঁজে পাচ্ছি না। তাঁদের মতে বক্তব্য বিষয়কে বোঝানোর জন্য কোন শব্দই যথোচিত শব্দ নয়, সেরকম শব্দ নেই, কাজেই অভিজ্ঞতা এবং প্রত্যয় সম্পর্কীয় চিন্তন (conceptual thought) উভয় দিক থেকেই ভাষা অনেক পিছনে পড়ে আছে। এছাড়াও বলা হয়ে থাকে যে 'বক্তব্য বিষয় জানান সম্ভব নয়'। অভিজ্ঞতায় যা অনির্বচনীয় ভাষা তাকে ব্যক্ত করতে পারে না। কোন রঙ সম্পর্কে আমাদের যে অভিজ্ঞতা হয়, রঙ সম্পর্কীয় কোন শব্দ প্রয়োগ করে সেই সুনির্দিষ্ট রঙের অভিজ্ঞতাকে প্রকাশ করা যায় না। এর কারণ অংশতঃ হল এই যে, ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় যা অনুপম তার অংশীদার হওয়া সম্ভব হয় না। কেননা

অভিযোগের সারমর্ম

অভিজ্ঞতার অনুপম বৈশিষ্ট্যকে সাধারণ পদের মাধ্যমে ব্যক্ত করা যায় না, অথচ ভাব প্রকাশের জন্য এই সাধারণ পদগুলিই আমরা ব্যবহার করি। আমাদের অভিজ্ঞতাকে বর্ণনা করতে গিয়ে আমাদের প্রকাশের যে স্থূল মাধ্যম আছে তাকে অবলম্বন করা ছাড়া আর আমাদের অন্য কোন উপায় থাকে না। এমন কথা বলা হয়ে থাকে যে বক্তব্য বিষয়কে যথাযথ প্রকাশ করার ব্যাপারে শব্দ ত্রুটিপূর্ণ। যদি এই ছেদ পূরণ করা যায়, তাহলে শব্দ বর্তমানে যা করতে অক্ষম তা ভবিষ্যতে করতে সক্ষম হবে। কিন্তু দার্শনিকগণ ভাষার ব্যাপারে যে ক্ষোভ প্রকাশ করেন, নতুন শব্দ প্রণয়নের মাধ্যমে সেই ক্ষোভ মেটান সম্ভব নয়। কোন নতুন শব্দই যথাযথভাবে সেই প্রয়োজনও মেটাতে পারবে না।

বাস্তবে দেখা যায় ভাষার ক্ষেত্রে যখন কোন কোন ফাঁক পূরণ করা হয় তখন নতুন ফাঁক দেখা দেয়। তখন এরকম মনে হয় যে যতই ফাঁক পূরণ করা হোক না কেন, নতুন করে অসম্পূর্ণতা দেখা দেবে। এলিস এম্ব্রোস এই প্রসঙ্গে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেন যে, সব ভাষাতেই কিছু কিছু না অসম্পূর্ণতা আছে, এবং সব ভাষারই এ নিয়ে ক্ষোভের কারণ রয়েছে। কিন্তু এই ক্ষোভ দূর করা কঠিন। কেননা, যতক্ষণ পর্যন্ত না কোন নতুন ধরনের প্রতীকতার প্রয়োজন দেখা দিচ্ছে না, ততক্ষণ পর্যন্ত এই ত্রুটি নিরূপণ করার কোন উপায় থাকছে না।

আবার অনেক সময় যুক্তিবিজ্ঞানীরাও ভাষা নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করেন এই কারণে যে ভাষার পরিকল্পনার ক্ষেত্রে কোন যুক্তিবিদ্যাসম্মত সংহতি দেখা যায় না।

ভাষা সম্পর্কে যুক্তিবিজ্ঞানীদের ক্ষোভ

আমাদের সাধারণ ভাষার ক্ষেত্রে প্রতীকগুলির অর্থকে বাদ দিয়ে শুধুমাত্র ব্যাকরণের নিয়মের দ্বারা বুঝে ওঠা যাবে না যে, কোন শব্দসমষ্টি অর্থবহ হয়েছে কি হয়নি। কিন্তু এম্ব্রোস মনে করেন যে এই অসন্তোষের কোন প্রতিকার সম্ভব নয়। স্বাভাবিক ভাষার ক্ষেত্রে ভাষা গঠনের এবং পরিবর্তনের নির্দিষ্ট কোন নিয়ম নেই বলে যে অভিযোগ, এই অভিযোগ অনেকটা দার্শনিকদের অভিযোগের মতন যা দূর করা সম্ভব নয়।

দার্শনিকরা নানা ভাবে ভাষার সংশোধনের চেষ্টা করেছেন। প্রথমতঃ, দার্শনিকরা ভাষার দুর্বোধ্যতা দূর করার ব্যাপারে দুটি পদ্ধতির কথা বলেছেন। যৌক্তিক

ভাষার দুর্বোধ্যতা দূর করার দুটি উপায়

অভিজ্ঞতাবাদী (logical empirecists) এবং অন্যান্য কোন কোন যুক্তিবিজ্ঞানী এক নতুন ধরনের প্রতীকতা (symbolism) প্রবর্তনে আগ্রহী। তাঁরা ভাষার ক্ষেত্রে ছেদ বা ফাঁক পূরণ করতে চান না। তাঁরা নতুন একটা নক্শা (model)' প্রবর্তন করতে চান যার সাহায্যে ব্যাকরণ-

সম্মতভাবে বাক্য গঠনের বিষয়টির সংস্কার সাধন সম্ভব। অপরটি হল অধ্যাপক জি. ই. মুর (*G. E. Moore*)-এর প্রচেষ্টা, যাঁর মতে প্রত্যয়ের সুস্পষ্টতা সাধনের দ্বারা দুর্বোধ্যতা দূর করা যেতে পারে।

কিন্তু উপরিউক্ত প্রচেষ্টা সার্থক হতে পারে না, কেননা, কোন কৃত্রিম ভাষার প্রবর্তন কিভাবে ব্যাকরণসম্মত বাক্যগঠন বা পদবিন্যাসের ব্যাপারে সহায়ক হতে পারে তা বোঝা মুসকিল। ভাষার মধ্যে একটা অন্তর্নিহিত অপর্যাপ্ততা (intrinsic inadequacy) আছে বলে কোন কোন দার্শনিক মনে করেন। কিন্তু দার্শনিক বিশ্লেষকবৃন্দ (philosophical analysts) তা মনে করেন না। সাধারণ ভাষার ক্ষেত্রে সব সময়ই সংশোধনের অবকাশ রয়েছে। বিশ্লেষণের মাধ্যমে কোন কোন প্রত্যয় তার মূল প্রত্যয়ের তুলনায় অধিকতর স্পষ্ট হয়ে উঠতে পাবে। কিন্তু বিশ্লেষণের মাধ্যমে দুর্বোধ্যতা দূরীভূত হয় একথা যারা বলেন তারা একটা মিথ্যা অসন্তোষকে দূর করার জন্য সচেষ্ট হন। যদি কোন পদ দুর্বোধ্য হয় তাহলে সেই পদের সংজ্ঞা নির্দেশ করতে গিয়ে যে শব্দসমষ্টি ব্যবহার করা হবে তাও দুর্বোধ্য হবে। কাজেই সেই দুর্বোধ্যতা দূর করতে হলে বার বার বিশ্লেষণ করতে হবে, লক্ষ্যে পৌছান সম্ভব হবে না।

একটি সাধারণ ধারণার বিশ্লেষণের কোন উপকারিতা যে নেই, তা নয়, কিন্তু তা দুর্বোধ্যতা দূরীকরণ নয়। বিশ্লেষণ যা করতে পারে তাহল শব্দের অর্থের জ্ঞানকে অ-দুর্বোধ্য না করা। কিন্তু এটা সম্ভব হয় যদি শব্দটি দুর্বোধ্য না হয়। যদি একটি শব্দ যথার্থই দুর্বোধ্য হয়, বিশ্লেষণের ফলে তার দুর্বোধ্যতার বিষয়টিই সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে। শুদ্ধ বা যথার্থ বিশ্লেষণ বলতে বোঝায় এমন কিছু বৈশিষ্ট্য খুঁজে বার করা যা কোন পদের অর্থকে সুনির্দিষ্ট করবে। কিন্তু বিশ্লেষণের মাধ্যমে এই রকম কোন বৈশিষ্ট্য আবিষ্কৃত হয় না।

বিশ্লেষণ যা করতে সক্ষম

দার্শনিকদের অসন্তোষের কারণ হল অভিধানের কোন শব্দই সঠিক শব্দ নয়। সঙ্গে সঙ্গেই যে প্রতিকারের কথা মনে হবে তা হল, মানুষ যা ব্যক্ত করতে চায় তার জন্য নতুন শব্দ সৃষ্টি করা। হোয়াইটহেড নতুন নতুন পরিভাষার সৃষ্টি করে এর প্রতিকার করার চেষ্টা করেন। তিনি বলেন, "প্রত্যেক বিজ্ঞানকে তার নিজস্ব যন্ত্র উদ্ভাবন করতে হবে। দর্শনের জন্য যে যন্ত্রের প্রয়োজন তা হল ভাষা। কাজেই প্রাকৃতিক বিজ্ঞানে পুরনো যন্ত্রপাতির যেমন নতুন করে পরিকল্পনা করা হয়, দার্শনিকরাও ভাষার সেইভাবে পরিকল্পনা করে থাকে। দার্শনিকরা যা বলতে চায় তা হল ভাষার এই পুনঃপরিকল্পনার পিছনে দুটি লক্ষ্য

নতুন নতুন পরিভাষার সৃষ্টি

বর্তমান। একটি হল দার্শনিকরা আবিষ্কার করেছে এমন নতুন তথ্য বা বিষয়ের নাম দেওয়া এবং দ্বিতীয়তঃ, বর্তমান ভাষায় প্রকাশযোগ্য নয়, এমন ধারণাকে (যার আমরা অধিকারী) প্রকাশ করতে সমর্থ করা। যেমন—দার্শনিকরা 'sense data' (ইন্দ্রিয় উপাত্ত), 'monads' (চিৎপরমাণু), 'universal' (সামান্য) প্রভৃতি শব্দের প্রবর্তন করে তাদের ভাষাগত প্রয়োজন মেটান। কিন্তু একটা বিষয় লক্ষ্য করার যে, দার্শনিকেরা যে-সব নতুন শব্দের প্রবর্তন করেন সেগুলি প্রবর্তনের প্রয়োজন আছে কিনা —এ নিয়ে দার্শনিকদের মধ্যে কোন মতের ঐক্য পরিলক্ষিত হয় না।

দার্শনিকরা বলেন যা অপ্রকাশযোগ্য তাকে প্রকাশ করার জন্য নতুন শব্দ সৃষ্টির প্রয়োজন রয়েছে। কিন্তু কিভাবে তা সম্ভব ? সঠিক শব্দ হবার জন্য এটির সঠিক অর্থ বহন করা উচিত, কিন্তু নতুন হওয়ার জন্য, সুরুতে এটি হবে অর্থশূন্য। কাজেই ঘটনার ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে বা পরিকল্পিত শব্দের সঙ্গে যুক্ত করে একে অর্থপূর্ণ করে তুলতে হবে। পুরাতন শব্দ যদি সঠিক শব্দ না হয়, নতুন শব্দও সঠিক শব্দ হতে পারবে না কেননা তাদের পুরাতন শব্দের দ্বারাই ব্যাখ্যা করতে হবে। পুরাতনের সাহায্যে নতুন শব্দ প্রবর্তন করা, আসলে পুরনো শব্দ নিয়েই কাজ করা। কাজেই পুরাতন শব্দে কাজ হচ্ছে না বলে নতুন শব্দের অনুসন্ধান করা হল নিছক ভণ্ডামী, কারণ যা করতে হবে তা হবে আত্মবিরোধিতা দোষে দুষ্ট : নতুন শব্দ আবিষ্কার করে তাতে যে অর্থ আমরা প্রকাশ করতে চাই তা আরোপ করা, কিন্তু সঠিক শব্দের অভাবের জন্য তাতে অর্থ আরোপ করা যাবে না। আর একটি অভিযোগ হল ভাষা অনির্বচনীয়কে প্রকাশ করতে সমর্থ নয়। যার অভিজ্ঞতা আমরা লাভ করি, শব্দ তাকে বর্ণনা করতে পারে না। এর উত্তরে বলা যায় যে, অভিজ্ঞতাকে পরিপূর্ণভাবে অপরের জ্ঞাত করানো কখনও সম্ভব নয়। এর মূলে অনেক কারণ আছে। একটি হল অভিজ্ঞতার বৈশিষ্ট্য, ভাষার অর্থাৎ সাধারণ পদ প্রয়োগের মাধ্যমে কখনও ধরা পড়ে না। অন্য কারণ হল ব্যক্তির ব্যক্তিগত গোপন জগতের দ্বার শব্দ উদ্ঘাটন করতে পারে না।

আবার অনেক সময় বলা হয় শব্দ চিন্তন প্রকাশের যথার্থ মাধ্যম নয় কেননা যদিও অভিধানে কোন শব্দের অর্থ সুনির্দিষ্টভাবে বেধে দেওয়া হয়েছে, তবু দু'জন ব্যক্তি যখন একই শব্দ ব্যবহার করে তখন তাদের মনে কিন্তু একই ধরনের চিন্তার উদয় হয় না। সেইজন্য রাসেল (*Russell*) বলেন যে, যে চিন্তাকে শব্দ প্রকাশ করতে চায় সেই চিন্তার পক্ষে সেই শব্দ একটা বেমানান পোশাক, কেননা ঐ একই শব্দ বিভিন্ন চিন্তার প্রকাশের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়। কিন্তু যদিও

রাসেলের বক্তব্য

কোন শব্দের সমান স্বক্রীত অর্থ থাকতে পারে তবু এটা অসম্ভব নয় যে, যে দু'জন লোক ঐ শব্দ ব্যবহার করছে তাদের মনে দু'ধরনের চিন্তা জাগছে। এটা কিভাবে সম্ভব যে সমাজ একটি শব্দে একই অর্থ আরোপ করবে এবং সমাজের দু'জন সভ্য তা করবে না? যদি না করে বুঝতে হবে শব্দের সমাজ-স্বীকৃত অর্থ সমাজের সভ্যরা শব্দতে আরোপ করছে না। সেক্ষেত্রে ব্যাপারটিকে অসংগতিপূর্ণ বলে গণ্য করতে হবে। কাজেই ভাষা ভাবের বাহন নয় এটা কোন যুক্তি নয়। এলিস এমব্রোস বলেন, কোন ভাষা যা কোন বিশেষ উদ্দেশ্য পূরণ করার জন্য গঠিত হয়নি, তা বিশেষ উদ্দেশ্য পূরণ করতে পারছে না, এ কথা বলা নেহাতই অর্থহীন।[1]

দেখা যাক, ভাষার অপর্যাপ্ততা সম্পর্কীয় উপরিউক্ত আলোচনা ধর্মের ভাষার দোষ ত্রুটি বিশ্লেষণে কতখানি সহায়ক হয়।

২। ধর্মের ভাষার অপর্যাপ্ততা (Inadequacy of Religious Language) ঃ

ধর্মের ভাষার অর্থ অনুধাবন বা উপলব্ধির ব্যাপার নিয়ে সাম্প্রতিক দর্শনে এবং ধর্ম বিজ্ঞানে এক সমস্যার উদ্ভব হয়েছে। আত্মবিশ্বাসে ভরপুর এবং স্পষ্ট বক্তা দার্শনিক এ. জে. আয়ার (*A. J. Ayer*) যৌক্তিক বিশ্লেষণ এবং বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান-নীতি ও মানদণ্ডকে হাতিয়ার হিসেবে গ্রহণ করে সোজাসুজি বলেই বসলেন যে, ধর্মীয় আলোচনাকে অর্থহীন প্রলাপ মনে করে বাতিল করে দেওয়া যেতে পারে। জ্ঞানের দিক থেকে ধর্মীয় আলোচনা কোন অর্থ বহন করে না। কিন্তু শুধুমাত্র এ. জে. আয়ারই যে এই অভিমত প্রকাশ করেছেন তা নয়; একাধিক ধর্মবিষয়ক চিন্তাবিদ যৌক্তিক অভিজ্ঞতাবাদের (logical empiricism) বিদ্রোহ ঘোষণার আভাষ পেয়ে বা প্রচলিত ধর্মীয় পারিভাষিক শব্দাবলীর মোহ থেকে মুক্ত হয়ে ধর্মের ভাষার কঠোর পরীক্ষণ কার্যের কথা ঘোষণা করেছেন এবং নিজেরাও সেই পরীক্ষণকার্যে নিজেদের নিযুক্ত করেছেন। *Paul L Holmre* তাঁর 'The Nature of Religious Propositions' প্রবন্ধে বলেন, "যে কোন বর্ণনামূলক দার্শনিক বিবরণ যা ধর্মবিষয়ক বাক্যের জ্ঞানবিষয়ক অর্থের সম্ভাবনার ব্যাপারটিকে পূর্ব থেকে স্বীকার করে নেয়, তা আর সমস্যার মোকাবিলা করতে পারে না।"[1] *H. D. Lewis* তাঁর 'The Cognitive Factor in Religious

আয়ারের মতে ধর্মীয় আলোচনা অর্থহীন

1. "To say a language fails to come up to certain specifications when it was not constructed according to them is simply nonsense".

—Alice Ambroce; "The Problem of Linguistic Inadequacy."

Experience' প্রবন্ধে বলেন, 'ধর্মের প্রভাব হ্রাস পাওয়ার ব্যাপারে একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হল যে মানুষ এর দাবী মেটাবার ব্যাপারে বা এদের অর্থপূর্ণ করে তোলার ব্যাপারে সাধারণভাবে হতাশ হয়ে পড়েছে।"[2]

Holmre এবং Lewis-এর বক্তব্য

C. H. Whiteley বলেন, "যেহেতু এর (ধর্মের) এক অসাধারণ বৈশিষ্ট্য রয়েছে, সুতরাং এর এক অসাধারণ ব্যাখ্যার প্রয়োজন রয়েছে।" পল টিলিক (*Paul Tillich*) এ-সম্পর্কে অভিমত ব্যক্ত করতে গিয়ে বললেন যে ধর্মবিজ্ঞানে, দর্শনে এবং তাদের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত বিষয়গুলিতে ভাষার ব্যাপারে আমরা এক বিভ্রান্তিকর অবস্থার সম্মুখীন হয়েছি। তিনি

পল টিলিক-এর অভিমত

আরও বললেন যে, শব্দ সুরুতে যা আমাদের জানাত এবং যা তাদের জানাবার কথা তা আর জানাচ্ছে না। বস্তুতঃ, আমাদের এখন আর সেই শব্দ নেই, যার মধ্যে শব্দের শক্তি অনুরণিত হচ্ছে। অন্য আর একজন লেখক বলে বসলেন যে, 'নীট্‌সে যে বলেছেন 'ঈশ্বর মৃত', সে কথাও আজ আমরা বুঝে উঠতে পারি না। কেননা 'ঈশ্বর' শব্দটিরই মৃত্যু ঘটেছে।[3]

ধর্মের ভাষার প্রকৃতি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা এবং উদ্বেগ জ্ঞানবিদ্যা সম্পর্কীয় প্রশ্নের আলোচনার দিকে আমাদের চালিত করে। কেননা ধর্মের ভাষার মর্যাদা সম্পর্কে যে প্রস্তাবই উত্থাপন করা হোক না কেন, প্রস্তাবককে সব সময়ই এই প্রশ্ন করা যেতে পারে যে ধর্মের ভাষার প্রকৃতি কি, তিনি কিভাবে তা জানতে পারলেন এবং তাঁর দাবীকেই বা কিভাবে তিনি সমর্থন করতে পারবেন। তাছাড়া ধর্মীয় ভাষা

ধর্মের ভাষার প্রকৃতি কিভাবে জানা যায়

যিনি ব্যবহার করছেন তাঁকে এই প্রশ্নও করা যেতে পারে যে যাঁর ক্ষেত্রে তিনি ধর্মের ভাষা ব্যবহার করছেন, তার প্রতি যে সেই ভাষা প্রযোজ্য হচ্ছে তা তিনি কিভাবে দাবী করতে পারেন। তাছাড়া কিসের ভিত্তিতে তিনি ঐ ধর্মসম্পর্কীয় জ্ঞান লাভ করেছেন। জ্ঞান বলতে তিনি কি বোঝেন, তাঁর ধর্মসম্পর্কীয় ভাষা কি সত্য মিথ্যা হতে পারে বা সত্যতা মিথ্যাত্ব দেখান যেতে পারে কিনা, এই সব প্রশ্নও তাঁকে করা যেতে পারে।

পিটার ডনোভেন (*Peter Donovan*) তাঁর 'Religious Language' গ্রন্থে বলেন, "ভাষা ধর্মবিষয়ক হয়ে উঠে যখন ধর্মের দিক থেকে তার ব্যবহার হয়ে থাকে।

---

1. Religious Language and the problem of Religious knowledge.
—Edited by R. E. Santoni ; Page 233.

2. Ibid ; Page 248.

3 ' Religious Language and the Problem of Religious Knowledge",
—Edited by R. E. Santoni.

অর্থাৎ কিনা, ধর্মে নানাধরনের লক্ষ্য অন্বেষণ এবং ধর্মে বিভিন্ন ধরনের বিশ্বাসের প্রকাশ হিসেবে যখন তার ব্যবহার দেখা যায়। সেই কারণে তিনি বলেন যে,

শব্দ কিভাবে ধর্মীয় বিশ্বাস এবং ক্রিয়া-কলাপের ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হয় তার উপরই ধর্মের ভাষার প্রকৃতি নির্ভর করে

"আমি ধর্মের ভাষার কথা যেমন বলব তেমনি ধর্মের ভাষার ব্যবহারের কথাও বলব। এই কারণে যে, আমি দেখাতে চাই ধর্মের ভাষার ক্ষেত্রে গুরুত্ব শব্দের উপর ততখানি নয়, যতখানি না শব্দগুলিকে নিয়ে কি করা হচ্ছে এবং কি পরিপ্রেক্ষিতে তাদের দেখা যাচ্ছে। ধর্মকে কোন ভাষার বিশেষণ রূপে ব্যবহার করার তুলনায়, ক্রিয়াবিশেষণ রূপে ব্যবহার করাই যুক্তিযুক্ত। অর্থাৎ ধর্মের ভাষা কিভাবে কাজ করে সেটাই বড় কথা।' ধর্ম সম্পর্কীয় কতকগুলি শব্দ বা বিষ্ণু, খ্রীষ্ট বা বুদ্ধদেবের নাম উল্লেখ করলেই ভাষা ধর্মের ভাষা হয় না এবং কিভাবে শব্দ (প্রায়ই ব্যবহৃত হয় যে সাধারণ শব্দ), ধর্মীয় বিশ্বাস এবং ক্রিয়াকলাপের ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হয় অর্থাৎ ঐ পটভূমিকায় শব্দের ভূমিকা কি, তার উপরই ধর্মের ভাষার প্রকৃতি নির্ভর করে।

ধর্মের জ্ঞানের সঙ্গে ধর্মের ভাষার যে একটা নিগূঢ় সম্পর্ক রয়েছে সেই সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে ই. এস. ম্যাসকল বলেন যে 'ঈশ্বর' এই শব্দটির অবশ্যই কিছু আধেয় (contents) বা বিষয়বস্তু থাকবে, তা না হলে ঈশ্বর সম্পর্কে আমাদের বিবৃতিগুলি বোধগম্য হবে না এবং যদি আমরা বলি 'ঈশ্বর' এই শব্দটির বিষয়বস্তু কি, তাহলে অনিবার্যভাবে ঈশ্বর সম্পর্কে আমরা কোন কিছু বলছি বা কোন প্রশ্ন রাখছি, এই বিষয়টা মেনে নিতে হবে। কাজেই ধর্মের জ্ঞানের সমস্যা থেকে ধর্মের ভাষার সমস্যাকে বিচ্ছিন্ন করা যেতে পারে না।

ধর্মের জ্ঞানের সঙ্গে ধর্মের ভাষার নিগূঢ় সম্পর্ক

কাজেই ধর্মের ভাষার জ্ঞান সম্পর্কীয় সমস্যা বলতে বোঝায় মূল সমস্যা, যার সঙ্গে অন্যান্য সমস্যা জড়িত যেমন প্রার্থনা, স্বীকারোক্তি, ধর্মমত বা ধর্মবিশ্বাস, ধর্ম-বিজ্ঞানের স্বীকার্য সত্য—এগুলি সমগ্রভাবে বা অংশতঃ সত্য বা মিথ্যা হবার যোগ্য। কেউ কেউ মনে করেন এই সমস্যাই হল মূল সমস্যা যার থেকেই ধর্মের ভাষার প্রকৃতি বিষয়ক সমস্যা, ধর্মীয় জ্ঞানের সম্ভাব্যতার সমস্যা, ধর্মীয় জ্ঞানের প্রমাণ ও সমর্থন বিষয়ক সমস্যার উদ্ভব। ডবলু. টি. ব্লেকস্টোন বলেন, "ধর্ম সম্পর্কীয় বাক্যগুলি জ্ঞান রচনা করার দাবী করে কিনা এই প্রশ্নের পূর্বে যৌক্তিক দিক থেকে যে প্রশ্নের আলোচনা করা উচিত তা হল ধর্মের বচনগুলি বা ধর্ম বিষয়ক বাক্যগুলি জ্ঞান বিষয়ক (cognative) কিনা?

ধর্মের বিবৃতিগুলি জ্ঞান বিষয়ক কিনা—এই প্রশ্ন এক গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন

৩। ধর্মের ভাষার বৈশিষ্ট্য (Peculiarity of Religious Language) ঃ

বিজ্ঞান বা কলাবিষয়ক আলোচনার ক্ষেত্রে যে ভাষার ব্যবহার করা হয়, তার যেমন একটা নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে, নীতিবিজ্ঞানের ভাষারও যেমন একটা নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে, তেমনি ধর্মবিজ্ঞানে বা ধর্ম-সম্পর্কীয় বিভিন্ন আলোচনায় যে ভাষার ব্যবহার করা হয় তারও একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য আছে। স্টিভেনসন (*Stevenson*) তাঁর 'Language of Lthics' গ্রন্থে নীতিবিজ্ঞানের ভাষা নিয়ে আলোচনা করেছেন। ভাষার দার্শনিকবৃন্দ (Philosophers of language) যেমন—কারনাপ, এ. জে. আয়ার প্রমুখ নীতিবিজ্ঞানের ব্যবহৃত ভাষা নিয়ে আলোচনা করেছেন। ধর্মদর্শনের সমসাময়িক গ্রন্থগুলিতেও ধর্মসম্পর্কীয় ভাষার ব্যবহার নিয়ে নানাবিধ সমস্যার আলোচনা লক্ষ্য করা যায়। এইসব সমস্যার মধ্যে দুটি সমস্যার আলোচনার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপিত হয়েছে। একটি হল ঈশ্বরের ক্ষেত্রে যে-সব বর্ণনামূলক পদের প্রয়োগ করা হয় সে-গুলি কোন বিশেষ অর্থ বহন করে কি? অবশ্য মধ্যযুগের চিন্তাবিদরা এই বিষয় নিয়ে অনেক আলোচনা করেছেন। বর্তমান যুগেও এই আলোচনাতে ছেদ পড়েনি। অপর প্রশ্নটি হল ধর্ম-সম্পর্কীয় ভাষার মূল ক্রিয়া (basic function of religious language) সম্পর্কে। এই আলোচনারও একটা অতীত ইতিহাস আছে, কিন্তু সমসাময়িক বিশ্লেষণমূলক দর্শন এই আলোচনায় বিশেষ আগ্রহ দেখিয়েছেন। একটা উদাহরণের সাহায্যে প্রথম সমস্যাটিকে বুঝে নেওয়া যাক্। 'রাম যদুকে ভালবাসে' বা 'রাজা প্রজাদের ভালবাসেন' ইত্যাদি হল তথ্যমূলক বচন, অর্থাৎ এই সব বচনে কোন একটি বিষয় বা ঘটনা ঘোষণা করা হচ্ছে। কিন্তু যখন বলা হয় 'ঈশ্বর মনুষ্যজাতিকে ভালবাসেন'। তখন এটিও একটি তথ্য বিষয়ক ঘোষণা বা উক্তি। কিন্তু এটি কি একটি বিশেষ ধরনের ঘটনাকে নির্দেশ করে? ধর্মীয় ঘটনা কি শুধুমাত্র ঘটনার দিক থেকে বৈজ্ঞানিক ঘটনার থেকে পৃথক? বা ধর্মীয় বচনের বিশেষ ধরনের কোন ক্রিয়া আছে কি? ধর্ম-সম্পর্কীয় ভাষা বিষয়ক সমস্যার ক্ষেত্রে এগুলিই হল আলোচনার বিষয়।

দুটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা

এটা স্পষ্ট যে ঈশ্বর প্রসঙ্গে যে সব পদের ব্যবহার করা হয়, সেগুলির ব্যবহারে একটা বিশেষত্ব আছে। দৈনন্দিন জীবনে পার্থিব বস্তুর ক্ষেত্রে সেই সব পদের যে ব্যবহার, সেই ব্যবহার থেকে তাদের ব্যবহার পৃথক। উদাহরণের সাহায্যে বিষয়টাকে স্পষ্ট করে তোলা যাক। যখন বলা হয় ঈশ্বর বড় বা মহান, তখন নিশ্চয়ই আমরা এই বচনটির অর্থ বুঝতে গিয়ে মনে

ঈশ্বর প্রসঙ্গে পদের ব্যবহারের বৈশিষ্ট্য

করি না যে ঈশ্বর অনেক বৃহৎ স্থান বা দেশ জুড়ে অধিষ্ঠিত; বা যখন বলা হয়, ঈশ্বর তাঁর পরম ভক্তকে উদ্দেশ্য করে কোন কিছু বললেন তখন আমরা মনে করি না যে ঈশ্বরের দেহ আছে, তিনি বাক্‌যন্ত্রের অধিকারী; তার উচ্চারিত শব্দ-তরঙ্গ গতিময় হয়ে পরম ভক্তের শ্রবণেন্দ্রিয়ে পৌঁছেছে। যখন বলা হয় 'ঈশ্বর কল্যাণময়' (good) তখন আমরা চিন্তা করি না যে ঈশ্বর-প্রকৃতি নিরপেক্ষ নৈতিক মূল্যের অস্তিত্ব আছে যার সঙ্গে তুলনা করে ঈশ্বরকে কল্যাণময় বলা হয়। যেমন—ভাল ছেলে হওয়ার মানদণ্ডে বিচার করে কোন ছেলে ভাল কি মন্দ বিচার করা হয়। মানুষের ক্ষেত্রে যখন বলা হয় 'রাম ভাল' (good), তখন এমন ভাবা যেতে পারে যে রাম প্রলোভনে পতিত হলেও তাকে জয় করতে সক্ষম। কিন্তু ঈশ্বর ভাল বা কল্যাণময়, এরকম কথা যখন বলা হয় তখন নিঃসন্দেহে এমন কথা আমাদের মনে জাগে না যে ঈশ্বর প্রলোভনে পতিত হন এবং সেই প্রলোভনকে জয় করেন। কাজেই ধর্ম-নিরপেক্ষ প্রসঙ্গে কোন পদের প্রয়োগের সময় সেই পদের যে অর্থ, এবং ধর্ম-বিষয়ক প্রসঙ্গে সেই পদের যে প্রয়োগ তার যে অর্থ—এই উভয় অর্থের মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য আছে।

এই প্রসঙ্গে জন হিক (*John Hick*)-এর একটি অভিমত বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। যে-সব ক্ষেত্রে কোন পদ ধর্মবিষয়ক এবং ধর্মবিষয়ক নয়এমন প্রসঙ্গে প্রয়োগ করা হয়, পদটির ধর্মবিষয়ক প্রসঙ্গ-নিরপেক্ষ অর্থ টিই প্রাথমিক বা মুখ্য, কেননা এই অর্থ টিই সর্ব প্রথম বিকাশ লাভ করেছে এবং শব্দটির সংজ্ঞা বা লক্ষণকে নিরূপণ করেছে। ঈশ্বরের ক্ষেত্রে সেই পদটিকেই যখন প্রয়োগ করা হয়েছে তখন সেই পদটির অর্থ পদটির ধর্ম-নিরপেক্ষ প্রসঙ্গে ব্যবহারের ফলে, যে অর্থ, সেই অর্থকেই অন্যভাবে উপযোগী করে নেওয়া হয়েছে। দৈনন্দিন জীবনে 'ভাল', 'সদয়', 'ক্ষমাশীল', 'আদেশ', 'শোনা', 'বলা', 'সঙ্কল্প করা', 'উদ্দেশ্য' এই সব পদের অর্থ বিশেষ কোন সমস্যার সৃষ্টি করে না। কিন্তু ঈশ্বরের ক্ষেত্রে এই সকল পদের প্রয়োগ নানা ধরনের সমস্যা সৃষ্টি করে। ধরা যাক, 'ভালবাসা' এই পদটি, কথার মধ্য দিয়ে ভালবাসার প্রকাশ ঘটে এবং নানা ধরনের ব্যবহারিক ক্রিয়ার মধ্য দিয়েও ভালবাসার প্রকাশ ঘটে। কিন্তু ঈশ্বব বিদেহী, অংশহীন, আবেগবিহীন, কাজেই ভালবাসা প্রকাশ করার জন্য ঈশ্বরের কোন দৈশিক অবস্থান বা শারীরিক উপস্থিতির কথা বলা চলে না। কিন্তু অশরীরী ভালবাসার প্রকৃতি কি, এই জাতীয় ভালবাসার অস্তিত্ব আছে কিনা, বোঝা যাবে কি ভাবে? ঈশ্বরের ক্ষেত্রে অন্যান্য যে সব গুণ আরোপিত হয়, সেগুলি সম্পর্কেও একই সমস্যা দেখা দেয়।

পদের ধর্মীয় প্রসঙ্গ নিরপেক্ষ অর্থই প্রাথমিক বা মুখ্য

ধর্মের ভাষার বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে এলাসডেয়ার মেকিনটায়ার

(*Alasdair Macintyre*) বলেন[1] যে, ধর্মীয় উক্তিতে যে অসংখ্য শব্দসমষ্টির দেখা পাওয়া যায়, তাদের মধ্যে অধিকাংশ শব্দই অ-ধর্মবিষয়ক (non-religious) প্রসঙ্গে তাদের প্রয়োগের দ্বারাই অর্থপূর্ণ হয়ে উঠত। প্রশংসা করা, ভালবাসা, মহান কাজের বর্ণনা করা, শ্রদ্ধামিশ্রিত ভয় প্রদর্শন করা—এসব ক্ষেত্রে যেসব শব্দের ব্যবহার করা হয়েছে সেগুলি আমরা দৈনন্দিন জীবনের ভাষায় বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হতে দেখি। এমন কথা বলা যুক্তিসঙ্গত নয় যে ধর্ম এই সব শব্দ সমষ্টির ক্ষেত্রে কোন নতুন এবং গুপ্ত অর্থ আরোপ করে। কিন্তু ধর্মবিজ্ঞানীরা এই কথাই বলতে চান। তাঁদের যুক্তি হল কতকগুলি শব্দসমষ্টি শুধুমাত্র ধর্মীয় উক্তির ক্ষেত্রেই প্রয়োগ করা যেতে পারে, অন্যান্য ক্ষেত্রে নয়। কিন্তু আমরা দেখি যখন বলা হয় ঈশ্বর আমাদের পিতা, ঈশ্বর আমাদের মাতা নন, তিনি আমাদের ভালবাসেন, ঘৃণা করেন না, আমরা তাঁকে মানতে বাধ্য, আমরা কোনমতেই তাঁর আদেশ লঙ্ঘন করতে পারি না, তখন পিতা-মাতা; ভালবাসা, ঘৃণা, মান্য করা, লঙ্ঘন করা—এইসব তুলনামূলক প্রত্যয় তাদের পরিচিত অর্থ নিয়েই ঈশ্বর সম্পর্কীয় উক্তির ক্ষেত্রেই ব্যবহৃত হয়েছে।

পরিচিত শব্দই ঈশ্বর সম্পর্কীয় উক্তির ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়

এই সুস্পষ্ট বিষয়টির জন্যই ধর্মীয় উক্তির সম্পর্কে তিনটি অভিমতকে সমর্থন করা চলে না, যে অভিমতগুলি কোন কোন ধর্মবিজ্ঞানীদের সমর্থন লাভ করেছে।

প্রথম অভিমত : যে মন ধর্মে বিশ্বাস স্থাপন করে, সেই ধর্ম-বিশ্বাসী মনের এক বিশেষ আলোকপাতের দ্বারা ধর্মীয় উক্তির ক্ষেত্রে অর্থ আরোপিত হয়। অনেকের ধারণা, যে মন ঈশ্বরের করুণা লাভ করেনি, সেই মনের কাছে বাইবেলের উক্তিগুলি অর্থহীন।

প্রথম অভিমত

সমালোচনা : এই অভিমত সমর্থনযোগ্য নয়। কেননা অধিকাংশ ধর্ম পরিচিত শব্দই ব্যবহার করে যার অর্থের সঙ্গে আমাদের পরিচিতি রয়েছে। তাদের অর্থ, ধর্ম-বিশ্বাসী এবং ধর্মে অবিশ্বাসী, উভয়ের কাছে সমান ভাবেই প্রকাশমান।

দ্বিতীয় অভিমত : ধর্মীয় উক্তিগুলিকে সাংকেতিক ভাষা থেকে সাধারণ ভাষায় অনুবাদ করে নেবার প্রয়োজন রয়েছে। কেননা তারা আভ্যন্তরীণ অভিজ্ঞতা নির্দেশ করে, যে অভিজ্ঞতার অধিকারী হতে পারে স্বল্প ব্যক্তিই। অর্থাৎ খুব অল্প সংখ্যক লোকই এই সাংকেতিক ভাষা বুঝতে পারে। অর্থাৎ এই অভিমতানুসারে কেবলমাত্র সেই সব ব্যক্তি যাদের এই ধরনের

দ্বিতীয় অভিমত

1. তাঁর রচিত প্রবন্ধ "Is Religious Language so idiosyncratic that we can hope for no philosophical account of it" ? —In the book Religious Language and the problem of Religious knowledge. —Edited by R. E. Santoni]

বৈশিষ্ট্যমূলক অভিজ্ঞতা লাভের সুযোগ ঘটে, তারাই এই সাংকেতিক ভাষাকে সাধারণ ভাষায় অনুবাদ করতে পারে।

সমালোচনা : কিন্তু এই অভিমত যে সমর্থনযোগ্য নয় একটি উদাহরণের সাহায্যে সেটা বুঝে নেওয়া যেতে পারে। স্লেয়ারমেকার (*Schleiermaehar*) বলেন যে, যখন আমরা বলি ঈশ্বর জগত সৃষ্টি করেছিলেন তখন আমরা ঈশ্বরের উপর আমাদের একান্ত নির্ভরতার আভ্যন্তরীণ অভিজ্ঞতার বিষয়টির কথা বলছি। কিন্তু 'ঈশ্বর জগত সৃষ্টি করেছিলেন' এই শব্দগুলি যদি সাধারণ অর্থে আমরা ব্যবহার করি তাহলে আমরা কোন আভ্যন্তরীণ অভিজ্ঞতার কথা নির্দেশ করছি, এমন কথা বলতে পারব না।

তাছাড়া অর্থহীন শব্দসমষ্টির ক্ষেত্রে অর্থ আরোপ করা বলতে কি বোঝায়? এমন কথা বলা যেতে পারে যে, শব্দ সমষ্টিকে নতুনভাবে ভাষান্তরিত বা ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। কিন্তু যদি কেউ এমন কথা বলতে চায় যে শব্দগুলি যে অর্থ নির্দেশ করে সেই অর্থ না বুঝে অন্য অর্থ বুঝে নিতে হবে তাহলে এই ধরনের শব্দ ব্যবহার করা হয়ে পড়বে বিভ্রান্তিকর। ধর্মবিজ্ঞানীরা তাঁদের ধর্মমতে এই ধরনের শব্দ প্রয়োগের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। কাজেই এটা বলা ভুল হবে যে স্লেয়ারমেকার এবং গোঁড়া ধর্মবিজ্ঞানীরা 'ঈশ্বর জগৎ সৃষ্টি করেছিলেন' এই উক্তির অর্থ সম্পর্কে একমত হতে পারেননি। আসল বিষয় হল এই জাতীয় কথা বলা যুক্তিযুক্ত কিনা, এই নিয়ে তাঁদের মধ্যে মতভেদ আছে।

উদারপন্থী ধর্মবিজ্ঞানীরা যখন বলেন যে ধর্মবিষয়ক বক্তব্যগুলি ব্যক্তির একান্ত নিজস্ব বিষয়, তখন সমস্ত বিষয়টিকে এই বলে বাতিল করে দেওয়া যেতে পারে যে, কোন শব্দসমষ্টি এইভাবে অর্থবহ হয়ে উঠতে পারে না।

এমন নয় যে আমাদের একান্ত নিজস্ব অভিজ্ঞতা (private experiences) হয়। আমরা শব্দগুলি শিক্ষা করি এবং আমাদের অভিজ্ঞতায় তাদের প্রয়োগ করি। এক অর্থে ভাষা অভিজ্ঞতার পূর্বগামী, এবং অভিজ্ঞতাকে আকার দান করে। এই বিষয়টি ধর্মের ভাষা সম্পর্কে যেমন, অন্য ভাষা সম্পর্কেও সত্য।

সমালোচনা

ধর্মবিষয়ক অভিজ্ঞতা ব্যক্তির নিজস্ব অভিজ্ঞতা। এই কথা যাঁরা বলেন, তাঁদের বলা যেতে পারে যে, এই ভাষাই ব্যক্তির নিজস্ব অভিজ্ঞতাকে অপর ব্যক্তির কাছে বোধগম্য করে তুলতে পারে। এই কারণে দু'জন ধর্ম বিশ্বাসী তাঁদের অভিজ্ঞতার কথা আলোচনা করতে পারে। যদি ধর্মীয় উক্তি বা বচন হয় ব্যক্তির একান্ত নিজস্ব ব্যাপার এবং তাদের অর্থ তার দ্বারাই নিঃশেষিত হয়ে যায় তাহলে

দু'জন ধর্মবিশ্বাসী ব্যক্তি তাঁদের অভিজ্ঞতাকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে একই ভাষা ব্যবহার করবেন না। দু'জনের ভাষা হবে দুই পৃথক ভাষা এবং দুই ধর্মবিশ্বাসী ব্যক্তি কখনও জানতে পারবে না যে তাঁদের অভিজ্ঞতা একই ধরনের। কিন্তু আমরা বাস্তবে দেখি ধর্মবিশ্বাসী ব্যক্তিরা ধর্মের ব্যাপারে পরস্পরের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করতে পারে। এর কারণ হল ধর্মের ভাষা কোন ব্যক্তিগত সাংকেতিক ভাষা নয়। ধর্মের ভাষা সকলের ভাষা এবং পরিচিত ভাষা।

তৃতীয় অভিমত : অপর একটি অভিমত আছে যে, অভিমত ধর্মের ভাষার পরিচিত বিষয়বস্তুকে অগ্রাহ্য করে। সংশয়বাদীরা বলেন যে ধর্মীয় উক্তি বা বচনগুলি হল অর্থহীন। কোন কোন ধর্মবিশ্বাসী ব্যক্তি এই অভিযোগের উত্তর দিতে গিয়ে তাকে স্বীকার করে নেয়। তাঁরা বলেন ধর্মের কাজ, বিশেষ করে যা অব্যক্ত (what cannot be said) তাকে নিয়ে। অতীন্দ্রিয়বাদী লেখকেরা এর উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন এবং কোন কোন ধর্মবিজ্ঞানের লেখক তাঁদের বক্তব্যকে সমর্থন করেছেন। সংশয়বাদী এবং অতীন্দ্রিয়বাদীরা যখন একত্রে বলেন যে, ঈশ্বর সম্পর্কে কোন কিছু বলার অর্থ হল যা বলা হল তার সীমা অতিক্রম করে যাওয়া—তখন তারা ভিন্ন ভিন্ন বিষয় বুঝিয়ে থাকেন। কিন্তু এটি আমাদের এক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের দিকে চালিত করে যে, অধিকাংশ ধর্মের ভাষা আমাদের পরিচিত ভাষা। ধর্মবিশ্বাসী ব্যক্তিরা সাধারণতঃ কোন কিছু ঘোষণা করতে চায়, যেহেতু তারা কোন কিছুকে স্বীকার বা অস্বীকার করতে চায়। কিন্তু সবহ কিছুই যদি অর্থহীন হয় তাহলে এক ধরনের অর্থহীন বিষয় অন্য ধরনের অর্থহীন বিষয়ের সমতুল হয়ে পড়বে। ধর্মবিজ্ঞানী, তার পরিচিত শব্দ ব্যবহার করবে যে বিষয়টি ঘোষণা করার জন্য সেটি হল যে, ধর্মবিষয়ক আলোচনা অর্থহীন।

তৃতীয় অভিমত

ধর্মের উক্তি সম্পর্কে উপরিউক্ত অভিমতগুলি গ্রহণযোগ্য নয়, কেননা ধর্মের ভাষা এবং সাধারণ দৈনন্দিন ভাষার মধ্যে যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে। প্রকৃত অসুবিধা দেখা দেয় যখন আমরা সাদৃশ্য এবং পার্থক্য উভয়কে একত্রে বিবেচনা করি। বাইবেলে যখন বলা হয়, মানুষ ভ্রমণ করতে চায়, কষ্ট পায়, বিবাহ করে, সন্তান লাভ করে তখন কোন অসুবিধার সৃষ্টি হয় না। কিন্তু ঈশ্বরের আদেশে তারা ভ্রমণে যান, সব কিছু করেন ঈশ্বরের নির্দেশে, এসব কথা যখন বলা হয়, তখনই অসুবিধা দেখা দেয়। ঈশ্বর সম্পর্কে যা বলা হয় তাও খুব পরিচিত বিষয়। ঈশ্বর ডাকেন, ঈশ্বর শ্রবণ করেন, ঈশ্বর কোন কিছু প্রদান করেন। কিন্তু যে-সব ক্রিয়াপদের উল্লেখ করা হল, ধর্ম বিষয় বহির্ভূত

ধর্মের ভাষা এবং সাধারণ দৈনন্দিন ভাষার মধ্যে যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে

পরিপ্রেক্ষিতে তাদের যা প্রয়োগ ঈশ্বরের ক্ষেত্রে তাদের সেই প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায় না। ঈশ্বর এই নামটি যখন প্রয়োগ করা হচ্ছে তখন এমন কাউকে বোঝাচ্ছে না যাকে প্রত্যক্ষ করা যায়, এবং যখন বর্ণনামূলক কোন ক্রিয়া পদ ব্যবহার করা হয় যেমন—ঈশ্বরের আহ্বান শোনা যায় ; তখন সাধারণ ধরনের শোনা বোঝাচ্ছে না। এর ফলেই বিভ্রান্তির সৃষ্টি। যদি ঈশ্বর সম্পর্কীয় আলোচনার কোন ব্যাখ্যা তার সাধারণ অর্থে দেওয়া না যায়, তাহলে প্রশ্ন দেখা দেয়; কি ভাবে তা দেওয়া যেতে পারে ?

৪। সাদৃশ্য বিষয়ক মতবাদ (The Doctrine of Analogy) :

উপরে যে সমস্যার কথা আলোচনা করা হয়েছে মধ্যযুগীয় দার্শনিকবৃন্দ সেই সমস্যা সম্পর্কে অবহিত ছিলেন এবং সেই সমস্যার সমাধানের জন্য সাদৃশ্য বিষয়ক মতবাদ উপস্থাপিত করেছেন। মধ্যযুগীয় দার্শনিক একুইনাস (*Aquinas*) বলেন যে, যখন ভাল বা 'কল্যাণময়' শব্দটি সৃষ্ট জীব এবং 'ঈশ্বর' উভয়ের ক্ষেত্রেই প্রয়োগ করা হয় তখন শব্দটি কিন্তু একই অর্থে উভয় ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয় না। মানুষ যে অর্থে ভাল হতে পারে সেই অর্থে ঈশ্বর ভাল নাও হতে পারে। আবার 'ভাল' এই বিশেষণ বা বিধেয়টি যখন ঈশ্বরের এবং মানুষের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয় তখন সম্পূর্ণ ভিন্ন এবং পারস্পরিক সম্পর্কবিহীন অর্থেও ব্যবহার করা হয় না যেমন—ইংরেজীতে কোন কোন শব্দ প্রয়োগের ক্ষেত্রে দেখা যায়। 'ইংরেজীতে' page শব্দটি 'কাগজ' বোঝায় এবং 'বালক ভৃত্যকে'ও বোঝায়। মানুষের ক্ষেত্রে এবং ঈশ্বরের ক্ষেত্রে যখন ভাল (good) শব্দটি প্রয়োগ করা হয় তখন ঈশ্বরের ভালত্ব এবং মানুষের ভালত্ব, এই উভয়ের মধ্যে সুনির্দিষ্ট সম্পর্কের কথা অস্বীকার করা যায় না, কেননা ঈশ্বরই মানুষের স্রজন কর্তা। সেইকারণে দার্শনিক একুইনাস মনে করেন যে, 'ভাল' বা 'কল্যাণময়' শব্দটি জীবের স্রষ্টা এবং সৃষ্ট জীবের ক্ষেত্রে একই অর্থে বা ভিন্ন অর্থে প্রযোজ্য হয় না, সাদৃশ্যমূলকভাবে (analogically)-ই প্রযোজ্য হয়। একটি উদাহরণের সাহায্যে বিষয়টিকে স্পষ্ট করে তোলা যেতে পারে।

একুইনাসের অভিমত

'কল্যাণময়' শব্দটি জীবের ও ঈশ্বরের ক্ষেত্রে সাদৃশ্যমূলকভাবে প্রযোজ্য হয়

জন হিক বলেন, আমরা সময় সময় পোষা কুকুরকে বিশ্বাসী (taithful) বলি। আমরা মানুষকেও বিশ্বাসী বলি। উভয় ক্ষেত্রে আমরা একই শব্দ প্রয়োগ করি, তার কারণ হল, বিশ্বাসী কুকুরের ক্ষেত্রে তার আচরণের মধ্যে যে বৈশিষ্ট্যের প্রকাশ লক্ষ্য করি এবং মানুষের অন্য মানুষের প্রতি বা কোন কারণের প্রতি যে একনিষ্ঠ ঐচ্ছিক আনুগত্য দেখি, এই দুই-এর মধ্যে আমরা সাদৃশ্য বা মিল লক্ষ্য করি। এই সাদৃশ্যের জন্য আমরা 'বিশ্বাসী' এই শব্দটি ভিন্ন অর্থে উভয় ক্ষেত্রে ব্যবহার করছি না। আবার

কুকুরের মনোভাব এবং মানুষের মনোভাবের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য আছে। মানুষের দায়িত্ববোধ, তার সচেতন বিবেচনা শক্তি, নৈতিক উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের সঙ্গে মনোভাবকে যুক্ত করার ক্ষমতা ইত্যাদি বিষয়গুলি বিচার করলে কুকুরের মনোভাবের তুলনায় মানুষের মনোভাবের উৎকর্ষ অস্বীকার করা চলে না। এই পার্থক্য হেতুই 'বিশ্বাসী' শব্দটি আমরা কুকুর এবং মানুষের ক্ষেত্রে একই অর্থে ব্যবহার করছি না। সাদৃশ্যমূলক দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই কথাটিকে প্রয়োগ করা হচ্ছে; কুকুরের চেতনার বিশেষ এক স্তরে এমন একটি গুণের প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়, যে গুণটি মানুষের স্তরে যাকে বিশ্বাসী হওয়া বলি, তার অনুরূপ। অর্থাৎ বিশ্বাসী শব্দটির মনোভাবের দিক থেকে এবং আচরণের বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে এমন একটা উল্লেখযোগ্য সাদৃশ্য রয়েছে যার জন্য 'পশু' এবং 'মানুষ' উভয় ক্ষেত্রে আমরা একই শব্দ প্রয়োগ করি।

যাই, বলা হোক না কেন, মানুষের বিশ্বস্ততা এবং কুকুরের বিশ্বস্ততা—এই দুই-এর মধ্যে ব্যাপক পার্থক্য বর্তমান, যেমন রয়েছে কুকুরের সঙ্গে মানুষের। কাজেই পার্থক্যের মধ্যে যেমন সাদৃশ্য বর্তমান থাকে তেমনি রয়েছে সাদৃশ্যের মধ্যে পার্থক্য, যার জন্য একুইনাস দুটি ভিন্ন প্রসঙ্গে একই শব্দের সাদৃশ্যমূলক ব্যবহারের কথা বলেছেন। উপরের দৃষ্টান্তে মানুষের সঙ্গে মনুষ্যেতর জীবের সাদৃশ্যের কথাই বলা হল।

এই সাদৃশ্যের ক্ষেত্রে, যখন নীচের স্তরে এই সাদৃশ্য প্রয়োগ করা হয়, প্রকৃত আদর্শ-মূলক বিশ্বাস বা আস্থা, যা প্রত্যক্ষভাবে আমাদের মধ্যে রয়েছে, তার কথা আমরা জানি। কুকুরের মধ্যে যে বিশ্বাস বা আস্থার কথা বলি তাকে আমাদের বিশ্বাসের মতন এমন সুস্পষ্ট ভাবে জানি না, তাকে জানি সাদৃশ্যের মাধ্যমে। কিন্তু যখন উপরের দিকে অগ্রসর হই, অর্থাৎ মানুষের থেকে ঈশ্বরের দিকে যাই, তখন পরিস্থিতির সম্পূর্ণ পরিবর্তন ঘটে। আমাদের নিজেদের প্রত্যক্ষভাবে জানা সততা, ভালবাসা, জ্ঞান—এগুলি ঈশ্বরের নিখুঁত গুণের তুলনায় ক্ষীণ ছায়ামাত্র এবং ঈশ্বরের গুণের সন্নিকট থেকে অনেক দূরে অবস্থিত; এবং ঈশ্বরের নিখুঁত গুণের কথা আমরা সাদৃশ্যের মাধ্যমেই জানি। কাজেই যখন আমরা বলি ঈশ্বর ভাল বা কল্যাণময় তখন যা আমরা বলতে চাই তা হল এই যে, অসীম পূর্ণ সত্তা ঈশ্বরের এমন একটা গুণ আছে, মানুষের স্তরে যাকে আমরা 'ভাল' বা 'কল্যাণময়' বলি, তার সঙ্গে তাঁর সঙ্গতি আছে। এক্ষেত্রে ঐশ্বরিক কল্যাণই হল সত্য, আদর্শনিষ্ঠ এবং অখণ্ড সত্তা; মানুষের জীবনে সেই গুণের ক্ষীণ, খণ্ড বা অসম্পূর্ণ এবং বিকৃত প্রতিবিম্ব মাত্র লক্ষ্য করা যায়। কেবলমাত্র

আমাদের জানা গুণ ঈশ্বরের নিখুঁত গুণের তুলনায় ছায়ামাত্র

ঈশ্বরের ক্ষেত্রেই সত্তার পূর্ণতা সত্য এবং অখণ্ডরূপে নিজেকে প্রকাশ করে। কেবলমাত্র ঈশ্বরই জানে, ভালবাসে এবং পরিপূর্ণ অর্থে সৎ এবং জ্ঞানী।

ঈশ্বর যেহেতু আমাদের দৃষ্টির আড়ালে, ঈশ্বর ইন্দ্রিয়ের দ্বারা প্রত্যক্ষগ্রাহ্য নয়। প্রশ্ন জাগে ঈশ্বর যে কল্যাণময়, বা ঈশ্বর অন্যান্য গুণের অধিকারী তা আমরা কিভাবে জানি? একুইনাস তার উত্তরে বলেছেন যে, আমরা জানি না। তিনি যেভাবে সাদৃশ্য বিষয়ক মতবাদটি উপস্থাপিত করেছেন, তাতে তাঁর সেই মতবাদ ঈশ্বরের পূর্ণতার মূর্ত বৈশিষ্ট্যটি প্রকাশ করে না। যখন কোন শব্দ মানুষের ক্ষেত্রে এবং ঈশ্বরের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয় মতবাদটি তখন সেই শব্দের বিভিন্ন অর্থের মধ্যে যে সম্বন্ধ কেবলমাত্র তাকেই নির্দেশ করছে। সাদৃশ্য অনন্ত ঈশ্বরের প্রকৃতি আবিষ্কারের যন্ত্রমাত্র নয়। এটি হল, যে ঈশ্বরের অস্তিত্ব এই মুহূর্তে পূর্ব থেকে অনুমান করে নেওয়া হচ্ছে সেই ঈশ্বরের ক্ষেত্রে পদগুলি কিভাবে ব্যবহার করা হয় তারই একটি বর্ণনা মাত্র। অজ্ঞেয়তাবাদকে লঙ্ঘন না করে এবং ঈশ্বরের সত্তার মধ্যে যে রহস্যময়তার বা অতীন্দ্রিয়তার বোধ আছে, যা খ্রীষ্টীয় এবং ইহুদীদের চিন্তার মধ্য দিয়ে প্রকাশিত, তাকে লঙ্ঘন না করে সাদৃশ্য সম্পর্কীয় মতবাদ ঈশ্বরের সম্পর্কে কয়েকটি সীমিত উক্তির একটা কাঠামো উপস্থাপিত করে। কেথলিক ঈশ্বরবিজ্ঞানী বেরন ভন্ হুগেল (১৮৫২-১৯২৫)-ও মনে করেন যে

ভন্ হুগেল এর অভিমত

ঈশ্বর সম্পর্কে অনেক কথা বলা চলে, তবে যে সব কথা বলা হবে বা যতদূর সেই আলোচনাকে টেনে নিয়ে যাওয়া হবে তা স্রষ্টা এবং সৃষ্ট জীবের মধ্যে দূরাগত সাদৃশ্যের ভিত্তিতেই করা সম্ভব হতে পারে। বেরন ভন হুগেল বলেন যে ধর্ম যদি সত্য হয় এবং ধর্মের বস্তুও যদি বাস্তব হয় তবু ধর্মের উৎস এবং বস্তু কখনও আমার কাছে এতটা স্পষ্ট হতে পারে না, আমার কুকুরের কাছে আমি যেমন স্পষ্ট। কারণ যখন কোন বস্তুর সঙ্গে বা কোন প্রাণীর সঙ্গে আমার সম্পর্কের কথা বলি তখন আমি এমন সত্তার সঙ্গে আমার সম্পর্কের কথা বলছি যা আমার থেকে নিম্ন স্তরে অবস্থিত। যখন মানুষের সঙ্গে আমার সম্পর্কের কথা বলি তখন মানুষ আমার সমান স্তরে অবস্থিত। কাজেই কোন ক্ষেত্রেই এমন সম্পর্কের কথা বলা হচ্ছে না যেখানে সত্তা আমার থেকে উচ্চতর স্তরে অবস্থিত। কিন্তু ধর্মের ক্ষেত্রে, অবশ্য ধর্ম যদি যথার্থ হয়, আমরা এমন সত্তার কথা বলি যে সত্তা আমাদের থেকে শ্রেষ্ঠ, গুণগত দিক থেকে শ্রেষ্ঠ ; আমাদের সত্তার তুলনায় যার সত্তা অনেক বৃহৎ। বেরন ভন হুগেল বলেন যে আমার কুকুরের কাছে আমার জীবনের যে দুর্বোধ্যতা, ঈশ্বরের সঙ্গে আমার সম্পর্কের দুর্বোধ্যতা তাকে অনেক বেশী অতিক্রম করে যায়।

রেফেল ডেমস্ (*Raphel Demos*) সাদৃশ্যবিষয়ক মতবাদ সম্পর্কে আলোচনা

করেছেন। তিনি বলেন যখন আমরা বলি স্মিথ এবং জন দু'জনেই মানুষ, তখন মানুষ শব্দটি একার্থবোধক। কিন্তু যখন 'post' কথাটিকে আমরা 'ডাক' এবং 'স্তম্ভ' অর্থে গ্রহণ করি তখন শব্দটি দ্ব্যর্থবোধক। লেখকের মতে অর্থের অভিন্নতা (identity of sense) এবং অর্থের পার্থক্য (difference of sense), কোন শব্দ যে অর্থ নির্দেশ করে, সেই অর্থের সমগ্র অর্থকে নিঃশেষ করতে পারে না। তৃতীয় একটা বিকল্প আছে সেটা হচ্ছে সাদৃশ্যমূলক (analogical), যার অর্থ হল অভিন্নতাও নয়, পার্থক্যও নয়। কোন কোন দার্শনিক সাদৃশ্য-এর সংজ্ঞা নিরূপণ করতে গিয়ে বলেছেন যে সাদৃশ্য হল অংশতঃ অভিন্নতা (part identity) এবং অংশত পার্থক্য (part difference)। লেখক রেফেল ডেমস্ এই অভিমতের সঙ্গে একমত হতে পারেননি। তাঁর মতে সাদৃশ্য হল এমন একটি সম্বন্ধ যাকে অভিন্নতা এবং পার্থক্য উভয়ই ছাড়া অন্য কোন কিছুতে রূপান্তরিত করা যায় না। যখন ধর্মীয় সাদৃশ্যকে পার্থক্য-এর সঙ্গে ভুল করে দেখা হয় তখন আমরা অতীন্দ্রিয়বাদের চরম রূপ দেখি। যখন সাদৃশ্যকে অভিন্নতার সঙ্গে ভুল করি তখন আমরা পাই দেবতায় নরত্ব আরোপ (anthropomorphism)।

রেফেল ডেমস্-এর অভিমত

যখন আমরা বলি স্মিথ জনের মতন, তখন প্রশ্ন দেখা দেয় কোন্ ব্যাপারে ? তখন উত্তরে বলা যেতে পারে, বুদ্ধির বা উচ্চতার ব্যাপারে। এখানে সাদৃশ্য হল, তারা এক বৈশিষ্ট্যের অধিকারী, কিন্তু সাদৃশ্য (analogy) বলতে সব সময় তা বোঝায় না।

ধর্মের ক্ষেত্রে যখন বলা হয় 'ঈশ্বর অস্তিত্বশীল', 'ঈশ্বরের মন আছে', 'ঈশ্বর হল প্রেম', এই সব গুণগুলিকে সাদৃশ্যের দিক থেকে গ্রহণ করতে হবে। কেননা যখন বলি 'ঈশ্বর ভালবাসে', তখন বুঝতে হবে সেই ভালবাসা সেইরকম নয় যখন আমরা বলি মানুষ মানুষকে ভালবাসে।

অধ্যাপক ডেমস্ যা বলতে চান তা হল : (১) সাদৃশ্যকে বিশ্লেষণ করা যায় না। এটি হল অংশতঃ অভিন্নতা, অংশতঃ পার্থক্য। (২) সাদৃশ্য ধারণাগত সাদৃশ্য নয়। কেননা ধারণাগত সাদৃশ্যের ক্ষেত্রে একটা সাধারণ বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হওয়া বোঝায়। (৩) সাদৃশ্য হল এমন একটা সম্বন্ধ যাকে কোন কিছুতে রূপান্তরিত করা যায় না। (৪) এটি এ বিষয়ে সদৃশ বা ঐ বিষয়ে সদৃশ হওয়া বোঝায় না। এটি হল ঠিক সাদৃশ্য (just likeness), (৫) সাদৃশ্যকে বিশ্লেষণ করা যায় না, একে দেখে জানা যায়, একে তাৎক্ষণিকভাবে চিনে নিতে পারা যায়। (৬) যাদের মধ্যে সাদৃশ্যের কথা বলছি তারা সদৃশ হল কি, হল না, সেই সম্পর্কে কোন নির্দিষ্ট মানদণ্ড নেই।

সি. জে. ডুকাসি (*C. J. Ducasse*) অধ্যাপক ডেমসের সমালোচনা করতে গিয়ে বলেন যে, আমি বুঝে উঠতে পারছি না যে অধ্যাপক ডেমস সাদৃশ্য বলতে কি বুঝেছেন। সাদৃশ্যের সাধারণ অর্থ হল সম্বন্ধের সাদৃশ্য অর্থাৎ A এবং B এর সম্বন্ধ C এবং D-এর সম্বন্ধের অনুরূপ। সেইহেতু এ অর্থে সেই পদগুলি সাদৃশ্যসূচক হতে পারে, যা সম্বন্ধ নির্দেশ করে। কিন্তু ঈশ্বর সম্পর্কে এমন কতকগুলি গুণবাচক পদ ব্যবহার করা হয় সেগুলি মোটেই সম্বন্ধসূচক নয় এবং সেগুলি যে সম্বন্ধ-সূচক তা তিনি দেখাবার কোন চেষ্টা করেননি। তিনি সাদৃশ্যকে সাধারণ অর্থেই গ্রহণ করেছেন। অধ্যাপক ডেমস্ মনে করেন যে সাদৃশ্য হল এমন বিষয় যাকে বিশ্লেষণ করা যায় না এবং তাঁর বক্তব্য যেন এরকম দাঁড়ায় যে, খ্রীষ্টান ধর্ম-বিজ্ঞানীরা ঈশ্বর সম্পর্কে যে সব গুণ-বিষয়ক পদ প্রয়োগ করেন সেগুলি বর্ণনামূলক, যদিও তারা আক্ষরিক অর্থে বা আধিবিদ্যক অর্থে (metaphysically) বর্ণনামূলক নয়। তাহলে যে সব বিবৃতি ঈশ্বরের ক্ষেত্রে ঐ বিধেয়গুলি আরোপ করে সেগুলি জ্ঞানমূলক, এমন সিদ্ধান্ত সুপ্রতিষ্ঠিত হয় না।

ডেমস্-এর সমালোচনা

৫। ধর্মসম্পর্কীয় বচন বা বিবৃতি হল প্রতীকধর্মী (Religious Statements are symbolic) :

পিটার ডনোভেন (*Peter Donovan*) ধর্মীয় ভাষায় প্রতীকের ব্যবহার সম্পর্কে আলোচনা করেছেন।[1] তাঁর বক্তব্য হল ধর্মীয় ভাষায় প্রতীকের ব্যবহার আছে সত্য, কিন্তু এর অনেক ভাষাই প্রতীকধর্মী নয়। যখন বলা হয় ঈশ্বর কথা বলেন, শোনেন, কাউকে কাছে টানেন, তখন শব্দগুলি সাধারণ দৈনন্দিন জগতে ব্যবহৃত অতি পরিচিত শব্দ হলেও এদের ব্যবহার সাধারণ নয়। যে শরীরধারী তার ক্ষেত্রে কথা বলা, শোনা প্রভৃতি ক্রিয়া-মূলক পদের অর্থ আমরা বুঝি, কিন্তু ঈশ্বরের তো কোন শরীর নেই। তবু ধর্মের বিবৃতিগুলিতে এমন অনেক শব্দের ব্যবহার করা হয় যেগুলির ব্যবহার আক্ষরিক অর্থেই করা হয়।

পিটার ডনোভেন-এর অভিমত

তবে ধর্মের ক্ষেত্রে প্রতীকী ভাষার ব্যবহার দেখে আমরা দার্শনিক সমস্যার স্বরূপটা বুঝে নিতে পারি। প্রতীকী ভাষা হল অনুভূতির ভাষা। এটি মানুষের অনুভূতিকে জাগ্রত করে, তার কল্পনাকে প্রণোদিত করে এবং তার আবেগকে প্রভাবিত করে। ধর্মের ভাষাও তাই করে থাকে। ধর্মের ক্ষেত্রে প্রতীকতার এক সুমহান ও পরমসত্তার কথা জাগিয়ে তোলার ক্ষমতা আছে। মানুষের অন্তরে কোন বিষয় গভীর ভাবে

1. Religious Language, (Is Religious Language all figurative ?) ; Page 7.

মুদ্রিত করার ক্ষমতা ধর্মের প্রতীকের আছে। তাই ধর্ম শুধুমাত্র বৌদ্ধিক ব্যায়ামে (intellectual exercise) পরিণত হয় না। মানুষের আবেগগত প্রতিক্রিয়া এবং তার নৈতিক এবং সৌন্দর্য-বিষয়ক অনুভূতিশীলতার সঙ্গে ধর্মের ভাষার সম্পর্ক আছে।

দর্শন যখন ধর্মের প্রকৃতি অনুসন্ধান করে, তখন দর্শন, ধর্মের ভাষা যে গভীর আবেগ জাগিয়ে তোলে তাকে অস্বীকার করে না। কিন্তু ধর্ম এই কাজটি করতে গিয়ে যদি মনে করে যে, যে বিষয়ের অস্তিত্ব আছে বলে সে বলছে তার অস্তিত্ব সে প্রমাণ করতে পেরেছে, তাহলেই ভুল সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে। ডনোভেন বলেন যে ভাষার ব্যবহার যতই অর্থপূর্ণ হোক, যতই চমকপ্রদ হোক, তার থেকে সিদ্ধান্ত করা চলে না যে, তার দ্বারা কোন কিছুর অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়।

ভাষার দু'রকম ব্যবহার আছে—আহ্বানসূচক (evocative) এবং তথ্যমূলক (informative)। অনেক উক্তিই আহ্বানসূচক ও তথ্যমূলক দুটিই হতে পারে, যেমন —দেশভ্রমণকারী ক্ষুধার্ত ব্যক্তির কাছে পথের ধারে বিক্রি হচ্ছে এমন গরম সুগন্ধযুক্ত খাদ্যবিষয়ক উক্তি। কিন্তু সব উক্তিই তথ্যমূলক নয়। ধর্মীয় ভাষায় যেটা আহ্বানসূচক দিক (evocative language), তার প্রতীকতা, তার মনে কোন ভাবমূর্তি জাগাবার ব্যাপার—এগুলির সঙ্গে তার তথ্যমূলক দিকটির পার্থক্য আছে। কিন্তু দর্শনের কাছে যেটি গুরুত্বপূর্ণ সেটি হল **ধর্মীয় বিবৃতিগুলি আমাদের সত্যই কি কোন কিছু (something) সম্পর্কে কিছু বলে?** অর্থাৎ ধর্মীয় বিবৃতিগুলিতে যার কথা বলা হয়, যাকে কেন্দ্র করে আবেগ জাগান হয়, তার অস্তিত্ব আছে কি?

ডনোভেনের মতে প্রতীকী ভাষার স্বরূপ

ভাষার দু' প্রকার ব্যবহার

ধর্ম সম্পর্কীয় বিবৃতিগুলি প্রতীকধর্মী—পল টিলিকের (*Paul Tillich*) এই মতবাদ ধর্মের ভাষার ক্ষেত্রে এক গুরুত্বপূর্ণ মতবাদ, যে মতবাদের আলোচনার প্রয়োজন আছে।

সংকেত এবং প্রতীকের মধ্যে টিলিক পার্থক্য নির্দেশ করেছেন। সাধারণভাবে বলা যেতে পারে যে প্রতীক হচ্ছে সংকেত বা চিহ্ন। যেমন কোন দেশের পতাকা সেই দেশের প্রতীক। কোন দেশের পতাকা দেখে আমরা বলতে পারি সেটি কোন্ দেশের প্রতীক। যদিও প্রতীক হচ্ছে সংকেত বা চিহ্ন তবু উভয়ের মধ্যে পার্থক্য করা হয়। সংকেত এবং প্রতীক উভয়েই নিজেদের ছাড়িয়ে স্বতন্ত্র কিছুকে নির্দেশ করে। কিন্তু সংকেত যা নির্দেশ করে সেটা খেয়ালখুশীমত নির্দিষ্ট প্রচলিত কোন ব্যবস্থা যেমন লাল আলোর নিশানা দেখে গাড়ীর চালকরা পথে গাড়ী থামিয়ে দেয়। এখানে লাল আলো দেখে

সংকেত এবং প্রতীকের মধ্যে পার্থক্য

গাড়ী থামা, এই দুই-এর মধ্যে সম্পর্ক নিছক বাহ্য সম্পর্ক। কারণ পূর্ব থেকে স্থির হয়ে আছে যে লাল আলো দেখলে গাড়ীকে থামাতে হবে। একটির সঙ্গে আর একটির কোন অনিবার্য সম্পর্ক নেই। এর সঙ্গে তুলনা করলে দেখা যাবে যে প্রতীক যা নির্দেশ করে তাতে সে অংশ গ্রহণ করে। টিলিকের উদাহরণটি উল্লেখ করেই প্রতীকের স্বরূপকে বুঝে নেওয়া যেতে পারে। পতাকা যে জাতির প্রতীক সেই জাতির ক্ষমতা এবং মর্যাদায় অংশ গ্রহণ করে। যে বিষয়টিকে প্রতীকায়িত করছে তার সঙ্গে আভ্যন্তরীণ সম্পর্ক থাকার জন্য, প্রতীক প্রচলিত সংকেতের মতন খেয়ালখুশীমত প্রবর্তিত হয় না। ব্যক্তি বা সমষ্টির নির্জ্ঞান মন থেকে তার উদ্ভব ঘটে এবং সেই হিসেবেই তার আয়ুষ্কাল, তার ধ্বংস এবং মৃত্যু নির্ধারিত হয়। প্রতীক সত্তার বিভিন্ন স্তর আমাদের কাছে উদ্ঘাটিত করে, যেগুলি হয়ত আমাদের কাছে উদ্ঘাটিত হত না এবং সেই সঙ্গে নতুন জগতের যে দিকগুলি উদ্ঘাটিত করে তার সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করে আমাদের আত্মার বিস্তৃতির ও উপাদানের দ্বার আমাদের কাছে উন্মোচন করে দেয়। এই দ্বিবিধ ক্রিয়ার সুস্পষ্ট দৃষ্টান্ত দেখতে পাই কলার ক্ষেত্রে যা সত্তার কোন একটি স্তরে উপনীত হবার জন্য প্রতীক সৃষ্টি করে, যে স্তরে অন্য কোন ভাবে উপনীত হওয়া সম্ভব নয়। সেই সঙ্গে সঙ্গে কলা আমাদের মধ্যে নতুন অনুভবশীলতা এবং উপলব্ধির ক্ষমতা জাগিয়ে তোলে।

প্রতীক সত্তার বিভিন্ন স্তর আমাদের কাছে উদ্ঘাটিত করে

পল টিলিক তাঁর 'Symbols of Faith' প্রবন্ধে প্রতীকের কতকগুলি বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করেছেন। (১) প্রতীক নিজেকে ছাড়িয়ে বা অতিক্রম করে অন্য কিছুকে নির্দেশ করে। (২) প্রতীক যা নির্দেশ করে তাতে অংশ গ্রহণ করে। (৩) এটি সত্তার বিভিন্ন স্তর আমাদের কাছে উদ্ঘাটিত করে যা প্রতীক ব্যবহার করা না হলে আমাদের কাছে অনুদ্ঘাটিত থেকে যেত। (৪) এটি আমাদের আত্মার ব্যাপ্তি (dimension) এবং উপাদানের কথা আমাদের কাছে ব্যক্ত করে। যেমন একটি মহান নাটক মানব জীবনের এক সুমহান দৃশ্যই আমাদের কাছে তুলে ধরে না, আমাদের সত্তার গোপন বা লুক্কায়িত গভীরতার দিকটিও আমাদের কাছে উদ্ঘাটিত করে। (৫) প্রতীককে ইচ্ছামতন সৃষ্টি করা চলে না। তারা ব্যক্তি নির্জ্ঞান-মন বা সমষ্টি নির্জ্ঞান-মন (individual or collective unconscious) থেকে উদ্ভূত হয়। যেমন—রাজনৈতিক বা ধর্মীয় প্রতীক গোষ্ঠীর সমষ্টি-নির্জ্ঞান মনের দ্বারা সৃষ্ট এবং গৃহীত হয়। (৬) প্রতীককে আবিষ্কার করা যায় না (symbols cannot be invented), জীবিত প্রাণীর মতন

পল টিলিক-এর মতে প্রতীকের বৈশিষ্ট্য

তারা বেড়ে উঠে এবং মারা যায়। তারা বেড়ে উঠে যখন পরিস্থিতি বেড়ে ওঠার অনুকূল হয় এবং মারা যায় যখন পরিস্থিতি প্রতিকূল হয়।

টিলিক মনে করেন যে ধর্মীয় বিশ্বাস, যা পরম সত্তা সম্পর্কে জানতে চায় কেবলমাত্র নিজেকে প্রতীকধর্মী ভাষায় প্রকাশ করতে পারে। যাকে আমরা পরমতত্ত্ব বলে গণ্য করি তার সম্পর্কে আমরা যা বলি না কেন, তাকে আমরা ঈশ্বর বলি বা না বলি, তার একটা প্রতীকী অর্থ আছে। এটি নিজেকে অতিক্রম করে অন্য কিছু নির্দেশ করে। অথচ যা নির্দেশ করে তাতে অংশ গ্রহণ করে। অন্য কোন ভাবে ধর্মীয় বিশ্বাস যথোপযুক্তভাবে নিজেকে প্রকাশ করতে পারে না। 'বিশ্বাসের ভাষা হল প্রতীকের ভাষা'।

টিলিকের মতে পরম-সত্তা প্রতীকধর্মী ভাষায় কেবলমাত্র নিজেকে প্রকাশ করতে পারে

টিলিকের মতে কেবলমাত্র একটি অপ্রতীকী উক্তি আছে যেটি পরম সত্তা সম্পর্কে ব্যক্ত করা চলে যে সত্তাকে ঈশ্বর নামে অভিহিত করা হয়। সেটি হল, ঈশ্বর হল স্ব-নির্ভর সত্তা (Being itself)। এই অপ্রতীকী বিবৃতি ছাড়া সব ধর্মীয় বিবৃতি হল প্রতীকধর্মী, যেমন যখন বলা হয় ঈশ্বর অনন্ত, অস্তিত্বশীল, সৎ, জগতের স্রষ্টা, জীবের কল্যাণকামী,—এ সবই প্রতীকী ভাষা।

ঈশ্বর সম্পর্কের সব ভাষাই প্রতীকধর্মী

ঈশ্বর সম্পর্কে কোন মূর্ত ঘোষণা যে প্রতীকী হবে তাতে কোন সংশয় নেই কারণ ঈশ্বর সম্পর্কে কোন মূর্ত ঘোষণায় সীমিত অভিজ্ঞতার একটা অংশ ব্যবহার করা হয়। এই ধরনের বক্তব্যের বৈশিষ্ট্য হল যে এটি অভিজ্ঞতার সেই সীমিত অংশকে অতিক্রম করে যায়, অথচ একে আবার অন্তর্ভুক্ত করে নেয়, যেমন যখন আমরা বলি 'ঈশ্বর কল্যাণময়', তখন আমাদের সীমিত অভিজ্ঞতায় 'কল্যাণময়' শব্দটি যে অর্থ বহন করে আমরা ঈশ্বরের ক্ষেত্রে সেটি প্রয়োগ করি। কিন্তু 'আমার বন্ধু কল্যাণময়' বলতে আমি যা বুঝি, ঈশ্বরের ক্ষেত্রে 'কল্যাণময়' শব্দটি প্রয়োগ করার সময় আমি তার থেকে অধিক কিছু বুঝি। কাজেই আমাদের সীমিত অভিজ্ঞতাকে ভিত্তি করেই ঈশ্বর সম্পর্কে আমরা বিভিন্ন বচন ব্যবহার করি। কিন্তু এই বচনগুলি সীমিত অভিজ্ঞতাকে অতিক্রম করে যায় এবং সেইহেতু হয়ে ওঠে প্রতীকধর্মী।

ঈশ্বর সম্পর্কে যে কোন মূর্ত ঘোষণা প্রতীকী হতে বাধ্য

সীমিত সত্তার যে অংশটুকু, ঈশ্বর সম্পর্কে কোন মূর্ত ঘোষণা করতে গেলে, মাধ্যম রূপে ব্যবহৃত হয়, তাকে একাধারে যেমন স্বীকার করে নেওয়া হয়, তেমনি অপর দিকে তার নিষেধ হয় অর্থাৎ তাকে অস্বীকার করা হয় (affirmed and negated at the same time)। আসলে এটি একটি প্রতীকে পরিণত হয়। কেননা প্রতীকী

বিবৃতি হল তাই যার যথার্থ অর্থ যার দিকে নির্দেশিত হয়, তার দ্বারাই অস্বীকৃত হয় (negated by that to which it points)। অথচ বিষয়টি প্রতীকের দ্বারা স্বীকার করেও নেওয়া হয়। এই স্বীকৃতির ব্যাপারে, প্রতীকী বিবৃতিকে, তাকে অতিক্রম করে অন্য কিছুকে নির্দেশ করার একটা যথোপযুক্ত ভিত্তি বলে গণ্য করা হয়।

জন হিক, টিলিকের অভিমত সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেন যে, টিলিক বলতে চান যে, যখন আমরা পরম তত্ত্বের কথা বলি তখন আমরা মানুষের ভাষাকে আক্ষরিক অর্থে বা একই অর্থে ব্যবহার করি না। কেননা আমাদের পদগুলি কেবলমাত্র আমাদের নিজেদের সীমিত মানবীয় অভিজ্ঞতা থেকে উদ্ভূত হতে পারে, তারা যথাযথভাবে ঈশ্বরের ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হতে পারে না। যখন ধর্মের দিক থেকে তাদের প্রয়োগ বা ব্যবহার করা হয়, তখন তাদের অর্থ, যা তারা নির্দেশ করতে চায়, তার দ্বারা সর্বদাই আংশিকভাবে অস্বীকৃত (negated) হয়। ধর্মের দিক থেকে এই মতবাদ ঈশ্বরকে মানুষ রূপে কল্পনা করা বা ঈশ্বরে নরত্ব আরোপ করা সম্পর্কে সতর্কতার বাণী উচ্চারণ করার সামিল।

জন হিকের মতে টিলিকের অভিমত ঈশ্বরে নরত্ব আরোপ করা সম্পর্কে সতর্ক বাণী উচ্চারণ

টিলিকের মতবাদের সমালোচনায় জন হিক বলেন যে, তাঁর মতে একটি প্রতীক, যে সত্তা নির্দেশ করে, তাতে অংশ গ্রহণ করে। কিন্তু টিলিক এই অংশ গ্রহণের বিষয়টিকে বিশদভাবে ব্যাখ্যা করেন নি। 'ঈশ্বর কল্যাণময়' এই প্রতীকী বিবৃতিটি বিচার করে দেখা যাক: এক্ষেত্রে প্রতীকটি কি নির্দেশ করতে চাইছে? ঈশ্বর সৎ বা কল্যাণময় বা ঈশ্বরের সততার প্রত্যয়? প্রশ্ন হল, এই প্রতীকটি কি স্ব-নির্ভর (Being itself) সত্তাতে সেভাবেই অংশ গ্রহণ করে, যেমনভাবে একটি পতাকা জাতির শক্তি এবং মর্যাদায় অংশ গ্রহণ করে? টিলিক এর কোন বিশদ ব্যাখ্যা দেননি, যদিও তিনি অনেক জায়গায় বলেছেন যে একটি প্রতীক যা প্রতীকায়িত করে, তাতে অংশ গ্রহণ করে। পল টিলিক তাঁর 'Symbols of Faith' প্রবন্ধে বলেন, "এই ঘটনাটা এক হিসেবে চূড়ান্ত যে সংকেত যাকে নির্দেশ করে তার সত্তায় অংশ গ্রহণ করে না, কিন্তু প্রতীক করে থাকে"।[1]

টিলিকের অভিমতের সমালোচনা

---

1. "Decisive is the fact that signs do not participate in the reality of that to which they point, while symbols do."

—Religious Language and the Problem of Religious Knowledge. (Edited by R. E. Santoni); page136

কাজেই এটা স্পষ্ট হল না যে অন্য প্রতীকের সঙ্গে ধর্ম সম্পর্কীয় প্রতীকের সাদৃশ্য কোথায়। আবার টিলিকের মতে, যা কিছু অস্তিত্বশীলতা 'স্ব-নির্ভর সত্তাতে' অংশ গ্রহণ করে, তাহলে হিক প্রশ্ন তুলেছেন প্রতীকের স্ব-নির্ভর সত্তাতে অংশ গ্রহণ করা এবং সকল কিছুর তাতে অংশ গ্রহণ করা—এই দুই-এর ধরনের মধ্যে পার্থক্য কোথায় ?

টিলিক বলেছেন যে সত্তা নিজে ছাড়া অন্য কোন সত্তার উপর তার অস্তিত্বের জন্য নির্ভর নয়, এটি ব্যক্তি বা সমষ্টি-নির্জ্ঞান মন থেকে উদ্ভূত। কিন্তু হিক প্রশ্ন তুলেছেন যে, এটাই কি বেশী যুক্তিযুক্ত মনে হয় না যে, কোন দার্শনিক ধর্মবিজ্ঞানী এই ধারণাটি গঠন করেছেন। তিনি আরও প্রশ্ন তুলেছেন, কি অর্থে এই বচনটি আমাদের কাছে সত্তার সেই সব স্তরকে উদ্ঘাটিত করেছে যেগুলি আমাদের দৃষ্টির কাছে রুদ্ধ এবং আমাদের সত্তার লুক্কায়িত গভীরতর দিককে উদ্ঘাটিত করেছে। হিকের মতে প্রতীকের এই দুটি দিক ধর্মীয় বচনের বা ধারণার তুলনায় কলার ক্ষেত্রেই অধিকতর প্রযোজ্য। হিক মন্তব্য করেছেন যে টিলিকের প্রতীক সম্পর্কীয় মতবাদ নানা প্রশ্ন মনে জাগিয়ে তোলে, যার মধ্যে কয়েকটির মাত্র উল্লেখ করা হয়েছে। এই সব প্রশ্নের উত্তর না জেনে টিলিকের বক্তব্য যতই ইঙ্গিত-পূর্ণ হোক না কেন, তাকে একটি পরিপূর্ণভাবে বিবৃত দার্শনিক মতবাদ রূপে গ্রহণ করার পথে অসুবিধা রয়েছে।

হিকের মন্তব্য

৬। ধর্মের ভাষা কি জ্ঞান-বিষয়ক (Is religious Language Cognitive) :

ধর্মের ভাষা-সম্পর্কীয় সমস্যার ক্ষেত্রে একটি প্রশ্ন দেখা দেয়, প্রশ্নটি হল ধর্মের উক্তিগুলি বা ধর্ম-সম্পর্কীয় বিবৃতিগুলি কি জ্ঞান-বিষয়ক বিবৃতি অর্থাৎ এই বিবৃতিগুলি কি আমাদের কোন জ্ঞান প্রদান করে ? বিষয়টি বিস্তারিত আলোচনা করে দেখা যাক :

যখন আমরা কোন ঘটনাকে ঘোষণা করি, ঘোষণার ব্যাপারটি স্বীকৃতি বা অস্বীকৃতির ব্যাপার হতে পারে। তখন আমরা মনে করি আমাদের ব্যবহৃত ভাষা জ্ঞান সংক্রান্ত ভাষা। অর্থাৎ আমরা এমনভাবে ভাষা ব্যবহার করছি যার থেকে কোন ব্যক্তি জ্ঞান লাভ করতে পারে। যেমন যখন আমরা বলি 'আকাশ হয় মেঘাচ্ছন্ন', 'গোলাপ ফুল হয় সুগন্ধযুক্ত', 'তিনের সঙ্গে তিন সংখ্যার যোগফল হয় ছয়', 'রাম এখন বাড়ীতে নেই', তখন আমাদের এই সব উক্তি জ্ঞান-বিষয়ক উক্তি। বস্তুতঃ, আমরা একটি জ্ঞান-বিষয়ক (তথ্যমূলক বা ঘোষণামূলক) বাক্যের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলতে পারি যে বাক্যটি হয় সত্য কিংবা মিথ্যা।

জ্ঞান-বিষয়ক উক্তির সত্যতা বা মিথ্যাত্ব

কিন্তু এমন ধরনের উক্তি আছে যা সত্যও নয়, মিথ্যাও নয়। কেননা তারা ঘটনার বর্ণনা করে না। তারা অন্য কোন উদ্দেশ্য সাধন করে। 'সামনের দিকে এগিয়ে যাও',—এই আদেশবাক্য সত্য কি মিথ্যা, এই প্রশ্ন আমরা তুলি না। কোন গীতিকাব্য সত্য কি মিথ্যা এমন প্রশ্নও আমরা তুলি না। কেননা গীতিকাব্যের কাজ হল আমাদের মনে আবেগ জাগিয়ে তোলা এবং আমাদের মনের কাছে কিছু মানসিক প্রতিলিপিকে উপস্থাপিত করা। যে বাক্যের মাধ্যমে কোন ব্যক্তি তার অনুভূতিকে প্রকাশ করে, তেমন বাক্যের সত্যতা মিথ্যাত্ব যাচাই করার প্রশ্ন আমরা তুলি না।

যে সব উক্তির সত্যতা মিথ্যাত্বের প্রশ্ন ওঠে না

এখন, প্রশ্ন হল ধর্মীয় বাক্য বা বিবৃতিগুলি যেমন 'ঈশ্বর তার সৃষ্ট জীবকে ভালবাসেন' কি জ্ঞান-বিষয়ক বাক্য বা এগুলি এমন বাক্য যা কোন জ্ঞান প্রদান করে না (non-cognitive) ?

মেক ফিয়ারসন (*Mc Pherson*) বলেন যে, "ধর্মীয় উক্তি হল যা বলা যাবে না তাকে প্রকাশ করার প্রচেষ্টা"। মেক ফিয়ারসন-এর এই বক্তব্য কিন্তু এই বিষয় সূচিত করতে চায় না যে, ধর্মবিজ্ঞানীরা এমন কিছু উচ্চারণ করছেন যা আক্ষরিক দিক থেকে অসংগতিপূর্ণ বা অদ্ভুত কিছু বা যৌক্তিক প্রত্যক্ষবাদীরা যে কথা বলেছেন যে, ধর্মমূলক বিবৃতি হল অর্থহীন কেননা ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষের মাধ্যমে তাদের প্রমাণ করা যাবে না। মেক ফিয়ারসন বলেন যে, ধর্মবিজ্ঞানীদের বক্তব্যগুলির অসমঞ্জস হওয়ার বিষয়টি উল্লেখ করে যৌক্তিক প্রত্যক্ষবাদীরা দেখাতে চেয়েছেন যে ধর্ম অব্যক্ত বা অপ্রকাশ্য বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত (belongs to the sphere of the unutterable) এবং এই অসম্ভাব্যতা, যে অসম্ভাব্যতা আক্ষরিক দিক থেকে হোক বা ইন্দ্রিয়বিষয়ক প্রমাণের দিক থেকে অর্থহীন হোক, আসলে নীরবতার রাজ্যে পশ্চাদপসারণ করা ছাড়া কিছু নয়। ধর্মকে নীরবতার রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করে, মিঃ ফিয়ারসন এবং প্রত্যক্ষবাদীরা ধর্মের ভাষার মর্যাদার প্রশ্নটি নিরূপণে সচেষ্ট হয়েছেন এবং তাঁদের বক্তব্য হল এই জাতীয় কোন ভাষা থাকা উচিত নয়।

মেক ফিয়ারসনের বক্তব্য

কিন্তু একটা বিষয় লক্ষ্য করার রয়েছে যে, ম্যাক ফিয়ারসন এবং প্রত্যক্ষবাদীরা ধর্মের ভাষা-সম্পর্কে যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন, সেই সিদ্ধান্ত শুধুমাত্র যে ধর্ম-সম্পর্কীয় ভাষার জ্ঞানবিষয়ক হওয়ার বিষয়টিকেই বাতিল করে দেয় তা নয়, ধর্মের সত্য হবার দাবীকেও নাকচ করে দেয়। কেননা, এই ধরনের দাবী হবে এমন উক্তি যা ধর্মীয় ভাষার অন্তর্ভুক্ত হবে বা ধর্মীয় ভাষায় উপস্থাপিত কোন উক্তি সম্পর্কে কোন দাবী হবে।

জন হিক বলেন যে, যখন বলা হয় 'ঈশ্বর মনুষ্যজাতিকে ভালবাসেন,' তখন এই বচনটি কি জ্ঞানবিষয়ক বা জ্ঞানবিষয়ক নয়। এই জিজ্ঞাসা দুটি প্রশ্নের রূপ পরিগ্রহ করে। প্রথম প্রশ্ন হল, এই ধরনের বাক্যগুলি যাঁরা প্রয়োগ করেন তাঁরা কি সেগুলি জ্ঞানবিষয়ক হোক, এই ভাবেই তাদের গঠন করেছেন? দ্বিতীয় প্রশ্ন হল, তাদের যুক্তিবিন্যাসসম্মত প্রকৃতি কি এমন যে তারা ইচ্ছা করা হোক বা না হোক, সত্য বা মিথ্যা হতে পারে? হিক 'ধর্মের ভাষার সমস্যা' সম্পর্কীয় আলোচনায় প্রথম প্রশ্নটি আলোচনা করেছেন।

নিঃসন্দেহে 'ঐতিহাসিক দিক থেকে বলা যেতে পারে যে, ধর্মভাবাপন্ন ব্যক্তিরা স্বাভাবিকভাবে' ঈশ্বর মনুষ্য জাতিকে ভালবাসেন' এই ধরনের বিবৃতিকে শুধু যে জ্ঞানবিষয়ক মনে করেছেন তা নয়, তাকে সত্যও মনে করেছেন। ধর্মের তথ্য এবং ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য তথ্যের মধ্যে পার্থক্য করার প্রয়োজন আছে কিনা, সেটা চিন্তা না করেই সাধারণ ধর্মবিশ্বাসী ব্যক্তি স্বীকার করে নিয়েছেন যে ধর্মসম্পর্কীয় বিষয় এবং তথ্যের অস্তিত্ব আছে এবং তাঁদের ধর্মসম্পর্কীয় বিশ্বাস ঐ সব তথ্য এবং ঘটনা নিয়েই।

ধর্মবিশ্বাসীরা যা মনে করেন

বর্তমান কালে, অনেক মতবাদ ধর্মের ভাষাকে জ্ঞানবিষয়ক নয়, বলেই মনে করেন। এই ধরনের একটি মতবাদ হল জে. এইচ. রেনডেল্-এর মতবাদ।[1] রেনডেল্ মনে করেন যে ধর্ম হল এক ধরনের মানবিক ক্রিয়া, কলার মতন যার মানুষের সংস্কৃতির ক্ষেত্রে বিশেষ অবদান রয়েছে। যে সুনির্দিষ্ট উপাদান নিয়ে ধর্মের কাজ তা হল কতকগুলি প্রতীক এবং অতিকথা (myth)। এই ধর্মীয় প্রতীকগুলি কোন কিছুর প্রতিনিধিত্ব করে না বা এগুলি জ্ঞান-বিষয়ক নয়। এই অ-জ্ঞান-বিষয়ক প্রতীকগুলি এমন কোন বাহ্য বিষয়কে প্রতীকায়িত করে না যাকে তার ক্রিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন করেই নির্দেশ করা যেতে পারে। এই প্রতীকগুলি যা নিজেরা করে, তাদের বিশেষ ধরনের ক্রিয়াকেই প্রতীকায়িত করে।

জে. এইচ. রেনডেল-এর মতবাদ

রেনডেল্-এর মতে প্রতীকের চার ধরনের ক্রিয়া আছে। **প্রথমতঃ,** তারা আবেগ জাগিয়ে তোলে এবং মানুষকে কাজে প্রণোদিত করে; তার দ্বারা তারা মানুষের ব্যবহারিক প্রতিশ্রুতি যেগুলিকে সে যথোচিত মনে করে সেইগুলিকে শক্তিশালী করে। **দ্বিতীয়তঃ,** তারা সহযোগিতামূলক কার্যে মানুষকে প্রণোদিত করে এবং একটি সম্প্রদায়কে ঐক্যবদ্ধ করে রাখে। কেননা সম্প্রদায় মনে করে যে একই প্রতীকের

1. J. H. Randall, Jr.: "The Role of knowledge in Western Religion" গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

ক্ষেত্রে সাধারণভাবে সকলকেই প্রতিক্রিয়া করতে হবে। **তৃতীয়তঃ,** তারা এমন ধরনের অভিজ্ঞতার আদান প্রদানে সক্ষম হয় যা সাধারণ আক্ষরিক ভাষার দ্বারা প্রকাশ করা যেতে পারে না। **চতুর্থতঃ,** তারা জগতের এমন এক দিকের মানুষের অভিজ্ঞতার উৎসাহবর্ধন ও সুস্পষ্ট করার কাজে নিজেদের প্রণোদিত করে যে যাকে স্বর্গীয় বলে অভিহিত করা যেতে পারে। শেষের বিষয়টি বোঝাতে গিয়ে রেনডেল্ সৌন্দর্য-বিষয়ক উপমার সাহায্যে তাকে বোঝাবার চেষ্টা করেছেন।

প্রতীকের চার ধরনের ক্রিয়া

চিত্রকর, সঙ্গীতজ্ঞ, কবি আমাদের শিক্ষা দেয় কিভাবে আমাদের চক্ষু, কর্ণ, মন ও অনুভূতিকে অধিকতর শক্তি এবং দক্ষতার সাহায্যে ব্যবহার করা যেতে পারে। বস্তুতঃ, মানুষের সহযোগিতায় এরা জগতে নতুন গুণ পর্যবেক্ষণ করতে শিক্ষা দেয়। এরা শিক্ষা দেয় যে জগতে কত শক্তি ও সম্ভাবনা প্রচ্ছন্ন হয়ে রয়েছে। ধর্মপ্রবর্তক, সাধু-সন্ন্যাসী প্রভৃতি ব্যক্তিরাও অনেক কিছু করতে পারেন। তাঁরাও আমাদের মধ্যে এবং এই জগতের মধ্যে পরিবর্তন আনতে পারেন। তাঁরা শিক্ষা দেন এই জগতে মানুষের জীবন কি এবং তা কি হতে পারে। তাঁরা মানুষের প্রকৃতি, তার স্বাভাবিক অবস্থা এবং উপাদান থেকে কি নিরূপণ করতে পারে, তা শিক্ষা দেন। প্রতীক যা স্বর্গীয় বা ঐশ্বরিক তাকে কি ভাবে জানতে হয় তা শিক্ষা দেয়। তারা আমাদের মধ্যে ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্পর্কে অতীন্দ্রিয় সচেতনতা সৃষ্টি করে।

একটা বিষয় লক্ষ্য করার রয়েছে। পাশ্চাত্ত্য ধর্ম যে প্রচলিত বিষয়গুলিকে স্বীকার করে নেয়, রেনডেল্-এর বক্তব্য তার থেকে স্বতন্ত্র। কারণ যখন রেনডেল্ যা কিছু স্বর্গীয় তাকে দেখা, ঈশ্বরের সম্পর্কে সচেতনতা লাভ করার কথা বলছেন, তখন রেনডেল একথা বলতে চান না যে মানুষের মন-নিরপেক্ষ কোন স্বাধীন ঈশ্বরের অস্তিত্ব আছে। আসলে তিনি প্রতীকী ভাষায় কথা বলেছেন। ঈশ্বর হলেন আমাদের আদর্শ, তিনি আমাদের মূল্যগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করেন। তিনি আমাদের পরম চিন্তার বিষয়। জগতের ধর্ম-সম্পর্কীয় বিস্তৃতির এবং যা স্বর্গীয় বা ঐশ্বরিক তার পক্ষে তিনি একটি বৌদ্ধিক প্রতীক, মানুষের কল্পনার যে সৃষ্টি সেগুলি অনন্ত নয়। তারা মানুষ অস্তিত্বশীল হবার পূর্বে অস্তিত্বশীল ছিল না এবং কল্পিত বস্তু হিসেবে তারা অস্তিত্বশীল হতে পারে কেবলমাত্র যতদিন মানুষ অস্তিত্বশীল হতে পারে। এই মতবাদ অনুসারে ঈশ্বর এই বিশ্ব-জগতের স্রষ্টা এবং পরম শাসনকর্তা নয়। তিনি হলেন দেশ-কালের ক্ষুদ্র কোণে একটা চঞ্চল কল্পনার তরঙ্গমাত্র।

মানুষের মন নিরপেক্ষ স্বাধীন ঈশ্বরের অস্তিত্ব আছে

রেনডেল্-এর ধর্মসম্পর্কীয় মতবাদ এবং ধর্মের ভাষার ক্রিয়া সুস্পষ্টভাবে এমন এক চিন্তনের ধারা প্রকাশ করেছে, যা বর্তমানে অনেকটা অস্পষ্ট আকারে প্রচলিত। বস্তুতঃ, এই চিন্তাধারা আমাদের সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্যস্বরূপ। এই চিন্তন ধারার বৈশিষ্ট্য হল, ধর্ম বা বিশ্বাস যা তার সমার্থক শব্দ রূপে ব্যবহৃত হয়, 'ঈশ্বর' এই শব্দটির পরিবর্তে ব্যবহৃত হচ্ছে। পূর্বে যে সব প্রসঙ্গে ঈশ্বর, তার অস্তিত্ব, গুণাবলী, উদ্দেশ্য, কার্য-সম্পর্কে প্রশ্ন উত্থাপিত হত, বর্তমানে তারই অনুরূপ প্রশ্ন হল, ধর্মের প্রকৃতি কি, ক্রিয়া কি, তার রূপ কি এবং ব্যবহারিক মূল্য কি, কাজেই কতগুলি শব্দের কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে 'ঈশ্বরের' পরিবর্তে 'ধর্ম' এই পদটির ব্যবহার হচ্ছে।

ধর্ম শব্দটি ঈশ্বরের পরিবর্তে ব্যবহৃত হচ্ছে

ধর্মকে মানুষের সংস্কৃতির একটা দিক হিসেবে গণ্য করা হয়। রেনডেল্-এর মতে ধর্ম হল মানুষের এক বিশিষ্ট কর্মপ্রচেষ্টা যার নিজের একটা অনিবার্য সামাজিক ক্রিয়ার দিক রয়েছে। কাজেই সাধারণ ভাবে মানুষের সংস্কৃতির ক্ষেত্রে ধর্মের অবদান কি, বর্তমানে তাই নিরূপণ করা হয়। অন্যান্য অনেক বিষয়ের আলোচনার সঙ্গে ঈশ্বরেরও আলোচনা করা হয়ে থাকে। এ যেন ধর্মের সুবিস্তৃত আলোচনার ক্ষেত্রে ঈশ্বর হল তার অধীনস্থ একটা বিষয় মাত্র।

ধর্মের বিস্তৃত আলোচনার ক্ষেত্রে ঈশ্বর একটি আলোচ্য বিষয় মাত্র

অধিকতর লৌকিক স্তরে ধর্মকে মনোবিজ্ঞানের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে এক মানবিক ক্রিয়ারূপে গণ্য করা হয় যার সাধারণ কাজ হল ব্যক্তিকে নিজের সঙ্গে এবং পরিবেশের সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধানে সমর্থ করা। নানাভাবে এই কার্য সম্পাদিত হয়, তার মধ্যে একটি বিশেষ ধরন হল কিছু মহান ধারণা বা প্রতীকের সংরক্ষণ এবং সংবর্ধন, যে ধারণা বা প্রতীকগুলির মানুষের মধ্যে আরও ভাল প্রত্যাশা জাগিয়ে তোলার ক্ষমতা আছে। এই সব প্রতীকগুলির মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং স্থায়ী প্রতীক হল ঈশ্বরের প্রতীক। কাজেই শিক্ষাগত এবং লৌকিক, উভয় স্তরেই ধর্মের নামেই ঈশ্বরের সংজ্ঞা দেওয়া হয়। ঈশ্বর হল একটা প্রত্যয় বা ধারণা যা নিয়ে ধর্মের কাজ কারবার। ঈশ্বরের পরিপ্রেক্ষিতে ধর্মের সংজ্ঞা দেবার কোন প্রয়োজন নেই। যে ঈশ্বর এক বাস্তব অলৌকিক সত্তা যার ক্ষেত্রে মানুষ বিচিত্রভাবে প্রতিক্রিয়া করে।

ঈশ্বর এক গুরুত্বপূর্ণ প্রতীক

ঈশ্বরের পরিবর্তে ধর্মের ব্যবহারের ফলে, ঈশ্বরকে কেন্দ্র করে যে সব প্রশ্ন দেখা দিত সেগুলিরও প্রকৃতিগত পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। ঈশ্বর সম্পর্কে যে গতানুগতিক প্রশ্ন উত্থাপিত হত তা হল : ঈশ্বর কি বাস্তব, ঈশ্বর কি অস্তিত্বশীল ? কিন্তু ধর্ম-সম্পর্কে

এই ধরনের প্রশ্ন দেখা দেয় না। কেননা ধর্মের অস্তিত্ব আছে। ধর্মের ক্ষেত্রে যে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নটি দেখা দেয় সেটি হল মানুষের জীবনে এটি কি উদ্দেশ্য সাধন করে। ধর্মের অনুশীলনের কি কোন প্রয়োজন আছে এবং যদি কোন প্রয়োজন থাকে তাহলে কোন দিকে ধর্মের বিকাশ সাধিত হলে তা মানুষের পক্ষে লাভজনক হবে। এই সব প্রশ্ন দেখা দেওয়াতে ধর্মীয় বিশ্বাসের সত্যতার প্রশ্নটি চাপা পড়ে গেছে এবং ধর্মের ব্যবহারিক প্রয়োজনীয়তার বিষয়টি সকলের মনোযোগ আকর্ষণ করেছে।

ধর্মের ব্যবহারিক প্রয়োজনীয়তার বিষয়টির গুরুত্ব লাভ করেছে

তাহলে প্রশ্ন দাড়াল, ধর্ম সত্য কি সত্য নয়, তার থেকেও বড় কথা, ধর্ম প্রয়োজনীয় কি প্রয়োজনীয় নয়? এটা কি ধর্মীয় বিশ্বাসের অধঃপতন সূচনা করে না। প্রাচীনকালে যেখানে ধর্মবিষয়ক সত্তাকে বস্তুগত মনে করা হত, এখন যদি ধর্মের উপকারিতার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়, তাহলে তা কি নিঃসন্দেহে ধর্মবিশ্বাসের মর্যাদা হ্রাস পাওয়ার বিষয়টিকে সূচিত করছে না?

ধর্মের উপকারিতার উপর গুরুত্ব ধর্মবিশ্বাসের ব্যাখ্যাকে হ্রাস করে

অজ্ঞেয়তাবাদী জন স্টুয়ার্ট মিল (*John Stuart Mill*) এইরকম মন্তব্যই করেছেন। তিনি বলেন যে ধর্মের উপকারিতা বা প্রয়োজনীয়তার দিকটি ঘোষণা করার প্রশ্নই ওঠে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না এর সত্যতার সপক্ষে যে যুক্তি প্রদত্ত হয় সেগুলির বিশ্বাস-যোগ্যতা হ্রাস পায়। মানুষ যখন ধর্মের উপকারিতার বা প্রয়োজনীয়তার প্রশ্নটির উপর গুরুত্ব আরোপ করে, তখন বুঝতে হবে যে ধর্মে বিশ্বাস সে হারিয়েছে বা অপরের বিশ্বাসের উপর সে আর নির্ভর করতে পারছে না। যারা ধর্মে অবিশ্বাসী তাদের কাছেই ধর্মের উপকারিতা বা প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করার প্রয়োজন দেখা দেয়। এ যেন তাদের ভণ্ডামী করার ব্যাপারে প্রণোদিত করা। এই প্রসঙ্গে বার্ট্রাণ্ড রাসেলের একটি মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন, 'আমি সেই সব ব্যক্তিদের শ্রদ্ধা করি যাঁরা মনে করে ধর্ম সত্য এবং সেইহেতু ধর্মে বিশ্বাস স্থাপন করা উচিত কিন্তু সেই সব ব্যক্তিদের আমি অশ্রদ্ধা করি যাঁরা মনে করেন ধর্মকে বিশ্বাস করা উচিত, কারণ ধর্মের উপযোগিতা আছে, এবং ধর্ম সত্য কিনা এই প্রশ্ন করাটাকেই যাঁরা সময়ের অপচয় বলে মনে করেন।'

ধর্মে অবিশ্বাসী ব্যক্তির কাছেই ধর্মের উপকারিতার কথা বলার প্রয়োজন দেখা দেয়

বর্তমানে ধর্মের সত্যতার উপর গুরুত্ব আরোপ না করে যে ধর্মের উপযোগিতা (utility)-র উপর গুরুত্ব আরোপ করা হচ্ছে, বহু ধর্মবিশ্বাসীদের কাছে মনে হবে এটা একটা উল্টো ব্যাপার। কেননা 'ঈশ্বরের সেবা এবং উপাসনা' এবং 'ধর্মে আগ্রহ'

—এই দুই এর মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য আছে। ঈশ্বর যদি সত্য হন, তাহলে ঈশ্বর আমাদের স্রষ্টা। তিনি আমাদের থেকে যোগ্যতা, ক্ষমতা, সকল ব্যাপারেই শ্রেষ্ঠ। ঈশ্বর সর্বশক্তিমান, সর্বজ্ঞ, সর্বব্যাপী সত্তা। ঈশ্বর আমাদের সব কামনা বাসনার কথা জানেন, তাঁর কাছ থেকে আমাদের গোপন কিছু নেই। অপরদিকে ধর্ম হল অসংখ্য বিষয়ের মধ্যে একটি বিষয় যার প্রতি আমরা ইচ্ছা করলে আকর্ষণ বোধ করতে পারি। অর্থাৎ ধর্মেতে আমার আগ্রহ জাগা না জাগাটা আমার ইচ্ছার ব্যাপার। কোন বিশেষ ধর্ম নিয়ে, বা একাধিক ধর্ম নিয়ে আলোচনা করার সময় জন হিক-এর ভাষায় আমাদের ভূমিকা হল মূল্যায়নকর্তার এবং আমরা যার মূল্যায়ন করি ঈশ্বর তার অন্তর্ভুক্ত বিষয় মাত্র।

ঈশ্বর ও ধর্ম

ঈশ্বরের বিচার এবং করুণার জন্য ঈশ্বরের কাছে নিজেদের জীবনকে খুলে ধরার কোন প্রয়োজন দেখা দেয় না। বরং তার পরিবর্তে আমরা ধর্ম নিয়ে আলোচনা করতে পারি যেখানে ঈশ্বর নিছক একটি ধারণা মাত্র, নিছক একটি প্রত্যয় যার ইতিহাস আমরা অনুসন্ধান করতে পারি, যে প্রত্যয়কে আমরা বিশ্লেষণ করতে পারি, যার সংজ্ঞা দিতে পারি এবং প্রয়োজনে ঐ ধারণার পুনরায় বিচার করে সংশোধন করতে পারি। তখন ঈশ্বরকে আমরা জগৎকর্তা, জগৎস্রষ্টা বিশ্বের প্রভু হিসেবে গণ্য করি না, যাকে উপাসনার জন্য শ্রদ্ধাভরে আমরা মাথা নত করি এবং যার সেবার জন্য আমরা উল্লসিত হয়ে উঠি!

ঈশ্বর নিছক একটি ধারণা

ঈশ্বরের তুলনায় ধর্মের প্রতি এই যে আগ্রহ, যে ধর্ম মানুষের সংস্কৃতির একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক, তার ঐতিহাসিক উৎসগুলিও খুবই সুস্পষ্ট। ধর্মের প্রতি এই যে আগ্রহ অর্থাৎ ধর্ম-সম্পর্কে উপরিউক্ত অভিমত-এর ক্ষেত্রে একটা যুক্তিবিদ্যাসম্মত বিকাশের ব্যাপার লক্ষ্য করা যায় যাকে নানা নামে অভিহিত করা হয়েছে—বিজ্ঞানবাদ, প্রত্যক্ষবাদ এবং প্রাকৃতিকবাদ। এই বিকাশের মূলে রয়েছে বিজ্ঞানের ক্রমবর্ধমান জ্ঞানের অগ্রগতি প্রসূত একটি ধারণা। এই ধারণাটি হল যে সত্তার যে কোন বৈশিষ্ট্য বা যে বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আমরা অনুসন্ধান করতে চলেছি, সেটি আলোচ্য বিষয়ের ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানকার্যের পদ্ধতির প্রয়োগের দ্বারা জানা যাবে। বৈজ্ঞানিক আলোচনার জন্য ঈশ্বরকে পাওয়া যাবে না কিন্তু ধর্মকে পাওয়া যাবে। ধর্মের একটা ইতিহাসের কথা বলা যায়, ধর্মের বিভিন্ন তথ্যের আলোচনার কথা বলা যেতে পারে। ধর্মের মনোবিদ্যা বা সমাজবিদ্যার কথা বলা যেতে পারে। ধর্মের তুলনামূলক আলোচনার

ঈশ্বরের তুলনায় ধর্মের প্রতি আগ্রহের কারণ

কথা বলা যেতে পারে। এইসব কারণে ধর্ম বর্তমানে এক প্রগাঢ় অনুসন্ধানের বিষয় হয়ে উঠেছে এবং ঈশ্বর হয়ে পড়েছে এই জটিল বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত একটি ধারণা মাত্র।

পিটার ডনোভেন (*Peter Donoven*) তাঁর 'Religious Language' গ্রন্থে ধর্মবিষয়ক বিবৃতি জ্ঞানবিষয়ক কিনা এই নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। সেই আলোচনায় দেখা যায় *R. M. Hare*, *Antony Flew* প্রভৃতি লেখকবৃন্দের মতে ধর্মীয় বিবৃতির প্রাথমিক কাজ হল জ্ঞান দান করা নয়। যারা ধর্মের ব্যবহার করেন তাঁদের জীবনে ধর্মের যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা, তাঁর থেকেই ধর্মের অর্থের উৎপত্তি। হেয়ার এবং ফ্লুর অভিমত সম্পর্কে এ অধ্যায় ছাড়াও পরবর্তী অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে।

রেনডেল, হেয়ার, ফ্লুর মতন আরও একজন লেখক আর. বি. ব্রেইথওয়েথ (*R. B. Braithwaite*) ধর্মের ভাষার প্রকৃতি বিশ্লেষণ করতে গিয়ে দেখিয়েছেন যে ধর্মের ভাষা জ্ঞানবিষয়ক নয়। তাঁর বক্তব্য হল ধর্মীয় বিবৃতিগুলি মুখ্যত: যে ক্রিয়া সম্পাদন করে তা হল নৈতিক। *R. B. Braithwaite* তাঁর An Empirist's View of the Nature of Religious Belief' গ্রন্থে বলেন ধর্মীয় বিবৃতিগুলির অর্থ আছে কারণ তাদের যে একটা ব্যবহার আছে, এটা দেখান যেতে পারে। ভালভাবে পর্যবেক্ষণ করলে এই ব্যবহারের বিষয়টি আবিষ্কার করা যেতে পারে এবং তাদের সুস্পষ্ট বচনের মাধ্যমে ব্যক্ত করা যেতে পারে। কাজেই তিনি বিশ্বাস করেন যে ধর্মীয় ভাষা অভিজ্ঞতাবাদীদের প্রশ্নের জবাব দেবার জন্য তাদের সম্মুখীন হতে পারে। এই মতানুসারে ধর্মীয় বিবৃতি যদিও তথ্যমূলক বা ঘটনাসম্পর্কীয় নয় তবু আবেগ বা অনুভূতি জাগান ছাড়াও অধিকতর ক্রিয়া সম্পাদন করে থাকে। ব্রেথওয়েট বলেন যে ধর্মীয় বিবৃতি হল প্রাথমিকভাবে কোন কর্মপদ্ধতি অনুসরণ করার, বা কোন জীবনধারা মেনে চলার ঘোষণা। ধর্মীয় বিবৃতি হল কোন অভিপ্রায়ের প্রকাশ যেহেতু পরোক্ষভাবে তারা কিছু আদর্শের সঙ্গে জড়িত, বেঁচে থাকার পদ্ধতির সঙ্গে যুক্ত। ব্রেইথওয়েথ-এর অভিমতানুসারে নৈতিক বচন বা বিবৃতির উদ্দেশ্য হল বক্তার কোন বিশেষ কার্য পদ্ধতির প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করা। নৈতিক বচনগুলি, বক্তা বচনগুলির মাধ্যমে যে কর্মধারার কথা বিবৃত করেন, সেই কর্মধারা অনুযায়ী কর্ম করার অভিপ্রায় ব্যক্ত করে। যখন কোন ব্যক্তি ঘোষণা করে যে তার এই ধরনের কাজ করা উচিত, তিনি ঘোষণার মাধ্যমে যে বিষয়টি ব্যক্ত করতে চান তা হল তিনি যথাধসাধ্য তাঁর ব্যক্ত কর্মপদ্ধতি অনুসারে ক্রিয়া করার জন্য সঙ্কল্প করেছেন। অবশ্য,

ব্রেইথওয়েথ-এর ধর্মের ভাষার প্রকৃতি দিয়েছে

বক্তা তার বিবৃতির মাধ্যমে সেই আচরণ পদ্ধতি অপরের জন্যও অনুমোদন করেন। তাঁর মতে ধর্মীয় বচন বা বিবৃতিগুলি একটা জীবনের ধারা বা জীবন সম্পর্কে একটা বিশেষ কর্মপন্থার কথা ঘোষণা করে। উদাহরণস্বরূপ যখন কোন খ্রীষ্টান বলেন যে 'ঈশ্বরই নিঃস্বার্থ প্রেম' তখন তাঁর এই বিবৃতির অর্থ হল যে জীবনে নিঃস্বার্থভাবে অপরকে ভালবাসার অভিপ্রায় তাঁর রয়েছে।

ব্রেইথওয়েথ বলেন যখন দুটি পৃথক ধর্ম, যেমন খ্রীষ্টান ধর্ম এবং বৌদ্ধ ধর্ম একই জীবনধারার কথা অনুমোদন করেন তখন কি অর্থে ধর্ম দুটি পৃথক বা স্বতন্ত্র? অবশ্য আচার-অনুশীলনের দিক থেকে দুটি ধর্মের মধ্যে উল্লেখযোগ্য পার্থক্য পরিলক্ষিত হতে পারে। কিন্তু ব্রেথওয়েট-এর মতে এগুলি তেমন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নয়। তাঁর মতে দুটি ধর্মের পার্থক্য হল দুটি ধর্মের সঙ্গে যুক্ত বিভিন্ন কাহিনী বা অতিকথার পার্থক্য যেগুলি সেই সেই ধর্মের জীবনধারা বা কর্মপদ্ধতি নির্দেশ করে। অর্থাৎ বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে যে পার্থক্য তা হল বিভিন্ন ধরনের কাহিনীগুচ্ছের মধ্যে পার্থক্য যেগুলি তাদের আচরণ সম্পর্কীয় পদ্ধতির সঙ্গে অনুষঙ্গবদ্ধ। প্রশ্ন হল, কাহিনী বলতে ব্রেথওয়েট কি মনে করেন? কাহিনী হল, "বচন বা বচনের গুচ্ছ যেগুলি সোজাসুজি প্রত্যক্ষ করতে গেলে কতকগুলি অভিজ্ঞতামূলক বচন যাদের অভিজ্ঞতার মাধ্যমে পরীক্ষণ সম্ভব এবং যেগুলি ধর্মীয় ব্যক্তি তার ধর্ম যে জীবনধারা নির্দেশ করে, সেগুলি অনুসরণ করার জন্য যে সঙ্কল্প করে, তার সম্পর্কে চিন্তা করে।"[1] ব্রেইথওয়েথ মনে করেন ধর্মের সঙ্গে যুক্ত এই কাহিনীগুলি সত্য কিনা বা তাদের সত্যতায় বিশ্বাস করা হল কিনা এটাই বড় কথা। ধর্মের কাহিনী এবং ধর্মীয় জীবনধারা এই দুই-এর মধ্যে সম্পর্ক হল মনস্তাত্ত্বিক এবং কার্যকারণ সম্পর্ক। এটি একটি অভিজ্ঞতামূলক মনস্তাত্ত্বিক ঘটনা যে, অনেক ব্যক্তি কোন একটি কর্মপন্থাকে অনুসরণ করার জন্য সঙ্কল্পবদ্ধ হওয়াকে সহজ ব্যাপার বলে গণ্য করে যদিও সেটি তাদের স্বাভাবিক প্রবণতা-বিরোধী। তাঁদের মনে করার কারণ হল সেই কর্মপদ্ধতি কতকগুলি কাহিনীর সঙ্গে যুক্ত। আবার অনেক ব্যক্তির ক্ষেত্রে দেখা যায় যে আচরণ পদ্ধতির সঙ্গে যুক্ত কাহিনীটিতে আস্থা স্থাপন না করার জন্য মনস্তাত্ত্বিক যোগসূত্রটি শিথিল হয়ে পড়েনি।

দুটি ধর্মে পার্থক্য হল দুটি ধর্মের সঙ্গে যুক্ত বিভিন্ন কাহিনী

---

1. By story Braithwaite means.
"......... a proposition or set of propositions which are straightforwardly empirical propositions capable of empirical test and which are thought of by the religious man in connection with his resolution to follow the way of life advocated by his religions." As quoted by Peter Donovan in his 'Religious Language'; page 26.

সংক্ষেপে ব্রেথওয়েথ-এর বক্তব্য হল 'ধর্মীয় বিবৃতি, আমার মতে কোন এক বিশেষ ধরনের আচরণ পদ্ধতিকে মেনে চলার সঙ্কল্পের ঘোষণা, যে আচরণ পদ্ধতি বা নীতিকে কোন সাধারণ নৈতিক নিয়মের শ্রেণীভুক্ত করা যেতে পারে, যার সঙ্গে যুক্ত থাকবে কোন প্রকাশ্য বা প্রচ্ছন্ন বিবৃতি, কিন্তু কোন কাহিনীর ঘোষণা নয়।'[1]

ব্রেথওয়েথের আলোচনাকে কেন্দ্র করে জন হিক কতকগুলি প্রশ্নের অবতারণা করেছেন।

ব্রেথওয়েথ-এর আলোচনা সম্পর্কে জন হিকের প্রশ্ন

প্রথমতঃ, রেনডেলের মতবাদের ক্ষেত্রে যেমন, তেমন ভাবে ব্রেথওয়েথ মনে করেন যে ধর্মীয় বিবৃতি এমন এক ভাবে ক্রিয়া করে, অসংখ্য ধর্ম বিশ্বাসী ব্যক্তি যেভাবে তাদের ব্যবহার করেছেন, তার থেকে তারা পৃথক। **দ্বিতীয়তঃ,** যে নৈতিক মতবাদের উপর ব্রেথওয়েথ-এর ধর্মের ভাষা সম্পর্কীয় বিবরণটি প্রতিষ্ঠিত, সেই নৈতিক মতবাদ অনুসারে নৈতিক ঘোষণা হল বক্তার নৈতিক ঘোষণার মধ্যে বিধৃত আচরণ বিধি অনুসরণের অভিপ্রায়। উদাহরণস্বরূপ যখন বলা হয়, মিথ্যা কথা বলা অন্যায় তখন তার অর্থ হল, 'আমার অভিপ্রায় এই যে কখনও মিথ্যা কথা বলব না'। তাই যদি হয়, তাহলে তার থেকে এই সিদ্ধান্ত অনুসৃত হচ্ছে যে অন্যায় আচরণের অভিপ্রায় করা যুক্তিবিজ্ঞাসম্মত অসম্ভাব্যতার ব্যাপার। "মিথ্যা কথা বলা অন্যায়, কিন্তু আমি মিথ্যা কথা বলার ইচ্ছা করি"—এ বিরোধিতা দোষে দুষ্ট, এ হল যেন এই ধরনের বিবৃতি, আমি কখনও মিথ্যা বলতে ইচ্ছা করি না (মিথ্যা বলা অন্যায়) কিন্তু আমি মিথ্যা বলতে ইচ্ছা করি। ব্রেথওয়েথ-এর বক্তব্যের এই পরিণতিকে মেনে নেওয়া অসুবিধাজনক। কেননা কোন কোন পরিস্থিতিতে দেখা যায় ব্যক্তি ইচ্ছাকৃত ভাবে অন্যায় কার্য করার সঙ্কল্প করে। তাহলে অভিজ্ঞতালব্ধ এই দৃষ্টান্ত কি ব্রেথওয়েথ-এর বক্তব্যের পরিণতির সঙ্গে অসংগতিপূর্ণ নয়? **তৃতীয়তঃ,** ব্রেথওয়েথ কাহিনীর সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন যে, কাহিনী হল "একটি বা এক গুচ্ছ বচন যেগুলি হল প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতামূলক বচন এবং অভিজ্ঞতার মাধ্যমে যাদের সত্যতা পরীক্ষা করা যেতে পারে।" তাহলে 'ঈশ্বর মানুষকে ভালবাসেন', ব্রেথওয়েথ-এর বিবৃতি অনুযায়ী কাহিনী বলে গণ্য হবে না। তিনি ধর্মীয় কাহিনী বলতে যা বুঝেছেন, তাতে মনে হয় যে যীশুর জীবনের ঐতিহাসিক ঘটনাই ধর্মীয় কাহিনীরূপে গণ্য হবে, কিন্তু ঈশ্বর সম্পর্কীয় ধর্মমূলক বিবৃতিগুলি এই

1. "A religious assertion, for me, is the assertion of an intention to carry out a certain behaviour policy......together with the implicit or explicit statement but not the assertion of certain stories ;—R. B. Braithwaite : 'An Empiricist's view of the Nature of Religious Belief.'

কাহিনীর অন্তর্ভুক্ত হবে না। চতুর্থতঃ, ব্রেথওয়েথ মনে করেন যে ঈশ্বর সম্পর্কে বিশ্বাস মানুষের ব্যবহারিক আচরণের সঙ্গে প্রসঙ্গোচিত কেননা ঈশ্বরে বিশ্বাস মানুষের আচরণের ক্ষেত্রে মনস্তাত্বিক শক্তি যুগিয়ে দেয়। কিন্তু বিষয়টির আর একটি দিক আছে, সেটি হল, ঈশ্বর সম্পর্কীয় বিশ্বাসের নৈতিক তাৎপর্য নিহিত রয়েছে, যে ভাবে তারা একটি জীবনধারাকে আকর্ষণীয় এবং বিচারবুদ্ধিসম্মত ভাবে দেখাতে পারে।

যীশুর নৈতিক শিক্ষার সঙ্গে এই মতবাদ সঙ্গতিপূর্ণ। যীশু কর্মপন্থার কোন নতুন উদ্দেশ্যের কথা বলেননি। তিনি যে জগতে মানুষ বসবাস করছে সেই জগতের যথার্থ প্রকৃতি কি সেটিই মানুষের কাছে তুলে ধরতে সচেষ্ট হয়েছিলেন। তিনি কোন নতুন অভীষ্ট বা লক্ষ্যের কথা বলেননি। বরং তিনি জগত সম্পর্কে একটা নতুন দৃষ্টি সূচিত করার চেষ্টা করেছিলেন। তিনি চেয়েছিলেন ব্যক্তির এই জগৎ সম্পর্কে একটা আত্মদর্শন হোক, যাতে ব্যক্তি বুঝতে পারে যে বিচারবুদ্ধিসম্মতভাবে জগতে জীবন অতিবাহিত করতে হলে, তিনি যে জীবনধারার কথা বলেছেন সেই জীবনধারা অনুযায়ী চলাই হবে যুক্তিযুক্ত। তিনি প্রচলিত জীবনধারা সম্পর্কে যে চিন্তা তার পরিবর্তন সাধন করে, তার বদলে জীবন সম্পর্কে নতুন দৃষ্টিভঙ্গি এনে দেবার চেষ্টা করেছিলেন। জীবনের প্রতি এমন এক দৃষ্টিভঙ্গি আছে যা মনে করে যে, জগত হল এমন একটি ক্ষেত্র যেখানে স্বার্থের দ্বন্দ্ব অবিরত লেগে রয়েছে এবং যার ফলে প্রতিটি মানুষ নিরাপত্তার অভাব বোধ ক'রে নিজের স্বার্থ সংরক্ষণে সচেষ্ট হয়। মানুষের জীবন পশুর জীবন ছাড়া নতুন কিছু নয়, এই জাতীয় দৃষ্টিভঙ্গিকে যীশু বাতিল করে দিতে চেয়েছেন কারণ জগৎ সম্পর্কে এ-জাতীয় ধারণা বা দৃষ্টিভঙ্গি মিথ্যা। কারণ এ হল নিরীশ্বরবাদী ধারণা-প্রসূত জীবনের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি। যারা জগতকে উপরিউক্ত দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখে তারা অনুমান করে নেয় যে ঈশ্বরের কোন অস্তিত্ব নেই।

যীশুর নৈতিক শিক্ষার সঙ্গে এই মতবাদ সঙ্গতিপূর্ণ

জন হিক বলেন যীশু জড়বাদী ছিলেন না, তিনি ছিলেন বস্তুবাদী। ঘটনার সঙ্গে সম্পর্ক-বর্জিত কোন আদর্শ তিনি মানুষের সামনে তুলে ধরতেন না। তিনি চাইতেন যে মানুষ তার জীবনের বাস্তব ঘটনার দ্বারাই চালিত হোক। তিনি যে জীবনধারার কথা বলতেন সেই জীবনধারাতে প্রতিবেশীর মূল্য নিজের জীবনের থেকে কম কিছু নয় এবং বিশ্বজগতের যথার্থ প্রকৃতিই সেই বিষয়টি নির্দেশ করে। যীশুর নীতিবিদ্যা সম্পর্কীয় ধারণা ছিল আস্তিকতার উপর প্রতিষ্ঠিত। যীশু তাঁর নৈতিক ধারণায় যে জীবনধারার কথা ব্যক্ত করেছেন তা যথার্থ হবে যদি ঈশ্বরকে যথার্থ বাস্তব বলে ধারণা করা হয়।

জন হিকের মন্তব্য

ঈশ্বর প্রেমময় এবং ঈশ্বরের ভালবাসা স্বার্থবর্জিত—এইভাবে ঈশ্বরের বাস্তবতায় যার বিশ্বাস রয়েছে সেই ব্যক্তি জীবনে নিঃস্বার্থভাবে অপরকে ভালবাসতে পারবে। ভাল গাছ থেকেই ভাল ফল পাওয়া যায়। কাজেই যে ব্যক্তি নিঃস্বার্থ ভালবাসায় জীবন অতিবাহিত করতে চায় সেই ব্যক্তিই ঈশ্বরের বাস্তবতা, ভালবাসা এবং শক্তিতে বিশ্বাস করতে পারে। বিশ্বাসকে আক্ষরিক অর্থে গ্রহণ করতে হবে, প্রতীকী অর্থে নয়। জীবনকে আকর্ষণীয় এবং বিচারবুদ্ধিসম্মত করে তোলার জন্য, ধর্মীয় বিশ্বাসকে কাল্পনিক গণ্য না করে, বাস্তব বলে মনে করতে হবে। মনে করতে হবে যে ধর্মীয় বিশ্বাসের মধ্য দিয়ে কোন ঘটনার কথা ঘোষণা করা হচ্ছে, কোন কাল্পনিক অলীক কাহিনীর কথা বিবৃত করা হচ্ছে না।

টি. আর মাইলস্ (*T. R. Miles*) ব্রেইথওয়েথের অভিমতের অনুরূপ অভিমত ব্যক্ত করেছেন তাঁর 'Religion and the Scientific Outlook' গ্রন্থে। তিনি ব্রেইথওয়েথের 'stories'-র বদলে 'parable' শব্দটি ব্যবহার করেছেন। মাইলস্ বলেন, ধর্মে বিশ্বাসী এবং ধর্মে অবিশ্বাসীর মধ্যে পার্থক্য হল তারা কি ধরনের উপদেশপূর্ণ ক্ষুদ্র গল্প (parable) বলে। ঈশ্বরে বিশ্বাস করা বলতে বোঝায় ঈশ্বরবিষয়ক গল্প বলা, এক প্রেমময় পিতার কাহিনী বা গল্প বলা, যিনি বলেছেন আমাদের সকলকে তাঁর মত হতে এবং তাঁর সন্তান হতে। মাইলস্ বলেন যে, অভিজ্ঞতার গণ্ডীর বাইরে আমারা 'ঘটনা', 'অস্তিত্ব' 'সত্তা' প্রভৃতি সম্পর্কে কোন অর্থপূর্ণ বিবৃতি করতে পারি না। তাঁর মতে আমরা কোন অতীন্দ্রিয় ঈশ্বরের কথা এমন ভাবে ব্যক্ত করতে পারি না যা মানুষের বোধগম্য হতে পারে। যা আমরা পারি তা হল ঈশ্বর সম্পর্কে গল্প বলতে। তিনি বলেন সব কাহিনীর ব্যাপারেই আক্ষরিক সত্যতা বা মিথ্যাত্বের প্রশ্নটি গুরুত্বপূর্ণ নয়। তাঁরা একটা বাণী বহন করে আনে, এবং আমাদের তার উপরে গুরুত্ব আরোপ করতে বলা হয়। তিনি বলেন, ধর্ম-বিশ্বাসী ব্যক্তিরা এই কাজই করে থাকেন।

টি. আর মাইলস্-এর অভিমত

রেনডেল, হেয়ার, ব্রেইথওয়েথ এবং মাইলস্-এর অভিমতের অর্থাৎ ধর্মীয় বিবৃতি জ্ঞানমূলক নয়—এই অভিমতের সমালোচনা করেছেন আস্তিক এবং নাস্তিক সকলেই। একটা প্রধান সমালোচনা হল ধর্মীয় বিবৃতি যে শুধু জ্ঞানের দিক থেকেই অর্থপূর্ণ তা নয়, অধিকাংশ ব্যক্তি মনে করেন যে তারা বাস্তবের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ (in accord with reality)। মানুষ যে জীবনে ধর্মীয় বিবৃতিগুলিকে পথ চলার নির্দেশক বলে গণ্য করে তার মূলে রয়েছে এই অনুমান, যে আসলে বস্তু যেমন তাদের সঙ্গে এদের সংগতি রয়েছে। জন হিক বলেন,

সমালোচনা

"আকর্ষণীয় এবং বৌদ্ধিক জীবন পদ্ধতি (style of life) নির্দেশ করার ব্যাপারে ধর্মীয় বিশ্বাসকে অবশ্যই কাল্পনিক কাহিনীরূপে গণ্য না করে ঘটনার বিবৃতিরূপে গ্রহণ করা যুক্তিযুক্ত।[1]

যাঁরা মনে করেন ধর্মীয় বিবৃতি জ্ঞানমূলক নয়, তাঁরা এই সমালোচনার কি ভাবে উত্তর দিয়েছেন তা নিশ্চয়ই জানতে ইচ্ছে করে। ব্রেইথওয়েথ বলেন যে, ধর্মীয় কাহিনীর সত্যতাতে বিশ্বাস করার বিষয়টি মোটেও গুরুত্বপূর্ণ নয়। কিন্তু তিনি যা অস্বীকার করেন না তা হল এই যে, এই সব কাহিনী যে জীবনধারার নির্দেশ করে তা সন্ধান করা যুক্তিযুক্তই মনে হয়, কেননা এই জীবনধারা জগতের উপযোগী।

মাইলসও বলেন যে ধর্মবিশ্বাসী ব্যক্তিদের ঘটনা বা তথ্য সম্পর্কীয় কোন জ্ঞান আছে, যা ধর্মে বিশ্বাসী নয় এমন ব্যক্তিদের তাঁরা যুগিয়ে দিতে পারেন, তা নয়। তবে তিনি মনে করেন যে কাহিনীগুলি যা ব্যক্ত করে তাকে গভীর ভাবে গ্রহণ করার জন্য জগত সম্পর্কে কোন কোন ঘটনা প্রাসঙ্গিক।

ব্রেইথওয়েই এবং অপর ব্যক্তিরা মনে করেন যে ধর্মীয় বিবৃতি বলতে সঠিক ভাবে যা বোঝায়, তা মোটেও তথ্যমূলক বিবৃতি নয়। কিন্তু তাঁরা মনে করেন যে ধর্মীয় কাহিনীগুলির সঠিক ব্যবহারের জন্য এক ধরনের জ্ঞানের প্রয়োজন, কেননা কাহিনীগুলির সত্যে উপনীত হবার এক ধরনের নিজস্ব ক্ষমতা আছে, ঘটনা সম্পর্কীয় সুস্পষ্ট বিবৃতির মাধ্যমে অবশ্য নয়।

গল্প, কাহিনী যে আমাদের সংবাদ প্রদান করতে পারে তা অস্বীকার করা চলে না। বিভিন্ন কাহিনী যে আজ যুগ যুগ ধরে চলে আসছে তার কারণ এই নয় যে এই সব কাহিনী আমোদ-প্রমোদের উপকরণ যোগায়। তারা যেন এই কথাও সূচিত করতে চায় যে জীবন অবিকল তারই মতন (life is really like that)। কাজেই ধর্মীয় ভাষায় বিধৃত বিবৃতি সম্পর্কে যে কথা মনে রাখতে হবে, সেটা হল তারা ঘটনামূলক বিবৃতি নয়। কিন্তু পৌরাণিক কাহিনী, প্রবাদ বাক্য এগুলির মতন তারা জীবনধারা সম্পর্কে আমাদের গুরুত্বপূর্ণ সত্য সম্পর্কে অবহিত করতে পারে এবং বিষয়বস্তুকে নতুন ভাবে প্রত্যক্ষ করতে সহায়তা করতে পারে। এর ফলে সত্তা সম্পর্কে যাতে আরও ভালভাবে উপলব্ধি হয় তাতে তারা সহায়তা করতে পারে।

---

1. "In order to render a distinctive style of life both attractive and rational, religious beliefs must be regarded as assertions of facts, not merely as imaginative fictions." —John Hick : Philosophy of Religion ; Page 93.

ধর্মের সমর্থনে যদি একথা বলা হয় যে ধর্মের অ-জ্ঞানমূলক (non-cognitive) বিবরণ অলৌকিকতাকে বাতিল করে দিতে চায় এবং এটা সমর্থনযোগ্য নয়, তাহলে তার উত্তরে বলা যেতে পারে যে, যখনই ধর্ম তার বিবরণে অতীন্দ্রিয় বিষয়কে অন্তর্ভুক্ত করে নেয়, তখনই তাদের বিবৃতিগুলি হয়ে পড়ে শূন্যগর্ভ কেননা অভিজ্ঞতাবাদীরা সেগুলি সম্পর্কে সত্যতার প্রশ্ন উত্থাপন করলে তারা তার উত্তর দিতে ব্যর্থ হন। কাজেই অতীন্দ্রিয় সত্তার অস্তিত্ব কিভাবে প্রমাণ করা যায় তার দায়ীত্ব ধর্ম-বিশ্বাসীদের ক্ষেত্রে থেকেই যায়।

৭। ধর্মের ভাষা সম্পর্কে আইএন্ র‍্যাম্সের অভিমত (View of Ian Ramsey on Religious Language) :

আইএন্ র‍্যামসে (*Ian Ramsey*) তাঁর গ্রন্থ 'Religious Language'-এ বলেছেন যে, ধর্মের আলোচনা অভিজ্ঞতা-ভিত্তিক পথেই ক্রিয়া করে, তবু গভীরতর এবং অতীন্দ্রিয় অর্থের সূচক হয়, যাকে প্রকাশ করা যেতে পারে। আকারের দিক থেকে ধর্মীয় বিবৃতিকে দেখতে সাধারণ বিবৃতির মতন মনে হতে পারে। কিন্তু সাধারণ বিবৃতির মতন তাদের গ্রহণ করা হলে তাদের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য এবং তারা যে পরিস্থিতি জাগ্রত করে তার সঙ্গে তাদের সম্পর্কও হারিয়ে যায়। তাঁর মতে ধর্মীয় বিবৃতি এমন পরিস্থিতির কথা বলে, যেখানে শুধুমাত্র ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে ঘটনা প্রত্যক্ষণের ব্যাপার নয়, একটা গভীরতার অনুধাবন বা অর্থ-নিরূপণের প্রশ্ন দেখা দেয়। ধর্মের ভাষাকে কেবলমাত্র বোঝা যেতে পারে যখন যে পরিস্থিতি থেকে তার উদ্ভব এবং যে পরিস্থিতির ক্ষেত্রে তা তখনও প্রযোজ্য তার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত করে যখন তাকে বোঝা হয়। গল্প বা কাহিনীতে দেখা যায় শব্দকে তাদের ঘটনার সঙ্গে যুক্ত করে এমন ভাবে প্রয়োগ করা হয় যে তারা অর্থপূর্ণ বা কোন তাৎপর্যের বাহক হয়ে ওঠে। তেমনি যেখানে ধর্ম-বিষয়ক শব্দ ব্যবহার করা হয় সেখানে ধর্মবিষয়ক প্রতিক্রিয়ার আবির্ভাব ঘটে, যেন সামগ্রিক ভাবে কিছু বলা হল, এইরকম ভাব পরিলক্ষিত হয় (a commitment of a total kind)।

ধর্মীয় বিবৃতির ক্ষেত্রে একটা গভীরতার অনুধাবনের প্রশ্ন দেখা দেয়

ঈশ্বরের ক্ষেত্রে যখন বলা হয় যে ঈশ্বর আদি কারণ, সর্বশক্তিমান, সর্বজ্ঞ, র‍্যামসের মতে, এই সব ধর্মবিষয়ক উক্তি একটা জাগতিক তাৎপর্য (a cosmic significancc) মনে জাগিয়ে তোলে, অবশ্য যদি যথার্থ ধর্মের দিক থেকে তাদের বোঝার চেষ্টা করা হয় এবং নিছক কোন অতীন্দ্রিয় বিষয় সম্পর্কে ঘোষণা বলে গণ্য করা না হয়। র‍্যামসে বলেন, নানা ধরনের কাহিনী ব্যক্ত করে কোন কোন ব্যক্তির জন্য বিশেষ পরিস্থিতি সৃষ্টি করা যেতে পারে যেমন—সৃষ্টিমূলক গল্প, উদ্দেশ্যমূলক গল্প, ভাল জীবনের কাহিনী

ঈশ্বর সম্পর্কে ধর্মবিষয়ক উক্তি জাগতিক তাৎপর্য মনে জাগিয়ে তোলে

ইত্যাদি। বস্তুতঃ, এমন কোন শব্দ নেই, যা কোন কাহিনীর সৃষ্টি করতে পারে না, যে কাহিনী এমন পরিস্থিতির উদ্ভব করতে পারে, যে পরিস্থিতিতে ঈশ্বরকে জানা যেতে পারে। তিনি বলেন পরিপূর্ণ অভিজ্ঞতাবাদ শুধুমাত্র এই জগতের অভিজ্ঞার বিবরণ সংগ্রহ করে না, ধর্মবিষয়ক শব্দ এবং কাহিনী যে জাগতিক গভীরতার অর্থ নিরূপণ করতে চায়, সেই বিশ্বজগতের কথা এবং তার অধিক কিছুর কথা, তার অভিজ্ঞতাও সংগ্রহ করতে চায়।

পিটার ডনোভেন (Peter Donovan) র‍্যামসের বক্তব্যের সমালোচনা করেছেন। তিনি বলেন যে ধর্মবিষয়ক শব্দ বা বিবৃতি বিশেষ কোন পরিস্থিতির অভিজ্ঞতা আমাদের মধ্যে এনে দিতে পারে, কিন্তু আসলে দেখা যাবে যে সেই পরিস্থিতি কোন বিশেষ অর্থ বহন করে নিয়ে আসছে না। যেন কিছুর অভিজ্ঞতা হল, এই ভাবটা জাগতে পারে, কিন্তু সেই অভিজ্ঞতা প্রকৃতপক্ষে কার অভিজ্ঞতা তা নিরূপণ করা কষ্টকর হয়ে পড়ে। যদি মনে করা যায় যে ধর্মীয় বিবৃতিগুলি, যা প্রতীকধর্মী এবং অসবল (oblique), গভীরতর তাৎপর্যের প্রকাশক হয় তাহলে একথা বলতে বাধা কোথায় যে অনেক নিন্দাসূচক ধর্মবিষয়ক শব্দ বা বিবৃতি, বা নিছক অর্থহীন শব্দ সমষ্টি মাঝে মাঝে ঐ একই ফলাফল সৃষ্টি করবে না? ধর্মের দাবী কি অর্থহীন হয়ে পড়ে যদি দেখা যায় যে কেউ যথাযথভাবে তাতে সাড়া দিচ্ছে না? যদি তাই হয় তাহলে তাদের সত্যতার দাবীকে স্বীকার করে নেওয়া যেতে পারে কিভাবে? র‍্যামস-এর মতবাদ অনুসারে কোন কিছুর অর্থপূর্ণ হওয়া নির্ভর করছে কতকগুলি শব্দের একত্র সমাবেশের মনে কোন কিছুকে জাগিয়ে তোলার ক্ষমতার উপর (evocative power)। কিন্তু তিনি দেখাতে ব্যর্থ হয়েছেন তারা কিভাবে তথ্যমূলক (informative) হতে পারে।

র‍্যামসের সমালোচনা

র‍্যামসের-এর অভিমতের সমালোচনা

একথা বলার অর্থ এই নয় যে অতীন্দ্রিয় উৎস থেকে যদি কোন কিছুর প্রকাশ ঘটে, তাহলে তা অর্থহীন। র‍্যামসে যে জাগতিক তাৎপর্যের প্রকাশের কথা ব্যক্ত করেছেন তা উচ্চতর সত্তা-সম্পর্কীয় কোন অতীন্দ্রিয় চেতনার সমতুল্য নয়। র‍্যামসে হয়ত যথার্থ কথা বলেছেন, যখন তিনি বলেন যে, কোন কোন ধর্মবিষয়ক শব্দের এই কাজ। কিন্তু পিটার ডনোভেন বলেন যে, ধর্মের ভাষার যদি এই একমাত্র কাজ হয়, তাহলে ধর্মের ভাষা আর অতিরিক্ত কিছু বলল কিনা, তার আর কোন অর্থ অবশিষ্ট থাকল কিনা, আমরা কি করে বুঝব? কি করে বুঝব যে কোন ঈশ্বরের অস্তিত্ব আছে, যার উপাসনা করাই হল আমাদের দিক থেকে যথাযথ প্রতিক্রিয়া করা? ধর্মের বিবৃতি যে

কোন তথ্যের সন্ধান দেয় তা বুঝব কি ভাবে ? কাজেই র‍্যামসে দেখাতে পারলেন না যে ধর্মের দাবী তথ্য বা ঘটনা বিষয়ক সংবাদ প্রদান করার দাবী মেটাতে পারছে। র‍্যামসে মনে করেন ধর্মের ভাষা ইহ জগতের কথা না বলে ঐশ্বরিক উৎস-উদ্ভূত বিষয়ের কথা বলে। কিন্তু প্রত্যক্ষগ্রাহ্য জগতের বাইরের বিষয় কিভাবে জানা যাবে বা তাদের সম্পর্কে কোন কিছু কিভাবে বলা যাবে সেই সম্পর্কে র‍্যামসের বিবরণ অভিজ্ঞতা-বাদীদের চ্যালেঞ্জের জবাব দিতে পারে না।

অ্যালফ্রেড জে. আয়ার (*Alfred J. Ayer*) তাঁর 'On the literal significance of religious sentences' প্রবন্ধে ধর্মের ভাষার প্রকৃতি সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। তিনি বলেন ধর্মবিজ্ঞান যে ঈশ্বরের কথা বলে তাঁর অস্তিত্ব কোনমতেই প্রমাণ করা যায় না। কোন্ হেতুবাক্য থেকে ঈশ্বরের অস্তিত্বের বিষয়টি অবরোহের আকারে টানা হয়েছে ? যদি ঈশ্বরের অস্তিত্ব সুনিশ্চিতভাবে প্রমাণ করা যায়, তবে এই হেতুবাক্যগুলিও সত্য হবে। কিন্তু আমরা জানি কোন পরতঃসাধ্য বা অভিজ্ঞতাপ্রসূত বচন কখনও সম্ভাব্য ছাড়া, সুনিশ্চিত হতে পারে না। কোন পূর্বতঃসিদ্ধ বা অভিজ্ঞতাপূর্ব (apriori) বচন থেকে আমরা ঈশ্বরের অস্তিত্বের বিষয়টি অবরোহের আকারে নিঃসৃত করতে পারি না। অভিজ্ঞতাপূর্ব বচন সুনিশ্চিত বচন কারন তারা হল স্বতঃসত্য বচন। কাজেই স্বতঃসত্য বচন-গুচ্ছ থেকে অন্য আর একটি স্বতঃসত্য বচন নিঃসৃত হতে পারে। কাজেই দেখা যাচ্ছে ঈশ্বরের অস্তিত্ব কোনভাবেই প্রমাণ করা যেতে পারে না।

আয়ার-এর মতে ধর্মের ভাষার প্রকৃতি

অনেক সময় বলা যায় যে, প্রকৃতির মধ্যে নিয়মানুগত্য ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ করে। কিন্তু 'ঈশ্বর অস্তিত্বশীল' এই বাক্যটি যদি এই কথাই সূচিত করে যে প্রকৃতিতে প্রয়োজনীয় নিয়মানুগত্য দৃষ্ট হয়, তাহলে কোন ঈশ্বরবাদী বলবেন না যে ঈশ্বর অস্তিত্বশীল বলতে তাঁরা এটুকু বোঝেন। তাঁরা বলবেন ঈশ্বর বলতে আমরা বুঝি এক অতীন্দ্রিয় সত্তা যাকে অভিজ্ঞতামূলক প্রকাশের মাধ্যমে জানা যায়। কিন্তু সে, ক্ষেত্রে ঈশ্বর হবেন এক আধিবিদ্যক পদ (metaphysical term)। তাহলে ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্ভাবনার বিষয়ও হবে না। কেননা 'ঈশ্বর অস্তিত্বশীল' একথা বলা হল এক আধিবিদ্যক উক্তি করা যাকে সত্য-মিথ্যা কিছুই বলা যাবে না। কাজেই যে সব ধর্মসম্পর্কীয় বিবৃতি কোন অতীন্দ্রিয় ঈশ্বরের প্রকৃতি বর্ণনা করে তার কোন আক্ষরিক তাৎপর্য থাকতে পারে না।

'ঈশ্বর অস্তিত্বশীল' এটি একটি আধিবিদ্যক উক্তি

অজ্ঞেয়তাবাদীরা বলেন ঈশ্বর অস্তিত্বশীল। অস্তিত্ব একটা সম্ভাবনা যাতে বিশ্বাস বা অবিশ্বাস করার কোন সু-যুক্তি নেই। নাস্তিকরা বলেন যে ঈশ্বরের নাস্তিত্ব একটা সম্ভাব্য বিষয়। কিন্তু আয়ার বলেন, ঈশ্বর সম্পর্কে অর্থাৎ ঈশ্বরের প্রকৃতি সম্পর্কে সব উক্তিই হল অর্থহীন (non-sensical)। 'ঈশ্বর আছে' এই কথা যদি অর্থহীন হয়, তাহলে নাস্তিকরা যখন বলে 'ঈশ্বর নেই, তখন তাও অর্থহীন, কেননা কোন তাৎপর্যপূর্ণ বচনেরই বোধগম্যভাবে বিরোধিতা করা যেতে পারে।

ঈশ্বর সম্পর্কে সব উক্তিই অর্থহীন

অজ্ঞেয়তাবাদীরা বলেন, 'অতীন্দ্রিয় ঈশ্বর আছেন' এবং 'অতীন্দ্রিয় ঈশ্বর নেই'—এই দুই-এর মধ্যে কোন্‌টি সত্য আমাদের বলার উপায় নেই, কাজেই আমরা কোন উক্তি এই সম্পর্কে করতে চাই না। কিন্তু এই বাক্যগুলি আসলে কোন বচন নয়। কাজেই অজ্ঞেয়তাবাদীদের বক্তব্যকেও বাতিল করে দেওয়া যেতে পারে।

অজ্ঞেয়তাবাদীদের সমালোচনা

যখন ঈশ্বরবাদীরা দাবী করেন যে অতীন্দ্রিয় ঈশ্বরের অস্তিত্বের কথা বলতে গিয়ে তাঁরা একটি যথার্থ বচন (genuine proposition) ব্যক্ত করেছেন তখনই তাঁর সঙ্গে আয়ার একমত হতে পারছেন না। ঈশ্বরকে যদি এমন পুরুষ কল্পনা করা হয় যার প্রয়োজনীয় গুণাবলী অভিজ্ঞতার দ্বারা বিচার্য নয়, তাহল সেই পুরুষের ধারণা কোন বোধগম্য ধারণা নয়। যে বচনে 'পুরুষ' (person) কথাটি ব্যবহার করা হচ্ছে তাকে যদি অভিজ্ঞতার দ্বারা প্রমাণ করা না যায় তাহলে তাকে কোন কিছুর প্রতীক বলে স্বীকার করা সম্ভব হয় না। ঈশ্বর সম্পর্কে ঐ একই কথা। 'ঈশ্বর' এই বিশেষ্য পদটি ব্যবহার করলে মনে হতে পারে যে কোন বাস্তব সত্তার অস্তিত্ব আছে। কিন্তু যখনই আমরা ঈশ্বরের গুণাবলীর অনুসন্ধান করি তখন বুঝি যে 'ঈশ্বর' কোন প্রকৃত নাম নয়।

ঈশ্বরকে পুরুষরূপে ধারণা করলে সেই ধারণা বোধগম্য নয়

আয়ার বলেন, ধর্মের সঙ্গে বিজ্ঞানের কোন বৈরিতা নেই, কেননা যেহেতু ঈশ্বরবাদীদের ধর্মসম্পর্কীয় উক্তিগুলি মোটেও যথার্থ বচন নয়। বিজ্ঞানের বচনের সঙ্গে তাদের কোন যুক্তিবিজ্ঞানসম্মত সম্পর্ক নেই।

ধর্ম সম্পর্কে কোন অতীন্দ্রিয় সত্য (transcendent truths) হতে পারে না। এই ধরনের যে সব সত্যের কথা ঈশ্বরবাদীরা বলেন তাদের কোন আক্ষরিক তাৎপর্য নেই। অনেক সময় বলা হয় ঈশ্বর হল এক রহস্যময় সত্তা যা মানুষের বোধের সীমারেখা

ছাড়িয়ে যায়। কিন্তু একথা বলার অর্থ ঈশ্বর বোধগম্য নয়। যা বোধগম্য নয় তার অর্থপূর্ণ বিবরণ সম্ভব নয়। এমন কথা বলা হয় যে ঈশ্বর বিচারবুদ্ধির বিষয় নয়, বিশ্বাসের বিষয়। একথা বলার অর্থ হল যে, যেহেতু ঈশ্বরকে প্রমাণ করা যায় না, বিশ্বাসের ভিত্তিতে তাকে স্বীকার করে নিতে হবে। এমন কথা বলা হয় ঈশ্বর শুদ্ধ, অতীন্দ্রিয় স্বজ্ঞার (pure mystical intuition) বা প্রত্যক্ষ অনুভূতির বিষয় এবং সেহেতু ঈশ্বরের কোন সংজ্ঞা দেওয়া যায় না, যে সংজ্ঞা বিচারবুদ্ধির সাহায্যে বোধগম্য হবে। কিন্তু এমন কথা বলার অর্থ হল যে কোন বচন তাৎপর্যপূর্ণ এবং সেই বচন ঈশ্বর সম্পর্কীয় এই দুটি বিষয় এক সঙ্গে হতে পারে। আয়ারের মতে তা হতে পারে না।

ধর্ম সম্পর্কীয় কোন অতীন্দ্রিয় সত্য হতে পারে না

কোন অতীন্দ্রিয়বাদী যদি বলেন যে স্বজ্ঞায় তিনি যাকে প্রত্যক্ষ করেন তার বর্ণনা দেওয়া যায় না, তাহলে আয়ারের মতে তাকে স্বীকার করতে হবে যে, যখন তিনি তার বর্ণনা দিচ্ছেন তখন তিনি বাজে অর্থহীন কথা বলছেন।

অতীন্দ্রিয়বাদী যদি বলেন যে তাঁর স্বজ্ঞা এমন সত্য প্রকাশ করছে যা তিনি অপরকে ব্যক্ত করতে পারছেন না, তাহলে আমরা যারা তার অধিকারী নই নিশ্চয়ই একথা বলতে পারব যে স্বজ্ঞা জ্ঞানের বৃত্তি (faculty) নয়। এমন কথা বলার অর্থ হয় না যে, অতীন্দ্রিয়বাদী সত্যকে জেনেছেন কিন্তু তাকে প্রকাশ করতে অক্ষম। কারণ আমরা জানি যদি সত্যই তিনি কোন তথ্যের সন্ধান পেয়ে থাকেন তাহলে তাকে তিনি অবশ্যই প্রকাশ করতে পারবেন। যেহেতু তিনি যা জেনেছেন তাকে প্রকাশ করতে পারেন না এবং নিজের লব্ধ জ্ঞানের বৈধতা বিচারের কোন মানদণ্ড নিরূপণ করতে পারেন না, তাহলে সুনিশ্চিতভাবে বলা চলে যে তাঁর অতীন্দ্রিয় স্বজ্ঞার অবস্থা কোন জ্ঞানের অবস্থা (cognitive state) নয়।

কেউ কেউ বলেন তাঁরা ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ করতে পারেন, ঈশ্বরের সঙ্গে সাক্ষাৎ-ভাবে পরিচিত হতে পারেন। এর উত্তরে আয়ার বলেন যে, যে ব্যক্তি ঘোষণা করে যে সে ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ করছে, এবং তার অর্থ যদি এই হয় যে, সে এক বিশেষ ধরনের ইন্দ্রিয়-উপাত্তকে প্রত্যক্ষ করছে, তাহলে বলার কিছু থাকে না। কিন্তু যখন কেউ বলেন যে তিনি ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ করছেন তখন তিনি তাঁর কোন আবেগের কথা মাত্র শুধু বলেন না। তিনি আরও যা বলতে চান তা হল যে, এক অতীন্দ্রিয় বস্তু আছে যা এই আবেগের বিষয়। 'কোন অতীন্দ্রিয় ঈশ্বরের অস্তিত্ব' আছে—এই বচনকে অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে প্রমাণ করা যাবে না। কিন্তু 'এখানে একটা লাল রঙের বস্তু আছে' এটাকে অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে

ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ করার বিষয়টির সমালোচনা

প্রমাণ করা যাবে। কাজেই 'কোন অতীন্দ্রিয় ঈশ্বরের অস্তিত্ব আছে'—এর কোন আক্ষরিক তাৎপর্য নেই।

সুতরাং আয়ারের সিদ্ধান্ত হল ধর্মীয় অভিজ্ঞতার বিষয়টি ভ্রান্তিজনক বিষয়। মনোবিজ্ঞানের দিক থেকে ধর্মীয় অভিজ্ঞতা আকর্ষণীয় বিষয় হতে পারে কিন্তু তার থেকে এই সিদ্ধান্ত করা যায় না যে ধর্মীয় জ্ঞানের কোন অস্তিত্ব আছে। ঈশ্বরবাদী মনে করতে পারেন যে তাঁর অভিজ্ঞতা জ্ঞানমূলক অভিজ্ঞতা। কিন্তু যদি তিনি তাঁর জ্ঞানকে বচনের মধ্যে বিধৃত করে তাকে অভিজ্ঞতার সাহায্যে যাচাই করতে না পারেন বা সংক্ষেপে অভিজ্ঞতার দ্বারা সমর্থন-যোগ্য এমন বচনের মাধ্যমে সেই জ্ঞানকে প্রকাশ করতে না পাবেন তাহলে বলতে হবে যে তিনি নিজেকে প্রতারণা করছেন। কারণ স্বজ্ঞালব্ধ সত্য যদি অভিজ্ঞতার দ্বারা প্রমাণযোগ্য, এমন বচনের মাধ্যমে প্রকাশ করা না যায়, তাহলে কোন সত্যকে প্রকাশ করা হল, এমন কথা বলা যাবে না।

আয়ারের সিদ্ধান্ত

এইচ. ডি, লুইস্ (*H. D. Lewis*) এই প্রসঙ্গে বলেন যে, ধর্মীয় মতবাদ অনেক ক্ষেত্রে ধর্মীয় উক্তিগুলির মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করতে গিয়ে এমন ধর্মীয় ধারণার (religious notion) কথা ব্যক্ত করেছে যে সেগুলির সাধারণতঃ যে অর্থ হয়, সেই অর্থে তাদের গ্রহণ করা চলে না। তবে তার অর্থ এই নয় যে এদের বাতিল বলে সরিয়ে রাখা। ধর্মবিশ্বাসী ব্যক্তির মূল অভিজ্ঞতার সঙ্গে যুক্ত করে তাদের পরীক্ষা করে দেখার প্রয়োজন আছে।[1]

লুইস্-এর অভিমত

সি. এইচ. হোয়াইটলে (*C. H. Whiteley*) বলেন, "ধর্মীয় অভিজ্ঞতার সঙ্গে যে বিশ্বাস জড়িত তা অত্যন্ত দুর্বোধ্য হতে পারে। তাছাড়া ধর্মীয় অভিজ্ঞতার মধ্যে যে অলৌকিকতা সম্পর্কে অবগতি রয়েছে, এই অবগতির ধরনও এক ধরনের নয়। ঈশ্বরের প্রকৃতি সম্পর্কে এই সব অভিজ্ঞতা যে সব বর্ণনা দিয়েছে তার মধ্যে নানা ধরনের বৈপরীত্য লক্ষ্য করা যায়। সেই কারণে ধর্মীয় অভিজ্ঞতার জ্ঞানমূলক উপাদানকে আমরা সরাসরি গ্রহণ করতে পারি না এই অর্থে যে, অলৌকিকতা সম্পর্কে বা তার প্রকৃতি সম্পর্কে আমরা কোন যথার্থ সংবাদ পাচ্ছি না।" তিনি বলেন যে, ধর্মীয় অভিজ্ঞতার জ্ঞান-বিষয়ক মূল্য আছে, কিন্তু এই জ্ঞানমূলক দাবীকে অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে গ্রহণ করতে হবে। কেননা ধর্মীয় অভিজ্ঞতাপ্রসূত অনেক ধারণাই ভ্রান্ত হতে বাধ্য। তিনি বলেন, ধর্মীয় অভিজ্ঞতার

হোয়াইটলের অভিমত

1, The Cognitive Factors in Religious Experience (in the Book 'Religious Language and the Problem of Religious Knowledge;'' Page. 258.

যেটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সেটা হল এর জ্ঞানমূলক উপাদান নয়, এর অনুভূতিমূলক এবং ইচ্ছামূলক উপাদান। তিনি বলেন, ধর্মীয় অভিজ্ঞতা থেকে ব্যক্তি যা জানতে পারে তা হল কি ভাবে বাঁচতে হয়, কি ভাবে নিজের সঙ্গে এবং বিশ্বজগতের সঙ্গে শান্তিতে সময় অতিবাহিত করতে হয়।

রেফেল ডেমস (*Raphael Demos*) বলেন, 'ধর্ম-সম্পর্কীয় এবং বিজ্ঞান সম্পর্কীয় জ্ঞানের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য বর্তমান। কেননা দেখা গেছে ধর্মের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত বৈজ্ঞানিকদের মনে কোন দাগ কাটেনি। তাছাড়া যেহেতু তাদের আলোচনার হেতুবাক্য যেমন পৃথক, তেমনি সেই হেতুবাক্যকে ভিত্তি করে যুক্তি গঠন করার ধরনও পৃথক।'

রেফেল ডেমস বলেন, যখন অতীন্দ্রিয়বাদীরা বলেন যে ঈশ্বর অনুধাবনযোগ্য নয় (incoprehensible) তখন তাঁরা বলতে চান না যে, ঈশ্বরকে জানা যায় না। তাঁদের বক্তব্য হল ঈশ্বরকে যে জ্ঞান লাভের উপায়ের দ্বারা জানা যায় তা হল অনুপম—তা ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষ এবং ধারণা থেকে পৃথক কিছু। প্রশ্ন হল অতীন্দ্রিয়তার মাধ্যমে যাকে জানা গেল, সেই জানাকে কি অন্য ভাষায় রূপান্তরিত করা সম্ভব? এখানে অতীন্দ্রিয়বাদীরা নিজেদের দুটি দলে বিভক্ত করেছেন—(১) এক দলের মতে অতীন্দ্রিয়বাদীদের ভাষাকে অন্য ভাষায় রূপান্তরিত করা চলে না, এবং (২) অপর দলের মতে তা করা চলে। শেষোক্ত দলের মতে প্রাকৃতিক ঘটনা হল ঐশ্বরিক অর্থের প্রতীক (natural events are 'symbolic' of divine meanings)।

রেফল ডেমস এর মন্তব্য

'ঈশ্বরের অস্তিত্বে'র প্রশ্নে জন হিকের মন্তব্য :

জন হিক বলেন, যে যখন বলা হয়, 'ঈশ্বর অস্তিত্বশীল, তখন কি বুঝব? 'অস্তিত্বশীল' শব্দটির কি একটি মাত্রই অর্থ আছে যার জন্য আমরা ঐ একই অর্থে এমন কথা বলতে পারি, "উড়ন্ত মৎস্যের অস্তিত্ব আছে কি? – 1-এর বর্গমূলের অস্তিত্ব আছে কি? ফ্রয়েডের 'সুপার-ইগোর' অস্তিত্ব আছে কি? এবং ঐ একই অর্থে ঈশ্বরের অস্তিত্ব আছে কি? জন হিক বলেন যে, আমরা যখন এই জাতীয় প্রশ্নের উত্থাপন করি তখন আসলে কিন্তু আমরা একই ধরনের প্রশ্ন করছি না? প্রথম ক্ষেত্রে

1. "And the meaning of 'God exists' will be indicated by spelling out the past, present and future difference which God's existence is alleged to make within human experience."

—John Hick : Philosophy of Religion ; Second Edition ; Page 96.

আমাদের প্রশ্ন হল বিশেষ এক ধরনের জীবের এই জগতে অস্তিত্ব আছে কিনা। দ্বিতীয় প্রশ্নের ক্ষেত্রে কোন জড় বস্তুর অস্তিত্বের প্রশ্ন তুলছি না। আমাদের প্রশ্ন গণিতে বিষয়টির প্রয়োগ রীতিগত কিনা। তৃতীয় ক্ষেত্রে প্রশ্ন হল, ফ্রয়েডের অভিমত আমরা গ্রহণ করি কিনা। কিন্তু ঈশ্বরের অস্তিত্বের প্রশ্ন তুললে উপরিউক্ত কোন প্রশ্নের যে অবতারণা করছি না বেশ বোঝা যায়। তাহলে আমরা কি বোঝাতে চাই?

এই জাতীয় প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে কেউ কেউ বলেন যে, ঈশ্বর অনিবার্যভাবে অস্তিত্বশীল এবং অন্যান্য বস্তু সম্ভাব্যরূপে বা অনিশ্চিত ঘটনা রূপে অস্তিত্বশীল। কিন্তু সেখানে প্রশ্ন উঠবে যে ঈশ্বর অনিবার্যভাবে অস্তিত্বশীল হবে এবং সম্ভাব্য বা অনিশ্চিত রূপে অস্তিত্বশীল হবে না? এর কারন কি? ঈশ্বর এমন কি করছেন, যার জন্য তিনি অনিবার্যভাবে অস্তিত্বশীল, এটা সিদ্ধান্ত করতে হবে।

জন হিক বলেন যে, ধর্মের ভাষা জ্ঞানবিষয়ক নয়, এমন বিবরণ যারা গ্রহণ করেন, সে-সব ক্ষেত্রে 'ঈশ্বর অস্তিত্বশীল'-এর অর্থ বুঝতে অসুবিধা হয় না। ঈশ্বর অস্তিত্বশীল বলতে যদি তাঁরা বক্তার ব্যক্তিগত অনুভূতি বা মনোভাবের কথা ব্যক্ত করতে চান তাহলে কিছুই বলার নেই। কিন্তু যখন ধর্মবিজ্ঞানীরা প্রচলিত অর্থে ঈশ্বরকে অস্তিত্বশীল বলেন, অর্থাৎ ঈশ্বর জগতের স্রষ্টা এবং সংরক্ষক হিসেবে অস্তিত্বশীল, তখন তাঁরা অস্তিত্বশীল বলতে কি বোঝাতে চান?

কেউ কেউ বলেন ঈশ্বরের অস্তিত্ব হল একটা ঘটনা (fact)। ঈশ্বর-বিজ্ঞানীরা বলেন, ঈশ্বর এক বাস্তব সত্তা (reality)। কিন্তু প্রশ্ন হল এই সব শব্দের অর্থ কি? কাজেই ঈশ্বরের ক্ষেত্রে অস্তিত্বশীল হওয়া (exist), ঘটনা (fact) বা বাস্তব হওয়া (real)—যে শব্দই প্রয়োগ করা হোক না কেন, সমস্যা থেকে যায়।

জন হিক যে এই প্রশ্নের সমাধান করতে পেরেছেন তা নয়। তবে তাঁর বক্তব্য হল, উপরিউক্ত শব্দগুলি প্রয়োগ করা হলে তার যে সাধারণ অর্থ প্রকাশিত হয় তাহল ঐ সব শব্দের প্রয়োগের মাধ্যমে একটা 'পার্থক্য সূচিত করা' (making a difference)-র ব্যাপার। যখন বলা হয় 'ক' অস্তিত্বশীল বা বাস্তব বা এটা ঘটনা যে, 'ক' আছে, তখন এই দাবী করা যায় যে 'ক-বর্জিত জগৎ' এবং 'ক'-কে নিয়ে যে জগৎ'—এই দুই-এর মধ্যে পার্থক্য আছে। সেই পার্থক্যের স্বরূপ নির্ভর করছে 'ক'-এর প্রকৃতির উপর। 'ঈশ্বর অস্তিত্বশীল'—এই বচনের অর্থ হল যে, ঈশ্বর না থাকলে অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতে মানুষের অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে যে পার্থক্য সূচিত হত, ঈশ্বর অস্তিত্বশীল হওয়ার জন্য সেই পার্থক্য সূচিত হচ্ছে না।

উনবিংশ অধ্যায়

ধর্মবিজ্ঞান এবং সত্যতা প্রমাণের সমস্যা

(Theology and the Problem of Verification)

১। সত্যতা প্রমাণযোগ্যতার প্রশ্ন (The Question of Verifiability) :

ধর্মবিজ্ঞানের বিবৃতিগুলির সত্যতা প্রমাণের প্রশ্নটিকে কেন্দ্র করে নানান ধরনের তর্কবিতর্কের উদ্ভব ঘটেছে। প্রশ্ন হল, ধর্মবিজ্ঞানের বিবৃতিগুলির সত্যতা কি প্রমাণের যোগ্য, এই সম্পর্কে অনেক মনোজ্ঞ আলোচনা হয়েছে। জন হিক এই সম্পর্কে বিভিন্ন গ্রন্থে যে আলোচনা করেছেন, আমরা প্রথমে তা আলোচনা করব এবং পরে অন্যান্য লেখকের বক্তব্য আলোচনা করব।

পূর্ববর্তী অধ্যায়ে আমরা দেখেছি যে অনেক লেখকের মতে ধর্মীয় ভাষা যে সব বিবরণ বা বিবৃতি দেয় সেগুলি জ্ঞানবিষয়ক নয় (noncognative)। কিন্তু খ্রীষ্টান এবং ইহুদী ধর্মবিশ্বাসী ব্যক্তিরা ধর্মীয় বিবৃতিগুলির, বিশেষ করে যেসব বিবৃতিগুলি মৌলিক, তাদের ঘটনামূলক উপাদানকে সকল সময়ই স্বীকার করে নিয়েছেন। অর্থাৎ এঁদের মতে ধর্মবিষয়ক বিবরণগুলি জ্ঞান-বিষয়ক। অবশ্য একথা সত্য যে ধর্মবিষয়ক বিবৃতিগুলির বিষয়বস্তু অনুপম (unique subject matter)। সেগুলির বিষয়বস্তু অন্যান্য বিবৃতিগুলির মতন নয়। ধর্মের ভাষায় যে ভাষার ব্যবহার করা হয় তা ভাষার সাধারণ ব্যবহার নয়, এক বিশেষ ধরনের ব্যবহার এবং ধর্মদর্শনের কাজ এই বিষয়টিকে পরীক্ষা করে দেখা।

খ্রীষ্টান ইহুদী ধর্ম-বিশ্বাসীদের মতে ধর্মীয় বিবৃতি জ্ঞানবিষয়ক

যেহেতু ঐতিহ্যগত (traditional) ধর্মবিজ্ঞানের মধ্যে এরূপ বিশ্বাস করার প্রবণতা রয়েছে যে ধর্মের ভাষা হল তথ্যমূলক ভাষা এবং যখন ধর্মের ভাষা প্রয়োগ করা হয় তখন তথ্যমূলক ভাষাই প্রয়োগ করা হয় সেহেতু সমসাময়িক দর্শন এমন একটি মানদণ্ডের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছে, যে মানদণ্ডের সহায়তায় তথ্যমূলক ভাষাকে অ-তথ্যমূলক ভাষা থেকে পৃথক করা সম্ভব হবে এবং এই মানদণ্ড নিরূপণ ধর্মের ভাষার প্রকৃতি আলোচনার পক্ষে শুধুমাত্র যে প্রাসঙ্গিক, তা নয়, একান্ত গুরুত্বপূর্ণ।

প্রথম মহাযুদ্ধের পর ভিয়েনা, অস্টিয়ায় যে দার্শনিক আন্দোলন সুরু হয়েছিল যা যৌক্তিক প্রত্যক্ষবাদ (Logical Positivism) নামে পরিচিত, তার পূর্বে এরূপ

ধারণা করা হত যে, কোন বচনকে সত্য বলে প্রমাণিত হতে হলে তাকে একটি মাত্র পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে, সেটি হল তার সত্যতা এবং মিথ্যাত্বকে প্রত্যক্ষভাবে পরীক্ষা করে দেখা। কিন্তু যৌক্তিক প্রত্যক্ষবাদীরা নির্দেশ করলেন যে কোন বচনকে সত্যতার পরীক্ষায় প্রতিযোগী হতে হলে অপর একটি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে। এই প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে যে, যৌক্তিক প্রত্যক্ষবাদীদের মতবাদের সুবিন্যস্ত রূপটির অভাষ পাওয়া যাবে যদি আমরা বিখ্যাত দার্শনিক এ. জে. আয়ার (*A, J, Ayer*)-এর 'Language, Truth and Logic' গ্রন্থটি পাঠ করি। এই পূর্ববর্তী পরীক্ষাটি হল, কোন বচন অর্থপূর্ণ (meaningful) কিনা, সেটি বিচার করে দেখা।

যৌক্তিক প্রত্যক্ষবাদীদের অভিমত

এ. জে. আয়ার বলেন, "প্রমাণের নীতিটি আমাদের একটি মানদণ্ড দিতে পারবে বলে মনে করা যেতে পারে যার সাহায্যে নিরূপণ করা যাবে কোন বাক্য আক্ষরিক দিক থেকে অর্থপূর্ণ কিনা। এই বিষয়টিকে উপস্থাপনের একটি সহজ উপায় হল, এই কথা বলা যে, কোন বাক্যের আক্ষরিক অর্থ ছিল মনে করা যেতে পারে যদি এবং কেবল যদি বাক্যটি যে বচনটিকে প্রকাশ করেছে যেটি বিশ্লেষক (analytic) বা অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে প্রমাণযোগ্য বিবেচ্য হয় (empirically verifiable)।[1] এই প্রসঙ্গে ব্যবহৃত 'অর্থপূর্ণ' শব্দটি একটি যুক্তিবিদ্যা-সম্মত পদ, এটি মনোবিদ্যাসম্মত পদ নয়। 'এর অর্থ আমার কাছে অনেক'—এখানে 'অর্থ' শব্দটি মনোবিদ্যাসম্মত পদ। যৌক্তিক প্রত্যক্ষবাদীরা যা বোঝাতে চেয়েছেন তা হল এই যে, কোন বচনের অর্থ আছে এমন কথা বলা যাবে বা আরও সঠিক ভাবে বলতে গেলে কোন বচনের ঘটনামূলক বা জ্ঞান বিষয়ক অর্থ আছে বলা যাবে, যদি নীতিগতভাবে এটি প্রমাণযোগ্য (verifiable) হয় বা মানুষের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে বলা যেতে পারে যে, এটি যে সম্ভাবনামূলক, তা প্রমাণ করা যেতে পারে।

আয়ারের বক্তব্য

এর অর্থ হল বচনটির সত্যতা বা মিথ্যাত্ব সম্ভাব্য অভিজ্ঞতামূলক পার্থক্য সৃষ্টি করবে। যদি বচনটির সত্যতা বা মিথ্যাত্ব কোন পার্থক্য সৃষ্টি না করে, যা সম্ভবতঃ প্রত্যক্ষগোচর হতে পারে, তাহলে বচনটি জ্ঞানের দিক থেকে হবে অর্থহীন বা অর্থশূন্য এবং বলা হবে যে বচনটি কোন ঘটনামূলক বিষয় ঘোষণা করছে না।

উদাহরণের সাহায্যে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে জন হিক বলেছেন, মনে কর যে একদিন সকালবেলায় একটা চাঞ্চল্যকর খবর ঘোষণা করা হল যে, সমগ্র বিশ্ব-জগত মুহূর্তমধ্যে

[1] A. J; Ayer : Language, Truth and Logic ; Page 7.

আকারে দ্বিগুণ হয়েছে বা আলোকের গতি দ্বিগুণ হয়েছে। এখন প্রশ্ন হল, এই ঘোষণা যে সত্য কি ভাবে নিরূপণ করা যাবে? কোন ব্যক্তি কি ভাবে বুঝবে যে বিশ্বজগতের আকার দ্বিগুণ হয়েছে। যদি না হয়ে থাকে তাহল এমন কি পার্থক্য আছে যা চোখে পড়বে এবং বুঝিয়ে দেবে যে দ্বিগুণ হয়নি? কোন্ ঘটনা বিশ্ব-জগতের দ্বিগুণ হওয়ার বিষয়টিকে প্রকাশ করবে? একটু চিন্তা করে দেখলেই বোঝা যাবে যে এই বচনের পক্ষে কোন প্রমাণ নেই। কেননা যদি বিশ্বজগৎ দ্বিগুণ হয়ে থাকে এবং আলোর গতিও দ্বিগুণ হয়ে থাকে, আমাদের পরিমাপও দ্বিগুণ হয়ে যাবে এবং আমরা বুঝতে পারবনা যে প্রকৃতই কোন পরিবর্তন সংঘটিত হয়েছে। কাজেই যেহেতু এই জাতীয় বচনকে সুসংগত ভাবে প্রমাণ করা এক অসম্ভব ব্যাপার, সবচেয়ে ভাল হল এই জাতীয় বচনকে জ্ঞানের দিক থেকে অর্থহীন বা অর্থশূন্য (meaningless) মনে করা। প্রথম দৃষ্টিতে মনে হয়েছিল যে এটি একটি প্রকৃত ঘটনামূলক বিবৃতি। কিন্তু একটু পরীক্ষা করে দেখতেই বোঝা গেল যে কোন ঘোষণায় যে মৌলিক বৈশিষ্ট্য থাকা প্রয়োজন, সেই বৈশিষ্ট্য এটি প্রমাণ করতে পারে না—সেটি হল ঘটনা সম্পর্কে যা ব্যক্ত করা যাচ্ছে সেটি যেমন তেমন নয়, সেই ব্যাপারে অভিজ্ঞতার ক্ষেত্র অবশ্যই কোন পার্থক্য পরিলক্ষিত হবে।

জন হিকের ব্যাখ্যা

আর একটি দৃষ্টান্ত নেওয়া হল। ধরা যাক, এমন একটি জন্তুর অস্তিত্ব ঘোষণা করা হল যে জন্তু অদৃশ্যমান, স্পর্শনের সাহায্য বোধগম্য নয়, যার গন্ধ পাওয়া যায় না, যার ওজন নেই, যার শব্দ শোনা যায় না।

এই রকম নঞর্থক বা অভাবব্যঞ্জক পদের সাহায্যে যখন কোন জন্তুর সংজ্ঞা দেওয়া হয় তখন কি আমরা এমন কথা বলব যে, এই ধরনের কোন জন্তুর অস্তিত্ব আছে? স্পষ্টই কোন নঞর্থক উত্তর দেওয়া ছাড়া গতি নেই। তাহলে একটা বিষয় স্পষ্ট হয়ে উঠল যে যেহেতু জন্তুটির সবরকম অভিজ্ঞামূলক বৈশিষ্ট্য বাদ দিয়ে দেওয়া হল সেহেতু এমন কিছু থাকল না যার সম্পর্কে আমরা কোন কিছু ঘোষণা করতে পারি।

যৌক্তিক প্রত্যক্ষবাদীদের মূলনীতিটি হল যে তথ্যমূলক ঘোষণা বা বিবৃতি হল সেটি, যার সত্যতা এবং মিথ্যাত্ব অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে পার্থক্য সূচিত করে। যৌক্তিক প্রত্যক্ষবাদীরা এই নীতিটিকে ধর্মবিষয়ক বিবৃতির ক্ষেত্রেও প্রয়োগ করেছেন।

জন উইস্‌ডম্ (*John Wisdom*) তাঁর ধর্মদর্শন গ্রন্থে যে মালীর বিখ্যাত কাহিনীটি বিবৃত করেছেন, জন হিক তার ধর্মদর্শন গ্রন্থে সেটির পূর্ণ উদ্ধৃতির সাহায্যে ধর্মের ভাষার ক্ষেত্রে বিবৃতির প্রমাণযোগ্যতার বিষয়টি বোঝাবার চেষ্টা করেছেন। কাহিনীটি সংক্ষেপে এরূপ: বহুদিনের অবহেলিত একটি উদ্যানে দু'জন ব্যক্তি হঠাৎ একদিন

ফিরে এসে দেখলেন যে আগাছার মধ্যে কয়েকটি চারাগাছ বেশ সজীব। প্রথম ব্যক্তিটি নানা যুক্তি দিয়ে কোন মালীর উদ্যানে আসার বিষয়টি ব্যক্ত করতে চায়, দ্বিতীয় ব্যক্তিটিও নানা যুক্তি দিয়ে মালীর আগমনের ব্যাপারটি অস্বীকার করতে চায়।

জন উইসডম্-এর মালীর কাহিনী

নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষার পরেও যখন একজন ব্যক্তি বলল যে আমি মনে করি 'মালী এসেছিল' এবং অপরজন বলল যে আমি মনে করি 'মালী আসেনি', তাদের ভিন্ন বক্তব্য, বাগানে যা তারা দেখেছে, তার ক্ষেত্রে কোন পার্থক্য সূচিত করতে পারবে না যদিও তারা আরও অনুসন্ধানে তৎপর হয়। এই স্তরে, এই প্রসঙ্গে মালীর প্রকল্পটি আর পরীক্ষণ-মূলক থাকছে না। যে ব্যক্তি মালীর অস্তিত্ব স্বীকার করছে, যে তাকে প্রত্যাখ্যান করছে উভয়ের মধ্যে পার্থক্য এই নয় যে, একজন কোনকিছু প্রত্যাশা করছে, অপরজন করছে না। তাহলে উভয়ের মধ্যে পার্থক্য কী? একজনের বক্তব্য মালী এসেছে, তাকে দেখা যায়নি, শোনা যায়নি। শুধুমাত্র কাজের মধ্য দিয়েই তার পরিচয়। অপরজনের বক্তব্য কোন মালী নেই। মালীর সম্পর্কে তাদের বক্তব্যের যে পার্থক্য তা মালী সম্পর্কে তাদের অনুভূতির পার্থক্য সূচিত করে যদিও উভয়ের একজন যা প্রত্যাশা করে না অপরেও তার প্রত্যাশা করে না।

উইসডম্ (*Wisdom*) যা বলতে চাইছেন তা হল আস্তিক এবং নাস্তিক উভয়েই অভিজ্ঞতামূলক ঘটনা সম্পর্কে পরস্পরের সঙ্গে একমত হতে পাচ্ছেন না তা নয়। বরং তাঁরা একই ঘটনার ক্ষেত্রে ভিন্নভাবে প্রতিক্রিয়া করছেন। তাঁরা পরস্পর বিরোধী ঘোষণা ব্যক্ত করছেন না বরং বিভিন্ন ধরনের অনুভূতিকে প্রকাশ করছেন। এইভাবে

আস্তিক এবং নাস্তিকের একই ঘটনার ক্ষেত্রে ভিন্নভাবে প্রতিক্রিয়া

যদি আমরা তাদের বুঝে নিই, তাহলে স্বাভাবিক অর্থে আমরা কখনও বলতে পারব না যে একজন সঠিক কথা বলেছে এবং অপরজনের বক্তব্য ভ্রান্ত। তাঁরা যেভাবে নির্দেশ করেছেন ঠিক সেভাবে তাঁরা উভয়েই জগৎ সম্পর্কে অনুভব করেছেন। কিন্তু অনুভূতির প্রকাশ জগৎ সম্পর্কে কোন ঘোষণার কথা ব্যক্ত করে না। আমরা বরং বিভিন্ন অনুভূতির ক্ষেত্রে অনুভূতি বেশী বা কম সন্তোষজনক, বেশী বা কম মূল্যবান এমন কথা বলব। সেনটায়ানা (*Sentayana*) বলেন ধর্ম সত্য কিংবা মিথ্যা নয়, ধর্মের ক্ষেত্রে প্রশ্ন হল ধর্ম বেশী ভাল বা বেশী মন্দ। উইসডম্-এর মতে অভিজ্ঞতার বিষয়কে কেন্দ্র করে কোন মতভেদ নেই, যার সমাধানের দ্বারা নিরূপণ করা যাবে যে আস্তিক কিংবা নাস্তিক সঠিক কথা বলেছে। আসল কথা হল, কারও বক্তব্যই নীতির দিক থেকে প্রমাণযোগ্য নয়।

বর্তমানে এই তর্কবিতর্ক অন্যরূপ পরিগ্রহ করেছে, যার সম্পর্কে পূর্ব অধ্যায়ে আমরা আলোচনা করেছি। এখন কোন ধারণা প্রমাণযোগ্য কিনা, সেই প্রশ্ন না তুলে, তাকে মিথ্যা প্রমাণ করা যায় কিনা সেই প্রশ্ন তোলা হয়। প্রশ্ন হল, এমন কোন ঘটনা আছে কিনা যার ধারণা করতে পারি, যা ঘটলে ঈশ্বরবাদ খণ্ডিত হবে? আমাদের অভিজ্ঞতা কি এমনভাবে বিকাশলাভ করতে পারে, ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস যার সঙ্গে অসংগতিপূর্ণ হবে। কিংবা আমরা এমন মনে করব যে, যা কিছুই ঘটুক না কেন তা ঈশ্বরবাদ বা ঈশ্বরে বিশ্বাসের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ।

কোন ধারণাকে মিথ্যা প্রমাণ করা যায় কিনা সেটাই প্রশ্ন

এনটনি ফ্লু (Antony Flew) এই সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেন, ধর্মবিশ্বাসী নয় এমন ব্যক্তি মনে করতে পারে যে ধারণাযোগ্য এমন কোন ঘটনা নেই, যে ঘটনা ঘটলে ধর্মবিশ্বাসী ব্যক্তি মনে করতে পারে যে 'ঈশ্বরের কোন অস্তিত্বই নেই' বা 'ঈশ্বর আমাদের ভালবাসেন না'। কেউ কেউ বলেন যে পিতা যেমন তাঁর সন্তানদের ভালবাসেন, ঈশ্বর সেইরকম আমাদের ভালবাসেন। কিন্তু যখন দেখি যে শিশু গলায় কর্কট রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যাচ্ছে, তখন তার বাস্তব জগতের পিতার মধ্যে যে উদ্বেগ দেখা যায়, পরম পিতা ঈশ্বরের মধ্যে সেই উদ্বেগ লক্ষ্য করা যায় কি? তখন ধর্মবিশ্বাসীরা বলবেন, ঈশ্বরের ভালবাসা সাধারণ মানুষের ভালবাসা নয়। এই ভালবাসা দুর্বোধ্য এবং শিশুকে ক্যান্সার রোগে কষ্ট পেতে দেখে হয়ত কোন ধর্মবিশ্বাসী এই কথাই বলবেন যে ঈশ্বর আমাদের ভালবাসেন তবে সেই ভালবাসার রূপ বা প্রকৃতিকে বুঝে ওঠা দুষ্কর। কিন্তু তারপরেও আমাদের মনে এই প্রশ্ন জাগবে যে ঈশ্বর যে আমাদের ভালবাসে তার প্রমাণ কোথায়? এমন কি ঘটা দরকার যা আমাদের প্রলোভিত করতে পারে এবং যৌক্তিকভাবে ও যথার্থভাবে আমাদের বলার জন্য অধিকারী করতে পারে যে, 'ঈশ্বর আমাদের ভালবাসেন না' বা 'ঈশ্বর অস্তিত্বশীল নয়'। কাজেই ফ্লু যে প্রশ্নটি উত্থাপন করলেন তা হল এমন কি ঘটা দরকার বা এমন কি ঘটেছে যার দ্বারা ঈশ্বরের ভালবাসা বা ঈশ্বরের অস্তিত্ব অপ্রমাণিত হল বলা যেতে পারে।[1]

এনটনি ফ্লু্র অভিমত

ঈশ্বরের ভালবাসাকে বুঝে ওঠা দুষ্কর

২। সমাধানের নির্দেশ (Solutions Suggested):

এণ্টনি ফ্লু উপরে যে প্রশ্ন উত্থাপণ করলেন তার উত্তরে আর. এম. হেয়ার (*R. M. Hare*) 'bliks'-এর ধারণা প্রবর্তন করলেন। হেয়ার বলতে চান যে ধর্মীয় বিশ্বাসের

1. Antony Flew: 'New Essays in Philosophical Theology'; Pages 98-99.

প্রকৃতিই হল এই যে, কোন কিছুই সুনির্দিষ্টভাবে তার বিরুদ্ধাচরণ করতে পারে না এবং কাজেই তাঁদের যথাযথভাবে এমন বিবৃতির বা ঘোষণার শ্রেণীভুক্ত করা চলে না, যাদের সত্য বা মিথ্যা বলে অভিহিত করা যেতে পারে। প্রশ্ন হল, তাহলে ধর্মীয় বিশ্বাসের প্রকৃতি কি? হেয়ার তাঁর প্রকৃতিকে বোঝাবার জন্য একটা নতুন শব্দের ব্যবহার করলেন, সেটি হল 'blik'। 'blik' কথাটির অর্থ কি? 'blik' বলতে তিনি বোঝাতে চেয়েছেন কারও নিজের অভিজ্ঞতার এমন ধরনের ব্যাখ্যা, যা প্রমাণযোগ্য নয় বা যাকে মিথ্যা বলে প্রমাণ করা যায় না (a blik being an unverifiable and unfalsifiable interpretation of one's own experience)। একটা উদাহরণ নেওয়া যাক: একজন উন্মাদ ব্যক্তি মনে মনে সুনিশ্চিত ধারণা করল যে কোন কলেজের সব অধ্যাপক তাকে হত্যা করার জন্য মনস্থ করেছে। ঐ উন্মাদ ব্যক্তির সামনে একাধিক নির্দোষ এবং উদারপ্রাণ অধ্যাপককে হাজির করে যদি তার সন্দেহ দূর করার চেষ্টা করা হয় তাহলে সে প্রচেষ্টা সার্থক হবে না। কেননা অধ্যাপকদের বন্ধুসুলভ ব্যবহারের মধ্যে সে দেখতে পাবে এক ধূর্ত চক্রান্তের আভাস। সে তার বিশ্বাসটাকে এমন ভাবে পোষণ করে না, যাকে অভিজ্ঞতার সাহায্যে সমর্থন করা যায় বা খণ্ডন করা যায়। তখন হেয়ার-এর ভাষায় বলতে হবে 'he has a blik'। হেয়ার-এর অভিমতানুসারে অধ্যাপকদের সম্পর্কে উন্মাদ ব্যক্তির রয়েছে একটা 'insane blik' এবং আমাদের রয়েছে একটা 'sane blik'। হেয়ার বলেন যে, এটা বুঝে নেওয়া প্রয়োজনীয় যে আমরা একটা সুস্থ বা সঠিক ধারণা পোষণ করছি এবং আমাদের বিশ্বাসটাকে 'blik' বলে অভিহিত করা চলবে না। কারণ যে কোন যুক্তির দুটি দিক আছে—যদি তার (উন্মাদ ব্যক্তিটির) ভুল বিশ্বাস রয়েছে বলে বলি তাহলে যাদের ভদ্র লোক সম্পর্কে সঠিক বিশ্বাস রয়েছে তাদের সঠিক blik রয়েছে এমন কথা বলাই যুক্তিযুক্ত হবে। ফ্লু-এর মতে 'blik' মানে এই নয় যে তা কোন ঘোষণা বা বিবৃতি বা একাধিক বিবৃতির সংহতিকে বোঝাবে, তবে হেয়ার-এর মতে যথাযথ 'blik'-এর অধিকারী হওয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।[1]

'blik' বলতে কাকে বোঝায়

একটি উদাহরণের সাহায্যে blik-এর ব্যাখ্যা

যথাযথ বা সুস্থ বিশ্বাস (sane blik)-এর উদাহরণ দিতে গিয়ে হেয়ার বলেন, কারও গাড়ীতে যে ইস্পাতের ব্যবহার করা হয়েছে তার দৃঢ়তা সম্পর্কে বিশ্বাস; জগতের

1. R. M. Hare; 'New Essays in Philosophical Theology'; Page 100

যে এক অপরিবর্তনীয় বৈশিষ্ট্য আছে, সেই সম্পর্কে বিশ্বাস, যার জন্য মনে এই বিশ্বাস জাগে যে বস্তু হঠাৎ আবির্ভূত হবে না বা তিরোহিত হবে না বা অন্য কোন কিছুতে রূপান্তরিত হবে না। ঘটনার কার্যকারণ সম্পর্ক রয়েছে এবং ঘটনা খেয়ালখুশীমত ঘটে না। ধরা যাক আমরা বিশ্বাস করি যে যা কিছু ঘটেছে নিছক দৈববশতঃ ঘটেছে। এটা কোন ঘোষণা বা বিবৃতি নয়। কিন্তু আমরা যদি এরূপ বিশ্বাস পোষণ করি তাহলে আমরা কোন কিছু ব্যাখ্যা করতে, কোন ভবিষ্যদ্বাণী করতে বা কোন পরিকল্পনা করতে সক্ষম হব না। কাজেই যদিও আমরা একটা স্বাভাবিক বিশ্বাসের অতিরিক্ত কিছু ঘোষণা করছি না তবু আমাদের মধ্যে একটা বড় রকমের পার্থক্য দেখা দেবে। অর্থাৎ আমরা যারা মনে করি, 'যা কিছু ঘটে, কোন কারণবশতঃ ঘটে' এবং যারা মনে করি 'যা কিছু ঘটে শুদ্ধ দৈব বশতঃ ঘটে'—এই দুই-এর মধ্যে বড় রকমের পার্থক্য দেখা দেবে এবং এই ধরনের পার্থক্য দেখা দেয় দু'দলের মধ্যে। এক দল যারা প্রকৃতই ঈশ্বরে বিশ্বাস করে এবং আর এক দল যারা ঈশ্বরে বিশ্বাস করে না।

'sane blik'-এর উদাহরণ।

হেয়ার-এর 'blik'-এর ধারণার সমালোচনা করা হয়েছে এবং সেই সমালোচনা যুক্তিযুক্তভাবেই করা হয়েছে। হেয়ার-এর বিরুদ্ধে প্রধান বক্তব্য হল যে, তিনি যে ফ্লু-র প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন বলে মনে করছেন, আসলে তিনি কিন্তু যথাযথ উত্তর দিতে পারেননি। ধর্মীয় বিবৃতির মধ্যে এমন ঘোষণা থাকে যা সত্য বা মিথ্যা। ধর্মীয় বিবৃতি সম্পর্কে যে ঐতিহ্যগত মতবাদ, হেয়ার তাকে সমর্থন করা যায় না মনে করে বর্জন করেছেন। সম্ভবতঃ, সকলেই একমত হবেন যে, কোন ব্যক্তি যখন আন্তরিকভাবে ধর্মীয় মত পোষণ করেন, তখন ধর্মীয় বিশ্বাস ধর্মবিশ্বাসী ব্যক্তির ক্ষেত্রে এক বিশেষ পার্থক্যের সূচনা করে। ধর্মীয় বিশ্বাস ব্যক্তির অনুভূতি, কথা বলা এবং ক্রিয়াকে সেইরকমভাবেই প্রভাবিত করে যা আমরা উন্মাদ ব্যক্তির অধ্যাপকদের সম্পর্কে বিশ্বাসের ক্ষেত্রে পর্যবেক্ষণ করেছি। কিন্তু ধর্ম সম্পর্কে যদি বিচারবুদ্ধি-সম্মত প্রশ্ন আমরা করতে চাই তাহলে অনিবার্যভাবে আমরা জানতে চাইব যে ধর্মবিশ্বাসী ব্যক্তি যেভাবে অনুভব করছে এবং ক্রিয়া করছে, বিশ্বজগতের প্রকৃত বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে তার সংগতি আছে কি, নেই এবং ধর্ম বিশ্বাসী হিসাবে তিনি যা বলছেন তা সত্য কিনা।

হেয়ার-এর 'blik'-এর ধারণার সমালোচনা

জন হিক হেয়ার-এর 'right blik' এবং 'wrong blik'-এর পার্থক্যের সমালোচনা করেছেন। তিনি কোন 'blik-কে বলেছেন 'sane' বা সুস্থ এবং তার বিরোধী 'blik'-কে বলেছেন 'insane' বা অসুস্থ।

কিন্তু হেয়ার-এর এই ধরনের শ্রেণীবিভাগের ক্ষেত্রে একটা অসংগতি দেখা দিচ্ছে, তিনি sane বা যথোচিত এবং insane বা ভ্রান্ত blik-এর মধ্যে যে পার্থক্য করেছেন, এই পার্থক্য টেঁকে না। কারণ 'blik' বলতে তিনি মনে করেন অভিজ্ঞতার এমন ব্যাখ্যা যাকে প্রমাণ করা যায় না, আবার মিথ্যা বলেও অভিহিত করা যায় না। ধর্মসম্পর্কীয় 'blik' বা অভিজ্ঞতার ব্যাখ্যাকে যদি সত্য বা মিথ্যা বলে প্রমাণ করা না যায়, তাহলে তাদের সঠিক এবং ভ্রান্ত, যথোপযোগী এবং অনুপযোগী, বা সুস্থ এবং অসুস্থ এইভাবে শ্রেণীভুক্ত করা যেতে পারে না। ধর্মীয় বিশ্বাস সম্পর্কে এই স্বীকৃতির দাবীই ফ্লু করেছেন। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, হেয়ার ফ্লু-র চ্যালেঞ্জ-এর কোন জবাব দেননি বা তাকে এড়িয়ে যাবার কোন পথও নির্দেশ করতে পারেননি।

অপর একজন দার্শনিক বেসিল মিচেল (*Basil Mitchell*) ফ্লুর বক্তব্যের উত্তরে হেয়ার যা বলেছেন, তার বিরোধী পথে অগ্রসর হলেন এবং দেখাতে চাইলেন যে, ধর্মীয় বিশ্বাস প্রকৃতপক্ষে তথ্যমূলক যদিও তাদের প্রত্যক্ষভাবে প্রমাণ করা যায় না বা মিথ্যা বলেও প্রমাণ করা চলে না। মিচেল একটি কাহিনীর মাধ্যমে তাঁর বক্তব্যকে বুঝিয়ে বলার জন্য চেষ্টা করেছেন। শত্রু অধিকৃত একটি দেশে প্রতিরোধের আন্দোলনের জন্য যে দল গঠিত হয়েছে তার জনৈক সভ্যের সঙ্গে এক অপরিচিত ব্যক্তির সাক্ষাৎ ঘটল, যে অপরিচিত ব্যক্তিটিকে তার মনে হল খুবই সত্যবাদী এবং বিশ্বাস-পরায়ণ এবং সে দাবী করতে লাগল যে সে প্রতিরোধ দলের নেতা। দেখা গেল কখনও কখনও এই অপরিচিত ব্যক্তি প্রতিরোধে সহায়তা করছে এবং কখনও কখনও শত্রুর সঙ্গে সহযোগিতা করছে। কিন্তু শত্রু অধিকৃত দেশের প্রতিরক্ষা-দল ভুক্ত ব্যক্তি কিন্তু তখনও তার বিশ্বাস হারায়নি। সে স্বীকার করে যে অপরিচিত ব্যক্তিটির কোন কোন আচরণ তাকে পীড়িত করে। যাইহোক না কেন, তার অপরিচিত ব্যক্তিটির উপর বিশ্বাস আছে, যদিও সময় সময় তার বিশ্বাস শিথিল হয়ে পড়ে। তবু অপরিচিত ব্যক্তিটির দুর্বোধ্য আচরণের সন্তোষজনক ব্যাখ্যা রয়েছে। মিচেল-এর বক্তব্য হল এইখানেই হেয়ার-এর গল্পের সঙ্গে তার গল্পের পার্থক্য। প্রতিরক্ষা দলভুক্ত ব্যক্তি স্বীকার করে যে অনেক বিষয় রয়েছে যা তার বিশ্বাসের বিরোধিতা করতে পারে। অপরপক্ষে হেয়ার-এর উন্মাদ ব্যক্তি, যার অধ্যাপকদের সম্পর্কে এমন ধারণা (blik) রয়েছে, এমন কোন কিছুকে স্বীকার করতে নারাজ যা তার ধারণা বা বিশ্বাসের (blik) বিরোধিতা করতে পারে।

Basil Mitchell-এর অভিমত

তাছাড়া প্রতিরক্ষাদলভুক্ত ব্যক্তি অপরিচিত ব্যক্তিটির চরিত্র বা প্রকৃতি সম্পর্কে প্রথমে যে ধারনা গঠন করেছিলেন তার পক্ষে যুক্তি আছে। কিন্তু উন্মাদ ব্যক্তিটি

অধ্যাপকদের সম্পর্কে যে ধারণা পোষণ করে তাকে সত্য বলে বা মিথ্যা বলে প্রমাণ করা যায় না। উন্মাদ ব্যক্তির তার ধারনার সপক্ষে কোন যুক্তি নেই। এর কারণ হল 'blik'-এর পক্ষে কোন যুক্তি থাকতে পারে না, কেননা 'blik' হল 'an unverifiable and unfalsifiable interpretation of one's own experience'.

মিচেলের কাহিনী এমন একটি বিষয়ের সঙ্গে জড়িত, নীতিগতভাবে যার সুনির্দিষ্ট নিরূপণ সম্ভব। অপরিচিত ব্যক্তিটি জানে কোন্ দলে সে রয়েছে এবং যুদ্ধের পরে যখন সব ঘটনা প্রকাশিত হবে, তখন তার আচরণের দুর্বোধ্যতার সমাধান খুঁজে পাওয়া যাবে এবং তার আসল চরিত্রও প্রকাশিত হবে। কাজেই মিচেল ধর্মীয় বিশ্বাস এবং সাধারণ ঘটনামূলক বিশ্বাস—এই দুই-এর মধ্যে অসাদৃশ্যের তুলনায় সাদৃশ্যের উপর গুরুত্ব আরোপের পক্ষপাতী।

৩। ধর্মীয় ব্যাপারে জগতের শেষ পরিণাম বা তার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত ঘটনার সত্যতা প্রমাণ (Eschatological Verification) :

জন হিক তাঁর 'Philosophy of Religion' গ্রন্থে 'eschatological verification' সম্পর্কে যে মনোজ্ঞ আলোচনা করেছেন আমরা সংক্ষেপে এখানে সেই সম্পর্কে দু'চার কথা আলোচনা করতে পারি এবং তাঁর বক্তব্য কতদূর প্রণিধানযোগ্য বিচার করে দেখতে পারি।

জন হিক খ্রীষ্টধর্মের পারলৌকিক জীবনে বিশ্বাস সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে সত্যতা প্রমাণ (verification) সম্পর্কে কিছু প্রাথমিক আলোচনা করেছেন।

প্রথমতঃ, কোন তথ্যমূলক বিবৃতির সত্যতা প্রমাণ এবং তার যৌক্তিক প্রমাণ (logical demonstration) এক বিষয় নয়। সত্যতা প্রমাণের যে ধারণা তার মূল বিষয় হল বিচারবুদ্ধিসম্মত সংশয়ের হেতু দূরীকরণ (removal of grounds for rational doubt)। 'P' এই বচনটির সত্যতা প্রমাণিত হয়েছে, এর অর্থ হল এমন কিছু ঘটেছে যার জন্য এটা সুস্পষ্ট যে p হল সত্য। একটা প্রশ্নের সমাধান হয়েছে আমরা তখনই বলি যখন সেই ব্যাপারে কোন বিচারবুদ্ধিসম্মত সংশয় দেখা দেবার অবকাশ থাকে না।

যে উপায়ে এই সংশয়ের হেতুগুলিকে দূর করা হয় সেইগুলি আলোচনাভেদে ভিন্ন ভিন্ন হয়। কিন্তু সত্যতা প্রমাণের সকল ক্ষেত্রে, যে সাধারণ বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়, তাহল বিচারবুদ্ধিসম্মত সংশয়ের হেতুগুলিকে দূর করে সত্যতা নিরূপণ করা। যেসব

ক্ষেত্রে এই সংশয়ের হেতুগুলিকে দূর করা হয়েছে আমরা সঠিকভাবেই বলে থাকি সে সব ক্ষেত্রে সত্যতা প্রমাণিত হয়েছে। **দ্বিতীয়তঃ,** সত্যতা প্রমাণের জন্য পূর্ব থেকেই অবশ্য পূরণীয় এমন কোন শর্তের প্রয়োজন দেখা দিতে পারে যা হল নিজেকে কোন বিশেষ অবস্থানে রাখা বা বিশেষ কোন ক্রিয়া সম্পাদন করা। উদাহরণস্বরূপ, 'পাশের ঘরে একটি চেয়ার আছে' এই সত্য প্রমাণিত হতে পারে শুধুমাত্র পাশের ঘরে গিয়ে চেয়ারটিকে দেখে আসা। কিন্তু যেটা লক্ষ্য করার বিষয় যে কেউ এটা করতে বাধ্য নয়। **তৃতীয়তঃ,** 'সত্যতা প্রমাণযোগ্য' বলতে বোঝায় 'সাধারণের দ্বারা সত্যতা-প্রমাণযোগ্য' অর্থাৎ কিনা, নীতিগতভাবে যে-কোন ব্যক্তির দ্বারা প্রমাণযোগ্য। তবু তার দ্বারা একথা বোঝায় না যে সত্যতা-প্রমাণযোগ্য এমন কোন প্রদত্ত বচনের সত্যতা প্রত্যেকের দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে বা বাস্তবে হবে। একটি বিশেষ সত্য বচনের সত্যতা প্রমাণিত হবে যে সংখ্যক ব্যক্তির দ্বারা তা নির্ভর করে অনেক সম্ভাব্য অনিশ্চিত উপাদানের উপর। **চতুর্থতঃ,** নীতিগতভাবে কোন বচনের সত্যতা প্রমাণযোগ্য হতে পারে কিন্তু নীতিগতভাবে তার মিথ্যাত্ব প্রমাণ করা না যেতে পারে (falsifiable)। যেমন দেহের মৃত্যুর পরে নিরবচ্ছিন্ন চেতন অস্তিত্বের প্রকল্পটি এমন একটি বচনের উদাহরণ যেটি সত্য হলে অবশ্য প্রমাণযোগ্য। কিন্তু মিথ্যা হলে তার মিথ্যাত্ব কখনও প্রমাণযোগ্য নয়। এই প্রবন্ধ যে বিষয়টি নির্দেশ করছে তা হল যে কোন ব্যক্তি তার দেহের মৃত্যু ঘটার পরও চেতন অভিজ্ঞতার অধিকারী হবে, এমন কি তার মৃত্যুর ঘটনাও স্মরণ করতে পারবে। নির্দেশিত বিষয়টি সত্য হলে ব্যক্তি তার অভিজ্ঞতার এই সত্যতা প্রমাণিত হয়েছে দেখতে পাবে, কিন্তু এটি মিথ্যা হলে এর মিথ্যাত্ব কখনও প্রমাণ করা যাবে না। এর অর্থ হল এটি মিথ্যা হতে পারে কিন্তু এটি যে মিথ্যা, সেটি কোন ব্যক্তি তার অভিজ্ঞতার দ্বারা মিথ্যা বলে প্রমাণ করতে পেরেছে এমন ঘটনা নয়। এই নীতি অবশ্য প্রকল্পটির অর্থের কোন রকমে হানি করছে না কেননা, প্রকল্পটি যে বিষয় সম্পর্কে ভবিষ্যৎবাণী করছে তা যদি সত্য হয় এটিকে সত্য বলে জানা যাবে। কাজেই এবার ধর্মীয় ব্যাপারে জগতের শেষ পরিণাম বা তার সঙ্গে সম্পর্কযুক্তযুক্ত ঘটনার সত্যতা প্রমাণের বিষয়টির আলোচনার জন্য জন হিক অন্যান্য লেখকদের মতন একটি কাহিনীর অবতারণা করলেন।

সত্যতা প্রমাণের শর্তগুলি

দু'জন ব্যক্তি একই রাস্তা ধরে পথ চলছে। তাদের মধ্যে একজন মনে করে যে এটি এক দিব্য নগরীতে গিয়ে শেষ হয়েছে এবং অপরজন মনে করে যে এই পথে গেলে কোথাও পৌছান যাবে না, কিন্তু যেহেতু এটিই একমাত্র পথ উভয়কেই এই

পথে ভ্রমণ করতে হবে। দু'জনের কেউ কোনদিন এই পথে ভ্রমণ করেনি কাজেই কেউ বলতে পারে না পথে যেতে যেতে কোথায় তারা কি দেখতে পাবে। পথে যেতে যেতে উভয় ব্যক্তিই কখনও আনন্দের অনুভূতি লাভ করেছে; কখনও বা বিপদ ও দুঃখকষ্টের সম্মুখীন হয়েছে। দু' ব্যক্তির মধ্যে একজন সবসময়ই মনে করেছে যে এ হল এক দিব্য নগরীতে তার তীর্থযাত্রা।

জন হিকের কাহিনী

পথে যেতে যেতে যে আনন্দের অনুভূতি তার হয়েছে, তার ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে সে মনে করেছে উৎসাহ উদ্দীপনা যোগাবার ব্যবস্থা আর বাধাবিপত্তি হল ধৈর্যে ও কষ্টের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া। কেননা নগরীর রাজা তো চান ব্যক্তি নিজেকে উপযুক্ত নাগরিক হিসেবে নিজের যোগ্যতাকে প্রতিষ্ঠা করুক। অপর ব্যক্তি কিন্তু এরকম কিছুই চিন্তা করে না এবং মনে করে তাদের যাত্রা হল এক উদ্দেশ্যহীন ভ্রমণ যাকে এড়াবার উপায় নেই। যেহেতু তার এই ব্যাপারে বেছে নেবার কোন সুযোগ নেই, সে ভালকে উপভোগ করছে এবং মন্দকে সহ্য করছে। সে মনে করে না যে কোন দিব্য নগরীর দিকে তার যাত্রাপথ। তার যাত্রাপথ উদ্দেশ্যবিহীন, শুধু পথচলাই হল বড় কথা।

পথ ভ্রমণের ক্ষেত্রে উভয় ব্যক্তির কাছে সমস্যাটি পরীক্ষণমূলক কিছু নয়। পথের বিশদ বিবরণ সম্পর্কে তারা ভিন্ন ভিন্ন প্রত্যাশা পোষণ করে না। কেবলমাত্র পথের তুলনায় গন্তব্যস্থল সম্পর্কেই তাদের প্রত্যাশা ভিন্ন।

তবু যখন তারা গন্তব্যস্থলে পৌঁছবে তখন দেখা যাবে যে, একজন সব সময়ই ঠিক এবং অন্যজন ভুল চিন্তা করছে। কাজেই যদিও তাদের মধ্যে সমস্যাটা পরীক্ষণমূলক নয়, তবু এটি একটি প্রকৃত সমস্যা তারা পৃথকভাবে পথ সম্পর্কে চিন্তা করছে। কেননা বাস্তব পরিস্থিতি সম্পর্কে একজনের অনুভূতি যথাযথ, আর একজনের অযথাযথ। পরিস্থিতি সম্পর্কে তাদের বিরুদ্ধ ব্যাখ্যা প্রকৃতপক্ষে পরস্পর বিরোধী বিবৃতি, যেন দুই বিবৃতি পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী, এবং ভবিষ্যৎ জটিল বিষয়ের দ্বারাই বিবৃতির নিশ্চয়তা স্থিরীকৃত হবে।

জন হিক বলেন যে, এই কাহিনীর অন্যান্য কাহিনীর মতন বিস্তৃতির অভাব, এটি একটি মাত্র বিষয় নির্দেশ করতে চায় সেটি হল, ইহুদীর খ্রীষ্টান ঈশ্বরবাদ এক পরম অস্তিত্বের নির্দেশ করে যা দুর্বোধ্য নয়, অপরপক্ষে আমাদের বর্তমান দুর্বোধ্য অস্তিত্বের কথাও বলে। আমরা দুটি অবস্থা দেখছি—একটা অবস্থা গন্তব্যস্থলে পৌঁছবার এবং অপরটি হল পথ চলার। একটি হল অনন্ত স্বর্গীয় জীবন, অপরটি হল এই পৃথিবীতে তীর্থযাত্রা। আমাদের অভিজ্ঞতার বর্তমান ব্যাখ্যা হিসেবে ভবিষ্যৎ যে অভিজ্ঞতার কথা উপরে বলা হয়েছে, তা কিন্তু ঈশ্বরবাদের পক্ষে প্রমাণ নয়। কিন্তু

এটার দ্বারা বোঝা যায় যে ঈশ্বরবাদ এবং ঈশ্বরের অনস্তিত্বের মধ্যে নির্বাচনের বিষয়টি একটি বাস্তব বিষয়, নিছক শূন্যগর্ভ বা মৌখিক নির্বাচনের বিষয় নয়।

ঈশ্বরবাদীরা বিশ্বজগতকে যে দৃষ্টিতে দেখেছেন, নাস্তিকরা বিশ্বজগতকে যে দৃষ্টিতে দেখেছেন, তার থেকে সামগ্রিকভাবে স্বতন্ত্র। তবে এই স্বাতন্ত্র্য, আমাদের বর্তমান দৃষ্টিভঙ্গি থেকে, বিশ্বজগতের প্রতিটি চলমান বা কোন এক মুহূর্তের অন্তঃস্থিত বস্তুর কোন পার্থক্য সূচিত করে না। আস্তিক এবং নাস্তিক, কালিক প্রক্রিয়ার ঘটনার পারম্পর্যের ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন ঘটনা ঘটার প্রত্যাশা করে না। ইতিহাসের গতিপথ সম্পর্কে তারা ভিন্ন প্রত্যাশা পোষণ করে না। তবে যিনি আস্তিক তিনি মনে করেন যে যখন ইতিহাসের পরিসমাপ্তি ঘটবে, তখন তিনি দেখবেন যে তিনি একটি নির্দিষ্ট গন্তব্য স্থানে উপনীত হয়েছেন এবং একটি নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য পূরণ হয়েছে যা হল 'ঈশ্বরের সন্তান' সৃষ্টি করা। কিন্তু যে নাস্তিক সে এরূপ কোন প্রত্যাশা করবে না।

আস্তিক ও নাস্তিকের ভিন্ন প্রত্যাশা

৪। মৃত্যু-পরবর্তী জীবনের অস্তিত্ব কি ঈশ্বরে বিশ্বাসের সত্যতা প্রমাণ করতে পারে? (Can continued personal existance after death by itself render belief in God verifiable ?) ঃ

মৃত্যুর পরে নিরবচ্ছিন্ন ব্যক্তি-অস্তিত্বের বিষয়টিকে স্বীকার করে নেবার ব্যাপারে মতবিভেদ লক্ষ্য করা যায়। কোন কোন দার্শনিক বিষয়টি স্বীকার করেন এবং কোন কোন দার্শনিক স্বীকার করেন না। যদি স্বীকার করে নেওয়া হয় যে মৃত্যুর পরেও ব্যক্তির অস্তিত্বের হানি ঘটে না, তার নিরবচ্ছিন্ন অস্তিত্ব চলতে থাকে, তবু প্রশ্ন জাগে যে শুধুমাত্র এই বিষয়টিই কি ঈশ্বরে বিশ্বাসের সত্যতা প্রমাণ করতে পারে। মৃত্যুর পরে বেঁচে থাকার বাস্তব ঘটনা ঈশ্বরে বিশ্বাসের সত্যতাকে অনিবার্যভাবে প্রমাণ করবে না। এটা একটা প্রাকৃতিক বিস্ময়জনক ঘটনা হিসেবেই প্রতীয়মান হবে। ঈশ্বর-বিশ্বাসী মৃত্যুর পরে যখন বেঁচে থাকবে তখন মৃত্যু-পূর্ববর্তী জাগতিক জীবনের কথা স্মরণ করতে সক্ষম হলে, মনে করবে এই বিশ্বজগৎ আরও জটিল হয়ে পড়েছে। কিন্তু মৃত্যুর পরে নতুন পরিবেশে, নতুন দেহ নিয়ে বেঁচে থাকার ঘটনাটি তার কাছে ঈশ্বরের বাস্তবতাকে প্রমাণ করবে না। ধর্মের দিক থেকে মৃত্যু-পরবর্তী জীবন তার কাছে দুর্বোধ্য মনে হবে। এই বর্তমান জীবনের মতনই, ঈশ্বর আছে কি নেই, এই বিষয়টি তখনও তার কাছে কোন সুস্পষ্ট সিদ্ধান্তের আকারে প্রকাশিত হবে না।

মৃত্যুর পরে ব্যক্তির অস্তিত্ব ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ করে না

এই স্তরে মানুষের ঈশ্বর-দর্শনের ঘটনাটির কথা উত্থাপন করা যেতে পারে। ক্যাথলিক এবং অতীন্দ্রিয়বাদী ঈশ্বরবিজ্ঞানে এর উল্লেখ লক্ষ্য করা যায়। যদি এটিকে রূপক হিসেবে গ্রহণ না করে, তার থেকে অধিকতর কোন কিছু এভাবে চিন্তা করা হয়, তাহলে দেহধারী জীবের ঈশ্বর দর্শনের ব্যাপারটি কি সূচিত করে তা বুঝে ওঠা কঠিন হয়ে পড়ে। কেননা তাহলে দেশে (space) অবস্থিত ঈশ্বরকে একটি সান্ত বস্তু রূপে কল্পনা করতে হয়, এতে ঈশ্বরত্বের হানি ঘটে। পাশ্চাত্য ধর্মবিজ্ঞানে যে গভীরতর অন্তর্দৃষ্টির কথা ব্যক্ত হয়েছে তাকে যদি আমরা অনুসরণ করি তাহলে আমরা এমন এক অভিজ্ঞতামূলক পরিস্থিতির কথা চিন্তা করতে পারি যা সুস্পষ্টভাবে ঈশ্বরের বাস্তবতা নির্দেশ করে, ঈশ্বরের চেতনা তা সত্ত্বেও হবে বিশ্বাসের ব্যাপার কেননা এর সঙ্গে জড়িত থাকবে একটা ব্যাখ্যার ব্যাপার। কিন্তু যে সব উপাত্তের (data) ব্যাখ্যা দিতে হবে, সেগুলি দ্ব্যর্থবোধক হওয়া দূরে থাকুক, সকল দিক থেকেই ধর্মীয় বিশ্বাসের ব্যাপারটিকে সমর্থন করবে। কাজেই আমরা এমন একটা পরিস্থিতির কথা চিন্তা করছি যেটির সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ দিক থেকে আমাদের বাস্তব পরিস্থিতির বিরোধিতা রয়েছে। এই জগৎ সম্পর্কে আমাদের বর্তমান অভিজ্ঞতা নানা দিক থেকে ধর্মীয় বিশ্বাসের সমর্থন করে আবার নানা দিক থেকে তার বিরোধিতা করে। এই জগতের শৃঙ্খলা, নিয়মানুবর্তিতা, এর বৈচিত্র্য, এর বিভিন্ন বস্তুর বিচিত্র সংগঠন দেখে কেউ কেউ এক অপ্রত্যক্ষ উদার বুদ্ধির অস্তিত্ব অনুমান করেন এবং অপরেরা মনে করেন এরকম কোন বুদ্ধির অস্তিত্ব নেই। কাজেই ধর্মের দিক থেকে বিচার করলে আমাদের পরিবেশ খুবই দুর্বোধ্য। এই বিষয়টি সম্পর্কে আমাদের অবহিত হতে হলে আমাদের, যত অস্পষ্টই হোক না কেন, পূর্ব থেকে কিছু জ্ঞান থাকা দরকার যে জগতকে দুর্বোধ্য না হতে হলে কি হতে হয়, এবং বিপরীত পক্ষে যা হবে ঈশ্বরের অস্তিত্বের পক্ষে প্রমাণযোগ্য বিষয়। ধর্মের দিক থেকে এই রকম কোন দুর্বোধ্যতা-বর্জিত পরিস্থিতির পূর্ব ধারণা করা কি সম্ভব?

ঈশ্বর-দর্শনের ঘটনাকে কেন্দ্র করে জটিলতার উদ্ভব

ধর্মের দিক থেকে বিচার করলে আমাদের পরিবেশ খুবই দুর্বোধ্য

কোন্ কোন্ ভবিষ্যৎ অভিজ্ঞতা সাধারণভাবে ঈশ্বরবাদের সত্যতা প্রমাণে সহায়ক হবে তা বলা যদিও কঠিন, তবে খ্রীষ্টান ধর্মের মত ধর্মের বিশেষ দাবী এবং জগতের শেষ পরিণাম সম্পর্কে তার যে বিশ্বাস, এগুলির সত্যতা কি ভাবে প্রমাণিত হতে পারে তা বলা কিন্তু কম কঠিন। খ্রীষ্টান ধর্মের ঈশ্বর সম্পর্কে ধারণার সঙ্গে যে সব ধারণা জড়িত এবং যে সব ধারণার পরিপ্রেক্ষিতে ঈশ্বরের ধারণাকে বুঝে নিতে হবে

সেই ধারণার অন্তর্ভুক্ত হয়ে রয়েছে কিছু প্রত্যাশা। সেই প্রত্যাশা হল 'ঈশ্বরের রাজ্যে' মানুষের জন্য ঈশ্বরের উদ্দেশ্যের চরম পরিপূর্ণতা। যে অভিজ্ঞতা খ্রীষ্টানদের ঈশ্বরে বিশ্বাসের সত্যতাকে প্রমাণ করবে তা হল উপরে যে পরিপূর্ণতার কথা বলা হয়েছে তাতে অংশ গ্রহণের অভিজ্ঞতা। বাইবেলের অন্তখণ্ড অনুযায়ী মানুষের জীবনের জন্য ঈশ্বরের উদ্দেশ্যের সাধারণ প্রকৃতি হল 'ঈশ্বরের সন্তান সৃষ্টি' যারা অনন্ত জীবনে অংশ গ্রহণ করবে। উপরে যে পরিপূর্ণতার কথা বলা হয়েছে তার সম্পর্কে এইটুকুই মাত্র বলা যেতে পারে, যদি পূর্ব থেকে বেশী কিছু বলার লোভ সংবরণ করতে হয়।

খ্রীষ্টান-ইহুদী ধর্মের ঈশ্বরের ধারণার সঙ্গে যুক্ত আছে কিছু প্রত্যাশা

পরিস্থিতিটা একটা ছোট শিশুর পরিস্থিতির সমতুল যে প্রাপ্ত বয়স্কের অবস্থার দিকে তাকিয়ে আছে এবং প্রাপ্তবয়স্ক হবার পর আবার শৈশবের দিকে দৃষ্টিপাত করছে। শিশু 'বেড়ে ওঠা' ধারণাটা কি তা জানে এবং শুদ্ধভাবে তার ব্যবহার করতে পারে যদিও সে সঠিকভাবে জানে না বেড়ে ওঠা বা প্রাপ্তবয়স্ক হওয়া কা'কে বলে। যখন সে প্রাপ্তবয়স্ক হয়, তখন সে জানে বা জানতে সক্ষম হয় যে সে প্রাপ্তবয়স্ক হয়েছে। প্রাপ্তবয়স্কের পরিণত অবস্থার বোধ তার মধ্যে আসে যখন সে পরিপক্ক হয় বা পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। মানুষের জীবনের জন্য ঐশ্বরিক উদ্দেশ্যের ক্ষেত্রে অনুরূপ বিষয়ের অনুমান করা যেতে পারে। সেই পরিপূর্ণতা আমাদের বর্তমান অবস্থা থেকে বহু দূরে অবস্থিত, যেমন পরিপক্ক প্রাপ্তবয়স্কের অবস্থা একটি ছোট শিশুর মন থেকে দূরে অবস্থিত। বস্তুতঃ পক্ষে ঐ পরিপূর্ণতার অবস্থা বহুদূরে অবস্থিত কিন্তু যীশুখ্রীষ্টের মাধ্যমে আমরা সেই সম্পর্কে কিছু ধারণা করতে পারি এবং যতই আমরা তাব দিকে অগ্রসর হব ততই আমাদের ধারণা তার উপযোগী হয়ে উঠবে। যখন আমরা সেই পরিপূর্ণতার স্তরে উপনীত হব তখন তাকে চিনে নেবার সমস্যাটা বিলীন হয়ে যাবে।

পরিপূর্ণতার অবস্থা বহুদূরে অবস্থিত

ঈশ্বর সাক্ষাৎকারে বিষয়টি নিয়ে অনেক দার্শনিকই প্রশ্ন তুলেছেন, কিভাবে কোন ব্যক্তি জানতে পারেন যে, যাঁর সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎকার হল তিনি ঈশ্বর। খ্রীষ্টান ধর্মে ঈশ্বরের বর্ণনায় বলা হয়েছে, ঈশ্বর সর্বশক্তিমান, সর্বব্যাপী, সর্বজ্ঞ পূর্ণ, পরিপূর্ণ সততা ও ভালবাসা। এই সর্বনিরপেক্ষ বা পরিপূর্ণ গুণগুলি আমাদের পক্ষে প্রত্যক্ষ করা সম্ভব নয়। আমরা সীমিত ক্ষমতা, সীমিত সততা ও ভালবাসা প্রত্যক্ষ করতে পারি। মানুষের অসীম ক্ষমতা, শক্তি, সততা এবং ভালবাসার অভিজ্ঞতা লাভ করা সম্ভব নয়। কোন ব্যক্তি দাবী করতে পারেন যে তার এমন সত্তার সঙ্গে সাক্ষাৎকার ঘটেছে যাকে তিনি ঈশ্বর বলে অনুমান

ঈশ্বর সাক্ষাৎকারের বিষয়টি নিয়ে দার্শনিকদের মনে প্রশ্ন

করেন কিন্তু সেই ব্যক্তি এমন দাবী করতে পারে না যে, যে সত্তার সঙ্গে তার সাক্ষাৎ হয়েছে সেই সত্তা এক অসীম, সর্বশক্তিমান, অনন্ত স্রষ্টা।

খ্রীষ্টধর্মে ঈশ্বর হলেন ঈশ্বর এবং মহান যীশুর পিতা। ঈশ্বর হলেন এমন এক সত্তা যাঁর সম্পর্কে যীশুখ্রীষ্ট শিক্ষা দিয়েছিলেন, যাঁর সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত হয়ে তিনি বসবাস করতেন এবং শিষ্যদের সঙ্গে তিনি ঈশ্বরের সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছিলেন—যে সত্তার মানুষের প্রতি নিঃস্বার্থ ভালবাসা যীশুখ্রীষ্টের জীবনেই প্রত্যক্ষিত হয়েছে। সংক্ষেপে বলা যেতে পারে যে, ঈশ্বর হলেন অতীন্দ্রিয় স্রষ্টা যিনি যীশুখ্রীষ্টের মধ্য দিয়ে নিজেকে প্রকাশ করেছেন। জগতের পিতা সম্পর্কে যীশুর শিক্ষাদানকে ঈশ্বরের আত্মপ্রকাশের ঘটনা রূপে গ্রহণ করা হয় এবং এই শিক্ষা থেকে এবং যীশুখ্রীষ্টের পূর্ববর্তী ধর্মপ্রবর্তকদের শিক্ষা থেকে খ্রীষ্টধর্ম ঈশ্বরের অতীন্দ্রিয় সত্তা সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করার কথা বলে থাকে। কেবলমাত্র ঈশ্বরই তাঁর অসীম প্রকৃতির কথা জানতে পারে এবং মানুষ হিসেবে আমাদের সেই প্রকৃতিতে বিশ্বাস, খ্রীষ্টধর্মের মতে যীশুখ্রীষ্টের মাধ্যমে ঈশ্বরের আত্মপ্রকাশের উপর নির্ভর। ঈশ্বরের অসীম সত্তায় এরূপ বিশ্বাস পর্যবেক্ষণ-ভিত্তিক সত্যতা প্রমাণের দ্বারা প্রমাণিত হতে পারে না ; কিন্তু পরোক্ষভাবে তার প্রমাণ সম্ভব। সেই পরোক্ষ প্রমাণ হল যীশু-খ্রীষ্টের সম্পর্কে যে নির্ভরযোগ্য জ্ঞান সেই সম্পর্কে বিচারবুদ্ধিভিত্তিক সংশয়কে দূর করা। এই জগৎ হল পিতার দ্বারা সৃষ্ট জগৎ। পিতার দ্বারা সৃষ্ট জগতে সন্তানের জীবনের অভিজ্ঞতা উপরিউক্ত নির্ভরযোগ্য জ্ঞান যুগিয়ে দেবে এবং যীশুর ঈশ্বরের প্রকৃতি সম্পর্কে যে শিক্ষা, সেই শিক্ষাই ঈশ্বরের অসীম অতীন্দ্রিয় প্রকৃতি সম্পর্কে জ্ঞান দান করবে।

ঈশ্বর যীশুখ্রীষ্টের মধ্য দিয়ে নিজেকে প্রকাশ করেছেন

কিন্তু সমালোচকেরা মনে করেন না যে উপরিউক্ত দাবীর ভিত্তিতে ঈশ্বরে বিশ্বাসকে প্রতিষ্ঠিত করা যাবে না। অভিজ্ঞতাবাদী দর্শনের মৌলিক বক্তব্য হল তথ্যমূলক ঘটনা যুক্তিবিজ্ঞানসম্মত ভাবে প্রমাণযোগ্য নয় (matters of fact are not susceptible of logical proof)। এই প্রসঙ্গে যে বিষয়টির উপরে গুরুত্ব আরোপ করা যায় তা হল এমন সমস্ত প্রমাণ সংগ্রহ করা যা বিচারবুদ্ধিসম্মত সংশয়কে দূর করতে পারে। খ্রীষ্টধর্ম দাবী করে যে, খ্রীষ্টান ধর্মবিজ্ঞানে বা ঈশ্বরবিজ্ঞান যে 'eschatological varification'-এর কথা বলা হয়েছে তা এই সাক্ষ্য প্রমাণ যুগিয়ে দিতে পারে।

সমালোচকদের বক্তব্য

বিংশ অধ্যায়

ধর্মের তুলনামূলক আলোচনা

(Comparative Study of Religion)

১। তুলনামূলক ধর্ম বলতে কি বোঝায়? (What is Comparative Religion?):

'তুলনামূলক ধর্ম' (Comparative Religion) নামটি বর্তমানে বেশ প্রচলিত। কোন কোন লেখক এর মূলে দুটি কারণ অনুসন্ধান করেছেন—প্রথমতঃ, এশিয়ার ধর্মগুলি সম্পর্কে পাশ্চাত্ত্য দেশগুলির ক্রমবর্ধমান জ্ঞান এবং দ্বিতীয়তঃ, নৃবিজ্ঞান এবং সমাজ-বিজ্ঞানের অগ্রগতি। কিন্তু ঐতিহাসিক, সামাজিক, ভাষাসম্বন্ধীয় এবং দার্শনিক দিক থেকে ধর্মের তুলনামূলক আলোচনা করেছেন যাঁরা, তাদের মধ্যে একটা প্রবণতা লক্ষ্য করা গেছে, সব ধর্মগুলিকে একটি ধর্মে মিলিয়ে দেওয়া বা ধর্মের উৎপত্তির ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে উন্নত ধর্মীয় জীবনকে উপেক্ষা করা। কিন্তু তুলনামূলক ধর্ম বিভিন্ন ধর্মকে একটি ধর্মে মিলিয়ে দেওয়া নয়। তুলনামূলক ধর্ম বিভিন্ন ধর্মের নিছক ঐতিহাসিক আলোচনা নয়, বা বিভিন্ন ধর্মের উৎপত্তির বর্ণনা নয়। কেউ কেউ আবার ধর্মের তুলনামূলক আলোচনায় আদিম ধর্মগুলির আলোচনাতে গুরুত্ব আরোপ করে অন্যান্য মহান ঐতিহাসিক ধর্মগুলিকে উপেক্ষা করেছেন। কিন্তু এটিও ধর্মের তুলনামূলক আলোচনার যথার্থ দৃষ্টিভঙ্গি নয়। আবার ধর্মের তুলনামূলক আলোচনার লক্ষ্যও নয় বিভিন্ন ধর্মের আলোচনা করে তাদের তুলনামূলক উৎকর্ষ নিরূপণ করা। তুলনামূলক ধর্ম হল প্রচলিত ধর্মগুলির নিরপেক্ষ এবং পর্যাপ্ত তুলনা (just and adequate comparison of living religion); যার দ্বারা তাদের পারস্পরিক সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য সম্পর্কে, তাদের সংযোগ ও সম্বন্ধের বিষয়ে অবহিত হওয়া যায়। [1]উইজারি (*Widgery*) বলেন, "এর সমস্যাগুলি হল, কিভাবে একটি ধর্মকে সামগ্রিকভাবে, অর্থাৎ কিনা জীবন ও বিশ্বাসের একটা নমুনা হিসেবে অন্যান্য ধর্মগুলির সঙ্গে, যাদের সামগ্রিকভাবে দেখা হয়, তুলনা করা যেতে পারে। বিভিন্ন ধর্মের উপাদানের মধ্যে কি কি সাদৃশ্য এবং অসাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়?

তুলনামূলক ধর্মের উদ্ভবের মূলে দুটি কারণ

তুলনামূলক ধর্মের স্বরূপ

উইজারির মন্তব্য

1. A. B. Widgery: The Comparative study of religion; Page 15.

ঐতিহাসিক বিবর্তনের রূপগুলি কতদূর সদৃশ বা অসদৃশ (how far are the forms of historical evolution similar or diverse)"।

[1]যোয়াকিম্ ওয়াচ (*Joachim Wach*) বলেন, "তুলনামূলক ধর্মের আলোচনা যা এই নতুন যুগ সম্ভব করেছে, ধর্মীয় অভিজ্ঞতার অর্থ কি, তার পরিপূর্ণ দৃষ্টিলাভ করতে, এই অভিজ্ঞতার প্রকাশ কি কি রূপ গ্রহণ করতে পারে সেইগুলি, এবং মানুষের জন্য এটি কি করতে পারে সেইগুলি জানতে আমাদের সমর্থ করে।"

ধর্মের তুলনামূলক আলোচনা অনেক কিছুই প্রকাশ করে, যা আজকের বিজ্ঞানের ছাত্রের কাছে কুসংস্কারমূলক মনে হয়। ধর্মের তুলনামূলক আলোচনায় নিযুক্ত ছাত্রকে ধর্মের সঙ্গে জড়িত সব কুসংস্কারগুলি আলোচনা করে দেখতে হবে যে এইসব কুসংস্কারের কোন মূল্য আছে কিনা। ধর্মকে যারা অস্বীকার করেন তারা ধর্মকে কুসংস্কার মনে করেন। ধর্মের তুলনামূলক আলোচনাই প্রকাশ করবে যে কুসংস্কার ও ধর্ম এক নয়।

ধর্ম ও কুসংস্কার অভিন্ন নয়

ধর্মের তুলনামূলক আলোচনা করতে গিয়ে ধর্মপ্রবণ ব্যক্তি জীবনের সেই সব দিকের উপর গুরুত্ব আরোপ করতে পারে যেগুলিকে তারা অংশতঃ বা পুরোপুরি উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হয়েছে। ধর্মের তুলনামূলক আলোচনার ফলে মনের প্রসারতা বাড়ে। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে যে, খ্রীষ্টধর্ম এই বিশ্বে প্রাণীর স্থান, তাদের মানসিক জীবন এবং তাদের প্রতি মানুষের কিরূপ দৃষ্টিভঙ্গি হওয়া উচিত আলোচনা করেনি। কিন্তু প্রাচ্যদেশের কয়েকটি ধর্ম এই সমস্যা সম্পর্কে তাদের ধর্মে আলোচনা করাতে খ্রীষ্টধর্মাবলম্বী ব্যক্তি এই সমস্যা নিয়ে আলোচনা করতে উৎসাহী হয়।

মনের প্রসারতা বৃদ্ধি

ধর্মের তুলনামূলক আলোচনা সংক্রান্ত গবেষণা দু' ধরনের হতে পারে—সংকীর্ণ এবং ব্যাপক। সংকীর্ণ গবেষণার রূপ হল দুটি বা তিনটি মাত্র ধর্মের বা দুই বা ততোধিক ধর্মের ইতিহাসের বিশেষ সময়ের পারস্পরিক তুলনা। ব্যাপক গবেষণার ক্ষেত্রে সব উৎস থেকেই উপাদান সংগৃহীত হয়। ধর্মের তুলনামূলক আলোচনায় যাঁরা বিশেষজ্ঞ, তাঁদের লক্ষ্য হল ব্যাপক ধরনের গবেষণা।

ধর্মের তুলনামূলক গবেষণা—সংকীর্ণ ও ব্যাপক

---

1. "A comparative study of religion such as the new era made possible enables us to have a fuller vision of what religious experience can mean, what forms its expressions may take and what it might do for man."

—Joachim Wach : The Comparative Study of Religions ; Page 9.

তুলনামূলক ধর্ম হল অভিজ্ঞতাভিত্তিক (empirical)। এর প্রথম এবং প্রধান লক্ষ্য হল বিভিন্ন ধর্মের সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্যমূলক তথ্যের অনুসন্ধান করা। তুলনামূলক ধর্ম শুধু মাত্র সাদৃশ্যমূলক ও বৈসাদৃশ্যমূলক তথ্যের সংগ্রহণ মাত্র হবে না, তাদের সুসংহত সুসমন্বিত রূপ হবে। ধর্মের সঙ্গে ধর্মের তুলনা করার সময় ঐতিহাসিক দিক থেকেই হোক বা অন্য দিক থেকেই হোক, বিভিন্ন উপাদানের মধ্যে সংযোগের নীতিগুলি আবিষ্কার করার চেষ্টা করা উচিত। প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের মত কতকগুলি সাধারণ ধারণার মাধ্যমে তথ্যগুলিকে সমন্বিত করার জন্য প্রকল্প রচনা করতে হবে।

তুলনামূলক ধর্ম অভিজ্ঞতাভিত্তিক

ধর্মের তুলনামূলক আলোচনার সময় পদ্ধতি সংক্রান্ত কতকগুলি মৌলিক নীতির প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে। প্রচলিত ধর্মের তুলনার সময় শিক্ষিত অভিমতের সঙ্গে লৌকিক অভিমতের তুলনা বাঞ্ছনীয় নয়। কোন ধর্মের আধুনিক অভিমতের সঙ্গে অন্য ধর্মের আধুনিক অভিমতের তুলনাই যুক্তিসঙ্গত।

তুলনামূলক ধর্ম কোন ধর্ম সম্পর্কে অভিজ্ঞতা-পূর্ব কোন ধারণা নিয়ে আলোচনায় অগ্রসর হবে না। তুলনামূলক ধর্মের কাছে প্রতিটি ধর্মই তথ্যরূপে বা তথ্যের সমষ্টিরূপে বিচায বিষয়। কোন ধর্ম-বিশ্বাসের অনুগামীরা মনে করতে পারে যে সেই ধর্ম বুঝি অভিনব কিছু, কিন্তু তুলনামূলক ধর্ম এই জাতীয় দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে ধর্মের তুলনামূলক আলোচনায় অগ্রসর হতে পারে না। ধর্মের তুলনামূলক আলোচনায় ব্রতী ব্যক্তি কোন ধর্মের উৎকর্ষ সম্পর্কে সেই ধর্মাবলম্বী ব্যক্তিদের ধারণাকে অন্যান্য তথ্যের মত একটি তথ্য রূপেই গণ্য করবেন।

তুলনামূলক ধর্মের কাছে প্রতিটি ধর্মই আলোচ্য বিষয়

উইজারি (*Widgery*) তুলনামূলক ধর্মের কাজ সম্পর্কে বলেন, এর কাজ হবে ধর্ম বা কোন বিশেষ ধর্ম সম্পর্কে ধ্বংসমূলক সমালোচনা নয় বা অন্ধ সমর্থন করা নয়। তবে একথা ঠিক যে, কোন একটা ধর্মের প্রতি সহানুভূতিমূলক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে আলোচনায় অগ্রসর হতে গেলে ছাত্রের বা সাধারণ পাঠকের সেই ধর্মের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি কিছুটা প্রভাবিত হবেই। ধর্মের আধুনিক প্রবণতাকে যথাযথভাবে উপলব্ধি করার গুরুত্বকে উপেক্ষা করা চলে না। ধর্মের পার্থক্যগুলিকে যথাযথভাবে উপলব্ধি করতে না পারলে ব্যক্তি বা জাতির মধ্যে ঐক্য ব্যাহত হয়।

উইজারির মন্তব্য

বিভিন্ন ধর্মের সাদৃশ্যের উপর গুরুত্ব আরোপ করেই তুলনামূলক ধর্মকে কোন ধর্ম সম্পর্কে ধারণা গঠন করতে গেলে ভুল হবে। তাকে মনে রাখতে হবে যে, বৈসাদৃশ্যগত উপাদান সাদৃশ্যগত উপাদানের মতনই সমান গুরুত্বপূর্ণ। তুলনামূলক ধর্মকে আরও এক বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। কোন বিশ্বাস বা ধর্মীয় ক্রিয়াকে, যেহেতু সেটা প্রায় সর্বজনীন, বা সেটা একটা সাধারণ প্রয়োজন মেটাচ্ছে, সেই ওজুহাতে সমর্থন করা চলবে না। তবে বিপক্ষের কোন প্রবল যুক্তি না থাকলে বিশ্বাস এবং ধর্মীয় আচারের সর্বজনীনতা বা সার্বিকতা তাকে সমর্থনের একটা ভিত্তি রূপে গণ্য হতে পারে।

তুলনামূলক ধর্মকে যে যে বিষয়ে সতর্ক থাকতে হবে

একটা প্রশ্ন হল তুলনামূলক ধর্মের আলোচনা কি বিভিন্ন ধর্ম বিশ্বাস, ধর্মীয় ক্রিয়া এবং তার আবেগগত মনোভাবের বা সামগ্রিকভাবে ধর্মের আপেক্ষিক মূল্য নিয়ে আলোচনা করবে? সংক্ষেপে তুলনামূলক ধর্ম কি মূল্যের আলোচনা করবে? এই সম্পর্কে মতবিভেদ দেখা যায়। যদি বলা হয়, 'না', তাহলে এটা হবে বিনা বিচারে কোন কিছুকে ঘোষণা করা। অবশ্য এই নঞর্থক অভিমতের অনুকূলে সুদৃঢ় যুক্তি দেখান যেতে পারে। একটা যুক্তি হল মূল্যের তুলনামূলক আলোচনায় একটা মানদণ্ডের প্রয়োজন আছে। এই মানদণ্ড কিভাবে পাওয়া যেতে পারে? কোন একটা বিশেষ ধর্মকে মানদণ্ডরূপে গ্রহণ করা নিছক খেয়ালখুশীর ব্যাপার হয়ে দাঁড়াবে। তাছাড়া এই মানদণ্ড নিরূপণের ব্যাপারটি ধর্মদর্শনের কাজ, যেটি প্রাপ্ত উপাত্তের বিচারের সাহায্যে এই মানদণ্ড সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করে। ধর্মের ইতিহাস (History of Religion) তুলনামূলক আলোচনার জন্য উপাদান সরবরাহ করবে এবং তুলনামূলক ধর্ম সেইগুলিকে এমনভাবে সু-সমন্বিত করবে যাতে সেগুলি ধর্মদর্শনের আলোচনার বিষয়বস্তু হয়।

মূল্যের আলোচনা সম্পর্কে তুলনামূলক ধর্মের দৃষ্টিভঙ্গি

২। ধর্মের তুলনামূলক আলোচনায় বিভিন্ন স্তর (Different stages in the study of the Comparative Religion) ঃ

প্রায় এক শতাব্দী পূর্বে ম্যাক্সমূলার (*Max Muller*)-কে কেন্দ্র করে আধুনিক ধর্মের তুলনামূলক আলোচনার সুরু। তাঁর রচিত দু'খানি গ্রন্থ *Comparative Mythology* ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে এবং ১৮৭০ সালে *The Introduction to the Science of Religion* প্রকাশিত হয়। আলোচনার প্রথম স্তরে অন্যান্য ধর্মকে বোঝার জন্য এক অকৃত্রিম উৎসাহ ও উদ্দীপনা এবং আন্তরিক ইচ্ছার প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়। *The Sacred Books*

আলোচনার প্রথম স্তর

of the East গ্রন্থটির প্রকাশনের মাধ্যমে এই প্রচেষ্টার একটি উল্লেখযোগ্য স্তর সূচিত হয়।

ধর্মের তুলনামূলক আলোচনার দ্বিতীয় স্তর সূচিত হয় ১৮৯৬ থেকে ১৮৯৮ সাল পর্যন্ত টাইলি (*Tiele*)-র প্রদত্ত গিফোর্ড বক্তৃতার মাধ্যমে। *Elements of the Science of Religion* গ্রন্থে ঐ বক্তৃতাবলী প্রকাশিত হয়। টাইলর (*Tylor*), এমিলি দুরখীম (*Emile Durkheim*), উইলহেম ভুণ্ট্ (*Wilhelm Wundt*) প্রমুখ গ্রন্থ ধর্মের আলোচনার ক্ষেত্রে অভিব্যক্তিবাদের (evolutionary theory) প্রয়োগ নির্দেশ করেন। এই স্তরে মূল্যায়নের স্থান দখল করেছিল বর্ণনা, আদর্শ এবং মূল্যকে ঐতিহাসিক, মনস্তাত্ত্বিক এবং সমাজবিজ্ঞানের দিক থেকে ব্যাখ্যা করা হয়। বর্তমান এবং অতীতের মানুষের ধর্ম সম্পর্কীয় অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান লক্ষ্য করা যায়। ধর্মের উৎপত্তির আলোচনার ব্যাপারে যথেষ্ট আগ্রহ পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু প্রথম স্তরে যেমন বিশদ বিবরণের বিষয়টিকে উপেক্ষা করা হয়েছিল, দ্বিতীয় স্তরে বিশদ বিবরণের আধিক্য লক্ষ্য করা যায়। আলোচনার প্রথম স্তরে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল বিভিন্ন ধর্মের সাদৃশ্যের উপর, দ্বিতীয় স্তরে বিভিন্ন ধর্মের পার্থক্যের উপর। এই যুগে আরনেস্ট রেনান (*Ernest Renan*) একটি খ্যাতনামা নাম।

দ্বিতীয় স্তর

আলোচনার তৃতীয় স্তর সুরু হল দর্শনে নব্য কান্টপন্থী, বার্গসো এবং অবভাসবাদীদের অবদানের মাধ্যমে। ক্যাথেলিক চিন্তার ক্ষেত্রে ভন হুগেল (*Von Hugel*) এবং সেলার (*Scheler*) এবং প্রোটেস্ট্যান্ট ধর্মের ক্ষেত্রে সোডারব্লম্ (*Soderblom*), বার্থ (*Barth*) এবং অটো (*Otto*)-র মাধ্যমে। এই স্তরের তিনটি বিষয় উল্লেখযোগ্য। প্রথমতঃ, এক ঐক্যবদ্ধ সুসমন্বিত দৃষ্টিভঙ্গির মাধ্যমে অতিরঞ্জিত অসুবিধাগুলিকে অতিক্রম করার আকাঙ্ক্ষা। দ্বিতীয়তঃ, ধর্মীয় অভিজ্ঞতার প্রকৃতির গভীরে প্রবেশের ইচ্ছা এবং তৃতীয়তঃ, জ্ঞানবিদ্যা সম্পর্কীয় ও তত্ত্ববিদ্যা সম্পর্কীয় প্রশ্নের অনুসন্ধানে ব্রতী হওয়া। এই যুগের উল্লেখযোগ্য রচনা হল রুডলফ্ অটো (*Rudolf Otto*)-র রচনা। এই রচনা পরমতত্ত্বের বস্তুগত প্রকৃতি (objective character of ultimate reality)-র উপর যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করেছে এবং ধর্ম সম্বন্ধীয় সব মনোগত এবং অলীক মতবাদকে বর্জন করেছে।

তৃতীয় স্তর

এই তিন যুগের ইউরোপীয়, এশিয়া এবং আমেরিকার পণ্ডিত ব্যক্তিদের মধ্যে এক আন্তর্জাতিক সহযোগিতার মনোভাব লক্ষ্য করা যায়।

৩। বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে বিরোধ এবং পারস্পরিক তুলনার প্রয়োজনীয়তা (Conflict of religions and the need for comparasion):

ধর্মদর্শনের স্বরূপ ও পরিসর সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে আমরা বলেছিলাম যে ধর্ম একটি সর্বজনীন বিষয়। কি আদিম সমাজে, কি আধুনিক উন্নত সমাজে, যে কোন সমাজেই, কোন না কোন ভাবে ধর্মের অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায়। [1]ধর্মের গুরুত্ব সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে পেরিণ্ডার (*Parrinder*) বলেন, "ধর্ম এমনই একটি বিষয় যার সবচেয়ে বৃহৎ সাহিত্য, পুরণো ইতিহাস এবং মানবজাতির জন্য সবচেয়ে ব্যাপক গুরুত্ব রয়েছে।" কিন্তু যদিও ধর্ম একটি সর্বজনীন বিষয়, তবু দেখা যায় এই ধর্মকে কেন্দ্র করে অশান্তির শেষ নেই। বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে পারস্পরিক সম্প্রীতি ও বোঝাবুঝির অভাব প্রায়শঃই লক্ষ্য করা যায়। বস্তুতঃ প্রায়ই দেখা যায় কোন একটি ধর্মের সঙ্গে অপর একটি ধর্মের বিরোধ। অবশ্য এই বিরোধ উগ্র বা অনুগ্র হতে পারে। ধর্মও একটি মাত্র নয়, ধর্মের সংখ্যা বহু। অনেকে মনে করেন যে ধর্মের এই বহুত্বই জগতে অশান্তির কারণ, কেননা ধর্মই বিরোধ ও বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে। ইতিহাস থেকেই প্রমাণ পাওয়া যায় যে এই পৃথিবীতে অনেক সময় শোষণ, উৎপীড়ন ও অত্যাচারের যন্ত্র হিসেবে ধর্মকে প্রয়োগ করা হয়েছে এবং ধর্মকে কেন্দ্র করে অনেক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ ঘটেছে। কাজেই কেউ কেউ এমন অভিমত প্রকাশ করবেন যে জগতে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য ও বিভিন্ন ধর্মের বিরোধ দূর করার জন্য এই জগতের সব ধর্মকেই অবদমিত করার প্রয়োজন। কিন্তু ধর্মকে অবদমিত করা বা ধর্মের বিলোপ সাধন করা বাস্তবে সম্ভব নয়। ধর্মের প্রয়োজন মানুষের প্রকৃতির মধ্যেই নিহিত। কাজেই ধর্মকে অবদমিত করার বা ধর্মকে বিলুপ্ত করার প্রচেষ্টা কখনই সার্থক হবে না, কিছুকাল পরে ধর্মের আবার আবির্ভাব ঘটবে।

ধর্ম সর্বজনীন বিষয়

বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে বিরোধ

ধর্মের বিলোপসাধন সম্ভব নয়

যাঁরা ধর্মকে অবদমিত করার বা বিলুপ্ত করার কথা বলেন তাঁরা প্রকৃতপক্ষে ধারণা করেন যে ধর্ম শুধু মাত্র অশুভ, তার কোন কল্যাণকর দিক নেই। কিন্তু তাঁদের সেই ধারণা যথার্থ নয়। আমরা ইতিপূর্বে আলোচনা করেছি যে সমাজের দিক থেকে এবং ঐতিহাসিক দিক থেকে ধর্মের প্রভাব দুই ধরনের—সদর্থক, সমন্বয়সাধক, সংহতিমূলক, আর নঞর্থক, ধ্বংসমূলক এবং বৈষম্যমূলক। আবার মনোবিজ্ঞানের দিক থেকে বিচার

1. G. Parrinder: Comparative Religion, Page 16

করলে ধর্ম মানুষের মনের উপর দু'ভাবে প্রভাব বিস্তার করে। ধর্ম মানুষকে অনেক সময় অনুষ্ঠানসর্বস্ব করে তোলে, কোন সংকীর্ণ ধর্ম সম্প্রদায়ের প্রতি তার সুদৃঢ় আনুগত্যের ভাব সৃষ্টি করে, ধর্মপ্রবণ ব্যক্তিকে উদ্ধত, সংকীর্ণমনা, অনুদার ও ধর্মান্ধ করে তোলে। কিন্তু এও ঠিক যে ধর্ম মানুষকে উদার, বৃহত্তর দৃষ্টিভঙ্গিযুক্ত, সহিষ্ণু, ও সংযত করে, তার মধ্যে বিশ্ব ভ্রাতৃত্ব-বোধের মনোভাব জাগায় এবং জনসেবায় তাকে উদ্বুদ্ধ করে। আবার নীতি ও দর্শনের দিক থেকে দেখলে ধর্ম যেমন একদিকে কুসংস্কার, ভ্রান্ত ধারণা ও বদ্ধমূল ধারণা সৃষ্টি করে অনেক দুর্নীতিমূলক অনুষ্ঠান সম্পাদনে ব্যক্তিকে উৎসাহিত করে, তেমনি অপরদিকে এটাও স্বীকার করতে হয়, ধর্ম অনেক সুমহান দার্শনিক সত্য শিক্ষা দেয়, ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনে যার মূল্য অনস্বীকার্য।

মানুষের জীবনে ধর্মের প্রভাব

সংক্ষেপে বলা যেতে পারে যে, ধর্মের বাহরূপের মধ্যেই দু'ধরনের প্রকৃতির একত্র সমাবেশ দেখা যায়—দেখা যায় সত্যতা ও অসত্যতার একত্র মিশ্রণ। কাজেই প্রয়োজন দেখা দেয় ধর্মের সারমর্মকে (essence) আবিষ্কার করার জন্য ধর্মের প্রকৃতির গভীরে প্রবেশ করা। এই কারণেই বিভিন্ন ধর্মের পারস্পরিক তুলনার (comparison) প্রয়োজন দেখা দেয়। বিভিন্ন ধর্মের প্রকৃতি, উপদেশ বা শিক্ষা, আচার অনুষ্ঠানের নিরপেক্ষ ও সহানুভূতিমূলক আলোচনা ছাড়া এটা বলা কঠিন যে, কোন একটি ধর্মের সঙ্গে অপর একটি ধর্মের বিরোধ অনিবার্য কিনা। বিভিন্ন ধর্মের পারস্পরিক তুলনার মাধ্যমেই বিভিন্ন ধর্মের অন্তরালে যে মৌলিক ঐক্য বর্তমান সেটি আবিষ্কার করা যেতে পারে।

বিভিন্ন ধর্মের পারস্পরিক তুলনার প্রয়োজনীয়তা

তুলনামূলক ধর্ম (Comparative Religion) সাধারণভাবে ধর্মের দার্শনিক মূল্যায়ন সম্ভব করে তোলে। আমরা ইতিপূর্বে আলোচনা করেছি যে ধর্মদর্শনের কাজ কোন বিশেষ ধর্মের প্রকৃতি অনুসন্ধান করা নয়, সাধারণভাবে ধর্ম-অভিজ্ঞতার দার্শনিক বিচার করা। কিন্তু বিভিন্ন ধর্মের তুলনামূলক আলোচনার ফলে সংগৃহীত উপাদানের সাহায্যেই ধর্মদর্শনের পক্ষে তার উদ্দেশ্য সিদ্ধ করা সম্ভব। অনুরূপভাবে ধর্মের সমাজবিজ্ঞানকেও (Sociology of Religion), ধর্মকে সামাজিক বিষয়রূপে উপলব্ধি করার জন্য বিভিন্ন ধর্মের তুলনা-মূলক আলোচনার উপর নির্ভর করতে হয়। এই সব ব্যবহারিক প্রয়োজন ছাড়াও, শুধুমাত্র আমাদের বুদ্ধিবৃত্তির কৌতূহলকে পরিতৃপ্ত করার জন্যও আমরা বিভিন্ন ধর্মের মূল বৈশিষ্ট্য ও তাদের পারস্পরিক তুলনা করে তাদের মধ্যে সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্যকে আবিষ্কার করতে চাই। এইসব প্রয়োজন মেটাবার জন্যই ধর্মের তুলনামূলক আলোচনার উদ্ভব ঘটেছে।

তুলনামূলক ধর্মের উদ্ভবের কারণ

৪। তুলনামূলক ধর্মের লক্ষ্য (The Aim of Comparative Religion) :

তুলনামূলক ধর্মের লক্ষ্য কি? ধর্মের তুলনামূলক আলোচনা কোন্ উদ্দেশ্য সিদ্ধ করে? এর উত্তরে বলা যেতে পারে যে, তুলনার অভিপ্রায়ে প্রাচীন এবং আধুনিক, প্রাগ্‌ঐতিহাসিক এবং ঐতিহাসিক ধর্মগুলির শুদ্ধ ব্যক্তি-নিরপেক্ষ আলোচনা করা তুলনামূলক ধর্মের কাজ। বিভিন্ন ধর্মের সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলি আবিষ্কার করার জন্য তাদের মৌলিক ধর্মমত, মতবাদ, উপদেশাবলীর প্রকৃতি অনুসন্ধান করা তুলনামূলক ধর্মের কাজ। আবার বিভিন্ন ধর্মের যেমন কতকগুলি সাধারণ বৈশিষ্ট্য আছে, তেমনি তাদের মধ্যে নানা বিষয়ের পার্থক্য আছে। কাজেই তুলনামূলক ধর্মকে বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে কোন কোন বিষয়ে মিল এবং কোন কোন বিষয়ে অমিল আছে তাও অনুসন্ধান করতে হয়। একটি ধর্মের সঙ্গে অপর একটি ধর্মের কি এমনই অমিল রয়েছে যে তাদের পরস্পরের মিলনের একটা সাধারণ ভিত্তি আবিষ্কার করা যায় না? এই অনুসন্ধানের কাজ পরিপূর্ণ করার দিকেই তুলনামূলক ধর্ম চালিত হয়।

তুলনামূলক প্রকৃতি

এই যদি তুলনামূলক ধর্মের মূল লক্ষ্য হয় তাহলে স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে যে তুলনামূলক ধর্ম কোন নতুন ধর্ম নয় বা তুলনামূলক ধর্ম নতুন কোন ধর্ম সম্প্রদায় সৃষ্টি করে নতুন বিরোধ ও বিতর্কের উদ্ভব ঘটায় না। কোন বিশেষ ধর্মকে শ্রেষ্ঠ, মহান বা প্রগতিশীল বলে তুলনামূলক ধর্ম নির্দেশ করে না, বা অন্য কোন ধর্মকে নিকৃষ্ট, আদিম বা অপ্রগতিপন্থী বলেও বর্ণনা করে না। বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে কোন ক্ষতিকর বা সর্বনাশা প্রতিযোগিতার মনোভাব সৃষ্টি করাও তুলনামূলক ধর্মের কাজ নয়। যে ধর্ম এই জাতীয় কাজ করতে অগ্রসর হয় তা প্রতিযোগিতামূলক ধর্মে (competitive religion) পরিণত হয়। কিন্তু তুলনামূলক ধর্মকে প্রতিযোগিতামূলক ধর্ম বলে ভুল করা উচিত নয়। ধর্মের তুলনামূলক আলোচনার ক্ষেত্রে সব সময়ই বিভিন্ন ধর্মের প্রতি একটা সহানুভূতির মনোভাব উপস্থিত থাকবে। একটা কথা মনে রাখতে হবে যে, ধর্ম এমন একটা বিষয় নয় যার অনুদার বিশ্লেষণ যুক্তিসঙ্গত, কেননা ধর্ম হল ধর্মপ্রবণ ব্যক্তির বিশ্বাস।

তুলনামূলক ধর্ম ও প্রতিযোগিতামূলক ধর্মের মধ্যে পার্থক্য

তুলনামূলক বিচারের জন্য ধর্মসম্বন্ধীয় তথ্য বা ঘটনাকে একত্র সংগ্রহ করা এবং এই সব তথ্যের প্রকৃতি, উৎপত্তি, বিকাশ এবং ধর্মসম্বন্ধীয় নীতিগুলি বর্ণনা করাও তুলনামূলক ধর্মের অন্তর্ভুক্ত। এর ফলে ধর্মের বিভিন্ন বিকাশের স্তরে ধর্ম যে এক, এই

বিষয়টি আবিষ্কৃত হয়, এবং সব ধর্মগুলিকেই নিরপেক্ষভাবে বিচারের ইচ্ছা জাগ্রত হয়: সব ধর্মের কোন সাধারণ ভিত্তি আছে কিনা, তা আবিষ্কারের চেষ্টা করা হয়, এবং ধর্মের সাধারণ নীতি, প্রকৃতি, উৎপত্তি, বিকাশ প্রভৃতি নিরূপণের চেষ্টা করা হয়।

অবশ্য একথা চিন্তা করলে ভুল হবে যে তুলনামূলক ধর্ম বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে যে পার্থক্য সেগুলিকে উপেক্ষা করে। তুলনামূলক ধর্ম পার্থক্যগুলিকে অগ্রাহ্য করে না।

তুলনামূলক ধর্ম বিভিন্ন ধর্মের পার্থক্যকে উপেক্ষা করে না

তুলনামূলক ধর্ম পার্থক্যগুলিকে নির্দেশ করার সময় বিজ্ঞানোচিত মনোভাব নিয়ে এবং কোনরকম বিদ্রূপ বা ব্যঙ্গের মনোভাব না নিয়ে সেগুলি নির্দেশ করে। অবশ্য তুলনামূলক ধর্ম বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে যে ঐক্য তার উপরই গুরুত্ব আরোপ করবে, পার্থক্য বা বৈষম্যগুলির সমালোচনাকেই আলোচনার ক্ষেত্রে মুখ্য বিষয় করে তুলবে না।

তুলনামূলক ধর্ম ধর্মসম্বন্ধীয় তথ্যের বা ঘটনার নিছক তালিকা প্রস্তুতি নয়। তুলনামূলক ধর্ম শুধু মাত্র ধর্মসম্বন্ধীয় ঘটনার আলোচনা নয়, ঘটনাগুলির সহানুভূতিমূলক উপলব্ধি। তুলনামূলক ধর্মকে বুঝতে হবে যে প্রতিটি ধর্মসম্বন্ধীয় ঘটনা হল মানুষের লৌকিককে অলৌকিকের সঙ্গে যুক্ত করার প্রচেষ্টা। কোন ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানের ব্যাখ্যায় তুলনামূলক ধর্ম সেই ধর্মের সামাজিক পটভূমিকাকে জানার জন্য সচেষ্ট হবে, সেই ধর্মীয় রীতি কি উদ্দেশ্য সিদ্ধ করতে চায় তা জানতে চাইবে, সেই রীতি ব্যক্তির মধ্যে কি কর্তব্য জাগরিত করে, বা যারা রীতি মেনে চলে তাদের কি ধরনের পরিতৃপ্তি হয় সেই সম্পর্কে অনুসন্ধান করবে। ঐ রীতি মেনে চলাতে যে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়, সেই একই উদ্দেশ্য সিদ্ধ করার জন্য একই অবস্থায় অন্য একই ধর্মাবলম্বী ব্যক্তিগণ কোন্ রীতি মেনে চলে? এই সব প্রশ্নের যথাযথ উত্তর খুঁজে পেতে হলে তুলনামূলক ধর্মের নিরপেক্ষ আলোচনাকারীকে অপরের দৃষ্টিভঙ্গিকে সহানুভূতিমূলক দৃষ্টিতে দেখতে হবে।

অপরের দৃষ্টিভঙ্গির সহানুভূতিসূচক বিচার তুলনামূলক ধর্মের কর্তব্য

এই সহানুভূতিমূলক মনোভাবের কথা বলতে গিয়ে পেরিণ্ডার (*Parrinder*) বলেন যে, নৃতত্ত্ববিজ্ঞানীকে যদি কোন উপজাতির বিশ্বাস অর্জন করার জন্য সহানুভূতিসূচক দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করতে হয়, কোন মনোবিজ্ঞানীকে রোগীকে খোলাখুলি কথাবার্তা বলার জন্য অনুরূপ দৃষ্টিভঙ্গির আশ্রয় নিতে হয়, তাহলে এর চেয়ে অনেক বেশী সহানুভূতিসূচক দৃষ্টিভঙ্গি, সহিষ্ণুতা ও বোধের প্রয়োজন হবে তুলনামূলক ধর্মের, কেননা তুলনামূলক ধর্ম মানুষের বিশ্বাস, ধর্মবিশ্বাস নিয়ে আলোচনা করে যাকে মানুষ প্রাণের মতনই প্রিয় বলে জানে, যার জন্য অসংখ্য লোক প্রাণ দিয়েছে। কাজেই ধর্মের তুলনামূলক আলোচনার জন্য যথেষ্ট সহানুভূতি, উদার মনোভাব ও নিরপেক্ষ

বোধের প্রয়োজন আছে। প্রত্যেক ধর্মের ক্ষেত্রে কতকগুলি সমস্যা আছে, সেগুলিকে এড়িয়ে গেলে চলবে না, উদার মনোভাব নিয়ে সেগুলির বিশ্লেষণ করতে হবে। অন্য ধর্মের আলোচনা করতে গেলে সহিষ্ণুতার প্রয়োজন আছে। অন্য ধর্মের আলোচনা করতে গেলে নিরপেক্ষভাবে এবং স্বাধীনভাবে করা দরকার (if other religions are to be studied, it must be fairly and freely)। ধর্মের তুলনামূলক আলোচনার ক্ষেত্রে যথার্থ দৃষ্টিভঙ্গি কি হওয়া উচিত তার ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বুকে (*Bouquet*) বলেন,[1] "এই কাজে নিজেকে নিযুক্ত করার জন্য কেবলমাত্র যে উপায়টিকে সহনীয় মনে করা যায় তাহল মানুষের অলৌকিকতার এবং অসীমতার নিরবচ্ছিন্ন অনুসন্ধিৎসায় নিজের আত্মাকে প্রযুক্ত করা, যা এই জগতের সাধারণ জীবন তাকে কখনও দেবে না এবং নিজেকে তাদের জায়গায় স্থাপিত করা যারা নিজের ধর্মমত ছাড়া অপর এক ধর্মকে জানার জন্য স্পষ্টত: উৎসাহী হবে।"

বুকে-এর অভিমত

প্রতিটি ধর্মের দুটি দিক আছে—আকারের দিক এবং উপাদানের দিক। আকারের দিক থেকে সব ধর্মই মোটামুটি এক, কেননা প্রতিটি ধর্মেই রয়েছে বুদ্ধিগত, আবেগগত এবং ইচ্ছাগত উপাদান। কিন্তু উপাদানের দিক থেকে বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে নানারকম পার্থক্য বর্তমান। প্রতিটি ধর্ম কোন পরমতত্ত্বে বিশ্বাসী, কিন্তু এই পরমতত্ত্বের ধারণা বিভিন্ন ধর্মের ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন। অনুভূতির দিক থেকেও পার্থক্য লক্ষিত হয়। আদিম ধর্মে ভীতির আবেগের প্রাধান্য ছিল কিন্তু উন্নত ধরনের ধর্মগুলিতে দেখা যায় সশ্রদ্ধ ভয়, এবং ভালবাসার প্রাধান্য। আবার পূজা ও উপাসনা পদ্ধতিও এক এক ধর্মের ক্ষেত্রে এক এক রকম। এই প্রসঙ্গে জন হিক হিন্দু ধর্ম, ইসলাম ধর্ম, বৌদ্ধ ধর্ম এবং খ্রীষ্টান ধর্ম সম্পর্কে বলেন, "এই বিভিন্ন ধর্মগুলি পরমতত্ত্বের প্রকৃতি সম্পর্কে, ঐশ্বরিক ক্রিয়ার ধরণ সম্পর্কে মানুষের প্রকৃতি ও ভাগ্য সম্পর্কে ভিন্ন এবং পরস্পর বিরুদ্ধ বিষয় ব্যক্ত করে বলে মনে হয়[2]।" এই কারণেই ধর্মের তুলনামূলক আলোচনার প্রয়োজন দেখা দেয়। তুলনামূলক ধর্ম বিভিন্ন ধর্মগুলির আকারের মিল বা সঙ্গতির পরিপ্রেক্ষিতে তাদের পার্থক্যের প্রকৃতি বা স্বরূপ আলোচনা করে। তারপর তুলনামূলক ধর্ম অনুসন্ধান করে যে বিভিন্ন ধর্মের পার্থক্যগুলির মূল কি এত গভীরে রয়েছে যে বিভিন্ন ধর্মের মিলন একটা অসম্ভব ব্যাপার। [3]পেরিণ্ডার বলেন, "ধর্মের তুলনামূলক আলোচনার অনুশীলন করা যেতে পারে

ধর্মের দুটি দিক

1. A. C. Bouquet: Comparative Religion
2. J. Hick: Philosophy of Religion; Page 119.
3. G. Parrinder: Comparative Religion; Page 15.

এবং ধর্ম এমনই এক গুরুত্বপূর্ণ ও সর্বজনীন বিষয় যে এটি গুরুত্বপূর্ণ মনোযোগ আকর্ষণ করার অধিকারী।”

৫। তুলনামূলক ধর্ম কি সম্ভব? (Is Comparative Religion possible?) ঃ

কেউ কেউ তুলনামূলক ধর্মের সম্ভাব্যতায় সংশয় প্রকাশ করেছেন। এইসব ব্যক্তিদের সংশয় কতখানি যুক্তিপূর্ণ আমরা বিচার করে দেখব এবং এদের অভিযোগের উত্তর দেবার চেষ্টা করব।

(i) কেউ কেউ এমন অভিযোগ করেছেন যে তুলনা এমনিতেই নিন্দাজনক বা দূষণীয় বিষয় এবং ধর্মের ক্ষেত্রে এটি আরও বেশী নিন্দাজনক ব্যাপার। তুলনা অযাচিত তিক্ততা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি করে। কাজেই ধর্মের তুলনামূলক আলোচনা পরিহার করাই সঙ্গত।

এর উত্তরে বলা যেতে পারে যে, ধর্মের তুলনামূলক আলোচনাকে পরিহার করা সম্ভব। কিন্তু ধর্মের বিরোধিতা বাস্তব ঘটনা, বর্তমান জগতে কোনধর্মের পক্ষেই অপরের কাছ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে অবস্থান করা সম্ভব নয়। যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি সাধিত হওয়ার ফলে বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী ব্যক্তিরা পরস্পরের সঙ্গে মেলামেশা করে এবং অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে ধর্মসম্বন্ধীয় ব্যাপারেও নিজেদের মধ্যে ভাব বিনিময় করে। তাছাড়া অপরের ধর্মসম্বন্ধীয় মতামত ও আচার অনুষ্ঠান সম্পর্কে মানুষের কৌতূহলের শেষ নেই। কাজেই ধর্মকে পরস্পরের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন রাখা সম্ভব নয়. কাজেই তুলনাকে যেহেতু পরিহার করা সম্ভব হবে না, এই তুলনা যাতে নিরপেক্ষ ভাবে এবং সহানুভূতির মনোভাব নিয়ে করা হয়, তাই যুক্তিযুক্ত। [1]পেরিণ্ডার বলেন “যেটা গুরুত্বপূর্ণ সেটা হল যাতে তুলনাগুলি যথার্থভাবে করা হয় এবং তার সবিচার মূল্যায়ন করা হয়।”

ধর্মের তুলনা পরিহার করা সম্ভব নয়

(ii) পৃথিবীর বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে ব্যাপক পার্থক্য বর্তমান। তাদের ঐতিহাসিক পটভূমিকা পৃথক। তাছাড়া তাদের ধর্মমত, আদর্শ, ভাবধারা পৃথক, কাজেই বিভিন্ন ধর্মের পারস্পরিক মিশ্রণ সম্ভব নয়। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের ধর্মের প্রকৃতির মধ্যে এতই পার্থক্য যে, মনে হয় তেল ও জলের মত তাদের মধ্যে মিশ্রণ সম্ভব নয়।

তুলনামূলক ধর্মের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ তুলনামূলক ধর্মের লক্ষ্য সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত। বিভিন্ন ধর্মের মিশ্রণ তুলনামূলক ধর্মের লক্ষ্য নয়। পেরিণ্ডার

1. G. Parrinder: Comparative Religion; Pages 14-15

যথার্থই বলেছেন যে, তুলনা অনিবার্যভাবে মিশ্রণ বোঝায় না, আলোচনা বোঝায় (Comparison does not necessarily imply mingling, but study)। বিভিন্ন ধর্মের তুলনামূলক আলোচনাই তুলনামূলক ধর্মের প্রাথমিক কাজ। এই আলোচনার ফলে বিভিন্ন ধর্মের মৌলিক ঐক্যের বিষয়টি আবিষ্কৃত হবে। ধর্মের মিশ্রণ, যেখানে কোন বিশেষ ধর্মের স্বকীয় বৈশিষ্ট্য হারিয়ে যায়, তুলনামূলক ধর্মের লক্ষ্য নয়।

ধর্মের মিশ্রণ তুলনামূলক ধর্মের লক্ষ্য নয়

(iii) 'তুলনামূলক ধর্ম' পদটি সুপ্রযুক্ত নয়। কেননা এই পদটি মূল্যায়ন, বিচার এবং সমালোচনার ইঙ্গিত বহন করে। কাজেই এই তাৎপর্য পরিহার করার জন্য ধর্মের তুলনামূলক আলোচনা (The Comparative Study of Religions) পদটির ব্যবহার সুপ্রযুক্ত। কেউ বা শুধুমাত্র 'ধর্মের আলোচনা (The Study of Religion) বা 'ধর্ম বিজ্ঞান' পদটি ব্যবহারের পক্ষপাতী।

তুলনামূলক ধর্ম পদটি পরিহার করা যুক্তিযুক্ত

এই অভিযোগের উত্তরে বলা যেতে পারে যে, 'তুলনামূলক ধর্ম' নামটির ব্যবহারে যাতে কোন ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি না হয় তার জন্য ধর্মের তুলনামূলক লক্ষ্য সুস্পষ্টভাবে প্রথমেই নির্দেশ করা উচিত। ধর্মের তুলনামূলক লক্ষ্য কোন ধর্মকে উপহাস করা নয়। তাছাড়া 'ধর্মবিজ্ঞান' পদটির ব্যবহারে কেউ কেউ আপত্তি করতে পারেন। অনেক বৈজ্ঞানিক এই অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে, ধর্ম সম্বন্ধীয় ঘটনার যথার্থ বৈজ্ঞানিক আলোচনার দিন এখনও আসেনি। শুধু তাই নয়, ধর্মপ্রবণ ব্যক্তিরাও ধর্মের বিজ্ঞানসম্মত আলোচনায় আপত্তি জানিয়েছেন। কাজেই 'তুলনামূলক ধর্ম' পদটির ব্যবহারে কোন আপত্তি করার সঙ্গত কারণ নেই।

ধর্মের তুলনামূলক লক্ষ্য সুস্পষ্টভাবে বিবৃত করলে নাম সম্পর্কে কোন আপত্তির কারণ থাকে না

(iv) ধর্মের ক্ষেত্রেও অনেক অহংভাবপূর্ণ ব্যক্তির দেখা মেলে যাঁরা মনে করেন যে তাঁদের ধর্মই একমাত্র যথার্থ ধর্ম এবং অন্য সব ধর্ম মিথ্যা। কাজেই এই জাতীয় ব্যক্তিরা ধর্মের তুলনামূলক আলোচনায় বিশেষভাবে আপত্তি করেন।

অহংভাবপূর্ণ ব্যক্তির ক্ষেত্রে তুলনার বিষয়টি নিঃসন্দেহে একটি গুরুতর সমস্যা এবং এই অহংভাব অনেক রকম ক্ষতির কারণ। এর একমাত্র প্রতিকার হল ব্যাপক ও উদার শিক্ষার দ্বারা এইসব ব্যক্তির মনোভাবের ও দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন সাধন করা।

অনেকে মনে করেন যে, শিক্ষার দ্বারা সেই পারস্পরিক বোঝাবুঝির মনোভাব সৃষ্টি করা যায় না, যা তুলনামূলক ধর্মের লক্ষ্য। মনের দিক থেকে এই জাতীয় শিক্ষা বিশেষ ফলপ্রসূ হবেনা কেননা প্রতিটি ধর্মপ্রবণ ব্যক্তি তার নিজের ধর্মবিশ্বাস বা

ধর্মসম্বন্ধীয় দৃষ্টিভঙ্গিকে অভিনব এবং অতুলনীয় মনে করে এক পরম পরিতৃপ্তি লাভ করে।

কিন্তু এই জাতীয় ধারণা যথার্থ নয়। যদিও প্রতিটি ব্যক্তি নিজের ধর্ম বিশ্বাসের শ্রেষ্ঠতায় বিশ্বাসী এবং নিজের ধর্ম বিশ্বাসের প্রতি বিশেষভাবে অনুরক্ত, এর অর্থ এই নয় যে, সেই ব্যক্তি নিজের ধর্মের সঙ্গে অন্য ধর্মের সাদৃশ্য আবিষ্কারে আগ্রহী নয়। মানুষ তার দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে অপরের দৃষ্টিভঙ্গির সাদৃশ্য দেখতে পেলে খুশীই হয় এবং ধর্মের ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম দেখা যায় না। কাজেই ধর্মের তুলনামূলক আলোচনা মানবমনের বিরোধী ক্রিয়া নয়।

কেউ কেউ মনে করেন যে তুলনামূলক ধর্ম সম্ভব নয়। কেননা কোন ব্যক্তির পক্ষে তার নিজের ধর্ম ছাড়া অন্য ধর্মের স্বরূপকে যথার্থভাবে জানা সম্ভব নয়। অপর ধর্ম সম্প্রদায়ের সভ্য না হয়ে কোন ব্যক্তি কিভাবে সেই ধর্মের প্রকৃতিকে জানতে পারবেন?

অপরের ধর্মকে বোঝা সম্ভব

এই অভিযোগের উত্তরে বলা যেতে পারে যে, কোন ব্যক্তির পক্ষে নিজের ধর্ম ছাড়া অন্য ধর্মকে বোঝা অসম্ভব নয়। কোন ধর্মকে বুঝতে হলেই যে সেই ধর্মসম্প্রদায়ের সভ্য হতে হবে, এ সিদ্ধান্তও যুক্তিসঙ্গত নয়। উদার মনোভাব, এবং সুদৃঢ় ইচ্ছা থাকলে এটা কোন অসম্ভব ব্যাপার নয়। [1]পেরিণ্ডার বলেন, গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি হল অন্যান্য ধর্মমতকে আক্রমণ করার এবং তাদের দুর্নাম করার মনোভাবকে অতিক্রম করে যেতে হবে। তাছাড়া এই প্রচেষ্টার প্রথম স্তরে ঘটনা সংগ্রহের কাজ ধৈর্য ধরে এবং যত্ন সহকারে সম্পন্ন করা যেতে পারে। তাছাড়া কোন ব্যক্তি অন্য ধর্মকে বোঝার প্রচেষ্টায় সেই ধর্মমতের অন্তর্ভুক্ত না হয়েও সেই ধর্মের কিছু কিছু অনুষ্ঠানে সক্রিয় অংশীদার হতে পারে।

তুলনামূলক ধর্ম ধর্মের পার্থক্যগুলিকে উপেক্ষা করে

(vii) তুলনামূলক ধর্ম কেবলমাত্র বিভিন্ন ধর্মের সাদৃশ্য ও ঐক্যের উপর গুরুত্ব আরোপ করে এবং তাদের পার্থক্যগুলিকে উপেক্ষা করে। কিন্তু পার্থক্যগুলিকে উপেক্ষা করার অর্থ সেই ধর্মের বৈশিষ্ট্যগুলিকে উপেক্ষা করা, যার ফলে তুলনামূলক ধর্ম ঘটনার যথাযথ বিবরণ না দিয়ে তার ভ্রান্ত বিবরণ ও ব্যাখ্যা দেয়।

এর উত্তরে বলা যেতে পারে যে, তুলনামূলক ধর্ম শুধুমাত্র বিভিন্ন ধর্মের সাদৃশ্য ও ঐক্যের উপর গুরুত্ব আরোপ করে এবং অসাদৃশ্যগুলিকে উপেক্ষা করে, —এই

1. G. Parrinder: Comparative Religion; Page 62.

অভিমত যথার্থ নয়। তুলনামূলক আলোচনার জন্য সাদৃশ্য ও অসাদৃশ্য উভয়ের আলোচনা সমান গুরুত্বপূর্ণ। শুধুমাত্র সাদৃশ্য থাকলে, তুলনার কোন অবকাশ থাকত না। তুলনামূলক ধর্ম অসাদৃশ্যগুলিকে যেমন উপেক্ষা করে না, তেমনি অনাবশ্যকভাবে সেগুলিকে অতিরঞ্জিতও করে না। যখনই বিভিন্ন ধর্মের পার্থক্যগুলি তার দৃষ্টিপথে পড়ে, তখন তুলনামূলক ধর্ম বিচার করে দেখে সেইগুলি কতখানি গুরুত্বপূর্ণ। তবে এই প্রসঙ্গে একথা বলা অযৌক্তিক হবে না যে, বিভিন্ন ধর্মের যে পার্থক্য সেগুলি ধর্মের মূল ঐক্যকে ধ্বংস করে দিতে পারে না। বস্তুতঃ তুলনামূলক ধর্মের কাজ হল বিভিন্ন ধর্মের বৈষম্যের অন্তরালে এই ঐক্যকে আবিষ্কার করা।

তুলনামূলক ধর্মে সাদৃশ্য ও অসাদৃশ্য উভয়ের আলোচনা গুরুত্বপূর্ণ

(viii) তুলনামূলক ধর্ম ধর্মের পারস্পরিক তুলনা করতে গিয়ে তাদের তুলনামূলক উৎকর্ষ (comparative worth) নিরূপণ করতে পারে, যার ফলে বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে অপ্রীতিকর সম্পর্কের সৃষ্টি হতে পারে।

এর উত্তরে বলা যেতে পারে যে, তুলনা করতে গেলেই যে কোন ধর্ম ছোট, বা কোন ধর্ম অপরের তুলনায় বড়, এটা নির্দেশ করতেই হবে এমন কোন কথা নেই। বস্তুতঃ তুলনামূলক ধর্মের সেটা মোটেও লক্ষ্য নয়। কোন ধর্মকে বুঝতে গেলে পক্ষপাতশূন্য আলোচনার একান্ত প্রয়োজন, তুলনামূলক ধর্মের সেটিই লক্ষ্য।

[1]পেরিগুার-এর অভিমতানুসারে তুলনামূলক ধর্মের আবশ্যকতা আছে। এটি অবশ্য প্রয়োজন, কিন্তু সৌন্দর্য ও উদারতার মনোভাব নিয়ে এর আলোচনা চালিয়ে যেতে হবে।

যোয়াকিম্ ওয়াচ (*Joachim Wach*) তাঁর '*The Comparative Study of Religions*' [2]গ্রন্থে প্রশ্ন তুলেছেন—'তোমার নিজের ধর্ম ছাড়া তুমি কি অন্য ধর্মকে জানতে পার?' তাঁর অভিমত হল যে, এই প্রশ্নের উত্তরে অনেকে 'না' বললেও, এই প্রশ্নের সদর্থক উত্তর সম্ভব। তিনি বলেন যে অন্য ধর্মকে জানার জন্য প্রয়োজনীয় বিষয়গুলি তিন ধরনের। প্রথম বিষয়টি হল বৌদ্ধিক প্রকৃতির (intellectual nature)। কোন ধর্মকে বা কোন ধর্মীয় ঘটনাকে বুঝতে হলে প্রথমে তথ্য সংগ্রহণের প্রয়োজন আছে। দ্বিতীয়তঃ, নিজের ধর্ম ছাড়া অন্য ধর্মকে বুঝতে গেলে একটা অতিরিক্ত আবেগগত অবস্থার (additional emotional condition) প্রয়োজন আছে। অর্থাৎ কিনা, অন্য ধর্মের প্রতি উদাসীন হলে চলবে না, অন্য ধর্মের প্রতি আগ্রহ জাগাতে হবে। এর অর্থ

যোয়াকিম্ ওয়াচ-এর অভিমত

1. Comparative Religion ; Page 65.
2. The Comparative study of Religions ; Pages 11-13.

কিন্তু এই নয় যে ধর্ম নিছক আবেগের বিষয়বস্তু। তৃতীয় বিষয়টি হল ইচ্ছা। ইচ্ছাকে একটা সংগঠনমূলক উদ্দেশ্যের দিকে চালিত করতে হবে। নিছক অলস কৌতূহল বা আমার ধর্ম থেকে যা পৃথক তাকে বিলুপ্ত করে দেবার বাসনা এই কাজের পক্ষে উপযুক্ত মনোভাব নয়। তবে এ ছাড়াও আর একটি বিষয় আছে যা ধর্মের আলোচনার জন্য প্রয়োজন, সেটা হল অভিজ্ঞতা।

উপরিউক্ত আলোচনার ভিত্তিতে আমরা এই সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে, তুলনামূলক ধর্মের সম্ভাব্যতা অস্বীকার করা চলে না।

৪। তুলনামূলক ধর্মের পদ্ধতি (The Method of Comparative Religion) ঃ

যে-কোন বিষয়কে তার বিষয়বস্তু আলোচনার জন্য একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতি অনুসরণ করতে হয়। তুলনামূলক ধর্মকেও বিভিন্ন ধর্মের পারস্পরিক তুলনা করে তাদের মধ্যে সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য আবিষ্কার করার জন্য একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে। প্রশ্ন হল, তুলনামূলক ধর্মের আদর্শ পদ্ধতি কি? এর উত্তরে বলা যেতে পারে যে তুলনামূলক ধর্ম তুলনামূলক পদ্ধতি (comparative method) অনুসরণ করবে। কিন্তু এই তুলনামূলক পদ্ধতির স্বরূপ নিরূপণ করতে গিয়ে নানারকম অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়।

তুলনামূলক ধর্মের পদ্ধতি কি?

তুলনামূলক পদ্ধতির প্রকৃতি এবং প্রয়োগের সম্ভাব্যতা সম্পর্কে তিনটি অভিমত পাওয়া যায় (১) অনেক চিন্তাবিদ প্রয়োগগত অসুবিধার দিক থেকে বিচার করে বিভিন্ন ধর্মেব তুলনামূলক আলোচনার ক্ষেত্রে তুলনামূলক পদ্ধতির প্রয়োগে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। (২) কারও কারও মতে তুলনামূলক ধর্মের পদ্ধতি হবে তার নিজস্ব পদ্ধতি এবং বিজ্ঞান অনুসৃত তুলনামূলক পদ্ধতিকে গ্রহণ করা যুক্তিসঙ্গত হবে না। (৩) কারও কারও মতে ধর্মের ক্ষেত্রেও বিজ্ঞান অনুসৃত তুলনামূলক পদ্ধতি প্রয়োগ করা সম্ভব এবং প্রয়োগ করা যুক্তিযুক্ত। আমরা এই অভিমতগুলি একে একে আলোচনা করব।

তুলনামূলক পদ্ধতির প্রকৃতি সম্পর্কে তিনটি অভিমত

প্রথম অভিমতের সমর্থকবৃন্দ বলেন যে, ধর্মের ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের বাস্তব ধর্মসম্বন্ধীয় অভিজ্ঞতার ভিত্তিতেই প্রকৃত তুলনা করার কাজ সম্পন্ন হতে পারে। তাঁদের মতে এই তুলনা করার কাজ সকলের দ্বারা সম্পাদিত হতে পারে না। যে সব ব্যক্তি আধ্যাত্মিক অন্তঃদৃষ্টির অধিকারী, আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতার অধিকারী, তেমন ব্যক্তিই এই তুলনার কাজ করতে সক্ষম। রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের মত সাধকই বিভিন্ন ধর্মের তুলনা করে সিদ্ধান্ত

আধ্যাত্মিক অন্তঃদৃষ্টি-সম্পন্ন ব্যক্তিই তুলনা করতে পারে

করতে পারেন যে, সব ধর্মের লক্ষ্য হল এক অর্থাৎ ঈশ্বরপ্রাপ্তি। ধর্মের ক্ষেত্রে নিছক গবেষণারত ছাত্র-ছাত্রীর পক্ষে বাস্তব ধর্মীয় অভিজ্ঞতার তুলনা করা সম্ভব নয়। কেননা তারা আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতার অধিকারী নয়, এবং যদিও আন্তর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার (inner personal experience) ভিত্তিতে কারও কারও পক্ষে এই তুলনা করা সম্ভব হয়, তার ভিত্তিতে কোন বাস্তব তুলনামূলক পদ্ধতি রচিত হতে পারে না।

তুলনামূলক পদ্ধতি এক অভিনব পদ্ধতি

(২) যাঁরা মনে করেন যে তুলনামূলক পদ্ধতি হল এক অভিনব পদ্ধতি, এবং জ্ঞানের অন্যান্য ক্ষেত্রে যে সব পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয় তার সঙ্গে অভিন্ন নয়, তাঁরা এই অভিমত প্রকাশ করেন যে ধর্মের সারবস্তু বিচার বুদ্ধির অতীত। ধর্মীয় অভিজ্ঞতা এক অনুপম অভিজ্ঞতা। এই অভিজ্ঞতা বস্তুনিরপেক্ষ এবং যুক্তির মাধ্যমে প্রকাশযোগ্য নয়। অতীন্দ্রিয়বাদীরা মনে করেন যে ধর্মীয় অভিজ্ঞতা হল অন্তরের বিষয়, মস্তিষ্কের নয়, এবং অতীন্দ্রিয় অভিজ্ঞতার চরম স্তরে যখন পরমসত্তার সঙ্গে ভক্তের মিলন বা সাক্ষাৎকার সাধিত হয়, তখন ভক্ত এমন এক উল্লাস অনুভব করেন যা অনির্বচনীয়। অটো (*Otto*) তাঁর '*Idea of the Holy*' গ্রন্থে এই অভিমত প্রকাশ করেছেন যে ধর্মের সার ধর্ম (essence) হল 'নুমেন' (*Numen*) অর্থাৎ এক অভিনব মৌলিক 'অনুভূতি প্রতি-ক্রিয়া' (feeling response), যার কোন যৌক্তিক সংজ্ঞা নির্দেশ করা যায় না, নৈতিক দিক থেকে যা ভাল-মন্দ নিরপেক্ষ, যা 'পরিপূর্ণ ভাবে অন্য' (wholly other)।

সমালোচনা

এই অভিমতের সমালোচনায় একথা বলা যেতে পারে যে অতীন্দ্রিয়বাদীরা যে অভিজ্ঞতা লাভের কথা বলেন তা সীমিত কয়েকজনের পক্ষেই সম্ভব এবং সেটাই ধর্মের সবটুকু নয়। কাজেই যদিও অতীন্দ্রিয় অভিজ্ঞতাকে অনির্বচনীয় আখ্যা দেওয়া হয় এবং সাধারণ ভাষার মাধ্যমে তাকে প্রকাশ করা সম্ভব নাও হয় এবং যদি মনে করা হয় যে এই অভিজ্ঞতা সাধারণ ধর্মসম্বন্ধীয় অভিজ্ঞতার ঊর্ধে, তাহলেও এই সিদ্ধান্ত করা যেতে পারে যে, ধর্মের অন্যান্য বস্তুগত এবং প্রকাশক্ষম দিক আছে, যেগুলির তুলনামূলক এবং বিচারভিত্তিক মূল্যায়ন সম্ভব।

ধর্মের সারবস্তু হল 'সম্পূর্ণ অন্য কিছু', অটো (*Otto*)-র এই ধারণা মেনে নেওয়া চলে না। কেননা যা সম্পূর্ণ অন্য কিছু, তার সঙ্গে কোন সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়।

যেহেতু ধর্ম কোন অতীন্দ্রিয় সত্তার সঙ্গে ব্যক্তির ব্যক্তিগত সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার কথা ব্যক্ত করে, ধর্মের মধ্যে নিঃসন্দেহে অনুভূতির উপাদান রয়েছে, এবং এই অনুভূতিকে অভিনব আখ্যা দেওয়া যেতে পারে। কিন্তু এই অনুভূতি মূক বা অনির্বচনীয় অনুভূতি

হতে পারে না। এই অনুভূতিকে অবশ্যই সত্য, শিব ও সুন্দরের সঙ্গে যুক্ত করতে হবে। ধর্ম সম্বন্ধীয় অভিজ্ঞতা অ-বিচারবুদ্ধিসম্পর্কীয় এবং অ-নৈতিক হতে পারে না।

তৃতীয় অভিমতানুসারে ধর্মের ক্ষেত্রে তুলনামূলক পদ্ধতি বৈজ্ঞানিক এবং ব্যক্তি-নিরপেক্ষ হতে পারে। কিন্তু 'বৈজ্ঞানিক' পদটির ব্যাখ্যা দেওয়া প্রয়োজন।

তুলনামূলক পদ্ধতি বৈজ্ঞানিক হতে পারে

সংকীর্ণ অর্থে, 'বিজ্ঞান' কথাটি শুধুমাত্র প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য, যে প্রাকৃতিক বিজ্ঞান পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষণ পদ্ধতির ভিত্তিতে সামান্য নিয়ম (universal laws) প্রতিষ্ঠা করে। ব্যাপকতর অর্থে 'বিজ্ঞান' পদটি যে-কোন সুসংহত, সুবিন্যস্ত, তথ্যমূলক আলোচনার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। বলাবাহুল্য যে, ধর্ম সম্বন্ধীয় তথ্যের কোন পরীক্ষণমূলক অনুসন্ধান কায সম্ভব নয়। তুলনামূলক ধর্মের কাজ হল ব্যাখ্যামূলক এবং শুধুমাত্র তথ্য সংগ্রহণেই তার কাজ পরিসমাপ্ত হয় না। কাজেই তুলনামূলক ধর্মের পদ্ধতিকে যদি বৈজ্ঞানিক হতে হয়, তাহলে বৈজ্ঞানিক পদটিকে ব্যাপক অর্থে গ্রহণ করতে হবে, অর্থাৎ যে পদ্ধতি ধর্মের আলোচনাকে সুসংহত, সুবিন্যস্ত এবং তথ্যমূলক করে, সেই পদ্ধতিকে বুঝে নিতে হবে।

বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিকে ব্যাপক অর্থে গ্রহণ করতে হবে

রাইট (*Wright*) ধর্মের সংজ্ঞা নিরূপণ করতে গিয়ে বলেছেন যে, 'ধর্ম হল সমাজ-স্বীকৃত মূল্যের সংরক্ষণকে লাভ করার প্রচেষ্টা'। কিভাবে আলোচনার জন্য ধর্ম-গুলিকে পরস্পরের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে রাইটের মতে উপরিউক্ত সংজ্ঞার মাধ্যমে তার নির্দেশ পাওয়া যায়। (১) আমরা তাদের লক্ষ্যগুলিকে পরস্পরের সঙ্গে তুলনা করতে পারি, অর্থাৎ যে বিভিন্ন ধরনের সমাজ-স্বীকৃত মূল্যকে তারা সংরক্ষণ করতে চায়, সেগুলিকে পরীক্ষা করে দেখতে পারি। আদিম ধর্মগুলি নৈতিক ধর্ম-গুলি থেকে কিভাবে পৃথক, তা পরীক্ষা করে দেখা চলে। সব নৈতিক ধর্ম দৈনন্দিন জীবনের আচরণবিধি হিসেবে একই নৈতিক উপদেশের উপর গুরুত্ব আরোপ করে—সব নৈতিক ধর্মই সত্যবাদিতা, ক্ষমা, উদারতা, নম্রতা প্রভৃতির উপর গুরুত্ব আরোপ করে। কিন্তু জীবনের অর্থের ব্যাখ্যায় তাদের মধ্যে পার্থক্য দেখা যায়। এই সব উচ্চতর ধর্মের সর্বশ্রেষ্ঠ কল্যাণের স্বরূপ সম্পর্কে ধারণা কিন্তু এক নয়। এই প্রসঙ্গে বৌদ্ধধর্মের ও খ্রীষ্টধর্মের উল্লেখ করা যেতে পারে। (২) মূল্যের সংরক্ষণ—এই লক্ষ্যকে লাভ করার জন্য বিভিন্ন ধর্ম বিভিন্ন উপায় অবলম্বন করে। আমরা এই বিভিন্ন উপায়গুলিকে পরস্পরের সঙ্গে তুলনা করতে পারি। প্রতিটি ধর্মের তিনটি রীতি আছে—(i) প্রার্থনা ও উৎসর্গসহ এর ধর্মানুষ্ঠান,

রাইটের মন্তব্য

(ii) এই সব ধর্মানুষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা এবং কিভাবে তারা ক্রিয়া করে তার ব্যাখ্যার জন্য ধর্মমত, (iii) ধর্মানুষ্ঠানের জন্য এর আনুষ্ঠানিক সংগঠন। এইগুলির পারস্পরিক তুলনা করা চলে।

তবে রাইট মন্তব্য করেছেন যে ধর্মের সঙ্গে যুক্ত পৌরাণিক কাহিনী, ধর্মমত এবং ধর্মানুষ্ঠানের আলোচনাকেই তুলনামূলক ধর্ম মনে করা, ধর্মের রীতির এই সব বৈশিষ্ট্যের প্রকৃত তাৎপর্যকে অতিরঞ্জিত করে দেখানর সামিল।

উইজারি (*Widgery*) তুলনামূলক ধর্মের তিনটি পদ্ধতির কথা বলেছেন—(১) ধর্মগুলিকে সমগ্র হিসেবে, জীবনের নমুনা হিসেবে (as wholes, as types of life) তুলনা করা যেতে পারে, (২) ধর্মকে তদের ঐতিহাসিক ক্রমবিকাশের (historical development) দিক থেকে তুলনা করা যেতে পারে, (৩) ধর্মগুলিকে তাদের অঙ্গীভূত উপাদান (constituent elements)-এর দিক থকে তুলনা কবা যেতে পারে।

উইজারির অভিমত

যে তিনটি উপায়ের কথা উইজারি উল্লেখ করেছেন, ব্যবহারিক ধর্মীয় জীবনের পক্ষে সমগ্র হিসেবে তাদের তুলনাই গুরুত্বপূর্ণ। একটি ধর্মের সংক্ষিপ্ত অথচ পূর্ণ বিবরণের সঙ্গে, যার মাধ্যমে সেই ধর্মের একটা সাধারণ ধারণা কবা যায়, অন্য একটি ধর্মের সংক্ষিপ্ত অথচ পূর্ণ বিবরণের তুলনা করা যেতে পারে। এই ধরনের পদ্ধতি ব্যক্তিকে বিশেষ একটি ধর্মের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যগুলির সঙ্গে পরিচয় লাভ করতে সমর্থ করে, এবং বিভিন্ন পথগুলি সম্পর্কে যথার্থ দৃষ্টি গ্রহণ করার পক্ষে এই পদ্ধতি উপযোগী। এক্ষেত্রে এক ধরনের জীবনের মুখোমুখী আর এক ধরনের জীবনকে রাখা হয়, বাস্তবে যেভাবে তারা সম্পর্কযুক্ত। কোন ধর্মের সঙ্গে অন্য ধর্মের অনেক প্রয়োজনীয় বিষয়ে সাদৃশ্য দেখান যেতে পারে কিন্তু সমগ্র হিসেবে (as wholes) দেখলে ধর্মগুলিকে পৃথক বলে মনে হবে। কোন ধর্মের অনুপম বৈশিষ্ট্যকে বিচার করতে হলে অন্য ধর্মের সঙ্গে তার কোন্ কোন্ উপাদানের দিক থেকে সাদৃশ্য আছে তা আবিষ্কার করলে চলবে না; সেই ধর্মের উপর কোন বিশেষ ছাপ পড়েছে কিনা সেটা জানতে হবে। এই পদ্ধতি অনুসরণ করতে হলে বিভিন্ন ধর্মের উল্লেখযোগ্য দিকগুলিকে জানতে হবে। [1]এম্ এনেসাকি (*M. Anesaki*) বৌদ্ধধর্মের বৌদ্ধিক প্রকৃতির (intellectual character) সঙ্গে খ্রীষ্টধর্মের আবেগগত প্রকৃতির (emotional nature) বিস্তৃত তুলনা করেছেন।

ধর্মগুলিকে সমগ্র হিসেবে তুলনা করার প্রয়োজনীয়তা

1. A. B. Widgery: The Comparative Study of Religion; Page 15.
1. Hibbert Journal IV, 1905.

এই পদ্ধতির প্রয়োগের জন্য সেই ধর্মের বিশদ বিবরণ এবং ইতিহাসের নিবিড় জ্ঞানের প্রয়োজন। এর সফল প্রয়োগের জন্য ধর্মের অঙ্গীভূত উপাদানের জ্ঞান প্রয়োজন এবং যে ধর্মগুলির পারস্পরিক তুলনা করা হচ্ছে তাদের মূলতত্ত্বের সঙ্গে সহানুভূতিমূলক পরিচয়ও প্রয়োজন।

বিভিন্ন ধর্মকে তাদের নিজ নিজ ঐতিহাসিক ক্রমবিকাশের দিক থেকেও তুলনা করা যেতে পারে। তাত্ত্বিক আলোচনার জন্য অনেকে মনে করেন যে এইটিই সবচেয়ে মূল্যবান পদ্ধতি। একটি প্রচলিত ধর্মের গতি অতীতে কি ছিল এবং তার বর্তমান প্রবণতাগুলি কি? বিভিন্ন ধর্মের বিকাশ এবং ক্রিয়ার বিবর্তনের মধ্যে কি একই ধরনের অনুক্রম (sequence) দেখা যায়? সব ধর্মের বিবর্তন কি একই ভাবে ঘটেছে? যদি ঘটে থাকে তাহলে এই বিবর্তনের নীতিগুলি কি? এইসব প্রশ্নের আলোচনা করতে গেলে কোন ধর্মকে বিচ্ছিন্ন ভাবে অর্থাৎ অন্য ধর্ম থেকে স্বতন্ত্র করে নিয়ে আলোচনা করা চলে না।

ঐতিহাসিক ক্রমবিকাশের দিক থেকে তুলনা

তৃতীয় এবং সবচেয়ে সরল পদ্ধতি হল ধর্মের পৃথক উপাদানগুলির তুলনা। যেমন, কোন ধর্মের আচার অনুষ্ঠান, বিশ্বাস, আবেগ, অনুভূতির সঙ্গে অন্য ধর্মের অনুরূপ বিষয়গুলির তুলনা। অবশ্য প্রথমে যে পদ্ধতির কথা বলা হয়েছে তার সফলতার জন্যও এই পদ্ধতি অনিবার্যভাবে প্রয়োজন। কেননা বিশদ বিবরণের পারস্পরিক তুলনা না করলে সমগ্র হিসেবে ধর্মের তুলনা সার্থক হতে পারে না। বিভিন্ন ধর্মের বিভিন্ন উপাদানের মধ্যে পারস্পরিক তুলনা করতে গিয়ে লক্ষ্য রাখতে হবে যে ধর্মের সামগ্রিক রূপটি যেন বাদ পড়ে না যায়।

একবিংশ অধ্যায়

ধর্মীয় অভিজ্ঞতার উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য

(Main features of religious experience)

১। ধর্মীয় অভিজ্ঞতার প্রকৃতি (Nature of religious experience) :

আমরা ব্যক্তির ধর্মীয় অভিজ্ঞতাকে এক অনুপম বা অভিনব অভিজ্ঞতা বলে মনে করি। দৈনন্দিন জীবনের সাধারণ অভিজ্ঞতার সঙ্গে এই অভিজ্ঞতা তুলনীয় নয়। কিন্তু অনেকে মনে করেন যে ধর্মীয় অভিজ্ঞতা বাস্তব নয়। এর যথার্থ কোন অস্তিত্ব নেই।

ধর্মীয় অভিজ্ঞতা বলতে কি বোঝায়? [1]যোয়াকিম্ ওয়াচ্ (*Joachim Wach*) বলেন, "ধর্মীয় অভিজ্ঞতা হল মানব ও মানবমনের ঈশ্বরের সঙ্গে সংযোগের আভ্যন্তরীণ দিক।" ধর্মীয় অভিজ্ঞতার প্রকৃতিকে কেন্দ্র করে কয়েকটি অভিমত দেখতে পাওয়া যায়। প্রথম অভিমতানুসারে ধর্মীয় অভিজ্ঞতা বলে কিছু নেই। ধর্মীয় অভিজ্ঞতা নামে যা প্রচলিত তার যথার্থ কোন অস্তিত্ব নেই। ধর্মীয় অভিজ্ঞতা আসলে অলীক বস্তু। অনেক মনোবিজ্ঞানী, সমাজবিজ্ঞানী ও দার্শনিক উপরিউক্ত অভিমত পোষণ করেন। দ্বিতীয় অভিমতানুসারে অকৃত্রিম ধর্মীয় অভিজ্ঞতার অস্তিত্ব আছে কিন্তু একে স্বতন্ত্র করা চলে না, যেহেতু ব্যক্তির সাধারণ অভিজ্ঞতার সঙ্গে ধর্মীয় অভিজ্ঞতা অভিন্ন। ডিউই (*Dewey*), উইমেন (*Wieman*), এনি (*Aney*) এবং অন্যান্য ইউরোপীয় ও অ্যামেরিক্যান চিন্তাবিদগণ এইরূপ সিদ্ধান্ত করেছেন। তৃতীয় অভিমতানুসারে ধর্মের ঐতিহাসিক রূপের সঙ্গে ধর্মীয় অভিজ্ঞতা অভিন্ন, গোঁড়া ধর্মীয় সম্প্রদায়গুলির মধ্যে অনেকে এইরূপ সিদ্ধান্ত করেন। চতুর্থ অভিমতানুসারে যথার্থ ধর্মীয় অভিজ্ঞতার অস্তিত্ব আছে, এবং এই অভিজ্ঞতার প্রকাশকে জানা যায়। এই অভিমতানুসারে ধর্মীয় অভিজ্ঞতার কতকগুলি বৈশিষ্ট্য আছে। সেই বৈশিষ্ট্যের মাধ্যমে এই অভিজ্ঞতার স্বরূপটিকে জানা যেতে পারে।

ধর্মীয় অভিজ্ঞতার প্রকৃতি সম্পর্কে কয়েকটি অভিমত

---

1. "Religious experience then is the inner aspect of the intercourse of man and the human mind with God."

—Joachim Wach : The Comparative Study of Religion ; page 39.

পূর্বোক্ত অভিমতগুলি সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বলা যেতে পারে যে, যে অভিমত ধর্মীয় অভিজ্ঞতাকে অবাস্তব বা অলীক বলে অগ্রাহ্য করতে চায়, তা কোনমতেই গ্রহণযোগ্য নয়। যথার্থ ধর্মীয় অভিজ্ঞতা (genuine religious experience)-র বাস্তবতাকে অস্বীকার করা চলে না। যথার্থ ধর্মীয় অভিজ্ঞতা হল সার্বিক, দেশে কালে সীমাবদ্ধবদ্ধ নয়। হেনরী বার্গসোঁ বলেন, ধর্ম ছাড়া কখনও কোন সমাজের অস্তিত্ব ছিল না' (there has never been a society without religion) : বরং এমন কথা বলা যেতে পারে যে ধর্মীয় অভিজ্ঞতা ব্যক্তির প্রকৃতির অঙ্গীভূত। মেরেট (*Marett*) বলেন, "আমাদের সাধারণ মানব প্রকৃতি, আমি বিশ্বাস করি, ধর্মের স্থায়ী সম্ভাবনাকে অন্তর্ভুক্ত করে নেয়।" মানুষের ধর্মীয় বোধ তার মানসিক জীবনের এক অপরিবর্তনীয় ও সার্বিক বৈশিষ্ট্য (a constant and universal feature of his mental life)। পূর্বেই বলা হয়েছে যে, ধর্মীয় অভিজ্ঞতা ঈশ্বরের সঙ্গে মানুষের সংযোগের আভ্যন্তরীণ বা আন্তর দিক। পরমতত্ত্বের সঙ্গে মানুষের এই সংযোগের ক্ষেত্রে মানুষ এই সম্বন্ধের গভীরতার দিকটি নিজেই প্রত্যক্ষ করবে, নিজেই এই সম্বন্ধের অভিজ্ঞতা লাভ করবে। পরমতত্ত্ব মানুষের কাছে নিজেকে প্রকাশ করে, তবে এক ঘনিষ্ট আন্তরিক গভীর সম্পর্কের মধ্য দিয়েই তার প্রকাশ ঘটে। ধর্মীয় অভিজ্ঞতার প্রকাশ ঘটে এক বাস্তব বা মূর্ত পরিস্থিতিতে অর্থাৎ কিনা—কালিক, দৈশিক, ঐতিহাসিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, মনস্তাত্ত্বিক এবং সবশেষে এক ধর্মীয় পরিস্থিতিতে। তবে ধর্মীয় অভিজ্ঞতা যদিও কোন পরিস্থিতির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত, তবু যে পরিস্থিতিতে ঘটে, সেই পরিস্থিতি স্বতঃস্ফূর্ত, সৃজনমূলক এবং স্বাধীন।

সমালোচনা

২। ধর্মীয় অভিজ্ঞতার প্রধান বৈশিষ্ট্য (Main features of religious experience) :

ধর্মীয় অভিজ্ঞতার নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলি লক্ষ্য করা যায় :

(i) ধর্মীয় অভিজ্ঞতা সকল ক্ষেত্রেই পরমতত্ত্বের (ultimate reality) অভিজ্ঞতা। [1]যোয়াকিম্ ওয়াচ বলেন, "কাজেই আমরা বলতে পারি যা কিছু সীমিত তার অভিজ্ঞতা ধর্মীয় অভিজ্ঞতা হতে পারে না, তা হবে মিথ্যা ধর্মীয় অভিজ্ঞতা (pseudo religious experience)। যদিও ধর্মীয় অভিজ্ঞতা ব্যক্তি বিশেষের প্রতিক্রিয়া তবু এই অভিজ্ঞতা শুধুমাত্র মনোগত (subjective) নয়, বস্তুগতও বটে (objective)।

1. Joachim Wach : The Comparative Study of Religion ; Page 30.

ধর্মের সংজ্ঞা নির্ণয় করতে গিয়ে যদি বলা যায় যে পরমসত্তারূপে যার অভিজ্ঞতা হয়, ধর্ম তার প্রতি প্রতিক্রিয়া, তাহলে চারটি বিষয়কে এই অভিজ্ঞতার অন্তর্ভুক্ত মনে করা যেতে পারে। প্রথমতঃ, ধর্মীয় অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে যে চেতনা বা বোধ তার বিভিন্ন মাত্রা আছে, যেমন উপলব্ধি, ধারণা ইত্যাদি। দ্বিতীয়তঃ, এই প্রতিক্রিয়াকে মুখোমুখী সাক্ষাৎকারের (encounter) অংশরূপে গণ্য করা চলে। অকৃত্রিম ধর্মীয় অভিজ্ঞতাকে সব যুগের সকল যথার্থ ধর্মবিদ এইভাবেই গ্রহণ করেছেন। তৃতীয়তঃ, পরমতত্ত্বের অভিজ্ঞতা, অভিজ্ঞতা লাভকারী এবং যে বস্তুর অভিজ্ঞতা হয় উভয়ের মধ্যে এক গতীয় সম্বন্ধ (dynamic relationship) নির্দেশ করে। অকৃত্রিম ধর্মীয় অভিজ্ঞতাকে কখনও স্থির অপরিবর্তনীয়রূপে চিন্তা করা যায় না। ধর্মীয় অভিজ্ঞতার মধ্যে ধারাবাহিকতা বর্তমান, যদিও এর মধ্যে বিরামের বিষয়টিকে অস্বীকার করা যায় না। ধর্মীয় অভিজ্ঞতা সংযোগহীন রোমাঞ্চ বা শিহরণ নয়। চতুর্থতঃ, ধর্মীয় অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে পরিস্থিতিসম্বন্ধীয় বৈশিষ্ট্যকে উপেক্ষা করা চলে না, অর্থাৎ ধর্মীয় অভিজ্ঞতাকে তার বিশেষ পরিস্থিতিতে বুঝে নিতে হবে।

(ii) ধর্মীয় অভিজ্ঞতার দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হল ধর্ম সমগ্র সত্তার পরমতত্ত্বের প্রতি পরিপূর্ণ প্রতিক্রিয়া (total response of the total being to Ultimate Reality)। এর অর্থ হল ধর্মীয় অভিজ্ঞতার সঙ্গে এক অখণ্ড ব্যক্তিই (integral person) সম্পর্কযুক্ত। ব্যক্তির শুধুমাত্র মন, আবেগ বা ইচ্ছা নয়, ধর্মীয় অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে বৌদ্ধিক, আবেগগত ও ইচ্ছামূলক তিনটি উপাদানেরই একত্র উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। জীবনের আংশিক অভিজ্ঞতা, অর্থাৎ যে অভিজ্ঞতা খণ্ডিত বা মানুষের সত্তার কোন একটি মাত্র অংশের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত, তার সঙ্গে ধর্মীয় অভিজ্ঞতার পার্থক্য আছে। এই কারণেই দাবী করা যায় যে ধর্ম সমগ্র ব্যক্তি এবং সমগ্র মানুষের জীবনের সঙ্গেই সম্পর্কযুক্ত (with the whole man and with the whole of human life)।

(iii) ধর্মীয় অভিজ্ঞতার তৃতীয় উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল এর তীব্রতা (intensity)। টিলিক (*Tillich*) যথার্থই বলেছেন যে, দেবতারা হল এমন সত্তা যারা শক্তি এবং অর্থের দিক থেকে সাধারণ অভিজ্ঞতার রাজ্য অতিক্রম করে যায় এবং তাদের সঙ্গে মানুষের যে সম্পর্ক, সেই সম্পর্ক, তীব্রতা এবং তাৎপর্যের দিক থেকেও সাধারণ অভিজ্ঞতাকে অতিক্রম করে যায়। সর্বকালের ও সর্বযুগের ধর্মপ্রবণ ব্যক্তিরা তাদের চিন্তা, কথা ও কার্যের মধ্য দিয়ে এই তীব্রতাকে প্রকাশ করেছেন।

(iv) যথার্থ ধর্মীয় অভিজ্ঞতার অন্যতম উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল যে, এই অভিজ্ঞতা ক্রিয়ার মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয়। ধর্মীয় অভিজ্ঞতা প্রেষণা এবং ক্রিয়ার এক গুরুত্বপূর্ণ

উৎস। উইলিয়ম জেমস্ বলেন, 'আমাদের অনুশীলনই, এমন কি আমাদের কাছেও একমাত্র সুনিশ্চিত প্রমাণ যে আমরা যথার্থ খ্রীষ্টান।' ধর্মীয় অভিজ্ঞতা ক্রিয়াকর্মের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হবে কি হবে না সেটাই বড় কথা নয়, সৎ, উত্তম ক্রিয়ার মধ্য দিয়ে তার প্রকাশের বিষয়টিই গুরুত্বপূর্ণ। অবশ্য এক্ষেত্রে 'ক্রিয়া' (action) কথাটিকে ব্যাপক অর্থে গ্রহণ করতে হবে, শুধুমাত্র বাহ্য আচার অনুষ্ঠান পালনের সঙ্গে তাকে অভিন্ন করে দেখলে চলবে না বা ধ্যান ধারণা চিন্তার সঙ্গে তার বিরোধ আছে মনে করাও যুক্তিসঙ্গত হবে না। আসলে 'ক্রিয়াকে' জড় নিষ্ক্রিয়তা (sluggish inaction) বা ঔদাসীন্যের বিরোধী বলেই গ্রহণ করতে হবে। যোয়াকিম্ ওয়াচ (*Joachim Wach*) বলেন, "সব অতীন্দ্রিয় ধর্মই প্রশান্তি ধরনের তা নয়, আবার ধর্মের নামে সব ক্রিয়াই ঈশ্বর ভক্তির দ্বারা প্রেষিত নয়।"[1]

যোয়াকিম্ ওয়াচ্ মনে করেন যে, যথার্থ ধর্মীয় অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে উপরিউক্ত চারটি বৈশিষ্ট্যের একটি বা একাধিকের উপস্থিতিই যথেষ্ট নয়। চারটি বৈশিষ্ট্যেরই উপস্থিতি অনিবার্যভাবে প্রয়োজনীয়। এর অর্থ হল, ঈশ্বর-বর্জিত কোন ধর্মীয় অভিজ্ঞতার কথা বলা যেতে পারে না। মিথ্যা বা অবাস্তব ধর্মীয় অভিজ্ঞতা অনেক সময় যথার্থ ধর্মীয় অভিজ্ঞতার বৈশিষ্ট্যগুলি প্রকাশ করতে পারে। কিন্তু এই ধর্মীয় অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে ব্যক্তি কোন পরমতত্ত্বের সঙ্গে নিজের সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠা না করে, কোন সীমিত সত্তার সঙ্গে নিজের সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠা করে। যথার্থ ধর্মীয় অভিজ্ঞতা কোন বিশেষ স্থানকালে সীমাবদ্ধ নয়। এটি সার্বিক। যে কারণে হেনরী বার্গসোঁ (*Henri Bergson*) বলেন, "ধর্ম ছাড়া কোন সমাজের কখনও অস্তিত্ব ঘটেনি।"

(v) ধর্মীয় অভিজ্ঞতা হল অতীন্দ্রিয় অভিজ্ঞতা। আমরা ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে পার্থিব জগতের অভিজ্ঞতা লাভ করি কিন্তু ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে এই অভিজ্ঞতা লাভ করা যায় না। ধর্মের কেন্দ্রীয় বিষয়বস্তু ঈশ্বর বা পরমতত্ত্ব ইন্দ্রিয়ের দ্বারা অধিগম্য বিষয়বস্তু নয়।

(vi) ধর্মীয় অভিজ্ঞতা ব্যক্তির নিজস্ব অভিজ্ঞতা। ধর্মীয় অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে এই 'অভিজ্ঞতা একান্তভাবে আমার' এই বোধ থাকে। একই সময়ে একাধিক ব্যক্তি জাগতিক বস্তু পর্যবেক্ষণ করে তার অভিজ্ঞতা লাভ করতে পারে। কিন্তু একই ধর্মীয় অভিজ্ঞতার অংশীদার অপরকে করা যায় না। (vii) অনেকের মতে ধর্মীয় অভিজ্ঞতা এক অনির্বচনীয় অভিজ্ঞতা যে অভিজ্ঞতার পরিপূর্ণ স্বরূপ ভাষায় ব্যাখ্যা করা যায় না।

(viii) ধর্মীয় অভিজ্ঞতার প্রকাশের ধরনটি ব্যক্তি ভেদে পৃথক হতে পারে। সব ধর্মীয় অভিজ্ঞতাই একইভাবে নিজেকে প্রকাশ করে না। আবার কোন কোন ক্ষেত্রে এই প্রকাশের বিষয়টি বাহ্যতঃ পরিদৃশ্যমান হয় না।

1. "Not all mystical religion is of the quietist type, not all action in the name of religion is motivated solely by devotion."—Joachim Wach.

দ্বাবিংশ অধ্যায়

প্রচলিত ধর্মবিশ্বাসের মূলতত্ত্ব

(Fundamentals of Living Faith)

১। হিন্দুধর্ম (Hinduism) ঃ

(i) **হিন্দুধর্মের উৎপত্তি ঃ** এই বিশ্বজগতের মহান ধর্মগুলির মধ্যে হিন্দুধর্ম অন্যতম। সুদীর্ঘকাল ধরে ভারতবর্ষ হিন্দুধর্মের উৎসভূমি। কত বৎসর পূর্বে হিন্দু-ধর্মের উদ্ভব ঘটেছিল সেই সম্পর্কে মতবিভেদ আছে। কিন্তু হিন্দুধর্মের উদ্ভব যে বেশ কয়েক সহস্র বৎসর পূর্বে ঘটেছে এবং হিন্দুধর্ম পৃথিবীর অন্যান্য প্রধান ধর্মমতগুলির মধ্যে যে অন্যতম সেই বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

প্রাচীনকালে হিন্দুধর্ম আর্যধর্ম নামে পরিচিত ছিল এবং এর অনুগামীদের আর্য বলা হত। আর্যগণ ভারতে এসে প্রথমে সপ্তসিন্ধু প্রদেশে বাস করেন। পারসিকগণ সপ্তসিন্ধুকে বলতেন 'হপ্তহিন্দু'। তাঁরা 'স'-কে 'হ' উচ্চারণ করতেন। তাঁদের এই 'হপ্তহিন্দু' থেকে ভারতীয় আর্যদের নাম হয় হিন্দু—কাজেই হিন্দু নাম পারসিকদের দেওয়া। বেদ, স্মৃতি, পুরাণে হিন্দু শব্দ ব্যবহৃত হয় নি। তারপর সপ্তসিন্ধু থেকে আর্যরা ক্রমশঃ উত্তর ভারতে ছড়িয়ে পড়ে, যাকে তখন আর্যাবর্ত নামে অভিহিত করা হত। কালক্রমে তারা বিন্ধ্যপর্বত অতিক্রম করে এবং দক্ষিণ ভারতে তাদের ধর্মের প্রসার ঘটে। পরে এই আর্যদেরই হিন্দু নামে অভিহিত করা হয়। হিন্দুধর্ম থেকেই তাদের ঐতিহ্যময় ও গৌরবময় সংস্কৃতির উদ্ভব।

হিন্দুধর্ম পূর্বে ছিল আর্যধর্ম

কালক্রমে হিন্দুধর্ম থেকে দুটি বৃহৎ ধর্মের উদ্ভব ঘটে, জৈনধর্ম এবং বৌদ্ধধর্ম। ক্রমশঃ ভারতের বাইরে হিন্দুধর্মের ও বৌদ্ধধর্মের প্রসার ঘটতে থাকে। হিন্দুরা বল প্রয়োগ করে কখনও তাদের ধর্ম অপরের উপরে চাপিয়ে দেয় নি। শান্তি, প্রেম, সহানুভূতি ও সেবাই হিন্দুধর্মের মূলমন্ত্র। কালক্রমে এই হিন্দুধর্মের মধ্যেই বৈষ্ণব, শাক্ত, শৈব, গাণপত্য প্রভৃতি বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায়ের উদ্ভব ঘটে। তাছাড়া জৈনধর্ম, বৌদ্ধধর্ম, শৈবধর্ম, আর্যসমাজ, ব্রাহ্মসমাজ ইত্যাদি হিন্দুধর্ম থেকেই উদ্ভূত।

হিন্দুধর্ম থেকে দুটি বৃহৎ ধর্মের উদ্ভব

(ii) **হিন্দুধর্মে 'ধর্ম' শব্দের তাৎপর্য ঃ** হিন্দুধর্ম শুধুমাত্র কোন ধর্মমতে বিশ্বাস এবং তার সঙ্গে যুক্ত পূজা, প্রার্থনা, আচার-অনুষ্ঠান মাত্র বোঝায় না। ইংরেজী 'religion' শব্দ এবং সংস্কৃত 'ধর্ম' শব্দ ঠিক একার্থবোধক শব্দ নয়। ইংরেজী 'religion'

শব্দটি দুটি মূল ল্যাটিন শব্দের সংযোগে উদ্ভূত। 'Re' শব্দের অর্থ পশ্চাৎ এবং 'ligare' শব্দের অর্থ নিয়ে যাওয়া। এই পরিদৃশ্যমান জগতের অন্তরালে যা নিয়ে যায় অর্থাৎ ঈশ্বরের অভিমুখে যা জীবকে নিয়ে যায় তাই হল 'religion'। হিন্দুধর্মে ধর্ম কথাটির গভীরতর তাৎপর্য আছে। ধৃ+মন্ প্রত্যয়= ধর্ম। ধৃ ধাতু থেকেই ধর্ম শব্দের উৎপত্তি। ধৃ ধাতুর অর্থ ধারণ করা। ধর্ম বলতে বোঝায় যা কোন কিছুর অস্তিত্বকে ধারণ করে থাকে (holds up the existence of a thing)। মহর্ষি পতঞ্জলি যোগদর্শনে ধর্মের আর এক সংজ্ঞা নির্ধারণ করেছেন। 'যোগ্যতাবচ্ছিন্না ধর্মিনঃ শক্তিরেব ধর্ম।' যোগ্যতাবিশিষ্ট ধর্মীয় বা পদার্থের কার্যসাধিকা শক্তিই ধর্ম। এই সংজ্ঞাটি তাৎপর্যপূর্ণ। কেননা ধর্ম শব্দের ধাতুগত অর্থের সঙ্গে এর যথেষ্ট সামঞ্জস্য আছে। যা ধারণ করে তাই ধর্ম। কে ধারণ করে? শক্তিই ধারণ করে। বিশ্বজগতে প্রত্যেক পদার্থের অস্তিত্ব রক্ষা করে তার অন্তর্নিহিত শক্তি।

ধর্ম অর্থে যা কোনকিছুর অস্তিত্বকে ধারণ করে

প্রশ্ন হল, কার উপর কোন কিছুর অস্তিত্ব বিশেষভাবে নির্ভর করে? এর উত্তরে বলা যেতে পারে, এটি হল বস্তুর অনিবার্য প্রকৃতি (essential nature)। কাজেই বস্তুর অবশ্য প্রয়োজনীয় প্রকৃতিই হল তার ধর্ম, সেরূপ মানুষেরও ধর্ম আছে যা তার অস্তিত্বকে ধারণ করে আছে। এই মানবধর্ম হল ঐশ্বরিক হওয়ার ক্ষমতা, মানুষের দেবত্বলাভের শক্তি। কিন্তু তা কি ভাবে সম্ভব? সম্ভব, যেহেতু ঐশ্বরিকতা (divinity) মানুষের মধ্যে সুপ্ত বা প্রচ্ছন্ন হয়ে আছে। হিন্দুধর্মমতে ঈশ্বর সর্বত্র বিরাজমান। ঈশ্বর আমাদের অন্তরে অধিষ্ঠিত। কাজেই ঐশ্বরিকতা মানুষের মধ্যে প্রচ্ছন্ন। ঈর্ষা, লোভ, মোহ, ক্রোধ, ঘৃণা, অহংকার, স্বার্থপরতা প্রভৃতি মানুষের এই ঐশ্বরিকতাকে ঢেকে রাখে। তখন মানুষ পশুর সমান। কিন্তু মানুষ নিজের প্রচেষ্টায় এই সব রিপুকে দমন করে মনকে সুস্থ ও পবিত্র করে তুলতে সমর্থ হয় এবং যে ঐশ্বরিকতা তার মধ্যে প্রচ্ছন্ন তাকে প্রকট করে তুলতে পারে। অবশ্য হিন্দুধর্মমতে এই প্রচেষ্টা এক কঠিন সাধনা। এই প্রচেষ্টা সার্থক হলেই মানুষের ঈশ্বর সাক্ষাৎকার ঘটে। তখনই মানুষের ঐশ্বরিকতা তার মধ্যে পূর্ণভাবে প্রকাশিত হয়। অবশ্য বিভিন্ন সত্যদ্রষ্টা এই সাধনার বিভিন্ন মার্গের কথা বলেছেন, কিন্তু সকলেরই লক্ষ্য এক—মানুষের ঐশ্বরিকতাকে প্রকট করে তোলা, মানুষকে আত্মোপলব্ধিলাভে, মোক্ষলাভে প্রণোদিত করা। হিন্দুরা ধর্মকে এই আলোকেই দেখে এসেছেন। বস্তুতঃ মানুষ তখনই ধর্মকে অর্থাৎ তার স্বরূপগত বৈশিষ্ট্যকে লাভ করে, কেবলমাত্র যখন ঈশ্বর তার মধ্যে পরিপূর্ণভাবে নিজেকে প্রকাশ করে।

মানুষের দেবত্বলাভের শক্তিই তার ধর্ম

(iii) **হিন্দুধর্মের সংজ্ঞা:** হিন্দুধর্মের কোন সংজ্ঞা নিরূপণ করা খুবই কঠিন কাজ। এর কারণ এই নয় যে, এই ধর্ম খুবই অমূর্ত বা রহস্যময়। এর কারণ হল, এই ধর্ম খুবই ব্যাপক এবং এক হিসেবে এর পরিসর হল সার্বভৌম। কোন সুনির্দিষ্ট একটিমাত্র বিশেষ চিন্তাধারার পরিণতি হিন্দুধর্ম নয়। কোন একজন মাত্র নির্দিষ্ট ধর্মপ্রবর্তক, বা ঈশ্বরের অবতার, বা মুনি, ঋষি বা ধর্মসংস্কারকের সুমহান বাণীর উপরই এই ধর্ম প্রতিষ্ঠিত নয়। কোন মানববিশেষ হিন্দুধর্ম প্রবর্তন করেনি। অপরপক্ষে প্রাচীন যুগের, মধ্যযুগের এবং আধুনিক যুগের একাধিক ভারতীয় মুনি-ঋষি, সত্যদ্রষ্টা, আচার্য এবং ভক্তের বিচিত্র ধর্মসম্বন্ধীয় নৈতিক অভিজ্ঞতা এবং শিক্ষা ও উপদেশের উপর এই ধর্ম প্রতিষ্ঠিত। ঐতিহাসিক দিক থেকে এই ধর্মের মূল নিহিত আছে—উপনিষদসহ চারটি বেদে—শ্রুতিতে; মনু, যাজ্ঞবল্ক, পরাশর প্রভৃতির ধর্মশাস্ত্রে অর্থাৎ স্মৃতিতে; পুরাণে এবং উপপুরাণে, ভগবদ্গীতাসহ রামায়ণ ও মহাভারতে; শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দ, জ্যোতিষ এই ছটি বেদাঙ্গে এবং ছ'টি বেদোপাঙ্গে অর্থাৎ ভারতীয় ষড়দর্শনে, তাদের টীকায় এবং ভাষ্যে। হিন্দুধর্মের উৎপত্তিকাল অনির্দিষ্ট। হিন্দুধর্মের অপর নাম সনাতন ধর্ম, বৈদিক ধর্ম। 'শাশ্বত সত্য সম্বলিত এবং সৃষ্টির প্রাক্কাল থেকে বিদ্যমান বলে' এর নাম সনাতন ধর্ম এবং বেদ এই ধর্মের মূল বলে এর নাম বৈদিক ধর্ম।

হিন্দুধর্মের সংজ্ঞা নিরূপণ কঠিন কাজ নয়

হিন্দুধর্মের প্রবর্তক মানববিশেষ নয়

হিন্দুধর্মের উৎস

যে ধর্মের উৎস এত বিচিত্র ও জটিল, খুবই স্বাভাবিক যে সেই ধর্ম জটিল ও বিচিত্র হবে। কাজেই হিন্দুধর্ম বলতে আমরা কোন একমাত্র বিশেষ ধরনের ধর্মসম্বন্ধীয় অভিজ্ঞতাকে বুঝব না। এই ধর্ম ধর্মের লক্ষ্যকে লাভ করার জন্য কোন একটিমাত্র পথের নির্দেশ করে না। এই ধর্মে বিভিন্ন মুনি-ঋষির বিভিন্ন সময়ের বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গির, বিভিন্ন ধর্ম সম্বন্ধীয় অভিজ্ঞতার একত্র সংযোজন লক্ষ্য করা যায়। বস্তুতঃ, হিন্দুধর্ম হল এমন একটি ধর্ম যে ধর্মে বিভিন্ন ধরনের ধর্মীয় অভিজ্ঞতার এক সুসমন্বিত রূপ লাভ করা যায়। এক একটি ধর্মীয় অভিজ্ঞতা আবার এক একটি পৃথক ধর্মের উৎস হতে পারে। সেই কারণে একই হিন্দুধর্মে বাহ্যত বহু ধর্মের একত্র উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। যেহেতু মূল ধর্মীয় অভিজ্ঞতাগুলি পরস্পর বিরোধী না হয়ে পরস্পরের পরিপূরক হয়েছে, সেই কারণে একই হিন্দুধর্মের মধ্যে শৈবধর্ম, শাক্তধর্ম, বৈষ্ণবধর্মের একত্র উপস্থিতি ও প্রসার দেখা যায়। এই সব দেখে এমন কথা বলা অত্যুক্তি হবে না যে, হিন্দুধর্ম বহু ধর্মের সমন্বয় বা এক বিশ্বজনীন ধর্ম।

হিন্দুধর্মে বহু দৃষ্টিভঙ্গির সমন্বয়

হিন্দুধর্মে বহু ধর্মের সমন্বয়

স্বামী শ্রীবিষ্ণু শিবানন্দ গিরি তাঁর রচিত 'হিন্দুধর্ম প্রবেশিকা' গ্রন্থে হিন্দুধর্মের একাধিক সংজ্ঞার কথা উল্লেখ করেছেন। কয়েকটি সংজ্ঞা উদ্ধৃত করা হল। "ভারতে উদ্ভূত কোন ধর্মে যিনি বিশ্বাস করেন তিনিই হিন্দু।" 'সিন্ধুনদ থেকে সাগর পর্যন্ত সুবিস্তৃত ভারতভূমিকে যিনি পিতৃভূমি ও পুণ্যভূমি বলে স্বীকার করেন তিনিই হিন্দু।' 'হিংসায় যার চিত্ত ব্যথিত হয়, তিনিই হিন্দু।' নিঃসন্দেহে এই সব সংজ্ঞা অত্যন্ত ব্যাপক। "যিনি বর্ণাশ্রম ব্যবস্থায় নিষ্ঠাবান —গোবৎস, বেদকে মাতৃতুল্য জ্ঞান করেন, দেবমূর্তির অবজ্ঞা করেন না, সকল ধর্মকে সমাদর করেন, পুনর্জন্মে বিশ্বাসী, মুক্তিপ্রয়াসী এবং সর্ব জীবকে আত্মবৎ মনে করেন, তিনিই হিন্দু।" এই সংজ্ঞা নিঃসন্দেহে সংকীর্ণতা দোষে দুষ্ট, কেননা বর্ণাশ্রম ধর্মে বিশ্বাস না করলে তাকে হিন্দু বলা যাবে না, এটা যুক্তিসঙ্গত নয়,"। "বেদে স্ব-প্রমিত ও স্বতঃসিদ্ধ সত্যরাজি নিহিত, এই কথা যিনি বিশ্বাস করেন তিনিই হিন্দু।" শ্রীগিরি এই পরিভাষাটিকেই স্পষ্ট ও সমীচীন বলে আখ্যাত করেছেন। কিন্তু এটিকেও হিন্দুর সন্তোষজনক সংজ্ঞা বলে গণ্য করা যায় না।

হিন্দু ধর্মের সংজ্ঞা

[1]এম্ ভেঙ্কট রত্নম্ (*M. Venkata Ratnam*) হিন্দুধর্ম সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন যে, হিন্দুধর্মে বহু ধর্মের সমন্বয়, যেমন শৈবধর্ম, ব্রাহ্মণ্যধর্ম, বহুদেববাদ, একেশ্বরবাদ, পৌত্তলিকতা, বৃক্ষ উপাসনা প্রভৃতি। সেই কারণে হিন্দু-ধর্মের সংজ্ঞা নির্দেশ করা কঠিন। তবু হিন্দু-ধর্মের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে তিনি বলেন, "যে সব ব্যক্তি ইসলাম, জৈন, বৌদ্ধ, খ্রীষ্টান, পার্শী, ইহুদী বা জগতের অন্য পরিচিত যে সব ধর্ম তার অন্তর্ভুক্ত নয় এবং যাদের উপাসনার রূপ একেশ্বরবাদ থেকে ফেটিশবাদ পর্যন্ত প্রসারিত এবং যার ধর্মতত্ত্ব সম্পূর্ণভাবে সংস্কৃত ভাষায় লিখিত, তাদের হিন্দুরূপে এবং তাদের অবলম্বিত ধর্মকে হিন্দুধর্ম রূপে গণ্য করা হবে।"

হিন্দু ধর্মের অপর একটি সংজ্ঞা

কিন্তু হিন্দু ধর্মের এই সংজ্ঞাকেও সন্তোষজনক সংজ্ঞা বলে অভিহিত করা যায় না। এই সংজ্ঞার অংশ বিশেষ নঞর্থক, সেইহেতু সমর্থনযোগ্য নয়। আসলে শ্রীযুক্ত গোবিন্দ দাস মহাশয় তাঁর 'Hinduism' গ্রন্থে যে কথা বলেছেন তা খুবই প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেছেন 'হিন্দু-ধর্মের কোন সংজ্ঞা দেওয়া সম্ভব নয়, কারণ হিন্দু-ধর্ম পরিপূর্ণ ভাবে অনির্দিষ্ট।[2] আমরা হিন্দু ধর্মের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য আলোচনা করে হিন্দু ধর্মের স্বরূপকে বুঝে নেবার চেষ্টা করব।

হিন্দুধর্ম অনির্দিষ্ট

1. As Essav on Islam: Chapter on Hinduism.
2. "No definitlon is possible, for the very good reason that Hinduism is absolutely indefinite". —Govinda Das: Hinduism; Page 45.

(iv) **হিন্দুধর্মের স্বরূপ ঃ** ধর্মের দুটি দিক—তত্ত্ব এবং সাধনা। হিন্দুধর্ম শুধু তত্ত্ব আলোচনা করেনি, তত্ত্বের ভিত্তিতে সাধনার দ্বারা তত্ত্বের উপলব্ধির উপর গুরুত্ব আরোপ করেছে। হিন্দুধর্ম সাধনার উপর অত্যন্ত গুরুত্ব আরোপ করেছে। একমাত্র প্রত্যক্ষানুভূতিতেই ঈশ্বরকে জানা যায়, তার জন্য প্রয়োজন কঠোর সাধনা।

হিন্দুধর্ম দু' প্রকার—সামান্য ও বিশেষ। এখানে ধর্ম বলতে শাস্ত্রবিহিত কর্তব্য কর্মকে বোঝাচ্ছে। নীতিসম্মত যে সব আচরণ মানুষের করণীয় সেইগুলি সামান্য ধর্ম। হিন্দুধর্মমতে এই সামান্য ধর্মের দশটি সাধারণ লক্ষণ—ধৃতি, ক্ষমা, দম বা শীত, তাপ, সহিষ্ণুতা, অস্তেয় বা চুরি না করা, শৌচ বা দেহমনের নির্মলতা, ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ, ধী, বিদ্যা, সত্য এবং অক্রোধ। এই সব কর্ম সম্পাদনে চিত্তশুদ্ধি ঘটে। বিশেষ বিশেষ কালে বিশেষ বিশেষ মানুষের যে সব নীতিসম্মত করণীয় কর্ম সেগুলি হল বিশেষ ধর্ম।

হিন্দুধর্ম মতে ধর্ম সম্পর্কে সংশয় দেখা দিলে বেদ, স্মৃতি, সাধুগণের আচার ব্যবহার এবং বিবেকের অনুমোদনের উপরই নির্ভর করা যুক্তিযুক্ত।

হিন্দুধর্মে দুটি পথ—প্রবৃত্তিমার্গ ও নিবৃত্তিমার্গ। প্রথমটি ভোগের, দ্বিতীয়টি ত্যাগের পথ। মানবজীবনের লক্ষ্য সম্বন্ধে হিন্দুধর্ম প্রবৃত্তিমার্গে তিনটি লক্ষ্য এবং নিবৃত্তিমার্গে একটি লক্ষ্য নিরূপণ করেছেন। প্রবৃত্তিমার্গে—ধর্ম, অর্থ, কাম এবং নিবৃত্তি-মার্গে মোক্ষ। গৃহস্থাশ্রম প্রবৃত্তিমার্গ। বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস আশ্রম নিবৃত্তিমার্গ। গৃহীর পুরুষার্থ ধর্ম, অর্থ ও কাম এবং সন্ন্যাসীর পুরুষার্থ মোক্ষ। হিন্দুধর্মের চরম লক্ষ্য মোক্ষ। হিন্দুধর্মে সুখই মানবজীবনের চরম লক্ষ্য নয়।

(v) **হিন্দু ধর্মগ্রন্থ ঃ** প্রত্যেক ধর্মেরই নিজস্ব ধর্মগ্রন্থ আছে, ধর্মগ্রন্থের অপর নাম শাস্ত্র। অন্য ধর্মের তুলনায় হিন্দু শাস্ত্রের সংখ্যা অনেক বেশী। তার কারণ হিন্দু-ধর্ম অত্যন্ত প্রাচীন। তাছাড়া বিভিন্ন শ্রেণীর লোকের কাছে ধর্মের ব্যাখ্যার জন্যও বিভিন্ন ধরনের শাস্ত্রের উদ্ভব ঘটেছে। ঈশ্বরের স্বরূপ, জীবের সঙ্গে ঈশ্বরের সম্পর্ক, ঈশ্বর প্রাপ্তির উপায় প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয় শাস্ত্র থেকেই জানা যায়। হিন্দু শাস্ত্রের সংখ্যা অনেক হওয়াতে বিভিন্ন সত্যদ্রষ্টা, ঋষি ঈশ্বরপ্রাপ্তির বিভিন্ন উপায়ের কথা বলেছেন। প্রত্যেক ধর্মে একাধিক ধর্মগ্রন্থ বা শাস্ত্র থাকলেও তার মধ্যে একখানা সিদ্ধশাস্ত্র থাকে। হিন্দুধর্মের সিদ্ধশাস্ত্র হল বেদ। বৈদিক যুগের হিন্দু ঋষিগণ বেদকে ভিত্তি করে যুগপোযোগী কতক-গুলি শাস্ত্র রচনা করেন। যেমন স্মৃতিসংহিতা, ইতিহাস, পুরাণ, আগম এবং ষড়-দর্শন। এগুলি উল্লেখযোগ্য হিন্দুধর্মগ্রন্থ।

বেদ হিন্দুধর্মের সিদ্ধশাস্ত্র

বেদ হিন্দুদের সিদ্ধশাস্ত্র। হিন্দুধর্মের বিভিন্ন গ্রন্থের মধ্যে বেদের স্থান খুবই

গুরুত্বপূর্ণ। সংস্কৃত 'বিদ্' ধাতু থেকে বেদ পদটি নিষ্পন্ন। বিদ্+ ঘঙ=বেদ। বিদ্ মানে জানা (to know), তাই বেদ শব্দের ধাতুগত অর্থ জ্ঞান বা বিদ্যা। বেদ অপৌরুষেয়, বেদ কোন পুরুষের চিন্তাপ্রসূত নয়। বেদ অনাদি ও অনন্ত, কালাদির দ্বারা পরিচ্ছিন্ন নয়। বেদের অপর নাম শ্রুতি, কারণ পরমেশ্বরের বাণী সর্ব প্রথম ঋষিগণ অলৌকিক যোগশক্তির সাহায্যে শুনতে পান। বেদকে শ্রুতি বলার অন্য কারণ বেদের সত্যগুলি গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ না হয়ে গুরুশিষ্য পরম্পর শ্রুত হয়ে মানব সমাজে প্রচলিত হয়। বৈদিক যুগে ব্রহ্মচর্যাশ্রমে বেদের সংহিতা-ভাগ কণ্ঠস্থ করার রীতি ছিল। বেদ অপৌরুষেয়। বৈদিক ঋষিদের অন্তঃর্দৃষ্টিতে যে পরম সত্য উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছিল; সেইগুলিই বেদে প্রকাশিত হয়। বেদ সংখ্যায় চারটি—ঋক্‌বেদ, সামবেদ, যজুর্বেদ ও অথর্ববেদ। ঋষি কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন বেদব্যাস বেদের এই বিভাগ কর্তা। প্রত্যেক বেদের দুটি অংশ—সংহিতা এবং ব্রাহ্মণ। সংহিতায় আছে মন্ত্র এবং ব্রাহ্মণে রয়েছে তার অর্থ এবং ব্যবহার। 'সংহিতার' অর্থ যে অংশে মন্ত্রগুলি সংহিত বা একত্রিত হয়েছে। প্রাচীন কালে হিন্দুরা মূর্তির মধ্য দিয়ে দেব দেবতার পূজা করত না, তারা মন্ত্রপাঠ করত এবং সম্পাদন করত। বেদের ব্রাহ্মণ অংশে এই বিভিন্ন ধরনের যজ্ঞের বর্ণনা পাওয়া যায়। তাছাড়া এই অংশে উপাসনা ও ব্রহ্মবিদ্যা সন্নিবিষ্ট হয়েছে। ব্রাহ্মণের অংশবিশেষ হল আরণ্যক। আরণ্যক বানপ্রস্থাশ্রমে অরণ্যবাসীদের পাঠ্য ছিল। ধ্যান উপাসনাই অরণ্যবাসীদের মুখ্য কর্ম ছিল। যাগযজ্ঞ ছিল গৃহস্থাশ্রমে গৃহীদের প্রধান ধর্মকর্ম।

বেদের পরিচয়

বেদকে শ্রুতি বলার বিভিন্ন কারণ

বেদ সংখ্যায় চারটি

বেদের অংশ বিশেষ উপনিষদে ব্রহ্মবিদ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে ব্যাখ্যাত হয়েছে। উপ ও নি পূর্বক 'সদ্' ধাতুর উত্তর ক্বিপ প্রত্যয় যোগে উপনিষদ। সদ্ ধাতুর অর্থ প্রাপ্তি বা বিনাশ। 'উপ' এই উপসর্গটির দ্বারা সমীপবর্তিতা বোঝায়। 'যা মানুষকে ব্রহ্মের সমীপবর্তী করে' তাকে উপনিষদ বলা হয়। এটি উপনিষদ শব্দের মুখ্যার্থ; যে গ্রন্থপাঠে ব্রহ্মবিদ্যা লাভ করা যায়, তাকেও উপনিষদ বলা হয়। এটি উপনিষদ শব্দের গৌণার্থ, উপনিষদ পাঠে মোহের নাশ ঘটে। বেদের অন্তর্নিহিত তাৎপর্য উপনিষদেই প্রকাশিত। সেই কারণে উপনিষদকে বেদোপনিষদ্ নামে অভিহিত করা হয়। 'বেদান্তো নাম উপনিষৎ।' বেদান্ত শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হচ্ছে 'বেদের অন্ত বা শেষ।' উপনিষদই বেদান্ত, উপনিষদ বেদের সর্বশেষ অংশ। ব্রহ্মবিদ্যা বেদের সারাংশ, সেকারণেও এর নাম বেদান্ত। উপনিষদ সংখ্যায় অনেক।

উপনিষদের পরিচয়

উপনিষদই বেদান্ত

বর্তমানে ১১২ খানি উপনিষদের নাম জানা গেছে। এগুলির মধ্যে বৃহদারণ্যক, শ্বেতাশ্বতরো, ছান্দোগ্য, ঐতরেয়, তৈত্তিরীয়, ঈশ, কেন, কঠ, প্রশ্ন, মণ্ডুক ও মাণ্ডুক্য—এই কয়খানা উপনিষদ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। উপনিষদকেই সাধারণতঃ বেদান্ত দর্শনের ভিত্তি বলে মনে করা হয়। কিন্তু উপনিষদই একমাত্র ভিত্তি নয়। উপনিষদ, ভগবদ্গীতা এবং ব্রহ্মসূত্র ও তার ভাষ্য বিবৃতি—এই তিনটিই বেদান্ত দর্শনের ভিত্তি। এদের একত্রে প্রস্থানত্রয় বলে।

বেদের মর্ম যথার্থভাবে উপলব্ধি করার জন্য বেদের ছখানা অবয়বগ্রন্থ অধ্যয়নের প্রয়োজন আছে। এই অবয়ব গ্রন্থগুলিকে বলা হয় বেদাঙ্গ। এগুলি হল শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দ ও জ্যোতিষ। এই গ্রন্থগুলি সূত্রাকারে রচিত। শিক্ষা ও ব্যাকরণের রচয়িতা পাণিনি, ছন্দের রচয়িতা পিঙ্গলাচার্য, নিরুক্তের যাস্ক, জ্যোতিষের গর্গ এবং কল্পের রচয়িতা বিভিন্ন ঋষিগণ। শিক্ষাসূত্রে বর্ণের বিশুদ্ধ উচ্চারণ সম্পর্কে নিয়ম নিবদ্ধ হয়েছে। ব্যাকরণ সূত্র হল শব্দ ব্যুৎপাদক শাস্ত্র। এতে পদ সাধনাদির নিয়ম আছে। নিরুক্তে বৈদিক শব্দের যোগার্থ নিরূপিত হয়েছে। ছন্দতে 'বৈদিক পদ্য বন্ধের নিয়মাবলী বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে বিশ্লেষিত' হয়েছে। জ্যোতিষে গ্রহনক্ষত্রাদির স্থান ও গতি আলোচিত হয়েছে। কল্পসূত্র—শ্রৌতসূত্র, ধর্মসূত্র, ও গৃহ্যসূত্র—এই তিনের সমষ্টি। শ্রৌতসূত্রে শ্রৌত অর্থাৎ বৈদিক যাগযজ্ঞাদির অনুষ্ঠান পদ্ধতি বর্ণনা করা হয়েছে। ধর্মসূত্রে প্রত্যেক ব্যক্তির সমাজের ও দেশের প্রতি কর্তব্যকর্ম নিরূপিত হয়েছে। গৃহ্যসূত্রে প্রত্যেক গৃহীর 'পিতা পুত্র ভ্রাতা স্বামী-রূপে স্বপরিবারভুক্ত অপর সকলের প্রতি কর্তব্যকর্ম বিশদভাবে বিধিবদ্ধ হয়েছে'।

বেদাঙ্গের পরিচয়

বেদাঙ্গের আলোচ্য বিষয়

মূল চারটি বেদ ছাড়া চারটি উপবেদ আছে। আয়ুর্বেদ, ধনুর্বেদ, গন্ধর্ববেদ ও স্থাপত্যবেদ। আয়ুর্বেদ হল ভেষজশাস্ত্র, ধনুর্বেদ হল অস্ত্রবিদ্যা, গন্ধর্ববেদ হল সঙ্গীতবিদ্যা আর স্থাপত্যবেদ হল কৃষিবিদ্যা। মূল বেদের সহকারী গ্রন্থ বলে এদের উপবেদ নামে অভিহিত করা হয়। মানব সমাজের সুষ্ঠু পরিচালনার উদ্দেশ্যে প্রাচীন ঋষিগণ মানব ও মানব সমাজের কল্যাণের কথা চিন্তা করে, এবং মানবের হিতের জন্য এই সব লৌকিক বিদ্যার প্রয়োজন আছে মনে করে এই সব উপবেদ রচনা করেছিলেন।

উপবেদের পরিচয়

উপবেদ বেদের সহকারী গ্রন্থ

এর পরে হিন্দুধর্মের গ্রন্থ হিসেবে স্মৃতি সংহিতার উল্লেখ করা যেতে পারে। স্মৃতি পাঠে হিন্দু জানতে পারে মানুষের ধর্মকর্ম কি। যা যা স্মৃত হয়েছে তাই স্মৃতি। স্মৃতি

পদের অর্থ স্মরণ। বেদের সত্য শাশ্বত অর্থাৎ অপরিবর্তনীয়। পরবর্তীকালে আর্য মুনি ঋষিরা বেদের শাশ্বত সত্যের কথা অন্তরে স্মরণ রেখে তার ভিত্তিতে বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন কালে সামাজিক পরিবেশের গতি অনুসারে নিজের নিজের যুগের উপযোগী কতকগুলি শাস্ত্র রচনা করেন। এগুলি ঋষিদের রচিত, সেই কারণে আর্যদের নয়। এগুলি যুগশাস্ত্র কেননা সমাজের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এদের পরিবর্তন হয়েছে। বেদের প্রামাণ্যের তুলনায় এদের প্রামাণ্য মুখ্য নয়, গৌণ। কুড়িখানা স্মৃতি-সংহিতার মধ্যে মনু-স্মৃতি, যাজ্ঞবল্ক-স্মৃতি ও পরাশর-স্মৃতি—এই তিনখানাই প্রধান ও প্রসিদ্ধ। আর্য হিন্দুর জীবনযাত্রাকে সুনিয়ন্ত্রিত করার অভিপ্রায়ে ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনে নানারকম বিধি-নিষেধের কথা স্মৃতিতে বলা হয়েছে। দশবিধ সংস্কার, খাদ্যাখাদ্য বিচার, ব্রত পূজা, প্রায়শ্চিত্ত, রাজধর্ম, শাসন-নীতি ইত্যাদি নানা বিষয় এই সব স্মৃতি-সংহিতায় আলোচিত হয়েছে। এতে রাজতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, গার্হস্থ্যবিজ্ঞান প্রভৃতি বিশদভাবে আলোচিত হয়েছে। বর্ণানুযায়ী কর্মের কথা, এই জীবনের বিভিন্ন অবস্থায় বা আশ্রমে ব্যক্তির করণীয় কর্মের কথা এখানে বলা হয়েছে। ব্যক্তির গার্হস্থ্য জীবনের বিভিন্ন অনুষ্ঠানের কথা এবং গার্হস্থ্য ও সামাজিক জীবনের নীতির কথা বর্ণিত হয়েছে। হিন্দু সমাজের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে নতুন স্মৃতি সঙ্কলিত হয়েছে। যেমন রঘুনন্দনের স্মৃতি মনুর স্মৃতির তুলনায় অনেক পরবর্তী কালের স্মৃতি।

স্মৃতি-সংহিতার পরিচয়

মনু-স্মৃতি, যাজ্ঞবল্ক-স্মৃতি ও পরাশরস্মৃতিই প্রসিদ্ধ

রামায়ণ ও মহাভারত, এই দুই মহাকাব্য হিন্দুধর্মগ্রন্থের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই দুই মহাকাব্য ইতিহাস বলে গণনীয়। বেদের শাশ্বত সনাতন সত্যগুলি, ঐতিহাসিক কথা কাহিনীর মধ্য দিয়ে, জনসমাজে প্রচার করা এই ধর্মগ্রন্থ দুটির মুখ্য উদ্দেশ্য। বেদের উচ্চতত্ত্ব, উপনিষদ ও ব্রহ্মসূত্রের সূক্ষ্ম দার্শনিক চিন্তাধারা সাধারণ মানুষের কাছে দুর্বোধ্য। স্মৃতির অনুশাসনও সকলের পক্ষে সহজবোধ্য নয়। এই কারণে বাল্মীকি ও বেদব্যাস এই দুই মহাকাব্যের মাধ্যমে বেদ বেদান্তের সুমহান তত্ত্ব ও স্মৃতির অনুশাসন মনোরম উপায়ে রূপক ও কথাচ্ছলে সাধারণ মানুষের কাছে প্রচার করেন। রামায়ণ মহাভারত পাঠে হিন্দুধর্ম সম্পর্কে মনে সুস্পষ্ট ধারণা জন্মায়। রামায়ণে সেই যুগের আর্য সমাজের এক সুন্দর চিত্র এবং আর্য হিন্দুর জীবনযাত্রা প্রণালীর মনোরম বর্ণনা পাওয়া যায়। মহাভারতকে হিন্দুধর্মের বিশ্বকোষ মনে করা যেতে পারে। মহাভারতকে পঞ্চম বেদ বলা হয়।

রামায়ণ ও মহাভারত

রামায়ণ ও মহাভারতে হিন্দুর জীবন-যাত্রা প্রণালীর বর্ণনা আছে

রামায়ণ মহাভারতের মধ্য দিয়ে হিন্দুধর্মের বিভিন্ন তত্ত্বের বর্ণনা করা হয়েছে। নীতি-ধর্ম, রাজধর্ম, গার্হস্থ্য ধর্ম, সামাজিক ধর্ম, আনুষ্ঠানিক ধর্ম, মানুষের সবরকম ধর্মের ও কর্তব্য কর্মের বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা সহজভাবে রূপক ও কাহিনীর মধ্য দিয়ে এই গ্রন্থ দুটির মধ্যে প্রকাশিত হয়েছে। ভীষ্মপর্বে জ্যেষ্ঠ পাণ্ডব যুধিষ্ঠিরের প্রশ্নের উত্তরে শরশয্যাশায়ী কুরু-পিতামহ ভীষ্ম ধর্ম সম্বন্ধে যেসব মূল্যবান উপদেশ দিয়েছিলেন, সেগুলির মধ্য দিয়ে হিন্দুধর্মের সারতত্ত্ব প্রকাশিত হয়েছে।

মহাভারতের ভীষ্মপর্বের অন্তর্গত সুপ্রসিদ্ধ শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা মহাভারতের অন্তর্গত হলেও স্বতন্ত্র ধর্মগ্রন্থরূপে হিন্দু সমাজে সমাদৃত। 'চতুর্বেদের সার উপনিষদ, উপনিষদের সার এই গীতা।' ধর্মের গূঢ়তত্ত্ব গীতায় প্রকাশিত। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের প্রাক্কালে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ হিন্দুধর্মের সারতত্ত্ব তৃতীয় পাণ্ডব অর্জুনের কাছে ব্যাখ্যা করেন। গীতার শিক্ষা হল ঈশ্বর পরমতত্ত্ব, পরমাত্মা, পুরুষোত্তম। ঈশ্বর সর্বভূতের সনাতন বীজ, বুদ্ধিমানগণের বুদ্ধি এবং তেজস্বী-গণের তেজস্বরূপ। ঈশ্বর ক্ষেত্রজ্ঞরূপে সর্বক্ষেত্রে বিদ্যমান। সর্বভূতের অধিষ্ঠান স্বরূপ ঈশ্বরই এই সমস্ত জগতের অধিষ্ঠান। ঈশ্বরের সত্তাতেই সকলের সত্তা। তিনি নির্গুণ হয়েও সগুণ। নির্গুণভাবে তিনি অক্ষয় আত্মা, সম, শান্ত, নিষ্ক্রিয়, নির্বিকার। আবার সগুণভাবে তিনি সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়কর্তা, কর্মফলদাতা, যজ্ঞ তপস্যার ভোক্তা। ভক্তের ভগবান, "সর্বলোক মহেশ্বর শ্রীভগবানে আত্ম-সমর্পণ করে সর্বভূতহিতকল্পে নিষ্কামভাবে ভগবৎ কর্মদ্বারা তাঁর অর্চনা করাই" গীতার মূল শিক্ষা। গীতা আরও শিক্ষা দান করে যে যোগ, কর্ম, ভক্তি এবং জ্ঞান—এই চারটি মার্গের যেকোন একটি অনুসরণ করেই ঈশ্বর লাভ সম্ভব। এগুলি সনাতন ধর্মের প্রধান অঙ্গ। এগুলি আপাতদৃষ্টিতে পরস্পর বিরোধী মনে হয়। কিন্তু গীতা সনাতন ধর্মের এইসব অঙ্গগুলির সমন্বয় করে এক অপূর্ব পূর্ণাঙ্গ যোগ শিক্ষা দিয়েছেন।

শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা

গীতার শিক্ষা

পুরাণ হিন্দুধর্মের অন্যতম ধর্মগ্রন্থ। যা পুরাতন তাই পুরাণ। বেদের পুরাতন দার্শনিক তত্ত্ব ও সাধনতত্ত্ব নানাবিধ উপাখ্যানের মাধ্যমে পুরাণ প্রচার করেছেন, এই কারণেও তার পুরাণ নাম। পুরাণ সকলের জন্য। পুরাণের পাঁচটি লক্ষণ—সর্গ, প্রতিসর্গ, বংশ, মন্বন্তর এবং বংশানুচরিত। সৃষ্টিতত্ত্ব, ইতিহাস, দার্শনিকতত্ত্ব, সাধন প্রণালী ইত্যাদি নানাবিধ বিষয় পুরাণে আলোচিত হয়েছে। হিন্দুধর্মের মূলতত্ত্ব মনোরম কথা কাহিনীর মধ্য দিয়ে সহজ ও সরলভাবে পুরাণে বিবৃত হয়েছে।' এই কারণেই সাধারণ মানুষের কাছে পুরাণের এতখানি জনপ্রিয়তা।

পুরাণের পরিচয়

পুরাণের জনপ্রিয়তার কারণ

পুরাণকে দুই শ্রেণীতে ভাগ করা যেতে পারে—মহাপুরাণ ও উপপুরাণ। উভয়ের সংখ্যা হল অষ্টাদশ। অষ্টাদশ মহাপুরাণের মধ্যে বিষ্ণুপুরাণ, পদ্মপুরাণ, বায়ুপুরাণ, স্কন্দপুরাণ, অগ্নিপুরাণ, মার্কণ্ডেয় পুরাণ এবং ভাগবত পুরাণ এই সাতখানিই উল্লেখযোগ্য। আর এই সাতখানার মধ্যে ভাগবত পুরাণই বর্তমান হিন্দু সমাজে বিশেষভাবে সমাদৃত। হিন্দু জনসমাজে দুখানা ভাগবত প্রচলিত—দেবী ভাগবত এবং শ্রীমদ্ভাগবত বা বিষ্ণু ভাগবত। দেবী ভাগবতে শ্রীদুর্গার শক্তি ও মাহাত্ম্য বর্ণিত হয়েছে এবং শ্রীমদ্ভাগবতে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শক্তি ও মাহাত্ম্য বর্ণনা করা হয়েছে। উপপুরাণ হল ক্ষুদ্র পুরাণ। এগুলিও পুরাণের লক্ষণযুক্ত। আদি, নৃসিংহ, বায়ু, শিবধর্ম, দুর্বাসঃ, বৃহন্নারদীয়, নন্দিকেশ্বর, উশনঃ, কপিল, বরুণ, শাম্ব, কালিকা, মহেশ্বর, দেবী, ভার্গব, বশিষ্ঠ, পরাশর ও সূর্য, মোট অষ্টাদশ উপপুরাণের নাম।

ভাগবত—দেবী ভাগবত ও বিষ্ণুভাগবত

উপপুরাণের পরিচয়

ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব—এই তিন দেবতা পুরাণের প্রসিদ্ধ দেবতা। গীতার মত চণ্ডীও হিন্দুদের নিত্য-পাঠ্য বিষয়। চণ্ডী মার্কণ্ডেয় পুরাণের অন্তর্ভুক্ত হলেও প্রকৃত পক্ষে একটি স্বতন্ত্র ধর্মগ্রন্থরূপে স্বীকৃত। হিন্দুধর্মে আগম শাস্ত্রের সংখ্যা অনেক। এই শাস্ত্রগুলির প্রামাণ্য বেদের উপর নির্ভর নয়। এগুলি স্বাধীন হলেও বেদ বিরোধী নয়। এতে বেদের তত্ত্বগুলি সহজবোধ্য ও বিশদভাবে বর্ণিত হয়েছে। এই শাস্ত্রগুলি কিছুটা পুরাণের মত। তাই দেবদেবীর পূজা অর্চনার পদ্ধতি এগুলিতে বিশেষভাবে স্থান পেয়েছে। পুরাণে দেবদেবীর রূপ ও লীলার বর্ণনাই বেশী, পূজার্চনার পদ্ধতির বর্ণনা খুবই কম। হিন্দুধর্মের তিনটি সম্প্রদায়; শৈব, বৈষ্ণব ও শাক্ত-র নিজ নিজ আগম শাস্ত্র আছে। যথাক্রমে এগুলি হল শৈবাগম, বৈষ্ণবাগম এবং শাক্ত্যগম বা তন্ত্র। শৈবাগমগুলিতে শিব, বৈষ্ণবাগমগুলিতে বিষ্ণু এবং শাক্ত্যগমগুলিতে মহামায়াই হল পরমতত্ত্ব।

চণ্ডী স্বতন্ত্র ধর্মগ্রন্থ

আগম শাস্ত্র

হিন্দুধর্মের চরম লক্ষ্য হল মোক্ষ। বুদ্ধির সাহায্যে ও যুক্তি বিচারের দ্বারা চরম লক্ষ্য বা মোক্ষের স্বরূপ নির্ধারণ এবং সেই উদ্দেশ্যে ব্রহ্ম জীবজগৎ ইত্যাদি তত্ত্বের ব্যাখ্যা দেবার চেষ্টা করা হয়েছে হিন্দু দর্শনে। সেই কারণে হিন্দু দর্শনও হিন্দুর ধর্মগ্রন্থ। দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য হেতু দর্শনেরও শ্রেণীবিভাগ আছে। তাই ষড় দর্শনের উৎপত্তি। এই ষড়দর্শন হল—সাংখ্য, যোগ, ন্যায়, বৈশেষিক, পূর্ব-মীমাংসা, উত্তর মীমাংসা বা বেদান্ত দর্শন। মহর্ষি কপিল সাংখ্য

ষড় দর্শনের পরিচয়

দর্শনের, পতঞ্জলি যোগ দর্শনের, অক্ষপাদ গৌতম ন্যায় দর্শনের, মহর্ষি কণাদ বৈশেষিক দর্শনের, মহর্ষি জৈমিনি পূর্ব মীমাংসার এবং বেদব্যাস উত্তর মীমাংসার প্রণেতা। বিভিন্ন দার্শনিক সংক্ষিপ্ত সূত্রের মাধ্যমে তাঁদের দার্শনিক চিন্তাধারাকে প্রকাশ করায় সেগুলি অনেক ক্ষেত্রে দুর্বোধ্য হয়ে পড়েছে। তাই প্রয়োজন হল সেই সূত্রের ভাষ্যের। ভিন্ন ভিন্ন ভাষ্যকারগণ এই সব দর্শনের ভাষ্য রচনা করেছেন। এই সব ভাষ্যের আবার বহু টীকা টিপ্পনী বার্তিক রচিত হয়েছে। যেমন ব্রহ্মসূত্রের উপর দু'খানি উল্লেখযোগ্য ভাষ্য হল শঙ্করাচার্যের 'শারীরিক ভাষ্য' এবং রামানুজের 'শ্রীভাষ্য'। গোবিন্দনন্দ শারীরিক ভাষ্যের উপর 'রতনপ্রভা' নামে একটি টীকা রচনা করেন।

(vi) **হিন্দুধর্মের দেবতা:** 'দিব্' ধাতু থেকে দেবতা শব্দ নিষ্পন্ন। দিব্ ধাতুর অর্থ তেজ বা জ্যোতির বিকিরণ। অতএব দেবতা শব্দের ধাতুগত অর্থ হল জ্যোতির্ময় জীব। স্বর্গলোকেই দেবতাদের আবাস। দেবতাদের শরীর হল মন্ত্র শরীর। এই কথার তাৎপর্য হল ঋষিদের উচ্চারিত মন্ত্রগুলি অলৌকিক শক্তিশালী। স্বর্গলোকের অধিবাসী সূক্ষ্ম শারীরিক দেবতাগণ মন্ত্রের অলৌকিক সূক্ষ্মশক্তি গ্রহণ করে পুষ্টিলাভ করেন। দেবতা শব্দের প্রতিশব্দ হল অমর, নির্জর, দেব, ত্রিদশ, বিবুধ এবং সুর। দেবতারা অমর, এর অর্থ মানুষের পরমায়ুর তুলনায় দেবতার পরমায়ু অধিক। দেবতারা নির্জর অর্থাৎ বার্ধক্য-হীন। দেব অর্থাৎ দীপ্তিশালী। মানবের দশ দশা, দেবতার তিন দশা—জন্ম, যৌবন, মৃত্যু; তাই ত্রিদশ। বিবুধ অর্থাৎ দেবতারা জ্ঞানী; দেবতার জ্ঞান অসীম। দেবতারা সুর অর্থাৎ সুবুদ্ধিসম্পন্ন।

দেবতার পরিচয়

দেবতাদের মধ্যেও শ্রেণীবিভাগ আছে। কারও মধ্যে সত্ত্ব, কারও মধ্যে রজঃ, আর কারও মধ্যে তমঃ গুণের আধিক্য। এই গুণ বৈষম্য হেতু সব দেবতা সমান নয়। এছাড়া দেবতা দুই শ্রেণীতে বিভক্ত— জাতিদেব ও কর্মদেব। মানুষ থেকে যাঁরা দেবতা হন তাঁরা কর্মদেব। যাঁরা জন্মাবধি দেবতা তাঁরা জাতিদেব। শুভকার্য সম্পাদন হেতু মানুষ পরলোকে দেবত্ব লাভ করতে পারে।

দেবতাদের শ্রেণীবিভাগ— জাতিদেব ও কর্মদেব

কথায় বলে হিন্দুধর্ম তেত্রিশ কোটি দেবতায় বিশ্বাসী। কাজেই অনেকে মনে করে হিন্দু বহু ঈশ্বরবাদী। কিন্তু হিন্দুধর্মের মূল কথা পরমেশ্বর এক। তিনি ভিন্ন আর কেহ নেই। হিন্দুধর্মের একেশ্বরবাদ পরবর্তী অংশে আলোচনা করা হয়েছে।

এই অসংখ্য দেবতার নামরূপের বর্ণনা সম্ভব নয়। এই দেবতা দ্বিবিধ—(১) বৈদিক এবং (২) পৌরাণিক। বৈদিক দেবতাদের মধ্যে প্রধান 'যজ্ঞাহুতিভোজী দেবতা'। এঁরা সংখ্যায় তেত্রিশ। ইন্দ্র, প্রজাপতি, দ্বাদশ আদিত্য, একাদশ রুদ্র এবং অষ্ট বসু, এঁরা জাতিদেব। ইন্দ্র দেবতাদের রাজা। ঋগ্বেদে ইন্দ্রই পরমাত্মা—পরম পুরুষ। 'ইন্দ্রই নির্গুণ ব্রহ্ম, ইন্দ্রই সগুণ ব্রহ্ম'। মায়ার দ্বারা ইন্দ্র নানা রূপ ধারণ করেন। প্রজাপতি হলেন স্থাবর জঙ্গমাত্মক প্রাণীদের স্রষ্টা। প্রজাদের পতি, তাই তাকে প্রজাপতি বলা হয়। বৎসরের দ্বাদশ মাস আদিত্য পদবাচ্য, যেহেতু এই দ্বাদশ মাস সব প্রাণীর আয়ুগ্রহণ করে এবং পরিদৃশ্যমান জগতকে গ্রাস করেও স্বভাবে অবিরত গমন করে। রুদ্রগণ সংখ্যায় একাদশ। পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয় এবং মন—এই একাদশ ইন্দ্রিয়কে উপনিষদে একাদশ রুদ্র বলা হয়েছে। পুরাণে একাদশ রুদ্রের নাম—মৃগব্যাধ, সর্প, নির্ঋতি, অজৈকপাত, অহির্বুধ্ন, পিনাকী, দহন, ঈশ্বর, কপালী, স্থাণু এবং ভগ। বসুগণ সংখ্যায় আট। উপনিষদে উল্লিখিত এই অষ্ট বসুর নাম হল—অগ্নি, পৃথিবী, বায়ু, অন্তরীক্ষ, আদিত্য, দ্যৌঃ, চন্দ্র এবং নক্ষত্র। যে চেতন শক্তি এগুলিতে অধিষ্ঠিত হয়ে এদের পরিচালিত করছে সেই শক্তিকেই বুঝতে হবে। সেই চেতন শক্তিগুলিই দেবতা—অষ্টবসু। অষ্টবসুর ভিতর প্রধান হল অগ্নি। তেত্রিশ যজ্ঞাহুতিভোজী প্রধান দেবতা ছাড়া বৈদিক অপ্রধান দেবতা আছে। যেমন মরুৎগণ। সংখ্যায় এরা ঊনপঞ্চাশ; বিশ্বদেবগণ। অনেকের মতে অশ্বিনী কুমারদ্বয় হল বিশ্বদেব। বিষ্ণু, বরুণ, সোম প্রভৃতি পৌরাণিক দেবতাদের মধ্যে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব ও দেবী সুপ্রসিদ্ধ। বেদেও এদের উল্লেখ আছে, পুরাণে ব্রহ্মা সৃষ্টিকর্তা, বিষ্ণু পালন কর্তা ও শিব সংহার কর্তা। বৈদিক দেবতা প্রজাপতিই পুরাণে ব্রহ্মা নামে রূপান্তরিত। বেদের রাত্রিদেবী পুরাণে দেবী, মহাদেবী এবং মহামায়া নামে অভিহিতা। কি বেদে, কি পুরাণে দেবদেবীগণ অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত। যে অসুর বিশ্বের কল্যাণ বিধ্বস্ত করতে চায় তাদের সঙ্গে সংগ্রামের জন্য দেবদেবীগণ নানাবিধ সূক্ষ্ম অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত।

দেবতা—বৈদিক ও পৌরাণিক

যজ্ঞাহুতিভোজী দেবতার পরিচয়

অষ্ট বসু

(vii) হিন্দুধর্মে একেশ্বরবাদ: হিন্দুধর্ম হল একেশ্বরবাদী ধর্ম। হিন্দুধর্ম এক পরম অধ্যাত্ম সত্তার অস্তিত্বে বিশ্বাসী, সর্বভূতে ও সর্বজীবের মধ্যে যার প্রকাশ। কিন্তু যদিও হিন্দুধর্ম এক ঈশ্বরে বিশ্বাসী তবু হিন্দুধর্ম মনে করে যে এক ঈশ্বর বহু ঈশ্বরের মধ্যে নিজেকে প্রকাশ করেছে, যাদের যে কোন একজনকেই পরম দেবতা রূপে উপাসনা করা চলে। কাজেই হিন্দুধর্ম এক বিশেষ ধরনের একেশ্বরবাদে বিশ্বাসী।

একেশ্বরবাদের পরিচয়

হিন্দুধর্ম এক পরম দেবতার বহু দেবতায় ঐক্যে বিশ্বাসী। হিন্দুধর্মের বিভিন্ন শাখা—বৈষ্ণবধর্ম, শক্তিধর্ম, শৈবধর্ম প্রতিটি ধর্মই এক পরম দেবতায় বিশ্বাসী, বস্তুতঃ, এক সর্বব্যাপক সত্তায় বিশ্বাসী। ব্যবহারিক দিক থেকে হিন্দুধর্ম পরমসত্তার প্রতি সমগ্র জীবন ব্যাপী ধ্যান ও উপাসনার নির্দেশ করে, যাতে মানুষ তার জীবনের চরম লক্ষ্য অর্থাৎ ঈশ্বরকে লাভ করতে পারে। যদিও ঈশ্বর এক, হিন্দুধর্মমতে মানুষ বিভিন্ন পথ অনুসরণ করে ঈশ্বর লাভ করতে পারে। অসংখ্য পথের মধ্যে হিন্দুধর্ম মাত্র চারটি পথের কথা বলে। এগুলি হল যোগ, কর্ম, জ্ঞান এবং ভক্তি। ধারণা, ধ্যান, সমাধি—এই তিনটি যোগের অন্তরঙ্গ সাধন। অপরগুলি যেমন, যম ও নিয়ম প্রভৃতি বহিরঙ্গ সাধন। 'নিয়ত কর্ম' নিরাসক্তভাবে সম্পাদন করতে হবে। নিষ্কাম কর্মযোগের তিনটি লক্ষণ—ফলাকাঙ্ক্ষা বর্জন, কর্তৃত্বাভিমান ত্যাগ এবং সর্বকর্ম ঈশ্বরে সমর্পণ। 'বিবেক, বৈরাগ্য ও শমাদিকে সহায় করে গুরুপদিষ্ট তত্ত্বমস্যাদি, বেদান্ত বাক্যের শ্রবণ ও মনন এবং ধ্যানাদিরূপ সাধনমার্গই জ্ঞানযোগ'। ভক্তিমার্গে প্রত্যক্ষ ও ব্যক্ত ঈশ্বরের উপাসনা। অনুরাগই ভক্তির স্বরূপ, ভক্তি কোন লৌকিক চিত্তবৃত্তি নয়। ভগবৎ শরণাগতি বা আত্মসমর্পণ-যোগ ভক্তিমার্গের সার কথা।

হিন্দুধর্ম এক পরম দেবতায় বিশ্বাসী

(viii) **হিন্দুধর্মে ঈশ্বর :** এবার হিন্দুধর্মে ঈশ্বরের ধারণা সম্বন্ধে আলোচনা করা যাক। আমরা ইতিপূর্বে বলেছি হিন্দুরা বহু দেবতার পূজা করে, তবু তারা বিশ্বাস করে যে ঈশ্বর এক। বেদের যুগ থেকেই হিন্দুরা বহু দেবদেবীর পূজা করে আসছে। ঋগ্বেদের বিভিন্ন মন্ত্রে একাধিক দেবতার স্তুতি করা হয়েছে। দেবতাদের মধ্যে ইন্দ্র, অগ্নি, বায়ু, বরুণ প্রভৃতি প্রধান। এমন কি বৈদিক যুগেও হিন্দুরা উপলব্ধি করেছিল যে, বিভিন্ন দেবতা এক পরম-সত্তার প্রকাশ। অনেকে বেদকে বহু ঈশ্বরবাদী বলে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু এরূপ বর্ণনা যুক্তিযুক্ত নয়। অদ্বৈতবাদের মূল ঋগ্বেদেই নিহিত। ঋগ্বেদের বিভিন্ন মন্ত্রে বিভিন্ন দেবতাকে একই সত্তার প্রকাশ বলে বর্ণনা করা হয়েছে। যে মন্ত্রে যখনই যে দেবতার স্তব করা হয়েছে তখন তাকে পরম দেবতা বলে অভিহিত করা হয়েছে।

হিন্দুধর্মে ঈশ্বরের পরিচয়

প্রত্যেক দেবতার মধ্যে অপর দেবতা আশ্রিত। যখন যে দেবতাকে স্তব করা হচ্ছে তখন তাকে পরম দেবতা বলে অভিহিত করা—এই বিষয়টি লক্ষ্য করে ম্যাক্সমূলার বলেন যে, আসলে বেদের যে দেবতাতত্ত্ব তাকে বহু ঈশ্বরবাদ (polythesim) বলে আখ্যাত না করে, এক পরম সত্তায় বহু দেবতার মিলন (henothesim) বলাই শ্রেয়ঃ।

বেদের দেবতাতত্ত্ব বহু ঈশ্বরবাদ নয়

বৈদিক যুগের পরবর্তী কালে হিন্দুধর্মের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে হিন্দুধর্ম অসংখ্য দেব-দেবীতে বিশ্বাস স্থাপন করল। এই দেবদেবীর সংখ্যা তেত্রিশকোটিতে গিয়ে দাঁড়াল। এই অসংখ্য দেবদেবী এক মহান দেবতার প্রকাশ। এই অসংখ্য দেবতার মধ্যে বিশেষ করে পাঁচটি দেবতা বিশেষ উপাসনার বস্তু হয়ে উঠল। এরা হলেন বিষ্ণু, শিব, শক্তি, সূর্য এবং গণেশ। কালক্রমে এই পাঁচটি দেবতাকে কেন্দ্র করে পাঁচটি ধর্মবিশ্বাস বা পূজা পদ্ধতির উদ্ভব ঘটেছিল—বৈষ্ণব, শৈব, শক্তি; গাণপত্য এবং সূর্য উপাসনা। হিন্দুধর্মে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর—এই তিন দেবতার উদ্দেশে অসংখ্য ভক্ত তাদের পূজা নিবেদন করেন। ব্রহ্মা সৃষ্টিকারক, বিষ্ণু সংরক্ষক এবং শিব সংহারক। আসলে এই তিন দেবতা একই পরমেশ্বরের তিনটি রূপ, তিনটি ভিন্ন দেবতা নয়, একই পরম সত্তার ভিন্ন ভিন্ন রূপ। জগতের সব কিছুর মূলে একই চৈতন্য সত্তার অস্তিত্ব, এই হল অদ্বৈতবাদের মূল কথা। সমস্ত দেবতার সত্তা এক পরম সত্তায় অধিষ্ঠিত, সেই পরম-সত্তা ভিন্ন দেবতাদের স্বতন্ত্র কোন সত্তা নেই কাজেই যখন একথা বলা হয় যে হিন্দু-ধর্ম একেশ্বরবাদী ধর্ম, হিন্দুধর্ম একটি মাত্র পরম সত্তার অস্তিত্বে বিশ্বাস করে এবং অন্যান্য সকল কিছুকেই তার প্রকাশ মনে করে, তখন এই স্বীকৃতি খুবই যুক্তিযুক্ত। কাজেই অন্যান্য ঈশ্বরবাদী ধর্ম, যেমন খ্রীষ্টধর্ম, থেকে এই ধর্মের পার্থক্য লক্ষ্যণীয়। খ্রীষ্টধর্ম মতে ঈশ্বর এক, কিন্তু এই ধর্ম ঈশ্বর ভিন্ন অন্যান্য মানুষ ও প্রকৃতির অস্তিত্ব স্বীকার করে, যারা ঈশ্বরের অংশ নয় এবং যারা বাহ্য সম্পর্কে পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। হিন্দুধর্মই মনে করে যে, একটি মাত্র সত্তার অস্তিত্ব আছে, যে সত্তা নিজের মধ্য থেকেই জীব জগতের সৃষ্টি করে এবং তাদের প্রত্যেকের মধ্যেই অবস্থান করে।

হিন্দুধর্ম একটি মাত্র পরমসত্তায় অস্তিত্বে বিশ্বাসী

এই পরমসত্তাকে হিন্দুধর্মে এক পরম পুরুষ রূপে কল্পনা করা হয়েছে। ঈশ্বর হলেন পুরুষোত্তম। ঈশ্বরের দুটি রূপ—তিনি জগতের অন্তর্বর্তী হয়েও জগতের অতিবর্তী। ঋগ্বেদের পুরুষ সুক্তে এক পরম পুরুষের বর্ণনা পাওয়া যায়; যিনি বিশ্বব্যাপী হয়েও বিশ্বাতিগ অর্থাৎ বিশ্বকে অতিক্রম করে আছেন। চেতন-অচেতন বিশ্বের যাবতীয় বস্তুকে সেই পরম পুরুষের অংশ রূপে বর্ণনা করা হয়েছে। বিশ্বজগৎ এই পরম পুরুষে বিধৃত। বর্ণনায় বলা হয়েছে যে এই পরম পুরুষের সহস্র মস্তক, সহস্র নয়ন ও সহস্র চরণ। তিনি বিশ্বব্যাপী হয়েও বিশ্বকে অতিক্রম করে আছেন অর্থাৎ তিনি সমস্ত ভূমি আবরণ করেও দশ অঙ্গুলি অধিক হয়েছেন। নিখিল বিশ্ব তাঁর এক চতুর্থাংশ মাত্র; তাঁর এক অংশে তিনি জীব-জগতে পরিব্যাপ্ত হয়ে আছেন, অপর তিন চতুর্থাংশ অমৃতলোকে বিরাজমান।

ঈশ্বর অন্তর্বর্তী হয়েও অতিবর্তী

হিন্দুধর্মে ঈশ্বরকে বোঝাবার জন্য 'ভগবান' শব্দটি ব্যবহার করা হয়। এই নামের যথেষ্ট তাৎপর্য আছে। ঈশ্বরকে ভগবান বলার কারণ তিনি পূর্ণ মাত্রায় ষড়ৈশ্বর্যের অধিকারী। ঈশ্বরের ঐশ্বর্য কেবলমাত্র তাঁর সর্বশক্তিমত্তাতেই প্রকাশিত নয়, তিনি করুণাময়। তিনি সর্বশক্তিমান কারণ তিনি এই জগতের সকল শক্তির উৎস এবং এই জগতে এমন কিছু নেই যা তাঁর শক্তিকে সীমিত করতে পারে। শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতায় বলা হয়েছে, 'যে তেজ সূর্য থেকে সমস্ত জগৎ উদ্ভাসিত করে এবং যে তেজ চন্দ্রে ও অগ্নিতে আছে তা ঈশ্বরেরই অনন্ত শক্তির অংশ।' ঈশ্বরের গৌরবের শেষ নেই, ঈশ্বর পরম সুন্দর। সব সৌন্দর্যই সংগতির প্রকাশক। সব কিছু সুন্দর বস্তুই ঈশ্বরের প্রকাশ। ঈশ্বর সর্বজ্ঞ। ঈশ্বরের জ্ঞান দেশ ও কালের সীমার অধীন নয়। ঈশ্বরের জ্ঞান অসীম ও অনন্ত। যদিও ঈশ্বর জগতকে সৃষ্টি করেন, সংরক্ষণ করেন এবং ধ্বংস করেন, ঈশ্বর আপ্তকাম, ঈশ্বর পূর্ণ। তাঁর এমন কোন অভাব নেই যা তিনি জগৎ সৃষ্টি ও ধ্বংসের মধ্য দিয়ে পরিপূর্ণ করতে চান। মানুষের মত কোন স্বার্থের দ্বারা প্রণোদিত হয়ে তিনি ক্রিয়া করেন না। যে আনন্দ সহকারে এবং নিরাসক্তভাবে তিনি ক্রিয়া করেন তাকে ঈশ্বরের লীলা বলে অভিহিত করা যেতে পারে। সৃষ্টি, সংরক্ষণ ও ধ্বংস ঈশ্বরের অনন্ত শক্তির স্বাধীন প্রকাশ।

হিন্দুধর্মে ঈশ্বর ভগবান

ঈশ্বরের লীলা

ঈশ্বর কেবলমাত্র জীবের অতিবর্তী কোন সত্তা নয়, জীবের অন্তরে অধিষ্ঠিত আত্মা। ঈশ্বর হলেন অন্তর্যামী, তিনি জীবের অন্তরে অধিষ্ঠিত থেকে জীবকে চালিত করেন। ঈশ্বরই জীবকে জন্ম থেকে জন্মান্তরে চালিত করেন যতক্ষণ পর্যন্ত না জীবের মোক্ষপ্রাপ্তি অর্থাৎ ঈশ্বর লাভ ঘটে। মানুষ তার কাজের নিমিত্ত কারণ, ঈশ্বর হলেন প্রযোজক কর্তা। ঈশ্বর এই জীব জগতের নৈতিক শাসন কর্তা, তিনি কর্মফল-দাতা। এই জগতের নৈতিক শাসনকর্তা রূপে ঈশ্বর হলেন বিধাতা বা নিয়ন্তা। কর্মবাদকে অদৃষ্ট নামে আখ্যাত করা হয়, এই অদৃষ্ট ঈশ্বরের দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হয়। বিধাতা হিসেবে ঈশ্বর সততার সঙ্গে সুখকে এবং অসততার সঙ্গে দুঃখকে সংযুক্ত করেন। ঈশ্বর আমাদের রক্ষক ও ত্রাণকর্তা। ঈশ্বরে যাদের পরম ভক্তি, ঈশ্বর তাদের রক্ষা করেন। ঈশ্বর অক্ষর পরব্রহ্ম, ঈশ্বরই একমাত্র জ্ঞাতব্য তত্ত্ব, ঈশ্বরই বিশ্বের পরম আশ্রয়, ঈশ্বরই সনাতন ধর্মের প্রতিপালক। তিনি অব্যয় সনাতন পুরুষ। ঈশ্বরের অন্তর্বর্তিতার ধারণা গীতায় খুব সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত হয়েছে। ভগবানই জগতের পিতা অর্থাৎ নিমিত্ত-কারণ এবং মাতা অর্থাৎ উপাদান কারণ। ঈশ্বর গতি, ভর্তা, প্রভু, শুভাশুভদ্রষ্টা, রক্ষক, সুহৃৎ, স্রষ্টা, সংহর্তা। ঈশ্বরই অবিনাশী বীজ স্বরূপ।

ঈশ্বর রক্ষক ও ত্রাণকর্তা

কিন্তু হিন্দুধর্মমতে ঈশ্বর জগতের অন্তর্বর্তী এবং অতিবর্তী উভয়ই। যদিও ঈশ্বর জগৎ সৃষ্টি করে তার মধ্যে অন্তঃস্যূত, তবু তিনি জগতের অতিবর্তী। গীতায় বলা হয়েছে ক্ষিতি, অপ্, তেজঃ, মরুৎ, ব্যোম, মন, বুদ্ধি, অহংকার —এইরূপে ঈশ্বরের প্রকৃতি অষ্টভেদ প্রাপ্ত হয়েছে। এটি ঈশ্বরের অপরা প্রকৃতি। এর থেকে শ্রেষ্ঠ হল জীবরূপা চেতনাত্মিকা ঈশ্বরের পরা প্রকৃতি, সেই পরা প্রকৃতি দ্বারা জগৎ বিধৃত হয়েছে। অতিবর্তী সত্তা হিসেবে ঈশ্বরের প্রকৃতি সম্পর্কে কি জানা যায়? হিন্দুশাস্ত্রে এ সম্পর্কে বলা হয়েছে যে তিনি বুদ্ধি বা মনের দ্বারা জ্ঞেয় নন। তিনি অনির্বচনীয়। এই সত্তা সৎ নন, আবার অসৎ নন। তিনি সদসতের অতীতাবস্থা, 'চক্ষু যেখানে যায় না, বাক্য যাকে প্রকাশ করতে পারে না, মন যেখানে উপনীত হয় না, যাকে স্থূল বস্তুর মত দেখা যায় না বা জানা যায় না, তার স্বরূপ আমরা কিভাবে বর্ণনা করব? তিনি জানা ও অজানার বাইরে।' যিনি নিরূপাধি, আদিঅন্তবিহীন, শুদ্ধ, শান্ত, নির্গুণ, অবয়বহীন, সদা আনন্দস্বরূপ, যাঁর নিত্য জ্ঞানাদির কোন খণ্ডন নেই এবং যিনি অ-দ্বিতীয়, সেই চৈতন্যস্বরূপকেই ব্রহ্ম বলে জানবে। অতিবর্তী সত্তা হিসেবে ঈশ্বর হলেন এই ব্রহ্ম।

ঈশ্বর অতিবর্তী ও অন্তর্বর্তী উভয়ই

যে ঈশ্বর আমাদের পূজা ও ভক্তির বস্তু তিনি এই জগতের অন্তর্বর্তী। সেই ঈশ্বরকে আমরা এই জগতের স্রষ্টা হিসেবে জানি। কিন্তু ঈশ্বরের অতিবর্তী সত্তাকে আমরা আমাদের সাধারণ জ্ঞানের মাধ্যমে জানতে পারি না, একমাত্র অপরোক্ষ অনুভূতির মাধ্যমেই জানতে পারি। শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসনের মাধ্যমেই ঈশ্বরের এই স্বরূপকে জানা যায়। এই অপরোক্ষ অনুভূতির মাধ্যমে ঈশ্বরের যে স্বরূপের জ্ঞান হয় তাকে সদচিৎআনন্দম্, সত্যম্‌জ্ঞানমঅনন্তম্ এবং একমেবাদ্বিতীয়ম্ বলে অভিহিত করেছেন।

অপরোক্ষ অনুভূতির মাধ্যমেই ঈশ্বরকে জানা যায়

সব ধর্মমতে ঈশ্বর আত্মা স্বরূপ। হিন্দুধর্মে ঈশ্বর জীবাত্মা এবং পরমাত্মা উভয়ই।

হিন্দুধর্ম মতে ঈশ্বর এই জগতের অতিবর্তী ও অন্তবর্তী উভয়ই। [1]গীতায় স্পষ্টই বলা হয়েছে যে, ঈশ্বর অব্যক্তরূপে সমস্ত জগৎ জুড়ে আছেন। সমস্ত ভূত ঈশ্বরে অবস্থিত, কিন্তু ঈশ্বর তৎসমুদয়ে অবস্থিত নয়। এর তাৎপর্য হল, ঈশ্বরের ব্যাপ্তি কেবল জগতেই সীমাবদ্ধ নয়। ঈশ্বরের ব্যাপ্তি জগতেরও অতীত, ঈশ্বর বিশ্বানুগ হয়েও বিশ্বাতিগ। ঈশ্বরের স্বরূপের এইরূপ পরস্পর বিরুদ্ধ বর্ণনার তাৎপর্য এই যে

1. গীতা—৯;৪-৫

'সগুণ' ও 'নির্গুণ'—এই দুইটি বিভাগ পরস্পর বিরুদ্ধ। ঈশ্বর নির্গুণ হয়েও সগুণ; সুতরাং ঈশ্বরে পরস্পর বিরুদ্ধ গুণের সমন্বয়। এর থেকে সিদ্ধান্ত করা যেতে পারে যে ঈশ্বর সম্পর্কে হিন্দুদের ধারণা একেশ্বরবাদ, সর্বেশ্বরবাদ নয়। সর্বেশ্বরবাদের অর্থ সব কিছুই ঈশ্বর। জগতের সত্তা ও ঈশ্বর অভিন্ন। হিন্দুধর্ম অনুসারে এই অভিমত সর্বেশ্বরবাদ (Pantheism) নয়, সর্বধরেশ্বরবাদ (Panentheism)। এই মতানুসারে সকল কিছু ঈশ্বরের মধ্যে। ঈশ্বর সকল কিছুর সমগ্রতা মাত্র নয়, তার অতিরিক্ত কিছু।

হিন্দুধর্ম সর্বধরেশ্বরবাদ, সর্বেশ্বরবাদ নয়

(ix) **অবতারবাদঃ** হিন্দুধর্ম অবতারবাদে বিশ্বাসী। 'অব' পূর্বক তৃ ধাতুর উত্তর 'ঘঙ্' প্রত্যয় যোগে অবতার শব্দ নিষ্পন্ন। এর ধাতুগত অর্থ নীচে নামা বা অবতরণ। দেবতার মনুষ্যাদির মূর্তি পরিগ্রহ করে পৃথিবীতে আগমন। হিন্দুধর্ম বিশ্বাস করে যে 'শ্রীভগবান সৃষ্টিমণ্ডলের উর্ধ্বস্থিত তাঁর সেই অপ্রাকৃত নিত্যধাম থেকে কখনো কখনো নীচে সৃষ্টিমণ্ডলে নেমে আসেন জীবকে দিব্য প্রকৃতিতে উঠাবার অভিপ্রায়ে।' এই হল ঈশ্বরের অবতরণ বা অবতারবাদ। এই অবতারবাদের উদ্দেশ্য সম্পর্কে গীতায় বলা হয়েছে যে যখনই ধর্মের গ্লানি এবং অধর্মের অভ্যুত্থান হয়, ঈশ্বর সেই সময় নিজেকে সৃষ্টি করেন অর্থাৎ দেহধারণ পূর্বক অবতীর্ণ হন। অবতারেব উদ্দেশ্য দুষ্কৃতদের বিনাশ, সাধুদের পরিত্রাণ, ও ধর্মসংস্থাপন। এই অবতারবাদ প্রচারিত হয় পৌরাণিক যুগে। অনন্ত ঈশ্বর সাকার হন এবং স্বেচ্ছায় ক্ষুদ্র জীবের বা মানবের আধারে আবির্ভূত হন। প্রশ্ন উঠতে পারে যে এতে কি ঈশ্বরের বা শ্রীভগবানের অসীমত্বের হানি ঘটে না? এবং শ্রীভগবানের পক্ষে অসীম জীবের আধারে নেমে আসা কি সম্ভব? এর উত্তরে বলা যেতে পারে যে, শ্রীভগবানের অসীমত্ব জড়ের অসীমত্ব নয়, চৈতন্যের অসীমত্ব। শ্রীভগবান শুদ্ধ চৈতন্য স্বরূপ। কাজেই তিনি অসীম স্থূল আধারের ভেতর অনায়াসে থাকতে পারেন। শ্রীভগবান স্বেচ্ছায় নিজের অসীমত্বের হানি করে ক্ষুদ্র জীবের রূপ পরিগ্রহণ করেন, যাতে সমস্ত মানুষ ঈশ্বরের রহস্যের স্বরূপ কিছুটা অবগত হন এবং ঈশ্বরের সংস্পর্শে আসেন।

অবতারবাদের উদ্দেশ্য

অবতার নরদেহধারী হলেও সাধারণ মনুষ্য নয়, তিনি মায়া-মনুষ্য। অবতারের স্থূল দেহ শুদ্ধ মায়ার দ্বারা রচিত। নরদেহধারণের পরেও অবতারের ভেতর এই দিব্য জ্ঞান থাকে যে তিনি এবং জগৎ-কারণ ব্রহ্ম এক এবং তাঁর এই স্থূল দেহধারণ মায়িক মাত্র। অবতার শ্রীভগবানের মূর্তরূপ। মানুষের মত অবতার কর্ম ফলভোগের অধীন নয়। তিনি বাহ্যতঃ সুখ দুঃখ

অবতারের পরিচয়

ভোগ করেন, এও মায়িক। স্থূল দেহ ধারণ করে শ্রীভগবানের অবতার রূপে আবির্ভাব তার একটি লীলা। লীলার অর্থ বিনা প্রয়োজনে ক্রীড়া। এই লীলা অনিত্য, কেননা অবতার-কাল পর্যন্ত স্থায়ী।

পরমেশ্বরের অবতরণ বা শরীর প্রবেশ মুখ্যতঃ তিন প্রকার—গুণাবতার, লীলাবতার ও আবেশাবতার। পরমেশ্বর ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব—এই তিন দেবতা রূপে অবতীর্ণ হয়ে ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহার করেন। 'এই তিন দেবতায় সত্ত্ব-রজঃ-তমঃ এই তিন গুণের এক একটির প্রাধান্য থাকায়, তাঁরা পরমেশ্বরের গুণাবতার। পৃথিবীতে মৎস্য, কূর্ম প্রভৃতি স্থূল দেহধারী জীবের মূর্তিতে অবতীর্ণ হয়ে তাঁর প্রকট লীলা হল লীলাবতার। শ্রীশঙ্কর, শ্রীচৈতন্য, শ্রীরামকৃষ্ণ প্রভৃতি 'পরমেশ্বরের জ্ঞানাদি শক্তির দ্বারা আবিষ্ট মহাপুরুষগণ' তাঁর আবেশাবতার।

অবতরণ তিন প্রকার

সৃষ্টি-স্থিতি-সংহার রূপ অপ্রকট লীলার মধ্যে স্থিতি লীলার দেবতা হলেন শ্রীবিষ্ণু। ব্রহ্মাণ্ডের স্থিতি বা সংরক্ষণের জন্য কখনও কখনও বিষ্ণুকে ধরাধামে অবতীর্ণ হয়ে একটি লীলা করতে হয়। মৎস্য, কূর্ম, বরাহ, নৃসিংহ, বামন, পরশুরাম, রাম, বলরাম, বুদ্ধ এবং কল্কি—বিষ্ণুর এই দশাবতার। দশাবতার সম্বন্ধে পৌরাণিক কাহিনী নিম্নরূপ :

দশাবতার

বেদ প্রলয় পয়োধি জলে নিমগ্ন ছিল। শ্রীবিষ্ণু মৎস্য রূপ ধারণ করে বেদের উদ্ধার করেন। বেদ পৃথিবীর আদি ধর্মগ্রন্থ, পৃথিবীতে ধর্ম প্রতিষ্ঠার জন্য শ্রীভগবানের এই বেদোদ্ধার। এ হল মৎস্যাবতার। তারপর পৃথিবী পুনরায় জলপ্লাবিত হলে তিনি কূর্মরূপে পৃথিবীকে পৃষ্ঠে ধারণ করেছিলেন এটি হল কূর্মাবতার। পৃথিবী আবার জলপ্লাবিত হলে তিনি বরাহরূপে পৃথিবীকে দন্তের দ্বারা ধারণ করেন এবং মহাবল হিরণ্যাক্ষকে সংহার করেন। এই হল বরাহ অবতার। ভক্ত প্রহ্লাদকে রক্ষা করার জন্য হিরণ্যাক্ষের ভ্রাতা এবং ভক্ত প্রহ্লাদের পিতা দৈত্যরাজ অত্যাচারী হিরণ্যকশিপুকে শ্রীবিষ্ণু নরসিংহ রূপে অবতীর্ণ হয়ে বধ করেন, এটি হল নৃসিংহাবতার। বলির দর্পে পৃথিবী ভারাক্রান্ত হলে তিনি বামন রূপে ছলনার দ্বারা অতিদর্পী বলির দর্প চূর্ণ করেন, এই পৃথিবীকে রক্ষা করেন, এই হল বামনাবতার। ক্ষত্রিয় প্রতাপে পৃথিবী নিপীড়িত হলে তিনি পরশুরাম রূপে পৃথিবীকে একবিংশতি বার নিক্ষত্রিয় করেন এই হল পরশুরাম অবতার। রাক্ষসরাজ রাবণের অত্যাচারে যখন পৃথিবী জর্জরিত তখন তিনি শ্রীরামচন্দ্র রূপে রাবণকে বধ করেন, এ হল শ্রীরামচন্দ্র অবতার। যমুনার জলে হল আকর্ষণ করে বলরাম হলাহলকে অমৃতে পরিণত করেন, এবং পৃথিবীকে রক্ষা করেন। এই হল বলরাম অবতার।

দশাবতারের পরিচয়

বৈদিক যাগযজ্ঞের নামে অবাধ পশু হত্যায় পৃথিবী কলঙ্কিত হতে লাগল তখন বুদ্ধরূপে শ্রীবিষ্ণু পশু হত্যার নিবারণ করেন, এই হল শ্রীবুদ্ধ অবতার। বর্তমানে কলিযুগের শেষ ভাগে যখন অধর্ম ও অসত্যের প্রভাবে পৃথিবী নরককুণ্ডে পরিণত হয়ে বাসের অযোগ্য স্থান হয়ে উঠবে তখন শ্রীবিষ্ণু কল্কিরূপে অবতীর্ণ হয়ে অধর্মচারীদের সংহার করে ধর্ম ও সত্যের পুনঃ প্রতিষ্ঠা করবেন, এই হল কল্কি অবতার। কল্কি ভিন্ন আর ন'জন অবতারের আবির্ভাব ঘটে গেছে। এই নয় অবতারের মধ্যে শ্রীরামচন্দ্র, ও শ্রীবুদ্ধ ঐতিহাসিক পুরুষ। দশাবতারের ভেতর মৎস্য, কূর্ম, বরাহ, নৃসিংহ, বামন এবং পরশুরাম ঐতিহাসিক নয়।

যদিও কৃষ্ণ এই দশ অবতারের অন্তর্ভুক্ত নন, তবুও হিন্দুরা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তাঁদের অসীম শ্রদ্ধাভক্তি নিবেদন করেন। কৃষ্ণ হলেন অবতারী। 'কৃষ্ণস্তু ভগবান স্বয়ং।' দশটি[1] আকৃতিই তাঁর অংশ।

মানবেতর নিকৃষ্ট জীবের আধারে শ্রীভগবানের আবির্ভাব অনেককে ব্যথিত করে, কিন্তু তাঁদের জানা উচিত যে শ্রীভগবান সর্বভূতে অধিষ্ঠিত। নিকৃষ্ট জীবের মাঝেও যখন তিনি আছেন তখন তিনি লীলাবশতঃ সেই সব জীবের মায়িক দেহ ধারণ করতে পারেন।

বিষ্ণুর অবতার ছাড়াও শিবের এবং দেবীর অবতার প্রসঙ্গও হিন্দু শাস্ত্রে আছে। শিব সংহার দেবতা, ভক্তের প্রতি কৃপাবশতঃ তিনি প্রকট মূর্তি ধারণ করেন যেমন অর্জুনকে কিরাত রূপে তিনি দর্শন দিয়েছিলেন। ভিন্ন ভিন্ন সময়ে দেবী শ্রীভগবতীর আবির্ভাবের বা অবতরণের বিষয় শ্রীশ্রীচণ্ডীতে বর্ণিত হয়েছে। দেবশক্তি ও অসুর শক্তির দ্বন্দ্বে যখন অসুর শক্তি প্রবল হয়ে ওঠে তখন মহাশক্তিরূপা দেবী শ্রীভগবতী স্বয়ং অবতীর্ণা হয়ে আসুরিক শক্তিকে দমন করেন। শ্রীভগবতী মহালক্ষ্মী, মা সরস্বতী রূপে অবতীর্ণা হয়ে মধুকৈটভাদি অসুরদের নিপাত করেছিলেন।

শিবের এবং দেবীর অবতার প্রসঙ্গ

অবতারবাদ সম্পর্কে হিন্দুরা খুবই উদার মনোভাবাপন্ন। অবতারবাদের সম্ভাবনায় বিশ্বাস করার ফলে তারা অবতারের আকার, সংখ্যা এবং ব্যক্তিত্ব নিয়ে খুব চিন্তা করে না। একজন ধর্মপ্রবণ খ্রীষ্টান বিশ্বাস করেন যে ঈশ্বর যীশুর মধ্য দিয়ে একবারই অবতার রূপে আবির্ভূত হয়েছেন, কিন্তু হিন্দু একাধিক অবতারে বিশ্বাসী। যীশু, বুদ্ধ কাউকেই অবতার রূপে গ্রহণ করতে তার বাধা নেই।

হিন্দুধর্ম একাধিক অবতারে বিশ্বাসী

1. "বেদান্ত উদ্ধরতে, জগন্তি বহতে, ভূগোলমুদবিভ্রতে ; দৈত্যং দারয়তে, বলিং ছলয়তে। ক্ষত্রক্ষয়ং কুর্বতে, পৌলস্ত্যং জয়তে, হলং কলয়তে। কারুণ্যমাতন্বতে ; ম্লেচ্ছান মূর্চ্ছয়তে দশাকৃতি কৃতে কৃষ্ণায় তুভ্যং নমঃ।"

যাঁরা অবতারবাদ স্বীকার করেন না, তাঁরা এই প্রশ্ন তুলতে পারেন যে অনন্ত ঈশ্বর সান্ত হবেন কিরূপে? যিনি নিরাকার তিনি সাকার হন কিরূপে?' এই প্রশ্নের উত্তর পূর্বে দেওয়া হয়েছে। আরও বলা যেতে পারে, যিনি সর্বশক্তিমান তার পক্ষে সকল কিছুই সম্ভব। হয়ত এমন কথা বলা যেতে পারে যে অবতাররূপে আবির্ভূত না হয়ে ঈশ্বর যদি তার পূর্ণ স্বরূপে আবির্ভূত হন তাহলে মানুষ ঈশ্বরের স্বরূপ সম্পর্কে আরও বিশদ ধারণা করতে পারে।

ঈশ্বর সাকার হন কেন

কিন্তু হিন্দু মতে ঈশ্বরের পূর্ণ স্বরূপ মানুষের ধারণার অতীত। ঈশ্বর যদি মাঝে মাঝে মানুষের মাঝে অবতীর্ণ না হন তাহলে মানুষের পক্ষে ঈশ্বরের স্বরূপ সম্পর্কে ধারণা করা কঠিন হবে। অবতারের মাধ্যমে মানুষ উপলব্ধি করতে পারে যে ঈশ্বর কোন দূরবর্তী দেবতা নয়। ঈশ্বর এক প্রাণবন্ত সত্তা, এক প্রেমময় সত্তা যিনি তার সৃষ্ট জগত সম্পর্কে সকল সময়ই আগ্রহ দেখান। অবতারের সম্ভাবনা ঈশ্বরের সর্বশক্তিমত্তাকে ক্ষুণ্ণ করে না। ঈশ্বর তার সৃষ্ট জীবের কল্যাণের জন্যই কোন ঐশ্বরিক উদ্দেশ্য সিদ্ধ করার প্রয়োজনে কোন একটি আকারের মাধ্যমে দেহ ধারণ করেন।

অবতারের সম্ভাবনায় ঈশ্বরত্বের হানি ঘটে না

শ্রীজগদীশচন্দ্র ঘোষ অবতার তত্ত্বের ব্যাখ্যায় বলেন, "বেদান্তমতে ঈশ্বর কেবল এক নন, তিনি অদ্বিতীয়, একামেবাদ্বিতীয়ম্, তিনিই সমস্ত, তিনি ছাড়া আর কিছুই নাই। তিনি জগৎরূপে পরিণত, সকলই তাহার সত্তায় সত্তাবান। সকলেই তাঁর মধ্যে আছে, তিনি সকলের মধ্যেই আছেন। জীব মাত্রই নারায়ণ। সুতরাং অজ আত্মার দেহ সম্পর্ক গ্রহণ করা অসম্ভব ত নয়ই, বরং সেই সম্পর্কেই জগতের অস্তিত্ব। কাজেই হিন্দুর পক্ষে অবতারবাদ কেবল ভক্তি-বিশ্বাসের বিষয় মাত্র নহে। উহা বেদান্তের দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত।"[1]

অবতারতত্ত্ব সম্পর্কে জগদীশচন্দ্র ঘোষের মন্তব্য

(x) **ব্রহ্মাণ্ডবাদ:** প্রতিটি ধর্মের কতকগুলি মূল তত্ত্ব আছে। সেরূপ হিন্দু ধর্মেরও কতকগুলি মূল তত্ত্ব আছে, সেগুলি প্রত্যেক হিন্দুকেই বিশ্বাস করতে হয়। যেমন, ব্রহ্মব্রহ্মাণ্ডবাদ, অধ্যাত্মবাদ, কর্মবাদ, জন্মান্তরবাদ, বন্ধন ও মুক্তিবাদ ইত্যাদি। আমরা এইবার হিন্দুধর্মের এই সব মূলতত্ত্বগুলি একে একেই আলোচনা করব। ব্রহ্মাণ্ডের অর্থ বিশ্ব বা জগৎ। ঈশ্বরের চিৎশক্তি ব্রহ্মাণ্ডের কারণ, ব্রহ্মাণ্ড একটি নয়, অসংখ্য। পরব্রহ্ম এক, তিনি সঙ্কল্প করলেন আমি এক, আমি বহু হব; আমি ব্যক্ত হয়ে প্রকাশ পাব। তখন

ঈশ্বরের চিৎশক্তি ব্রহ্মাণ্ডের কারণ

1. জগদীশচন্দ্র ঘোষ; শ্রীমদ্ভাগবদ্গীতা, পৃষ্ঠা ১৫৩

ব্রহ্মের ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টির সঙ্কল্প জাগল। ব্রহ্ম নিজেই ব্রহ্মাণ্ডের উপাদান এবং নিমিত্ত কারণ। ব্রহ্ম বাইরে থেকে উপাদান সংগ্রহ করে ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করেননি। উর্ণনাভ যেমন নিজের মধ্য থেকে তন্তু নিঃসৃত করে তন্তুজাল রচনা করে, সেইরূপ ব্রহ্ম নিজের শক্তিতে ব্রহ্মাণ্ড উৎপাদন করেছেন। ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি স্থিতি লয় প্রবাহ অনাদি-অনন্ত কাল ধরে চলেছে। ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি থেকে প্রলয় পর্যন্ত এক কল্প। কল্পারম্ভে সৃষ্টি এবং কল্পান্তে প্রলয়। ব্রহ্ম কল্পারম্ভে ব্রহ্মাণ্ড রচনা করেন আবার কল্পান্তে তা ব্রহ্মের মধ্যেই লয় প্রাপ্ত হয়।

'পাঞ্চভৌতিক জড় পদার্থের জড় দেহসমষ্টিই ব্রহ্মাণ্ডের স্থূল রূপ। এটি তার বিশ্ব জড়ত্বের রূপ এবং এর নাম বিরাট।' 'দেব মানব পশুপক্ষী ইত্যাদি সকল চেতন জীবের সূক্ষ্ম অন্তরিন্দ্রিয়ের সমষ্টিই ব্রহ্মাণ্ডের সূক্ষ্ম রূপ। এটি তার বিশ্বচেতনার রূপ এবং এর নাম হিরণ্যগর্ভ। মহাপ্রলয়ে ব্রহ্মাণ্ড সগুণ ব্রহ্মে লীন হলে অব্যক্তরূপে বিদ্যমান থাকে। তখন তার কারণ-রূপ। এই কারণ-রূপের নাম কারণ-ব্রহ্ম, বা সগুণ ব্রহ্ম বা ঈশ্বর। কারণ-ব্রহ্ম থেকে হিরণ্যগর্ভ এবং হিরণ্যগর্ভ থেকে বিরাট উৎপন্ন হয়। হিরণ্যগর্ভ যেন সগুণ ঈশ্বরের সূক্ষ্ম শরীর এবং বিরাট তার স্থূল শরীর।

(xi) **সৃষ্টিতত্ত্ব:** সাধারণতঃ সৃষ্টিরহস্য দুর্জ্ঞেয় বলে অভিহিত হয়। হিন্দু-ধর্মগ্রন্থের সংখ্যা একাধিক, কাজেই সৃষ্টি তত্ত্বের সংখ্যাও বহু। এ সম্পর্কে দুটি মত দেখা যায় (১) স্মৃতি পুরণাদির মত এবং (২) বেদান্তের মত।

(১) **স্মৃতি পুরাণাদির মত:** এই মতে সৃষ্টি দু'প্রকার—প্রাকৃত ও বৈকৃত। প্রাকৃত সৃষ্টির অন্য নাম সর্গ। বৈকৃত সৃষ্টির অন্য নাম ব্রহ্মার সৃষ্টি। প্রথমে প্রাকৃত সৃষ্টি এবং পরে বৈকৃত সৃষ্টি। প্রাকৃত সৃষ্টির বর্ণনায় বলা হয়েছে পরমেশ্বরের ইচ্ছায় ত্রিগুণাত্মিক প্রকৃতির গুণ বৈষম্যের ফলে প্রথমে উৎপন্ন হল মহৎ বা মহৎতত্ত্ব, তারপর অহঙ্কারতত্ত্ব। পৌরাণিক শাস্ত্রকারগণ অহঙ্কারতত্ত্বকে সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক এই তিন অংশে বিভক্ত করেছেন। তামসিক অহঙ্কার বিকৃত হয়ে পঞ্চ সূক্ষ্মভূত বা পঞ্চ তন্মাত্র উৎপন্ন করে। ঐ পঞ্চ তন্মাত্রের মিলিত সত্ত্বাংশে সাত্ত্বিক অহঙ্কারের দ্বারা মন এবং রাজসিক অহঙ্কারের দ্বারা বুদ্ধি উদ্ভূত হয়। পঞ্চ তন্মাত্রের মিলিত রজঃ অংশে রাজসিক অহঙ্কারের দ্বারা পঞ্চ প্রাণের উৎপত্তি। শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধ—এই পঞ্চ তন্মাত্রের পৃথক পৃথক সত্ত্বাংশ থেকে পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং তাদের পৃথক পৃথক রজঃ অংশে যথাক্রমে পঞ্চকর্মেন্দ্রিয়ের উৎপত্তি ঘটে। সাত্ত্বিক অহঙ্কার থেকে পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়ের, পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়ের, বুদ্ধির ও মনের 'ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতা' দেবতাদের উদ্ভব। এতকাল পঞ্চ সূক্ষ্মভূত বা তন্মাত্র অমিলিত অবস্থায় থাকে। এখন তারা মিলিত বা পঞ্চীকৃত হয়। পুরাণ মতে

স্মৃতি পুরাণমতে সৃষ্টির বর্ণনা

পরমেশ্বর কর্তৃক প্রেরিত হয়ে এই পঞ্চীকৃত পঞ্চভূত ও জীবাত্মা কালক্রমে সূর্যের মত দীপ্তিশালী একটি বৃহৎ অণ্ডরূপে পরিণত হয় এবং আকাশ, বায়ু, জ্যোতিঃ, জল, পৃথিবী এই পাঁচটি স্থূলভূতকে উৎপন্ন করে। প্রথমে পঞ্চভূত তরল অবস্থায় বিরাজ করে। পরে কঠিন হয়ে ভিন্ন ভিন্ন রূপ ধারণ করে। প্রধান ভূতগুলি অপ্রধান ভূতগুলিকে, যেমন আকাশ বায়ুকে, বায়ু জ্যোতিঃকে, জ্যোতি জলকে এবং জল পৃথিবীকে বেষ্টন করে থাকে। পৃথিবী জলমগ্ন হয়। জলমগ্ন পৃথিবীকে উদ্ধারের জন্য পরমেশ্বর পর্বত ও সমুদ্র সৃষ্টি করে। পঞ্চীকৃত স্থূল ভূতগুলি থেকে ভূতাদি লোক সকলের সৃষ্ট। বৈকৃত সৃষ্টি বা ব্রহ্মার সৃষ্টির বর্ণনায় বলা হয়েছে যে পূর্বোক্ত অণ্ডমধ্যে জলরাশির মধ্যস্থিত নারায়ণের নাভিস্থল বা কেন্দ্রস্থল থেকে ব্রহ্মার উৎপত্তি। ব্রহ্মার আবির্ভাবের পর ব্রহ্মার সৃষ্টি হল বৈকৃত সৃষ্টি। এই পরিদৃশ্যমান জগৎ ব্রহ্মার সৃষ্টি। জীবের স্থান এই সৃষ্টিতে মুখ্য। জীবের ভোগের জন্য ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়সমূহের সৃষ্টি। সৃষ্টি ব্যাপারে হিরণ্যগর্ভ বা ব্রহ্মা স্বয়ং শ্রেষ্ঠ জীব। তিনি সূক্ষ্ম শরীরী। ব্রহ্মা প্রথমে সূর্য, চন্দ্র, বরুণ ইত্যাদি দেবতাগণের সৃষ্টি করেন। এরপর ব্রহ্মা দিন, রাত্রি, সংবৎসর, কাল, ঋতু, মেঘ ও পৃথিবীর যাবতীয় পদার্থ সৃষ্ট করেন। তারপর ব্রহ্মা মনন করাতে তাঁর কতকগুলি মানসপুত্র উদ্ভূত হন। এই মানস পুত্রদের আদিতে চার কুমার—সনৎ, সনক, সনন্দন ও সনাতন এবং এরপর আদি, মনু, মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, দক্ষ, বশিষ্ঠ, ভৃগু ও নারদ—এই দশমুনি তার মানস পুত্ররূপে উৎপন্ন হন। এই দশ মুনিকে প্রজাপতি বলা হয়। ব্রহ্মা এই প্রজাপতিগণের পিতা। প্রজাপতিগণ আবার স্থাবর জঙ্গমাত্মক জগতের জনক। আদি মনুও ব্রহ্মার মানসজাত। মনুষ্যগণ আদি মনুর বংশধর, তাই মানব নামে অভিহিত। ব্রহ্মা স্বয়ম্ভূ। সেই স্বয়ম্ভূর মানসজাত বলে আদি মনুর নাম স্বায়ম্ভুব মনু। মনুসংহিতার সৃষ্টি প্রকরণ পুরাণের সৃষ্টিতত্ত্ব থেকে ভিন্ন। মনুর মতে ব্রহ্ম বা পরমাত্মা প্রজাসৃষ্টির অভিলাষে প্রথমে জল সৃষ্টি করলেন এবং তারপর সেই জলে নিজের শক্তি বীজ নিক্ষেপ করলেন। সেই নিক্ষিপ্ত বীজ স্বর্ণলিখিত অণ্ডে পরিণত হল। সেই অণ্ডে ব্রহ্মা জন্মগ্রহণ করলেন। ব্রহ্মা সেখানে এক বৎসরকাল অবস্থান করার পর চিন্তা করলেন অণ্ড দুভাগে খণ্ডিত হোক। তাঁর ইচ্ছানুসারে অণ্ড দুভাগে খণ্ডিত হল। সেই দুখণ্ডের ঊর্ধ্বখণ্ড স্বর্গ এবং অধঃখণ্ড পৃথিবী হল। মধ্যভাগে আকাশ, আটদিক এবং সমুদ্র প্রতিষ্ঠিত হল।

পরিদৃশ্যমান জগৎ ব্রহ্মার সৃষ্টি

(২) **বেদান্তের মতবাদঃ** ত্রিগুণাতীত নির্গুণ ব্রহ্ম নির্বিশেষ। নিষ্ক্রিয় অবস্থানই তাঁর স্বরূপে অবস্থান। তাঁর সৃষ্টির ইচ্ছা জাগল। ইচ্ছার সঙ্গে সঙ্গে সৃষ্টির

সূচনা হল। তাঁর স্বীয় ব্রহ্মশক্তির সাহায্যে তিনি ত্রিগুণ সংযুক্ত হয়ে সগুণ ও সক্রিয় হলেন। এই ব্রহ্মশক্তিই ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি। একে মায়া বা মায়াশক্তিও বলা হয়। এই প্রকৃতি অচেতন নয়, চিন্ময় ব্রহ্মেরই চিন্ময়ী শক্তি। বেদান্তমতে ব্রহ্মের সৃষ্টির ইচ্ছাই বিশ্বসৃষ্টির নিমিত্ত কারণ এবং মায়াশক্তিই উপাদান কারণ। শুদ্ধ চৈতন্য-স্বরূপ ব্রহ্ম সৃষ্টির ইচ্ছায় মায়া শক্তির আবরণে ত্রিগুণ অর্থাৎ সত্ত্ব, 'রজঃ ও তম সংযুক্ত হলেন। গুণত্রয়ের মধ্যে বৈষম্যের ফলে প্রথমে মহৎ তারপর অহংতত্ত্ব, তারপর পঞ্চতন্মাত্রের সৃষ্টি। এই পঞ্চতন্মাত্র হল পঞ্চমহাভূত—আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল ও পৃথিবীর পঞ্চসূক্ষ্মভূত অর্থাৎ শব্দতন্মাত্র, স্পর্শতন্মাত্র রসতন্মাত্র, রূপতন্মাত্র ও গন্ধতন্মাত্র। পঞ্চতন্মাত্রের বিভিন্ন সাত্ত্বিক অংশ থেকে জ্ঞান ও জ্ঞানেন্দ্রিয়ের উৎপত্তি। পঞ্চতন্মাত্রের বিভিন্ন রজোগুণাংশ থেকে পঞ্চকর্মেন্দ্রিয়ের সূক্ষ্মাংশ এবং মিলিত রজোগুণাংশ থেকে পঞ্চপ্রাণের উদ্ভব। পঞ্চতন্মাত্রের তামসাংশের পঞ্চীকরণে পঞ্চ স্থূল মহাভূতের উদ্ভব। এই স্থূল পঞ্চমহাভূত হল—আকাশ, বায়ু, অগ্নি, বা তেজঃ, জল ও পৃথিবী বা ক্ষিতি। পঞ্চীকৃত মহাভূত থেকে [1]চতুর্দশ ভুবন ও চতুর্বিধ স্থূল দেহ[2] উৎপন্ন হয়।

পঞ্চীকরণ

(xii) **প্রলয় :** এই পরিদৃশ্যমান জগৎ চিরকালই এইভাবে থাকবে হিন্দুমতে এরূপ ধারণা ভ্রান্ত। জীবের জন্ম মৃত্যুর মত এই পৃথিবীরও সৃষ্টি ও ধ্বংস আছে। পরিদৃশ্যমান জগতের ধ্বংসই প্রলয়। হিন্দুশাস্ত্রমতে যে ক্রমানুযায়ী সৃষ্টির পরিণতি তার বিপরীত ক্রমানুযায়ী প্রলয়ের গতি।

পুরাণমতে প্রলয় দুপ্রকার—প্রাকৃতিক এবং নৈমিত্তিক। প্রাকৃত সৃষ্টির নাশ প্রাকৃতিক প্রলয়, আর বৈকৃত সৃষ্টির নাশ দৈনন্দিন প্রলয়। পুরাণমতে প্রলয়ের সময় প্রথমে ব্রহ্মার সৃষ্টি লয় প্রাপ্ত হয় তার পরে প্রাকৃত সৃষ্টির লয় বা মহাপ্রলয় হয়। ব্রহ্মার সৃষ্টির লয় বা দৈনন্দিন লয়ের ক্ষেত্রে প্রথমে স্থাবর জঙ্গমাত্মক জগৎ ও চতুর্বিধ জীব লীন হয়ে যায় তাদের জন্মদাতা দশ প্রজাপতি ও মনুর অভ্যন্তরে। তারপর দশ প্রজাপতি, স্বায়ম্ভুব মনু এবং সনকাদি চার কুমার ব্রহ্মার মানসজাত হওয়াতে ব্রহ্মার মধ্যে লীন হয়ে যায়। পৃথিবী আবার জলমগ্ন হয়। বেদ বিদ্যার লোপ ঘটে। তখন সলিলশায়ী নারায়ণের নাভিকমলে ব্রহ্মা অবস্থান করেন। এই দৈনন্দিন প্রলয়ে প্রাকৃত সৃষ্টির কিছু লোপ

পরিদৃশ্যমান জগতের ধ্বংসই প্রলয়

1. ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ, মহঃ, জনঃ, তপঃ, ও সত্য এবং অতল, বিতল, সুতল, রসাতল, তলাতল, মহাতল ও পাতাল।

2. জরায়ুজ, অণ্ডজ , স্বেদজ ও উদ্ভিজ্জ।

পায় না। আকাশাদি পঞ্চ স্থূলভূত বিদ্যমান থাকে। নৈমিত্তিক প্রলয়ের পরে ব্রহ্মা আবার সৃষ্টিকার্যে মনোনিবেশ করেন। তিনি পূর্বের মতন আবার সৃষ্টি করেন। ব্রহ্মার এই দৈনন্দিন সৃষ্টি ও প্রলয়কে এক কল্প বলে। এইভাবে কল্প কল্পান্তর ব্রহ্মার সৃষ্টি প্রবাহ চলতে থাকে।

(xiii) **হিন্দুধর্মে অধ্যাত্মবাদ বা আত্মার স্বরূপ** (Nature of human self in Hinduism) **:** ক্ষর আত্মা অপেক্ষা উচ্চতর অক্ষর আত্মা বা অধি আত্মা আছে—এই তত্ত্বের নাম অধ্যাত্মবাদ। হিন্দুধর্মে ব্যক্তির আত্মাকে জীবাত্মা এবং ঈশ্বরকে পরমাত্মা রূপে অভিহিত করা হয়েছে। জীবাত্মা পরমাত্মারই প্রকাশ, তবু উভয়ের মধ্যে পার্থক্য আছে। জীবাত্মা বলতে সাধারণতঃ বোঝায় দেহধারী আত্মা। জীবাত্মা দেহের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত হলেও, জীবাত্মা দেহ, ইন্দ্রিয় এবং মন থেকে স্বতন্ত্র। আত্মার সঙ্গে দেহের ও মনের পার্থক্য হিন্দুধর্মে মৌলিক পার্থক্য। কাজেই হিন্দুধর্মে আত্মার দুটি রূপের মধ্যে পার্থক্য করা হয়েছে—অবভাসিক আত্মা ও প্রকৃত আত্মা, অর্থাৎ আত্মার বাহ্যস্বরূপ এবং আত্মার যথার্থ স্বরূপ। উপনিষদের 'আত্মানং বিদ্ধি'—আত্মাকে জান—এই উপদেশের মধ্যে আত্মার যথার্থ স্বরূপকে জানার কথা বলা হয়েছে।

আত্মা—প্রকৃত ও অবভাসিক

আত্মার বাহ্য স্বরূপকে তিন ভাবে জানা যেতে পারে—শারীরিক, মানসিক ও নৈতিক। জীবাত্মার তিনটি শরীর—স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ শরীর। এই তিন শরীর পঞ্চ কোষে বিভক্ত—অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময় ও আনন্দময় কোষ। স্থূল শরীর পিতামাতার কাছ থেকে প্রাপ্ত এবং ক্ষিতি, অপ্, তেজঃ, মরুৎ ও ব্যোম এই পাঁচটি ভৌতিক উপাদানের দ্বারা গঠিত। খাদ্যের দ্বারা এর পরিপুষ্টি সাধিত হয় বলে একে আত্মার অন্নময় কোষ বলে অভিহিত করা হয়। জীবাত্মার জাগতিক বস্তুর অভিজ্ঞতা ও ভোগ এই শরীরের দ্বারাই সম্পন্ন হয়। সূক্ষ্ম শরীরকে ইন্দ্রিয়ের দ্বারা পর্যবেক্ষণ করা যায় না। একে লিঙ্গ শরীরও বলা হয় কারণ আত্মার অস্তিত্ব অনুমানের পক্ষে এটি লিঙ্গ বা চিহ্নের কাজ করে। এই সূক্ষ্ম শরীর সতেরোটি উপাদানে—মন, বুদ্ধি, পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয়, পাঁচটি কর্মেন্দ্রিয় এবং পাঁচটি বায়ুর দ্বারা গঠিত। এটি প্রাণময়, মনোময় এবং বিজ্ঞানময় কোষের সমষ্টি। বুদ্ধি পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সঙ্গে মিলিত হয়ে বিজ্ঞানময় কোষ নামে অভিহিত হয়। মন পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়ের সঙ্গে মিলিত হয়ে মনোময় কোষ এবং পঞ্চপ্রাণ পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়ের সঙ্গে মিলিত হয়ে প্রাণময় কোষ নামে অভিহিত হয়। মৃত্যুতে স্থূল শরীর বিনষ্ট হয়, কিন্তু আত্মা সূক্ষ্ম শরীরকে তার সঙ্গে নিয়ে যায় এবং

অতীত কর্মানুসারে নতুন দেহ পরিগ্রহ করে। আত্মা কোন্ দেহ পরিগ্রহ করবে তা নির্ভর করে তার অতীত কামনা, বাসনা, চিন্তা ও কার্যের উপর যেগুলি সূক্ষ্ম শরীরে সংরক্ষিত থাকে। তৃতীয় শরীর হল কারণ শরীর। এটি থেকেই স্থূল এবং সূক্ষ্ম শরীরের উদ্ভব এবং তাতেই লীন হয়। কারণ শরীরে কেবলমাত্র আনন্দময় কোষ। হিন্দুশাস্ত্র অনুসারে স্থূল শরীর যেমন অচেতন, সূক্ষ্ম শরীর, কারণ শরীরও তেমনি অচেতন। গভীর ঘুমে স্থূল ও সূক্ষ্ম শরীর কারণ শরীরে লয় প্রাপ্ত হয় বলে, একে লয়স্থানও বলা হয়। জীবাত্মা যখন তার যথার্থ স্বরূপ উপলব্ধি করতে পারে তখন এই সব শরীরকে পরিহার করে। আত্মা একটি অজড় দ্রব্য। চিন্তা, অনুভূতি ও ইচ্ছা আত্মার গুণরূপে আত্মার অন্তর্ভুক্ত। চেতনার চারটি স্তর আছে—বিশ্ব, তৈজস, প্রজ্ঞা এবং তুরীয়।

স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ শরীর

আত্মা তিন প্রকার—নিত্য, মুক্ত এবং বদ্ধ। প্রথম ধরনের আত্মা হল যাঁরা কখনও বদ্ধ ছিলেন না। যাঁরা চিরমুক্ত যেমন—নারদ, প্রহ্লাদ। দ্বিতীয় ধরনের আত্মা হল যারা এক সময় বদ্ধ ছিলেন কিন্তু এখন মুক্ত, যেমন, জনক, বশিষ্ঠ। তৃতীয় ধরনের আত্মা হল এই জগতের সাধারণ মানুষ, যারা বদ্ধ। এরা জন্ম-মৃত্যুচক্র পরিক্রমণ করছেন এবং আত্মার যথার্থ স্বরূপ উপলব্ধি করে একদিন মোক্ষ লাভ করবেন।

আত্মার শ্রেণীভেদ

আত্মার যথাযথ স্বরূপের আলোচনায় আমরা আগেই বলেছি আত্মা দেহ, মন ও ইন্দ্রিয় থেকে স্বতন্ত্র। দেহ ও ইন্দ্রিয়ের পরিবর্তন সত্ত্বেও আত্মার স্বরূপের কোন পরিবর্তন হয়না। গভীর নিদ্রাবস্থায় মানুষের মন, বুদ্ধি, অহংকার ও ক্রিয়া থেকে বিরত হয়। কিন্তু চেতনসত্তারূপে আত্মার অস্তিত্ব তখনও থাকে। আত্মা চেতন প্রক্রিয়ার সমষ্টি নয়, বা চেতনার প্রবাহ নয়। আত্মা হল এক শাশ্বত, অপরিবর্তনীয়, আত্মসচেতন, অবিনাশী, আধ্যাত্মিক সত্তা। তুরীয় অবস্থায় জীবাত্মার যথার্থ স্বরূপ প্রকাশিত হয়। এটি হল সমাধির অবস্থা, বা যোগসাধনার মাধ্যমে লব্ধ। এই অবস্থায় দেহ, ইন্দ্রিয়, মন এবং বুদ্ধি ক্রিয়া করে না। অর্থাৎ এই অবস্থায় কোন বাহ্যবস্তু বা আভ্যন্তরীণ মানসিক প্রক্রিয়াব চেতনা থাকে না। কিন্তু এই অবস্থা অচেতন অবস্থা নয়, বরং এক প্রশান্তির অবস্থা। এই অবস্থায় আত্মা নিজ স্বরূপে অর্থাৎ শুদ্ধ চেতনা রূপে অবস্থান করে। অজ্ঞতাবশতঃ জীব দেহ, মন বা ইন্দ্রিয়কেই আত্মা বলে ভুল করে। প্রকৃত পক্ষে জীবাত্মা শাশ্বত, অবিনাশী এবং অপরিবর্তনীয়। আত্মা শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্ত, নিত্য। গীতায় বলা হয়েছে, "যে আত্মাকে হন্তা বলিয়া জানে এবং যে উহাকে হত বলিয়া মনে

আত্মা এক আধ্যাত্মিক সত্তা

করে, তাহারা উভয়েই আত্মতত্ত্ব জানে না। ইনি হত্যা করেন না, হতও হন না।"[1] আত্মা নিত্য, অবিনাশী, অপ্রমেয় (স্বপ্রকাশ)। আত্মা শুদ্ধচেতনা।

(xiv) **হিন্দুধর্মে পুনর্জন্মের ব্যাখ্যা (The Meaning of Rebirth in Hindu Religion) :** হিন্দুধর্ম বিশ্বাস করে যে জীবের মৃত্যুর পর জীব পুনরায় জন্ম-গ্রহণ করে। হিন্দুধর্মে পুনর্জন্মকে নানাভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে, কিন্তু সকলেই মৃত্যু পরবর্তী জীবনে বিশ্বাসী। পুনর্জন্মের অর্থ হল জীবের মৃত্যুর পরে আত্মার পুনরায় নতুন দেহ পরিগ্রহ। যদিও বহু ধর্ম পুনর্জন্মে বিশ্বাসী, তবু একমাত্র হিন্দুধর্মেই এই জন্মান্তরবাদের দার্শনিক ব্যাখ্যা খুঁজে পাওয়া যায়। আত্মার নতুন দেহ ধারণের মূলে রয়েছে, আত্মা যে এক শাশ্বত সত্তা এই ধারণা। বিভিন্ন পরিবর্তনের মধ্যেও আত্মা এক অবিনাশী সত্তা—এই বিশ্বাস না থাকলে জীবের পুনর্জন্মের কোন প্রশ্ন উঠে না। সেই কারণে হিন্দু জড়বাদী দার্শনিকরা কোন শাশ্বত আত্মার অস্তিত্বে, মৃত্যু পরবর্তী জীবনে এবং আত্মার পুনর্জন্মে বিশ্বাস করে না। হিন্দুধর্মে জীবাত্মা এক অপরিবর্তনীয় সত্তা, যার প্রকৃতি হল ঐশ্বরিক। যেমন, অগ্নি থেকে নির্গত অগ্নি স্ফুলিঙ্গ অগ্নির সঙ্গে অভিন্ন তেমনি যে জীবাত্মা ঈশ্বর থেকে উদ্ভূত সেই জীবাত্মা ঈশ্বরের সঙ্গে অভিন্ন। জীবাত্মার এই প্রকৃতি স্বীকার করে নিলেই জীবাত্মার জন্মান্তর গ্রহণ এবং জন্মান্তরের মধ্য দিয়ে তার বিবর্তনকে সমর্থন করা চলে। আত্মা নিত্য, শাশ্বত সত্তা হওয়াতে, আত্মার জন্ম ও মৃত্যুকে যথাক্রমে সম্পূর্ণ নতুন প্রারম্ভ বা পরিপূর্ণ বিনাশ রূপে গ্রহণ করা চলে না, বরং জীবাত্মার পুনর্জন্ম অর্থে নতুন দেহধারণ এবং মৃত্যু অর্থে জীর্ণ দেহ পরিত্যাগ করা বোঝায়। গীতায় বলা হয়েছে "যেমন মনুষ্য জীর্ণ বস্ত্র পরিত্যাগ করে নতুন বস্ত্র গ্রহণ করে সেইরূপ আত্মা জীর্ণ শরীর পরিত্যাগ করে অন্য নতুন শরীর পরিগ্রহ করে।"[2]

জন্মান্তরবাদের দার্শনিক ব্যাখ্যা

গীতার উক্তি

আত্মার শাশ্বত প্রকৃতি যেমন জীবের জন্মান্তর গ্রহণ সম্ভব করে তোলে, ঈশ্বরের সঙ্গে জীবাত্মার অভিন্নতা জন্মান্তর গ্রহণের বিষয়টিকে তাৎপর্যপূর্ণ করে তোলে। বেদে, উপনিষদে এবং ভগবদ্‌গীতায় বলা হয়েছে যে জীবাত্মা স্বরূপতঃ ঈশ্বরের সঙ্গে অভিন্ন। কিন্তু জাগতিক বস্তুর প্রতি আসক্তি বশতঃই আত্মাকে দেহ ধারণ করতে হয়। জীবের একাধিক জন্মগ্রহণের কারণ হল তার ভোগাকাঙ্ক্ষা। গীতায় বলা হয়েছে "পুরুষ প্রকৃতির সংসর্গবশতঃ

আসক্তিবশতঃ আত্মার দেহধারণ

1. গীতা ২।২০—২৫
2. গীতা—২।২২

প্রকৃতির গুণ অর্থাৎ, সত্ত্ব, রজঃ, তমোগুণের ধর্ম সুখ দুঃখ মোহাদিতে আবদ্ধ হয়ে পড়েন এবং আমি সুখী, আমি দুঃখী, আমি কর্তা, আমার কর্ম ইত্যাদি অভিমান করতঃ কর্ম নাশে আবদ্ধ হন। এই সকল কর্ম ফলভোগের জন্য তাকে বার বার জন্ম গ্রহণ করতে হয়।" সুতরাং 'এই প্রকৃতির সংসর্গ থেকে মুক্ত হতে না পারলে তার জন্মকর্মের বন্ধন থেকে নিস্তার নেই।' আত্মা পরমাত্মা থেকে ভিন্ন, এবং দেহ-মন সংগঠনের সঙ্গে অভিন্ন, এই ভ্রান্ত ধারণার জন্যই আত্মার পুনঃ পুনঃ দেহধারণ। জীবাত্মা তার যথাযথ স্বরূপ সাময়িকভাবে বিস্মৃত হয় সত্য, কিন্তু জীবাত্মার ঐশ্বরিক প্রকৃতি লুপ্ত হয় না এবং জীবাত্মাকে তার সুপ্ত ঐশ্বরিক প্রকৃতিকে লাভ করার জন্য উদ্বুদ্ধ করে। জীব পুনঃ-পুনঃ জন্ম গ্রহণের মধ্য দিয়ে তার লক্ষ্য লাভ করার দিকে চালিত হয়। অর্থাৎ জীবের সঙ্গে তার ঐশ্বরিক প্রকৃতির তাদাত্ম্যের উপলব্ধি—এই লক্ষ্যে উপনীত না হওয়া পর্যন্ত জীবের পুনর্জন্মের নিরোধ ঘটে না। বস্তুতঃ এই ধারণাই পুনর্জন্মের বিষয়টিকে তাৎপর্যময় করে তোলে। সকল বদ্ধ জীবই এই পুনর্জন্মের অধীন। কাজেই পুনর্জন্ম কোন রহস্যময় অদৃষ্টের খেয়াল খুশীর ব্যাপার নয়, এক ঐশ্বরিক পরিকল্পনার বা জগতের নৈতিক শৃঙ্খলার অংশ স্বরূপ।

আত্মা ও পরমাত্মা স্বরূপতঃ এক

(xv) **হিন্দুধর্মে কর্মবাদ: (The Law of a Karma in Hindu Religion):** হিন্দুধর্ম ও দর্শন এক শাশ্বত নৈতিক শৃঙ্খলায় বিশ্বাসী। কেন কিছু লোক সুখ ভোগ করে, অপরেরা দুঃখ ভোগ করে—কর্মবাদের মধ্যে তার একটা উত্তর খুঁজে পাওয়া যায়। কর্মবাদ অনুযায়ী মানুষকে তার কৃতকর্মের ফল অবশ্যই ভোগ করতে হবে, যে যেরূপ কর্ম করবে তাকে সেরূপ ফলভোগ করতে হবে। জীব কর্মানুযায়ী ফলভোগ করে, সৎ কর্মের ফল পুণ্য ও সুখ, অসৎ কর্মের ফল পাপ এবং দুঃখ। কোন জীবের পক্ষেই কর্ম ফলকে এড়ান সম্ভব নয়। এই কর্মবাদের উপরই জন্মান্তরবাদ প্রতিষ্ঠিত। জীব যে সকল কর্ম করে তার ফলভোগ এক জীবনে শেষ না হলে জীবকে নতুন জন্ম পরিগ্রহ করে ফলভোগের জন্য সংসারে আসতে হয়।

মানুষকে কৃতকর্মের ফলভোগ করতে হবে

কর্মবাদ অনুসারে কর্ম তিন প্রকার—সঞ্চিত, প্রারব্ধ এবং সঞ্চীয়মান। যেসব কর্মের ফলভোগ হয়নি তারাই সঞ্চিত কর্ম নামে অভিহিত। প্রারব্ধ কর্ম হল পূর্বকৃত কর্মফল অর্থাৎ সেই সব কর্ম যা অতীতে সম্পাদিত হয়েছে কিন্তু যার ফলভোগ সুরু হয়ে গেছে। যেসব কর্ম করার জন্য আমরা দেহধারণ করেছি এবং এই স্বভাব বা প্রকৃতি লাভ করেছি তাদের হেতু

সঞ্চিত, প্রারব্ধ ও সঞ্চীয়মান কর্ম

প্রারব্ধের কর্মরাশি। সঞ্চীয়মান কর্ম হল সেই সব কর্ম যেগুলি এই জীবনে সম্পাদিত হচ্ছে এবং যার ফলভোগ মানুষ এই জীবনেই ভোগ করতে পারে অথবা পরজীবনেও ভোগ করতে পারে।

কর্মের ফলভোগ করতেই হবে, কর্মফল কখনও বিনষ্ট হয় না। তবে সকাম কর্মের জন্যই জীবকে ফলভোগ করতে হয়, নিষ্কাম কর্মের জন্য জীবকে ফলভোগ করতে হয় না। রাগ, দ্বেষ ও মোহযুক্ত হয়ে যে কর্ম করা যায় তা সকাম। এই সকাম কর্ম বাসনা থেকে উদ্ভূত এবং সংসারের প্রতি জীবের বন্ধন সূচনা করে। কিন্তু জগৎ ও জীবনের স্বরূপ জেনে এবং রাগ, দ্বেষ ও মোহমুক্ত হয়ে যদি কর্ম সম্পাদন করা হয় তাহলে সেই কর্ম হল নিষ্কাম কর্ম। নিষ্কাম ভাবে বেদবিহিত কর্ম সম্পাদন করলে সঞ্চিত কর্মফল বিনষ্ট হয় এবং কর্মফলভোগের সম্ভাবনা না থাকায় পুনর্জন্ম গ্রহণের কোন সম্ভাবনা থাকে না।

সকাম কর্মের জন্যই জীবের ফলভোগ

কোন কোন হিন্দুধর্ম ও দর্শন বিশ্বাস করে যে কর্মের নীতি ঈশ্বরের নিয়ন্ত্রণাধীন। পরমপুরুষ কর্মনীতি অনুযায়ী জগৎ সৃষ্টি করেন। ঈশ্বর সর্বশক্তিমান, সেহেতু তিনি কর্মের নীতির অতীত। এই নীতি ঈশ্বরের ইচ্ছা নির্ভর। ন্যায় বৈশেষিক মতে জীব কর্মানুযায়ী কর্ম ফল ভোগ করে। কর্ম অনুযায়ী সে পাপ পুণ্যের অধিকারী হয়। জীবের এই পাপ পুণ্য যার মধ্যে সঞ্চিত থাকে তার নাম অদৃষ্ট। ঈশ্বর এই অদৃষ্টের (পাপ পুণ্যের) অধিষ্ঠাতা, ঈশ্বরই জীবের কর্মফলদাতা। সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিমান ঈশ্বরই এই অদৃষ্ট শক্তিকে নিয়ন্ত্রিত করেন। আবার কোন কোন দর্শনে যেমন—সাংখ্য, মীমাংসা, বৌদ্ধ ও জৈন দর্শনে এই কর্মের নীতি স্বতঃস্ফূর্তভাবে ক্রিয়া করে, ঈশ্বরের ইচ্ছার অধীন নয়।

কারও কারও মতে কর্মের নীতি ঈশ্বরের নিয়ন্ত্রণাধীন

কেবল মাত্র সকাম কর্মের ক্ষেত্রেই কর্মবাদ ক্রিয়া করে। যখন ব্যক্তি সকাম কর্ম করা থেকে বিরত হয় তখন সে কর্মফলের প্রভাব থেকে আংশিক-ভাবে মুক্ত হয়। ব্যক্তি মোক্ষ লাভ করলে আত্মা কর্মফলের ঊর্ধ্বে চলে যায় এবং মোক্ষপ্রাপ্ত ব্যক্তি জীবের কল্যাণের জন্য ক্রিয়া করলেও কর্মের জন্য বদ্ধ হন না।

সকাম কর্মের জন্যই কর্মফলভোগ

কর্মনীতি মানুষের স্বাধীন ইচ্ছার বিরোধিতা করে না, বরং তাকে স্বীকার করে নেয়। মানুষের কৃতকর্ম তার স্বাধীন ইচ্ছার ফলস্বরূপ। মানুষ স্বাধীন ইচ্ছা বলে নিষ্কাম কর্ম সম্পাদন করে মোক্ষ লাভ করতে পারে। কর্মবাদ ঈশ্বরের সর্বশক্তিমত্তার বিরোধিতা করে না। কোন নীতি কেবল মাত্র ব্যক্ত করে একটি বিষয় কিভাবে

ক্রিয়া করে। কাজেই শুধুমাত্র কর্মবাদের সাহায্যে জগতের ব্যাখ্যা অসম্পূর্ণ হয়ে পড়ে এবং এক পরম সত্তা বা ঈশ্বরে বিশ্বাসের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়, যিনি এই জগতকে এক বিশেষ উদ্দেশ্য অনুসারে চালিত করেন। কর্মবাদ ঈশ্বরেব শক্তিমত্তাকে ক্ষুণ্ণ করে না, বরং ঐশ্বরিক শক্তি এই জগতের নৈতিক শৃঙ্খলার ক্ষেত্রে কিভাবে নিজেকে প্রকাশ করে, তাই ব্যক্ত করে। ঈশ্বর পাপীকে ক্ষমা করেন, কিন্তু তার দ্বারা কর্মবাদের বিরোধিতা করা হয় না। যখন জীব কৃতকর্মের জন্য অনুশোচনা করে তখন জীব ঈশ্বরের ক্ষমা ও করুণা লাভ করে। কাজেই পাপ ও মোক্ষ সবই কর্ম নির্ভর, সেহেতু কর্মবাদের অধীন।

কর্মনীতি স্বাধীন ইচ্ছার বিরোধী নয়

কাজেই কর্মবাদ কাজের উৎকর্ষ অপকর্ষ রূপ নৈতিক মূল্যের সংরক্ষণবাদ। মানুষ তার কৃতকর্মেরই ফলভোগ করে। এই কর্মবাদের জন্যই হিন্দু দর্শন ও ধর্ম নৈরাশ্যবাদী না হয়ে অশাবাদী এবং মানুষ যে তার কৃতকর্মের দ্বারা তার সামনে এক মহান জীবনের দ্বার উদ্ঘাটিত করতে পারে সেই প্রত্যাশা জাগিয়ে তোলে। কর্মবাদ দৈববাদ (fatalism) নয়। দৈব হল পূর্বজন্মকৃত কর্মের সমষ্টিগত শক্তি, মানুষ এই জীবনের প্রচেষ্টার দ্বারা তাকে অতিক্রম করতে পারে।

কর্মবাদ নৈতিক মূল্যের সংরক্ষণবাদ

(xvi) **হিন্দুধর্মে বন্ধন ও মোক্ষ** (The Doctrine of bondage and liberation in Hindu Religion): হিন্দুধর্মে বন্ধন ও মোক্ষ এক উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করে আছে। খ্রীষ্টধর্ম মনে করে যে আদি মানুষের কৃত পাপের জন্যই বন্ধন, ও জীবের দুঃখভোগ। হিন্দুধর্ম মতে জগৎ ও আত্মার ভ্রান্ত ধারণা অর্থাৎ অজ্ঞতার জন্যই জীবের বন্ধন। বন্ধন অর্থে জীবের পুনঃপুনঃ জন্মগ্রহণ ও পরিণামে দুঃখভোগ। মোক্ষের অর্থ এই প্রক্রিয়ার নিরোধ। হিন্দুধর্ম ও দর্শনকে অনেকে দুঃখবাদী বলেন, কিন্তু এ ধারণা যথার্থ নয়। হিন্দুধর্ম ও দর্শন সুরুতে দুঃখবাদী হলেও, পরিণামে নয়। মানুষ নিজের প্রচেষ্টায় দুঃখ থেকে মুক্তি লাভ রেতপারে। এই মোক্ষ সম্পর্কে হিন্দুধর্ম ও দর্শনে নানারকম মত লক্ষ্য করা যায়। উচ্ছেদবাদীরা মনে করে সত্তার বিনাশই মোক্ষ। ন্যায় দর্শন মতে আত্মার স্বরূপে অবস্থানই মোক্ষ। সাংখ্য মতে প্রকৃতি ও পুরুষের ভেদ জ্ঞানই দুঃখ নিবৃত্তির একমাত্র উপায়। প্রাচীন মীমাংসাকদের মতে স্বর্গ সুখলাভই মোক্ষ, পরবর্তী মীমাংসাকদের মতে আত্মার স্বরূপে অবস্থানই মোক্ষ। অদ্বৈত বেদান্ত মতে জীবাত্মার সঙ্গে পরমাত্মার একাত্মতার উপলব্ধিই মোক্ষ। রামানুজের মতে অবিদ্যাপ্রসূত কর্মই দশার কারণ। যখন জীব উপলব্ধি করে যে আত্মা ঈশ্বরের

অজ্ঞতার জন্যই জীবের বন্ধন

অংশ তখনই মোক্ষ লাভ ঘটে। ঈশ্বরের প্রতি ভক্তিই জীবের মুক্তির হেতু। ঈশ্বরের করুণা ছাড়া মোক্ষ লাভ সম্ভব নয়।

ব্রহ্মদর্শন বা ব্রহ্মলাভে এই মুক্তি, হিন্দু শাস্ত্রে সাধারণতঃ পঞ্চবিধ মুক্তি—সালোক্য, সামীপ্য, সাযুজ্য, সার্ষ্টি ও নির্বাণ। পঞ্চবিধ মুক্তি এই মুক্তিরই পঞ্চবিধ অবস্থা।

হিন্দুধর্মে আত্মসুখ ও ক্ষুদ্রস্বার্থচিন্তা পরিহার করে সকলকেই সমাজের সভ্য হিসেবে মনে করার জন্য উপদেশ দেওয়া হয়েছে। কাজেই হিন্দুদের ধর্মীয় কর্তব্য মূলতঃ সামাজিক। হিন্দুদের বর্ণাশ্রমধর্মের ধারণার মধ্য দিয়ে তার প্রকাশ ঘটেছে। বর্ণাশ্রম ধর্মের অর্থ বর্ণ ও আশ্রম অনুযায়ী ধর্ম আচরণ।

(xvii) **বর্ণাশ্রম ধর্ম** (Varnasram Dharma) : মানুষের সত্তার দুটি দিক—দৈহিক ও আত্মিক। মানুষের দৈহিক দিক তাকে ইন্দ্রিয় ভোগের জন্য লালায়িত করে, ক্ষুদ্র স্বার্থসিদ্ধির জন্য প্রণোদিত করে। মানুষের আত্মিক দিক জাগতিক কামনা বাসনার ঊর্ধ্বে বিচরণ করে, কোন জাগতিক বন্ধন স্বীকার করতে চায় না। বন্ধনদশা থেকে মুক্তিলাভ করাই তার একমাত্র লক্ষ্য। হিন্দুধর্মমতে ভিন্ন ভিন্ন জীবন পরিগ্রহণ ও দেহধারণের মাধ্যমে এক ক্রমবিকাশের ধারণায় এই মোক্ষলাভ সম্ভব হয়।

প্রবৃত্তি মার্গ ও নিবৃত্তি মার্গ

এই মোক্ষ অবস্থার পথে দুটি স্তর—একটি প্রবৃত্তির, অপরটি নিবৃত্তির—একটি ভোগের, অপরটি ত্যাগের। হিন্দুধর্মমতে দেহাশ্রয়ী আত্মা যদি মোক্ষলাভ করতে চায়, তাহলে তার উপায় হল স্বাভাবিক কামনা, বাসনা, প্রবৃত্তিকে দমন না করে, সংযতভাবে, বিচারবুদ্ধিসম্মতভাবে জাগতিক বস্তুগুলিকে ভোগ কর। একেই বলা হয় প্রবৃত্তি জীবন এবং আত্মার মোক্ষলাভের ক্রমবিকাশের পথে এই স্তরকে বলা হয় প্রবৃত্তি মার্গ।

হিন্দু শাস্ত্রে এই প্রবৃত্তি মার্গের বিস্তারিত বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে। এই মার্গ অনুসরণ করে আত্মা তার লুপ্তশক্তিকে জাগরিত করতে পারে এবং মোক্ষলাভের পথে অগ্রসর হতে পারে। এই প্রবৃত্তি-মার্গের সঙ্গেই যুক্ত হয়ে রয়েছে নিবৃত্তিমার্গ। এই ভোগের পথই ধীরে ধীরে মানুষকে ত্যাগের আধ্যাত্মিক পথের দিকে চালিত করে। মানুষের জীবনের চারটি কাম্য বস্তু হল—কাম বা ভোগ, অর্থ, ধর্ম এবং মোক্ষ।

বর্ণাশ্রম ধর্ম ঃ

চতুরাশ্রম (Four Asrams or Stages of Life) : ব্যক্তি যাতে তার জীবনের পরম লক্ষ্যকে লাভ করতে পারে, সেই কারণে হিন্দুধর্ম ব্যক্তির জীবনের প্রকৃত শিক্ষার

চতুরাশ্রমের বর্ণনা

এবং বিকাশের জন্য বর্ণাশ্রম ধর্মের প্রবর্তন করেছেন। বস্তুতঃ এই বর্ণাশ্রম ধর্মের মধ্যে প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি মার্গের অর্থাৎ ভোগের ও ত্যাগের এক অপরূপ সমন্বয় লক্ষ্য করা যায়।

প্রতিটি মানুষকে শৈশব বাদ দিয়ে জীবনের চারটি পর্যায় বা স্তর অতিক্রম করতে হয়—ব্রহ্মচর্য বা ছাত্রজীবন, গার্হস্থ্য বা পারিবারিক জীবন, বানপ্রস্থ বা কর্ম থেকে অবসরপ্রাপ্তি এবং সন্ন্যাস বা ভোগবিরতির জীবন।

চারটি আশ্রমের বিশদ বর্ণনা

চতুরাশ্রমের প্রথম আশ্রম হল ব্রহ্মচর্য। শিশুকে পাঁচ বা আট বৎসর বয়সে গুরুগৃহে গমন করে গুরুর কাছে দীক্ষা গ্রহণ করতে হয় এবং গুরুগৃহে গুরুর তত্ত্বাবধানে অধ্যয়নে রত থাকতে হয়। গুরুগৃহে থাকাকালীন ছাত্র বিভিন্ন শাস্ত্র অধ্যয়ন করে এবং ব্রহ্মচারীর জীবন যাপন করে। ছাত্রকে আত্মসংযমী, মিতব্যয়ী, পরিশ্রমী ও কঠোর জীবন যাপন করতে হয়। দ্বিতীয় আশ্রম হল—গার্হস্থ্য বা পারিবারিক জীবন: গুরুগৃহে থেকে অধ্যয়ন সমাপ্ত করে ব্যক্তি নিজগৃহে প্রত্যাবর্তন করে এবং বিবাহ করে পারিবারিক জীবনের কর্তব্য ও দায়িত্বভার গ্রহণ করে। হিন্দুধর্মে বিবাহ একটি ধর্মীয় সামাজিক অনুষ্ঠান। প্রতিটি গৃহস্থকেই প্রতিদিন পাঁচটি যজ্ঞের অনুষ্ঠান করতে হয়। দেবযজ্ঞ—দেবতার উপাসনা ও ভজনা: পিতৃযজ্ঞ—পূর্বপুরুষের উদ্দেশ্যে তর্পণ করা: ঋষিযজ্ঞ—বেদ, উপনিষদ প্রভৃতি ধর্মশাস্ত্র পাঠ করা: নৃযজ্ঞ ও ভূত যজ্ঞ—অন্যান্য মানুষের ও মনুষ্যেতর জীবের সেবা করা, দান-ধর্ম করা। হাসপাতাল, পুষ্করিণী প্রভৃতি প্রতিষ্ঠা করা। তৃতীয় আশ্রম—বানপ্রস্থ। প্রবৃত্তি মার্গ প্রথম ও দ্বিতীয় আশ্রমের অন্তর্ভুক্ত, গার্হস্থ্য জীবনের কর্তব্য যথাবিহিত সম্পাদন করার ফলেই ব্যক্তির পরবর্তী দুটি আশ্রমে প্রবেশের অধিকার জন্মায়। পঞ্চাশ বৎসর বয়স পর্যন্ত গার্হস্থ্য জীবনের কর্তব্য সমাপন করার পর ব্যক্তির কর্তব্য সক্রিয় কর্মজীবন থেকে অবসর গ্রহণ করে কোন নির্জন পরিবেশে অবসর জীবন যাপন করা। সন্ন্যাস হল চতুরাশ্রমেব শেষ আশ্রম। এই অবস্থায় ব্যক্তি জাগতিক সকল প্রকার ভোগ এমনকি যজ্ঞাদি অনুষ্ঠান থেকেও বিরত হয়ে কেবলমাত্র ঈশ্বরের ধ্যানে মগ্ন থাকে। এই স্তরে চিত্ত সর্বকামনাশূন্য হয়ে আত্মাতেই অবস্থিতি করে।

হিন্দুধর্মের বর্ণবিভাগ

হিন্দুসমাজ চারটি বর্ণে বিভক্ত: (১) ব্রাহ্মণ, (২) ক্ষত্রিয়, (৩) বৈশ্য এবং (৪) শূদ্র। জন্ম বা বংশগতি অনুসারে এই শ্রেণীবিভাগ করা হয়নি। জীবের স্বভাব বা প্রকৃতির গুণ ভেদবশতঃই বর্ণভেদ ও কর্মভেদ শাস্ত্রে বিহিত হয়েছে। চতুর্বর্ণের উৎপত্তির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে গীতায় স্পষ্টই বলা হয়েছে—'চতুর্বর্ণং ময়া সৃষ্টং, গুণকর্ম বিভাগশঃ' অর্থাৎ গুণ ও কর্মের বিভাগানুসারে বর্ণচতুষ্টয়ের সৃষ্টি হয়েছে। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্রদের কর্মসমূহ স্বভাবজাত গুণের দ্বারা বিভক্ত এবং এদের এক এক জনের স্বভাবে এক একটি গুণের প্রাধান্য।

মানুষ নিজ নিজ কর্তব্য সম্পাদন করে তার ব্যক্তিগত কল্যাণ এবং সামাজিক কল্যাণ লাভ করতে পারে। হিন্দুধর্মমতে নিজের নির্দিষ্ট কর্তব্য পরিত্যাগ করে অপরের কর্তব্য সম্পাদন করা উচিত নয়। এ হল হিন্দুধর্মমতে অধিকারভেদে ধর্মনির্দেশ।

(xviii) **হিন্দুধর্মে পরমার্থ লাভের বিভিন্ন পথ** (Different Paths of realisation of the supreme end) : হিন্দুধর্মে পরমার্থ লাভের বিভিন্ন পথ নির্দেশ করা হয়েছে। বিশেষ করে তিনটি পথের উল্লেখ আমরা দেখতে পাই—জ্ঞান, কর্ম ও ভক্তি। (১) **জ্ঞানমার্গ :** জ্ঞানবাদীরা মনে করেন যে জ্ঞানের পথই পরমার্থ বা মোক্ষলাভের শ্রেষ্ঠ পথ, কর্মের পথ নয়। নামরূপাত্মক দৃশ্য প্রপঞ্চের অতীত যে নিত্য, শাশ্বত, অক্ষয়, অব্যয়, অনাদিতত্ত্ব, তাই পরমতত্ত্ব, তাই ব্রহ্ম। জ্ঞান যোগে তাকেই জানতে হবে। আত্মতত্ত্ব ও ব্রহ্মতত্ত্ব এক। জীব মায়ামুক্ত হলে এই একত্ব জ্ঞান লাভ করে। শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন আত্মজ্ঞান বা ব্রহ্মজ্ঞান লাভের তিনটি প্রয়োজনীয় অঙ্গ। শ্রবণ ব্রহ্মজ্ঞানের প্রথম সোপান। এর অর্থ গুরুর কাছ থেকে উপনিষদের বাণী শ্রবণ। দ্বিতীয় সোপান মননের অর্থ যৌক্তিক বিশ্লেষণের সাহায্যে এই উপদেশের তাৎপর্য উপলব্ধি। তৃতীয় ও চরম সোপান নিদিধ্যাসনের অর্থ বুদ্ধি অনুমোদিত তত্ত্বের নিরবচ্ছিন্ন ধ্যান। এরই মাধ্যমে পরমজ্ঞান লাভ হয়। এরই নাম প্রজ্ঞা। এরই মাধ্যমে তত্ত্বের প্রত্যক্ষ দর্শন ও সাক্ষাৎ উপলব্ধি হয়।

জ্ঞানমার্গ

(২) **ভক্তিমার্গ :** জ্ঞানমার্গ খুবই কঠিন ; সেকারণে এই পথ সকলের জন্য নয়, সীমিত কয়েকজনের জন্য। নির্গুণ, নির্বিশেষ ব্রহ্ম, যাকে জগৎ স্রষ্টা, প্রভু বা ঈশ্বর কোন ভাবেই বর্ণনা করা যায় না, তাকে ধারণা করা মানুষের পক্ষে কঠিন এবং তার সঙ্গে ভাবভক্তির সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠা করাও মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। সাধারণ মানুষ পরমতত্ত্বকে যতখানি হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করতে চায় ততখানি বুদ্ধি দিয়ে অনুভব করতে চায় না। তাই এসে পড়ে সগুণ ব্রহ্ম বা ঈশ্বরের কল্পনা এবং ভক্তির মাধ্যমে ভক্তের ঈশ্বর সাক্ষাৎকারের কথা। উপাসনা ভক্তিমার্গের সাধনা, ভক্তিমার্গের প্রাণ। অনুরাগই ভক্তির স্বরূপ। ভক্তিশাস্ত্রে নয় প্রকার ভক্তির সাধন উল্লিখিত আছে। যেমন—শ্রবণ, কীর্তন, স্মরণ, পদসেবা, অর্চনা, বন্দনা, দাস্য, সখ্য, আত্মনিবেদন। ভগবানই একমাত্র আশ্রয়—একমাত্র অগতির গতি—এই ভাব অবলম্বন করে ভগবানে আত্মসমর্পণই ভক্তিমার্গের একটি প্রধান ভাব।

ভক্তিমার্গ

(৩) **কর্মমার্গ :** কর্মমার্গ পরমার্থ লাভের জন্য নিষ্কাম কর্ম সম্পাদনের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছে। রাগদ্বেষমোহমুক্ত হয়ে যে কর্ম সম্পাদন করা হয় তাই হল

নিষ্কাম কর্ম। গীতায় নিষ্কাম কর্ম সাধনের কথা বলা হয়েছে। জীব অনাসক্তভাবে, কর্মের ফলাফলে উদাসীন হয়ে, নির্দ্বন্দ্ব ও সমত্ববুদ্ধিযুক্ত হয়ে এবং ঈশ্বরে সর্ব-কর্মফল সমর্পণ করে যদি কর্ম করে তবে সেই কর্মে কোন বন্ধন হয় না।

(xix) **হিন্দুধর্মে আনুষ্ঠানিক ধর্ম:** প্রত্যেক ধর্মকেই কতকগুলি বাহ্য কৃত্রিম অনুষ্ঠান পালন করতে হয়। হিন্দুধর্মেও কতকগুলি বাহ্য কৃত্রিম অনুষ্ঠান পালনের নির্দেশ আছে। এই সব অনুষ্ঠান পালনের মধ্য দিয়ে সেই বিশেষ ধর্মাবলম্বী ব্যক্তিকে সেই ধর্মের সীমারেখার মধ্যে ধরে রাখার চেষ্টা করা হয়। এই সব অনুষ্ঠানকে ধর্মকর্ম বা আনুষ্ঠানিক ধর্ম বলে।

ধর্মকর্ম তিন প্রকার—কায়িক, বাচিক এবং মানসিক। দেবতাদের উদ্দেশ্যে অর্থদান কায়িক কর্ম, দেবতার স্তোত্র পাঠ ও নাম জপ বাচিক ধর্ম, দেবতার উপাসনা মানসিক ধর্ম। ধর্মকর্মের লক্ষ্য হল চিত্তের শুদ্ধিতা।

ধর্মকর্ম দু' শ্রেণীতে ভাগ করা যেতে পারে—বিহিত ও নিষিদ্ধ। যে সব কর্ম চিত্তশুদ্ধির সহায়ক সেগুলি বিহিত কর্ম। যে সব কর্ম চিত্তশুদ্ধির পথে বাধাস্বরূপ সেগুলি নিষিদ্ধ কর্ম। শাস্ত্রবিধিবিহিত কর্ম মানুষকে চিত্তশুদ্ধিতে প্রবৃত্ত করে এবং নিষিদ্ধ কর্ম থেকে মানুষকে নিবৃত্ত করে। মদ্যপান, চৌর্য হল নিষিদ্ধ কর্মের উদাহরণ।

বিহিত কর্ম ও নিষিদ্ধ কর্ম

বিহিত কর্ম চার শ্রেণীর—নিত্য, নৈমিত্তিক, কাম্য এবং প্রায়শ্চিত্ত। সন্ধ্যা-বন্দনা হল নিত্যকর্ম, এই কর্ম প্রতিদিন সম্পাদন করতে হয়। কোন নিমিত্তকে উপলক্ষ্য করে যে কর্ম করা হয় তা নৈমিত্তিক কর্ম। যেমন, গ্রহণ উপলক্ষ্যে নদীতে বা গঙ্গায় স্নান। ষোড়শবিধি বা দশবিধি সংস্কারও নৈমিত্তিক কর্ম। কোন কামনা সিদ্ধির জন্য যখন কোন কর্ম করা হয় তা হল কাম্য কর্ম, যেমন—পুত্রেষ্টি যজ্ঞ। ইহজন্মের বা পূর্বজন্মের পাপ নাশ করার জন্য যে ক্রিয়া সম্পাদন করা হয় তা হল প্রায়শ্চিত্ত, যেমন—উপবাস। বেদ, স্মৃতি, পুরাণ এবং তন্ত্র যুগপোযোগী বিভিন্ন কর্মের নির্দেশ দিয়েছে। বেদবিহিত কর্মকে বৈদিক কর্ম, স্মৃতিবিহিত কর্মকে স্মার্ত কর্ম, পুরাণবিহিত কর্মকে পৌরাণিক কর্ম এবং তন্ত্রবিহিত কর্মকে তান্ত্রিক কর্ম বলা হয়।

যজ্ঞই বেদবিহিত কর্ম। বৈদিক কর্ম প্রধানতঃ তিন প্রকার—(১) অগ্নিহোত্র যোগ—'এটি প্রতি দিন প্রত্যেক দ্বিজ সাগ্নিক গৃহীর যাবজ্জীবন অবশ্য করণীয় ছিল।' অগ্নিহোত্র যোগে তিনটি অগ্নিতে আহুতি দেবার বিধি আছে। এই যোগে প্রতিদিন সূর্য ও অগ্নি—এই দুই দেবতার পূজা করা হয়। (২) সন্ধ্যাবন্দনা—সন্ধ্যাকালে ঈশ্বরের বন্দনা। (৩) স্বাধ্যায়—বেদ, উপনিষদ প্রভৃতি হিন্দুশাস্ত্র পাঠ।

বেদবিহিত নৈমিত্তিক কর্মে ইষ্টিযাগ ও পশুযাগ—এই দুই যাগ এবং ষোড়শ সংস্কার

বুঝায়। ইষ্টিযাগ বলতে বোঝায় যজমানের প্রতি অমবস্যায় ও পূর্ণিমায় যজ্ঞীয় অগ্নিতে ইন্দ্রদেবতার উদ্দেশ্যে 'অগ্নয়ে স্বাহা', 'সোমায় স্বাহা'—এই দুটি মন্ত্রোচ্চারণের সঙ্গে দধি আহুতি দেওয়া। পশুযাগে পশুবলি দেওয়া বিধেয়। ষোড়শ সংস্কারের অর্থ মন্ত্রের দ্বারা শোধন। নিজ নিজ ধর্মানুযায়ী কতকগুলি নির্দিষ্ট বাহ্য অনুষ্ঠান দ্বারা মানবজীবনের শোধন বা সংস্কার প্রায় সব ধর্মেই স্থান পেয়েছে। হিন্দুধর্মে মাতৃগর্ভে গর্ভসঞ্চারের সময় থেকে জন্ম হওয়ার পর মৃত্যু পর্যন্ত, সমগ্র মানবজীবনের বিভিন্ন স্তরে এক একটি সংস্কারের ব্যবস্থা করা হয়েছে। যেমন—গর্ভাধান, পুংসবন, সীমন্তোন্নয়ন, জাতকর্ম, নামকরণ, নিষ্ক্রমণ, অন্নপ্রাশন, মুণ্ডন, কর্ণবেধ, উপনয়ন, বেদারম্ভ, সমাবর্তন, বিবাহ, বানপ্রস্থ, সন্ন্যাস এবং অন্ত্যেষ্টি।

বেদবিহিত নৈমিত্তিক কর্ম

অর্থ, পুত্র-সন্তান, স্বর্গ প্রভৃতি কামনায় যে শাস্ত্রবিহিত অনুষ্ঠান সম্পাদিত হয় তাকেই কাম্যকর্ম বলে। এইসব বেদবিহিত কাম্য কর্মের মধ্যে সোমযাগ, অশ্বমেধ, রাজসূয় প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। যজ্ঞের অন্তর্নিহিত তাৎপর্য হল স্বার্থবলি, মমত্ববোধ বিসর্জন দিয়ে আহরণীয় অগ্নিতে দেবতার উদ্দেশ্যে দ্রব্যের আহুতি।

স্মৃতিবিহিত কর্ম হল স্মার্ত কর্ম। স্মৃতি বেদকে অনুসরণ করে, সেকারণে স্মার্ত কর্মের সঙ্গে বৈদিক কর্মের কোন বিরোধ নেই। বৈদিক কর্ম ক্রমশঃ অপ্রচলিত হওয়াতে স্মৃতিকার ব্যক্তি ও সমাজের কল্যাণের জন্য বেদবিহিত কর্মকে যুগপোযোগী করতে সচেষ্ট হন। স্মৃতিবিহিত নিত্যকর্ম হল পঞ্চমহাযজ্ঞ। মানুষ দেবতাদের, স্বর্গীয় পূর্বপুরুষ, অপর ব্যক্তি, সত্যদ্রষ্টা ঋষিদের ও মানবেতর অপর প্রাণীর কাছে ঋণী। দেবতাদের জন্যই মানুষ বায়ুতাপ ভোগ করে; স্বর্গীয় পূর্বপুরুষদের বংশে তাদের জন্ম হয়েছে। সেই কারণে তারা বংশ গৌরব অনুভব করে. সত্যদ্রষ্টা ঋষিদের রচিত শাস্ত্র পাঠ করে অতীন্দ্রিয় দিব্যজ্ঞানের অধিকারী হয়েছে। মানুষ অপর ব্যক্তির কাছে নানাভাবে সাহায্যপ্রাপ্ত এবং মানবেতর প্রাণী গরু, ছাগল প্রভৃতির কাছেও নানাভাবে উপকার প্রাপ্ত। মানুষের ঋণ পাঁচ প্রকার —দেবঋণ, পিতৃঋণ, ঋষিঋণ, নৃ-ঋণ এবং ভূতঋণ। এই পঞ্চবিধ ঋণ পরিশোধ করা প্রত্যেক মানুষের কর্তব্যকর্ম। আত্মত্যাগের মাধ্যমে এই ঋণ পরিশোধ হয় বলে এক এক ঋণ পরিশোধ এক এক যজ্ঞ নামে অভিহিত। যেমন—দেবযজ্ঞ, পিতৃযজ্ঞ, ঋষিযজ্ঞ, নৃ-যজ্ঞ ও ভূতযজ্ঞ।

স্মৃতিবিহিত কর্ম

স্মৃতি-বিহিত নৈমিত্তিক কর্মের মধ্যে দশবিধ সংস্কার ও বর্ণবৃত্তি উল্লেখযোগ্য। স্মৃতিকার বৈদিক ঋষিদের ষোড়শ সংস্কার থেকে দশটি নির্বাচন করে নিয়েছেন।

এগুলিই দশবিধ সংস্কার নামে খ্যাত। গর্ভাধান, পুংসবন, সীমন্তোন্নয়ন জাতকর্ম, নামকরণ, নিষ্ক্রমণ, অন্নপ্রাশন, চূড়াকরণ, উপনয়ন এবং বিবাহ।

পঠন, পাঠন, যজ্ঞ করা ও করান, দান এবং পরিগ্রহ এই কয়টি ব্রাহ্মণের বৃত্তি। ক্ষত্রিয়ের বৃত্তি দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন, যজ্ঞানুষ্ঠান, অধ্যয়ন ও বিষয়ে আসক্তি। পশুপালন, দান, যজ্ঞানুষ্ঠান, ব্যবসা, কুষীদ ও কৃষিকাজ বৈশ্যের বৃত্তি। শূদ্রের বৃত্তি হল পরিচর্যা। স্মৃতিশাস্ত্রেও পাপের গুরুত্ব অনুসারে প্রায়শ্চিত্তের বিধান আছে। দেহে ক্লেশসৃষ্টি করে, এরূপ কষ্টসাধ্য ব্রতাচরণই প্রায়শ্চিত্ত। প্রায়শ্চিত্ত নানাপ্রকার হতে পারে—কৃচ্ছ্র, অতিকৃচ্ছ্র কৃচ্ছ্রাতি কৃচ্ছ্র, চান্দ্রায়ন, পঞ্চতপা ইত্যাদি। পুরাণে বিধিবদ্ধ বারব্রত উপবাস, উৎসব-পার্বণ, তীর্থপর্যটন প্রভৃতি কর্ম পৌরাণিক কর্ম। বৈদিক যাগযজ্ঞ রূপান্তরিত হয়ে তান্ত্রিক হোমে পরিণত হয়েছে। তন্ত্রে মারণ, উচ্চাটন, বশীকরণ ইত্যাদি কতকগুলি নিকৃষ্ট কর্মের বিধান আছে সত্য, কিন্তু সেগুলিই তন্ত্রের সারকথা নয়। পুত্র, অর্থ, স্বর্গ কামনায় কাম্য কর্মের নির্দেশ তন্ত্রেও দেওয়া হয়েছে। প্রায়শ্চিত্তের বিধানও আছে। তন্ত্রে নিত্যকর্মের মধ্যে ষট্‌কর্মের বিধান আছে—স্নান, জপ, হোম, শাস্ত্রাধ্যয়ন, দেবপূজা এবং অতিথি সেবা। তান্ত্রিক সন্ধ্যা ত্রিকালিক।

পুরাণে বিধিবদ্ধ কর্ম

উপসংহারে বলা যেতে পারে যে, হিন্দুধর্ম পৃথিবীর প্রচলিত ধর্মগুলির মধ্যে এক সুমহান ঐতিহ্যপূর্ণ ধর্ম। পরধর্ম সহিষ্ণুতা হিন্দুধর্মের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। হিন্দুধর্ম অপর ধর্মমতের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। অন্য ধর্মে স্বধর্ম ভ্রাতৃত্বই বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয়। কিন্তু হিন্দুধর্ম বিশ্বভ্রাতৃত্বের পূর্ণ আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত। সকলেই এক ঈশ্বরের সন্তান, এই বোধ থেকেই বিশ্বভ্রাতৃত্বের বোধের উদ্ভব নয়; একই পরব্রহ্ম বিশ্বের সর্বত্র পরিব্যাপ্ত এবং আমাদের হৃদয়ে অধিষ্ঠিত, জীবাত্মা ও পরমাত্মা মূলতঃ অভিন্ন—এই বোধের উপরই বিশ্বভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত। হিন্দুধর্ম অধিকারভেদ বিশ্বাস করে। হিন্দুধর্মে ব্যক্তির অবস্থা, গুণ, রুচি, প্রকৃতি ও ধীশক্তি অনুযায়ী সাধনার ব্যবস্থা আছে, যা অন্য ধর্মে নেই। জ্ঞানী একভাবে সাধনা করতে পারে, ভক্ত একভাবে, কর্মী একভাবে, সন্ন্যাসী একভাবে, গৃহী একভাবে সাধনা করতে পারে। হিন্দুধর্মের সার্বভৌমিকতা তার অন্যতম বৈশিষ্ট্য, বেদ সব ধর্মের মূল। জগতে এমন কোন ধর্ম দেখা যায় না যার মূলতত্ত্ব বেদে সন্ধান করলে পাওয়া যাবে না। পরিবর্তনশীলতা হিন্দুধর্মের আর এক উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। হিন্দুধর্ম প্রচারিত শাশ্বত সনাতন সত্যগুলিকে প্রয়োজনবোধে যুগোপযোগী করার জন্য পরিবর্তিত করা হয়েছে যাতে সাধারণ মানুষ ঐসব সত্যের

হিন্দুধর্ম পরমতসহিষ্ণু

হিন্দুধর্ম সার্বভৌমিক

মূলতত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করতে পারে। হিন্দুধর্ম দুঃখবাদী, এই অভিযোগ সত্য নয়, বরং হিন্দুধর্ম পরম আশাবাদী। হিন্দুধর্মই যথার্থ আত্মনির্ভরতা শিক্ষা দেয়। হিন্দুধর্মই প্রচার করে যে, প্রতিটি মানুষ নিজের প্রচেষ্টায় সাধনার দ্বারা মোক্ষ লাভ করতে পারে। হিন্দুধর্ম সুরুতে দুঃখবাদী হলেও পরিণামে নয়। হিন্দুধর্মের মূলমন্ত্র অভীঃ। হিন্দুধর্ম মানুষকে স্বার্থমুক্ত হয়ে আত্মত্যাগের মহান আদর্শে দীক্ষিত করে। হিন্দুধর্মই মানুষকে সর্বপ্রকার ভয় পরিহার করতে বলে, মৃত্যু ভয় বর্জন করতে বলে। হিন্দুধর্মই বলে—মানুষ অজর, অমর; জরামরণভীতি তাকে স্পর্শ করতে পারে না। হিন্দুধর্মই বলে জীব অমৃতের সন্তান। জীব শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত আত্মা। মায়ার দ্বারা আবদ্ধ হওয়ার জন্যই জীব নিজেকে ক্ষুদ্র, বদ্ধ, নীচ মনে করে। সব মোহ দূর করে সত্যে পরিপূর্ণ বিশ্বাসই হিন্দুধর্মের সার কথা।

হিন্দুধর্ম আশাবাদী

২। ইসলাম ধর্ম (Islam)ঃ

পৃথিবীর বর্তমান বৃহৎ ধর্মগুলির মধ্যে ইসলাম অন্যতম। ইসলাম বিশ্বজনীন ধর্ম। খ্রীষ্টের জন্মের ছয় শত বৎসর পরে ইসলাম ধর্মের আবির্ভাব। হজরত মহম্মদ এই ধর্মের প্রবর্তক। ৫৭০ খ্রীষ্টাব্দের ২৯শে আগস্ট হজরত মহম্মদের জন্ম হয়। তিনি আরবদেশে জন্মগ্রহণ করেন। সেই সময় সেই দেশে সাকার দেবদেবীর উপাসনা প্রচলিত ছিল। হজরত মহম্মদ ছিলেন একেশ্বরবাদী এবং নিরাকার উপাসনার সমর্থক। এই কারণে তিনি সেই সময়কার প্রচলিত ধর্মের প্রতি বিদ্রোহ করেন।[1] কাজী আবদুল ওদুদ বলেন, "ইতিহাসে হজরত মহম্মদের পরিচয় ইসলাম ধর্মের প্রবর্তক রূপে। কিন্তু ইসলামের মহাগ্রন্থ কোরানের মতে ইসলামের অর্থ বিশ্বপিতায় আত্মসমর্পণ। আর সেই আত্মসমর্পণ হচ্ছে মানব-আত্মার শাশ্বত ধর্ম—জগৎ-পিতার মনোনীত ধর্ম ব্যবস্থা। এই ধর্ম সংস্থাপনের জন্য পৃথিবীর সর্বত্র ঐশ্বরিক প্রেরণা প্রাপ্ত বাণী বাহকরা যুগে যুগে আবির্ভূত হয়েছেন; হজরত মহম্মদ সেই বাণী বাহকদের অন্যতম—এই আত্মসমর্পণ-ধর্ম তাতে এসে পূর্ণাঙ্গতা লাভ করেছে"।

ইসলাম ধর্মের প্রবর্তক হজরত মহম্মদ

'মহম্মদ' শব্দের অর্থ 'প্রশংসিত'। ইসলাম শব্দের অর্থ হল ঈশ্বরের কাছে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ (to surrender) করা। কাজেই ইসলাম শব্দের ধাতুগত অর্থই নির্দেশ করে যে এই ধর্ম ব্যক্তিকে ঈশ্বরের কাছে পরিপূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ করতে বলে। 'ইসলাম' শব্দটি 'আসলামা' শব্দটির সঙ্গেও যুক্ত, যার অর্থ হল শান্তি। বস্তুতঃ, শান্তির ধারণা ইসলাম ধর্মের অন্যতম উল্লেখযোগ্য ধারণা এবং ইসলামের লক্ষ্য

1. কাজী আবদুল ওদুদ : হজরত মহম্মদ ও ইসলাম, পৃঃ ১

হল 'শান্তির আলয়' (abode of peace)। ইসলামের মূল শিক্ষা হল 'ঈশ্বরে বিশ্বাস কর এবং সৎ কার্য সম্পাদন কর।' ইসলাম শব্দের অর্থ হল শান্তি এবং পবিত্র কোরান মতে তাকেই মুসলমান বলা যেতে পারে যে ঈশ্বর এবং মানুষের সঙ্গে তার শান্তি প্রতিষ্ঠা করেছে। ঈশ্বরের সঙ্গে শান্তির অর্থ হল ঈশ্বরের ইচ্ছার কাছে পূর্ণ আত্মসমর্পণ, যে ঈশ্বর সকল পবিত্রতা ও কল্যাণের উৎস এবং মানুষের সঙ্গে শান্তির অর্থ হল মানুষের মঙ্গল সাধন করা। উভয় বিষয় কোরানে সংক্ষেপে অথচ খুব সুন্দর ভাবে ব্যক্ত হয়েছে। "যে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে আল্লার কাছে সমর্পণ করে এবং অপরের কল্যাণ সাধন করে, সে আল্লার কাছ থেকে পুরস্কার লাভ করে এবং তার কোন ভয় নেই।" পবিত্র কোরানের মতে একেই কেবল মাত্র মুক্তি বলা যেতে পারে। কেহ কেহ মনে করেন যে, ইসলামের অর্থ হল ঈশ্বরের কাছে পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণের ফলে যে পরিপূর্ণ শান্তি লাভ করা যায় তাই। পবিত্র কোরানে আল্লাকে শান্তির রচয়িতা (author of peace) নামে অভিহিত করা হয়েছে এবং ইসলামের লক্ষ্য হল শান্তির আলয় (abode of peace)। কাজেই শান্তিই হল ইসলামের সারকথা এবং ইসলাম হল বিশেষ করে শান্তির ধর্ম।

ইসলাম শব্দের অর্থ

শান্তিই ইসলামের সারকথা

ইসলাম ধর্মের অনুসরণকারীরা মুসলমান নামে পরিচিত। ইসলাম মতে সেই ব্যক্তিই মুসলমান যে প্রকৃত বিশ্বাস করে যে আল্লা এবং তাঁর প্রেরিত পুরুষ অর্থাৎ পয়গম্বরের আদেশই সম্পূর্ণ সত্য এবং এর বিরোধী যা তা সম্পূর্ণ মিথ্যা। পয়গম্বর ছাড়া যারা কেবল আল্লাকে মান্য করে, তারা ইসলাম মতে মুসলমান নয়। যে ব্যক্তি ঈশ্বরের প্রেরিত পুরুষের অর্থাৎ পয়গম্বরের আজ্ঞা পালন করে সে ঈশ্বরের আজ্ঞা পালন করে। প্রেরিত পুরুষের বিদ্রোহী হয়ে শুধুমাত্র ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাসী হলে বিশ্বাসের পূর্ণতা হয় না। ইসলামের পরিভাষায় যে ব্যক্তি আল্লার অস্তিত্বে ও একত্বে বিশ্বাস করে না এবং হজরত মহম্মদকে আল্লার প্রেরিত রসুল বলে স্বীকার করে না তাকে কাফের বলা হয়। কাফের শব্দটি 'কুফর' ধাতু থেকে উৎপন্ন। যে কুফর করে সেই কাফের। আল্লাকে অস্বীকার ও অমান্য করাও কুফর। যা কোরান শরীফের আয়ত দ্বারা পরিষ্কার রূপে নিষেধ প্রমাণিত হয়েছে তাকে হারাম বলে। যেমন, সুরাপান করা, শূকর মাংস আহার করা, সুদ গ্রহণ করা, চুরি করা ইত্যাদি।

ইসলামের মতে প্রকৃত মুসলমানের পরিচয়

কা'কে কাফের বলে

কা'কে হারাম বলে

কোরান ইসলামের পবিত্র ধর্মগ্রন্থ। 'কোর' মানে পড়, 'আন্' মানে সর্বক্ষণ।

কোর-আন্ মানে যা সব সময় পাঠ করা উচিত অর্থাৎ কোরান নিত্য পাঠের বিষয়। কোরান গ্রন্থে হজরত মহম্মদের কাছে ঈশ্বরের প্রত্যাদেশ লিপিবদ্ধ হয়েছে। ঈশ্বরের এই প্রত্যাদেশ কিভাবে তাঁর কাছে এসেছিল তার বর্ণনা পাওয়া যায়। কথিত আছে, মক্কার কয়েক মাইল দূরে অবস্থিত হেরা পর্বতের মূলদেশে একটি গুহা হজরত মহম্মদ পরিদর্শন করতে গিয়েছিলেন। সেখানে অবস্থান করার সময় একদিন রাত্রে তাঁর অদ্ভুত অভিজ্ঞতা হল। তিনি দেখলেন এক জ্যোতির্ময় দেবদূত তাঁর সম্মুখে দণ্ডায়মান। ইনি ঈশ্বর প্রেরিত দেবদূত 'জিব্রাইল'। জিব্রাইল মহম্মদকে বললেন, 'যিনি সমস্তই সৃষ্টি করেছেন তোমার সেই প্রভুর নাম পাঠ কর।" মহম্মদ ঈশ্বরের সম্পূর্ণ প্রত্যাদেশটি উদ্ধৃত করতে সমর্থ হয়েছিলেন। মহম্মদ এই অভিজ্ঞতায় অভিভূত হয়ে পড়েছিলেন। দিশাহারা হয়ে তিনি তাঁর পত্নী খাদিজার কাছে ছুটে গেলেন। খাদিজা তাকে জানালেন যে ঈশ্বরের ইচ্ছায় তাঁর মহান সত্যের উপলব্ধি ঘটেছে। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস যে ঈশ্বরের কোন মহান উদ্দেশ্য মহম্মদের দ্বারা সাধিত হবে। কিন্তু হজরত মহম্মদ সহধর্মিণীর কথায় তেমন আশ্বস্ত হতে পারলেন না। তিনি দেবদূত জিব্রাইলকে দেখার জন্য পর্বত থেকে পর্বতে ঘুরে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। তারপর একদিন তিনি শুনতে পেলেন জিব্রাইলের বাণী 'হে মহম্মদ, তুমি ঈশ্বরের দূত, আর আমি জিব্রাইল'। তখন তিনি সুনিশ্চিত হলেন যে তিনি ঈশ্বর প্রেরিত দূত।

কোরান ইসলামের ধর্মগ্রন্থ

হজরত মহম্মদের কাছে ঈশ্বরের প্রত্যাদেশের বর্ণনা

স্বর্গীয় দেবদূতের বক্তব্যের প্রামাণ্যে সুনিশ্চিত বোধ করার পর হজরত মহম্মদ ঈশ্বরের বাণী প্রচার করতে লাগলেন এবং তাঁর শিক্ষা থেকেই ইসলাম ধর্মবিশ্বাসের উদ্ভব। হজরত মহম্মদ যে ঐশ্বরিক অনুপ্রেরণা লাভ করেছিলেন, তাই পবিত্র ধর্মগ্রন্থ কোরানে প্রকাশিত হয়েছে। অবশ্য হজরত মহম্মদ যা প্রচার করেছিলেন এবং কোরানে যা লিপিবদ্ধ হয়েছে, সে সবই হল ঈশ্বরের বাণী যা হজরত মহম্মদ শ্রবণ করেছিলেন। ঈশ্বরের বাণী হিসেবে কোরানের কোন বাণীই মানুষের বাণী নয়। আসল ধর্মগ্রন্থ কোরান ইসলাম ধর্মমত অনুযায়ী 'অপৌরুষেয়'—কোন মানুষের সৃষ্ট নয়।

'ঈমান' অর্থাৎ বিশ্বাস এবং 'ইসলাম; অর্থাৎ আত্মসমর্পণ—এ দুটিই ইসলাম ধর্মের সুমহান নীতি। ইমান বলতে বোঝায় আল্লার পবিত্র গ্রন্থে, হজরত মহম্মদ পূর্ববর্তী পয়গম্বরের কথায়, হজরত মহম্মদের বাণীতে এবং তার পরবর্তী পয়গম্বরদের বাণীতে বিশ্বাস। ইমান হল বিশ্বাস ও কার্যের মিশ্রিত রূপ। ইসলামের অর্থ ঈশ্বরের কাছে আত্মসমর্পণ, যে আত্মসমর্পণ বিশ্বাস থেকে উদ্ভূত। 'ইমান' ও 'ইসলাম' একই

ধর্মীয় মনোভাবের দুটি দিক। ইমান মানুষের বিশ্বাসের তাত্ত্বিক দিক আর 'ইসলাম' হল তার প্রয়োগের দিক। ' বিশ্বাসের আবার তিনটি স্তর আছে—(১) ধর্মমতের স্বীকৃতি, (২) বিশ্বাসীর অন্তরে বিশ্বাসকে সুদৃঢ় ভাবে স্থাপন, (৩) আত্মোৎসর্গ ও ভালবাসার মধ্য দিয়ে ঐ বিশ্বাসের প্রকাশ। আসলে বিশ্বাস হল 'মুখে উচ্চারণ, অর্থ বুঝে অন্তরের সাথে বিশ্বাস এবং বাহ্যতঃ সৎকর্ম সম্পাদন।' কোরান শরীফে বলা হয়েছে, 'তোমাদের প্রিয় জিনিসগুলি যদি আল্লার জন্য উৎসর্গ না কর, তাহলে পুণ্যের ফল তোমরা কিছুতেই পেতে পারবে না'। এইআয়তটিই হল ইসলাম ও ইমানের মূল কথা। ইসলামের আসল দাবি হল তোমাদের সব প্রিয় জিনিসকে আল্লার কাছে উৎসর্গ করে দাও। আল্লা ছাড়া কাজের প্রতিদান দেওয়ার ক্ষমতা আর কারো নেই।

ইমান ও ইসলাম

বিষয়টি একটু বিস্তারিত আলোচনা করা যাক: ইসলাম ধর্মের মূল স্তম্ভ হল পাঁচটি—কলেমা, নামাজ, রমজান, হজ ও জাকাত। পাঁচটি কলেমা মুখে উচ্চারণ করা এবং অর্থ অনুধাবন করে দৃঢ়ভাবে তাতে বিশ্বাস স্থাপন করাই হল ইমান। ইমানকে এই ভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে—'সর্ববিধ নাম এবং গুণবিশিষ্ট আল্লার উপর বিশ্বাস স্থাপন কর এবং তাঁর বিধান সমূহ মেনে নাও'। 'আল্লা, তাঁর প্রেরিত দেবদূতে, গ্রন্থ সকলে, প্রেরিত পয়গম্বরে বিশ্বাস কর।' এর থেকে জানা যায় যে ইসলাম ধর্মে সর্ব প্রথমে আল্লায় বিশ্বাসের কথা বলা হয়েছে। কলেমা তৈয়াবে বলা হয়েছে যে, 'আল্লা ছাড়া আর কেউ উপাস্য হবার উপযুক্ত নয়। মহম্মদ তার আল্লার প্রেরিত পয়গম্বর'। পয়গম্বরের অর্থ হল আল্লার বাণী বাহক। পয়গম্বর অশরীরী আকাশচারী জীব নয়, অবতারও নয়। পয়গম্বর হল 'ঐশীদূত এবং মানুষের একত্র সমন্বয়।'

পাঁচটি স্তম্ভের পরিচয়

ইসলাম ধর্ম বহুদেববাদ অস্বীকার করে এবং একেশ্বরবাদে বিশ্বাস করে। এই ধর্মমত অনুসারে দেবতা মিথ্যা, আল্লা সত্য—তিনি ছাড়া আর কোন উপাস্য নেই। বিশুদ্ধ একত্ববাদই ইসলাম ধর্মের আদর্শ। আল্লা আছেন এবং তিনি এক ও অদ্বিতীয়। আল্লা সর্বশক্তিমান, সর্বব্যাপী এবং করুণাময়। আল্লা ছাড়া মানুষ আর কারও দাস হবে না, আর কারও দাসত্ব কবুল করবে না, কোরান শরীফে এই কথা বার বার বলা হইয়াছে।

ইসলাম ধর্মে একেশ্বরবাদ

আল্লার আনুগত্য করা এবং তাঁর আদেশ পালন করাই হল প্রকৃত ধর্ম। প্রত্যেকটি কাজে এবং প্রত্যেকটি ব্যাপারে কেবল আল্লার হুকুম সন্ধান করতে হবে। হজরত

মহম্মদ মনে করতেন যে অন্যান্য সমসাময়িক ধর্ম একেশ্বরবাদে বিশ্বাসী হলেও তারা একেশ্বরবাদের তাৎপর্য যথাযথভাবে উপলব্ধি করতে পারে নি।

হজরত মহম্মদের মতে আল্লা শব্দটি অতুলনীয়। অন্য কোন ধাতু বা শব্দ থেকে এটি উদ্ভূত নয়। ভগবান, ঈশ্বর, God প্রভৃতি শব্দের বহুবচন আছে, স্ত্রীলিঙ্গ আছে কিন্তু আল্লা শব্দের সেরূপ কোন রূপান্তর নেই। আল্লা হল 'সকলরকম সম্বন্ধরহিত একক ও অনুপম নাম।' পৌত্তলিকতা ও দেবদেবীবাদ সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। রাত্রি, দিন, চন্দ্র, সূর্য, আল্লার নিদর্শন। আল্লা তাদের সৃষ্টি করেছেন, কখনও তাদের আল্লা বলা উচিত নয়।

আল্লা শব্দটি অতুলনীয়

ইসলাম ধর্মমতে একদিকে আল্লাকে বড় বলে না মানা এবং অপরদিকে নিজেকে ছোট বলে জানাই হচ্ছে পৌত্তলিক মনোবৃত্তির দুটি উপাদান। সেকারণেই পৌত্তলিকতার সঙ্গে ইসলামের বিরোধ। ইসলামের মতে 'এক নিরাকার, এক এবং অদ্বিতীয় আল্লাকে জীবনের মধ্যে বরণ করে নেওয়া এবং তার সঙ্গে আত্মার নিবিড় যোগস্থাপন করাই প্রতিটি মুসলমানের কর্তব্য।' যারা একথা বলে যে নিরাকারের ধারণা করা কঠিন, নিরাকারের ধারণা অস্পষ্ট, তার উত্তরে ইসলাম বলে যে, নিরাকারকে আকার দিয়ে ধারণা করা আরও কঠিন এবং নিরাকার আল্লার ধ্যান ও ধারণা যতই অস্পষ্ট হোক না কেন, মানুষের জীবনের বড় সম্পদ। নিরাকারকে আকার দিয়ে ধরার চেষ্টা ইসলাম ধর্মমতে আত্ম-প্রবঞ্চনার সামিল। তাছাড়া পৌত্তলিকতা বহুত্বের প্রতীক, আল্লা এক।

পৌত্তলিকতার সমালোচনা

পারস্যবাসীরা জগতের মঙ্গল ও অমঙ্গল ব্যাখ্যার জন্য দুই ঈশ্বরের কল্পনা করেছেন। মঙ্গলের ঈশ্বর অরমুজদ। অমঙ্গলের ঈশ্বর আহরিমন। কিন্তু এ ধারণা ভ্রান্ত। আল্লা শুধু একজন। কাজেই কেবলমাত্র আল্লাকেই ভয় করা উচিত।

দ্বীশ্বরবাদের সমালোচনা

খ্রীষ্টধর্মের বৈশিষ্ট্য হল ত্রিত্ববাদ (Trinity)। পবিত্র পিতা, পবিত্র পুত্র এবং পবিত্র আত্মা—এই ত্রয়ীর মিলিত রূপ হচ্ছে ঈশ্বর। যীশুখ্রীষ্টকে খ্রীষ্টানগণ ঈশ্বরের পুত্র বলে মনে করেন এবং বলেন যে তিনি ঈশ্বরের অবতার। ইসলামধর্ম খ্রীষ্টানদের এই ত্রিত্ববাদ স্বীকার করে না। তিনজন আল্লা নেই, আল্লা এক। আল্লাতে পিতৃত্ব আরোপ একটি ঘৃণিত ধারণা। আল্লা এক, আল্লা সমস্ত কিছুর নির্ভর। তিনি জন্ম দেন না, জন্মগ্রহণ করেন না। তাঁর সমতুল্য আর কেহ নেই। আল্লা বিশুদ্ধ এক। সমস্ত দৃষ্টি তার থেকেই উৎসারিত। আল্লার স্ত্রী পুত্র নেই, পুত্র রূপে বা অবতাররূপে তিনি জন্মগ্রহণ করেননি। ইসলামধর্মে কোনরূপ প্রতীকের সাহায্যে তাঁকে বোঝান হয় না।

খ্রীষ্টধর্মের ত্রিত্ববাদের সমালোচনা

আল্লা কারও মতন নন, এই হল আল্লার পরিচয়। তাঁর সঙ্গে সাদৃশ্য থাকতে পারে এমন কিছু নেই, মানুষ যা, আল্লা তা নয়। মানুষের জন্ম আছে, মৃত্যু আছে, আল্লার তা নেই। আল্লা আমাদের সকল পরিচয় ও সকল বিশেষণের ঊর্ধ্বে। যতই বলা হোক, যতই বুঝান যাক, আল্লা সমস্ত কিছুর অতীত। 'এই বিশুদ্ধ চির পবিত্র একের নাম আল্লা।' আল্লার ইচ্ছায় সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করাই ইসলামের বৈশিষ্ট্য।

ইসলামে আল্লার নিরানব্বইটি নাম আছে, কিন্তু সেগুলি আল্লার গুণ, আল্লার প্রকৃত স্বরূপ নয়। এই নামগুলির মধ্যে চারটি নাম সমধিক প্রসিদ্ধ। 'রব', 'রহমান', 'রহিম' ও 'মালিক'। সূরা ফাতিহায় এই চারটি নামের উপরই বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে। 'রব' অর্থে স্রষ্টা ও পালনকারী, 'রহমান' অর্থে পরম করুণাময়, 'রহিম' অর্থে পরমদাতা ও দয়ালু, এবং 'মালিক' অর্থে বিচারক। আল্লা স্রষ্টা, প্রেমময়, দাতা এবং বিচারক।

আল্লার একাধিক নাম
আল্লার গুণ

ইসলাম মতে আল্লা সত্য। কিন্তু তার সৃষ্ট এই জগতও মিথ্যা নয়। ইসলামের সৃষ্টিতত্ত্ব অনুসারে আদিতে অন্য কিছুই ছিল না, ছিল এক নিরাকার নির্বিকার বিশুদ্ধ এক আল্লাহ। আল্লার মনে সৃষ্টির ইচ্ছা যখন জাগল, তখন একটা জ্যোতির্ময় আলোকের আবির্ভাব ঘটল। এক নূর বা আলোক থেকেই আল্লা বস্তু জগতের সৃষ্টি করলেন। একমাত্র 'কুন' শব্দ দ্বারা সর্বশক্তিমান আল্লা শূন্যতার (nothingness) মধ্য থেকে নিখিল সৃষ্টিকে একে একে প্রকট করে তুললেন। এই সৃষ্টির মূলে ছিল নূর, রূহ, কলম, বুদ্ধি, জল, তারপর এল মাটি, তারপর এল উদ্ভিদ-জগৎ। তারপর ফেরিশ্‌তা, জীন ও পশুপক্ষী। সবশেষে এল মানুষ। মানুষই হল আল্লার সৃষ্টির মধ্যে শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। মানবজীবন অলীক নয়, স্বপ্ন নয়, মানবজীবন বাস্তব সত্য, তবে পূর্ণ সত্য নয়। এই জীবনের শেষে যে পরজীবন আছে, তাকে মিলিয়েই পূর্ণ সত্য লাভ করা যায়। মানুষ মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই বিলীন হয়ে যায় না বা আল্লাতে লয় প্রাপ্ত হয় না। মানুষের স্বাধীন ব্যক্তিসত্তা আছে। মৃত্যুকে অতিক্রম করে মানুষ অমর জীবনে বেঁচে থাকে।

সৃষ্ট জগত মিথ্যা নয়

আল্লাতে বিশ্বাসের পর ইসলাম ধর্মে দেবদূতে বিশ্বাসের কথা বলা হয়েছে। জিব্রাইল স্বয়ং পয়গম্বরকে দেখা দিয়েছিলেন। দেবদূতরা হল স্বর্গীয় দূত। দেবদূতের এক বিশেষ মর্যাদা আছে, তারা জীব কিন্তু অতি মানবীয়। তারা আল্লার ভৃত্য এবং সকল সময়ই তাঁর উপাসনা করে। তারা পবিত্রতার প্রতিমূর্তি, সেই কারণে মনুষ্য জাতীয় জীবদের সঙ্গে তাদের পার্থক্য আছে। মানুষের সৃষ্টি মৃত্তিকা থেকে, দেবদূতের সৃষ্টি নূর বা আলোক থেকে। সাধারণ মানুষ আল্লাকে

দেবদূতের পরিচয়

বিস্মৃত হয় এবং যদিও তারা আল্লাকে উপাসনা করে, নিরবচ্ছিন্নভাবে করে না। কিন্তু দেবদূতরা সকল সময়ই তাঁকে উপাসনা করে। অনেক দেবদূত আছে। মর্যাদা ও কর্তৃত্বের দিক থেকে এদের মধ্যে পার্থক্য আছে। কেরামন এবং কাতেবিন হল দু'জন অভিভাবক স্থানীয় দেবদূত, যাঁরা প্রতিটি ব্যক্তির উপর নজর রাখেন এবং শেষ বিচারের দিনে মানুষের অনুকূলে সাক্ষ্য প্রদান করেন। তেমনি স্বর্গের একজন এবং নরকের একজন দেবদূত আছে। মৃত্যুরও দেবদূত আছে।

জিনের পরিচয়

মানুষ এবং দেবদূতের মাঝামাঝি রয়েছে এক শ্রেণীর অতিমানবীয় জীব, যাদের বলা হয় জিন। এই জিনরাও আগুন থেকে তৈরি। মানুষের মত জিনদেরও বিশ্বাসী এবং অবিশ্বাসী এই দুইভাগে ভাগ করা হয়—যারা বিশ্বাসী তাদের স্থান হল স্বর্গে এবং যারা অবিশ্বাসী তাদের স্থান হল নরকে। অবিশ্বাসী বিদ্রোহী জিনদের বলা হয় শয়তান। এই শয়তানদের যে নেতা, সে ঈশ্বরের স্থায়ী প্রতিদ্বন্দ্বী। এক সময় দেবদূতের মধ্যে তার স্থান ছিল। কিন্তু আল্লার নির্দেশ সত্ত্বেও আদমকে কুর্ণিশ না করার জন্য তাকে দেবদূতের জগৎ থেকে বিতাড়িত করা হয়।

হজরত মহম্মদ শ্রেষ্ঠ পয়গম্বর

ইসলাম ধর্মমত অনুসারে পয়গম্বরে বিশ্বাস ইসলাম ধর্মামতাবলম্বী ব্যক্তির অবশ্যই কর্তব্য। ঈশ্বর তাঁর নির্বাচিত পয়গম্বরদের মাধ্যমে নিজেকে প্রকাশ করেছেন। পয়গম্বরদের মাধ্যমে ঈশ্বর তাঁর অমর গ্রন্থ মানুষের কাছে প্রকাশ করেছেন। কিন্তু পয়গম্বর হজরত মহম্মদের মধ্য দিয়েই ঈশ্বরের প্রত্যাদেশ সম্পূর্ণতা লাভ করেছে এবং এই সব প্রত্যাদেশ পবিত্রগ্রন্থ কোরানের মধ্যে সন্নিবিষ্ট হয়েছে। প্রশ্ন করা যেতে পারে যে, এই পয়গম্বরের সংখ্যা কত? অবিকল

ইসলাম অবতারবাদে বিশ্বাসী নয়

সংখ্যা নির্দেশ করা কঠিন। কোরানেই আটাশ জন পয়গম্বরের নাম আছে। প্রথম হলেন আদম এবং শেষ ও শ্রেষ্ঠ পয়গম্বর হলেন মহম্মদ। অন্যান্য উল্লেখযোগ্য পয়গম্বর হলেন আদম, নূহ্, আব্রাহাম, মুসা এবং যীশু। ইসলাম অবতারবাদে বিশ্বাস করে না। ঈশ্বর মানবিক বা উপ-মানবিক সত্তার মধ্য দিয়ে অবতীর্ণ হন না। কিন্তু ইসলাম ঐশ্বরিক অনুপ্রেরণায় বিশ্বাসী।

শেষ বিচারের দিনে ইসলাম বিশ্বাসী

ইসলাম মৃত্যু-পরবর্তী জীবনে এবং শেষ বিচারের দিনে বিশ্বাসী। খ্রীষ্টধর্মের মতন ইসলাম বিশ্বাস করে যে বর্তমান জগৎ এক পরিণতি ও মহাপ্লাবনের দিকে এগিয়ে চলেছে। যখন জগৎ শেষ হয়ে যাবে তখন মৃত ব্যক্তিরা তাদের কবর থেকে উঠে আসবে এবং ঈশ্বরের সামনে তাদের বিচারের জন্য উপস্থিত হতে হবে, যিনি তার কৃতকর্ম অনুযায়ী বিচার করবেন। যারা সৎ,

তারা স্বর্গে মহাসুখে বসবাস করবে এবং যারা পাপী বা অসৎ কর্মের অনুষ্ঠান করেছে, তাদের নরকের যন্ত্রণা ভোগ করতে হবে। কাজেই ইসলাম জন্ম মৃত্যুর ভবচক্রে বিশ্বাসী। ইসলামের মতে মানুষ একবারই বিচারের সুযোগ পাবে। সে সুযোগ হারালে আর সুযোগ পাবে না।

এই হল ইসলাম ধর্মমতের তত্ত্বের দিক, কিন্তু এই ধর্মমতের একটা ব্যবহারিক দিক আছে। ইসলাম ধর্মের একনিষ্ঠ সমর্থককে কতকগুলি ধর্মীয় ক্রিয়ায় নিজেকে নিয়োজিত কবতে হয়।

মুসলমানের প্রধান কর্তব্য হল সরল পথে চলা—প্রতিদিন আল্লাকে উপাসনা করার সময় তাকে আল্লার কাছে প্রার্থনা করতে হয় যাতে আল্লা তাকে সরল পথে চালিত করেন। কিন্তু এই সরলপথের পরিচয় কী?

ইসলাম ধর্মের মূল স্তম্ভ পাঁচটি, যথা—**কলেমা, নামাজ, রোজা, হজ** এবং **জাকাত**।

কোরানে আছে কলেমা, নামাজ, রোজা, হজ এবং জাকাত, এই পাঁচটি ফরজ অর্থাৎ আল্লার আদেশ। এই পাঁচটি ইসলাম ধর্মের সুনির্দিষ্ট প্রধান বৈশিষ্ট্য।

ইমান যার নেই অর্থাৎ যে ব্যক্তি কলেমা পড়ে না এবং আন্তরিকভাবে কলেমাতে বিশ্বাস কবে না তাকে মুসলমান বলতে পারা যায় না। ইসলাম ধর্মমত অনুসারে কলেমা পাঠ করে প্রথমে ধর্মবিশ্বাস দৃঢ় করতে হয়। কলেমা পাঁচটি। (১) কলেমা তৈয়াব, (২) কলেমা শাহাদাৎ, (৩) কলেমা তৌহিক, (৪) কলেমা তমজিদ, (৫) কলেমা র‍্যদ্দেকোফর। এই পাঁচটি কলেমার মধ্যে প্রথমোক্ত চারটি কলেমা বিশেষ প্রয়োজনীয়। তন্মধ্যে কলেমা তৈয়াব অপরিহার্য। ইসলামের ধর্মবিশ্বাসের মূল বিষয়টি রয়েছে কলেমা শাহাদাতে, সেখানে বলা হয়েছে 'আল্লা ছাড়া কেহ উপাস্য হবার উপযুক্ত নয়। তিনি একা, তাঁর অংশী নেই। মহম্মদ হলেন তাঁর পয়গম্বর।' এই ধর্মবিশ্বাস ইসলামের একেশ্বরবাদী নীতির পরিচায়ক। এই বিশ্বাসের দুটি অংশ আছে—প্রথম অংশ হল আল্লা ছাড়া আর কেহ নেই। এই অংশ খুব সহজ ও সরলভাবে একেশ্বরবাদের মূল নীতিকে প্রকাশ করেছে। দ্বিতীয় অংশ, মহম্মদ তাঁর পয়গম্বর। এর মধ্য দিয়ে মহম্মদ যে ঈশ্বরের দূত এই বিষয়টিতে মুসলমানদের বিশ্বাস এবং তিনি যে পবিত্র গ্রন্থ জনসাধারণকে দিয়েছেন তার প্রামাণ্য নির্দেশ করে। প্রত্যেক মুসলমান বিশ্বাস করে যে হজরত মহম্মদের মাধ্যমেই ঐশ্বরিক প্রত্যাদেশ চরম পরিণতি লাভ করেছে এবং কোরানের মধ্য দিয়ে ঐশ্বরিক ইচ্ছার পরিপূর্ণ প্রকাশ ঘটেছে।

ইসলামের দ্বিতীয় স্তম্ভ হল নামাজ। 'চরম ভক্তি, বিনয় ও শ্রদ্ধা সহকারে আল্লার পূত পবিত্র স্মৃতির আরতি নিবেদনই নামাজের মূল।' তন্ময় ও তদগতভাবে আল্লার পূত পবিত্র স্মৃতির তর্পণই নামাজের আসল কথা। ভক্ত প্রেমিক এই নামাজের মধ্যে প্রিয়তম আল্লার সান্নিধ্য উপভোগ করে।

নামাজ

'নামাজের আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত প্রত্যেকটি অনুচ্ছেদে ও অঙ্গের (কিয়াম, কেরাত, রুকু, সজদা, তছবিহ প্রভৃতি) মধ্যে পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে মহিমাময় আল্লার প্রতি স্তুতি ও প্রশস্তি নিবেদন, ভক্ত প্রেমিকের আকুলি, ব্যাকুলি, অনুনয় বিনয় ও কাকুতি মিনতি।' নামাজের বৈশিষ্ট্য হল যিনি আল্লার কাছে প্রার্থনা করবেন তিনি আল্লার কাছে সমস্ত আত্মাকে ঢেলে দেবেন। এই প্রার্থনার দুটি বিষয় আছে (১) আল্লার প্রশংসা এবং আল্লার প্রতি কৃতজ্ঞতা এবং (২) আল্লার প্রতি সনির্বন্ধ আবেদন। এর মধ্য দিয়ে আল্লার সার্বভৌমতা স্বীকার করা হয়েছে এবং মানুষের আল্লার উপর নির্ভরতা নির্দেশিত হয়েছে। একজন একনিষ্ঠ ইসলাম ধর্মাবলম্বীকে দিনের মধ্যে পাঁচবার নামাজ পড়তে হবে। নামাজ যাকে অসৎকার্য থেকে বিরত রাখে না তার নামাজ নামাজ নয়, কারণ তার নামাজ তাকে আল্লার কাছ থেকে দূরে রাখে।

নামাজের নির্দিষ্ট সময় উপস্থিত হলে মুসলমানদের যে বাক্য উচ্চারণ করে নামাজে সামিল হওয়ার জন্য আহ্বান করা হয় সেই বাক্যকে 'আজান' বলে। মুসলমানদের উপাসনা গৃহ মসজিদ থেকে এই আজান দেওয়া হয়। মসজিদে প্রার্থনা ইমামের দ্বারা পরিচালিত হয়। ইমাম ঐ কাজের জন্য নিযুক্ত কোন পুরোহিত নয়। কারণ ইসলাম পুরোহিতগিরিতে বিশ্বাস করে না। প্রত্যেক ব্যক্তিরই তার নিজের জীবনের শুদ্ধতার জন্য একটা দায়িত্ব আছে। কোন পুরোহিত তাকে সাহায্য করতে পারে না। ইমাম হল 'সমবেত ভক্ত প্রেমিকের নির্বাচিত প্রতিনিধি।' প্রশ্ন হল ইমাম হবার উপযুক্ত কে? তার উত্তরে বলা যেতে পরে যে, নামাজের শুদ্ধা-শুদ্ধি সম্পর্কে, অবশ্য জ্ঞাতব্য বিধি বিধান সম্বন্ধে যিনি যত বেশী অভিজ্ঞ ও পারদর্শী এবং সচ্চরিত্র, ইমাম নির্বাচিত হবার যোগ্যতা তাঁরই বেশী। শিক্ষা, স্বভাব, জনপ্রিয়তা, বয়স প্রভৃতি যোগ্যতার উপরই নির্ভর করে ইমামের নির্বাচন।

ইমাম নামাজের নেতা

কোরানে বলা হয়েছে যে কোন একজনের সঙ্গে নামাজ পড়া, একা পড়ার চেয়ে উত্তম, দুই জনের সঙ্গে নামাজ পড়া ততোধিক উত্তম এবং সংখ্যা যত বেশী হবে আল্লার কাছে তা ততই প্রিয় হবে। নামাজে এবং নামাজ পড়ার আসল এবং মুখ্য

উদ্দেশ্য হল আল্লার সন্তোষ এবং পরিতুষ্টি সাধন। তিনি নামাজকে ভাল বলেন এবং তাঁরই নির্দেশ বলে ভক্ত এটি পালন করে থাকে। এক্ষেত্রে নামাজের উপকারিতা কি, এসব প্রশ্ন অবান্তর। তবে নামাজের অনেক উপকারিতা আছে। নামাজ ঘৃণিত ও নিন্দনীয় কাজ থেকে মানুষকে বিরত রাখে। নামাজ পাপ প্রতিরোধ করে। নামাজ 'পাপের আক্রমণ থেকে মুক্তি ও আত্মরক্ষার মহৌষধ।' নামাজে মানব হৃদয়ের সকল রকম পাপ চিন্তা দূরীভূত হয়ে হৃদয় নির্মল হয়।

নামাজের উপকারিতা

রোজা হল ইসলামের তৃতীয় স্তম্ভ। রমজান মাসে সূর্যোদয়ের কিছু পূর্ব থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত পান আহার না করে উপবাস করে থাকাকেই রোজা বলা হয়। রোজা তিন প্রকার—ফরজ, ওয়াজেব ও নফল। শরীর সুস্থ না থাকলে ধর্মকার্যে মনস্থির করা যায় না। এই কারণেই রমজান মাসে আহার সংযম দ্বারা স্বাস্থ্যের উন্নতি ও সদাসর্বদা সৎকার্য দ্বারা আত্মোন্নতির উদ্দেশ্যে রোজার ব্যবস্থা করা হয়েছে। 'রমজান' অর্থে জ্বলে যাওয়া অর্থাৎ রমজানের উপবাসের আগুনে ব্যক্তির পাপরাশি জ্বলে ভস্মীভূত হয়ে যায়। উপবাসের অর্থ হল পান, আহার, স্ত্রী সম্ভোগ ও সর্বপ্রকার জাগতিক সম্ভোগ থেকে বিরত থাকা। রমজান মাসে ব্যক্তি সকল প্রকারে মানসিক, নৈতিক এবং শারীরিক উন্নতির জন্য সচেষ্ট হবেন।

রোজা

'আল্লার ধ্যানে তন্ময় ও তাঁরই চিন্তায় মগ্ন থেকে আহার বিহার, ভোগ বিলাসের প্রতি উদাসীনতা সত্যিকারের রোজা।' রোজা প্রতিটি মুসলমানকে পশু প্রবৃত্তির প্রভাব থেকে মুক্ত হতে, পাপ প্রবৃত্তির আদেশ পরিহার করতে অভ্যস্ত হয়ে আত্ম সংস্কার ও চিত্ত শুদ্ধি লাভ করে উন্নত চরিত্র ও মহৎ স্বভাব অর্জন করতে সহায়তা করে। রোজা আত্ম-নিয়মানুবর্তিতা, আত্মসংযম শিক্ষা দেয়। রোজা মানুষকে শিক্ষা দেয় যে মানুষ ঈশ্বরের উপর নির্ভর। রোজা মানুষকে প্রিয়তম আল্লার আদেশ নিষেধ যথাযথ ভাবে পালন করতে ও তাঁর ইচ্ছামত চলতে এবং তাঁর মিলন ও সন্তোষ লাভ করার সৌভাগ্য অর্জনে সমর্থ করে। ব্যক্তির নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি বিধান, তাকে পশু প্রবৃত্তির দাসত্ব থেকে মুক্তিবিধান, রোজার মুখ্য উদ্দেশ্য হলেও ব্যক্তির স্বাস্থ্যরক্ষার ব্যাপারে রোজার অবদান উপেক্ষণীয় নয়। তাছাড়া রমজানের উপবাসের মধ্য দিয়ে ধনী ব্যক্তি বাস্তবে উপলব্ধি করতে পারে দরিদ্রের ক্ষুধার জ্বালা কি ভয়ঙ্কর। এর ফলে রমজানের উপবাসের মধ্য দিয়ে সমাজের দীন দরিদ্রের দুঃখ কষ্টের সঙ্গে ব্যক্তির পরিচিত হবার সুযোগ ঘটে।

রোজার উপকারিতা

ইসলামের চতুর্থ স্তম্ভ হল হজ। জেলহজ মাসের নয় তারিখে কাবাশরীফ প্রদক্ষিণ করাকেই হজ বলে। প্রতিটি ধনী মুসলমানের অন্ততঃ পক্ষে একবার জীবনে হজ যাত্রা করা উচিত। প্রতিটি হজযাত্রীকে একটি অখণ্ড বস্ত্রে তৈরি শুভ্র পোশাক পরিধান করতে হবে। কাবাশরীফের চারপাশে সাতবার প্রদক্ষিণ করতে হবে এবং ছোট কৃষ্ণবর্ণের প্রস্তর খণ্ডটি চুম্বন করতে হবে। অবশ্য এর সঙ্গে অন্যান্য ধর্মানুষ্ঠানও যুক্ত আছে। সঙ্গতি ও সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও যে হজ করল না, মুসলমান বলে পরিচয় দেবার তার কোন অধিকার নেই। যারা শরীয়ত নির্দেশিত নিয়মসমূহ যথাযথভাবে পালন করে হজ সম্পাদন করে, তারা নবজাত শিশুর মত নিষ্কলঙ্ক ও নিষ্পাপ। বিশ্বের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত বহু ভাষাভাষী মুসলমানদের মধ্যে সৌহার্দ্য, প্রীতি ও ঐক্য প্রতিষ্ঠা এবং পরস্পরের সঙ্গে পরিচয়ের সুযোগ প্রদান ও তাদের মধ্যে সহানুভূতির সঞ্চার, এমন মহান অনুষ্ঠানের বাধ্যতামূলক প্রবর্তন করেছে ইসলাম। বিশ্বের প্রতিটি সঙ্গতিসম্পন্ন মুসলমানকে ইসলাম বাধ্য করেছে জীবনে অন্ততঃ একটিবার হজ করতে। হজ মানুষকে শিক্ষা দেয় যে সব মানুষই সমান। মানুষকে তার পদমর্যাদা, বংশমর্যাদা সবই ভুলে যেতে হয় যখন সে পরিপূর্ণভাবে ঈশ্বরের কাছে আত্মসমর্পণ করে।

হজের স্বরূপ

ইসলামের পঞ্চম স্তম্ভ হল জাকাত। জাকাত শব্দের আভিধানিক অর্থ হল 'পবিত্র করা'। ইসলামিক পরিভাষায় বৎসরের উদ্বৃত্ত ধন সম্পদের চল্লিশ অংশের এক অংশ বা শতকরা আড়াই টাকা দান করাকে জাকাত বলা হয়। জমিতে যে ফসলাদি উৎপন্ন হয় তার অবস্থা ভেদে দশ বা বিশ অংশের এক অংশ দান করাকেও জাকাত বলে। এ ছাড়া পশুরও জাকাত দিতে হয়। যাদের আছে তারা, যাদের নেই তারাও নিজেদের অর্জিত ও সঞ্চিত অংশের কিছুটা দান করবে। যারা নিতান্ত অভাবী তাদের প্রতি দানশীল হতে হবে। যেসব ক্রীতদাস নিজের স্বাধীনতা অর্জন করতে চায়, যেসব অধমর্ণ ঋণদাতার ঋণ পরিশোধ করতে অক্ষম, পথের ভিক্ষুক এবং যেসব ব্যক্তি ভিক্ষা সংগ্রহ করে অপরকে দান করতে চায় তাদের ভিক্ষা দেওয়া উচিত। যথার্থ ধর্মপ্রবণ মুসলমানকে স্মরণে রাখতে হবে যে, ঈশ্বরই অর্থের মালিক। সেই কারণে ঈশ্বরের সৃষ্ট জীবের কল্যাণে অর্থকে নিয়োজিত করা প্রয়োজন।

জাকাত

ঈশ্বরই অর্থের প্রকৃত মালিক

ইসলাম ধর্মমতে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত কিংবা স্বোপার্জিত অর্থ বলে গর্ব করা এবং সমাজের নিঃস্ব দীন দরিদ্রকে তুচ্ছ করার অধিকার কোন মুসলমানের নেই।

জাকাতের পরিমাণ কত হবে? জাকাতের পরিমাণ নিরূপণ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে পরিমাণ যাতে এত অল্প না হয় যার ফলে দানে গ্রহণকারী ব্যক্তির উদ্দেশ্য সিদ্ধ না হয়, আবার এত বেশী যেন না হয় যাতে জাকাত-দাতার পক্ষে দানের ব্যাপারটি সত্য সত্যই দুর্বহ ও কষ্টকর বলে বোধ হয়।

জাকাতের পরিমাণ নিরূপণ

'ধনসম্পদের বিকেন্দ্রীকরণ এবং তদ্দ্বারা জাতীয় দারিদ্র্যের প্রতিবিধান করাই' জাকাতের অন্যতম উদ্দেশ্য। জাকাত প্রবর্তনের উদ্দেশ্য ধনসম্পদকে শুধুমাত্র ধনীর হস্তে সীমাবদ্ধ না রাখা। এছাড়া জাকাতের আর একটি উদ্দেশ্য হল ব্যক্তি-সংস্কার। ধনের প্রতি অতিরিক্ত আসক্তি, কৃপণতা, হিংসা, বিদ্বেষ প্রভৃতি দূর করে জাকাত ব্যক্তি-সংস্কারে সহায়তা করে। এতে কার্পণ্য দূর হয়, স্বার্থপরতার অবসান ঘটে, পরস্পরের মধ্যে হিংসা বিদ্বেষের পরিবর্তে প্রীতি ভালবাসার সঞ্চার হয়। ফলে ধনী ব্যক্তি ক্রমশঃ সদাশয় এবং সদ্ব্যবহারে অভ্যস্ত হয়ে প্রীতিভাজন হয়। জাকাত ইসলামের সুদৃঢ় ভিত্তি। ব্যক্তি-সংস্কার এবং নাগরিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক সুব্যবস্থা ও কল্যাণের উপরই জাকাতের ভিত্তি। ইসলাম ধর্ম জাকাত ব্যতীত আরও দান খয়রাতের প্রতি জনসাধারণকে উৎসাহিত করেছে। এই সমস্ত দান খয়রাতকে 'ছদকা' নামে অভিহিত করা হয়। জল যেমন অগ্নিকে নির্বাপিত করে থাকে, তেমনি দান খয়রাত দাতার স্বার্থপরতার বিনাশ সাধন করে। ইসলাম মতে ঈশ্বর, ভক্ত প্রেমিকের দানকে অত্যন্ত আনন্দ সহকারে গ্রহণ করেন এবং দানের জন্য দাতার এই দানকে অনবরত বর্ধিত করতে থাকেন।

জাকাতের লক্ষ্য

ফকির, মিছকীন অর্থাৎ যার কিছু নেই, ঋণী ব্যক্তি ও মুসাফের ব্যক্তিকে জাকাত দান করা যেতে পারে। 'জাকাত ধন দৌলত জনিত আসক্তি ও মোহের ঘৃণিত ব্যাধির চিকিৎসা স্বরূপ।' ইসলামের বক্তব্য, 'তোমার ধনের উপর তোমারই একমাত্র অধিকার নেই। এতে সমাজের দীন দরিদ্র, নিঃস্ব, অনাথ মুসলমানেরও পরিমিত অংশ রয়েছে। ইসলাম ধর্ম পরধর্মমত-সহিষ্ণু, অন্যান্য ধর্মের প্রতি ইসলাম খুবই শ্রদ্ধাশীল। হজরত মহম্মদ মসজিদ, গীর্জা, ইহুদীদের ভজনালয় ও অন্য ধর্মাবলম্বীরা যে স্থানকে মান্য করে সেই সব স্থান রক্ষা করতে ও তার জন্য প্রাণ দিতে মুসলমানদের আদেশ করেছেন। তিনি আরও বলেছেন, 'হে মানব, সমভাবে সকলের সঙ্গ করবে যেন অপর ধর্মাবলম্বী তোমাকে আপন ও আত্মীয় বলে মনে করে।' হজরত মহম্মদ বলেন, 'জোর নেই, জবরদস্তি নেই। আমার কথাগুলি যদি কারও ভাল লাগে সে তা গ্রহণ করুক, আর তা যদি কারও

ইসলামধর্ম পরমতসহিষ্ণু

অপছন্দ হয় তাহলে তাকে আমি জবরদস্তি আমার মত মান্য করতে বলি না।' ধর্মীয় ব্যাপারে ইসলাম সকল প্রকার বাধ্যতা বিরোধী।

ইসলাম মানবজাতির এক মহান ভ্রাতৃত্বে বিশ্বাসী। ইসলাম বিশ্বভ্রাতৃত্ব ও মহামানবতার আদর্শ প্রচার করে। ধর্ম, জাতি এবং দেশ ভিন্ন হলেও মানুষ যে মূলতঃ এক পরিবারের অন্তর্ভুক্ত, সকল মানুষের অন্তরে যে এক নিগূঢ় আত্মীয়তার যোগসূত্র আছে এবং তারা যে পরস্পর ভাই ভাই—ইসলাম এই আদর্শে বিশ্বাসী। ইসলাম ধর্ম মনে করে, ধনী, দরিদ্র, পুরুষ, স্ত্রী, প্রত্যেক মানুষের মৌলিক অধিকার সমান। কোরানে বলা হয়েছে যে, স্বামীর যেমন স্ত্রীর উপর অধিকার আছে, স্ত্রীরও স্বামীর উপর অধিকার আছে। ইসলাম বর্ণ বৈষম্য ও কৌলিন্য প্রথার বিরোধী। মানুষ তার কর্মের দ্বারাই বড় হতে পারে, বংশ মর্যাদার দ্বারা নয়। সব মানুষই সমান, সকলেরই ধর্মে কর্মে অধিকার আছে। ইসলাম এই নীতি স্বীকার করে। ইসলামের স্বাধীনতা ও গণতন্ত্র এই নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। ইসলাম মানুষে মানুষে ভেদাভেদে বিশ্বাস করে না। মানবজাতির প্রগতির পথে সবরকম অন্যায় বিধানের বিরুদ্ধে ইসলাম বিদ্রোহ ঘোষণা করে। ইসলাম মনে করে সব মানুষই আল্লার চোখে সমান।

মানবজাতি মহান ভ্রাতৃত্বে বিশ্বাস

ইসলামধর্ম গুরুজন ও পিতামাতাকে মান্য করার কথা বলে। পিতামাতা বৃদ্ধ হলে তাঁদের প্রতি নম্র, সদয় ও সুন্দর ব্যবহার করা উচিত। তাঁদের প্রতি অনুগত ও বাধ্য হতে হবে।

মুসলমানরা দুটি ভিন্ন ধর্মসম্প্রদায়ে বিভক্ত। দুটি প্রধান ধর্ম-সম্প্রদায় হল সুন্নি ও শিয়া। সুন্নিরা সুন্নর অনুগামী এবং তারা প্রথম তিনজন খলিফা—আবু বকর, ওমর এবং ওসমান—এই তিনজন যথাযথ নির্বাচিত বলে মনে করে। অধিকাংশ মুসলমান এই ধর্ম-গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। অপর পক্ষে শিয়ারা মনে করে যে তারা মহম্মদের জামাতা আলির পক্ষভুক্ত এবং উপরিউক্ত তিনজন খলিফা যথার্থভাবে নির্বাচিত হননি। তারা সুন্নর (*Sunna*) প্রামাণ্যের উপর তেমন গুরুত্ব আরোপ করে না।

দুটি সম্প্রদায়

উপসংহারে বলা যেতে পারে যে, ধর্ম ও নৈতিক আদর্শের বিচারে ইসলাম এক সুমহান ধর্ম।[1] ম্যাকডোনাল (*Macdonell*) বলেন, "একথা অস্বীকার করা যাবে না যে ইসলাম শুধুমাত্র আরবদেরই সভ্যতার উচ্চস্তরে উন্নীত করেছে তা নয়, অনেক পশ্চাদ্‌গামী জাতিকেও উন্নীত করেছে।"

1. A. A. Macdonell: Lectures on Comparative Religion Page; 165.

৩। খ্রীষ্টধর্ম (Christianity) :

পৃথিবীর বৃহৎ ধর্মগুলির মধ্যে খ্রীষ্টধর্ম অন্যতম। [1]হাস্টন স্মিথ (*Huston Smith*) বলেন, "মানুষের সব ধর্মের মধ্যে খ্রীষ্টধর্মই সবচেয়ে সুদূর প্রসারী এবং তারই সবচেয়ে অধিক সংখ্যক অনুগামী। আজকের দিনে প্রতি তিনজনে একজন খ্রীষ্টান। মোট সংখ্যা প্রায় ৮০০ লক্ষের কাছাকাছি।" খ্রীষ্টানদের ধর্মবিশ্বাসই খ্রীষ্টধর্ম নামে পরিচিত এবং তাঁরাই খ্রীষ্টান যাঁরা যীশুখ্রীষ্টে বিশ্বাস করেন। রাষ্ট্রনীতি, সাহিত্য, দর্শন প্রভৃতির উপর খ্রীষ্টধর্মের যথেষ্ট প্রভাব পরিলক্ষিত হয় এবং মানবজাতির বহু মহান ব্যক্তির মন ও চরিত্রের উপর এই ধর্মের গভীর প্রভাব লক্ষ্য করা যায়।

খ্রীষ্টধর্মের প্রভাব

খ্রীষ্টধর্মের আদি ইতিহাস থেকেই লক্ষ্য করা যায় যে বৌদ্ধ এবং ইসলাম ধর্মের মতন এই ধর্মও প্রচারের মাধ্যমে বিস্তৃতি লাভ করেছে। আধুনিক যুগে প্রাচ্য সভ্যতার সঙ্গে এই ধর্মের সংযোগ ঘটেছে। ইউরোপীয় সভ্যতার গঠনে এই ধর্মের প্রভাব সমধিক গুরুত্বপূর্ণ। ইউরোপীয় সভ্যতার মাধ্যমে এই ধর্ম মানবজাতির এক বৃহত্তর অংশের উপর তার প্রভাব বিস্তারিত করেছে। বর্তমান যুগে খ্রীষ্টধর্মের সমর্থকবৃন্দের সংখ্যা বিশ্বের জনসংখ্যার এক বৃহত্তর অংশ।

খ্রীষ্টধর্মের সাধারণ সংজ্ঞা দিতে গিয়ে [2]ম্যাকডোনাল (*Macdonell*) বলেন, 'এই ধর্ম হল ইহুদী ধর্মমতের উপর ভিত্তি করে খ্রীষ্টের দ্বারা প্রবর্তিত একটি একেশ্বরবাদী ধর্ম, যে ধর্মে খ্রীষ্টকে ঈশ্বর ও মানুষের মধ্যে মধ্যস্থ বলে গণ্য করা হয়েছে, যে ধর্মে খ্রীষ্টের আত্মোৎসর্গমূলক মৃত্যুর দ্বারা মানবজাতির প্রায়শ্চিত্ত সাধিত হয়েছে এবং যে ধর্ম তার ধর্মীয় এবং নৈতিক পরিসরের মধ্যে সমগ্র মানবজাতিকে অন্তর্ভুক্ত করেছে। এই ধর্ম খ্রীষ্টের জীবন ও বাণীকে ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। কোন ধরাবাধা নিয়মের বা বিধির উপর এই ধর্ম প্রতিষ্ঠিত নয়। কাজেই মানবজাতির বিবর্তনের সঙ্গে এই ধর্ম সহজেই সঙ্গতি সাধনে সমর্থ হয়েছে, মানবজাতির সভ্যতাকে সহজেই প্রভাবিত করতে পেরেছে। কোন সুনির্দিষ্ট ধারণা বা আচার ব্যবহার রীতিনীতির নিয়ন্ত্রণে এই ধর্ম বাধা পড়েনি।

খ্রীষ্টধর্মের সংজ্ঞা

খ্রীষ্টধর্মের প্রবর্তক যীশুর জীবন ও ক্রিয়াকলাপই খ্রীষ্টধর্মের উৎস, কাজেই ইহা বৌদ্ধধর্ম, ইসলামধর্ম বা কনফুসিয়াসের প্রচারিত ধর্মমতের মতনই একটি ঐতিহাসিক ধর্ম। বৌদ্ধধর্ম ও ইসলামধর্মের মতনই এই ধর্ম প্রচারমূলক ধর্ম এবং বিশ্বজনীন ধর্ম। হাস্টন স্মিথ (*Huston Smith*) বলেন, খ্রীষ্টধর্ম মূলতঃ একটি ঐতিহাসিক ধর্ম। এর

1. Huston Smith : The Religion of Man, Page ; 266.
2. A. A. Macdonell ; Lectures on Comparative Religion, Page. 1.

অর্থ হল এই ধর্মের ভিত্তি মূলতঃ কতকগুলি সার্বিক নীতি নয় বরং মূর্ত ঘটনা, বাস্তব ঐতিহাসিক ঘটনার উপরই এই ধর্মের ভিত্তি।

যীশুখ্রীষ্ট খ্রীষ্ট ধর্মের প্রবর্তক। সব খ্রীষ্টানই বিশ্বাস করেন যে যীশুখ্রীষ্টের মধ্য দিয়েই ঈশ্বরের প্রকাশ ঘটেছে। বাইবেল খ্রীষ্টানদের ধর্মগ্রন্থ। এই ধর্মগ্রন্থের দুটি ভাগ

বাইবেলের দুটি ভাগ

আছে—পূর্বখণ্ড (Old Testament) ও অন্তখণ্ড (New Testament)। পূর্বখণ্ডে যীশুর জন্মের পূর্ব পর্যন্ত ইজরাইল জাতির ইতিহাস আছে, অন্তখণ্ডে আছে যীশুর জীবনী ও যীশুর শিষ্যদের কার্যকলাপের বিবরণ। খ্রীষ্টানরা বিশ্বাস করে যে তাদের ধর্ম মানুষের কাছে ঈশ্বরের প্রত্যাদেশ। খ্রীষ্টধর্ম যীশুর উপদেশ পালনের উপর গুরুত্ব আরোপ করে।

মানবজাতির ত্রাতা বা রক্ষাকর্তা হিসেবে যার আবির্ভাব হবে বলে ইহুদীরা আশা করেছিল যীশুকেই সেই প্রত্যাশিত ত্রাতা রূপে গণ্য করে 'খ্রীষ্ট' উপাধি তাঁর উপর

যীশু মানবজাতির ত্রাতা

প্রত্যর্পন করা হয়। ইংরেজী 'Christ' শব্দটি গ্রীক শব্দ 'Christus' থেকে উদ্ভূত, হীব্রু ভাষায় যাকে মিসাইআ (*Messiah* নামে অভিহিত করা হয়। নাজারথে যীশুর ভক্তদেরই প্রথম খ্রীষ্টান নামে অভিহিত করা হয়। ইহুদী ধর্মের সঙ্গে খ্রীষ্টধর্মের গভীর সম্পর্ক বর্তমান এবং প্রথম খ্রীষ্টানরা ছিল সবাই ইহুদী।

জন হিক বলেন, "খ্রীষ্টধর্ম ইহুদীদের ধর্মের তুলনায় ধর্মবিজ্ঞানের দিক থেকে অনেক বেশী সুবিন্যস্ত ধর্মমত।"[1]

জুদিয়া দেশ ভূমধ্যসাগরের তীরে অবস্থিত। সে দেশে তখন রোমান সম্রাট অগস্টাসের রাজত্ব। জুডিয়া দেশের একটি ক্ষুদ্র গ্রাম হল নাজারথ। সেই

যীশুর জীবন ইতিহাস

গ্রামে একটি সূত্রধর দম্পতি বাস করত। নাম যোসেফ ও মেরী। কথিত আছে একদিন নাজারথ থেকে যোসেফ ও মেরী যখন জেরুজালেমে আসছিলেন, পথে জেরুজালেমের পাঁচ মাইল দূরবর্তী বেথেলহাম গ্রামে পৌঁছতেই রাত্রির অন্ধকার নেমে এল। মেরী ছিলেন সন্তানসম্ভবা। যোসেফ এবং মেরী রাত্রির আশ্রয়ের জন্য একটি সরাইখানায় গেলেন। সরাইখানায় স্থানাভাব ঘটাতে নিকটে একটি ঘোড়ার আস্তাবলে তাঁরা আশ্রয় নিলেন। সেই রাত্রেই মেরী একটি পুত্র সন্তান প্রসব করলেন। এই পুত্র সন্তানের নামই যীশু। ঈশ্বরের এক দূত স্বপ্নে যোসেফকে জানালেন যে নিষ্ঠুর রাজা হেরোদ শিশুকে

---

1. "Christianity has become a more theologically articulated religion than Judaism". — John Hick : Philosophy of Religion Page 6.

নাশ করার জন্য তার অন্বেষণে উদ্যত। কাজেই যোসেফ যেন নবজাত শিশু ও তার মাকে নিয়ে মিশরে পলায়ন করেন। যোসেফ শিশু ও তার মাকে নিয়ে মিশরে চলে গেলেন। যীশুর জন্ম সম্বন্ধে বহু সত্য বা অর্ধসত্য কাহিনী প্রচলিত আছে। কথিত আছে যীশুর মাতা মেরী যোসেফের বাগদত্তা হলে, তাদের মিলনের পূর্বে মেরীর অবিবাহিত অবস্থায় পবিত্র আত্মার দ্বারা গর্ভবতী হয়েছেন। যোসেফ গোপনে মেরীকে পরিত্যাগ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলে ঈশ্বরের দূত স্বপ্নে যোসেফকে দর্শন দিয়ে মেরীকে গ্রহণ করতে বললেন, কারণ তাঁর গর্ভে পবিত্র আত্মার সন্তান। দূত তার নাম যীশু রাখার জন্য বললেন, কারণ তিনি আপন জাতিকে তার পাপ থেকে পরিত্রাণ করবেন। যোসেফ দূতের আদেশ যথারীতি পালন করলেন।

যীশুকে নিয়ে যোসেফ ও মেরী তের বৎসর পরে দেশে ফিরে এলেন। তখন হেরোদের মৃত্যু ঘটেছে। সূত্রধরের কার্যশিক্ষা করে আর সমবয়সী ছেলেদের সঙ্গে মিশে যীশুর শৈশব অতিবাহিত হল। নাজারথ গ্রামে তখন লেখাপড়ার বিশেষ সুবিধা ছিল না।

একদিন যীশু শুনলেন তাঁর আত্মীয় জন ধর্মের বাণী প্রচার করতে এসেছেন। জর্ডন নদীর তীরে দাঁড়িয়ে মহাত্মা জন বলছিলেন, 'তোমরা সবাই প্রস্তুত হও। তোমাদের ত্রাণকর্তা আসছেন, তোমাদের পাপকার্যের জন্য অনুতাপ কর।' মহাত্মা জনের বাণীতে আকৃষ্ট হয়ে অনেক ব্যক্তি তাঁর কাছে এসেছিলেন। জন পবিত্র জর্ডন নদীর জল সিঞ্চন করে তাঁদের দীক্ষা দিলেন। যীশুও তাঁর কাছে দীক্ষা নিলেন। জন যীশুকে দেখতে পেয়ে তাঁকেই তাঁদের ত্রাণকর্তা হিসেবে অভিহিত করলেন। যীশুর বয়স তখন মাত্র ২৯ বৎসর। যীশু ভয় পেয়ে গেলেন। নিজেকে উপযুক্ত করার জন্য যীশু লোকালয় ত্যাগ করে তপস্যার জন্য নির্জন বনে গেলেন। রোমান শাসনকর্তার চক্রান্তে জন নিহত হলে যীশু তাঁর কার্যের ভার গ্রহণ করলেন। পর্বতের উপর দাঁড়িয়ে সকলকে ডেকে তিনি বললেন, 'এই পৃথিবী ঈশ্বরের রাজ্য। ঈশ্বর সব মানুষের পিতা। মানুষ মাত্রেই ভ্রাতা, সকল মানুষই ঈশ্বরের কাছে সমান প্রিয়।' ইহুদীদের কিন্তু যীশুর কথা পছন্দ হল না। কারণ তারা মনে করত ইহুদীরাই একমাত্র ঈশ্বরের সন্তান। কিন্তু যীশুর নম্র সদয় ব্যবহার, তার অপূর্ব উজ্জল শান্ত মূর্তি দেখে বহুব্যক্তি তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করল। তাছাড়া তারা মনে করত যীশু অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী। যীশু অন্ধ ব্যক্তিকে দৃষ্টি শক্তি দান করতে পারেন, রোগীকে নীরোগ করে তুলতে পারেন, পায়ে হেঁটে সমুদ্র পার হতে পারেন। যীশুর অলৌকিক শক্তি দেখে ইহুদী জনসাধারণ যীশুকেই ত্রাণকর্তারূপে অভিহিত করতে লাগল।

যীশুর জনপ্রিয়তায় ইহুদী পুরোহিতগণ (রবাইগণ) যীশুর উপর অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হলেন। ইহুদীরা রোমান শাসনকর্তার কাছে অভিযোগ করলেন, যীশু ঈশ্বরকে অপমান করেছেন। যীশু স্বয়ং রাজা হতে অভিলাষ করেন। যীশু রাজদ্রোহী।

যীশুর একজন শিষ্য জুডাস মাত্র ত্রিশটি রৌপ্য মুদ্রার লোভে যীশুকে ধরিয়ে দিল। যারা যীশুকে ধরেছিল তারা তাঁকে মহাপুরোহিত কাইয়াফারের কাছে নিয়ে গেল। মহাপুরোহিত যীশুকে ঈশ্বর নিন্দার অভিযোগে অভিযুক্ত করলেন। পুরোহিতরা যীশুকে দেশাধ্যক্ষ পীলাতের হস্তে সমর্পণ করলেন। যীশুর বিচার হল, বিচারে আদেশ হল ক্রুশবিদ্ধ করে যীশুকে হত্যা করা হবে এবং যীশুকে স্বয়ং সেই ক্রুশ বহন করে বধ্য-ভূমিতে নিয়ে যেতে হবে। যখন যীশু তাঁর বধ্যভূমি গোলাগাথা পাহাড়ের দিকে ক্রুশ বহন করে নিয়ে যাচ্ছিলেন তখন রাস্তায় ইহুদীরা যীশুর মাথায় কাটার মুকুট পরিয়ে দিল, প্রস্তর নিক্ষেপ করে যীশুর দেহ ক্ষতবিক্ষত করে দিতে লাগল। যীশুর শরীর বেয়ে রক্ত ঝরে পড়তে লাগল। যীশুকে ক্রুশবিদ্ধ করে তাঁর দোষলিপি লিখে তাঁর মস্তকের উর্ধ্বে রাখল, যাতে লেখা রয়েছে 'এ যীশু ইহুদীদের রাজা'। নয়ঘণ্টা অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করে গভীর রাত্রিতে যীশু পরলোকগমন করলেন। মৃত্যুর পূর্বে একবার মাত্র তিনি বলেছিলেন, 'পিতা এদের ক্ষমা কর, এরা জানে না এরা কি পাপ করেছে'।

কথিত আছে যীশুর মৃতদেহ ক্রুশ থেকে তুলে যে সমাধিতে রাখা হয়েছিল, একদিন সেই মৃতদেহ সমাধি থেকে অদৃশ্য হয়ে যায়। যীশু তাঁর শিষ্যদের কাছে আবির্ভূত হয়ে বলেন, 'তোমরা গালীলে যাও, সেখানে গেলে আমার দেখা পাবে।' পরে যীশু যে পর্বতের বিষয়ে তাদের নির্দেশ দিয়েছিলেন এগার জন শিষ্য গালীলে সেই পর্বতে গেলেন। তিনি শিষ্যদের উদ্দেশ্য করে বললেন, "আমি তোমাদের যে সমস্ত আদেশ দিয়েছি, সেই সমস্ত পালন করতে তাদের শিক্ষা দাও আর তাদের জানিও আমি যুগান্ত পর্যন্ত প্রতিদিন তোমাদের সঙ্গে আছি।" যীশু একাধিকবার তাঁর ভক্ত শিষ্যদের কাছে আবির্ভূত হয়েছিলেন: শেষবার যখন তিনি আবির্ভূত হন তখন তিনি শূন্যে অদৃশ্য হয়ে গেলেন এবং স্বর্গে গমন করলেন। যীশুখ্রীষ্টের সমাধি থেকে পুনরুত্থান এবং স্বর্গে গমনের ফলে শিষ্যদের আনন্দের অবধি রইল না।

যীশুর চরিত্রকে কেন্দ্র করে অনেক বিতর্কের উদ্ভব ঘটেছে। অনেকে বাইবেল বর্ণিত যীশুর জীবনকাহিনীকে স্বীকৃতি দিতে চান না। তাঁরা স্বীকার করেন না যে যীশু কোন ঐতিহাসিক চরিত্র। আবার কারও কারও অভিমত অনুযায়ী যীশু ছিলেন একজন সাধারণ মানুষ—খুব জোর একজন নৈতিক সংস্কারক। কিন্তু প্রায় সব খ্রীষ্টানই বিশ্বাস করেন যে তিনি মানুষেরও সন্তান ছিলেন। তিনি

ছিলেন মানুষের ত্রাণকর্তা এবং মানুষের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করার জন্যই তিনি ক্রুশবিদ্ধ হবার কষ্টকে স্বীকার করে নিয়েছিলেন।

যীশুর শিক্ষাতে ধর্মতত্ত্বসম্বন্ধীয় উপদেশ বড় বিশেষ নেই। উপাসনার পদ্ধতি সম্পর্কে বিস্তারিত কিছুই তাঁর শিক্ষাতে লিপিবদ্ধ হয়নি। ইহুদীদের প্রথা অনুযায়ী তিনি নিজে ইহুদী মন্দিরে এবং ইহুদীদের উপাসনা স্থানে উপাসনা করতেন এবং ইহুদীদের আচাররীতির প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করতেন। যীশু নিছক ধর্মানুষ্ঠানের বিরোধী ছিলেন। তিনি মনে করতেন ঈশ্বর এক এবং পবিত্র, সর্বশক্তিমান ও দয়াময়। তিনি ঈশ্বরের পিতৃত্বের উপর যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। তিনি মনে করতেন যে ঈশ্বরকে এক অসীম পিতারূপে গ্রহণ করার মধ্যেই সত্যিকারের আনন্দ ও মানসিক শান্তি নিহিত আছে। পিতা তাঁর প্রতিটি সন্তানকে ব্যক্তিগতভাবে ভালবাসেন। তিনি নিয়মের দ্বারা অনুপ্রাণিত না হয়ে ভালবাসার দ্বারা অনুপ্রাণিত হন। স্বর্গীয় পিতার চোখে সব সন্তানই সমান, ভালমন্দ সকলের উপরই সূর্যকিরণ বর্ষিত হয়, ন্যায়পরায়ণ এবং দুর্নীতিগ্রস্থ সকলের উপরই বৃষ্টির জলধারা পতিত হয়।

যীশুর মতে ঈশ্বরই পরম পিতা

সর্বশক্তিমান পিতার স্নেহদৃষ্টির কাছে সব সন্তানই সমান। যীশু তাঁর শিষ্যদের এই আশ্বাসই দিয়েছিলেন, যীশু বিনা শর্তে শত্রু মিত্র সকলকেই সমান ভাবে ভালবাসার জন্য তাঁর শিষ্যদের উপদেশ দিতেন। কখনও কারও অকল্যাণ চিন্তা করা, বা অনিষ্টের পরিবর্তে অনিষ্ট করা থেকে বিরত হতে বলতেন। তিনি ছোট ছোট উপদেশাত্মক কাহিনীর মধ্য দিয়ে তাঁর শিষ্যদের শিক্ষা দিতেন এবং পৃথিবীতে স্বর্গরাজ্য প্রতিষ্ঠার প্রত্যাশা তাদের মধ্যে জাগিয়ে তুলতেন। তিনি এই আশ্বাস দিতেন যে, যে কেহ তার পাপের জন্য অনুতাপ করবে এবং ঈশ্বরের পিতৃত্বে পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করবে, সে অবশ্যই এই স্বর্গরাজ্য লাভ করবে। তিনি তাঁর ঐশ্বরিক লক্ষ্য লাভের জন্য অদ্ভুত দাবী করতেন। তিনি বলতেন যে তিনি পিতাকে জানেন, এবং পিতাই তাঁকে পাঠিয়েছেন। যখন বিচারের সময় তাঁকে প্রশ্ন করা হয়েছিল যে তিনি ত্রাণকর্তা এবং ঈশ্বরের সন্তান কিনা, তখন তিনি তাঁর সদর্থক উত্তর দিয়েছিলেন।

ঈশ্বরের পিতৃত্বে পূর্ণ বিশ্বাস

যীশুর মৃত্যুর পর তাঁর শিষ্য পল, লিউক ও মার্ক যীশুর বাণী প্রচারের ভার নিয়েছিলেন। যীশুর বাণী ছিল 'তোমরা সবাই ঈশ্বরের সন্তান, ঈশ্বরের সন্তানের অনুরূপ কাজ করে যাও। আঘাতের প্রতিদানে আঘাত করো না। অপরাধীকে ক্ষমা করো।' যীশুর শিষ্যদের মধ্যে যিনি শ্রেষ্ঠ সেই সেইন্ট পল (*St. Paul*) যীশুর

শিক্ষা ও উপদেশকে আরও বিশদভাবে প্রচার করেছিলেন। তিনি যীশুকে কখনও দেখেন নি। তিনি প্রায়শ্চিত্তের মতবাদটি ব্যাখ্যা করেছিলেন। তিনি দেখাতে চাইলেন যে যীশুর মৃত্যু এই জগতে পাপের জন্য এক অভিনব ঐশ্বরিক ক্রিয়া। মনুষ্যজাতির পাপের প্রায়শ্চিত্ত করার জন্য ঈশ্বর নিজেই তাঁর একমাত্র পালিত পুত্রকে পৃথিবীতে ইচ্ছা মৃত্যু বরণের জন্য পাঠিয়েছিলেন। সেইন্ট পল 'ত্রিত্ববাদ' (the Doctrine of the Trinity) বা 'একের ভিতরে তিনের বিশদ ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন।

যীশুর শিষ্যদের প্রচারকার্য

খ্রীষ্টধর্মের একটি বৈশিষ্ট্য হল এই ধর্মমত অনুসারে যীশুখ্রীষ্ট পাপীদের উদ্ধারকারী। মন্দ বা অকল্যাণ দু-প্রকার—জাগতিক ও নৈতিক। মানুষ চেয়েছিল জাগতিক অকল্যাণ বা মন্দ থেকে কেউ তাদের রক্ষা করুক। মানুষের নৈতিক অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে মানুষ নৈতিক অকল্যাণ বা পাপ সম্পর্কে সচেতন হয়েছিল এবং তার থেকে কেউ তাদের পরিত্রাণ করুক, এটি মনে মনে চেয়েছিল। কোন ধর্মই সমগ্র মানুষকে পরিতৃপ্ত করতে পারে না, যদি সেই ধর্ম মানুষকে জাগতিক ও নৈতিক অকল্যাণ থেকে মুক্ত করতে না পারে। এই পাপ থেকে কি ভাবে মুক্তি পাওয়া যেতে পারে বৌদ্ধধর্মে নির্বাণের মাধ্যমে তা বলা হয়েছে। বৌদ্ধধর্মে বলা হয়েছে কোন ঐশ্বরিক সাহায্য ছাড়া শুধুমাত্র মানুষ নিজের প্রচেষ্টাতেই নির্বাণ লাভ করতে পারে। খ্রীষ্টধর্ম মনে করে মানুষের অসন্তোষের কারণ তার নৈতিক অকল্যাণ। খ্রীষ্টের আত্মোৎসর্গমূলক মৃত্যুর মাধ্যমে খ্রীষ্টধর্ম মানুষের পাপ থেকে মুক্তির কথা ঘোষণা করে।

খ্রীষ্ট পাপীদের উদ্ধারকারী

মানুষ এবং ঈশ্বরের মধ্যে মধ্যস্থতার ব্যাপারে খ্রীষ্টের ভূমিকা খ্রীষ্টধর্মের এক উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। এই মধ্যস্থতার ব্যাপারে খ্রীষ্টের আত্মবলিদান বা জীবন উৎসর্গ একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। খ্রীষ্টধর্মে খ্রীষ্টের স্থান অভিনব। তিনি যে কেবল শিক্ষক বা উপদেষ্টা তা নয়, তিনি তাঁর মৃত্যুর দ্বারা মানুষকে পাপ থেকে পরিত্রাণ করেছিলেন।

খ্রীষ্ট মানুষ ও ঈশ্বরের মধ্যে মধ্যস্থ

সেবা, ভালবাসা বা প্রেমই খ্রীষ্টধর্মের ও খ্রীষ্টীয় নীতিতত্ত্বের মূল কথা। বিশ্বজনের প্রতি ভালবাসা, সমস্ত মানবজাতির সেবার কথাই খ্রীষ্টধর্মে বলা হয়েছে। যীশুখ্রীষ্ট বলতেন, 'ঈশ্বরকে ভালবাস, তোমার প্রতিবেশীকে ভালবাস।' প্রতিবেশী মানে স্বদেশবাসী নয়, বিশ্ববাসী, যারা সবাই এক ঈশ্বরের সন্তান। ধর্মের বাহ্য আচার অনুষ্ঠানের উপর তিনি কোন গুরুত্ব আরোপ করেননি। মন্দিরে উপহার পাঠিয়ে প্রতিবেশী বা পিতামাতাকে অভুক্ত রাখার

প্রেমই খ্রীষ্টধর্মের মূলমন্ত্র

কোন সার্থকতা নেই। শুধুমাত্র প্রতিবেশীকে ভালবাসলে বা তার প্রতি দয়া দেখালে, তার কোন মূল্য থাকে না। আসলে ধর্মের নীতি হবে সকল মানুষের সেবা। এটা শুধু মনোভাব রূপেই থাকবে না। এই নীতিকে মানুষের ব্যবহারিক জীবনে বাস্তবে রূপান্তরিত করতে হবে।

সকল কাজের ক্ষেত্রে খ্রীষ্টধর্ম কাজের উৎস অর্থাৎ অভিপ্রায়ের উপর গুরুত্ব আরোপ করে। মানুষের অভিপ্রায়ের পরিপ্রেক্ষিতেই তার কাজের ভালত্ব ও মন্দত্ব বিচার্য। আত্মস্বার্থ ও আচার-অনুষ্ঠানকে বাদ দিয়ে যে নৈতিক নীতিকে খ্রীষ্ট স্বীকার করেছেন তাহল প্রেম বা ভালবাসা। এই ভালবাসার সঙ্গে বিনয় বা নম্রতা সব সময়ই যুক্ত থাকবে। যীশুখ্রীষ্টের মতে করুণা ভালবাসারই পরিণাম, যার উপর সবকিছু নির্ভর এবং যে মনোভাব নিয়ে এই করুণা প্রদর্শন করা হবে তার উপরই এর মূল্য নির্ভর করে। সেজন্য তিনি বলতেন, "স্বর্গে তোমার পিতা যে রকম করুণাময়, তুমি সেই রকম করুণাময় হবার জন্য সচেষ্ট হও।" খ্রীষ্টের মতে ঈশ্বরের ন্যায়পরায়ণতার ভিত্তি হল তাঁর করুণা। যীশু তার শিষ্যদের বলতেন, "লক্ষ্য কর তোমার অন্তরে যে দীপ্তি আছে তা অন্ধকার কিনা, তোমার সমস্ত শরীর যদি দীপ্তিমান হয়, কোন অংশ অন্ধকারময় না থাকে তবে প্রদীপ যেমন আলোর ঝলকে তোমাকে দীপ্ত করে তেমনই তোমার শরীর সম্পূর্ণরূপে দীপ্তিমান হবে।"

অভিপ্রায়ের শুচিতা

নৈতিকতার প্রতি খ্রীষ্টের মনোভাবকে বিশ্লেষণ করতে গিয়ে অনেকে মনে করেন যে এই মনোভাব জগতকে পরিহার করতে চায় এবং এই মনোভাব অত্যন্ত কঠোর। ক্যাথলিক সম্প্রদায় মনে করে যে, একমাত্র মঠধারী সন্ন্যাসীরাই খ্রীষ্টকে পরিপূর্ণভাবে অনুসরণ করতে পারবে। বস্তুতঃ যীশুখ্রীষ্টের প্রচারিত দুচারটি বাণী দেখলে অনুরূপ ধারণা করতে হয়। যেমন, এক জায়গায় তিনি বলেছেন, 'আমার কাছে যদি কোন মানুষ আসে এবং তার পিতা ও মাতাকে, স্ত্রী সন্তানাদিকে, ভ্রাতা-ভগ্নীকে, এমন কি নিজের জীবনকে ঘৃণা না করে তাহলে সে আমার শিষ্য হতে পারে না।' এই ধরনের বাণী পাঠ করলে মনে হয় যে যীশুখ্রীষ্টের প্রচারিত বাণী অত্যন্ত কঠোর এবং এই জগতকে অস্বীকার করতে চায়। কিন্তু এই ধারণা যুক্তিসঙ্গত নয়। খ্রীষ্টের অনেক শিষ্য হয়ত সংসার ত্যাগ করেছিল, তবু কৃচ্ছ্রতা বা কঠোরতাই তাদের জীবনের লক্ষ্য ছিল না। বরং অনেকে এমন কথাই বলেন যে, সংসারে নিজের পরিবেশে থেকে নিজের কাজকর্ম করতে করতে এই ধর্ম অনুসরণ করা যায়। একথা সত্য যে কঠোরতা বা কৃচ্ছ্রতা খ্রীষ্টধর্মের লক্ষ্য নয় তবু

খ্রীষ্টধর্ম কৃচ্ছ্রতাবাদ সমর্থন করে না

যীশুখ্রীষ্ট আত্মঅস্বীকৃতি এবং আত্মপরিহারের উপর যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করে-ছিলেন। কিন্তু কঠোরতার জন্যই কঠোরতাকে অবলম্বন করতে হবে, এই নীতি খ্রীষ্টধর্মের কোথাও নেই। যে কঠোরতার কথা যীশুখ্রীষ্ট প্রচারিত উপদেশে আছে তা হল তিনটি শত্রুর সঙ্গে সংগ্রাম করা—জাগতিক বস্তুর দাসত্ব স্বীকার, ঈশ্বরে বিশ্বাস না করে, আকাঙ্ক্ষা মনে নিয়ে ভবিষ্যতের মুখোমুখী হওয়া এবং স্বার্থপরতা। যে ধর্মমতের মূল নীতি হল ভালবাসা, মানবের সেবা, কোন রকম রুচ্ছ্রতাবাদের আদর্শকে সেই ধর্মমত সমর্থন করতে পারে না।

যীশুখ্রীষ্ট মনে করতেন জাগতিক সম্পদের অধিকারী হওয়া মানুষের আত্মার পক্ষে ক্ষতিকারক। কারণ জাগতিক সম্পদ মানুষকে জাগতিক উদ্বেগ ও দুশ্চিন্তার মধ্যে জড়িয়ে ফেলে এবং ব্যক্তি উচ্ছৃঙ্খল সুখের জীবন অতিবাহিত করতে প্রণোদিত হয়। সেই জন্য তিনি বলতেন, 'ধনী ব্যক্তি কদাচিৎ স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করতে পারে। ঈশ্বরের রাজ্যে ধনবানের প্রবেশ করা অপেক্ষা সূচের ছিদ্র পথে উটের প্রবেশ করা সহজ'। অবশ্য যীশুখ্রীষ্ট মানুষকে দারিদ্র্য ও দুঃখে কালাতিপাত করতে বলেন নি। কেবল মাত্র যারা যীশুখ্রীষ্টের উপদেশ প্রচারের জন্য সমগ্র জীবনকে নিয়োগ করতে চায়, তাদের ক্ষেত্রেই তিনি সবসময় জাগতিক সম্পদ বর্জনের কথা বলেছেন।

জাগতিক সম্পদ সম্পর্কে যীশুর মন্তব্য

যীশু তাঁর শিষ্যদের সর্বতোভাবে প্রতিহিংসা বর্জন করতে বলতেন। তিনি বলতেন, "কেউ যদি তোমাদের ডান গালে চড় মারে, তোমরা বাঁ গালটা বাড়িয়ে দিও। যে তোমার চাদর কেড়ে নেয়, তাকে জামাটিও নিতে বারণ করো না।" যীশু তাঁর শিষ্যদের শত্রুদের সঙ্গে প্রেম করতে বলেন, প্রতিদানের আস্থা না রেখে তাদের উপকার করতে বলেন। যীশু বলেন, "কিন্তু তোমরা যারা শুনছ, তোমাদের আমি বলি, আপন আপন শত্রুদের সঙ্গে প্রেম কর, যারা তোমাকে দ্বেষ করে, তাদের উপকার কর, যারা তোমাদের অভিশাপ দেয় তাদের আশীর্বাদ কর, যারা তোমাদের কুৎসা করে তাদের জন্য প্রার্থনা কর"।

ইহুদী-খ্রীষ্টধর্মে ঈশ্বরের যে স্বরূপ বর্ণনা করা হয়েছে তা হল এই: ঈশ্বর অনন্ত ও অসীম, ঈশ্বর এক অসীম সত্তা। যে কারণে পল টিলিক (*Paul Tillich*) বলেন যে, 'ঈশ্বর অস্তিত্বশীল' (God exists), একথাও আমাদের বলা উচিত নয়; কেননা সেটি হবে ঈশ্বর সম্পর্কে একটি সীমিত মন্তব্য। ঈশ্বরের অস্তিত্ব অস্বীকার করাও যেমন নাস্তিকতা, ঈশ্বরের অস্তিত্বের কথা বলাও এক ধরনের নাস্তিকতা। ঈশ্বর হলেন সত্তা নিজেই (being itself), বা স্বনির্ভর সত্তা;

ঈশ্বর অনন্ত ও অসীম

শুধু সত্তা নয়, ঈশ্বর এই পদটি যে সত্তাকে নির্দেশ করে, সে সত্তা হল সব সত্তার উৎস এবং ভিত্তি। ঈশ্বরের সত্তা, ইহুদী-খ্রীষ্টান ধর্মমতে, অসীম এবং ঈশ্বরের বিচিত্র ঐশ্বরিক গুণাবলী বা বৈশিষ্ট্য হল বিভিন্ন উপায় যার মাধ্যমে অসীম ঐশ্বরিক সত্তা অস্তিত্বশীল বা সত্তাবান হয়ে থাকেন।

এই সব গুণাবলীর মধ্যে প্রথমেই উল্লেখ করা যেতে পারে 'স্ব-সত্তাবান' (self-existent) হওয়ার গুণটির কথা। এই স্ব-সত্তাবান বা নিজে নিজে অস্তিত্বশীল হওয়ার ব্যাপারে ঈশ্বর-বিজ্ঞানীরা দুটি বিষয়ের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। (১) ঈশ্বর নিজের উপর ছাড়া তার অস্তিত্বের বা গুণাবলীর জন্য অন্য কোন সত্তার উপর নির্ভর নয়। ঈশ্বর-বহির্ভূত এমন কোন কিছু নেই যা তাকে গঠন করতে পারে বা ধ্বংস করতে পারে; ঈশ্বরের স্ব-নির্ভরতা শর্তহীন, (২) এর থেকে যে বিষয়টি অনুসৃত হয় তা হল ঈশ্বর অসীম, তাঁর আদি অন্ত নেই। ঈশ্বরের আদি কল্পনা করলে ঈশ্বরের সত্তাবান হওয়ার জন্য ঈশ্বর-পূর্ব কোন সত্তার কথা চিন্তা করা দরকার এবং ঈশ্বরকে সান্ত বলা হলে ঈশ্বরের সত্তার পরিসমাপ্তি ঘটাবার জন্য এমন কোন সত্তা থাকার প্রয়োজন, যা ঈশ্বরের অস্তিত্বের পরিসমাপ্তি ঘটাবে। ঈশ্বর অসীম, এর অর্থ হল তাঁর আদি অন্ত নেই।

ঈশ্বর স্ব-সত্তাবান

ইহুদী-খ্রীষ্টান ধর্মমতানুসারে ঈশ্বর নিজেকে ছাড়া আর যা কিছু অস্তিত্বশীল, তার সবকিছুরই অসীম, স্ব-নির্ভর স্রষ্টা (infinite self-existent creator)। এই মতবাদে 'সৃষ্টি' মানে নিছক শূন্যতা থেকে সৃষ্টি; পূর্ব থেকে অস্তিত্বশীল এমন কোন উপাদানকে নতুন রূপদান করা নয়। এ হল শুধুমাত্র যখন ঈশ্বর অস্তিত্বশীল, তখন এক বিশ্বজগতকে সত্তাবান করে তোলা।

ঈশ্বর অসীম স্ব-নির্ভর স্রষ্টা

এই ধারণার সঙ্গে যুক্ত রয়েছে দুটি গুরুত্বপূর্ণ অনুসিদ্ধান্ত। প্রথমতঃ, এই ধারণা ঈশ্বর এবং তাঁর সৃষ্টি, এই দুই-এর মধ্যে চরম পার্থক্যকে স্বীকার করে, কোন সৃষ্ট জীবের পক্ষে স্রষ্টা হওয়া সম্ভব নয়। দ্বিতীয়তঃ, সৃষ্ট জগৎ তার নিরবচ্ছিন্ন অস্তিত্বের উৎস হিসেবে স্রষ্টা ঈশ্বরের উপর চূড়ান্তভাবে বা শর্তহীনভাবে নির্ভর; কাজেই মানুষ প্রতি মুহূর্তেই ঈশ্বরের উপর নির্ভর। টমাস একুইনাস (*Thomas Aqinus*)-এর মতে এটা ধারণা করা যেতে পারে যে ঈশ্বর অনন্তকাল ধরে সৃজনশীল, এবং যদিও বিশ্বজগৎ ঈশ্বরের দ্বারা সৃষ্ট এবং সেহেতু ঈশ্বরের উপর নির্ভর, তবু বিশ্বজগতের কোন সুরু নেই; বিশ্বজগৎ আদিহীন। তিনি আরও ধারণা করেছেন যে সৃষ্টির ধারণা যদিও কোন সুরুর ইঙ্গিত দেয় না তবু খৃষ্টীয় প্রত্যাদেশ একটা সুরুর কথা বলে। এই ভিত্তিতে তিনি অনন্ত সৃষ্টির (eternal creation) ধারণাটি বাতিল করে দেন।

এ সম্পর্কে অগাস্টিন (*Augastine*)-এর মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য। তাঁর মতে সৃষ্টি কালে (in time) ঘটেনি বরং কাল (time) নিজেই সৃষ্ট জগতের একটা বৈশিষ্ট্য।

ঈশ্বর দেশ কালদ্বারা সীমাবদ্ধ নয়

তাহলে আপেক্ষিকতা মতবাদ যে বিষয়টি নির্দেশ করে সেটি হল আভ্যন্তরীণ দিক থেকে দেশ-কাল অসীম। তার মানে দেশ-কালের পরিপ্রেক্ষিতে বিশ্বজগত দেশ-কাল দ্বারা সীমাবদ্ধ নয়। কিন্তু দেশ-কাল আভ্যন্তরীণ দিক থেকে অসীম হলেও তার অস্তিত্বের জন্য ঈশ্বরের উপর নির্ভর। সৃষ্টি সম্পর্কে ধর্মীয় মতবাদের এটাই হল সারবস্তু যে দৈশিক-কালিক সমগ্র সত্তা হিসেবে বিশ্বজগৎ ঈশ্বরের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত হয়েই অস্তিত্বশীল।

ঈশ্বর পুরুষবিশেষ (personal)। বাইবেল এবং অন্যান্য ইহুদী-খ্রীষ্টান ধর্মগ্রন্থে 'ইহা' (it) শব্দটি ব্যবহার না করে 'সে' (He) শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। অনেক ধর্মবিজ্ঞানী ঈশ্বর সম্পর্কে 'পুরুষসম্পর্কীয়' কথাটি ব্যবহার না করে ঈশ্বরকে একজন

ঈশ্বর পুরুষ অপেক্ষা কম কিছু নয়

পুরুষ (a person) রূপে অভিহিত করেছেন। পুরুষ বললে এক বৃহৎ মানব সত্তারূপে ঈশ্বরকে চিত্রিত করা হয়। একে বলে ঈশ্বরে নরত্ব আরোপ করা। ঈশ্বর পুরুষসম্পর্কীয়, একথা বলা হলে মনে করা যুক্তিযুক্ত হবে যে ঈশ্বর কি, তা আমাদের ধারণার অতীত হতে পারে। কিন্তু ঈশ্বর পুরুষের থেকে কোনভাবে কম কিছু নয়। ঈশ্বর মানুষের সম্পর্কে ইহা (It), নয় সর্বদাই এক মহান অতীন্দ্রিয় তুমি (the higher and transcendent thou)।

ঈশ্বর প্রেমময় (loving)। প্রেম বা ভালবাসা দু'ধরনের—একটা হল 'eros' অর্থাৎ যে প্রেম প্রেমিকের বাঞ্ছিত গুণের দ্বারা জাগ্রত হয়। এই ধরনের ভালবাসা ভালবাসার বস্তুর, ভালবাসা জাগ্রত করার বৈশিষ্ট্যের দ্বারা উদ্ভূত হয়। যেমন কোন

ঈশ্বর প্রেমময়

পুরুষ কোন একজন মহিলাকে ভালবাসে কারণ সে সুন্দরী, আকর্ষণীয়া বা চতুরা। মহিলাটি পুরুষকে ভালবাসে কারণ পুরুষটি হল সুদর্শন, পুরুষোচিত গুণসম্পন্ন এবং চালাক। পিতামাতা সন্তানকে ভালবাসে কারণ তারা তাঁদের সন্তান। কিন্তু ঈশ্বরের ভালবাসা ইহুদী খ্রীষ্টান ধর্মমতে 'eros' নয়

'eros' এবং 'agape'

'agape'। 'agape' শব্দের অর্থ হল ভালবাসা প্রদান করা (giving love)। এই ভালবাসা নিঃস্বার্থ ভালবাসা। এই ভালবাসা কাউকে প্রদান করা হয়, এই কারণে নয় যে, তার কোন বৈশিষ্ট্য আছে, বরং সে অস্তিত্বশীল, সে একজন পুরুষ। 'agape'-র স্বরূপটি হল, কোন ব্যক্তির এইভাবে মূল্যায়ণ করা যাতে তার গভীর কল্যাণ কামনা করা হয়। এই অর্থেই

বাইবেলের অন্তখণ্ডে মানবজাতির প্রতি ঈশ্বরের ভালবাসার কথা বলা হয়েছে। এই ভালবাসা ঈশ্বরের সত্তাতেই বিধৃত। এই ভালবাসার জন্যই ধারণা করা হয় যে ঈশ্বর মানুষের জীবনের পরিপূর্ণ আনুগত্য দাবী করেন।

ঈশ্বর সৎ বা ভাল (good)। এর অর্থ কি এই যে ঈশ্বর বহির্ভূত এক নৈতিক মানদণ্ড আছে, যার পরিপ্রেক্ষিতে তাঁকে সৎ বলা হয়, বা সংজ্ঞামতেই ঈশ্বর সৎ? উভয়ক্ষেত্রেই অসুবিধা রয়েছে। ঈশ্বর, ঈশ্বর-বহির্ভূত কোন মানদণ্ডের বিচারে সৎ বিবেচ্য হলে পরমসত্তা হতে পারেন না। আর যদি বলা হয় ঈশ্বর সংজ্ঞামতে সৎ (is good by definition), তাহলে এটা স্বতঃসত্য হবে যে ঈশ্বর যা কিছু আদেশ করেন সবই ঠিক। তাহলে ঈশ্বর যদি বলেন যে আমি আগে যা করতে নিষেধ করেছি, মানুষ এখন তা সব কিছুই করবে। তাহলে ঘৃণা, নিষ্ঠুরতা, স্বার্থপরতা, হিংসা সেগুলিও সৎ গুণে পরিণত হবে। তাহলে এই সমস্যার সমাধান কোথায়? মানুষ যখন ঈশ্বরকে সৎ বলে, তখন তার অর্থ হল তাঁর অস্তিত্ব এবং ক্রিয়া মানুষের পরম কল্যাণের শর্তস্বরূপ। ঈশ্বর মানুষকে এমন ভাবে সৃষ্টি করেছেন যে তার পরম কল্যাণ ঈশ্বরের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত হয়েই লব্ধ হতে পারে। নীতিবিদ্যা ধর্ম নির্ভর নয়, কেননা নৈতিকতার নীতি ধর্মের উপর নির্ভর না করেও প্রমাণ করা যেতে পারে, তবু নৈতিকতা এবং মূল্য নিরূপণ ঈশ্বরের প্রকৃতির উপর নির্ভর। কেননা ঈশ্বর মানুষকে এমন প্রকৃতি দিয়েছেন যার পরিপূর্ণতাই তার কল্যাণ।

ঈশ্বরের সততার যথার্থ অর্থ

খ্রীষ্টানধর্মে ঈশ্বর হলেন এক সুমহান সত্তা, যিনি অসীম, যিনি পবিত্র (holy) অর্থাৎ যিনি হচ্ছেন পরম আত্মা, যার চিন্তা তোমার চিন্তা নয়। ঈশ্বর বলেন, "তোমার উপায় আমার উপায় নয়।" ঈশ্বরকে পরম আত্মা বলে মনে করা হল এমন এক সত্তার কথা চিন্তা করা যে সত্তা ভয়ঙ্কর ভাবে রহস্যময়, এমন এক সত্তার পরিপূর্ণতার কথা চিন্তা করা যার সম্পর্কে মানুষ কিছুই নয়। ঈশ্বর এক পূর্ণতা যার দৃষ্টিতে আমাদের সব ধর্মপ্রবণতা বা ন্যায়পরতা হল নোংরা বস্ত্রখণ্ড, ঈশ্বর হল এক উদ্দেশ্য এবং শক্তি, যার কাছে সব মানুষ কেবলমাত্র সশ্রদ্ধ ভয়ে মাথা নত করতে পারে।

কাজেই ইহুদী-খ্রীষ্টান ধর্মমতে ঈশ্বর হলেন জন হিকের ভাষায়, অসীম, অনন্ত, স্ব-নির্ভর ব্যক্তি সত্তা, যিনি নিজেকে ছাড়া সব কিছু সৃষ্টি করেছেন এবং যিনি তাঁর সৃষ্ট মানবের কাছে পবিত্র এবং প্রেমময় রূপে নিজেকে প্রকাশ করেছেন।[1]

1. John Hick; Philosophy of Religion; Page 14.

ত্রিত্ববাদ (Trinity) খ্রীষ্টধর্মের বৈশিষ্ট্য। খ্রীষ্টানদের মতে ঈশ্বরের তিন রূপ—পিতা (God the Father), পুত্র (God the Son) ও পবিত্র আত্মা (God the Holy spirit)। এই মতবাদ অনুসারে ঈশ্বর পিতা, স্রষ্টা, সকল কিছুর আদি উৎস; পুত্র হিসেবে তিনি যীশুর মধ্যে মূর্ত এবং পবিত্র আত্মা হিসেবে তিনি সমস্ত সৃষ্টির মধ্যে এবং আমাদের আত্মার মধ্যে বিরাজমান! যীশুখ্রীষ্টকে খ্রীষ্টানগণ ঈশ্বরের পুত্র রূপে জানেন এবং বলেন যে তিনি ঈশ্বরের অবতার (Incarnation of God)। 'তিনে এক—একে তিন'—এই অভিনবত্ব বাইবেলের New Testament-র সৃষ্টি, Old Testament-এ এটি নেই। সেখানে ঈশ্বর একক এবং অদ্বিতীয় রূপেই ব্যাখ্যাত হয়েছে। ত্রিত্ববাদ খ্রীষ্টধর্মের বৈশিষ্ট্য হলেও খ্রীষ্টধর্ম ঈশ্বরের একত্বের কথাই বলে। কাজেই খ্রীষ্টধর্ম একেশ্বরবাদী (monotheistic)।

ত্রিত্ববাদের বৈশিষ্ট্য

খ্রীষ্টধর্ম ইহুদী ধর্মের সঙ্গে একমত হয়ে এই অভিমত প্রকাশ করে যে বাইবেলের পূর্বভাগ ঈশ্বরের প্রত্যাদেশ সম্বলিত এবং বাইবেলের অন্তভাগে সেই প্রত্যাদেশের উপসংহার ঘটেছে। এই প্রত্যাদেশের চরম পরিণতি ঘটেছে যীশুর মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের আবির্ভাবের মাধ্যমে, যিনি এখনও স্বর্গে অধিষ্ঠিত এবং যিনি পবিত্র আত্মার শক্তি এখনও মানুষের উপর বর্ষণ করেন। কাজেই যীশুর মধ্য দিয়েই ঈশ্বরের শেষবারের মত আত্মপ্রকাশ। অন্যান্য ধর্ম, যেমন—হিন্দুধর্মে, বৌদ্ধধর্মেও মানুষের মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের আবির্ভাবের কথা আছে। কিন্তু খ্রীষ্টানরা দাবী করেন যে যীশুর মধ্য দিয়েই ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠ প্রকাশ এবং এই প্রকাশের মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের অনন্ত প্রেমের প্রকাশের কথা জানা যায়।

খ্রীষ্টানরা বিশ্বাস করেন যে একই ঈশ্বরের সমমর্যাদাসম্পন্ন ও সমশক্তিসম্পন্ন তিনটি রূপের মধ্য দিয়ে প্রকাশ ঘটে—পিতা, পুত্র এবং পবিত্র আত্মা। খ্রীষ্টানরা একেশ্বরবাদী হিসেবে এক ঈশ্বরে বিশ্বাস করে এবং তবু এক ঐক্যের মধ্যে তিনের বিভেদের কথা বলে—পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মা। খ্রীষ্টানরা ঈশ্বরকে পুরুষ রূপে কল্পনা করে। অর্থাৎ কিনা, খ্রীষ্টানরা মানুষ ও ঈশ্বরের মধ্যে এক আধ্যাত্মিক ও নৈতিক সম্পর্কে বিশ্বাসী। ঈশ্বর প্রেমময় ও সজীব; তিনি ভক্তের ডাকে সাড়া দেন।

খ্রীষ্টানরা বিশ্বাস করেন যে সৃষ্টিকার্য হল ঐশ্বরিক কাজ। খ্রীষ্টধর্ম জড়বাদ, দ্বৈতবাদ এবং উন্মেষবাদের বিরোধী। ঈশ্বর জগৎ সৃষ্টি করলেও ঈশ্বর ও জগৎ অভিন্ন নয়। ঈশ্বর অসীম সত্তা হিসেবে জগতের অতিবর্তী, যীশুখ্রীষ্ট ঈশ্বরের সন্তান হিসেবে সৃষ্টিকার্যে ঈশ্বরের কর্মী। সব সৃষ্টির লক্ষ্য ঈশ্বরকে শেষ লক্ষ্য মনে করে তাঁর দিকে যাত্রা করা। এর অর্থ সৃষ্টির মধ্যে একটা ঐশ্বরিক উদ্দেশ্য ক্রিয়া করছে। [সৃষ্টির

অর্থ এই নয় যে ঈশ্বর এই জগৎ ও জীব সৃষ্টি করার পর জগতকে তার উপর ছেড়ে দিলেন। ঈশ্বরের সৃষ্টিকার্য মানে ঈশ্বর এই জগতের সংরক্ষণ করেন। ঈশ্বরের মধ্যেই জগত ও জীবের অস্তিত্ব গতি ও সত্তা।

মানুষ সম্পর্কে খ্রীষ্টানদের অভিমত হল ঈশ্বর মানুষকে নিজের প্রতিশ্রুতির অনুরূপে গঠন করেছিলেন এবং নৈতিক পবিত্রতা লাভের প্রচেষ্টা মানুষের কর্তব্য। এই প্রসঙ্গে খ্রীষ্টানরা মনে করেন যে রক্তমাংসের দেহ ও আত্মার মধ্যে চির-বিরোধ। রক্তমাংসের দেহ অতি সহজেই পাপ কার্যের বশবর্তী হয়। ইডেনের উদ্যানে নিষিদ্ধ ফল খাওয়ার জন্য মানুষের যে পতন ঘটেছিল, তার জন্য সব মানুষই পাপী। যদিও ঈশ্বরের কৃপায় আমরা এই পাপ থেকে মুক্ত হতে পারি, খ্রীষ্টানরা মানুষের পাপের প্রতি প্রবণতার ক্ষেত্রে যেমন গুরুত্ব আরোপ করেছেন তেমনি মানুষের মুক্তির জন্য ঈশ্বরের ধারণা ও অনুমোদনের উপরও গুরুত্ব আরোপ করেছেন। খ্রীষ্টধর্ম মানুষকে এই আশ্বাস দেয় যে মানুষ পাপের উর্ধ্বে জীবনের পবিত্রতায় উত্তীর্ণ হতে পারে।

মানুষ সম্পর্কে খ্রীষ্টধর্মের বক্তব্য

খ্রীষ্টধর্মে জীবের মোক্ষ, খ্রীষ্টধর্মের ঈশ্বর-পিতার ধারণার সঙ্গে যুক্ত। কারণ তিনি শুদ্ধ প্রেমবশতঃ সকলকে নিজের কাছে টেনে নেন। ক্রুশ হল সেই ভালবাসার প্রতীক। ঈশ্বরের সন্তান ত্যাগমূলক ভালবাসার দ্বারা মানুষের প্রায়শ্চিত্তকে কার্যকর করেছিলেন এবং চিরকালের জন্য সব পাপীকে ভালবাসার পথ অনুসরণ করে মোক্ষ লাভের জন্য নির্দেশ দিয়েছেন।

মোক্ষ সম্পর্কে ধারণা

খ্রীষ্টধর্মের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বিশদ বিবরণ দেওয়া সম্ভব নয়। খ্রীষ্টধর্মের দুটি উল্লেখযোগ্য সম্প্রদায় হল—ক্যাথলিক (*Catholic*) এবং প্রোটেস্ট্যাণ্ট (*Protestant*)। তাঁরা উভয়ে একই মতবাদে বিশ্বাসী যদিও উভয় দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। ক্যাথলিকরা মনে করেন যে কুমারী মেরীই যীশুর মাতা এবং তাঁরা নানা ধরনের আচার অনুষ্ঠান পালনের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। কুমারী মেরীই যীশুর মাতা, প্রটেস্ট্যাণ্টরা বিশ্বাস করেন না। তাঁরা আচার-অনুষ্ঠান পালনের কঠোরতার প্রয়োজনীয়তাকে অস্বীকার করেন এবং মনে করেন যে মানুষ তার পথে চলার জন্য সকল সময়ই বাইবেলের উপর নির্ভর করবে।

খ্রীষ্টধর্মের দুটি সম্প্রদায়

খ্রীষ্টধর্ম হল প্রেমের ধর্ম, ভালবাসার ধর্ম, যে ধর্ম ঈশ্বরের পিতৃত্বের অধীনে মানুষের ভ্রাতৃত্বের কথা বলে। খ্রীষ্টধর্ম সর্বপ্রকার হিংসা, বিদ্বেষ, অসাধুতা, অপবিত্রতা ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করে। খ্রীষ্টধর্ম তার অনুরাগীবৃন্দকে জগৎ সম্পর্কে সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি পরিহার করে বৃহত্তর দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণে পরামর্শ দেয়।

পরিশিষ্ট

পঞ্চম অধ্যায়

আধুনিক বিজ্ঞান কি ঈশ্বরে অবিশ্বাসের হেতু হতে পারে (Can Modern Science be considered a ground for disbelief in God ?) ঃ

বর্তমান যুগে বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের ব্যাপক প্রসার ধর্মীয় বিশ্বাসের উপর গভীর প্রভাব বিস্তার করেছে। ইহুদী-খ্রীষ্টান ধর্মের ক্ষেত্রে এই প্রভাব অত্যন্ত বেশী; বিজ্ঞানের দাবী এবং ধর্মীয় জ্ঞান—এই দুইকে কেন্দ্র করে সৃষ্টি হয়েছে একাধিক বিতর্ক এবং এর ফলে সমসাময়িক বুদ্ধিজীবী মহল ধর্মের সমালোচনায় মুখর হয়ে উঠেছে।

রেনেসাঁস বা নবজাগরণের পর থেকেই বিশ্বজগৎ সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের অগ্রগতি ঘটেছে। জ্যোতির্বিজ্ঞান, ভূবিজ্ঞান, প্রাণিবিজ্ঞান, রসায়নশাস্ত্র এবং পদার্থবিদ্যার ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের বিস্তৃতি সত্যই বিস্ময়কর। এই সকল শাস্ত্রের নানা বিষয় সম্পর্কে বাইবেলের অভিমতগুলিকে ক্রমশঃ বাতিল করা হচ্ছে, কেননা পর্যবেক্ষণ এবং পরীক্ষণের মাধ্যমে লব্ধ সিদ্ধান্তগুলির সঙ্গে বাইবেলের বক্তব্যের বিরোধিতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। বৈজ্ঞানিক এবং ধর্মবিশ্বাসী ব্যক্তি, এই দুই-এর মধ্যে যখন কোন বিতর্কের উদ্ভব ঘটেছে, তখন ব্যবহারিক কার্যকারিতার কথা বিচার করে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির প্রতিই সমর্থন জানান হয়েছে। যে সব ধর্মীয় বিশ্বাসের সঙ্গে বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের বিরোধ পরিলক্ষিত হয়েছে, সে-সব ক্ষেত্রে ধর্মীয় বিশ্বাসের ব্যাপারেই প্রয়োজনীয় সামঞ্জস্য বিধান সাধিত হয়েছে। বিজ্ঞানের সঙ্গে ধর্মের এই সুদীর্ঘকালীন বাদ-প্রতিবাদের ক্ষেত্রে যে বিষয়টি পরিলক্ষিত হয়েছে তা হল খ্রীষ্টীয় ধর্মগ্রন্থের লেখকবৃন্দ মানব-ইতিহাসে ঈশ্বরের ক্রিয়াকলাপ সম্পর্কীয় অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ করার ব্যাপারে জগতের বোধ সম্পর্কে যে সব সাক্ষ্য প্রমাণ উপস্থাপিত করেছেন তা মোটেও বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল না, তাঁদের তৎকালীন অভিজ্ঞতার উপরই প্রতিষ্ঠিত ছিল। মানুষের ক্রমবর্ধমান জ্ঞান স্পষ্ট করেই বুঝে নিতে পেরেছে যে খ্রীষ্টান ধর্মগ্রন্থের লেখকবৃন্দ তাঁদের ঈশ্বর সম্পর্কীয় অভিজ্ঞতার বিবরণ লিপিবদ্ধ করার ব্যাপারে জগৎ সম্পর্কীয় প্রাচীন চিন্তাধারার উপরই বিশেষ করে নির্ভর করেছেন।

নবজাগরণের পর থেকে বিশ্বজগৎ সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের অগ্রগতি

কাজেই আধুনিক পাঠকের কাছে আধুনিক জ্ঞানের আলোকে বাইবেলে বর্ণিত বিশ্বজগৎ সম্পর্কীয় অনেক ঘটনাই আর বিশ্বাসযোগ্য মনে হয় না। সৃষ্টিবাদ এখন আর আধুনিক পাঠকের কাছে গ্রহণযোগ্য মতবাদ নয়। ৬০০০ বছর আগে বিশ্বজগতের সৃষ্টি হয়েছিল এবং মানুষ এবং অন্যান্য জীবজন্তু তাদের বর্তমান আকার-আকৃতি নিয়ে তখনই আবির্ভূত হয়েছিল,—এই মতবাদ এখন আর বিচারবুদ্ধিসম্মত বলে গ্রাহ্য হয় না। তাছাড়া খ্রীষ্টধর্ম বিশ্বাস অনুযায়ী শেষ বিচারের দিনে মৃত মানুষের কবর থেকে উঠে আসার ঘটনাও বুদ্ধিগ্রাহ্য মনে হয় না। কিন্তু যখনই বৈজ্ঞানিক সাক্ষ্য প্রমাণের সঙ্গে খ্রীষ্টান ধর্মপ্রাণ ব্যক্তিদের ধর্মীয় বিশ্বাসের বিরোধিতা দেখা দিয়েছে তখনই পাদরী সমাজ তার বিরুদ্ধে প্রবল বিক্ষোভ জানিয়েছে। এই বিক্ষোভ প্রাচীন মনোভাবাপন্ন ব্যক্তির নতুন অভিমত বা মতবাদকে মেনে না নেবার ব্যাপারে যে স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া, তা ছাড়া আর কিছুই নয়। কিন্তু এই প্রতিক্রিয়ার সমর্থন মিলেছে একদিক থেকে—সেটা হল প্রত্যাদেশের বিবৃতিমূলক ধারণা (propositional conception of revelation)। এই ধারণা অনুসারে ধর্মগ্রন্থের সব বিবৃতিই ঈশ্বরের বিবৃতি। কাজেই এই সব বিবৃতির সত্যতা সম্পর্কে কোন প্রশ্ন উত্থাপন করার অর্থ হল ঈশ্বরকে মিথ্যা ভাষণের অভিযোগে অভিযুক্ত করা অথবা খ্রীষ্টানদের ধর্মগ্রন্থ বাইবেল যে ঈশ্বরের প্রভাবে অনুপ্রাণিত, এই বিষয়টি অস্বীকার করা।

বর্তমানে সৃষ্টিবাদ আর গ্রহণযোগ্য মতবাদ বলে গ্রাহ্য হয় না

বিংশ শতাব্দীর পাশ্চাত্ত্য চিন্তাধারার ক্ষেত্রে যে বৈশিষ্ট্য বিজ্ঞানের জয়যাত্রা এবং ধর্মের পশ্চাদপসরণের ব্যাপারে প্রভাব বিস্তার করেছে তা হল এই যে, যদিও বিজ্ঞান সুনির্দিষ্টভাবে ধর্মের দাবীকে মিথ্যা বলে প্রমাণ করেনি, বিশ্বজগৎ সম্পর্কে বিজ্ঞান এমন অনেক তথ্য উপস্থাপিত করেছে যে ধর্মবিশ্বাস বর্তমানে একটা ব্যক্তিগত অলীক বিশ্বাসে পরিণত হয়েছে, যা মোটেও ক্ষতিকর নয়। ধর্ম যেন পরাজয় বরণ করে মানুষের জ্ঞানের রাজ্য থেকে ক্রমশঃ দূরে সরে যাচ্ছে। জন হিকের মন্তব্য উদ্ধৃত করে বলতে গেলে বলতে হয় যে ধর্ম যেন জ্যোতিষশাস্ত্রের সমজাতীয় মর্যাদা লাভ করেছে। জ্যোতিষশাস্ত্র প্রাচীন কাল থেকে চলে আসছে, অথচ তার সম্পর্কে আমাদের অভিজ্ঞতামূলক জ্ঞানের বিস্তৃতি খুবই অল্প।

ধর্মবিশ্বাস বর্তমানে একটা অলীক বিশ্বাসে পরিণত হয়েছে

বিজ্ঞান দেখিয়েছে যে ঈশ্বরের প্রসঙ্গের উল্লেখ না করেও প্রকৃতির আলোচনা সম্ভব। বিজ্ঞান বিশ্বজগত সম্পর্কে তার অনুসন্ধানকার্যে যেভাবে এগিয়ে চলেছে তাতে এমন কথাই মনে হয় যে ঈশ্বরের কোন অস্তিত্ব নেই।

জন হিক যে প্রশ্নের অবতারণা করেছেন তা হল উপরিউক্ত ঘটনার ভিত্তিতে কি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে ঈশ্বরের কোন অস্তিত্ব নেই?

তিনি বলেন যে এমন ধরনের ধর্ম সম্পর্কীয় বিশ্বাস আছে যার ভিত্তিতে এই সিদ্ধান্ত করা যেতে পারে যে ঈশ্বর নেই আবার এমন বিশ্বাসও রয়েছে যার ভিত্তিতে ঐ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না।

ঈশ্বরের অস্তিত্ব এবং নাস্তিত্ব উভয় ধরনের সিদ্ধান্ত

জন হিকের বক্তব্য হল যদি ঈশ্বরের সত্তায় বিশ্বাসকে বৈজ্ঞানিক যুগ-পূর্ববর্তী একটা অনুমানের বিষয় বলে গণ্য করা হয়, তাহলে এই জাতীয় বিশ্বাসকে যথার্থ বলে গণ্য করা যায় না। কিন্তু ব্যাপারটা অন্য রকম দাঁড়ায় যদি এমন ধারণা করা হয় যে ঈশ্বর মানুষের সৃষ্টির ব্যাপারে এই বিশ্ব-জগতকে এমন ভাবে সৃষ্টি করেছেন যে এটা হয়ে উঠেছে এক নিরপেক্ষ রাজ্য, যেখানে তাঁর সৃষ্ট জীব অনেকখানি স্বাধীনতা লাভ করেছে যাতে তারা স্রষ্টার সঙ্গে স্বাধীনভাবে একটা সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করতে পারে। এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বিচার করলে ঈশ্বর মানুষের থেকে কিছুটা দূরে অবস্থিত। কিন্তু তিনি মানুষকে কিছুটা স্বাধীনতা দিয়েছেন, যা আপেক্ষিক, কিন্তু স্বাধীন ব্যক্তি-সত্তা হিসেবে মানুষের অস্তিত্বের পক্ষে যা পর্যাপ্ত। সৃষ্ট মানুষের সঙ্গে স্রষ্টার এই যে দূরত্ব, এটাকে জ্ঞানের দিক থেকে বুঝে নিতে হবে, এটা দেশগত দূরত্ব নয়।

এই দূরত্ব যে ঘটনার উপর নির্ভর, তা হল যেহেতু ঈশ্বর মানুষের মনে তেমন স্পষ্টভাবে ধরা পড়ে না সেহেতু ঈশ্বরকে কেবলমাত্র বিশ্বাসের মাধ্যমে জানা যায়। এই ঘটনাকে বুঝে নিতে হলে আরও যে বিষয়ের প্রয়োজন তা হল মানুষের পরিবেশে সেই স্বাধীনতা রয়েছে যা তার থাকা প্রয়োজন অর্থাৎ পরিবেশ এমন হবে যাতে তার ক্রিয়াকলাপ বুঝে নেবার জন্য অনুসন্ধানকারীকে বিশ্বজগতের অন্তঃস্থিত বা অতিবর্তী কোন ঈশ্বরের অনুমান করতে হবে না। ঈশ্বরের এরূপ ধারণা করা হলে, প্রকৃতির স্বয়ংক্রিয়তা অর্থাৎ প্রকৃতি যে স্বশাসিত এই বিষয়টি বিজ্ঞান উত্তরোত্তর যাকে স্বীকার করে নিচ্ছে, ধর্মীয় বিশ্বাসের বিরোধিতা করে না।

স্রষ্টার সঙ্গে সৃষ্ট জীবের দূরত্ব যে সব ঘটনার উপর নির্ভর তার ব্যাখ্যা

বৈজ্ঞানিকরা যে বিশ্বজগতের অনুসন্ধানকার্যে ব্রতী, সেই বিশ্বজগৎ ঈশ্বরের দ্বারা সৃষ্ট এবং সংরক্ষিত কিন্তু এই বিশ্বজগতের স্বয়ংক্রিয়তা এবং ঐক্য ঈশ্বর প্রদত্ত। ঈশ্বর এবং ঈশ্বরের উদ্দেশ্যকে এইভাবে বুঝে নিলে ধর্মের দিক থেকে বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের বিষয়টি ধর্মবিশ্বাসী ব্যক্তিদের কাছে আর তেমন আশঙ্কাজনক মনে হয় না।

বিজ্ঞানের বিভিন্ন আবিষ্কার যেমন, প্রাণীজগতের সঙ্গে মানুষের নিরবচ্ছিন্নতার সম্পর্ক, পৃথিবীর বুকে রাসায়নিক প্রক্রিয়ার ফলে প্রাণের উদ্ভব এবং পরীক্ষণাগারে রাসায়নিক প্রক্রিয়ার সাহায্যে নতুন জীবন সৃষ্টির সম্ভাবনার বিষয়, মহাশূন্যে মানুষের অভিযান, অন্যান্য গ্রহে প্রাণের অস্তিত্বের সম্ভাবনা, মানুষের বংশগতির বাহক জিনের নিয়ন্ত্রণ, পরমাণবিক শক্তির সাহায্যে মারণাস্ত্র তৈরি করে তার দ্বারা মানুষের আত্ম-হনন, এইসব ঘটনা এবং সম্ভাবনা, যার ভাল মন্দ উভয় ধরনের পরিণাম রয়েছে, সবই এক প্রাকৃতিক অবস্থার বিভিন্ন দিক। এই প্রাকৃতিক অবস্থার রয়েছে এক স্বয়ংক্রিয়া গঠন। ধর্মীয় বিশ্বাস অনুসারে ঈশ্বর এই প্রাকৃতিক অবস্থার সৃষ্টি করেছেন যা হল একটি পরিবেশ যেখানে মানুষ স্বাধীন এবং দায়ীত্বপূর্ণ কর্মকর্তা হিসেবে ঈশ্বরের সঙ্গে সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করতে পারে। ধর্মের এই দাবীর উপর বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের যে প্রভাবের কথা বলা যেতে পারে তা হল, এই দাবী কোন প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের আওতায় পড়ে না। বিজ্ঞান বিষয়টি স্বীকার করতেও পারে না বা অস্বীকারও করতে পারে না।

এই ধরনের ধর্মবিজ্ঞানমূলক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে, ধর্মশাস্ত্রে যে সব অলৌকিক গল্পের কথা বলা হয়েছে, তাদের ব্যাখ্যা কি হতে পারে? স্বয়ংক্রিয় প্রাকৃতিক বা জাগতিক অবস্থাই যে বিজ্ঞানের অনুসন্ধানের ক্ষেত্র এই স্বীকৃতির সঙ্গে অলৌকিক ঘটনার ব্যাপারটি কি অসংগতিপূর্ণ?

এর উত্তর খুঁজে পাওয়া যাবে 'অলৌকিক'-এর সংজ্ঞা আমরা কিভাবে নিরূপণ করি। এই পদটিকে পুরোপুরিভাবে জাগতিক বা ধর্মের সঙ্গে সম্পর্কবিযুক্ত পদরূপে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। জাগতিক দিক থেকে ব্যাখ্যা করতে গেলে বলতে হবে যে অলৌকিক হল তাই যা প্রাকৃতিক নিয়ম লঙ্ঘন করে। ধর্মের দিক থেকে অলৌকিক হল এক অসাধারণ উল্লেখযোগ্য ঘটনা যা ঈশ্বর সম্পর্কে চেতনা মনে জাগ্রত করে। অলৌকিক ঘটনা বলতে যদি বোঝায় প্রাকৃতিক নিয়ম লঙ্ঘন করা তাহলে বলা যেতে পারে যে অলৌকিক বলে কিছু নেই। অবশ্য তার থেকে এই সিদ্ধান্ত করা যাবে না যে ধর্মের দিক থেকে 'অলৌকিক' বলে কোন পদের অস্তিত্ব নেই। কেননা প্রাকৃতিক নিয়মের বিরোধিতা করে কোন কিছু ঘটে না, এই নীতি নির্দেশ করে না যে, এমন কোন অসাধারণ বা উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটে না যা ঈশ্বর সম্পর্কে মনে কোন সুস্পষ্ট চেতনা জাগিয়ে তোলে না। বিশেষ বিশেষ দৃষ্টান্ত পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষণ করে সামান্য নিয়ম প্রতিষ্ঠা করা হয় বিশেষ বিশেষ ঘটনাকে ব্যাখ্যা করার জন্য। যখন কোন ঘটনা ঘটে যাকে

অলৌকিক ঘটনার ব্যাখ্যা

সামান্তীকরণের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত নিয়মের সাহায্যে ব্যাখ্যা করা যায় না, তখন বৈজ্ঞানিক কিন্তু ঘটনা ঘটার বিষয়টি অস্বীকার করতে চায় না। বৈজ্ঞানিক প্রকৃতি সম্পর্কে তার যে বোধ তার পুনর্বিবেচনা করতে চায় বা জ্ঞানকে আরও বিস্তৃত করতে চায় যাতে ঘটনাগুলিকে বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে। অস্বাভাবিক বা চমকপ্রদ ঘটনা ঘটা যে বৈজ্ঞানিক দিক থেকে অসম্ভব তা নয়।

জন হিকের মন্তব্য

জন হিক বলেন যে, ধর্মীয় তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা, যা ঈশ্বরের উপস্থিতি এবং ক্রিয়া সম্পর্কে সুস্পষ্ট চেতনা জাগ্রত করে, ঘটলেও ঘটতে পারে। তবে হয়ত এমন হতে পারে যে আমাদের বর্তমান সীমিত জ্ঞানের সাহায্যে প্রকৃতির সাধারণ প্রক্রিয়ার সঙ্গে তার সংযোগ আবিষ্কার করা হয়ত সম্ভব নাও হতে পারে।

প্রাচীন যুগে অলৌকিক ঘটনার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা ধর্মশাস্ত্রে দেখা যায়। এইসব অলৌকিক ঘটনা মানুষের মনে বাধ্যতামূলকভাবে ধর্মবিশ্বাসকে জাগ্রত করত। প্রাচীন অভিমতের বিরোধিতা করে অনেক ধর্মবিজ্ঞানী মনে করেন যে ধর্মীয় বিশ্বাসের মৌলিক ভিত্তি যুগিয়ে দেবার ব্যাপার দূরে থাক, অলৌকিক ঘটনা পূর্ব থেকে ধর্মবিশ্বাসকে স্বীকার করে নেয়। অর্থাৎ ধর্মবিশ্বাসের স্থান আগে, অলৌকিক ঘটনার স্থান তার পরে। ধর্মীয় বিশ্বাস, একই সময়ে ঘটনার সংঘটন যাকে সাধারণভাবে ব্যাখ্যা করা যায় না, তাকে অলৌকিক ঘটনারূপে অভিহিত করে বা যা আপাতদৃষ্টিতে ঘটা অসম্ভব মনে হয় বা যা অপ্রত্যাশিত এমন ঘটনাকে অলৌকিক ঘটনাতে রূপান্তরিত করে। কাজেই জন হিকের মতে অলৌকিক ঘটনা হল বিশ্বাসের ব্যাপার। ধর্মপ্রবণ ব্যক্তির আভ্যন্তরীণ বিশ্বাসের জগতে তার স্থান। অলৌকিক ঘটনা এমন মাধ্যম নয় যার দ্বারা ধর্মীয় সম্প্রদায় বাহ্য জগতকে ধর্মে দীক্ষিত করতে পারে বা মানুষের মনে ধর্ম বিশ্বাস জাগাতে পারে।

কাজেই দেখা গেল বিজ্ঞানের সাহায্যে ঈশ্বরের অস্তিত্ব যেমন প্রমাণ করা যায় না, তেমনি অপ্রমাণও করা যায় না।

নবম অধ্যায়

ধর্ম বিশ্বাসের ভিত্তি

১। প্রত্যাদেশ এবং বিশ্বাস সম্পর্কে বিবৃতিবাচক এবং অ-বিবৃতিবাচক মতবাদ (The Propositional and Non-Propositional View of Revelation and Faith) :

প্রত্যাদেশ এবং বিশ্বাস সম্পর্কে বিবৃতিবাচক মতবাদ (Propositional View) যে বিষয়টি ব্যক্ত করতে চায় তা হল প্রত্যাদেশের বিষয়বস্তু হল কিছু সত্য, যা বিবৃতি বা বচনের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়। (The content of revelation is a body of truths expressed in statements or propositions)। ঐশ্বরিক প্রাথমিক সত্য মানুষকে জ্ঞাপন করাই হল প্রত্যাদেশ। এই মতবাদটি মধ্যযুগে বিশেষ প্রাধান্য লাভ করে এবং বর্তমানে রোমান ক্যাথলিকবৃন্দ এই মতবাদটির সমর্থন করেছেন। ক্যাথলিক বিশ্বকোষে যে ভাষায় প্রত্যাদেশের সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে তা হল 'প্রত্যাদেশ হল বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন জীবের কাছে ঈশ্বরের কিছু সত্যের প্রকাশ বা উদ্ঘাটন, সেই উপায়ে, যে উপায় (means) সাধারণ প্রাকৃতিক উপায়ের ঊর্ধে।

প্রত্যাদেশ সম্পর্কে বিবৃতিবাচক মতবাদ

প্রত্যাদেশ সম্পর্কীয় এই মতবাদের সঙ্গে সংগতি রক্ষা করে বিশ্বাস সম্পর্কীয় একটি মতবাদও গঠিত হয়েছে, যে মতবাদ অনুসারে মানুষ এই সব ঐশ্বরিক প্রত্যাদিষ্ট সত্যকে মেনে চলার জন্য গ্রহণ করে। ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দের ভাটিকান সংসদ (*Vatican Council*) বিশ্বাসের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন যে বিশ্বাস হল 'এক অলৌকিক সংগুণ যার জন্য ঈশ্বরের করুণার দ্বারা অনুপ্রাণিত এবং সাহায্যপ্রাপ্ত হয়ে আমরা বিশ্বাস করি যে, তিনি যেসব সত্যকে ব্যক্ত বা প্রকাশ করেছেন, সেগুলি সত্য।' একজন সমসাময়িক ঈশ্বরতত্ত্ববিদ্ বা ধর্মবিজ্ঞানীর বক্তব্য উদ্ধৃত করে বলা যেতে পারে, "একজন ক্যাথলিকের কাছে 'বিশ্বাস' শব্দটি যে ধারণা ব্যক্ত করে তা হল প্রত্যাদেশের বিষয়বস্তুকে সত্য মনে করে বৌদ্ধিক স্বীকৃতি জ্ঞাপন করা, কারণ ঈশ্বর হলেন প্রামাণ্য কর্তৃপক্ষ যার দ্বারা ঐ সত্য প্রত্যাদিষ্ট হয়। কাজেই বিশ্বাস হল ঈশ্বরের দ্বারা ব্যক্ত একটি বিচারবুদ্ধিসম্মত বাণীর প্রতি ক্যাথলিকের প্রতিক্রিয়া।" (Catholic's response to an intellectual message communicated by God)।

বিশ্বাসের সংজ্ঞা

প্রত্যাদেশ হল ধর্মীয় সত্যের ঐশ্বরিক ঘোষণা এবং বিশ্বাস হল ঐ সত্যকে মেনে নেবার স্বীকৃতি—এই দুই পরস্পর নির্ভর মতবাদ বাইবেলের একটি অভিমতের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। বাইবেলের অভিমত অনুসারে ঐ সত্যগুলি সর্বপ্রথমে দৈববার্তা ঘোষণাকারীদের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে। তারপর ঐ সত্যগুলি আরও পরিপূর্ণভাবে এবং সুসংগতভাবে যীশুখ্রীষ্টের মাধ্যমে এবং ভগবদ্বাক্য প্রচারার্থ প্রেরিত ব্যক্তির মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে এবং পরে ধর্মশাস্ত্রে সেগুলি লিপিবদ্ধ হয়েছে। সেকারণে রোমান ক্যাথলিকদের বিশ্বাস হল ঈশ্বরই বাইবেলের রচয়িতা।

প্রত্যাদেশের এই বিবৃতিবাচক মতবাদ, যে মতবাদ অনুসারে ঈশ্বর মানুষকে কতকগুলি সত্য ব্যক্ত করেন যেগুলি ধর্মশাস্ত্রে লিপিবদ্ধ হয়েছে এবং যেগুলিকে শ্রদ্ধার সঙ্গে বিশ্বাস করা হয়, ঈশ্বরতত্ত্ব বা ধর্মবিজ্ঞানের প্রকৃতি এবং ক্রিয়া সম্পর্কীয় একটি মতবাদের দিকে আমাদের চালিত করে। প্রাকৃতিক ধর্মবিজ্ঞান এবং প্রত্যাদিষ্ট ধর্মবিজ্ঞানের পার্থক্য সকল সময়ই প্রত্যাদেশ সম্পর্কীয় বিবৃতিবাচক মতবাদকে অনুসরণ করে। বর্তমান শতাব্দী পর্যন্ত প্রায় সব ধরনের খ্রীষ্টীয় ধর্মবিজ্ঞানীরা এই দুই-এর পার্থক্যকে স্বীকার করে নিয়েছেন। প্রাকৃতিক ধর্মবিজ্ঞানে (Natural Theology) সেই সব ধর্মবিষয়ক এবং ঈশ্বরবিষয়ক সত্য স্থান পেয়েছে যেগুলি কেবলমাত্র মানবীয় বিচারবুদ্ধির দ্বারাই প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। এরকম ধারণা করা হয় যে প্রত্যাদেশের বিষয়টিকে টেনে না এনেও, ঈশ্বরের অস্তিত্ব, গুণাবলী, আত্মার অমরতা ইত্যাদি শুধুমাত্র যুক্তিবিজ্ঞানসম্মত যুক্তির দ্বারা প্রমাণ করা যেতে পারে। প্রত্যাদিষ্ট ধর্মবিজ্ঞান বা ঈশ্বরতত্ত্বে, অপরপক্ষে, সেইসব সত্যের আলোচনা রয়েছে যেগুলি মানুষের বিচারবুদ্ধির অধিগম্য নয় এবং যেগুলি শুধুমাত্র ঈশ্বরের দ্বারা বিশেষভাবে প্রত্যাদিষ্ট হলেই মানুষের জ্ঞানের বিষয় হতে পারে। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে যে, মানুষ তার বিচারবুদ্ধি বা যুক্তিকে যথাযথভাবে প্রয়োগ করে ঈশ্বরের অস্তিত্বের বিষয়টি সম্পর্কে অবহিত হতে পারে। কিন্তু সেই একই উপায়ে 'ত্রিত্ববাদ' (The Doctrine of the Trinity) সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা তার পক্ষে সম্ভব নয়। ত্রিত্ববাদ খ্রীষ্টধর্মের একটি বিশেষ মতবাদ। খ্রীষ্টানদের মতে ঈশ্বরের তিন রূপ—পিতা (God the Father), পুত্র (God the Son) এবং পবিত্র আত্মা (God the Holy Spirit)। 'ত্রিত্ববাদ'-কে প্রত্যাদিষ্ট ধর্মবিজ্ঞানের একটি বিষয় বলে গণ্য করা হয় এবং বিশ্বাসের মাধ্যমেই একে গ্রহণ করতে হবে।

প্রাকৃতিক ধর্মবিজ্ঞান এবং প্রত্যাদিষ্ট ধর্মবিজ্ঞান

অনেক আধুনিক ধর্মদার্শনিক ধর্মের বিরুদ্ধাচারণ করুন বা ধর্মকে সমর্থন করুন, যাই করুন না কেন, প্রত্যাদেশ এবং বিশ্বাস সম্পর্কীয় বিবৃতিবাচক মতবাদকে পূর্ণ

থেকে স্বীকার করে নেন্। অধ্যাপক ওয়ালটার কফম্যান (*Walter Kaufman*)[1] মনে করেন যে, ধর্মপ্রাণ ব্যক্তিরা যখন ঈশ্বরের প্রত্যাদেশের কথা বলেন, তখন তাঁরা ঈশ্বর মানুষের কাছে যে সব ঈশ্বরতত্ত্ববিষয়ক বচন ঘোষণা করেছেন সেগুলির কথা বলেন।

কফম্যান-এর অভিমত

বস্তুতঃ, সাম্প্রতিক কালের ধর্মের দার্শনিক সমালোচকবৃন্দ বিশ্বাসের সংজ্ঞার কথা ভাবতে গিয়ে অপর্যাপ্ত প্রমাণের উপর ভিত্তি করে ধর্মসম্পর্কীয় বিবৃতি বা বচনকে স্বীকার করা বা বিশ্বাস করার কথা ভাবেন। অনেক ধর্মদার্শনিক ধর্মের সমর্থনে তাদের মৌলিক ধারণাগুলিকে সমর্থন করার জন্য উপযুক্ত প্রমাণের অভাবে নানাধরনের সুবিধাজনক উপায় বা কৌশলের কথা প্রস্তাব করেন। জন হিক বলেন যে, এই ছেদটি (Gap) এত স্পষ্ট যে তাকে ইচ্ছা বা সঙ্কল্প দিয়ে ভরাট করা যেতে পারে। অর্থাৎ ভাবটা এমন যে এমন কতকগুলি ধর্মীয় সত্য আছে যেগুলিতে বিশ্বাস করার ইচ্ছা বা সঙ্কল্প জাগ্রত হয়। একটা সম্ভাব্য বিবৃতি বা বচনকে মেনে নেওয়ার সঙ্গে বিশ্বাসের পার্থক্য কতটুকু তা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে জনৈক ধর্মদার্শনিক বলেন যে, শুধুমাত্র কোন একটি সম্ভাব্য বচনকে স্বীকার করার ব্যাপারটা একটা তাত্ত্বিক ব্যাপারে পরিণত হয়। বিশ্বাসের মধ্যে একটা দায়ীত্বকে স্বীকার করে নেওয়ার ব্যাপার রয়েছে, যেন অনেকটা 'হ্যাঁ' বলার ব্যাপার রয়েছে। বিশ্বাস, যা সম্ভাব্য, তাকে যে সুনিশ্চিত সত্যে পরিণত করে, তা নয়। কেননা একমাত্র সাক্ষ্য প্রমাণের দিকটা ভারী হয়ে উঠলেই তা সম্ভব হতে পারে। আসলে বিশ্বাস হল ইচ্ছামূলক প্রতিক্রিয়া যা আমাদের তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি বা মনোভাবের পরিসরের বাইরে টেনে নিয়ে যায়।

প্রত্যাদেশ সম্পর্কীয় অপর একটি মতবাদ হল অ-বিবৃতিবাচক মতবাদ (Non-propositional view)। প্রোটেস্ট্যান্ট খ্রীষ্টানদের মধ্যেই এই অভিমতের সমধিক প্রচলন। এই মতবাদের উৎস রয়েছে ষোড়শ শতাব্দীর লুথার, কেলভিন এবং তাঁদের সহযোগীদের চিন্তাধারার মধ্যে।

এই মতবাদ অনুসারে প্রত্যাদেশের বিষয়বস্তু, ঈশ্বর সম্পর্কে একগুচ্ছ সত্য নয়। ঈশ্বর মানুষের ইতিহাসে ক্রিয়া করার মধ্য দিয়ে মানুষের অভিজ্ঞতার পরিসরের মধ্যে এসে পড়েছে। এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে যা বলা হয় তা হল, ধর্মবিজ্ঞান বা ঈশ্বরতত্ত্ব সম্পর্কীয় বিবৃতি বা বচনগুলি প্রত্যাদিষ্ট নয়; প্রত্যাদিষ্ট ঘটনার তাৎপর্য উপলব্ধির জন্য মানুষের প্রচেষ্টা। প্রত্যাদেশ সম্পর্কীয় এই অ-বিবৃতিবাচক ধারণা সাম্প্রতিককালে 'ঈশ্বর একজন পুরুষ', এই চিন্তার উপর গুরুত্ব আরোপ করে। এই মতবাদ বলতে

1. **Critique of Religion and Philosophy; Page 89.**

চায় ঈশ্বর ও মানুষের যে ব্যক্তিগত সম্পর্ক, তা, ধর্মবিজ্ঞানসম্পর্কীয় সত্যের ঘোষণা এবং তাতে স্বীকৃতি জানাবার তুলনায় অধিকতর কিছু। ঈশ্বর একজন পুরুষ, কাজেই তাঁর ইচ্ছা এবং উদ্দেশ্য আছে। এই ইচ্ছা এবং উদ্দেশ্যের মাধ্যমে ঈশ্বর মানুষকে তাঁর উপস্থিতি সম্পর্কে সচেতন করে তুলতে চান। একথা যদি বলা হয় তাহলে প্রশ্ন জাগে, ঈশ্বর কি তাঁর ঐশ্বরিক ক্ষমতা এবং গৌরবকে প্রকাশিত করে সংশয়াতীতভাবে মানুষকে তাঁর উপস্থিতি সম্পর্কে সচেতন করে তুলতে পারতেন না? এই প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে বলা হয় যে ঈশ্বরের সম্পর্কে সচেতন হওয়ার অর্থ, অপর কোন ব্যক্তি বা সীমিত সত্তা সম্পর্কে সচেতন হওয়ার সমতুল নয়। আমরা আমাদের চারপাশের কোন ব্যক্তির উপস্থিতি সম্পর্কে উদাসীন হতে পারি। কিন্তু যাকে আমরা ভালবাসি তার সম্পর্কে আমাদের চেতনা ভিন্নতর। ভালবাসার বা অনুরাগের ক্ষেত্রে, যাকে ভালবাসি তার অস্তিত্বে আমি উদাসীন নই, বরং তার অস্তিত্ব আমার সমস্ত সত্তাকে প্রভাবিত করে।

ঈশ্বর সম্পর্কে সচেতনতার অর্থ কি

ধর্মীয় চেতনার বিষয়বস্তু যে ঈশ্বর, সেই ঈশ্বর এমনই যে, কোন সীমিত জীবের পক্ষে তাঁর সম্পর্কে সচেতন হওয়া, অথচ সেই সচেতনতার দ্বারা প্রভাবিত না হওয়া, এ এক অসম্ভব ব্যাপার। ইহুদী খ্রীষ্টান ধর্মের যে ঐতিহ্য তাতে দেখা যায় ঈশ্বর আমাদের সত্তার উৎস এবং ভিত্তি। ঈশ্বরের ইচ্ছাতেই আমাদের অস্তিত্ব। ঈশ্বরের উদ্দেশ্য আমাদের প্রকৃতির মধ্যে এমন ভাবে নিহিত যে এই উদ্দেশ্যের পরিপূর্ণতা আমাদের ব্যক্তিগত পরিপূর্ণতা এবং শান্তির মৌলিক শর্ত। কাজেই শুধুমাত্র আমাদের অস্তিত্বের জন্য নয়, আমাদের পরম কল্যাণের জন্য আমরা ঈশ্বরের উপর নির্ভর। ঈশ্বর সম্পর্কে চেতনার অর্থ হল, নিজেকে অপরের দ্বারা সৃষ্ট, অপরের উপর নির্ভর বলে জানা এবং এক বৃহত্তর উৎস থেকে নিজের জীবন এবং কল্যাণকে লাভ করছি বলে মনে করা। এই বৃহত্তর সত্তা আমাদের দৃষ্টিতে এক রহস্যময় প্রেমময় সত্তা। তাঁর প্রতি আমাদের উপযুক্ত মনোভাব হল বাধ্যতার মনোভাব, কৃতজ্ঞতার মনোভাব, উপাসনার মনোভাব। কাজেই ঈশ্বর সম্পর্কে চেতনা, যদি ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের অর্থাৎ ব্যক্তি-স্বাধীনতার হানি না করে, তাহলে সেই চেতনা হবে ব্যক্তির স্বাধীন সম্মতির ব্যাপার, ব্যক্তির অন্তর্দৃষ্টি-প্রসূত স্বীকৃতির ব্যাপার। কাজেই, এটা মনে রাখতে হবে, ঈশ্বর আমাদের কাছে তেমন ভাবে নিজেকে প্রকাশ করেন না, যেমন ভাবে অন্য কোন সসীম সত্তা বা জীব আমাদের কাছে নিজেকে প্রকাশ করে। ঈশ্বর যদি তাই করতেন, তাহলে জন হিকের ভাষা উদ্ধৃত করে বলা যেতে পারে যে, অসীম সত্তা সসীম সত্তাকে গ্রাস

আমাদের পরম কল্যাণের জন্য আমরা ঈশ্বরের উপর নির্ভর

করে ফেলত (the finite being would be swallowed by the infinite being) অর্থাৎ অসীমের মধ্যে সসীম মিলিয়ে যেত। বরং ঈশ্বর দেশ-কালের পরিসরের মধ্যে জীবকে সৃষ্টি করেছেন যেখানে ব্যক্তি তার আপেক্ষিক স্বাধীনতা নিয়ে অস্তিত্বশীল হতে পারে। এই পরিসরের মধ্যে ঈশ্বর নিজেকে প্রকাশ করেন, এবং এই পরিসরের মধ্যে অবস্থান করে ঈশ্বরের উপস্থিতি সম্পর্কে অবহিত হবার বা না হবার স্বাধীনতা মানুষের আছে।

ঈশ্বরের ক্রিয়া মানুষের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করে না। মানুষ যে বাধ্য না হয়েও ঈশ্বরের প্রতি প্রতিক্রিয়া করতে পারে, ধর্মবিজ্ঞান তাকেই বিশ্বাস বলে অভিহিত করেছে। ঈশ্বর সম্পর্কে এই চেতনার মধ্যে যে উপাদান বর্তমান সেই উপাদানই মানুষের থেকে বৃহত্তর, অসীম ও মহত্তর সত্তার প্রতি মানুষের জ্ঞানমূলক স্বাধীনতাকে সংরক্ষিত করে। অর্থাৎ মানুষ তার থেকে এক বৃহত্তর সত্তার প্রতি প্রতিক্রিয়া করতেও পারে, নাও পারে, তার সম্পর্কে সচেতন হতে পারে, নাও পারে। এইখানেই মানুষের স্বাধীনতা। কাজেই 'বিশ্বাস'-এর সঙ্গে মানুষের ইচ্ছার স্বাধীনতার ঘনিষ্ট সম্পর্ক বর্তমান। কোন নির্বাচনের ব্যাপারের সঙ্গে স্বাধীন ইচ্ছার যে সম্পর্ক, জ্ঞানের সঙ্গে বিশ্বাসের সেই সম্পর্ক।

বিশ্বাসের সঙ্গে মানুষের ইচ্ছার স্বাধীনতার সম্পর্ক

বিশ্বাস হল মানুষের ইতিহাসে ঈশ্বরের ক্রিয়ার ঐচ্ছিক স্বীকৃতি এবং বিশ্বাস হল ঘটনাকে এক বিশেষ ভাবে দেখা এবং ব্যাখ্যা করা।

ধর্মসম্পর্কীয় নয়, এমন অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে দেখার ব্যাপারটা কি রকম তাৎপর্যপূর্ণ ব্যাপার হয়ে উঠতে পারে লুডউইগ্ উইট্‌গেনস্টিন একটি সুন্দর উদাহরণ দিয়ে ব্যাখ্যা করেছেন। ধরা যাক একটা ধাঁধার ছবি। কাগজটিতে কতকগুলি শুধুমাত্র বিন্দু এবং রেখা রয়েছে। কিন্তু কোন ব্যক্তি কাগজটির দিকে ভাল করে তাকাতেই দেখতে পেল যে আসলে ঝোপে একটা বাঘ লুকিয়ে আছে। তখন ঐ বিন্দু ও রেখার ক্ষেত্রটি তার কাছে এক বিশেষ তাৎপর্য নিয়ে প্রকাশিত হল, শুধুমাত্র এলোমেলো বিন্দু এবং রেখার সমাবেশ মাত্র নয়।

উইট্‌গেনস্টিনের মতবাদ

এত হল একটা বিষয়ের চাক্ষুষ ব্যাখ্যা। কিন্তু এর থেকেও রয়েছে অভিজ্ঞতারূপ জটিল বিষয়, যে ক্ষেত্রে একটা সমগ্র পরিস্থিতির এক বিশেষ তাৎপর্য্য রয়েছে বলে উপলব্ধি হয়। মানুষ ভিন্ন ভিন্ন পরিস্থিতিতে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে প্রতিক্রিয়া করে। তার কারণ পরিস্থিতির বিশেষ বিশেষ বৈশিষ্ট্য অনুসারে প্রতিক্রিয়া ভিন্ন হয়। ভিন্ন ভিন্ন পরিস্থিতি সম্পর্কে তার চেতনাও ভিন্ন হয়। এই যে চেতনা এ হল কোন কিছুর অভিজ্ঞতা হওয়া, কোন কিছুর অভিজ্ঞতা লাভ করা। তবে অভিজ্ঞতা হওয়ার বা

অভিজ্ঞতা লাভ করার বিষয়টি যেহেতু ব্যাখ্যামূলক, সেহেতু এক্ষেত্রে ভুল হবার সম্ভাবনা থাকে। যেমন, কোন উন্মাদ ব্যক্তি হয়ত মনে করতে পারে যে সবাই তাকে ভয় দেখাচ্ছে এবং সেই ভাবে সে প্রতিক্রিয়া করে।

সময় সময় একই পরিস্থিতিতে দুটি ভিন্ন স্তরের তাৎপর্যের অভিজ্ঞতা হয়, বিশেষ করে ধর্মপ্রবণ মনের যখন কোন ঘটনার অভিজ্ঞতা হয়। তখন সেই ব্যক্তির মনে হয় ঘটনাটি একটি ঐতিহাসিক ঘটনা—মানুষের ইতিহাসে ঘটছে ; আবার ঐ সঙ্গে তার এমন অভিজ্ঞতাও হয় যে ঘটনাটি ঈশ্বরের উপস্থিতি এবং ক্রিয়ার কথা ব্যক্ত করছে। ধর্মবিশ্বাসী ব্যক্তির স্বাভাবিক অভিজ্ঞতার তাৎপর্যের উপর একটি ধর্মীয় তাৎপর্য আরোপিত হয়। বাইবেলের পূর্বখণ্ডে দেখা যায় যে দৈববার্তা ঘোষণাকারী ব্যক্তিগণ তাঁদের সমসাময়িক ঐতিহাসিক ঘটনাগুলিকে ইজরায়েল এবং তাদের চারপাশের জাতির মধ্যে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ঘটনারূপে যেমন প্রত্যক্ষ করেছেন তেমনি প্রত্যক্ষ করেছেন যে, ঘটনাগুলি হল ঈশ্বরের নিজের লোকদের চালিত করা, তাদের নির্দেশ দেওয়া, নিয়মানুবর্তী করে তোলা, প্রয়োজনে শাস্তি দেওয়া যাতে তারা ঈশ্বরের উদ্দেশ্য সিদ্ধ করে। বাইবেলের পূর্বখণ্ডে এমন অনেক ঘটনা আছে, কোন ধর্মনিরপেক্ষ ঐতিহাসিক যাকে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং ভৌগোলিক ঘটনা হিসেবে ব্যাখ্যা করবে। আবার অপরের দৃষ্টিতে সেগুলি হল ঈশ্বর এবং তাঁর লোকদের মধ্যে শতাব্দী ধরে ঘটে চলেছে এমন অসংখ্য ঘটনা। একটা কথা মনে রাখতে হবে যে,

একই পরিস্থিতিতে দু-ধরনের অভিজ্ঞতা—ধর্মীয় তাৎপর্যের বাহক এবং ধর্ম বিযুক্ত অভিজ্ঞতা

ধর্মপ্রবর্তক বা দৈববার্তা ঘোষণাকারী ব্যক্তিগণ যখন ঘটনার বর্ণনা দিয়েছেন তখন ঐতিহাসিক ঘটনার দার্শনিক ব্যাখ্যা দিচ্ছেন না বা তাদের কোন অনুমিত ধারণাকে ঘটনার ক্ষেত্রে প্রয়োগ করছেন না। বস্তুতঃ, ঘটনা বাস্তবে যে ভাবে ঘটেছে সেভাবেই তাঁরা তার বর্ণন দিচ্ছেন। জগৎজুড়ে ঈশ্বরের ক্রিয়া তাঁরা প্রত্যক্ষ করেছেন। সমসাময়িক পরিস্থিতি সম্পর্কে তাঁদের অভিজ্ঞতা হয়েছে যে পরিস্থিতির প্রতিটি মুহূর্তে ঈশ্বর সক্রিয়ভাবে উপস্থিত।

ধর্মপ্রবণ ব্যক্তির দৃষ্টিতে পরিস্থিতির তাৎপর্য

বাইবেলের উত্তরখণ্ডেও যে সব ঘটনার প্রাকৃতিক ব্যাখ্যা দেওয়া যায় তার ধর্মীয় ব্যাখ্যা দেবার প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা যায়। যেমন—মনে করা যেতে পারে যে নাজারথের যীশু একজন ধর্ম প্রবর্তক, যিনি নিজেকে নিজে ধর্মপ্রবর্তক রূপে ঘোষণা করেছিলেন, যিনি রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়েছিলেন, জেরুজালেমের পুরোহিতদের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়ে শেষ পর্যন্ত প্রাণ হারালেন। কিন্তু বাইবেলের উত্তরখণ্ডের লেখকদের দৃষ্টিতে যীশু

হলেন মানবজাতির ত্রাণকর্তা, তিনি হলেন ঈশ্বরের পুত্র, যিনি মর্তে মানুষের রূপ গ্রহণ করে সমস্ত মানবজাতির পুনর্গঠনের মহৎ কার্যে আত্মনিয়োগ করেছেন। এইভাবে যীশুকে দেখা এ হল এক বিশ্বাসের, এক ধরনের অভিজ্ঞতা লাভের ব্যাপার।

বস্তুতঃ ইহুদী-খ্রীষ্টান ধর্মের যে ঐতিহ্য তাতে দেখা যায় ধর্মীয় অভিজ্ঞতা মানুষের জীবনকে এক সমগ্র পরিস্থিতি রূপে প্রত্যক্ষ করে, যে পরিস্থিতিতে মানুষের সঙ্গে ঈশ্বরের অবিরাম ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া চলেছে। এই বিশ্বাস ধর্মপ্রবণ ব্যক্তিকে নির্দেশ দেয় কি পরিস্থিতিতে কিভাবে তাকে আচরণ করতে হবে।

২। বিশ্বাসের প্রকৃতি সম্পর্কে আধুনিক মতবাদ (Modern theories of the nature of faith) :

ধর্মীয় বিশ্বাসের ক্ষেত্রে ইচ্ছা বা সংকল্পের যে ভূমিকা রয়েছে, তার থেকেই বিশ্বাসের প্রকৃতি বিষয়ক কতকগুলি আধুনিক মতবাদের উদ্ভব ঘটেছে। দু-একটি এই ধরনের মতবাদ নীচে আলোচনা করা হচ্ছে :

সপ্তদশ শতাব্দীর ফরাসী চিন্তাবিদ ব্লেস প্যাসকেল (*Blaise Pascal*) মনে করেন যে ধর্মীয় বিশ্বাস হল ব্যক্তির স্বেচ্ছায় কিছু বিশ্বাসকে স্বীকার করে নেওয়া। তাঁর মতে ঈশ্বরের অস্তিত্বের বিষয়টি হল রহস্যময় ব্যাপার। যদি আমরা বাজী ধরি যে ঈশ্বর অস্তিত্বশীল এবং যদি আমাদের বক্তব্য সঠিক হয় আমরা অনন্ত মোক্ষ লাভ করতে পারি, আর যদি আমাদের ভুল হয়, আমাদের তেমন কিছুই হারাবার ভয় থাকে না। আবার যদি বাজী ধরি যে ঈশ্বরের কোন অস্তিত্ব নেই এবং যদি আমাদের বক্তব্য সঠিক হয় আমাদের লাভের দিকটা খুবই তুচ্ছ। কিন্তু যদি ভুল হয় তাহলে অনন্ত সুখ হারাই। কাজেই ঈশ্বর আছে এই বিশ্বাসের লাভ ক্ষতির হিসাব করলে দেখা যাবে যে যদি আমরা লাভ করি আমরা সর্বস্ব লাভ করি, হারালে কিছুই হারাই না। কাজেই বাজী ধরা যেতে পারে যে ঈশ্বর আছেন।

যদি এমন প্রশ্ন করা যায় যে কারও মধ্যে ঈশ্বরে বিশ্বাস জাগ্রত করা যায় কিনা,— প্যাসকেল বলেন তা সম্ভব, তবে সঙ্গে সঙ্গেই তা সংঘটিত হবে না; একটা চিকিৎসা-পদ্ধতির মধ্য দিয়ে অগ্রসর হতে হবে। এই পদ্ধতি হল অবিশ্বাস দূর করার চিকিৎসা, অবিশ্বাসের প্রতিকার খুঁজে বেড়ান। যে সব ব্যক্তিরা অবিশ্বাসী ছিলেন, তারা কিভাবে অবিশ্বাস থেকে মুক্ত হলেন তা অনুসন্ধান করতে হবে এবং তাদের পথে চলতে হবে। এর ফলে ঈশ্বরে বিশ্বাস জাগ্রত হবে, অবিশ্বাসের একগুঁয়েমি দূর হবে। ঈশ্বরও তাঁর প্রতি অবিশ্বাসীর এই ধরনের মনোভাব দেখে পরিতৃপ্ত হবেন।

অনেক ধর্মবিশ্বাসীর কাছে প্যাসকেলের এই ধারনা একান্তভাবে অ-ধর্মজনোচিত মনে হয়েছে, যদিও অনেকে একে গ্রহণ করেছেন।

উইলিয়ম জেমস তাঁর সুবিখ্যাত রচনা 'Will to believe'-এ বলেছেন যে ঈশ্বরের অস্তিত্ব বা নাস্তিত্ব, যার সম্পর্কে কোন সিদ্ধান্তমূলক প্রমাণ সংগ্রহ করা সম্ভব নয়, অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। যে কোন ব্যক্তি ইচ্ছা করলে ঈশ্বর প্রকল্পের উপর তার জীবনকে পণ হিসেবে ধরতে পারে। বস্তুতঃ, আমরা ঈশ্বরের অস্তিত্বের পক্ষে বা বিপক্ষে আমাদের জীবনকে পণ হিসেবে ধরতে বাধ্য হই। আমরা সংশয়বাদী হয়ে বিষয়টাকে এড়িয়ে যেতে পারি না, কারণ ঐরকম করতে গিয়ে, ধর্ম যদি অসত্য হয়, তাহলে যেমন আমরা ভুলটাকে এড়িয়ে চলতে পারি, তেমনি ধর্ম যদি সত্য হয় তাহলে আমরা ভালটাকে হারাতে পারি। যেমন—আমরা সুনিশ্চিতভাবে ধর্মে অবিশ্বাসী হবার ব্যাপারটিকে নির্বাচন করে নিতে পারি। তাছাড়া যদি পুরুষরূপে কোন ঈশ্বরের অস্তিত্ব থাকে, (if there is a personal God) তাহলে ঈশ্বরকে বাস্তব বলে মেনে নেবার ব্যাপারে আমাদের অনিচ্ছা, ঈশ্বরকে আমাদের গ্রহণ করার ব্যাপারে এক অসম্ভব বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে।

জেমস্-এর উপরিউক্ত অভিমত সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে জন হিক বলেন যে খ্রীষ্ট ধর্মগ্রন্থ বাইবেলে যে সজীব ধর্ম বিশ্বাসের পরিচয় পাওয়া যায়, জেমস্-এর চিন্তাধারায় তার অভাব পরিলক্ষিত হয়। সাণ্টায়ানা (*Santayana*) বলেন, জেমস্ ব্যক্তিগত ধর্মের সমর্থনে যা বলেছেন তাতে না আছে নিরাপত্তা, না আছে আনন্দ। তিনি আসলে বিশ্বাস করতেন না। তিনি বিশ্বাস করার অধিকারে বিশ্বাস করতেন। অর্থাৎ তুমি বিশ্বাস করলে, তোমার বিশ্বাস সঠিক হলেও হতে পারত।

জেমস্-এর অভিমতের ত্রুটি নির্দেশ করতে গিয়ে জন হিক বলেন যে এই অভিমতে খুশীমত ইচ্ছা করার অবাধ স্বাধীনতা রয়েছে।

একজন সাম্প্রতিক দার্শনিক ঈশ্বর বিজ্ঞানী এফ. আর. টেনেণ্ট (*F. R. Tennant*) বিশ্বাসকে ইচ্ছাকরা রূপ প্রক্রিয়ার সঙ্গে অভিন্ন করে দেখেন। সব রকম আবিষ্কারের ক্ষেত্রে মানুষের যে ইচ্ছার উপাদান বর্তমান থাকে, টেনেণ্ট-এর মতে বিশ্বাস তার সঙ্গে অভিন্ন। টেনেণ্ট-এর মতে বিশ্বাসকে সমর্থন করা যাবেই, সুনিশ্চিতভাবে তা বলা সম্ভব নয়। বিশ্বাসের ক্ষেত্রে সব সময়ই ঝুঁকি রয়েছে কিন্তু এই ঝুঁকি নেওয়ার জন্যই মানুষের জ্ঞানের বিস্তৃতি ঘটেছে। বিজ্ঞান এবং ধর্ম, উভয় ক্ষেত্রেই ঝুঁকি নেবার বিষয়টি বর্তমান।

সমালোচনায় বলা হয়েছে যে টেনেণ্ট-এর ধর্মীয় বিশ্বাস এবং বৈজ্ঞানিক বিশ্বাসকে একই বন্ধনীর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করার বিষয়টি বিতর্কের ব্যাপার। পরীক্ষণমূলক সত্যতা

প্রতিপাদনের প্রারম্ভিক পর্যায় রূপে বৈজ্ঞানিকের বিশ্বাস তাৎপর্যপূর্ণ ব্যাপার। এটি বিজ্ঞানের আবিষ্কারের পক্ষে একটি প্রয়োজনীয় স্তর এবং পরবর্তীকালের সত্যতা প্রতিপাদনের ব্যাপারের সঙ্গে যুক্ত থাকার জন্য এর মূল্য কম নয়। কিন্তু ধর্মীয় বিশ্বাসের ক্ষেত্রে, টেনেন্ট-এর মতে, এরূপ কোন বস্তুগত সত্যতা প্রতিপাদনের ব্যাপার নেই। বিজ্ঞানে সত্যতা প্রতিপাদনের বিষয়টি হল লক্ষ্য করা যে, প্রকল্প বা মতবাদটির সঙ্গে বাহ্য ঘটনার সঙ্গতি রয়েছে কিনা। কিন্তু ধর্মের সত্যতা প্রতিপাদনের বিষয়টি ভিন্ন। এটি হল ধর্মবিশ্বাসী ব্যক্তির বিশ্বাস ব্যক্তির অন্তরে কতখানি সন্তোষ উৎপাদন করতে পারছে বা তার মধ্যে আধ্যাত্মিকতাকে সুদৃঢ় করে তোলার ব্যাপারে তার শক্তি কতখানি তার উপরে নির্ভর। প্রকৃত ধর্মবিশ্বাসী ব্যক্তির ক্ষেত্রে এই বিশ্বাসের সফলতার দৃষ্টান্ত বাস্তব জগতেই পরিলক্ষিত হয়। উদাহরণস্বরূপ, এই বিশ্বাস ব্যক্তির মনে তীব্র নৈতিক চেতনার সঞ্চার করে। ব্যক্তিকে বিপদ আপদের সম্মুখীন হতে সমর্থ করে এবং ব্যক্তি এক মহান জীবনে উত্তরণ করে। কাজেই ধর্মীয় বিশ্বাসের সত্যতা তার ব্যবহারিক কার্যকারিতার দ্বারা প্রতিপাদিত হয় এবং যা অপ্রত্যক্ষ তার অস্তিত্বের নিশ্চয়তা প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু এই শুদ্ধ ব্যক্তি-নিরপেক্ষ সত্যতা প্রতিপাদনের বিষয়টির মূল্য অনেকখানি হ্রাস পায় যখন মনে করা হয় যে এইভাবে সত্যতা প্রতিপাদনের বিষয়টি মনোগত নিশ্চয়তার প্রমাণ হলেও, বাহ্য সত্তার বস্তুগত নিশ্চয়তা প্রমাণ করতে পারে না। নৈতিক এবং ধর্মীয় জীবনের সঙ্গে যুক্ত বিশ্বাসের ব্যবহারিক কার্যকারিতা এক বিষয় এবং এই বিশ্বাস যে বিষয়ের অস্তিত্বের অনুমান করে তার অস্তিত্ব বা সত্তা প্রমাণিত হওয়ার ব্যাপারটি এক ভিন্ন বিষয়।

এমন অনেক দৃষ্টান্ত দেখতে পাওয়া যায়, যে সব ক্ষেত্রে ঘটনার সঙ্গে সামঞ্জস্য নেই, এমন বিশ্বাসকেও কার্যকর হতে দেখা যায় অর্থাৎ এই ধরনের বিশ্বাস মানুষকে মহান আদর্শে অনুপ্রাণিত করতে পারে এবং তাকে আরও যোগ্য ব্যক্তি হবার জন্য উদ্বুদ্ধ করে তুলতে পারে। এটি স্বীকার করে নিলে ধর্মীয় বিশ্বাস, টেনেন্ট যেভাবে তাকে অনুধাবন করেন, হয়ে পড়ে নিছক প্রত্যাশা, যার সত্যতা প্রতিপাদন করা যায় না এবং তার ফলে টেনেন্ট (*Tennant*)-এর ধর্মীয় বিশ্বাস এবং বৈজ্ঞানিক বিশ্বাসকে অভিন্ন করে দেখার যে প্রচেষ্টা তা খুব দুর্বল হয়ে পড়ে।

পল টিলিক (*Paul Tillich*)-এর অভিমত উপরিউক্ত অভিমতগুলি থেকে ভিন্ন। বিশ্বাস হল চরমভাবে উদ্বিগ্ন হবার অবস্থা (the state of being ultimately concerned)। আমাদের চরম উদ্বেগের বিষয় হল তাই যা আমাদের অস্তিত্ব বা নাস্তিত্ব নির্ধারণ করে। এই অস্তিত্ব শারীরিক অস্তিত্ব নয়; এই অস্তিত্ব হল অস্তিত্বের

বাস্তবতা, সংগঠন, অর্থ এবং লক্ষ্য (the reality, the structure, the meaning and the aim of existence)। বহু বিষয়কে কেন্দ্র করেই মানুষের চরম উদ্বেগ— যেমন মানুষের উদ্বেগ তার ব্যক্তিগত সাফল্য ও মর্যাদাকে নিয়ে। কিন্তু টিলিকের মতে এরা হল প্রারম্ভিক উদ্বেগ (preliminary concerns)। এই প্রারম্ভিক উদ্বেগকে চরম অবস্থায় টেনে নিয়ে গেলে তা পরিণত হয় পৌত্তলিকতায়। এই চরম উদ্বেগের কথা বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি বলেন, ধর্মের উদ্বেগই হল চরম উদ্বেগ। এই উদ্বেগ অন্যান্য উদ্বেগকে চরম হবার পথে বাধার সৃষ্টি করে, এই উদ্বেগ অন্যান্য উদ্বেগকে প্রারম্ভিক উদ্বেগে পরিণত করে। পরম উদ্বেগ হল শর্তহীন; চরিত্র, বাসনা বা ঘটনা সম্পর্কীয় অবস্থার উপর তা নির্ভর নয়। চরম উদ্বেগ হল সামগ্রিক; আমাদের কোন অংশ বা পৃথিবীর কোন অংশ এর বহির্ভূত নয়। এর থেকে পালিয়ে বেড়াবার কোন জায়গা নেই। ধর্মের উদ্বেগ হল চরম, শর্তহীন, সামগ্রিক এবং অসীম।

পল টিলিকের অভিমত

সমালোচনায় বলা যেতে পারে, টিলিকের 'চরম উদ্বেগ'-এর বিষয়টি দুর্বোধ্য। চরম উদ্বেগ বলতে তিনি কি বোঝাতে চেয়েছেন? চরম উদ্বেগ কি একটি মানসিক উদ্বেগের ব্যাপার বা মনের এই অবস্থায় কোন অনুমিত বস্তুকে বোঝায়? ইতিপূর্বে চরম উদ্বেগের পূর্বে যে বিশেষ্যগুলি আমরা ব্যবহার করেছি, তাতে দেখা যায়, 'শর্তহীন' এই বিশেষণটি উদ্বেগের একটি মনোভাবকে বোঝায়। *'অসীম' এই বিশেষণটি* উদ্বেগের কোন একটি বস্তুকে বোঝায় এবং 'চরম' ও 'সমগ্র' উভয়ের যে-কোন একটিকেই বোঝাতে পারে। টিলিক তাঁর *Systematic Theology* গ্রন্থে কোন্ অর্থটি বোঝাতে চেয়েছেন বা উভয়কেই বোঝাতে চেয়েছেন কিনা তা বলা সম্ভব নয়।

সমালোচনা

টিলিক তাঁর *Dynamics of Faith* গ্রন্থে এই দুর্বোধ্যতার কিছুটা সমাধান করেছেন। টিলিক চরম উদ্বেগের মনোভাবকে চরম উদ্বেগের বস্তুর সঙ্গে অভিন্ন গণ্য করে উভয় অর্থকেই সুস্পষ্টভাবে বোঝাতে চেয়েছেন। বিশ্বাস হল চরম উদ্বেগের অবস্থা এবং যার জন্য চরম উদ্বেগ, এই দুই-এর অভিন্নতা। এর অর্থ হল চরম বা পরম অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে ব্যক্তি যে অভিজ্ঞতা লাভ করছে এবং যার অভিজ্ঞতা লাভ করছে—এই দুই-এর পার্থক্য অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। চরম উদ্বেগ কোন ঐশ্বরিক বস্তুর প্রতি মনের কোন বিশেষ মনোভাব নয়। চরম উদ্বেগ হল টিলিকের ভাষায়, মানুষের মনের নিজ সত্তার ভিত্তি বা হেতুতে অংশগ্রহণের একটি রূপ (a form of the human mind's participation in the ground of its own being)। এই অংশ গ্রহণের বিষয়টি টিলিকের চিন্তনের ক্ষেত্রে একটি মৌলিক বিষয়। তিনি দু'ধরনের ধর্মদর্শনের মধ্যে পার্থক্য করেছেন—তত্ত্ববিদ্যাসম্পর্কীয় (ontological) এবং জগৎসম্পর্কীয় (cosmological)।

শেষোক্ত অভিমত অনুসারে ঈশ্বর বাইরে কোথাও অবস্থান করছেন। সুদীর্ঘ অনিশ্চিত অনুমান প্রক্রিয়ার পথ ধরে অগ্রসর হতে হতে সেই পথের শেষে, ঈশ্বরের কাছে উপনীত হতে হয়। ঈশ্বরকে পাওয়া হল এক অপরিচিত ব্যক্তির সঙ্গে সাক্ষাৎকার। তত্ত্ববিদ্যার দিক থেকে, টিলিকের মতে, ঈশ্বর পূর্ব থেকেই আমাদের অস্তিত্বের ভিত্তি বা হেতুরূপে উপস্থিত। তিনি আমাদের সঙ্গে অভিন্ন, আবার তিনি সীমাহীন ভাবে আমাদের অতিবর্তী। আমাদের সসীম সত্তার সঙ্গে সত্তার অসীমতার কোন ছেদ নেই (our finite being is continuous with the infinity of Being)। কাজে কাজেই ঈশ্বরকে জানার অর্থ হল আমাদের সত্তার ভিত্তি থেকে আমাদের যে বিচ্ছিন্নতা তাকে অতিক্রম করে যাওয়া। ঈশ্বর অন্য কোন বস্তু নয় যাকে আমরা জানি বা জানতে ব্যর্থ হই। ঈশ্বর সত্তা নিজেই (Being itself)। আমরা অস্তিত্বশীল হয়ে তাতে অংশগ্রহণ করি। ঈশ্বর সম্পর্কে আমাদের চরম উদ্বেগের অবস্থা হল সত্তার সঙ্গে আমাদের যথার্থ সম্পর্ককে প্রকাশ করা।

টিলনের ধর্মদর্শন—তত্ত্ববিদ্যাসম্পর্কীয় এবং জগৎসম্পর্কীয়

জন হিক মনে করেন টিলিক যেভাবে বিশ্বাসের সংজ্ঞা দিয়েছেন, তা থেকে দেখা যায় যে এই সংজ্ঞা মানুষের সত্তার ভিত্তিস্বরূপ ঈশ্বরের সঙ্গে তার অভিন্নতা বা নিরবচ্ছিন্নতার বিষয়টি নির্দেশ করছে। কিন্তু এটি আবার বিপরীত পথের দিকেও নির্দেশ করতে পারে, অর্থাৎ মানুষ ও ঈশ্বরকে পরস্পরের থেকে এমন চরমভাবে বিচ্ছিন্ন করতে পারে যে বিশ্বাস মানুষের মনের এক স্বাধীন ক্রিয়ারূপে কার্য করতে পারে, ঈশ্বরের বাস্তবতা থাকুক বা নাই থাকুক। টিলিক বলেন, ঈশ্বর হলেন তারই নাম যা মানুষের পরম চিন্তার বিষয় হয়ে ওঠে। তার অর্থ এই নয়, প্রথমে ঈশ্বর বলে কোন সত্তার অস্তিত্ব আছে এবং তারপর মানুষ তার সম্পর্কে চরম উদ্বেগ বোধ করে। এর অর্থ হল যা মানুষের চরম উদ্বেগের কারণ হয়, তাই হয়ে ওঠে তার পক্ষে ঈশ্বর এবং বিপরীতভাবে এর অর্থ হল যে মানুষ তার সম্পর্কেই চরম উদ্বেগ অনুভব করে যা তার পক্ষে ঈশ্বর হয়ে ওঠে।

কাজেই, টিলিকের সূত্র অনুসারে, কেউ ইচ্ছে করলে ঈশ্বরের পরিপ্রেক্ষিতে বিশ্বাসের সংজ্ঞা নির্দেশ করতে পারে যেমন ঈশ্বর হল পরম সত্তা সম্পর্কে মানুষের উদ্বেগ। কেউ বা বিশ্বাসের পরিপ্রেক্ষিতে ঈশ্বরের সংজ্ঞা নির্দেশ করতে পারে অর্থাৎ ঈশ্বর হল কোন কিছু, যার সম্পর্কে মানুষ চরম উদ্বেগ বোধ করে। টিলিক মনে করেন যে অলৌকিকতা এবং প্রকৃতিবাদ, দুটোর যে-কোন একটাকেই মেনে নেওয়ার ব্যাপারটা হল অলৌকিকতা এবং প্রকৃতিবাদ এই দুটিকেই অতিক্রম করে তাদের থেকে শ্রেষ্ঠ এক অবস্থায় উপনীত হওয়া। টিলিকের এই অভিমত কতখানি সমর্থন যোগ্য তা অনেকের কাছে চিন্তার বিষয়।

একবিংশ অধ্যায়

প্রচলিত ধর্মবিশ্বাসের মূলতত্ত্ব

১। বিভিন্ন ধর্মের সত্য হয়ে ওঠার দাবীকে কেন্দ্র করে বিরোধিতা (The Conflicting truth claims of Different Religions) :

বিভিন্ন ধর্মবিশ্বাসের প্রত্যেকটিই নিজেকে পরম সত্য বলে দাবী করে। সাম্প্রতিক কালেই লক্ষ্য করা গেছে যে বিভিন্ন ধর্মবিশ্বাসগুলি পরস্পরকে বুঝে নেবার জন্য সচেষ্ট হয়েছে। প্রাচীনকালে এই জগতের বিভিন্ন ধর্ম অপর ধর্মের সত্যকে বোঝার কোন চেষ্টা না করেই বিকাশলাভ করেছে। জগতের বৃহৎ ধর্মগুলি নিজেদের বিকশিত এবং ব্যাপক করার প্রচেষ্টায় অনেক সময় নিজেদের কাছাকাছি এসে পড়েছে। কিন্তু তাদের সেই ভূমিকা বিরোধিতার ভূমিকা, পরস্পরকে বুঝে উঠার ভূমিকা নয়। গত একশত বৎসরে জগতের বৃহৎ ধর্মগুলি সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট আলোচনা অন্য ব্যক্তির বিশ্বাসের মূল্যায়নকে সম্ভব করে তুলেছে এবং অনেক লোকই উপলব্ধি করতে পেরেছে যে বিভিন্ন ধর্মের নিজেকে সত্য বলে জাহির করার যে দাবী তাকে কেন্দ্র করে বিরোধিতা দেখা দিয়েছে। এই সমস্যা এখন আর অবহেলার বস্তু নয়। তাই ধর্মদর্শনে এর আলোচনা একটা গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করেছে।

প্রতিটি ধর্মের নিজেকে সত্য বলে জাহির করার প্রচেষ্টা

বিভিন্ন ধর্ম পরমতত্ত্ব সম্পর্কে বিভিন্ন কথা বলে, যা পরস্পরের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ নয়। ঈশ্বরের ক্রিয়া, মানুষের অদৃষ্ট প্রভৃতি সম্পর্কেও বিভিন্ন ধর্মের বক্তব্যের ক্ষেত্রে বিরোধিতা লক্ষ্য করা যায়। ঈশ্বর কি পুরুষ, না পুরুষ নয়? ঈশ্বর কি অবতাররূপে জগতে আবির্ভূত হন্? মানুষ কি এই পৃথিবীতে বার বার জন্মগ্রহণ করে? মানুষের যে আত্মা তাই কি যথার্থ আত্মা, বা জীবাত্মা এক অসীম বৃহত্তর আত্মার প্রকাশ মাত্র? বাইবেল, বা ভগবদ্গীতা কি ঈশ্বরের বাণী বহন করে? এই প্রশ্নের উত্তরে খ্রীষ্টান ধর্ম যা বলছে তা যদি সত্য হয়, হিন্দু ধর্ম যা বলছে তা কি অধিকাংশে মিথ্যা হচ্ছে না? ইসলাম ধর্ম যা বলছে তা যদি সত্য হয়, বৌদ্ধধর্ম যা বলছে তা কি মিথ্যা?

পরমতত্ত্ব সম্পর্কে বিভিন্ন ধর্মের বিভিন্ন বক্তব্য

এই সব প্রশ্নকে কেন্দ্র করে যে সংশয় তার মূল কিন্তু খুব গভীরে। কেননা, এই সব প্রশ্নই নির্দেশ করে যে বিভিন্ন ধর্মের সবগুলিই সত্য হতে পারে না, যদিও তাদের প্রত্যেকেই সত্য বলে দাবী করে। ডেভিড হিউমের মতে ধর্মের ক্ষেত্রে যা ভিন্ন তাই হল বিপরীত এবং এটা অসম্ভব যে প্রাচীন রোম, তুরস্ক, শ্যাম এবং চায়নার, প্রত্যেকেরই ধর্ম সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। ঐ একই

হিউমের বক্তব্য

যুক্তি অনুসরণ করে জন হিক বলেন, কোন বিশেষ ধর্মকে সত্য বলে বিশ্বাস করার হেতু অন্য ধর্মকে মিথ্যা গণ্য করার হেতুরূপে ক্রিয়া করবে এবং কাজে কাজেই কোন বিশেষ ধর্মের ক্ষেত্রে তাকে মিথ্যা মনে করার তুলনায় তাকে সত্য গণ্য করার হেতু অনেক কম হবে। বিশ্বজগতের বিভিন্ন ধর্মবিশ্বাসের সত্যতার দাবী যে বিরোধ সৃষ্টি করে, জন হিকের অভিমতানুসারে, তার থেকেই উপরিউক্ত সংশয়পূর্ণ যুক্তির উদ্ভব ঘটে।

ডবলু. এ. ক্রিশ্চিয়ান্ (*W. A. Christian*) এই সমস্যার আলোচনা করতে গিয়ে তাঁর [1]গ্রন্থে 'বিশ্বাসের প্রস্তাব' (proposal for belief)—এই শব্দসমষ্টি নিয়ে তাঁর আলোচনা সুরু করেছেন। তিনি বিশ্বাসকে জ্ঞান থেকে পৃথক করেছেন। ক্রিশ্চিয়ান্-এর মতে আমি যদি আমার ঘড়ি দেখে কাউকে বলি কটা বেজেছে, তাহলে আমি একটা সংবাদ প্রদান করছি, আমি কোন বিশ্বাসের প্রস্তাব করছি না। বিশ্বাসের প্রস্তাব যে প্রসঙ্গে করা হয় তাহল এমন কোন প্রশ্নকে কেন্দ্র করে যাতে সাধারণের আগ্রহ রয়েছে, যে প্রশ্নের উত্তর কোন দলেরই জানা নেই এবং যে প্রশ্নকে কেন্দ্র করে নানাধরনের মতবাদের উদ্ভব ঘটতে পারে, যে মতবাদ প্রশ্নের উত্তর যুগিয়ে দিতে পারে। 'যীশু হল মেসাইয়্যা' (ইহুদীদের ভাবী ত্রাণকর্তা), 'আত্মা হল ব্রহ্ম' 'আল্লা হল দয়ালু'—এগুলি ক্রিশ্চিয়ান্-এর মতে বিশ্বাসের প্রস্তাবের উদাহরণ। এই সব প্রস্তাব কি পরস্পরের বিরোধী?

ক্রিশ্চিয়ানার বিশ্বাসের প্রস্তাব

ধর্মসম্পর্কীয় বিরোধিতার একটা উদাহরণ নেওয়া যাক: খ্রীষ্টানরা বলে 'যীশু হল মেসাইয়্যা' বা ইহুদীদের ত্রাণকর্তা, কিন্তু ইহুদীরা বলে যে যীশু মেসাইয়্যা নয়; তাদের ত্রাণকর্তার আবির্ভাব হতে দেরী আছে। কিন্তু উইলিয়ম ক্রিশ্চিয়ান্ বলেন যে, উভয় দলের প্রত্যেকেই মেসাইয়্যা বলতে কি বোঝেন সেটা যখন আমরা বুঝে নিই তখন বোঝা যায় যে তারা পরস্পরের বিরোধিতা করছে না। কেননা, ইহুদীরা মেসাইয়্যা বলতে বোঝেন এমন এক সত্তা যিনি ঐশ্বরিক সত্তা নন আর খ্রীষ্টানরা বোঝেন মনুষ্যজাতির ত্রাণকর্তা, যিনি মানুষকে পাপ থেকে রক্ষা করবেন। কাজেই যেহেতু দুজন ভিন্ন মেসাইয়্যার কথা ব্যক্ত করা হয়েছে, দুটি ভিন্ন বচন ঘোষিত হয়েছে। কাজেই যখন ইহুদীরা অস্বীকার করছে যে যীশু হল মেসাইয়্যা, তখন খ্রীষ্টানদের ঘোষণা—'যীশু হল মেসাইয়্যা'-কে ইহুদীরা অস্বীকার করছে না।

ধর্মসম্পর্কীয় বিরোধিতার উদাহরণ—তার সমাধান

ক্রিশ্চিয়ান্-এর মতে বিশ্বাসের প্রস্তাবের ক্ষেত্রে যে ধারণাগুলি কোন বিশেষ ধর্মের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়, সেগুলি সেই ধর্মেরই বৈশিষ্ট্যমূলক ধারণা। যেমন খ্রীষ্টানদের

1. W. A. Christian: Meaning and truth in Religion.

মেসাইয়্যা হল ঐশ্বরিক ত্রাণকর্তা, ইহুদীদের মতে মেসাইয়্যা হল ঈশ্বরের উদ্দেশ্য সিদ্ধ করার জন্য মানবীয় কর্মকর্তা। বুদ্ধরা তাঁদের ধর্মে নির্বাণের কথা, হিন্দুরা ব্রহ্মের কথা বলেছেন। কিন্তু এই ধারণাগুলির প্রত্যেকটিই সেই সেই ধর্মের আলোচনার প্রসঙ্গে ব্যবহৃত হলেই অর্থযুক্ত হয়ে ওঠে এবং ঐ আলোচনার অংশ হিসেবেই তা অর্থবহ। কাজেই দুটি ধর্ম একই ধারণা ব্যবহার করছে এবং পরস্পরবিরুদ্ধ কথা ঐ বিষয়ে বলছে, এই প্রশ্ন ওঠে না। যেমন কোন খ্রীষ্টান বলে না যে আল্লা দয়ালু নয়, কেননা আল্লার ধারণা খ্রীষ্টানদের ধর্মে ব্যবহৃত কোন ধারণা নয় এবং খ্রীষ্টানদের ধর্ম আলোচনায় আল্লা সম্পর্কে কোন উক্তি করা হয় না।

উইট্‌গেনষ্টিন (*Wittgenstein*) তাঁর শেষের দিকের রচনায় বলেছেন যে প্রতিটি ধর্ম একধরনের জীবন (a form of life), যার নিজস্ব ভাষা রয়েছে। খ্রীষ্টানধর্ম এবং বৌদ্ধ ধর্ম ভিন্ন ভিন্ন ভাষা ব্যবহার করে, যে ভাষা একটি বিশেষ ধর্মীয় জীবনে অর্থবহ। সেকারণে তারা পরস্পর বিরোধী বিশ্বাসের প্রস্তাব উত্থাপন করছে, এমন প্রশ্ন ওঠেই না। এই মতবাদের সুবিধা হল এই যে, এই মতবাদ বিভিন্ন ধর্মের নিজেকে সত্য বলে জাহির করার দাবীকে কেন্দ্র করে যে বিরোধিতা, তাকে অস্বীকার করতে চায়।

উইট্‌গেনষ্টিনের মতে প্রতিটি ধর্ম এক ধরনের জীবন

যাই হোক উইলিয়ম ক্রিশ্চিয়ান্ দেখাতে চান যে এই জাতীয় সমাধান নিতান্তই বাহ্য। উপরে যে উদাহরণটি দেওয়া হয়েছে, সেই প্রসঙ্গে বলতে গেলে বলতে হয় যে 'মেসাইয়্যা' (the Messiah) বলতে ইহুদী এবং খ্রীষ্টানরা ভিন্ন বিষয় বোঝেন না এবং যখন একজন বলেন যে যীশু মেসাইয়্যা নয়, এবং অপরজন বলেন যে যীশুই মেসাইয়্যা, তখন তাঁরা প্রত্যক্ষভাবে পরস্পরের বিরোধিতা করছেন না। কিন্তু বিষয়টাকে অন্যভাবে দেখলে এই বিরোধিতার ব্যাপারটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। যদি বলা হয় মেসাইয়্যা হল এমন একজনের কথা যাকে ঈশ্বর পাঠিয়েছেন ইজরায়েলকে বন্দিদশা থেকে মুক্ত করার জন্য, তিনি মানুষও হতে পারেন বা ঐশ্বরিক সত্তাও হতে পারেন তাহলে আমাদের দ্বিতীয় বিশ্বাস-প্রস্তাবটি হবে—(খ) যীশু হল ঈশ্বর প্রেরিত ব্যক্তি যিনি ইজরায়েলকে মুক্ত করবেন। তাহলে এই বিশ্বাস-প্রস্তাবটি খ্রীষ্টানরা গ্রহণ করবে কিন্তু ইহুদীরা বর্জন করবে। এক্ষেত্রে যীশুকে কেন্দ্র করে তাদের মধ্যে যথার্থ মতের অনৈক্য পরিলক্ষিত হবে। কাজেই যীশুর প্রকৃতি সম্পর্কে ইহুদী এবং খ্রীষ্টানরা যে ভিন্ন ধারণা বা পরস্পর অসংগতিপূর্ণ ধারণা পোষণ করে তাতে কোন সন্দেহ নেই।

ক্রিশ্চিয়ান্-এর মতে যথার্থ সমাধান নয়

উইলিয়াম ক্রিশ্চিয়ান্ বলেন, উপরিউক্ত ধর্মীয় মতানৈক্যের ক্ষেত্রে একই উদ্দেশ্যের ক্ষেত্রে বিভিন্ন বিধেয় আরোপ করা হয়েছে। তিনি একে মতবাদ-সম্পর্কীয় মতানৈক্য (doctrinal disaggrement) বলে অভিহিত করেছেন। আবার অনেক ক্ষেত্রে একই বিধেয়র ক্ষেত্রে বিভিন্ন উদ্দেশ্য আরোপ করা হয়—একেই ক্রিশ্চিয়ান্ বলেন মৌলিক ধর্মবিষয়ক মতানৈক্য (basic religious disaggrement)। যেমন ঈশ্বরবাদী বলেন ঈশ্বরই সত্তার ভিত্তি-স্বরূপ, কিন্তু সর্বেশ্বরবাদীরা বলেন প্রকৃতিই সত্তার ভিত্তিস্বরূপ। অন্যান্য মৌলিক ধর্ম তাদের ধর্মীয় বিধেয়র ক্ষেত্রে নানাধরনের উদ্দেশ্য ব্যবহার করেন। যেমন বৌদ্ধরা বলেন নির্বাণ হল জীবনের পরম লক্ষ্য। হিন্দুধর্ম মতে আত্মজ্ঞানই হল সবকিছু থেকে বেশী মূল্যবান। ইহুদীধর্মে জেহবার উপাসনাই সবকিছু থেকে বেশী মূল্যবান।

মতবাদ সম্পর্কীয় এবং ধর্মবিষয়ক মতানৈক্য

জন হিক উপসংহারে বলেন যে, ধর্মসম্পর্কীয় বিশ্বাসের প্রস্তাবের ব্যাপারে প্রকৃত মতানৈক্য আছে, অর্থাৎ এমন অনেক বিশ্বাস-প্রস্তাব আছে যা কোন এক ধর্মের সমর্থকবৃন্দ গ্রহণ করেন এবং অপর ধর্মের সমর্থকবৃন্দ বর্জন করেন।

উইলফ্রেড কান্টওয়েল স্মিথ একটি ধর্মের (a religion) সুপরিচিত ধারণার বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছেন তাঁর গ্রন্থ 'The Meaning and End of Religion'-এ। বিভিন্ন ধর্মবিশ্বাসের সত্য হবার দাবীকে কেন্দ্র করে যে বিরোধিতা সেই সমস্যাটি 'একটি ধর্মের' ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত। তিনি বলেন যে যাকে আমরা ধর্ম বলে অভিহিত করি সেটি হল একটি অভিজ্ঞতার বস্তু যার একটা ইতিহাস আছে এবং ভৌগোলিক দিক থেকে যার অবস্থান নির্ণয় করা যায়। ধর্ম মানুষের সৃষ্টি। ধর্মের ইতিহাস মানব সংস্কৃতির বৃহত্তর ইতিহাসের একটি অংশ। ধর্মের ধারণা সার্বিক বা স্বপ্রকাশ ধারণা নয়। স্মিথের মতে, খ্রীষ্টধর্ম সত্য, না হিন্দুধর্ম সত্য এই ধরনের চিন্তন আধুনিক বুদ্ধিভ্রংশতার দৃষ্টান্ত। তাঁর মতে বিভিন্ন ধর্মকে পরস্পর বিরোধী মনে করা এবং চিন্তা করা যে এদের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য এবং ইতিহাস আছে, মোটেই যুক্তিসঙ্গত নয়।

একটি ধর্মের সুপরিচিত ধারণার বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ

তাঁর মতে ঐভাবে চিন্তা না করে যেভাবে চিন্তা করাটা যুক্তিসঙ্গত হবে তা হল এই যে, মনুষ্যজাতির ধর্মীয় জীবন হল এক চলমান আধার, যার মধ্যে মাঝে মাঝে দেখা দিয়েছে বড় ধরনের বিক্ষোভ। এই বিক্ষোভের ফলে দেখা দিয়েছে জটিল ধরনের সম্বন্ধ, আকর্ষণ, বিকর্ষণ, শোষণ, প্রতিরোধ এবং শক্তিবৃদ্ধি। এই বড় ধরনের বিক্ষোভ থেকেই জন্মলাভ করেছে প্রচলিত ধর্মবিশ্বাসগুলি। ধর্মের দিক থেকে ধর্মবিশ্বাসের সূত্রপাতের এই

বিভিন্ন ধর্ম সাংস্কৃতিক ঘটনা ছাড়া কিছু নয়

মুহূর্তগুলিকে মানবীয় বিশ্বাস, মানবীয় প্রতিক্রিয়া, মানবীয় শিক্ষার এবং ঐশ্বরিক করুণা, ঐশ্বরিক প্রেরণা, ঐশ্বরিক সত্যতার পারম্পরিক ছেদ হিসেবে প্রত্যক্ষ করা হয়েছে, মানুষের জীবনধারাকে তারা প্রভাবিত করেছে যার ফলে সংস্কৃতির বিকাশ সাধিত হয়েছে এবং স্মিথের মতে খ্রীষ্টধর্ম, বৌদ্ধধর্ম, হিন্দুধর্ম প্রভৃতি তার ফলে উদ্ভূত ঐতিহাসিক সাংস্কৃতিক ঘটনা ছাড়া কিছুই নয়।

কাজেই কোন ধর্মকে সত্য বা মিথ্যা বলা যুক্তিসঙ্গত নয়, যেমন যুক্তিসঙ্গত নয় কোন সভ্যতাকে সত্য বা মিথ্যা বলা। বিভিন্ন ধর্ম মানুষের চিন্তনের বিভিন্ন ধরন। স্মিথের মতে অনুষ্ঠান হিসেবে ধর্ম, তার ধর্মীয় মতবাদ, আচার-আচরণ যা তার সীমারেখা নির্দিষ্ট করে দেয়, তার আবির্ভাব এই কারণে ঘটেনি যে, ধর্ম তা চেয়েছে। বরং ঐতিহাসিক দিক থেকে এই ধরনের বিকাশ ছিল অনিবার্য, বিশেষ করে যখন সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীদের মধ্যে যোগাযোগ তেমন বিকশিত হয়নি।

কিন্তু যোগাযোগের দিক থেকে সমগ্র বিশ্বজগৎ এক অখণ্ড সত্তা এবং সেই কারণে আমরা এক নতুন পরিস্থিতিতে উপনীত হচ্ছি যার ফলে ধর্মসম্পর্কীয় চিন্তনের পক্ষে সাংস্কৃতিক ঐতিহাসিক সীমারেখার গণ্ডী অতিক্রম করে যাওয়া সম্ভব এবং ধর্ম-সম্পর্কীয় চিন্তন তার পক্ষে উপযুক্ত। কিন্তু প্রশ্ন হল এই নতুন চিন্তাধারা কি রূপ গ্রহণ করবে এবং ধর্মসম্পর্কীয় বিশ্বাসের সত্য হবার দাবীর বিরোধিতাকে কেন্দ্র করে যে সমস্যা তাকে কি ভাবে এই নতুন চিন্তন প্রভাবিত করবে, সেইটাই হল আসল কথা।

অতীতে একাধিক ধর্মের ঐতিহাসিক দিক থেকে অনিবার্য হয়ে ওঠার ঘটনা এবং ভবিষ্যতে সেই অনিবার্যতা লোপ পাওয়া, এর জন্য প্রয়োজন মনুষ্য জাতির ধর্মীয় জীবনের প্রশস্ত গতিপথ লক্ষ্য করা। মানুষের বর্ণনায় বলা হয়েছে যে মানুষ স্বভাবতঃ এক ধর্মপ্রবণ জীব। তার পরিবেশকে ধর্ম এবং প্রকৃতি উভয় দিক থেকে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ হিসেবে প্রকাশ করার এক সহজাত প্রবণতা তার মধ্যে লক্ষ্য করা যায়। আদিম মানুষের সংস্কৃতিতে এই মনোভাবের সার্বিক প্রকাশ ঘটেছে। মানুষ অনেক বস্তুকে পবিত্র বলে বিশ্বাস করেছে, যেগুলি অসংখ্য জীবের দ্বারা অধ্যুষিত, যাদের পরিতুষ্ট করা প্রয়োজন। ঐশ্বরিক সত্তাকে এই স্তরে অসংখ্য আধা-জৈবিক শক্তি (quasi- animal forces) রূপে কল্পনা করা হয়েছে। দ্বিতীয় স্তরে উপজাতীয় দেবতার আবির্ভাব। মধ্য প্রাচ্যে তারা জাতীয় দেবতার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়েছে। যেমন—গ্রীকদের জিউস, ইসরায়েল-এর জেওভা, ভারতে বৈদিক দেবতা, অগ্নি,

তিন হাজার বছর আগে মানুষের ঐশ্বরিক সত্তা সম্পর্কে চেতনা ছিল

স্বরুণ ইত্যাদি। কাজেই এই সব জাতীয় (national) এবং প্রকৃতি দেবতার (nature gods) চিন্তন থেকে বোঝা যায় যে প্রায় তিন হাজার বছর আগে মানুষের ঐশ্বরিক সত্তা সম্পর্কে চেতনা ছিল। জন হিক-এর মতে এই পর্যন্ত ধর্মসম্পর্কীয় চিন্তনের বিকাশকে বলা যেতে পারে প্রাকৃতিক বা অপ্রত্যাদেশমূলক ধর্মের অগ্রগতি। আদিম মানুষ অচেনা প্রাকৃতিক শক্তির ভয়ে ভীত হয়ে প্রাণময় সত্তার উপাসনা করত এবং পরবর্তী কালে আঞ্চলিক দেবতার উপাসনা থেকে ঐশ্বরিক প্রত্যাদেশ-পূর্ব মানবীয় ধর্ম জীবনের বিস্তৃতি সম্পর্কে একটা আভাস পাওয়া যায়।

কিন্তু খ্রীষ্টের জন্মের হাজার বছর আগে ধর্মীয় সৃষ্টির সুবর্ণ যুগের আবির্ভাব ঘটল। সেই সময় বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে অনেক প্রত্যাদেশের ঘটনা ঘটল যা মানুষের ঐশ্বরিক ধারণাকে গভীরতর এবং বিশুদ্ধ করে তুলল এবং ঐ ধর্মীয় বিশ্বাসই মানুষের মনে ঐশ্বরিক সত্তার অস্তিত্ব সম্পর্কে এক গভীরতর চেতনার সঞ্চার করল। এই সময় অনেক হিব্রু ধর্ম প্রবর্তকদের আবির্ভাব ঘটল যাঁরা দাবী করল যে তাঁরা ঈশ্বরের বাণী

খ্রীষ্টান ধর্মের আবির্ভাব কাল

শ্রবণ করেছেন, যিনি তাদের আনুগত্য দাবী করেন এবং তাঁরা ইসরায়েলের জীবনে এক নতুন সততা এবং ন্যায়পরতার বোধের দাবী জানাল। পরবর্তী পাঁচটি শতাব্দীতে অর্থাৎ যীশুর জন্মের পূর্বে ৮০০ এবং ৩০০ বছরের মাঝামাঝি সময়ে পারস্যদেশে জেরোস্টার (*Zoroaster*)-এর আবির্ভাব, গ্রীসদেশে পাইথাগোরাস, সক্রেটিস, প্লেটো এবং অ্যারিস্টটল, চায়নায় কনফুসিয়াস-এর, ভারতে গৌতমবুদ্ধ এবং মহাবীরের আবির্ভাবের, তারপর কিছুটা ছেদের পর, আবির্ভাব ঘটল খ্রীষ্টানধর্মের এবং তারও কিছু পরে ইসলাম ধর্মের।

যখন এই সব প্রত্যাদেশের ঘটনাগুলি ঘটেছিল তখনকার পরিস্থিতি লক্ষ্য করার ব্যাপার। মানুষের সঙ্গে মানুষের যোগাযোগ ছিল সীমিত। তার ফলে মানুষ

আঞ্চলিক ধর্মের উদ্ভব

এক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জগতে বসবাস করত। বিশ্বের এক অংশের লোক অপর অংশের লোকের অস্তিত্বের কথা জানত না। এর ফলে অনিবার্যভাবে অসংখ্য আঞ্চলিক ধর্মের উদ্ভব ঘটল, যেগুলি ছিল এক হিসেবে আঞ্চলিক সভ্যতা। কাজে কাজেই প্রত্যাদেশের মহান সৃষ্টিমূলক মুহূর্তগুলি বিভিন্ন সংস্কৃতির ক্ষেত্রে ভিন্নভাবে ঘটেছিল এবং তাদের বিকাশকে প্রভাবিত করেছিল। ফলে বৃহত্তর সংগঠনের উদ্ভব ঘটল যার ফলে সৃষ্টি হল বৃহৎ ধর্মীয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের যাকে আমরা বর্তমানে বিশ্ব ধর্ম (world religion) নামে অভিহিত করি। সুতরাং অতীতে বিভিন্ন ধর্মীয় অভিজ্ঞতা এবং বিশ্বাসের প্রবাহ ঘটেছিল বিভিন্ন সংস্কৃতির মধ্য দিয়েই এবং প্রতিটিই তার ভিন্ন পরিবেশের দ্বারা গঠিত হয়েছিল।

ইতিহাসে মাঝে মাঝে বিভিন্ন ধর্মের সংযোগের কথা জানা যায়। সময় সময় একটি ধর্ম অপর একটি ধর্মকে প্রভাবিত করেছে কিন্তু বিভিন্ন ধর্মগুলি তাদের ঐতিহাসিক এবং সাংস্কৃতিক পরিবেশে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে বিকশিত হয়েছে।

ঈশ্বরের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের অর্থ নিরূপণ

এই সব ঐতিহাসিক ঘটনা লক্ষ্য করার সময় একটি গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্যের কথা মনে রাখতে হবে। বিভিন্ন অভিজ্ঞতার মাধ্যমে মানুষের ঐশ্বরিক সত্তার সঙ্গে সাক্ষাৎকার এবং এই সাক্ষাৎকারের অর্থ নিরূপণ করতে গিয়ে বিভিন্ন ধর্মীয় মতবাদের বিকাশ, ধর্মের এই দুটি অঙ্গের মধ্যে পার্থক্যের কথা চিন্তা করা গেলেও, তারা কিন্তু আসলে পৃথক নয়। ধর্মের বিকাশের ক্ষেত্রে একটি অপরটির উপর বরাবরই প্রভাব বিস্তার করেছে। অভিজ্ঞতা বিশ্বাসের ভিত্তি যুগিয়ে দিয়েছে আর এই বিকাশের ভিত্তি, অভিজ্ঞতা যে রূপ গ্রহণ করেছে, তাকে প্রভাবিত করেছে।

জন হিকের মন্তব্য

জন হিক এই প্রসঙ্গে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেছেন যে উপরের আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে এই প্রকল্প গ্রহণ করা যেতে পারে যে, সব বৃহৎ ধর্মের অভিজ্ঞতার মূলে রয়েছে একই পরম ঐশ্বরিক সত্তার সঙ্গে সংযোগ। কিন্তু সেই সত্তা সম্পর্কে তাদের ভিন্ন ভিন্ন অভিজ্ঞতা শতাব্দী ধরে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক চিন্তনের উপর প্রভাব বিস্তার করে বিভিন্ন বৃহৎ ধর্মের রূপ গ্রহণ করেছে, যার জন্য হিন্দুধর্ম খ্রীষ্টধর্ম থেকে পৃথক। জন হিক যে ভবিষ্যতের কল্পনা করছেন তাতে বর্তমানে অস্তিত্বশীল ধর্মগুলি যেন একই ধর্মের বিভিন্ন স্তরের অতীত ইতিহাস বলে গণ্য হবে।

যদি ধর্মের প্রকৃতি এবং ইতিহাস ভবিষ্যতে এই ভাবে বিকশিত হয় তাহলে বর্তমানে বিভিন্ন ধর্মের সত্য হবার দাবীকে কেন্দ্র করে যে বিরোধ তা কি রূপ গ্রহণ করবে?

তিনটি দিক থেকে জন হিক এই প্রশ্নের আলোচনা করেছেন: 'প্রথমতঃ, ঐশ্বরিক সত্তার অভিজ্ঞতার ব্যাপারে পার্থক্য। দ্বিতীয়তঃ, ঐশ্বরিক সত্তা সম্পর্কে দার্শনিক এবং ধর্মসম্পর্কীয় মতবাদ বা মানুষের ধর্মীয় অভিজ্ঞতার তাৎপর্য নিরূপণের ব্যাপারে পার্থক্য এবং তৃতীয়তঃ, প্রত্যাদিষ্ট অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে পার্থক্য, যা কোন ধর্মীয় অভিজ্ঞতা এবং চিন্তনকে ঐক্যবদ্ধ করে।

প্রথম ধরনের পার্থক্যের উদাহরণ হল ঐশ্বরিক সত্তাকে ব্যক্তি-সত্তা বা পুরুষ এবং নৈর্ব্যক্তিক-সত্তা বা অ-পুরুষ হিসেবে গণ্য করা। যেমন, খ্রীষ্টধর্মে ঐশ্বরিক সত্তা হল

একজন পুরুষ, যিনি সৎ, যাঁর উদ্দেশ্য এবং সঙ্কল্প আছে কিন্তু ভারতীয় দর্শনের অদ্বৈত বেদান্তে পরম সত্তা ব্রহ্ম কোন ব্যক্তি-সত্তা নয়।

দ্বিতীয় ধরনের পার্থক্য দার্শনিক এবং ধর্মসম্বন্ধীয় মতবাদের ক্ষেত্রে পরিলক্ষিত হয়। মানুষের বর্তমান চিন্তনের ক্ষেত্রেও এই পার্থক্য বর্তমান এবং জন হিক মনে করেন যে একদিন একে অতিক্রম করে যাওয়া সম্ভব হবে, কারণ তারা পরিবর্তনশীল।

ধর্মসম্পর্কীয় মিল বা ঐক্যের ক্ষেত্রে তৃতীয় ধরনের পার্থক্যই সবচেয়ে বেশী অসুবিধার সৃষ্টি করে। কারণ প্রতিটি ধর্মেরই আছে এক মহান প্রবর্তক, আছে একটি ধর্মশাস্ত্র বা উভয়ই আছে, যার মাধ্যমে ঐশ্বরিক সত্তার প্রত্যাদেশ ঘটেছে এবং যেখানেই এই ঐশ্বরিক সত্তার প্রকাশ ঘটেছে, তখন সেটিই মানুষের বিশ্বাস এবং উপাসনা দাবী করেছে এবং অন্য ধর্মের ক্ষেত্রে যেখানে অনুরূপ প্রত্যাদেশের ঘটনা ঘটেছে তার সঙ্গে অপরটির অসংগতি বা বিরোধ পরিলক্ষিত হয়েছে। যেমন খ্রীষ্টধর্মে বলা হয়েছে যীশুখ্রীষ্টই একমাত্র ঈশ্বরের সন্তান, যিনি ঈশ্বর এবং মানুষের মধ্যে সংযোগ সাধনের মাধ্যম, কিন্তু এই প্রচলিত মতবাদ বর্তমানে অসংগতির সৃষ্টি করেছে, কারণ, একদিকে খ্রীষ্টানধর্ম শিক্ষা দেয় যে ঈশ্বর সকল মানুষের প্রভু এবং স্রষ্টা, তিনি সকল মানুষকে ভালবাসেন, তাদের পরম কল্যাণ এবং মোক্ষ আকাঙ্ক্ষা করেন। কিন্তু অপরদিকে এই ধর্ম বলে যে যীশুকে বিশ্বাস করলেই মানুষ রক্ষা পেতে পারে। এর অর্থ দাঁড়াল যে যারা খ্রীষ্টধর্মের আওতার বাইরে তারা রক্ষা পাবে না। তাহলে মুসলমান, হিন্দু, জৈন, বৌদ্ধ, যাদের মধ্যে ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাসী এবং অবিশ্বাসী উভয় ধরনের ব্যাক্তিই আছেন তাঁরা যীশুখ্রীষ্টের প্রচারিত বাণীর কথা শোনার পরও যদি নিজেদের ধর্মপ্রবর্তকদের আঁকড়ে ধরে থাকে তাহলে বলার কি আছে?

প্রত্যাদেশের ক্ষেত্রে পার্থক্যই চরম অসুবিধার সৃষ্টি করেছে

কাজেই খ্রীষ্টধর্মের মধ্যে এই যে অসংগতি অর্থাৎ অ-খ্রীষ্টধর্মের প্রতি তার মনোভাবের যদি কোন সমাধান করতে হয়, খ্রীষ্টধর্মের চিন্তার ক্ষেত্রে জন হিকের মতানুসারে প্রগতির প্রয়োজন রয়েছে।

দশম অধ্যায়

মানুষের নিয়তি ঃ কর্ম এবং পুনর্জন্ম

১। লৌকিক ধারণা (The Popular Concept) ঃ

যারা পুনর্জন্মে বিশ্বাসী নয়, তাঁরা মনে করেন মানুষ একবারই জন্মায়, একবারই মৃত্যুমুখে পতিত হয়। হিন্দুধর্মে যারা পুনর্জন্মে বিশ্বাসী, তাঁরা মনে করেন যে কোন ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করার পূর্বে বহুবার জন্মগ্রহণ করেছে এবং মৃত্যুর পরেও তার নতুন করে জন্ম হবে। জন হিকের মতে উপরিউক্ত দুটি মতবাদের ক্ষেত্রেই অসুবিধা লক্ষ্য করা যায়।

ভারতীয়রা পাশ্চাত্ত্য ধারণার মধ্যে যে সব অসুবিধা দেখতে পান তার উল্লেখ করতে গিয়ে বলা যেতে পারে যে, মানুষের জন্মের ক্ষেত্রে নানাধরনের অসমতা পরিলক্ষিত হয়। কোন ব্যক্তি সুস্থ দেহসম্পন্ন, তার বুদ্ধ্যঙ্ক উন্নত, জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত, কিন্তু আবার অপর একজন ব্যক্তির ক্ষেত্রে ঠিক এর বিপরীত বিষয়গুলি দেখা যায়। তাহলে এটা কি ভাল যে দু-জন ব্যক্তি এই ধরনের বিপরীত বৈশিষ্ট্য নিয়ে জন্মগ্রহণ করেছে? যখন কোন নতুন শিশুর জন্ম হল, তখন যদি একটি নতুন আত্মা সৃষ্ট হয়, তাহলে স্রষ্টা যে দুটি আত্মার ক্ষেত্রে দুরকম অসম বৈশিষ্ট্য আরোপ করলেন, এর পরও কি সেই স্রষ্টাকে কল্যাণময় বলা চলে? মানুষের জন্মের ক্ষেত্রে যত অধিক পরিমাণে এই ধরনের অসমতা পরিলক্ষিত হয়, ততই পাশ্চাত্ত্য ধর্ম যে ধারণা করে থাকে মানুষ ঐশ্বরিক সৃষ্টি—এটি একটি গভীর সমস্যা বলে মনে হয়।

ভারতীয়দের দৃষ্টিতে অসুবিধা

ভারতীয় ধর্মের সিদ্ধান্ত হল আমরা সবাই ইতিপূর্বে আরও অনেক জীবন অতিবাহিত করেছি এবং আমাদের বর্তমান জীবনের শর্তগুলি আমাদের পূর্বজন্মের প্রত্যক্ষ পরিণতি। মানুষের অদৃষ্টের বা নিয়তির ক্ষেত্রে কোন রকম খেয়ালখুশীর ব্যাপার, কোন রকম অসমতা, অবিচার বা পক্ষপাতের ব্যাপার নেই। যা আছে তা হল কার্যকারণ তত্ত্ব। মানুষ অতীতে যেমন কর্ম করেছে তার ফল বর্তমানে ভোগ করছে। মানুষের আত্মা নিরবচ্ছিন্নভাবে জন্ম থেকে জন্মান্তরে প্রবহমান, বার বার তার পুনর্জন্ম ঘটছে। তার কর্মই তার পরবর্তী জীবনের ঘটনাকে নিয়ন্ত্রণ করছে।

ভারতীয়রা কর্মবাদে বিশ্বাসী

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্যদেশে পুনর্জন্মবাদের লৌকিক রূপটি হল যে, যে আত্মা নতুন দেহ ধারণ করে পুনর্জন্ম গ্রহণ করে সেই আত্মা তার বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে এবং স্মৃতি

সম্পর্কে সচেতন। ব্যক্তির পক্ষে তার বর্তমান দেহ পরিগ্রহ করে পূর্ব জীবনকে স্মরণ করা সম্ভব। সময় সময় ব্যক্তি তার অতীত জীবনের কিছু কিছু অভিজ্ঞতা স্মরণ করতে পারে এবং এগুলিকে পুনর্জন্মের প্রমাণরূপে উপস্থাপিত করা হয় এবং পুনর্জন্ম মতবাদ বলতে কি বোঝায় তাও এই সব ঘটনার দ্বারা নির্দেশিত হয়। অনেকে হয়ত এই সব ঘটনাকে পুনর্জন্মের পক্ষে খুব গ্রহণযোগ্য প্রমাণ বলে মনে করেন না। তবুও যখন এই সব ঘটনাকে অর্থাৎ পূর্ব জন্মের স্মৃতিকে পুনর্জন্মের প্রমাণ বলে নির্দেশ করা হয়, তখন এই সব ঘটনা যে পুনর্জন্মের ধারণার এক বিশেষ ধরনের উপাদান সেটি নির্দেশিত হয় এমন কথা বলা চলে।

ব্যক্তির পক্ষে তার পূর্ব জীবনকে স্মরণ করা সম্ভব

জন হিকের মতে পুনর্জন্মের ক্ষেত্রে তিনটি বিষয় দ্রষ্টব্য। প্রথমতঃ, বর্তমান জীবনের অতীত জীবনের স্মৃতি, দেহের নিরবচ্ছিন্নতা এবং মনস্তাত্ত্বিক নিরবচ্ছিন্নতা (psychological continuity)। যখন বলা হয় যে সব মানব আত্মাই ইতিপূর্বে অসংখ্য জীবন অতিবাহিত করেছে, তখন আমরা দেখতে পাই যে শতকরা ৯৯ জনের ক্ষেত্রে অতীত জীবনের স্মৃতির অভাব। তাহলে পুনর্জন্ম নির্ধারণের একটি মানদণ্ড খুঁজে পাওয়া গেল না। দৈহিক নিরবচ্ছিন্নতার প্রশ্নই আসে না, কেননা পুনর্জন্মবাদ যাঁরা সমর্থন করেন তাঁরা মনে করেন যে, যে একবার পুরুষ হয়ে জন্মেছে সে পরের বারে স্ত্রীলোক হয়েও জন্মাতে পারে। কাজেই অবশিষ্ট থাকল মানসিক অবস্থার নিরবচ্ছিন্নতা। এর অর্থ ক-এর যখন 'খ' রূপে পুনর্জন্ম হল তখন খ 'ক' এর মতন ব্যক্তিত্বের অধিকারী। ক যদি হয় গর্বিত এবং অসংযত, খ ও তাই হবে। ক যদি হয় বিরাট শিল্পী, খ-ও হবে তাই। অনেক ব্যক্তিকেই অতীতে দেখা যায় নানাধরনের মানবিক গুণের অধিকারী। বর্তমানে যদি ঐ একই মানবিক গুণের অধিকারী ব্যক্তিরূপে অনেক ব্যক্তিকে দেখাও যায়, যেহেতু তাদের দেহ ভিন্ন, চেতনা ও স্মৃতিও ভিন্ন, তাদের একই ব্যক্তিরূপে গণ্য করা চলে না। দ্বাদশ শতাব্দীর তিব্বত দেশের কোন একটি নারী কৃষকের সঙ্গে যদি বিংশ শতাব্দীর মার্কিন দেশের কলেজের কোন ছাত্রের মানসিক বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে সর্বপ্রকারে মিল দেখা যায়, তাহলেও তাদের কি এক ব্যক্তি বলে গণ্য করা হবে?

জন হিকের পুনর্জন্মের ব্যাপারে তিনটি বিষয়ের উল্লেখ

কাজেই অতীতের কোন ব্যক্তির সঙ্গে বর্তমানের কোন ব্যক্তির মানসিক বৈশিষ্ট্যের সাদৃশ্যের ভিত্তিতে যদি সিদ্ধান্ত করতে হয় যে, তারা দু'জনই অভিন্ন ব্যক্তি, বিশেষ করে যেখানে দৈহিক অবিচ্ছিন্নতা বর্তমান নেই বা স্মৃতির সংযোগ নেই,

তাহলে সিদ্ধান্ত করতে হবে, সব ব্যক্তি যারা একই সময়ে জীবিত নয়, অথচ যাদের ব্যক্তিত্বের কাঠামোর মধ্যে সাদৃশ্য দেখা যায়, তারা হল অভিন্ন ব্যক্তি। তাহলে এই ধরনের বহু লোকই অভিন্ন ব্যক্তি বলে গণ্য হবে।

কাজেই পুনর্জন্মের ধারণা—অর্থাৎ আত্মার এক দেহের মৃত্যুর পর, অন্য দেহ-ধারনের মধ্য দিয়ে আত্মপ্রকাশ (যদিও স্বাভাবিক ক্ষেত্রে অতীত জীবনের কোন স্মৃতি বর্তমান নেই) স্বীকার করে নিলে নানা ধরনের অসুবিধা দেখা দেয়।

২। হিন্দু বেদান্ত দর্শনে পুনর্জন্মের ধারণা (The Conception of Reincarnation in Hindu Vedanta philosophy) ঃ

বেদান্ত দর্শনের পুনর্জন্মের ধারণা যেমনি জটিল, তেমনি সূক্ষ্ম। পুনর্জন্মের এবং অন্যান্য ধারণা এ ধারণারই হেরফের। কাজেই এ সম্পর্কে আলোচনার প্রয়োজন আছে বলে মনে করেন জন হিক। অদ্বৈত বেদান্ত মতে পরমতত্ত্ব হল ব্রহ্ম, যার থেকে বড় বা ব্যাপক বা উৎকৃষ্ট আর কিছুই নেই। যিনি মহত্তম, তিনিই ব্রহ্ম। 'আত্ম' চ ব্রহ্ম', আত্মাই ব্রহ্ম। নির্বিশেষ পরমাত্মা বা শুদ্ধ চৈতন্যই ব্রহ্ম। ব্রহ্ম অনন্ত, অসীম, নির্গুণ। শংকরের মতে জগৎ মায়ার সৃষ্টি। ঈশ্বর মায়াশক্তি প্রভাবে জগৎ রূপে প্রকাশিত হন এবং অবিদ্যাবশতঃ মানুষ জগতের সত্তা আছে বলে ধারণা করে। নির্গুণ ব্রহ্ম আপনাকে মায়াজালে আবৃত করে সগুণ সোপাধি হন। সগুণ ব্রহ্মই মায়া উপাধি উপহিত। ঈশ্বর বা সগুণ ব্রহ্মই জগতের স্রষ্টা, পালক ও সংহারক।

ব্রহ্মই পরম তত্ত্ব

এক অদ্বয় ব্রহ্মেরই সত্তা আছে। জীবের কোন স্বতন্ত্র সত্তা নেই। জীব মায়া বা অবিদ্যার সৃষ্টি। জীবের দেহান্তর প্রাপ্তি আছে, জন্ম-মৃত্যু আছে, বন্ধন-মুক্তি আছে। জীব সংখ্যায় অসংখ্য। জীব মায়া বা অবিদ্যার সৃষ্টি, তত্ত্বজ্ঞানে অবিদ্যা দূরীভূত হলে জীব ও ব্রহ্মের ভেদাভেদ লোপ পায় এবং জীব ব্রহ্মের ঐক্য সাধিত হয়।

জন হিক বলেন যে অদ্বৈত বেদান্ত মতে অসংখ্য জীবাত্মা অনন্তকাল ধরে অস্তিত্বশীল। কিন্তু আমি, তুমি, আমরা কেউই অনন্ত আত্মার কেউ নই। কেননা আমরা হলাম মনস্তাত্ত্বিক-দৈহিক সংগঠন, অহং সত্তা। আমাদের যথার্থ কোন সত্তা নেই। আমরা মায়ার সৃষ্টি, কেননা মনস্তাত্ত্বিক-দৈহিক অহং-সত্তা পুরুষ বা স্ত্রীলোক হতে পারে, কিন্তু আত্মা স্ত্রী-পুরুষের কোনটিই নয়। আত্মা দেহধারী হলেই স্ত্রী-পুরুষ হয়। দৈহিক মানসিক সংগঠনযুক্ত যে আত্মা সেই আত্মা সাধারণতঃ আত্মার অনন্ত অতীত সম্পর্কে সচেতন নয়, কিন্তু আত্মার গভীরতর স্তর বর্তমান, যেখানে এই সব অভিজ্ঞতা সংরক্ষিত থাকে।

অদ্বৈত বেদান্ত মতে পুনর্জন্ম

প্রত্যেকটি দৈহিক-মানসিক সংগঠনযুক্ত আত্মা এক অনন্ত আত্মার অস্থায়ী প্রকাশ এবং যাকে আত্মার বারংবার জন্ম বলে অভিহিত করা হয় তা হল এই ধরনের প্রকাশের পারম্পর্যের অন্যতম প্রকাশ। আত্মা যে মায়ার অধীন এর অর্থ হল আত্মা একাধিক শরীরের মধ্যে অবরুদ্ধ বা আত্মার একাধিক আবরণ আছে।

তিনটি প্রধান শরীর বা আবরণ হল—স্থূল শরীর, লিঙ্গ শরীর বা সূক্ষ্ম শরীর এবং কারণ শরীর। শেষের দুটিকে এক করলে মোট শরীর দুটি—স্থূল শরীর এবং সূক্ষ্ম শরীর। স্থূল শরীর জন্মের সময় গঠিত হয় এবং জীবের মৃত্যুর সময়ে স্থূল শরীর ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। কিন্তু সূক্ষ্ম শরীর বিনষ্ট হয় না। জীবের দেহান্তর গমনের সময় আত্মার সঙ্গে সূক্ষ্ম শরীরও উপস্থিত থাকে। জীবের সূক্ষ্ম বা লিঙ্গ শরীর পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়, পঞ্চ প্রাণ, মন ও বুদ্ধির দ্বারা নির্মিত। সহজ করে বলতে গেলে নানা ধরনের আবেগগত, আধ্যাত্মিক, নৈতিক, সৌন্দর্যবিষয়ক এবং বৌদ্ধিক পরিবর্তনের আশ্রয় হল লিঙ্গ শরীর।

তিনটি শরীর

জন হিক স্থূল শরীরকেই শরীর বলে অভিহিত করতে চান। কেননা এই শরীর সীমিত, পরিবর্তনশীল এবং চেতনা বর্জিত হওয়াতে জড় দেহের সঙ্গে এর সাদৃশ্য রয়েছে। এই বিষয়টাকে বুঝে নেবার জন্য চিন্তা, আবেগ, কামনা বাসনাকে বস্তু বলে কল্পনা করে নিতে হবে এবং এই সব বস্তু যেন চেতনা থেকে বিযুক্ত হয়ে সংস্কার-রূপে অস্তিত্বশীল হতে পারে, যারা চেতনার সঙ্গে যুক্ত হলে ক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রিত করতে পারে। মৃত্যুর সময় এই সংস্কাররূপ গঠনের চেতনা লোপ পাওয়া সত্ত্বেও অস্তিত্বশীল হতে পারে এবং সূক্ষ্ম বা লিঙ্গ শরীররূপে অস্তিত্বশীল হয়ে নতুন চেতন দেহের সঙ্গে যুক্ত হয়। জন হিক মনে করেন যে, বেদান্ত দর্শনের এই অভিমত সি. ডি. ব্রড (*C. D. Broad*)-এর 'মনস্তাত্ত্বিক উপাদানে'র খুবই কাছাকাছি।

প্রথমতঃ, যদি হিন্দুদের জিজ্ঞাসা করা হয় যে তারা পুনর্জন্মে বিশ্বাসী কেন, তার উত্তরে জন হিক-এর মতে যে উত্তর পাওয়া যাবে তা হল, এটি একটি প্রত্যাদিষ্ট সত্য, যা বেদে শিক্ষা দেওয়া হয়। দ্বিতীয়তঃ, পুনর্জন্মের ধারণার মাধ্যমে মানুষের জীবনের অনেক বিষয়, মানুষের সঙ্গে মানুষের নানা দিক থেকে অসমতার বিষয়টি ব্যাখ্যা করা যায়। তৃতীয়তঃ, কেউ কেউ গত জন্মের কথা স্মরণ করতে পারেন বিশেষ করে যাঁরা মোক্ষ লাভ করেন, তাঁরা পরিপূর্ণভাবে সব কিছুই স্মরণ করতে পারেন।

জন হিক এই পুনর্জন্ম সম্পর্কে নানা প্রশ্ন তুলেছেন। যোগী যোগ সাধনায় সিদ্ধিলাভ করে অসংখ্য অতীত জীবনের কথা স্মরণ করতে পারেন, যে জীবনগুলি অতিবাহিত করার সময় কোন যোগসূত্রের দ্বারা পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত ছিল না। সহস্র

সহস্র পৃথক আত্মা একের পর এক তাদের জীবন অতিবাহিত করছে, যে আত্মাগুলি অন্য আরও অসংখ্য আত্মা থেকে পৃথক। অথচ এই আত্মার ধারাবাহিকতার শেষ স্তরে, কোন একটি আত্মা, তার চেতনার বিশেষ এক স্তরে, পূর্ববর্তী সব জীবনগুলিকেই স্মরণ করতে সক্ষম। সে তার চেতনার উন্নত স্তরে স্মরণ করতে পারছে যে অতীতের এই সব জীবন সে অতিবাহিত করেছে। কিন্তু এই 'স্মরণ করার' ব্যাপারটি নিয়েই জন হিকের প্রশ্ন: তার মতে চেতনার এই উন্নত স্তরের পূর্ববর্তী জীবনের কোন অভিজ্ঞতা আত্মার হয়নি এবং কাজেই সাধারণ অর্থে যাকে স্মরণ করা বলে, সেই অর্থে তাদের স্মরণ করার কোন প্রশ্ন ওঠে না। এই চেতনা এমন একটি স্তরে অধিষ্ঠিত যে এর মনে হচ্ছে যেন অতীত জীবনগুলির অভিজ্ঞতা তার হয়েছে, যদিও বাস্তবে হয়নি।

পুনর্জন্ম সম্পর্কে বিভিন্ন প্রশ্ন

অর্থাৎ পুনর্জন্মে বিশ্বাসী ব্যক্তিরা দাবী করছেন যে ভবিষ্যতে এমন এক উন্নত চেতন অবস্থার আবির্ভাব ঘটতে পারে যখন ধারাবাহিকভাবে ভিন্ন ভিন্ন অনেক জীবনের স্মৃতির আবির্ভাব সম্ভব। জন হিক বলেন যে এই অবস্থাকে বর্ণনা করতে গেলে এই ভাবে বলতে হয় যে, ধারাবাহিক জীবনের শুরুতে রয়েছে 'ক' এবং শেষে রয়েছে হ। তাহলে কি একথা বলা চলে যে খ—হ হল 'ক'-এর ধারাবাহিক পুনর্জন্ম? তাহলে ব্যাপারটা দাঁড়াল এরকম: দু'তিনটি জীবন, যারা সমসাময়িক নয়, এমন জীবনগুলির স্মরণ যদি কোন উন্নত চেতনার স্তরে সম্ভব হয়, তাহলে সেই ধারা-বাহিকতার শেষ স্তরে যে ব্যক্তি, সে ঐ ধারাবাহিক জীবনে পূর্ববর্তী স্তরের ব্যক্তির পুনর্জন্ম। কিন্তু এইভাবে যদি পুনর্জন্মের সংজ্ঞা দেওয়া হয় তাহলে যদি আমি 'ক' হই তাহলে আমি বার বার খ—হ রূপে জন্মগ্রহণ করব। কেননা এমন কোন ধারণাগত যুক্তি নেই যার জন্য আমরা মনে করতে পারি যে বিভিন্ন জীবনগুলি সমসাময়িক হবে না। যদি কোন উন্নত চেতনার পক্ষে যে-কোন সংখ্যক ভিন্ন জীবনকে স্মরণ করা সম্ভব, তাহলে নীতিগতভাবে কোন যুক্তি নেই কেন, ঐ চেতনা সমসাময়িক জীবনকে স্মরণ করতে পারবে না, যেমন সহজে বিভিন্ন সময়ের জীবনের কথা সে স্মরণ করতে পারছে।

বস্তুতঃ, আমরা অসংখ্য উন্নত চেতনার কথা ধারণা করতে পারি, যে উন্নত স্তরে সব মানুষের জীবন যা অতিবাহিত হয়েছে, তার কথা স্মরণ করা যেতে পারে। তাহলে বিভিন্ন মানব জীবন, যেগুলি পরস্পরের দিক থেকে যত পৃথকই হোক না কেন, পুনর্জন্মের ধারণা যে ভাবে করা হয়েছে সেই দিক থেকে এক উন্নত চেতনার মাধ্যমে পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত হবে তাহলে যে-কোন দুটি জীবন সম্পর্কে, এমন বলা যুক্তিযুক্ত হবে যে, একটি

জীবন তাদের পূর্ববর্তী হোক. বা পরবর্তী সময়ের হোক, বা সমসাময়িক হোক, যে একজন ব্যক্তি অপর একজন ব্যক্তি রূপে পুনর্জন্ম গ্রহণ করেছে। জন হিক মন্তব্য করেছেন যে পুনর্জন্ম মতবাদের লৌকিক রূপ বা বেদান্ত দর্শনে তার যে সূক্ষ্ম রূপ,যে ভাবেই তাকে চিন্তা করা হোক না কেন, মতবাদটির ক্ষেত্রে নানারকম অসংগতি পরিলক্ষিত হয়।

মানুষের জন্মের ক্ষেত্রে যে বিভিন্ন ধরনের অসমতা দেখা যায়, দেখা যাক পুনর্জন্মবাদ এই অসমতার বিষয়টিকে যথাযথভাবে ব্যাখ্যা করতে পারে কিনা?। হয় একটি প্রথম জীবন আছে, যে জীবনে মানুষের সঙ্গে মানুষের পার্থক্য রয়েছে বা যেমন বেদান্ত দর্শনে বলা হয়েছে, কোন প্রথম জীবন নেই, অথচ প্রারম্ভহীন পুনর্জন্মের ধারাবাহিকতা রয়েছে। সেক্ষেত্রে আমাদের বর্তমান জীবনকে কেন্দ্র করে যে অসমতা তার ব্যাখ্যা অন্তহীন ভাবে বন্ধ থাকবে এবং কখনও পাওয়া যাবে না। কারণ আমাদের বর্তমান জীবনের কোন ব্যাখ্যা আমরা পাব না যদি না আমাদের বলা হয় যে তারা অতীত পূর্ববর্তী কোন জীবনের ফলস্বরূপ। আবার সেই জীবনকে যদি তার পূর্ববর্তী জীবনের দ্বারা ব্যাখ্যা করতে হয়, তাহলে আর এক জীবনের কথা চিন্তা করতে হবে, এইভাবে অনবস্থা দোষের সৃষ্টি হবে। আর যদি প্রথম জীবনের কথা আমাদের স্বীকার করে নিতে হয়, যা হিন্দুধর্ম করে না, তাহলে আমাদের ধারণা করতে হবে যে, হয় আত্মাগুলিকে অভিন্ন করে সৃষ্টি করা হয়েছে বা তাদের পরস্পরের মধ্যে যে অসমতা আছে তার বীজ জন্ম সময় থেকেই তাদের মধ্যে প্রচ্ছন্ন ভাবে রয়েছে, সেভাবেই তাদের সৃষ্টি হয়েছে, যার থেকে পরে অসমতার বিকাশ ঘটেছে। যদি শেষেরটি স্বীকার করে নেওয়া হয় তাহলে সৃষ্টির সুরুতে মানুষে মানুষে অসমতার সমস্যাটি পরিপূর্ণ আকারে দেখা দেয়। যদি প্রথমটি মেনে নেওয়া যায় তাহলে অসমতার ব্যাপারটির জন্য পরিবেশকে দায়ী করতে হয়, যে পরিবেশ পরিপূর্ণভাবে অভিন্ন দুটি ব্যক্তির মধ্যে নানা বিষয়ে অসমতা সৃষ্টি করেছে। সেক্ষেত্রে পুনর্জন্মবাদের সাহায্যে অসমতার বিষয়টি ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন দেখা দেয় না। কাজেই যদি কোন ঐশ্বরিক স্রষ্টা থাকে তাহলে এই দুই বিকল্পের কোন একটিকেই তিনি এড়িয়ে যেতে পারবেন না।

পুনর্জন্মবাদ অন্যান্য প্রশ্নের উত্তর দিতেও বিফল হয়

৩। পুনর্জন্মের এক নতুন ব্যাখ্যা (A new interpretation of Rebirth):

প্রমাণের অতীত এবং মিথ্যা প্রতিপন্ন হতে পারে না এমন এক আধিবিদ্যক ধারণারূপে পুনর্জন্মবাদকে গঠন করার প্রচেষ্টা সফল না হওয়াতে তার এক নতুন ব্যাখ্যা দেবার প্রচেষ্টা দার্শনিক মনে দেখা দিয়েছে। বুদ্ধদেব স্থায়ী আত্মায় বিশ্বাসী ছিলেন না,

সেকারণে মৃত্যুতে আত্মা এক দেহ পরিত্যাগ করে অন্য দেহ গ্রহণ করছে এই মতবাদ তিনি গ্রহণ করতে পারেননি। কিন্তু তিনি কর্মবাদকে স্বীকার করে নিয়েছিলেন এক নতুন অর্থে—অর্থাৎ মানুষের কর্মের ফলাফল জন্ম থেকে জন্মান্তরে সাঞ্চারিত হয়। এই জন্মে মানুষ যা করছে, পরজন্মের মানুষকে সেই কর্মের ফলাফল ভোগ করতে হবে।

এই মতবাদ অনুসারে পুনর্জন্মবাদ কর্মবাদের এক পৌরাণিক রূপ। কর্মবাদ এক পরম নৈতিক সত্যকে প্রকাশ করে সর্বজনীন মানুষের দায়ীত্বের কথা শিক্ষা দেয়। আমাদের সব কার্যই ভবিষ্যতকে প্রভাবিত করে, যেমন আমাদের প্রত্যেকের জীবন আমাদের পূর্বে যারা জন্মগ্রহণ করেছেন তাদের দ্বারা প্রভাবিত। ব্যক্তি বিশেষের কর্মসূত্রের কথা চিন্তা না করে যদি মানবজাতির কর্মসূত্রের কথা চিন্তা করা যায়, যে কর্মের ক্ষেত্রে প্রত্যেকেরই অবদান রয়েছে এবং প্রত্যেকেই প্রভাবিত হচ্ছে, তাহলে পুনর্জন্মের ধারণা সমগ্র মানব জাতির মিলিত ঐক্যের কথা স্বীকার করে নেয় এবং আরও স্বীকার করে নেয় সমগ্রের প্রতি প্রত্যেকের দায়ীত্ব, যে সমগ্রের সে একটা অংশ। আমরা লাইবনিজের কল্পিত মনাদ (monad) বা চিৎপরমাণু নই, যে প্রত্যেকে যে যার নিজস্ব জগতে বসবাস করছি। বরং আমরা এক মানব জগতের অংশ যারা পরস্পরের সঙ্গে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় রত, যে জগতে প্রত্যেকের চিন্তা এবং ক্রিয়া অপরের জীবনে হয় ভাল বা মন্দ প্রভাব বিস্তার করে। অতীতে অপরে যে ভাবে জগৎকে গঠন করেছে আমরা বর্তমানে সেই জগতে বাস করছি, আবার আমরা যেভাবে জগৎকে গঠন করছি সেই জগতে আমাদের ভবিষ্যৎ বংশধরদের বসবাস করতে হবে। অপরের কর্ম আমাদের বর্তমান জগতকে গঠিত করেছে, তেমনি আমাদের কর্ম অপরের বসবাসের জন্য জগৎকে গঠিত করবে। এইভাবে ধারণা করলে কর্মের ধারণার এক বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। জন হিক বলেন যে, এই দৃষ্টিতে দেখলে কর্ম হল এক নৈতিক মতবাদ। পুনর্জন্মের লৌকিক রূপ অর্থাৎ আত্মার দেহ থেকে দেহান্তরে গমন বা বেদান্তের লিঙ্গ শরীরের অপর দেহকে আশ্রয় করা, সবই এই নৈতিক সত্যের পৌরাণিক প্রকাশ ছাড়া কিছুই নয় (as mythological expressions of this great moral truth)।

অনেক পাশ্চাত্ত্য দার্শনিক এই শেষোক্ত পুনর্জন্ম সম্পর্কীয় মতবাদকে গ্রহণ করতে আপত্তি জানাবেন না, কেননা এ হল মানবতার সুস্পষ্ট স্বীকৃতি। কিন্তু পুনর্জন্ম বলতে সাধারণতঃ যা বোঝান হয় তার ব্যাখ্যা হিসেবে উপরিউক্ত মতবাদটি কতদূর পর্যন্ত গ্রহণযোগ্য হবে সেই সম্পর্কে জন হিক সংশয় প্রকাশ করেছেন এবং আমাদেরও সংশয় প্রকাশ করার ব্যাপারে কোন দ্বিধা নেই।